নাট্যদর্পণ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের
পি.এইচ. ডি উপাধির জন্য
প্রদত্ত গবেষণাগ্রন্থ
২০১২

সুশ্রী চক্রবর্তী

তত্ত্বাবধায়িকা ঃ ডঃ. ঋতা চট্টোপাধ্যায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২

আমুখ

নাটকের প্রতি আকর্ষণ থেকে-ই নাট্যতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ। গবেষণার বিষয় নিয়ে তাই চিন্তা করতে হয়নি; স্থির-ই ছিল যে, নাট্যতত্ত্বমূলক কোনো গ্রন্থের উপর কাজ করবো। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল অচর্চিত বা অল্প-চর্চিত কোনো গ্রন্থের উপর স্বতন্ত্রভাবে আলোকপাতের ইচ্ছা। এই দুই শর্তের সমাবেশ খুঁজে পেলাম 'নাট্যদর্পণ' গ্রন্থের মধ্যে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত এই গ্রন্থটি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নামক দুই জৈনাচার্যের যৌথ রচনা। এই দুই বিদ্বৎপ্রবরের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষায় উদ্ভাসিত এই গ্রন্থে নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত ও সর্বথা স্বতন্ত্র কিছু অভিমত পোষণ করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভবতঃ গ্রন্থকারদের জৈনধর্মাবলম্বিতার কারণে ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে এই গ্রন্থটি তার যথাযোগ্য প্রচার ও প্রসার পায়নি। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের এই অনাদৃত রত্নটিকে বিশ্লেষণের নিকষে রেখে তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ এবং সুধীসমাজের সপ্রশংস অনুমোদন – এই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য।

নাট্যতত্ত্বের দর্পণস্বরূপ এই গ্রন্থে নাট্যতত্ত্বের অন্তর্গত প্রায় সর্ববিধ বিষয়ে সুষ্ঠু আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থের সূচনা হয়েছে বাগ্দেবীর স্তুতিমূলক মঙ্গলাচরণের দ্বারা। কারিকা এবং বৃত্তিতে বিধৃত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে নাটকলক্ষণ, অঙ্কলক্ষণ, অর্থোপক্ষেপক-অবস্থা-সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গাদি তত্ত্বের সোদাহরণ বিশদ আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় বিবেকে রয়েছে প্রকরণাদি একাদশ প্রকার অন্য রূপকের লক্ষণবিচার। তৃতীয় বিবেকটি বৃত্তি-রস-ভাব-অভিনয়াদির আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই অধ্যায়ের রসবিমর্শে গ্রন্থকারদের বিশ্লেষণীক্ষমতা বিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে নান্দী, ধ্রুবা, নাটকীয় পাত্রের ভেদ, ভাষাবিভাগ, উপরূপকসমূহ ইত্যাদির সুবিস্তৃত আলোচনা।

আমি আমার গবেষণাগ্রন্থে নাট্যদর্পণধৃত উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি এবং সম্ভবপর প্রতিটি ক্ষেত্রে সটীক নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, শৃঙ্গারপ্রকাশ, ধ্বন্যালোক, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যানুশাসন, সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের তুলনাত্মক আলোচনা করেছি। এই দীর্ঘ পর্যেষণার পর নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, নাট্যকলাসংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বের বিন্যাসে, বেশ কয়েকটি অভিনব অভিমতের সন্নিবেশে, অননুকরণীয় মৌলিকতায় নির্মিত এই নাট্যদর্পণগ্রন্থটি বাস্তবিক-ই অধুনাতন সাহিত্যচিন্তকদের মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। আমার এই গবেষণা যদি বিবুধবর্গের নাট্যদর্পণসংক্রান্ত জিজ্ঞাসাকে কিছুমাত্র পরিতৃপ্ত করতে পারে, তবে-ই এই প্রয়াসকে সার্থক মনে করবো।

অলমতিবিস্তরেণ –

কলকাতা,২০১২

সুশ্রী চক্রবর্তী

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

গবেষণার সহায়কদের মধ্যে প্রথমে-ই উল্লেখ্য তত্ত্বাবধায়িকা ডঃ. ঋতা চট্টোপাধ্যায়ের নাম। বিভাগের যাবতীয় দায়িত্বপালনের পর-ও তিনি আমায় যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। গ্রন্থরচনার প্রতিটি স্তরে এবং বিভিন্ন প্রকার অফিশিয়াল কাজে সর্বদা তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। গবেষণা দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য তিনি ক্রমাগত আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আর কেবলমাত্র এই গবেষণার সময়ে নয়, ইতিপূর্বে-ও, আমার ছাত্রজীবন থেকে-ই বহু সূত্রে তাঁর সস্নেহ সাহায্য পেয়ে এসেছি।তাঁকে আমার বিনয়াবনত প্রণাম জানাই।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বিদ্বদ্বরেণ্য ডঃ. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি আমার গবেষণার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। গবেষণার সুবিধা ও অগ্রগতির জন্য সুপরামর্শ দিয়েছেন বহুবার। সাহিত্য পরিষদ্-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনে-ও বারংবার তাঁর আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি। তাঁকে প্রণাম জানাই।

বিশেষভাবে স্মরণীয় পণ্ডিতপ্রবর ডঃ. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। জৈন সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি তাঁর শীলিত স্মৃতিকোশ থেকে মুহূর্ত্তমধ্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থের নাম এবং সেগুলির প্রাপ্তিসন্ধান দিয়ে দিলেন; সেই বইগুলির দ্বারা আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। তাঁকে সপ্রণাম কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজের অধ্যাপক ডঃ. কার্তিক চন্দ্র খাটুয়া মহোদয়কে। গবেষণাসংক্রান্ত পড়াশুনোয় এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে বহু সুপরামর্শ দিয়ে তিনি আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রেখেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বিদ্যালয়ের (রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়) শিক্ষিকাদের, যাঁদের কাছে আমার সংস্কৃতশিক্ষার সূত্রপাত। স্মরণ করি বেথুন মহাবিদ্যালয়ের ডঃ. সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং ঁডঃ. সুমিতা মিত্রকে। প্রণাম জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডঃ. সীতানাথ আচার্য মহাশয়কে। সংস্কৃত নন্দনতত্ত্ব, নাট্যতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আমার আগ্রহের সূচনা তাঁর-ই অধ্যাপনাদ্বারে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এক-ই সঙ্গে প্রণাম জানাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের-ই প্রাক্তন অধ্যাপক প্রথিতযশা ডঃ. মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়কে। এঁদের স্নেহচ্ছায়ায় পড়াশুনো করতে পারা যে কি সৌভাগ্যের বিষয়, অধিকারীমাত্র-ই তা অবগত আছেন।

সবিশেষ ধন্যবাদ জানাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ. করুণাসিন্ধু দাস মহাশয় এবং সংস্কৃত বিভাগীয় অধ্যাপিকা ডঃ. পার্বতী চক্রবর্তী মহাশয়াকে। গবেষণাগ্রন্থ জমা দেওয়ার পূর্বে আন্তর্জাতিক কোনো জার্নালে একটি রচনা প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল; সময় ছিল আসন্ন। অত্যল্পকালমধ্যে সেই রচনাপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে এঁরা আমার বিশেষ উপকার করেছেন। অন্যথায় যথাযথ সময়ে এই গ্রন্থ জমা দেওয়া সম্ভব হত না। এক-ই সঙ্গে সপ্রণাম কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ. দেবার্চনা সরকার মহাশয়াকে। গবেষণাসংক্রান্ত বহু অফিশিয়াল কাজে তিনি বারংবার আমাকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছেন।

ধন্যবাদ জানাই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ. শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী শ্রীবাস্তবকে এবং মহারাণী কাশীশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের ডঃ. রীতা চ্যাটার্জীকে। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য কিছু ইংরাজী বই-এর সন্ধান দিয়ে এঁরা আমায় উপকৃত করেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের মিঠুদাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বহুবার বহু বই-এর সন্ধানে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি; কখনো ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়নি। এক-ই প্রসঙ্গে অকৃপণ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই এশিয়াটিক সোসাইটির সুভাষবাবু এবং সুরজিৎবাবুকে।

মা মনসা এ**ন্টার**প্রাইজ-এর কর্ণধার সর্বাণী এবং কম্পোজিটার নিরুপমাদিকে অজস্র ধন্যবাদ। এঁদের পক্ষে দুর্বোধ্য সংস্কৃত অক্ষরসমষ্টি দিনের পর দিন কম্পোজ করা যে কি শ্রমসাধ্য কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অসীম ধৈর্যে এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এঁরা আমার কার্যোদ্ধার করেছেন। এঁদের কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকবো।

যাঁর সহযোগিতা ব্যতিরেকে গবেষণার কাজ যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না, তিনি আমার মা, শ্রীমতী উশ্রী চক্রবর্তী। সংস্কৃতের-ই অধ্যাপিকা হওয়ার সুবাদে গবেষ্য গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পেরেছি; প্রুফ সংশোধনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের অর্ধেক লাঘব করেছেন তিনি; সবচেয়ে বড় কথা, গবেষণার সুদীর্ঘ ও বন্ধুর এই যাত্রাপথে অক্লান্ত গতির জন্য তিনি আমায় ক্রমাগত মনোবল যুগিয়েছেন। কি ভাষায় তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, জানি না।

জীবনসঙ্গী অমিতাভকে ধন্যবাদ। গবেষণার যেটুকু কাজ আমি কম্পিউটারে করেছি, সে সবটুকু-ই তার শেখানো। আমার লেখার জন্য খাতা-কলমের নিয়মিত যোগান-ও সে-ই দিয়েছে।

কন্যারত্ন পুপে আমার ‘প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি’। গবেষণার দীর্ঘ পথে যতবার ক্লান্তি বোধ করেছি, ততবার সে তার নিষ্পাপ সরলতা, তার অনাবিল হাসি আর তার নিত্যনতুন দুষ্টুমিতে আমাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তার জন্য রইল অনেক-অনেক আদর।

আমার বাবা, 'ছাত্রপরিষদি লব্ধকীর্তিঃ' ডঃ. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তীর বিশাল গ্রন্থভাণ্ডারের যথেচ্ছ সদ্ব্যবহার করেছি; তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বোন শ্রদ্ধার রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। শ্বশুরমশাই নিখিলকান্তি মজুমদার এবং শ্বশ্রূমাতা কৃষ্ণা মজুমদারকে-ও প্রণাম।

আমার মেয়ের আয়া মঞ্জুদিকে ধন্যবাদ জানাই। তার উপর ন্যস্ত অতি-গুরু দায়িত্ব সে যথাযথভাবে পালন করেছে বলে আমি নিশ্চিন্তভাবে গবেষণার কাজ করতে পেরেছি। পরিবারের অন্যান্য সহায়কদের-ও যথাযোগ্য ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা, ২০১২ — সুশ্রী চক্রবর্তী

বিষয়সূচী

গ্রন্থনামের সংক্ষেপসূচী

- **অভি.ভা. = অভিনবভারতী** [(ভরতপ্রণীত) *নাট্যশাস্ত্র (অভিনবভারতীটীকাসমেত)*, আর. এস. নাগর সম্পাদিত, দিল্লী, পরিমল পাবলিকেশনস্, ২০০৪ (পরিমার্জিত সংস্করণ)]
- **কা.অ. = কাব্যালঙ্কার** [(ভামহপ্রণীত)*কাব্যালঙ্কার*, রমণ কুমার শর্মা সম্পাদিত, দিল্লী, বিদ্যানিধি,১৯৯৫]
- **কা. অনু. = কাব্যানুশাসন** [(হেমচন্দ্রপ্রণীত) *কাব্যানুশাসন*, রসিকলাল সি. পারিখ সম্পাদিত, বম্বে, শ্রীমহাবীর জৈন বিদ্যালয়, ১৯৩৮]
- **কা.আ. = কাব্যাদর্শ** [(দণ্ডীপ্রণীত) *কাব্যাদর্শ*, চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫]
- **কা.প্র. = কাব্যপ্রকাশ** [(মম্মটপ্রণীত) *কাব্যপ্রকাশ*, বামনাচার্য ঝালকিকার সম্পাদিত, পুণা, ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৬৫ (সপ্তম সংস্করণ)]
- **দশ.রূ. = দশরূপক** [(ধনঞ্জয়বিরচিত) *দশরূপক*, এফ. ই. হল সম্পাদিত, কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৯ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ)]
- **ধ্বনি.আ. = ধ্বন্যালোক** [(আনন্দবর্ধনপ্রণীত) *ধ্বন্যালোক*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ (পরিমার্জিত সংস্করণ)]
- **না.চ. = নাটকচন্দ্রিকা** [(রূপ গোস্বামীপ্রণীত) *নাটকচন্দ্রিকা*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা , সদেশ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ]
- **না.দ. = নাট্যদর্পণ** [(রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র প্রণীত) *নাট্যদর্পণ*, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, দিল্লী, পরিমল পাবলিকেশনস্, ১৯৮৬]
- **না.ল.র. = নাটকলক্ষণরত্নকোশ** [(সাগরনন্দীপ্রণীত) *নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ]
- **না.শা. = নাট্যশাস্ত্র** [(ভরতপ্রণীত) *নাট্যশাস্ত্র (অভিনবভারতীটীকাসমেত)*, আর. এস. নাগর সম্পাদিত, দিল্লী, পরিমল পাবলিকেশনস্, ২০০৪ (পরিমার্জিত সংস্করণ)]
- **ভাব.প্র. = ভাবপ্রকাশন** [(শারদাতনয়প্রণীত) *ভাবপ্রকাশন*, মদনমোহন অগ্রবাল সম্পাদিত, মথুরা, ১৯৭৮]

- **শৃ.প্র. = শৃঙ্গারপ্রকাশ** [(ভোজদেবপ্রণীত) *শৃঙ্গারপ্রকাশ*, জি.এস.জসিয়ার সম্পাদিত ও প্রকাশিত, মাইসোর, ১৯৫৫]
- **সা.দ. = সাহিত্যদর্পণ** [(বিশ্বনাথপ্রণীত) *সাহিত্যদর্পণ (কুসুমপ্রতিমা টীকাসমেত),* হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৮১ (পুনর্মুদ্রিত পঞ্চম সংস্করণ)]

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি

সকল সাহিত্যসমালোচক শ্রব্য ও দৃশ্য ভেদে কবিকর্মের দুটি বিভাগকে স্বীকার করেছেন।এদের মধ্যে শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব-ও সর্বজনস্বীকৃত। আলঙ্কারিকরা যে রসোপলব্ধিকে কবিকর্মের পরম ও চরম সার্থকতা রূপে চিহ্নিত করেছেন,দৃশ্যকাব্যে সেই রসাস্বাদন সহজে এবং অধিক মাত্রায় সম্পাদিত হয়। এমনকি শ্রব্যকাব্যসমূহের রসোপলব্ধি-ও মানসনেত্রে বৃত্তান্তের নাট্যায়মানতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আচার্য ভট্টতৌত সেকারণে-ই বলেছেন – 'প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাব্যে নাস্বাদসম্ভবঃ'। তাই সংস্কৃত আলঙ্কারিক, কবি এবং নাট্যকার – সকলে-ই দৃশ্যকাব্যের গুণকীর্তন করেছেন।

এইরূপ রসাধার দৃশ্যকাব্যের তথা নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাস কিন্তু চিররহস্যাবৃত। এবিষয়ে অজস্র মতভেদ, অসংখ্য বাগ্‌বিতণ্ডা, বহু অনুমান, বহুতর সিদ্ধান্ত। এগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটিতে আংশিক সত্য নিহিত থাকলে-ও সর্বাংশে সত্য এবং সর্বজনসম্মত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। কারণ, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য তথা নাটকের উদ্ভব কবে এবং কিভাবে হয়েছে,সেবিষয়ে কোনো প্রামাণিক তথ্য গবেষকদের হাতে নেই। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অনুকূল পরিবেশে নাট্যসাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। আদিকাব্য রামায়ণে 'নট','নর্তক', 'নাটক' প্রভৃতির ৫৽উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ – 'নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ'(২.৬৭.১৫), 'নাটকান্যপরে প্রাহুঃ' (২.৬৯.৪) ইত্যাদি। মহাভারতে-ও 'পশ্যন্তো নটনর্তকান্'(১.২১৮.১০) ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। উপনিষদ্, হরিবংশ, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে-ও 'রঙ্গাবতারী', 'রঙ্গোপজীবী' ইত্যাদি পদের ব্যবহার দেখা যায়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে শিলালি এবং কৃশাশ্বের নটসূত্রের কথা আছে– 'পারশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ' (৪.৩.১১০),'কর্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ' (৪.৩.১১১)। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' নামক দুটি নাটকের নাম এবং 'শৌভিক' পদের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'কুশীলব' পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মগধরাজ বিম্বিসার নাগরাজাদের সম্মানার্থে নাটক রচনা করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ অনুশাসনে এবং জৈন ধর্মগ্রন্থে-ও নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাট্যতত্ত্বের প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল মহর্ষি ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্র, ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যা বর্তমান আকার লাভ করেছে বলে পণ্ডিতবর্গের অনুমান। নাট্যসাহিত্য না থাকলে নাট্যশাস্ত্র রচনার-ও প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পূবের্-ই যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য বিদ্যমান ছিল, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। মহাভারতের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে আরম্ভ বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। রামায়ণ তার-ও দু-এক শতক আগে রচিত বলে অনুমান । পাণিনির

আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম (মতান্তরে চতুর্থ) শতক বলে অনেক পণ্ডিতের অভিমত। এই সকল গ্রন্থে উল্লিখিত ‘নট’, ‘নর্তক’ ইত্যাদি পদ যদি নাটকের অভিনেতাকে-ই নির্দেশ করে থাকে, তবে এইসকল গ্রন্থের-ও পূর্বে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্বকে অবশ্য-ই স্বীকার করে নিতে হয়।

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। তৎসত্ত্বে-ও দৃঢ় ও অকাট্য প্রমাণের অভাবে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ে প্রচারিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বেশ কয়েকটির অসারতা পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকটি মতবাদ আবার সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত না হলে-ও তাতে একদেশদর্শিতা, স্ববিরোধ, প্রয়োজনীয় বিষয়ে যেন ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক্ , আমরা এবার সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ে প্রচলিত মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উদ্‌যুক্ত হব –

১. পৌরাণিক তথা নাট্যশাস্ত্রভিত্তিক মতবাদ ঃ

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ে প্রথমে-ই স্মর্তব্য মহর্ষি ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে নাটকের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাহিনীটি এরূপ – প্রাচীন কালে সমগ্র জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) যখন মানুষের মধ্যে গ্রাম্যতাদোষ দেখা দিয়েছিল, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হওয়ায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তখন মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন এমন একটি ‘ক্রীড়নীয়ক’ সৃষ্টি করতে, যা এক-ই সঙ্গে হবে দৃশ্য এবং শ্রব্য। এই ক্রীড়নীয়কটি-ই হল নাটক বা নাট্যবেদ। উল্লেখ্য যে, ঐসময়ে শূদ্রদের চতুর্বেদে কোনো প্রকার অধিকার ছিল না। তাই দেবগণ বললেন, ক্রীড়নীয়কটি এমন হবে, যাতে থাকবে সর্ববর্ণের সমান অধিকার –

“মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।
ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ॥
ন বেদব্যবহারো2য়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্ ॥”(না.শা.১/১১-১২)

দেবগণের এই আবেদনে সম্মতি জ্ঞাপন করে প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে রচনা করলেন ‘চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্’ এই নাটক –

“ জগ্রাহ পাঠ্যমৃগবেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥” (না.শা.১/১৭)

প্রথম নির্মিত এই নাটকের নাম 'দেবাসুরসংগ্রাম'।

নাটক সৃষ্টির পর সঙ্গত কারণে-ই আসে এর অভিনয়প্রসঙ্গ। নাট্যাভিনয়ের মতন এমন আয়াসসাধ্য ব্যাপারে চিরসুখী দেবগণ অক্ষমবিধায় ডাক পড়ল মর্ত্যের মহর্ষি ভরতের। ব্রহ্মার আদেশে সশিষ্য ভরত ইন্দ্রধ্বজোৎসবে 'দেবাসুরসংগ্রাম'-এর অভিনয় করলেন।

ব্রহ্মা রচনা করলেন দ্বিতীয় নাটক 'অমৃতমন্থন' – দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন যার বিষয়বস্তু। এটি-ও অভিনীত হল। এরপর রচিত হল ব্রহ্মার তৃতীয় নাটক 'ত্রিপুরদাহ'– মহাদেবের দৈত্যপুরী বিনাশের ঘটনা নিয়ে এটি রচিত। এই নাটকের অভিনয়দর্শনে প্রীত ত্রিপুরারি মহাদেব স্বয়ং নাট্যের পরিপূর্ণতাহেতু দান করলেন 'তাণ্ডব', পার্বতী দান করলেন 'লাস্য'।

এরপর একদা নাট্যপ্রয়োগে অপরাধবশতঃ ব্রহ্মার অভিশাপে ও আদেশক্রমে এবং পার্থিব রাজা নহুষের আবেদনে সশিষ্য ভরত নাট্যকে নিয়ে এলেন মর্ত্যলোকে। সেই থেকে পৃথিবীতে নাটকের প্রচলনের সূত্রপাত। তবে, বলা বাহুল্য , এই ঘটনার দিন-ক্ষণ নির্দেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

সংস্কৃতে নাটকের উৎপত্তি প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্র-বর্ণিত এই কাহিনীর যৌক্তিকতা কতখানি, তা বিচার্য। 'নাট্যতত্ত্বমীমাংসা' গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ. সাধন কুমার ভট্টাচার্য এই কাহিনীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। অন্যদিকে ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ. এ.বি.কীথ প্রমুখ এই কাহিনীকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন। ডঃ. মুখোপাধ্যায় একটু ভিন্নভাবে এর মূল্যায়ন করে বলেছেন – ''সেযুগে নূতন যাহা কিছু সৃষ্ট হইত, সে সৃষ্টি চলিত ব্রহ্মার নাম দিয়া, ইহাই ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য।... ব্রহ্মা ব্যতীত এত বড়ো বস্তু সৃষ্টি করিবে কে, এই ছিল তদানীন্তন ধারণা।''[১] অতএব তাঁর মতে, ব্রহ্মা নন, নাট্যবেদের রচনা মর্ত্যবাসীর হাতে-ই এবং নাটকের প্রথম যে অভিনয় হয়েছিল, তা-ও এই মর্ত্যের মাটিতে-ই।

এ প্রসঙ্গে ডঃ. মুখোপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য-ও প্রণিধেয়। তিনি বলেছেন–''প্রথম নাটকের রচয়িতা ভগবান ব্রহ্মা, নাটকের নাম 'দেবাসুর-সংগ্রাম'। অতএব মনে হয় আর্য ও অনার্যগণের সংগ্রাম ও অনার্যগণের পরাজয়ের অনতিকাল পরেই এই অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়।লোকশিক্ষার পরিবর্তে আর্য-মহিমা প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য এই অভিনয়ের । নিশ্চয়ই নাট্যবেদের উৎপত্তির ইহাও অন্যতম কারণ।"[২]

নাট্যবেদের উৎপত্তি বিষয়ে এই নাট্যশাস্ত্রভিত্তিক মতবাদের আলোচনাবসরে আরেকটি বিষয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দশপ্রকার রূপক স্বীকৃত হয়েছে। রূপকের এই বর্গীকরণের বিষয়টিতে বিশেষ অবধান প্রয়োজন । প্রতি ভেদে বেশ কিছু সংখ্যক রূপক না থাকলে

এই বর্গীকরণের কোনো অর্থ-ই থাকে না। অতএব নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের আবির্ভাবকাল যদি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে একথা-ও স্বীকার করতে-ই হবে যে, মহর্ষি ভরত এতপরিমাণ রূপক দেখেছিলেন যে, তাঁর মনে রূপকের এই বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। কারণ আগে নাট্য, পরে নাট্যশাস্ত্র – এই হল রচনার ক্রম। এবং এই দুয়ের মধ্যে কালিক ব্যবধান-ও কখনো-ই খুব কম হতে পারে না। সুতরাং আজ থেকে অন্ততঃ দুহাজার বছর আগে এই বিপুলসংখ্যক রূপকের রচনা এবং বিশেষতঃ তাদের ব্যাপক পরিচিতির প্রমাণদৃষ্টে এই সিদ্ধান্তে আসতে-ই হয় যে, অতি প্রাচীনকালে এবং মহর্ষি ভরতের বহু পূর্বে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের জন্ম হয়।

২. বেদভিত্তিক মতবাদ ঃ

এতাবৎ আবিস্কৃত বিশ্বের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে কতগুলি কথোপকথনমূলক সূক্ত আছে; যথা–যম-যমী সূক্ত (১০/১০), ইন্দ্র-বসুক্র সূক্ত(১০/২৮), দেব-অগ্নি সূক্ত (১০/৫১), পুরূরবা-উর্বশী সূক্ত (১০/৯৫), পণি-সরমা সূক্ত (১০/১০৮), বিশ্বামিত্র-নদী সূক্ত (৩/৩৩), ইন্দ্র-অদিতি-বামদেব সূক্ত (৪/১৮), ইন্দ্র-মরুৎ সূক্ত (১/১৬৫), অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সূক্ত (১/১৯৭) ইত্যাদি। 'সংবাদসূক্ত' নামে আখ্যাত এসকল সূক্তে যথেষ্ট নাটকীয়তা পরিলক্ষিত হয় । অনেক পণ্ডিতের মতে এই সূক্তগুলিতে যে সংলাপ রয়েছে, তাকে সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনতম রূপ বলা যেতে পারে। কালক্রমে এই সংলাপগুলির সঙ্গে অভিনয়-নৃত্য-গীত যুক্ত হয়ে নাটকের বর্তমান রূপ এসেছে। এই সংবাদসূক্তগুলির কোনো পৃথক দ্রষ্টার নাম নেই এবং সম্ভবতঃ প্রথমাবস্থায় যজ্ঞীয় ব্যাপারে এগুলির প্রয়োগ-ও ছিল না।

এতদ্ব্যতীত বৈদিক যুগে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের আনন্দবিধানের জন্য এমন কয়েকটি দৃশ্য বা অভিনয়াত্মক ঘটনার অবতারণা করা হত, যাদের মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে সোমযাগের 'সোমক্রয়' অনুষ্ঠান এবং মহাব্রতযাগের 'চর্মবিবাদ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 'সোমক্রয়' অনুষ্ঠানে একজন সোম বিক্রয় করত এবং অন্যরা তা কেড়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিত। সম্ভবতঃ গন্ধর্বদের ঠকিয়ে দেবতাদের সোমগ্রহণের অতীত ঘটনার অভিনয় ছিল এই অনুষ্ঠান। 'চর্মবিবাদ' অনুষ্ঠানে একটি পশুচর্ম নিয়ে বিবাদ বাঁধত বৈশ্য-শূদ্রের মধ্যে। উভয় পক্ষে এ বিষয়ে বাগ্-বিতণ্ডা এবং অবশেষে একপক্ষের জয় ও অপর পক্ষের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে এই নাটকীয় দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটত। এই ধরণের নাটকীয় অনুষ্ঠান যে একবার-ই হত, তা নয়।যখন-ই উক্ত যজ্ঞটি অনুষ্ঠিত হত, তখন-ই সংশ্লিষ্ট নাট্যদৃশ্য বা নাটকীয় ঘটনাটির অবতারণা করা হত। অর্থাৎ এই ধরণের নাটকীয় অনুষ্ঠান প্রায় নিয়মিত ছিল বলে-ই ধরে নেওয়া যায়। একারণে

প্রখ্যাত ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্ ম্যাক্সমূলার , সিলভ্যাঁ লেভী, ডঃ. হার্টেল, উইন্তারনিৎস, ভন শ্রোয়েডার প্রমুখ সকলে বেদের এই সংবাদসূক্তগুলি-ই যে ভারতীয় নাট্যের উৎস অর্থাৎ এ থেকে-ই যে পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব – একথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। ডঃ. হার্টেল তো বৈদিক যুগের 'সুপর্ণাধ্যায়' নামক একটি অর্বাচীন গ্রন্থকে যথার্থ নাটকের মর্যাদায় অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে উইন্তারনিৎস-এর মতে ঋগ্বেদের এই সংবাদসূক্তগুলি কেবল নাটকের নয় , পরবর্তী মহাকাব্যসমূহের-ও উৎস– **"This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama, for these ballads consist of a narrative and a dramatic element".** [৩]

বিপরীতে এ.বি.কীথ এই সংবাদসূক্তগুলিকে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উৎসরূপে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, যদি-ও এদের মধ্যে কিছু নাট্যধর্মী উপাদান আছে বলে তিনি মনে করেছেন –

"....there was undoubtedly present the element of the dramtic representation". [৪]

বিশেষ বিশেষ বৈদিক অনুষ্ঠানে যে অভিনয়গুলি হত, তাতে ধর্মের প্রভাব থাকলে-ও, নাটকীয়তার নিরিখে বিচার করলে এগুলিকে নাট্যসাহিত্যের উৎসের মর্যাদাদানে কুণ্ঠার কোনো কারণ থাকার কথা নয়। সুদূর অতীতে ঋগ্বেদের যুগে নাট্যবেদের উদ্ভবের প্রাথমিক স্তরের স্বরূপ ঠিক কি ছিল, তা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানার বিশেষ উপায় নেই। কিন্তু উপলব্ধ তথ্যাদির সাহায্যে সঙ্গতভাবে-ই এই অনুমানে আসা যায় যে, অভিনয় এবং নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক রূপের উৎপত্তির সন্ধানে বেদের দিকে-ই আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। ঋগ্বেদের রচনার কাব্যিক মূল্য অসীম। সুতরাং কাব্যের-ই আরেকটি প্রকার দৃশ্যকাব্য সেসময় অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত ছিল, এমন কথা মনে করা অনুচিত। তবে প্রাথমিক পর্বের বলে তাতে সূক্ষ্ম শৈল্পিক নিদর্শন আশা করা-ও অযৌক্তিক।

৩. আনন্দানুষ্ঠানভিত্তিক মতবাদ ঃ

অধ্যাপক হিল্লেব্রাণ্ডট এবং অধ্যাপক স্টেন কনো-র ধারণা সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হয়েছে লৌকিক আনন্দ-অনুষ্ঠান থেকে। তাঁদের মতে, নাট্যাংশটুকু ধর্মের ক্ষেত্রে আগন্তুকমাত্র; এর অনুপ্রেরণা এসেছে মানুষের স্বাভাবিক আনন্দ-উপভোগের মানসিকতা থেকে। হিল্লেব্রাণ্ডট নিশ্চিতরূপে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, আনন্দপরিণাম, হাস্যরসাত্মক নাটকাদির উৎপত্তি হয়েছে মানুষের আমোদ-প্রমোদ ও ব্যঙ্গ করার প্রবণতা থেকে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নাটকের বিদূষকচরিত্র , সূত্রধার-নটীর কথোপকথন ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হিল্লেব্রাণ্ডট নিজে-ই অন্যত্র, অন্য

আলোচনায় বিদূষকচরিত্রটিকে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বলে অভিমত পোষণ করেছেন এবং কীথের ধারণা-ও এর অনুরূপ। স্টেন কনো এই মতটি প্রতিপাদন করতে গিয়ে যাত্রাগুলিকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন; তবে সম্ভবতঃ তিনি বিস্মৃত হয়েছেন যে, যাত্রাগুলি মূলতঃ কৃষ্ণ উপাসনার সঙ্গে জড়িত।

৪. পুতুলনাচভিত্তিক মতবাদ ঃ

অধ্যাপক পিশেল এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হয়েছে পুতুলনাচ অর্থাৎ ‘Puppet Show’ থেকে। তাঁর বক্তব্য – পুতুলনাচের উদ্ভব ভারতবর্ষে-ই এবং এ থেকে-ই কালক্রমে নাটকের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর এই ধারণাতে ইন্ধন দিয়েছে সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত ‘স্থাপনা’ ও ‘সূত্রধার’ শব্দ দুটি। তাঁর মতে ‘সূত্র’ ধরে পুতুল স্থাপন করতে হয় এবং এ থেকে-ই সংস্কৃত নাট্যে ‘স্থাপনা’ এবং ‘সূত্রধার’ শব্দ দুটির আগমন ঘটেছে। পুতুলনাচে সূত্রধার যেমন পর্দার আড়াল থেকে সূত্র ধরে পুতুল নাচায়, তেমনি সংস্কৃত নাটকে-ও সূত্রধার অন্তরাল থেকে সমগ্র নাটকটি অর্থাৎ নাট্যাভিনয় পরিচালনা করে।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, পুতুলনাচ যদি নাটকের পূর্ববর্তী রূপ হত, তাহলে নাট্যশাস্ত্রে এর উল্লেখ থাকত। নাটকে ব্যবহৃত ‘স্থাপনা’ ও ‘সূত্রধার’ এই শব্দদুটির ব্যবহারের কারণে-ই যদি নাটককে পুতুলনাচ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়, তাহলে নাটকে ব্যবহৃত ‘ধনুঃ’, ‘যুদ্ধ’, ‘যজ্ঞ’,‘তপস্যা’ ইত্যাদি থেকে-ও নাটকের উৎপত্তি সংক্রান্ত কিছু মতবাদ উত্থাপিত হতে পারে।

৫. পারলৌকিক ক্রিয়াভিত্তিক মতবাদ ঃ

অধ্যাপক রিজ্ওয়ে প্রাচীন আর্যসমাজে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত পারলৌকিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নাট্যোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিত-গবেষকগণ এইসকল অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানকে নাট্যোৎপত্তির সঙ্গে জড়িত করতে সঙ্গতভাবে-ই অনিচ্ছুক । ডঃ. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন–“প্রাচীন হিন্দুধর্মে মৃত-পুরুষ-সম্পর্কিত প্রেত বা পরলোকতত্ত্ব, মৃতদেহ সৎকার অথবা শ্রাদ্ধাদি বিষয়ক যে সব অনুষ্ঠান ছিল, সেগুলির সঙ্গে নাট্যোৎপত্তির সংস্রব আদৌ ছিল না।”[৫]

৬. বসন্তানুষ্ঠানভিত্তিক মতবাদ ঃ

ইউরোপে প্রচলিত 'May Pole' অনুষ্ঠানের মত ভারতবর্ষে-ও প্রচলন ছিল বসন্তোৎসবের। অনেকের ধারণা সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব এই বসন্তোৎসব থেকে । কোনো-কোনো সংস্কৃত নাটক থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষে বসন্তোৎসবের অস্তিত্ব জানা গেলে-ও, তার প্রাচীনত্ব এবং সে উৎসবের সঙ্গে নাট্যোৎপত্তির সম্পর্ক কতখানি – সেবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৭. বৌদ্ধ মতবাদ ঃ

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অশ্বঘোষরচিত 'শারিপুত্তপ্রকরণ' হল আদি নাটক। এঁদের বিবেচনায় বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ আদি নাটকের রচয়িতা হওয়ায় বৌদ্ধরা-ই ভারতীয় নাট্যরচনায় আদি আচার্যের গৌরবলাভের অধিকারী। দুঃখের বিষয়, প্রথম শতকের কবি তথা নাট্যকার অশ্বঘোষের নাটকরচনার বহু পূর্বে-ই যে অনেক উন্নতমানের নাটক ছিল – এ তথ্য এঁরা বিস্মৃত হয়েছেন।

৮. ছায়ানাট্যভিত্তিক মতবাদ ঃ

অধ্যাপক লুডার্স এবং স্টেন কনো ছায়ারূপককে নাটকের মূল উৎস বলে স্বীকার করেন। ছায়ারূপকজাতীয় অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের পর্দার পিছনে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত ঘটনার পর্দায় প্রতিফলিত ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ করেন দর্শকরা। এই মতের প্রবক্তাদের এই ধারণার প্রধান কারণ হল মহাভাষ্যে ব্যবহৃত 'শৌভিক' শব্দটি। তাঁদের মতে 'শৌভিক' (বা 'শোভনিক') শব্দের অর্থ অভিনয়ের বা ছায়াভিনয়ের ভাষ্যকার।

ভারতে সুভট-রচিত 'দূতাঙ্গদ', মেঘপ্রভাচার্য-রচিত 'ধর্মাভ্যুদয়' এবং ব্যাস শ্রীরামদেব-রচিত 'সুভদ্রাপরিণয়','রামাভ্যুদয়','পাণ্ডবাভ্যুদয়' – এই ছায়ানাট্যগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। ভবভূতির উত্তররামচরিতের ছায়াসীতাবৃত্তান্তকে-ও অনেকে ছায়ারূপকের উদাহরণ বলে মনে করেন। কিন্তু উক্ত উদাহরণগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। এর পূর্বে ছায়ানাট্য ছিল কিনা সে বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এসব ছায়ানাট্যের সঙ্গে মূকাভিনয়ের বিশেষ পার্থক্য নেই এবং নাটকের সঙ্গে এদের বিশেষ সাদৃশ্য নেই। বরং নাটক সৃষ্টি হওয়ার পর তদনুকরণে ছায়ানাট্যের সৃষ্টি হয়েছে – এই ধারণা-ই পোষণ করেছেন অনেকে। ছায়ারূপকের প্রাচীনতার কোনো প্রমাণ না থাকায় অধ্যাপক কীথ তাই এই মতবাদটিকে খণ্ডন করেছেন–"The early evidence adduced for the existance of the shadow drama is wholly unreliable." [৬]

৯. কৃষ্ণোপাসনাভিত্তিক মতবাদ ঃ

অধ্যাপক এ.বি.কীথ নাট্যোৎপত্তি বিষয়ে কৃষ্ণোপাসনার উপর-ই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ধারণা সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মহাকাব্য আবৃত্তির সঙ্গে নাটকীয় কৃষ্ণ-কংস ঘটনার সংযোগের ফলে – "The balance of probability, therefore, is that the Sanskrit drama came into being shortly after, if not before, the middle of the second century B.C. and that it was evoked by the combination of epic recitations with the dramatic moment of the Krsna legend, in which a young god strives against and overcomes enemies."[৭] নাট্যোৎপত্তির মূলে ধর্মের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিলে-ও, ডঃ. কীথের মতবাদটির সমালোচনা করে বলা যায় যে, তিনি সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তিলগ্ন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ বলে যে অভিমত পোষণ করেছেন, তা মেনে নিলে, এটি-ও মেনে নিতে হয় যে, অনধিক দ্বিশতাব্দীকালের মধ্যে-ই সংস্কৃত নাটক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে; কারণ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে-ই পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটকের নিদর্শন আমরা পেয়েছি। এক-ই সঙ্গে উল্লেখ্য খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্রখ্যাত নাট্যকার ভাসের কালজয়ী রচনাগুলি। এত অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যসাহিত্যের এই বিস্ময়কর উৎকর্ষ সম্ভব কিনা, তা অবশ্য-ই বিচারের অপেক্ষা রাখে।

তাছাড়া নাট্যশাস্ত্রের বিরণ অনুযায়ী কৃষ্ণের আগে নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে শিবের। তাই 'নটরাজ' বা 'নটগুরু' বলা হয় শিবকে, কৃষ্ণকে নয়। নাটকের সঙ্গে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণোপাসনার কোনো যোগ থাকলে শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নামোল্লেখ-ই অধিকতর সঙ্গত হত।

ডঃ. কীথের এই মতের সমর্থকরা নাটকে শৌরসেনী ভাষার প্রয়োগকে এপ্রসঙ্গে একটি যুক্তিরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই যুক্তির খণ্ডন করে বলা যায় যে, নাটকে মহারাষ্ট্রী বা মাগধী ভাষার ব্যবহারের উপর-ও জোর দেওয়া হয়েছে। আসলে নাটকগুলির অভিনয় যাতে ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে সমাদৃত হয়, সেই কারণে-ই অভিনয়ের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃতভাষা ব্যবহারের জন্য পরবর্তীকালে নিয়ম করা হয়েছে। এ দেখে নাটকের আদি উৎপত্তি নির্ণয় করা যুক্তিসহ নয়।

একথা সত্য যে, কৃষ্ণোপাসনায় কৃষ্ণ কর্তৃক কংসহত্যার ঘটনাটি নাটকীয়ভাবে উপাসক-দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য – উভয়ত্র পণ্ডিতরা এ-ও স্বীকার করেছেন যে, এসব অনুষ্ঠানের নাটকীয় মূল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ থেকে-ই যে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হয়েছে, এরূপ সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়।

১০. নাট্যোৎপত্তিতে অনার্য অবদান ঃ

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদগুলির সবকটি-ই আর্যমহিমাকেন্দ্রিক। এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে ডঃ. শেল্ডন শেনে, ডঃ. ইন্দু শেখর প্রমুখ সংস্কৃত নাট্যোৎপত্তিতে অনার্যদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

এই মতবাদের প্রমাণগুলি ভারতবর্ষের দুই প্রান্ত থেকে গ্রহণ করতে হবে। একটি হল উত্তর-পশ্চিম ভারত, যা হরপ্পা সভ্যতার বিকাশস্থল; দ্বিতীয়টি দক্ষিণ ভারত, দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশভূমি।

নৃত্য এবং নাট্যের মধ্যে যে একটি অতি-ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে এ বিষয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পূর্বাপর সকল পণ্ডিত একমত। নৃত্যের সঙ্গে ক্রমে গীত-বাদ্য, তদনন্তর সংলাপ – এইভাবে-ই নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিকতম রূপটির নির্মাণ হয়েছে বলে অনেকে-ই মনে করেন। অতএব নৃত্যের মধ্যে-ই যে নাট্যের বীজ সুপ্তাকারে নিহিত ছিল – এমন কথা বলা যেতে-ই পারে। এবার আসা যাক, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের হরপ্পা সভ্যতা বিষয়ে। এই সভ্যতায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণদৃষ্টে একথা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বিকশিত এই সভ্যতায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল।এই সভ্যতা থেকে আবিস্কৃত অন্ততঃ তিনশোটি নৃত্যরত দেব-দেবীর মূর্তি, নর্তকীর মূর্তি ইত্যাদির অপূর্ব বিভঙ্গদৃষ্টে তৎকালের অত্যুন্নত নৃত্যকলা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। এবং এটি-ও অনুমান করা অযৌক্তিক হয় না যে, এই নৃত্য থেকে-ই গীত-বাদ্য-সংলাপ সহযোগে পরবর্তীকালে উদ্ভব হয়েছিল এক সুন্দর সংস্কৃতির, নাট্য ছিল যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । এই মতের প্রবক্তারা ‘নট’ পদের ব্যাখ্যাবসরে এই কথা-ও বলেছেন যে, সংস্কৃত নৃত্যার্থক ‘নৃত্’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন একটি প্রাকৃত রূপ হল নট। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আর্যরা যখন কেবলমাত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা সামগানের দ্বারা আনন্দ অনুভব করতেন, তখন ব্যবসায়প্রধান হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং হয়তো নাট্যের দ্বারা-ও আনন্দ উপভোগ করতেন। অনার্যদের সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট অঙ্গ দ্বারা পরবর্তীকালে আর্যরা অবশ্য-ই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যোৎপত্তির প্রচলিত মতবাদগুলির তালিকায় এই কারণটি না থাকার কারণ হল, মাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে হরপ্পা সভ্যতার খনন কার্য আরম্ভ হয়ে এসকল নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। আর পূর্বতন মতগুলির সবকটি-ই এর প্রাক্কালে উদ্‌ঘোষিত। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ. শেল্ডন তাঁর ‘ Theatre -Three thosand years’ গ্রন্থে নাট্যোৎপত্তির ইতিহাসের এই অনাবিস্কৃত অংশটি উন্মোচনের অসাধারণ প্রয়াস করেছেন।

এবার দৃষ্টিপাত করা যাক্ দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতার প্রতি। প্রামাণিক তথ্যের অভাবে মূলতঃ অনুমানের উপর নির্ভর করে এবিষয়ে অগ্রসর হতে হবে।এপ্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ করা যায়

সঙ্গমসাহিত্যের নাম, যেখানে 'কুট্টু' বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। 'কুট্টু' পদের পারিভাষিক অর্থ হল নৃত্য ও নৃত্যকলা। এই কুট্টুর দশটি ভেদ উল্লিখিত হয়েছে, আশ্চর্যের বিষয়, যাদের মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে পরকালীন কয়েকটি সংস্কৃত রূপকের বেশ কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত 'শিলপ্পদিকারম্' নামক তামিল প্রণয়কাহিনীতে নায়িকা মাধবী যে সকল বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ করছেন, তার অধিকাংশ-ই ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত বাদ্যযন্ত্রগুলির অনুরূপ। দ্রাবিড় সভ্যতায় চর্চিত 'মুদ্রা' নামক বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এক-ই অর্থে 'তন্ত্র' নামে উল্লিখিত ও আলোচিত। 'কথাকলি', 'কুচিপুড়ি', 'ভরতনাট্যম্' ইত্যাদি অসাধারণ, অনুপম নৃত্যশৈলীর জন্ম-ও এই দ্রাবিড় সংস্কৃতিতে-ই। দক্ষিণ ভারতের অজস্র মন্দির, নৃত্যশালা ইত্যাদি স্থানে খোদিত নৃত্যরতা নারীদের অনবদ্য শৈল্পিক ভঙ্গিমার মূর্তিগুলি দ্রাবিড় সভ্যতার যে অত্যুন্নত নৃত্যশিল্পের স্বাক্ষর বহন করে , সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে তার তুলনা এক প্রবিরল বিষয়।

আরেকটি বিষয়-ও এখানে বিশেষ অবধানের অপেক্ষা রাখে। 'নটরাজ' অর্থাৎ অর্বাচীন হিন্দুধর্মে যিনি দেবাদিদেব শিব নামে পূজিত, তিনি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্রাবিড় সভ্যতার নৃত্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা। বৈদিক সূক্তে কোথাও নটরাজের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে পৌরাণিক বার্তাতে বলা হয়েছে যে, নাট্যের সম্পূর্ণতা প্রদানকল্পে এতে তাণ্ডব নৃত্যের সংযোজন করেন নটরাজ শিব। অতএব শিবের সাথে নাট্যের একটি অন্তর্লীন সম্পর্ক নাট্যের জন্মমুহূর্ত থেকে-ই বিদ্যমান এবং এই নটগুরু মহাদেব শিব প্রকৃতপক্ষে দ্রাবিড়জাতির উপাস্য দেবতা ছিলেন। অদ্যাবধি কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ইত্যাদি প্রদেশের অধিবাসীদের বহু নাম ও পদবী শিবের নামানুসারে বিধান করা হয়ে থাকে – বিশ্বনাথন্, নটরাজন্, শিবগণেশন্ ইত্যাদি।[৮]

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে একথা তাই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, আর্য সাহিত্যের রচনাগুলিতে কোনোরূপ ঋণ বা প্রভাবের উল্লেখ না থাকলে-ও, বস্তুতঃপক্ষে কিন্তু সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তিতে অনার্যদের অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

১১. গ্রীক প্রভাব সংক্রান্ত মতবাদ ঃ

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবার সর্বপ্রথম এই মতবাদের প্রচার করেন যে, সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক নাটকের অনুকরণে। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেন, সেই সময় (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭-৩২৬ অব্দ) তাঁর বাহিনীর সঙ্গে কয়েকজন অভিনেতা-ও এসেছিলেন। তাঁদের অভিনয় দেখে ভারতীয়রা নাটক রচনা আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও গুজরাটের

রাজন্যবর্গের সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ হয়। গ্রীক রাজা মিনান্দারের সময় সংস্কৃত নাটক গ্রীক নাটকের দ্বারা সমধিক প্রভাবিত হয় বলে-ও ওয়েবার অভিমত পোষণ করেছেন।

ওয়েবারের এই মতবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন অপর দুই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্র্যাণ্ডেস্ এবং উইণ্ডিশ্ ।এঁদের এই অভিমতের স্বপক্ষে এঁরা কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। যথা –

১. গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় শ্রেণীর নাটক প্রধানতঃ প্রেমমূলক।
২. উভয় শ্রেণীর নাটক অঙ্ক দ্বারা বিভাজিত।
৩. উভয় শ্রেণীর নাটকে অঙ্কের সমাপ্তিতে অভিনেতারা মঞ্চ পরিত্যাগ করে এবং মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রের দ্বারা অন্য চরিত্রের প্রবেশ সূচিত হয়ে থাকে।
৪. উভয় শ্রেণীর নাটকে অভিজ্ঞান বা স্মারকের দ্বারা পরিচয় প্রকাশের পদ্ধতি দেখা যায়।
৫. উভয় শ্রেণীর নাটকে উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে তিন প্রকার চরিত্র দৃশ্যমান। উভয়ত্র বিদূষকজাতীয় চরিত্র-ও বিদ্যমান।
৬. সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত 'যবনী' ও 'যবনিকা' শব্দ দুটি গ্রীক ' Ionian' শব্দ-জাত।

প্রাপ্ত সংস্কৃত নাটকগুলির কোনোটির-ই খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে রচিত হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় এবং এলাহাবাদের কাছে সীতাবেঙ্গ পর্বতগুহায় গ্রীক নাট্যমঞ্চের ভারতীয়রূপ আবিস্কৃত হওয়ায় এই মতবাদটি একসময় বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল।

ওয়েবারের এই মতবাদের বিরোধিতা করেন অপর তিনজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত – পিশেল, সিলভ্যাঁ লেভী এবং কীথ। এঁদের মতে, গ্রীক নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের সাদৃশ্যের পরিবর্তে বৈসাদৃশ্যের গুরুত্ব-ই অধিকতর –

১. গ্রীক নাটক করুণরসপ্রধান এবং বিয়োগান্তক। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত নাটকে করুণরসের ব্যবহার থাকলে-ও তার পরিণতি মিলনান্তক (ব্যতিক্রম ভাসরচিত 'ঊরুভঙ্গ')।
২. গ্রীক নাটক আবেগ-নিয়ন্ত্রিত ও দৃঢ়সম্বদ্ধ; সংস্কৃত নাটক আবেগপ্রধান ও বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ।
৩. স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্য গ্রীক নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; সংস্কৃত নাটকে এবিষয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সংস্কৃত নাটকে স্থানের ব্যাপ্তি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সর্বত্র; সংস্কৃত নাটকের ঘটনাবলীর মধ্যে কালিক ঐক্য সর্বত্র দৃশ্যমান নয়।
৪. 'যবনী' ও 'যবনিকা' শব্দদুটি গ্রীকভাষার প্রভাবে এলে-ও এর দ্বারা সংস্কৃত নাটকে গ্রীক প্রভাব সূচিত হয় না, কারণ গ্রীক নাটকে যবনিকার ব্যবহার ছিল না। আর যবনী বলতে গ্রীক রমণী ছাড়া অন্য যে কোনো বিদেশী বা উপজাতীয় রমণীকে-ও বোঝানো যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে এই যবনিকার বিষয়টি একটু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন নাটকগুলিতে কিন্তু যবনিকার ব্যবহার ছিল না; এর প্রবর্তন যথেষ্ট পরবর্তীকালে। দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'-র পূর্বে কোনো নাটকে যবনিকা বা যবনিকাপাতের উল্লেখ নেই।তাছাড়া সংস্কৃত নাটকে যবনিকা রূপে যে পর্দার ব্যবহার হত, তা গ্রীসসম্বন্ধীয় কোনো বস্তুকে-ই বোঝাচ্ছে – এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের-ও কোনো কারণ নেই – তা অন্য কোনো দেশজাত-ও হতে পারে। এবং যবনিকা বলতে বস্তুতঃপক্ষে পারস্যদেশীয় কারুকার্যময় বস্ত্রকে-ই বোঝানো হত – গ্রীসদেশীয় বস্ত্রকে নয়। আবার অনেকের মতে, মূল শব্দটি ছিল 'জবনিকা', 'যবনিকা' নয়। 'জু'-ধাতুর অর্থ বেগে চলা। অভিনয়কালে তিরস্করিণী বা পর্দার দ্রুত অপসারণ করা হত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল জবনিকা। পরবর্ত্তীকালে এই শব্দটি-ই লিপিকরের প্রমাদবশতঃ বা 'যবনিকা' শব্দের বহুল ব্যবহারবশতঃ 'যবনিকা' রূপে-ই গৃহীত হয়ে ওঠে।

সংস্কৃত নাটকে গ্রীক প্রভাবের বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলি আত্মপক্ষ সমর্থনে যথেষ্ট। অন্যদিকে পক্ষের যুক্তিগুলি বিতর্কাতীত নয় এই কারণে যে, প্রভাবের পক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যে একদেশের নাটক থেকে-ই অন্যদেশের নাটকে অনুসৃত হবে – এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে পৃথক্-পৃথক্ সভ্যতা গড়ে উঠেছে, সেই সব সভ্যতার-ই কয়েকটি সাধারণ ভাবনা থাকতে পারে, থাকতে পারে কতগুলি সাধারণ অনুভূতি। তাই উভয়শ্রেণীর নাটকে কতিপয় সাধারণ বিষয়ের ব্যবহার নির্দ্বিধায় এই প্রমাণ করে না যে, একটি অপরটির অনুকরণ। পক্ষান্তরে একথা সত্য যে, এক-ই স্থানে দুটি সভ্যতার সহাবস্থান থাকলে একটি অপরটির দ্বারা প্রভাবিত হতে-ই পারে। সুতরাং সংস্কৃত নাটকের উপর গ্রীক নাটকের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা-ই শ্রেয়ঃ যে, গ্রীকদের আগমনের পূর্বে-ই সমৃদ্ধ ভারতীয় নাট্যসাহিত্য গ্রীক প্রভাববশতঃ ঋদ্ধতর হয়েছিল মাত্র – তদতিরিক্ত কিছু নয়।

সংস্কৃত নাটকে গ্রীক নাটকের প্রভাবের পশ্চাতে যে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনকে প্রধান কারণ বা যুক্তিস্তম্ভ ধরা হয়, তাঁর আগমনকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক। কিন্তু পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতকে। বস্তুতঃপক্ষে গ্রীকদের ভারত-আগমনের বহু পূর্বে-ই যে ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হত, ভরতের নাট্যশাস্ত্র,পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং রামায়ণ ও মহাভারত এই প্রাচীন মহাকাব্যদ্বয়ে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। এবিষয়ে বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশে বিস্তৃত আলোচনা-ও করা হয়েছে। প্রভাবের পক্ষে অভিজ্ঞানকে যে অন্যতম যুক্তিরূপে স্বীকার করা হয়েছে,

তার-ও পরিচয় এবং ব্যবহার ভারতীয় সাহিত্যে বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত, যথা– রামায়ণে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক নিয়ে সীতার সাথে হনুমানের সাক্ষাৎকার।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় নাট্যসাহিত্য ভারতের-ই মৃত্তিকাপ্রসূত এবং এর উৎপত্তি বিষয়ে আলোচিত উল্লিখিত মতবাদগুলির মধ্যে দ্বিতীয় মতবাদটি অর্থাৎ বৈদিক যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানরূপে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হয়েছে এবং নাটকের প্রাথমিক রূপটি বৈদিক সংবাদসূক্ত সমূহের মধ্যে নিহিত – ম্যাক্সমূলার প্রমুখের এই মতটিকে-ই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসরেখা

নাট্যশাস্ত্র ঃ

ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসে মহর্ষি ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রকে প্রাচীনতম গ্রন্থরূপে মান্য করা হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ.হল যখন 'দশরূপক' নামে একখানি নাট্যসূত্র গ্রন্থের সম্পাদনা করছিলেন, তখন নাট্যশাস্ত্রের একখানি খণ্ডিত পুঁথি তাঁর হাতে আসে এবং তিনি ঐ সম্পাদিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে নাট্যশাস্ত্রের কিছু অংশ মুদ্রিত করেন। এর প্রায় দশ বৎসর পর ১৮৭৪ সালে জার্মান পণ্ডিত হেমান্ প্রবন্ধাকারে নাট্যশাস্ত্রের বিষয়সূচী প্রকাশ করেন এবং এরপর সমগ্র ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ নাট্যশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত শিবদত্ত এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব বোম্বাই থেকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র প্রকাশ করেন।

মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। 'নাট্যতত্ত্বমীমাংসা' গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ. সাধনকুমার ভট্টাচার্য ভরতকে পাণিনি-পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। পাণিনি ব্যাকরণে উল্লিখিত দুটি নটসূত্র তাঁর এই ধারণার ভিত্তি। ঐ সূত্রদ্বয়ে শিলালি ও কৃশাশ্ব নামে দুজন নটসূত্রকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ. ভট্টাচার্যের মতে, ভরত যেহেতু নাট্যশাস্ত্রের প্রথম লেখক, অতএব এই দুজন নটসূত্রকার অবশ্য-ই ভরত-পরবর্তী। এই প্রমাণের আধারে বিচার করলে মহর্ষি ভরতের কালকে পাণিনি-পূর্ববর্তী অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের-ও পূর্বে বলে স্বীকার করতে হয়। ডঃ. মনমোহন ঘোষ-ও এই এক-ই অভিমত পোষণ করেছেন। ডঃ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্র খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সঙ্কলিত বলে মন্তব্য করেছেন। অপরদিকে ডঃ. কীথ নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন না। এই বিতর্কের আর গভীরে প্রবেশ না করে সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ সাহিত্যসমালোচকের মতে

৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র তার বর্তমান আয়তন পরিগ্রহ করেছিল এবং পরবর্তীকালে-ও কিছু-কিছু বিষয় এতে সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু এই রচনার উর্দ্ধসীমা অদ্যাবধি নির্ণয় করা যায়নি।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে মহর্ষি ভরতের পূর্বতন বেশ কয়েকজন নাট্যশাস্ত্রকারের নাম জানা গিয়েছে। সুতরাং ভরতকে মধ্যবর্তী রেখে ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের সমগ্র ইতিহাসকে আমরা প্রাগ্‌ভরত, ভরত এবং উত্তরভরত – এই তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি। শারদাতনয় তাঁর গ্রন্থে 'আদিভরত' বা 'বৃদ্ধভরত' নামে এক নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতার উল্লেখ করেছেন, যিনি বারো হাজার শ্লোকে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেটির নাম ছিল 'দ্বাদশসাহস্রী সংহিতা'। ভরত ঐ বৃহৎ নাট্যশাস্ত্র থেকে সংক্ষিপ্তাকারে ছয় হাজার শ্লোকে প্রচলিত আকারের নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন,যার নাম 'ষট্‌সাহস্রী সংহিতা'। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনবগুপ্ত-ও তাঁর টীকার প্রারম্ভে নাট্যশাস্ত্রের এই নামটি স্বীকার করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক সুশীল কুমার দে আদিভরত বা বৃদ্ধভরত নামে কোনো নাট্যশাস্ত্রকারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন যে, এগুলি পরবর্তী লেখকদের উদ্ধৃতি এবং আদিভরতের নামে উদ্ধৃত সমস্ত অংশ-ই বর্তমান নাট্যশাস্ত্রে উপলভ্যমান। অধ্যাপক পি.ভি. কাণে-ও এই এক-ই অভিমত পোষণ করেন। অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় ব্রহ্মা, সদাশিব ও ভরত – এই তিনজনের নামে তিনটি মতবাদের উল্লেখ করেছেন, যেগুলির সারসংক্ষেপ করে নাট্যশাস্ত্র লিখিত হয়েছিল। আচার্য ভরত স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়ে কোহল, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য ও ধূর্তিল নামক চারজন পূর্ববর্তী নাট্যশাস্ত্রকারের উল্লেখ করেছেন –

''কোহলাদিভিরেবং তু বাৎস্যশাণ্ডিল্যধূর্তিলৈঃ।

মর্ত্যধর্মক্রিয়াযুক্তৈঃ কশ্চিৎকালব্যবস্থিতৈঃ॥''(না.শা.৩৭/২৪)

এঁদের রচিত কোনো গ্রন্থের নাম জানা না গেলে-ও পরবর্তী নাট্যতাত্ত্বিকদের রচনায় 'কোহল'-এর নাম ও তাঁর অভিমতের উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আচার্য ভরত-ও বহুস্থলে 'অন্যে', 'অপরে','প্রাজ্ঞৈঃ' ইত্যাদি পদপ্রয়োগের দ্বারা তাঁর পূর্বসূরীদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মহর্ষি ভরতের পূর্বে-ও নাট্যচর্চার অব্যাহত একটি ধারা বর্তমান ছিল; মহর্ষি ঐ মতগুলি একত্রিত করে সঙ্ঘবদ্ধ আকারে তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন।

ভরতোত্তর যুগের নাট্যতাত্ত্বিকদের আলোচনায় আমরা স্বয়ং আচার্যপ্রোক্ত শতপুত্রের (শিষ্য?) নাম উল্লেখ করতে পারি। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ছাব্বিশ থেকে উনচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে এই নামগুলি বিধৃত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নামের উল্লেখ করা যেতে পারে – শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, কোহল, দন্তিল, জটিল, অষ্টম্বক,তাণ্ডু ,অগ্নিশিখ, সৈন্ধব, পুলোমা, শাড্‌বলী, বিপুল, কপিঞ্জল, ধূম্রায়ণ,

জম্বুধ্বজ, ভার্গব, বুধসেন, বাদরায়ণ, নখকুট্ট, অশ্মকুট্ট ইত্যাদি। এই নামগুলির মধ্যে বহু নাম-ই পরবর্তী নাট্যতাত্ত্বিকদের রচনায় অথবা টীকাকারদের লেখায় নাট্যাচার্য রূপে উল্লিখিত হয়েছে। নন্দী বা নন্দিকেশ্বর, তুম্বুরু, সদাশিব, পদ্মভূ ,দ্রোহিণী, ব্যাস, আঞ্জনেয় প্রভৃতি লেখকের উল্লেখ বা তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায় অভিনবগুপ্ত ও শারদাতনয়ের গ্রন্থে। নন্দী (বা নন্দিকেশ্বর) আচার্য ভরতের গুরু ছিলেন, এমন মত-ও প্রচলিত আছে। শারদাতনয় ও শার্ঙ্গদেবের গ্রন্থে কোহলের নাম পাওয়া যায়। বাৎস্য, শাণ্ডিল্য এঁরা নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা রূপে উক্ত হয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। দন্তিলের নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায় সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ রূপে। শিঙ্গভূপাল তাঁর রসার্ণবসুধাকরে চারায়ণ ও বাদরায়ণের নামোল্লেখ করেছেন। সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে চারায়ণ, নখকুট্ট ও মাতৃগুপ্তের নামে প্রচলিত বেশ কিছু অভিমতের উল্লেখ করেছেন। সাগরনন্দী ও অভিনবগুপ্ত কাত্যায়ন, রাহুল ও গর্গের উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য নামের মধ্যে শকলিগর্ভ ও ঘণ্টকের উল্লেখ করেছেন অভিনবগুপ্ত। তিনি হর্ষ, বার্তিকার প্রমুখের রচনা থেকে উদ্ধৃতি-ও দিয়েছেন।

কিন্তু এতজন নাট্যাচার্যের মধ্যে একমাত্র দন্তিলাচার্য প্রণীত 'গন্ধর্ববেদসার' নামক গ্রন্থটি (রামকৃষ্ণ কবি কর্তৃক আবিষ্কৃত)[৯] ব্যতীত অন্য কোনো আচার্য-রচিত অন্য কোনো গ্রন্থের সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এঁদের নামগুলি নাট্যতত্ত্বচর্চার ইতিহাসের অস্ফুট নিদর্শনমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে।... প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে 'সুবন্ধু' নামে এক নাট্যতাত্ত্বিকের নামোল্লেখ রয়েছে। তিনি এবং গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'-র রচয়িতা এক-ই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যদি উভয়ে এক ব্যক্তি হন, তাহলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বিদ্যমান ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে।

মহর্ষি ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন সংস্করণে গ্রন্থটির অধ্যায়সংখ্যা নিয়ে বৈমত্য দেখা যায়। প্রাচীন টীকাকারদের মতানুযায়ী এই গ্রন্থ ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে গ্রন্থটিকে 'ষট্‌ত্রিংশক' অধ্যায় বিশিষ্ট বলে স্বীকার করে-ও সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ের উপর-ও টীকা রচনা করেছেন। যাই হোক্, বর্তমানে উপলভ্যমান সাঁইত্রিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্র নাট্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও অলঙ্কার সম্পর্কিত আলোচনার আকর। প্রথম অধ্যায়ে নাট্যবেদের উৎপত্তি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রেক্ষাগৃহের বিস্তারিত বর্ণনা,ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রসাভিব্যক্তির প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যসমূহ, অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আঙ্গিক অভিনয়ের বিচার, চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বাচিক ও আহার্য অভিনয়ের বিচার, চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বিভিন্ন কুশীলবের বৈশিষ্ট্য, একত্রিংশ থেকে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে বিবিধ প্রকার গীত-তাল-লয় ও বাদ্যের আলোচনা ইত্যাদি এই মহাগ্রন্থের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ। পাঁচ হাজারের-ও বেশি নিজস্ব শ্লোক,পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক

রচিত প্রায় একশোটি শ্লোক, গুরুশিষ্যক্রমে প্রচলিত কিছু কিছু শ্লোকবদ্ধ মন্তব্য, যেগুলিকে 'আনুবংশ্য শ্লোক' বলা হয়,সূত্রাকারে লিখিত বাক্যগুলির শ্লোকবদ্ধ ব্যাখ্যা এবং গদ্যবাক্যরাশির সমন্বয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্র নামক এই সুবিশাল সাম্প্রদায়িক সঙ্কলনটিকে ভারতীয় ললিতকলার বিশ্বকোষ বললে-ও অত্যুক্তি হয় না। তবে এ প্রসঙ্গে এটি-ও বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিষয়বস্তুর বিন্যাসদৃষ্টে অনেক পণ্ডিত মনে করেন নাট্যশাস্ত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে কিছু-কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে, যা পরবর্তীকালের সংযোজন। এবিষয়ে পি.ভি. কাণে মহোদয়ের বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধেয় –"...the text of the Natyasastra is unsatisfactory and has been tempered with in almost every chapter.'' [১০]

নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে অজস্র টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, যার পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তী কালের গ্রন্থসমূহে। কিন্তু আচার্য অভিনবগুপ্ত বিরচিত 'অভিনবভারতী' টীকার পূর্বে রচিত কোনো গ্রন্থ অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত। অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকার ষষ্ঠ, নবম ও ঊনবিংশ অধ্যায়ে সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত আচার্য উদ্ভটের মতের উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতরত্নাকরে-ও নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা রূপে তাঁর নাম স্বীকার করা হয়েছে। ভামহরচিত কাব্যালঙ্কারের টীকাকার রূপে-ও উদ্ভটাচার্যের নাম সুপ্রসিদ্ধ। অপর এক টীকাকার হলেন অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত আচার্য ভট্টলোল্লট। এই খ্যাতনামা মীমাংসক রসসূত্রের ব্যাখ্যায় উৎপত্তিবাদী আচার্য রূপে অভিহিত। এক-ই শতাব্দীতে আবির্ভূত হন নাট্যশাস্ত্রের অপর এক ব্যাখ্যাতা অনুমিতিবাদী আচার্য শ্রীশঙ্কুক। নবম শতাব্দীতে আবির্ভাব ঘটে ভুক্তিবাদী আচার্য ভট্টনায়কের । দশম শতাব্দীতে বিরাজমান অভিনবগুপ্তের গুরু আচার্য ভট্টতৌত-ও নাট্যশাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। এছাড়া-ও নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতারূপে ভট্টযন্ত্র, সিঙ্গাচার্য, শম্ভুরাজ, আচার্য কীর্তিধর, শ্রীরঙ্গরাজ (ষোড়শ শতাব্দী) প্রমুখের নামোল্লেখ করা যায়।

দেখা যাচ্ছে যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত হওয়ার বহুকাল পর অবধি স্বতন্ত্র কোনো নাট্যতত্ত্ব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। হয়তো টীকারচনার ক্ষেত্রে অত্যধিক মনোযোগ নতুন গ্রন্থ রচনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল অথবা হয়তো অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালের করাল গ্রাসে বিনষ্ট হওয়ায় সেগুলি পরভাবী পণ্ডিতবর্গের অধিগত হয়ে ওঠেনি।

অগ্নিপুরাণ ঃ

অগ্নিপুরাণে সাহিত্যতত্ত্বের নানা কথার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যতত্ত্বের আলোচনা-ও স্থান পেয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং পি.ভি. কাণের মতে এই পুরাণের রচনাকাল নবম শতাব্দী।

অগ্নিপুরাণের তিনশত আটত্রিশতম অধ্যায়টিতে নাট্যকলা বিষয়ক কিছু আলোচনা স্থান পেয়েছে। তবে এই আলোচনায় বিশেষ অভিনবত্ব নেই। নাট্যশাস্ত্রের কিছু অংশ পরিবর্তিতভাবে, কিছু অংশ অপরিবর্তিতভাবে এখানে উপস্থাপিত। এই গ্রন্থে মোট সাতাশপ্রকার নাট্যকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিবিধপ্রকার গৌণ নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টান্তের কথা এখানে নেই। তবে মূল নাট্যারম্ভের আগে পূর্বরঙ্গঘটিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য, কাহিনীর অংশভেদ, সন্ধি, ভারত্যাদি চতুষ্প্রকার বৃত্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য হল এই যে, এই গ্রন্থের তিনশত একচল্লিশ এবং তিনশত বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ে নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি ও চতুর্বিধ অভিনয় বিষয়ে বিস্ত ারিত আলোচনা করা হয়েছে।[১১]

অভিনয়দর্পণ ঃ

আচার্য নন্দিকেশ্বর বিরচিত ‘অভিনয়দর্পণ’ নাট্যতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মহর্ষি ভরত ও তাঁর নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায় নন্দিকেশ্বর ভরতের পরবর্তী। তাঁর আবির্ভাবকালকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য থাকলে-ও, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে তিনি বিরাজমান ছিলেন।

অভিনয়ের প্রকারভেদ, তাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এর সঙ্গে-সঙ্গে নাটকের উৎপত্তি, নাট্য, নৃত্য, নৃত্ত, বিভিন্ন প্রকার নাটকীয় পাত্র ইত্যাদি বিষয়ে-ও আলোচনা করা হয়েছে।

নন্দিকেশ্বর রচিত অপর একটি গ্রন্থ হল ‘ভরতার্ণব’। গ্রন্থটিতে অভিনয় এবং তালের বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনেকে মনে করেন, সুমতি নামক কোনো ব্যক্তির দ্বারা সঙ্কলিত, অভিনয়দর্পণের-ই সংক্ষিপ্তরূপ এই গ্রন্থটি।

দশরূপক ঃ

আচার্য ধনঞ্জয় বিরচিত ‘দশরূপক’ দ্বিতীয় বাক্‌পতিরাজ মুঞ্জের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত। অভিনবগুপ্ত ও ধনঞ্জয় প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে হয়। গ্রন্থের অন্তিম কারিকার ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা হয়েছে, সম্ভবতঃ ধনঞ্জয় তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন ‘দশরূপম্’, পরবর্তীকালে এটি ‘দশরূপক’ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

চারটি ‘প্রকাশ’ অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে নাটক-প্রকরণাদি ভেদে রূপকের দশবিধ প্রধান ভেদের বর্ণনা এবং রূপকসমূহের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা রয়েছে। এতদ্ব্যতীত নাটকীয়

কথাবস্তু অর্থাৎ ইতিবৃত্তের বিভাগ, নায়ক-নায়িকার ভেদ, রসবিমর্শ ইত্যাদি-ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। মূলতঃ নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে লেখা হলে-ও বেশ কিছু স্থলে গ্রন্থকারের স্বকীয়তা লক্ষণীয়; যথা– শৃঙ্গাররসের নতুন ভাগ, নায়িকার নতুন শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্মিত এই গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রের বহু বিষয় অস্পৃষ্ট-ও রয়ে গেছে।

দশরূপকের প্রধান ত্রুটি হল এর একদেশদর্শিতা এবং অতিসংক্ষিপ্তি। প্রায় কোনো বিষয়ে-ই কোনো ভিন্ন মতের বা কোনো পূর্বাচার্যর উল্লেখ নেই। সন্ধি-অবস্থা-অর্থপ্রকৃতি-অর্থোপক্ষেপক প্রভৃতি রূপকের সাধারণ তত্ত্বগুলিকে গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তা অনেক ক্ষেত্রে-ই অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রায় তিনশত কারিকায় রচিত এই গ্রন্থের উপর বহু টীকা রচিত হয়েছিল। কিন্তু ধনিকের 'অবলোক' টীকা ব্যতীত অন্য কোনোটি প্রকাশিত হয়নি। আচার্য ধনিকরচিত টীকার ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল, এবং সহজবোধ্য। অবলোকের সাহায্য ব্যতিরেকে দশরূপকের কারিকাসমূহের অর্থবোধ অসম্পূর্ণ। কেউ-কেউ মনে করেন, ধনঞ্জয় এবং ধনিক এক-ই ব্যক্তি । কিন্তু সূত্রের সাথে বৃত্তির কিছু স্থলে অসামঞ্জস্যদৃষ্টে অনেকে এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না। টীকাকার ধনিক কারিকাকার ধনঞ্জয়ের সহোদর ছিলেন – এই অভিমতটি-ই অধিকতর সম্মত। অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে দশরূপকের আরো কয়েকজন টীকাকারের নাম পাওয়া যায়।এঁদের মধ্যে ক্ষৌণীধর মিশ্র, দেবপাণি, নৃসিংহভট্ট, বহুরূপ মিশ্র, কুরবিরাম প্রমুখের নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। নৃসিংহভট্ট বিরচিত টীকাটি আবার 'অবলোক' বৃত্তির টীকাবিশেষ। তবে এই টীকাগুলি অদ্যাবধি অনুপলব্ধ।

শৃঙ্গারপ্রকাশ ঃ

ধারাধিপতি ভোজরাজ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।এই বিশাল গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য হল রসসম্পর্কে ভোজদেবের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে, প্রসঙ্গক্রমে, কিছু নাট্যতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। বহু তথ্যে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থটিকে রস ও তৎসংশ্লিষ্ট তত্ত্বসমূহের কোশগ্রন্থ বলা যায়। তৎকালে প্রচলিত প্রায় সমস্ত মতের এবং সেই মতসমূহের প্রবক্তা আচার্যদের নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত , ভাষা-ও অতি গুরুগম্ভীর । আলোচনাশৈলীর জটিলতা এবং বিশ্লেষণের অভাব – এই দুই কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে এই গ্রন্থ দুরধিগম্য। আচার্য ভোজদেব 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' ব্যতীত 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামক একটি অলঙ্কারগ্রন্থ-ও রচনা করেছিলেন।

নাটকলক্ষণরত্নকোশ ঃ

একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত আচার্য সাগরনন্দী কর্তৃক বিরচিত 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ' নাট্যতত্ত্বের এক মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী নেপালের রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজ শর্মার সংগ্রহশালা থেকে এই গ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই পুঁথি অবলম্বনে অধ্যাপক এম. ডিলন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নাটকলক্ষণরত্নকোশের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করেন। আচার্য সাগরনন্দী ধনঞ্জয় এবং ভোজদেবের পরবর্তী। এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ডঃ. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতে গ্রন্থকার সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন।

মূলতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত হলে-ও আচার্য সাগরনন্দী এই গ্রন্থে কেবলমাত্র নাট্যের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রকে উদ্ধৃত করে, কোথাও আবার নাট্যশাস্ত্রের কথাকে গদ্যে বা পদ্যে রূপান্তরিত করে তিনি আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের রচনাশৈলী সহজ ও অনাড়ম্বর । গ্রন্থকারের বিশ্লেষণীক্ষমতা বিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে । ডঃ. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতে, আলোচিত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত ভিন্ন অন্য কোনো প্রাক্তন গ্রন্থে এত স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, এত অধিক সংখ্যক লুপ্ত রূপকের বা অঙ্কের নামোল্লেখ এবং সেগুলি থেকে উদ্ধৃতি – এটি-ও অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের আরো একটি প্রাপ্তি হল বহু অজানা নাট্যশাস্ত্রব্যাখ্যাতার নাম ও তাঁদের অভিমতের উল্লেখ। এঁদের মধ্যে হর্ষবার্তিক, অশ্মকুট্ট, গর্গ, বাদরায়ণ ও মাতৃগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(বাগ্ভটবিরচিত) কাব্যানুশাসন ঃ

একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত নেমিকুমারের পুত্র আচার্য বাগ্ভট 'কাব্যানুশাসন' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পণ্ডিতসমাজে এই গ্রন্থটি 'অলঙ্কারতিলক' নামে-ও পরিচিত। এই গ্রন্থটিতে কয়েকটি নতুন প্রকারের নাট্যরচনার উল্লেখ রয়েছে,যেগুলি প্রাগ্ভাবী গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। সেগুলি হল সট্টক, ডোম্বিকা, ভাণ, প্রেরণা, হল্লীসক, শ্রীগদিত, রাসক, গোষ্ঠী ইত্যাদি। এই বাগ্ভট এবং বাগ্ভটালঙ্কারের রচয়িতা জৈন বাগ্ভট (যিনি মহারাজ জয়সিংহের সমকালে খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন) ভিন্ন ব্যক্তি বলে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত হলে-ও অনেকে এক ও অভিন্ন বাগ্ভটের অস্তিত্ব-ই স্বীকার করেন।

(হেমচন্দ্রবিরচিত) কাব্যানুশাসন ঃ

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় আচার্য হেমচন্দ্র রচনা করেন 'কাব্যানুশাসন' নামক এক মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের টীকার নাম 'অলঙ্কারচূড়ামণি'। সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের পূর্ণ বিবরণ সহ নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে-ও এই গ্রন্থে কিছু আলোচনা রয়েছে। মূলতঃ মহর্ষি ভরতের অনুসরণে নাট্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা থাকলে-ও, প্রচলিত দশবিধ রূপকের সঙ্গে নাটিকা ও সট্টক এই দুটি প্রকার যোগ করে মোট দ্বাদশপ্রকার নাট্যকৃতির কথা এই কাব্যানুশাসনে বলা হয়েছে।

নাট্যদর্পণ ঃ

দ্বাদশ শতাব্দীতে-ই হেমচন্দ্রের সুযোগ্য শিষ্য জৈনাচার্য রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র কর্তৃক রচিত 'নাট্যদর্পণ' নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ।

গ্রন্থের নামদৃষ্টে-ই বোঝা যায় যে, এটি নাট্যতত্ত্বের দর্পণবিশেষ। গ্রন্থটি 'বিবেক' নামক চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম বিবেকে রূপকের ভেদ, অঙ্কের লক্ষণ ও পরিমাণ, অর্থপ্রকৃতি, অবস্থা,সন্ধি,নাটকলক্ষণ ইত্যাদি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিবেকে নাটক ব্যতীত অন্যান্য রূপকসমূহের লক্ষণ ও উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তৃতীয় বিবেকটি, বৃত্তি, রস, ভাব ও অভিনয়ের বিচারে সমৃদ্ধ। চতুর্থ বিবেকে নায়কের গুণ, প্রতিনায়ক ও বিদূষকাদির স্বরূপ, নায়িকার ভেদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের অন্তিম অংশে সট্টক, শ্রীগদিত, কাব্য, ভাণিকা, দুর্মল্লিকা, রাসক, নাট্যরাসক, গোষ্ঠী ইত্যাদি অন্যান্য রূপভেদের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে।

মূল গ্রন্থের কারিকা ও বৃত্তি – দুটি-ই রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের রচনা। নাট্যশাস্ত্র এবং অভিনবভারতীর পর্যাপ্ত ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রন্থের মতামত-ও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পর্যালোচিত হয়েছে। ভারতীবৃত্তিপ্রসঙ্গে মহর্ষি ভরতের থেকে ভিন্ন মত পোষণ, শান্তরসপ্রধান নাটকের সম্ভাবনা স্বীকার , সুখাত্মক ও দুঃখাত্মক ভেদে রসের বর্গীকরণ, প্রসিদ্ধ রসের অতিরিক্ত স্নেহ, লৌল্য ইত্যাদি রসের কল্পনা, অধুনা দুস্প্রাপ্য বহু দৃশ্যকাব্য থেকে উদ্ধৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন মৌলিকতায় এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট। আচার্য হেমচন্দ্র-প্রস্তাবিত সট্টকের পরিবর্তে 'প্রকরণী'-কে এঁরা প্রধান রূপকশ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন এবং অন্যান্য গৌণ নাট্যকৃতিগুলিকে এঁরা খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। এরূপ কথিত আছে যে, এই জৈনাচার্যদ্বয় দশরূপকের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নাট্যদর্পণ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

নাটকমীমাংসা ঃ

কাশ্মীরীয় পণ্ডিত রুয্যক ‘নাটকমীমাংসা’ (বা ‘নাট্যমীমাংসা’) নামে নাট্যতত্ত্ববিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। গ্রন্থটি অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত। ‘অলঙ্কারসর্বস্ব’ এবং ‘সহৃদয়লীলা’ নামক আরো দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের অতিরিক্ত মহিমভট্ট-রচিত ‘ব্যক্তিবিবেক’ গ্রন্থের উপর একটি টীকা-ও তিনি রচনা করেছিলেন। পণ্ডিতরা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীকে রুয্যকের স্থিতিকাল বলে মনে করেন।

ভাবপ্রকাশন ঃ

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসে শারদাতনয়-রচিত ‘ভাবপ্রকাশন’ গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । বলা হয়ে থাকে, নাট্যশাস্ত্রর পর দ্বিতীয় সুবিস্তৃত গ্রন্থ হল এই ভাবপ্রকাশন। পি.ভি. কাণে মহোদয়ের মতানুসারে ১১৭৫ থেকে ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তবর্তী সময় শারদাতনয়ের আবির্ভাবকাল। আবার ডঃ. বলদেব উপাধ্যায় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগকে শারদাতনয়ের কালরূপে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থকারের পিতা অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী গোপালভট্ট, পিতামহ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণভট্ট।

ভাবপ্রকাশন গ্রন্থটি দশটি অধিকারে বিভক্ত। অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে ভাব, রসের স্বরূপ, রসের ভেদ, নায়ক-নায়িকা, নায়িকার ভেদ, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ, নাট্য-ইতিহাস, দশপ্রকার রূপক, নৃত্যের ভেদ এবং নাট্যের প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে ভোজদেবের ‘শৃঙ্গারপ্রকাশ’ এবং মম্মটের ‘কাব্যপ্রকাশ’-এর সবিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতদ্ব্যতীত ভরত, কোহল, মাতৃগুপ্ত, সুবন্ধু , হর্ষ, রুদ্রট, ধনঞ্জয়, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখ আচার্যের অভিমত-ও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। উদাহরণরূপে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ প্রমুখ বহু নাট্যকারের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

শারদাতনয় ত্রিশ প্রকার নাট্যকৃতির নাম ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত পারিজাত, মল্লিকা ও কল্পবল্লী জাতীয় রচনার উল্লেখ অন্য কোনো গ্রন্থে নেই। নাটকপ্রসঙ্গে সুবন্ধুর মত উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সুবন্ধু পূর্ণ , প্রশান্ত, ভাস্বর, ললিত ও সমগ্র ভেদে নাটকের পাঁচটি ভেদ মানতেন।[১২]

নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় পূর্বসূরীদের অনুসরণ করলে-ও রস ও ভাব সম্পর্কে শারদাতনয়ের মৌলিক চিন্তাধারা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রসবিষয়ক কোশগ্রন্থ রূপে শৃঙ্গারপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থটির নাম-ও সশ্রদ্ধভাবে উচ্চারিত হয়। তবে বিষয়ের জটিলতা গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, যা সাধারণ পাঠকের সুখবোধ্যতার প্রধান অন্তরায়।

প্রতাপরুদ্রীয় যশোভূষণ ঃ

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত আচার্য বিদ্যানাথ ‘প্রতাপরুদ্রীয় যশোভূষণ’ (সংক্ষেপে ‘প্রতাপরুদ্রীয়’)নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এটি নয়টি প্রকাশনে সম্পূর্ণ কারিকা-বৃত্তি-ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি অলঙ্কারগ্রন্থ। বিদ্যানাথের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তেলেঙ্গানার অধিপতি কাকতেয়বংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্রদেব। এঁর কাহিনী লিখে গ্রন্থকার তাঁর যাবতীয় সাহিত্যতাত্ত্বিক আলোচনার উদাহরণ এই গ্রন্থে উপন্যস্ত করেছেন। তাছাড়া ‘প্রতাপরুদ্রকল্যাণ’ নামক একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশনে সন্নিবিষ্ট করে,ঐ নাট্যগ্রন্থটির নানা অংশ ও পারিভাষিক শব্দ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের নাট্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় নাটকের প্রকৃতি, নাট্যবিভাগ, রস ইত্যাদি ছাড়া-ও অন্যান্য অধ্যায়ে কাব্যের প্রকৃতি, দোষ, গুণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, মিশ্রালঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে-ও আলোচনা রয়েছে। মূলতঃ দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতানুসারী হলে-ও , এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা অংশে গ্রন্থকারের নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়। আচার্য মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামী ‘রত্নাপণ’ নামে এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য টীকা রচনা করেন।

সাহিত্যদর্পণ ঃ

উড়িষ্যার অধিবাসী আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ চতুর্দশ শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য আলঙ্কারিক। তাঁর রচিত ‘সাহিত্যদর্পণ’ মূলতঃ অলঙ্কারগ্রন্থ হলে-ও, এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্ত ারিত আলোচনা করা হয়েছে। দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যস্বরূপনিরূপণ, দ্বিতীয়ে বাক্যস্বরূপনিরূপণ, তৃতীয়ে রসাদিনিরূপণ, চতুর্থে কাব্যভেদনিরূপণ, পঞ্চমে ব্যঞ্জনাব্যাপারনিরূপণ, ষষ্ঠে দৃশ্যশ্রব্যকাব্যনিরূপণ, সপ্তমে দোষনিরূপণ, অষ্টমে গুণবিবেচন, নবমে রীতিবিবেচন এবং দশমে অলঙ্কারনিরূপণ – অর্থাৎ কাব্যতত্ত্বের যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ধৃত নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় তিনি মূলতঃ দশরূপককে অনুসরণ করেছেন। এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে ধনঞ্জয়ের মতের বা টীকাকার ধনিকের মতের অবিকল প্রতিফলন দেখা যায়। অন্যদিকে, দশরূপকে আলোচিত না হলে-ও নাট্যলক্ষণ, নাট্যালঙ্কার ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যদর্পণের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সাহিত্যদর্পণের টীকাসমূহের মধ্যে বিশ্বনাথপুত্র অনন্তদাসের ‘সাহিত্যদর্পণলোচন’ টীকা, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত ‘কুসুমপ্রতিমা’ টীকা, কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রীকৃত ‘লক্ষ্মী’ টীকা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যদর্পণ ব্যতিরেকে বিশ্বনাথ কবিরাজ ‘রাঘববিলাস’ নামক মহাকাব্য, ‘কুবলয়াশ্বচরিত’ নামক প্রাকৃত কাব্য, ‘প্রভাবতী-পরিণয়’ ও ‘চন্দ্রকলা’

নামে দুটি নাটিকা, 'প্রশস্তিরত্নাবলী' নামে চৌদ্দটি ভাষায় নির্মিত করম্ভক এবং 'কাব্যপ্রকাশদর্পণ' নামে কাব্যপ্রকাশের একটি টীকা-ও রচনা করেন।

রসার্ণবসুধাকর ঃ

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত সিংহভূপাল (যিনি 'শিঙ্গভূপাল' নামে সমধিক পরিচিত) 'রসার্ণবসুধাকর' নামক একটি নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকার রাজাচল এবং বিন্ধ্য ও শ্রীশৈলের মধ্যবর্তী অংশের রাজা ছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থটি 'বিলাস' নামক তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম বিলাসে আলম্বন বিভাব, উদ্দীপনবিভাব, অনুভাব,সাত্ত্বিকভাব, রীতি, বৃত্তি, নায়ক-নায়িকার ভেদ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিলাসটি রস, স্থায়িভাব, তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাব ইত্যাদির আলোচনায় সমৃদ্ধ। তৃতীয় বিলাসে আলোচিত হয়েছে দশপ্রকার রূপকের বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বিভিন্ন নাট্যগ্রন্থ থেকে অনেকখানি অংশ উদ্ধারপূর্বক আলোচনা ও লক্ষণসঙ্গতিনির্দেশ।

'রসার্ণবসুধাকর' ব্যতীত সিংহভূপাল 'নাটকপরিভাষা' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে রূপকভেদ, নাটকীয় কথাবস্তুর বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে শ্লোকবদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে।

নাটকচন্দ্রিকা ঃ

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ও বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামী 'নাটকচন্দ্রিকা' গ্রন্থের রচয়িতা। মূলতঃ মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে অবলম্বন করে গ্রন্থটি রচিত। আটটি অধ্যায়ে নির্মিত এই গ্রন্থে রূপকসমূহের বৈশিষ্ট্য, নায়কের লক্ষণ ও ভেদ, নান্দী, সন্ধি, অর্থোপক্ষেপক, অর্থপ্রকৃতি, নাটকীয় ভাষা, বৃত্তি, বৃত্তিসমূহের বিভিন্ন রসে প্রয়োগ ইত্যাদি নাট্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। নাটকচন্দ্রিকা ও সিংহভূপাল-রচিত নাটকপরিভাষায় বহুস্থানে বাক্যগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উদাহরণগুলির অধিকাংশ-ই বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থ থেকে গৃহীত। গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থের নানা স্থানে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভ্রম-প্রমাদের আলোচনা করেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনাকৃতির সংখ্যা সতেরোটি। 'নাটকচন্দ্রিকা'র সঙ্গে সঙ্গে 'হংসদূত' ও 'উদ্ধবসন্দেশ' নামক গীতিকাব্য, 'ললিতমাধব'-'বিদগ্ধমাধব'-'দানকেলিকৌমুদী' নামক তিনটি নাটক, 'উজ্জ্বলনীলমণিচরিত', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি-ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাট্যপ্রদীপ ঃ

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আচার্য সুন্দরমিশ্র রচনা করেন 'নাট্যপ্রদীপ'। প্রধানতঃ দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণের অনুসারী এই গ্রন্থে নাট্যকলা ও বিবিধ নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া-ও নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক আরো কিছু গ্রন্থের নাম মাত্র জানা যায়। কয়েকটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ পুঁথির আকারে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে। বিদ্যানাথের 'প্রতাপরুদ্রীয় যশোভূষণ' গ্রন্থের কুমারস্বামী-রচিত 'রত্নাপণ' টীকায় বসন্তরাজকৃত 'নাট্যশাস্ত্র'-এর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা তেলুগুদেশের রাজা কুমারগিরি, যিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'শিশুপালবধম্'-এর উপর রচিত 'সর্বঙ্কষা' টীকাতে আচার্য মল্লিনাথ-ও 'বসন্তরাজীয় নাট্যশাস্ত্র'-এর উল্লেখ করেছেন। অমরকোশের টীকায় আচার্য সর্বান-ও এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কুমারস্বামীর 'রত্নাপণ' টীকায় 'নাটকপ্রকাশ' নামক একটি গ্রন্থের-ও নাম জানা যায়, তবে গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আচার্য ভরত থেকে আরম্ভ করে সুন্দরমিশ্র পর্যন্ত সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনের যে ধারাটি আলোচনা করা হল, তা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারতের নাট্যতত্ত্বের আলোচনা কতখানি গভীর এবং তার পরিধি কতখানি ব্যাপক।অজস্র নাট্যকার বিরচিত অসংখ্য দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে-সঙ্গে দৃশ্যকাব্যসংক্রান্ত অর্থাৎ নাট্যতত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনাতে-ও পণ্ডিতগণ কোনো অংশে পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-৪১

২. তদেব, পৃঃ-৪২-৪৩

৩. History of Indian Literature, vol-I, Winternitz,পৃঃ- ৯০.

৪. The Sanskrit Drama, A.B. Keith, পৃঃ-২৩

৫. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়,পৃঃ-৩১০

৬. The Sanskrit Drama,Keith, পৃঃ-৩১০

৭. তদেব,পৃঃ-৪৫

৮. দ্রষ্টব্য ঃ Sanskrit Farcial plays and those of Srijibanyayatirtha of Bengal, Dr. Gopal Ch. Misra, পৃঃ-৭০

৯. দ্রষ্টব্য ঃ সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের রূপরেখা, ডঃ. করুণাসিন্ধু দাস, পৃঃ- ০৫.

১০. History of Sanskrit Poetics, P.V. Kane, পৃঃ- ১২

১১. দ্রষ্টব্য ঃ সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের রূপরেখা, ঐ, পৃঃ- ০৬

১২. তদেব, পৃঃ- ০৮

গ্রন্থারম্ভের সংক্ষিপ্ত সূচনাতে বলা হয়েছে যে, রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র ছিলেন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের দুই শিষ্য। আরো বলা হয়েছে যে, নাট্যদর্পণ গ্রন্থটির নির্মাণে রামচন্দ্রের অবদান ও কৃতিত্ব সম্ভবতঃ গুণচন্দ্রের চেয়ে অনেকটা-ই বেশি। উল্লিখিত অধ্যায়ে এই মতের সমর্থনে কয়েকটি যুক্তির-ও অবতারণা করা হয়েছে। এই প্রাধান্যের কারণে-ই বর্তমান অধ্যায়টিতে প্রথমে রামচন্দ্রের, তারপর গুণচন্দ্রের জীবনী বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমে-ই জানিয়ে রাখি, এই অধ্যায়টির রচনা ব্যাপারে ডঃ.কে.এইচ.ত্রিপাঠী কর্তৃক সম্পাদিত 'নাট্যদর্পণ' গ্রন্থের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আলোচ্যমান বিষয়টি সম্পর্কে বহু তথ্য আমি এই গ্রন্থটি থেকে গ্রহণ করেছি।

পরমাত্মার সন্ধানে ও ভূমার মহানন্দলাভে ব্যাপৃত প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতবর্গ ইহকাল ও ইহজগৎকে কোনোদিন-ই খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে এই বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্বদের প্রায় সকলে-ই নিজেদের জীবন সম্পর্কে প্রায় নীরব থেকেছেন। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে-ই গ্রন্থকারদের জীবনেতিহাস রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। Macdonell যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন –'History is the one weak spot in Indian literature.'[১] রামচন্দ্র-ও অনেকাংশে এই এক-ই রীতির অনুসারী। নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব না হলে-ও, স্বরচিত গ্রন্থাদিতে তাঁর জীবনবিষয়ে যে সকল তথ্য তিনি দিয়েছেন, তার পরিমাণ নিতান্ত-ই স্বল্প। তাঁর বংশপ্ররিচয়, মাতাপিতার নাম, তাঁর অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিশদ তথ্য, তিনি জন্মগত ভাবে-ই জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন নাকি ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরিত্যাগপূর্বক জৈনধর্ম গ্রহণ করেন ইত্যাদি বহু বিষয় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। তাঁর জীবন সম্পর্কে অল্পবিস্তর যা তথ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তার উৎস প্রধানতঃ পাঁচটি –

১. মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি'

২. রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোশ'

৩. প্রভাচন্দ্রাচার্য্যবিরচিত 'প্রভাবকচরিত'

৪. রামচন্দ্রকৃত 'নলবিলাস'

৫. পুরাতনপ্রবন্ধসংগ্রহ

রামচন্দ্র ভারতবর্ষের বর্তমান গুজরাত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তৎকালীন গুজরাতে রাজত্বকারী চৌলুক্য বংশের সিদ্ধরাজ জয়সিংহ, কুমারপাল এবং অজয়পাল নামক তিনজন একবংশজ নৃপতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তবে রামচন্দ্রের বিষয়ে যে তথ্যটি সর্বাগ্রে উল্লেখ্য সেটি হল, তিনি ছিলেন জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের প্রধান শিষ্য, যাঁকে বলা হত 'পট্টধর'। নলবিলাস, রঘুবিলাস, সত্যহরিশ্চন্দ্র, নির্ভয়ভীমব্যায়োগ, কৌমুদীমিত্রানন্দ ইত্যাদি গ্রন্থের ভূমিকায় রামচন্দ্র স্বয়ং এই তথ্যের

উল্লেখ করেছেন। বহু গ্রন্থে পরম সম্মানের সঙ্গে তিনি আচার্য হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, যার মধ্যে প্রথমে-ই নাট্যদর্পণের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

রামচন্দ্রের প্রতি আচার্য হেমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহ প্রসঙ্গে 'প্রভাবকচরিত' গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, একদা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ হেমচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে তিনি নিজের প্রধান শিষ্য রূপে মনোনীত করেন। হেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন। কারণ তাঁর মতে রামচন্দ্র-ই তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ও প্রতিভাবান্, যিনি হেমচন্দ্রের অসামান্য পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকার যথাযথভাবে বহন করতে সক্ষম। এর কিছুদিন পরে হেমচন্দ্র রামচন্দ্র কর্তৃক বিরচিত রাজা জয়সিংহের একটি প্রশস্তি এনে দেখান, যা পাঠ করে বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।[২]

রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর আচার্য হেমচন্দ্রের এই স্নেহ অমূলক বা অকারণ ছিল না। অশেষশাস্ত্রবেত্তা রামচন্দ্রের দ্বারা রচিত কাব্যতত্ত্বসংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর স্বচ্ছ, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং রচনার প্রাঞ্জলতার প্রমাণ প্রতি পদে বিধৃত। আবার কবি ও নাট্যকার রামচন্দ্রের প্রতিটি কাব্যকৃতির মধ্যে শৃঙ্গারাদি রসোৎপাদনের দক্ষতা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্য এবং বর্ণনার চমৎকারিতা অনায়াসলক্ষ্য। কবি ও কাব্যতাত্ত্বিকের, নাট্যকার ও নাট্যতত্ত্বজ্ঞের বিরল সংমিশ্রণ পণ্ডিত রামচন্দ্র বাস্তবিক-ই সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতাদের মধ্যে সবিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখেন।

রামচন্দ্রের সময়কাল ঃ

রামচন্দ্রের সময়কাল বিষয়ে আলোচনার ভূমিকারূপে তাঁর গুরু হেমচন্দ্রের সময়কালের বিচার প্রাসঙ্গিক।

হেমচন্দ্রের জীবৎকাল বিষয়ে বিশেষ বৈমত্য নেই। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র দ্বারা স্থিরনির্ণয় করা হয়েছে তাঁর জন্ম ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। চৌলুক্য নরপতি জয়সিংহ সিদ্ধরাজ এবং কুমারপালের রাজত্বকালে তিনি বিরাজমান ছিলেন। রাজা কুমারপাল ছিলেন হেমচন্দ্রের গুণগ্রাহী ও পরম ভক্ত। জয়সিংহ সূরি রচিত 'কুমারপালচরিত' গ্রন্থে হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে রাজা কুমারপালের শোকাভিভূত অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। রামচন্দ্র প্রমুখ শিষ্যদের সান্ত্বনায় তিনি ক্রমশঃ স্থির হন।

এই ঘটনার ছয়মাসের মধ্যে কুমারপালের ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পাল বিষপ্রয়োগে খুল্লতাতকে হত্যার চেষ্টা করেন। চূড়ান্ত অসুস্থ কুমারপাল রামচন্দ্রকে 'পর্যন্তারাধনা'-র জন্য অনুরোধ করেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে। কুমারপালচরিতে এই ঘটনার উল্লেখ-ও পাওয়া যায়।[৩]

কুমারপালের মৃত্যুর পর অজয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অভিষেকের অল্পদিনের মধ্যে পূর্বতন রাজা কুমারপালের বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী রামচন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড দেন। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে রামচন্দ্রকে হত্যা করা হয়।

রামচন্দ্রের জন্মাব্দ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য জানা যায় না। সিদ্ধরাজ জয়সিংহ তাঁকে 'কবিকটারমল্ল' উপাধিতে ভূষিত করেন, যা থেকে বুঝতে পারা যায় জয়সিংহের রাজত্বকালে-ই রামচন্দ্র কবিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে, ১১২৫ থেকে ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

রামচন্দ্রের মৃত্যুসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবাদ ঃ

রামচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়।

মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি'-তে বলা হয়েছে, দুষ্ট রাজা অজয়পাল রামচন্দ্রকে অগ্নিতপ্ত তামার পাতের উপর বসতে বাধ্য করেছিলেন। রামচন্দ্র এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কেটে ফেলে আত্মহত্যা করেন। প্রবন্ধচিন্তামণির চতুর্থ প্রকাশে এই ঘটনার বিবরণদানাবসরে বলা হচ্ছে – " রামচন্দ্রস্তু তেন ভূপাপসদনেন তপ্ততাম্রপট্টিকায়াং নিবেশ্যমানঃ –

'মহিবীঢ়হ সচরাচরহ জিণি সিরি দিন্‌হা পায়।

তসু অত্থমণু দিণেসরহ হোই তু হোউ চিরায়॥' ইত্যুদীর্য দশনাগ্রেণ রসনাং ছিন্দন্‌ বিপন্ন এব ব্যাপাদয়াঞ্চক্রে।"

নৃশংস অজয়পাল পৈশাচিক হিংস্রতায় রামচন্দ্রের মৃতদেহের উপর-ও অজস্র অত্যাচার করেন। প্রবন্ধচিন্তামণি-তে আরো বলা হয়েছে, দুরাচারী এই রাজাকে 'বয়জলদেব' নামক তাঁর এক ভৃত্য ক্ষুরিকার দ্বারা হত্যার চেষ্টা করে; তিনি প্রচণ্ড আহত হন এবং তাঁকে অজস্র কৃমিকীটের সঙ্গে পূতিগন্ধময় কারাগারে নরকযন্ত্রণায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করার দণ্ড দেওয়া হয়। প্রবন্ধচিন্তামণির চতুর্থ প্রকাশে বলা হচ্ছে– 'স কুনৃপতির্বয়জলদেবনাম্না প্রতীহারেণ ক্ষুরিকয়া হতো ধর্মস্থানপাতনপাতকী কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণঃ প্রত্যক্ষং নরকমনুভূয় পরোক্ষতাং প্রপেদে।'

রাজশেখর রচিত 'প্রবন্ধকোশ'-এর কাহিনীটি নিম্নরূপ –

কালক্রমে আচার্য হেমচন্দ্রের শিষ্যরা দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র ও তাঁদের অনুগতজনেরা এবং অন্য গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন বালচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা। শেষোক্ত জন কুমারপালের ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পালের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন।

এক রাত্রে কুমারপাল, হেমচন্দ্র এবং আভড় নামক জনৈক ব্যক্তি রাজ্যের উত্তরাধিকারী বিষয়ক এক গোপন মন্ত্রণায় বসেন। অপুত্রক রাজা কুমারপাল তাঁর পরম শ্রদ্ধাভাজন হেমচন্দ্রকে উত্তরসূরীর নাম প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ করেন। হেমচন্দ্র দুষ্টবুদ্ধি ও কপটাচারী ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পালকে রাজ্যাধিকার দিতে বারণ করেন এবং পরিবর্তে রাজার দৌহিত্র প্রতাপমল্লকে সিংহাসনে বসানোর পরামর্শ দেন। আভড় এর বিরোধিতাপূর্বক এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে-ই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা অধিক যুক্তিযুক্ত। হেমচন্দ্র এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি অমীমাংসিত-ই রয়ে যায়।

এই সমস্ত ঘটনা বালচন্দ্র গোপনে শ্রবণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ অজয়পালকে নিবেদন করেন। বলা বাহুল্য, অজয়পাল হেমচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠেন। এর-ই ফলশ্রুতিস্বরূপ, হেমচন্দ্র ও কুমারপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার লাভ করে হেমচন্দ্রের প্রিয়তম শিষ্য রামচন্দ্রের প্রতি চূড়ান্ত নিগ্রহ করে তাঁকে তিনি হত্যা করেন। শুধু রামচন্দ্রের প্রতি-ই নয়, সকল জৈন সন্ন্যাসীদের উপর তিনি প্রচণ্ড অত্যাচার আরম্ভ করেন। অহিংসক জৈনভিক্ষুদের তিনি প্রত্যহ মৃগয়া করতে বাধ্য করেন, অজস্র জৈন চৈত্য ধূলিসাৎ করেন। প্রবন্ধকোশে আরো বলা হয়েছে, এই যাবতীয় অনাচারের মূল কারণস্বরূপ বালচন্দ্র লোকসমাজে চূড়ান্ত নিন্দিত হন, স্বজাতির বিনাশের জন্য সকলে তাঁকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে; এই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক মালবে চলে যান।[৪]

পুরাতনপ্রবন্ধসংগ্রহের কাহিনীটি হল–

রামচন্দ্র ও বালচন্দ্র সহাধ্যায়ী হলে-ও প্রথম জন ছিলেন তাদের আচার্য হেমচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য। রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ আচার্য তাঁকে বহু বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দান করেন, যা তিনি অন্যদের দান করেননি। কুমারপালের মৃত্যুর পর অজয়পাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন বন্ধুবর বালচন্দ্রের অনুরোধমতে তিনি হেমচন্দ্র-প্রদত্ত সেই বিশেষ জ্ঞানরাজি বালচন্দ্রকে দান করার জন্য রামচন্দ্রকে আদেশ করেন। অকুতোভয় রামচন্দ্র উত্তর দেন, কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে এই অমূল্য জ্ঞান দান করতে তিনি সম্মত নন। রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘনের কারণে ক্রুদ্ধ রাজা অজয়পাল রামচন্দ্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মৃত্যুর মুহূর্তে রামচন্দ্র 'দোধকপঞ্চশতী' রচনা করে নিজ জিহ্বা কর্তনপূর্বক মৃত্যু বরণ করেন। পুরাতনপ্রবন্ধসংগ্রহের অন্তর্গত অজয়পালপ্রবন্ধে প্রদত্ত এই ঘটনার বিবরণটি উদ্ধার করা হল – " শ্রীহেমসূরিশিষ্যৌ রামচন্দ্রবালচন্দ্রৌ। গুরুভিঃ সুশিষ্যং ভণিত্বা রামচন্দ্রস্য বিশেষবিদ্যাঃ দত্তাঃ। মানং চ দত্তম্ ।তৎকোপেন বালচন্দ্রঃ নিঃসৃতঃ। তস্যাজয়পালেন সহ মিত্রত্বং জাতম্ । রাজ্যে প্রাপ্তে2জয়পালেন রামচন্দ্রস্যোক্তম্ –শ্রীহেমচন্দ্রসূরীণাং সকলা বিদ্যা মম মিত্রায়

বালচন্দ্রায় দেহি। তেনোক্তম্ – গুরূনাং বিদ্যাঃ কুপাত্রায় ন দীয়ন্তে। রাজ্ঞোক্তম্– তর্হি অগ্নিঃ।......তত্র জিহ্বাং খণ্ডয়িত্বা উপবিশতা তেন দোধকপঞ্চশতী কৃতা।''

রামচন্দ্রের একটি চক্ষুর বিনষ্টি ঃ

একাধিক গ্রন্থে রামচন্দ্রের একটি চক্ষুর বিনষ্টির উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রভাবকচরিতে বলা হয়েছে, আচার্য হেমচন্দ্র যখন সিদ্ধরাজ জয়সিংহের সঙ্গে রামচন্দ্রের পরিচয় করান, সেই প্রথম সাক্ষাতে সিদ্ধরাজ রামচন্দ্রকে 'একদৃষ্টি' হওয়ার আর্শীবাদ দেন। 'একদৃষ্টি' অর্থাৎ অধ্যয়ন, স্বধর্ম ইত্যাদিতে-ই যাঁর একমাত্র দৃষ্টি, জাগতিক অন্যান্য কোনো প্রয়োজনে নয়। কিন্তু রামচন্দ্র পদটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন; সেই মুহূর্তে তাঁর একটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়।[৫]

প্রবন্ধচিন্তামণির তৃতীয় প্রকাশে এবিষয়ে অন্য একটি কাহিনী পাওয়া যায়। তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি শ্রীপাল 'সহর্ষলিঙ্গপ্রশস্তি' নামক স্তুতিমূলক একগুচ্ছ শ্লোক রচনা করেন। এটিকে পাথরে উৎকীর্ণ করা হয় এবং এটি দেখার জন্য বহু পণ্ডিত সেখানে সমবেত হন। তাঁরা সকলে রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র শ্রীপালের রচনানৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই রচনার মধ্যে একটি শ্লোক ছিল –

''কোশেনাপি যুতং দলৈরুপচিতং নোচ্ছেত্তুমেতৎক্ষমং
স্বস্যাপি স্ফুটকণ্টকব্যতিকরং পুংস্ত্বং চ ধত্তে নহি।
একো2প্যেষ করোতি কোশরহিতো নিষ্কণ্টকং ভূতলং
মত্বৈবং কমলা বিহায় কমলং যস্যাসিমাশিশ্রিয়ৎ॥''

রামচন্দ্র এই প্রশস্তিতে দুটি ব্যাকরণগত প্রমাদ আবিষ্কার করেন –' এতস্মিন্ কাব্যে সৈন্যবাচকো দলশব্দঃ, কমলশব্দস্য নিত্যক্লীবত্বং চ ইতি দূষণদ্বয়ং চিন্ত্যম্ ' । শ্রীপালের রচনায় ত্রুটিনির্দেশ করার অপরাধে রাজার আদেশে তাঁর একটি চোখ নষ্ট করে দেওয়া হয়।

তৃতীয় প্রবাদটি দ্বিতীয়টির প্রায় অনুরূপ। তদনুসারে, গুরুর নিষেধ সত্ত্বে-ও শ্রীপালের রচনায় দোষ আবিষ্কারের শাস্তিস্বরূপ রামচন্দ্রের একটি চোখ বিনষ্ট হয়।[৬]

চতুর্থ প্রবাদটি একটু অন্যরকম। এতে বলা হয়েছে, যুবাবয়সে রামচন্দ্র দুর্বিনীত ছিলেন। তাঁকে 'জয়ার্ণ' নামে এক জৈন সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একচক্ষু হয়ে জৈনধর্মের সাধনায় জীবন অতিবাহনের জন্য রামচন্দ্রকে আদেশ দেন এবং তদনুসারে রামচন্দ্রের একটি চোখ বিনষ্ট হয়।[৭]

রামচন্দ্র বিরচিত একাধিক স্তোত্রে কোথাও নেমিদেবের কাছে, কোথাও জিনদেবের কাছে দৃষ্টিলাভের জন্য রামচন্দ্রের আকুল প্রার্থনা পাওয়া যায়। তবে বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টি চক্ষুদৃষ্টি নাকি জ্ঞানদৃষ্টি – তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়।

রামচন্দ্রের বিবিধ উপাধি ঃ

তৎক্ষণাৎ কাব্যরচনার অসাধারণ ক্ষমতার কারণে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ রামচন্দ্রকে 'কবিকটারমল্ল' উপাধি দান করেন।মেরুতুঙ্গ তাঁর প্রবন্ধচিন্তামণির তৃতীয় প্রকাশে এই উপাধি প্রদানের পটভূমি বিষয়ে একটি সুন্দর কাহিনীর উল্লেখ করেছেন–

একবার এক গ্রীষ্মকালে রাজা জয়সিংহ বাহাত্তর জন সামন্তরাজাকে নিয়ে এক প্রমোদ উদ্যানে যান। যাওয়ার পথে রামচন্দ্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ও তিনি রামচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন গ্রীষ্মের দিনগুলি এত দীর্ঘ হয় কেন – 'গ্রীষ্মে দিবসাঃ কথং গুরুতরাঃ?' প্রতিভাবান্ ও সহজকবি রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোকের মাধ্যমে উত্তর দেন যে, দিগ্বিজয়ী সিদ্ধরাজ জয়সিংহের রথের অশ্বদের ক্ষুর থেকে উত্থিত ধূলি যে গঙ্গাতীরকে কর্দমাক্ত করে তুলেছে, সেই গঙ্গাতীরে জাত দুর্বাঘাস খাওয়ার লোভ সূর্যদেবের রথের অশ্বরা সম্বরণ করতে পারছে না, তাই তারা ফিরতে চাইছে না, তাই দিনগুলি এত দীর্ঘ হয়ে উঠছে। প্রাসঙ্গিকবোধে শ্লোকটি উদ্ধার করা হল –

"দেব শ্রীগিরিদুর্গমল্ল ভবতো দিগ্জৈত্রযাত্রোৎসবে
ধাবদ্বীরতুরঙ্গবল্গনখুরক্ষুণ্ণক্ষমামণ্ডলী।
বাতোদ্ধূতরজোমিলৎসুরসরিৎসঞ্জাতপঙ্কস্থলী
দুর্বাচুম্বনচঞ্চুরা রবিহয়াস্তেনৈব বৃদ্ধং দিনম্ ॥"

শ্লোকটির রচনাশৈলী এবং সুনিপুণ অন্তর্নিহিত রাজ-প্রশংসায় জয়সিংহ মুগ্ধবিস্মিত হয়ে পড়েন। আরো কিছু রচনাশ্রবণের ইচ্ছায় তিনি রামচন্দ্রকে রাজধানী ধারার বর্ণনা করতে বলেন। মুহূর্তমধ্যে রামচন্দ্র উৎপ্রেক্ষায় অলংকৃত, অসাধারণ কবিত্বমণ্ডিত একটি শ্লোক রচনা করেন। শ্লোকটি হল –

"এতস্যাস্য পুরস্য পৌরবনিতাচাতুর্যতানির্জিতা
মন্যে হন্ত সরস্বতী জড়তয়া নীরং বহন্তী স্থিতা ।
কীর্তিস্তম্ভমিষোঞ্চদণ্ডরুচিরামুৎসৃজ্য বাহোর্বলাৎ
তন্ত্রীকাং গুরুসিদ্ধভূপতিসরস্তম্বাং নিজাং কচ্ছপীম্ ॥"

সিদ্ধরাজ রামচন্দ্রের এই সহজাত প্রতিভায় অভিভূত হয়ে যান এবং সর্বসমক্ষে তাঁকে 'কবিকটারমল্ল' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রামচন্দ্রের স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্রুত রচনাক্ষমতা বিষয়ে প্রবন্ধচিন্তামণির চতুর্থ প্রকাশে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। একদা রাজা কুমারপালের সভায় বারাণসীর বিশ্রুত পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর উপস্থিত হন এবং তিনি দণ্ড-কম্বলধারী হেমচন্দ্রকে পশুপালকের সঙ্গে তুলনা করে উপহাস করেন। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে নিরস্ত করেন এবং আচার্যের (এবং নিজের) সম্মান দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও উপস্থিত বুদ্ধির সুষম মিশ্রণের এই উদাহরণটি এখানে অবশ্য উল্লেখনীয়। বিশ্বেশ্বর বলেছিলেন – 'পাতু বো হেমগোপালঃ কম্বলং দণ্ডমুদ্বহন্'– অর্থাৎ দণ্ড-কম্বলধারী হেম(চন্দ্র) নামক গোপালক তোমাদের রক্ষা করুন। রামচন্দ্র শ্লোকটি সমাপ্ত করেন এইভাবে – 'ষড়্দর্শনপশুগ্রামং চারয়ন্ জৈনগোচরে'–(আমার) আচার্য হেমচন্দ্র চারণ-ই করেন বটে, তবে তা পশু নয়। জৈন সাধনার ক্ষেত্রে ষড়্বিধ দর্শনকে অনুগত পশুর ন্যায় তিনি চালনা করেন। হেমচন্দ্রের অসম্মানের যোগ্য উত্তরদানের দ্বারা স্বীয় আচার্যের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা-ও এই ঘটনাটির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।[৮]

অনলস ও নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চার কারণে রঘুবিলাসের প্রস্তাবনায় রামচন্দ্র স্বয়ং নিজেকে 'অচুম্বিতকাব্যতন্দ্র' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এক-ই কারণে কৌমুদীমিত্রানন্দের প্রস্তাবনায় তিনি নিজেকে 'বিশীর্ণকাব্যনির্মাণতন্দ্র'রূপে অভিহিত করেছেন। রঘুবিলাসের প্রস্তাবনায় তিনি নিজেকে 'সাহিত্যোপনিষদ্বিদ্' রূপে উল্লেখ করেছেন। রামচন্দ্রকে প্রবন্ধশতকর্তৃ মহাকবি নামে অভিহিত করা হত। তিনি স্বয়ং কৌমুদীমিত্রানন্দ এবং নির্ভয়ভীমব্যায়োগে নিজেকে 'শতপ্রবন্ধরচয়িতা' বলে উল্লেখ করেছেন। মেরুতুঙ্গ-ও তাঁকে 'প্রবন্ধশতকর্তা' নামে অভিহিত করেছেন।[৯]

'প্রবন্ধশত' পদটির অর্থ ঠিক একশত প্রবন্ধ এমন হতে–পারে, আবার না-ও পারে। কারণ, 'শত', 'সহস্র' ইত্যাদি শব্দ প্রচুর, অনেক সংখ্যক বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। অতএব 'প্রবন্ধশতকর্তা' পদের দ্বারা রামচন্দ্র যে একজন অতিমাত্রায় সৃষ্টিশীল রচনাকার ছিলেন, এবিষয়ের দ্যোতনা থাকতে পারে। আবার এমন-ও হতে পারে, রামচন্দ্র বাস্তবিক-ই সর্বমোট একশতটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জৈনদের মধ্যে বহুগ্রন্থপ্রণেতা বহু আচার্য ছিলেন। জনশ্রুতি, হরিভদ্র নামে এক জৈন ভিক্ষু চৌদ্দশত প্রকরণ রচনা করেছেন। আচার্য হেমচন্দ্র-ও অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন । অতএব এ-ও সম্ভবপর যে, এক-ই ধারার অনুসারী আচার্য রামচন্দ্র একশতটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। প্রাচীন ভারতে ‘প্রবন্ধশত’ নামে নাট্যতত্ত্ববিষয়ক একটি গ্রন্থ ছিল যার উল্লেখ পাওয়া যায় ‘বৃহট্টীপণিকা’র মধ্যে। শ্রীপুণ্যবিজয়জী-র মতে রামচন্দ্র হলেন এই গ্রন্থের লেখক এবং এই কারণে-ই তাঁকে ‘প্রবন্ধশতকর্তৃ’ নামে অভিহিত করা হত। তবে এই মতটি সম্ভবতঃ খুব যৌক্তিক নয়। কারণ রামচন্দ্র রচিত কোনো গ্রন্থের মধ্যে ‘প্রবন্ধশত’ নামে কোনো গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে গ্রন্থের খ্যাতির জন্য সেই গ্রন্থের লেখকরূপে তাঁর পরিচিতি, সেই গ্রন্থের নাম রচনাতালিকার মধ্যে থাকবে না–এ অসম্ভব। এবং রামচন্দ্র কেন, অন্য কোনো গ্রন্থকৃতের দ্বারা-ও লিখিত ‘প্রবন্ধশত’ নামক কোনো গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, ‘প্রবন্ধশত’ শিরোনাম থেকে এই গ্রন্থটি ঠিক কোন্ বিষয়ে লেখা তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। নাট্যদর্পণের মত নাট্যতত্ত্বের অনুপুঙ্খ আলোচনাত্মক একটি গ্রন্থ রচনার পর রামচন্দ্র আবার নাট্যতত্ত্বসংক্রান্ত আরেকটি গ্রন্থ রচনা করবেন, এটি-ও বিশ্বাসযোগ্য নয়।[১০]

রামচন্দ্রের রচনাকৃতি ঃ

উপলব্ধ তথ্যসূত্র অনুসারে রামচন্দ্রের মোট সাতচল্লিশটি রচনার নাম জানা যায়।[১১] এগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে –

(ক) বিবিধপ্রকার রূপক–

১. নলবিলাস
২. সত্যহরিশ্চন্দ্র
৩. কৌমুদীমিত্রানন্দ
৪. নির্ভয়ভীমব্যায়োগ
৫. মল্লিকামকরন্দ
৬. রোহিণীমৃগাঙ্ক
৭. রাঘবাভ্যুদয়
৮. যাদবাভ্যুদয়
৯. রঘুবিলাস
১০. যদুবিলাস
১১. বাণমালা

(খ) কাব্য ও স্তোত্র –

১২. কুমারবিহারশতক

১৩. সুধাকলশ

১৪. দোধকপঞ্চশতী

১৫. যুগাদিদেবদ্বাত্রিংশিকা

১৬. ব্যতিরেকদ্বাত্রিংশিকা

১৭. প্রসাদদ্বাত্রিংশিকা

১৮. অপহ্নুতিদ্বাত্রিংশিকা

১৯. অর্থান্তরন্যাসদ্বাত্রিংশিকা

২০. জিনস্তুতিদ্বাত্রিংশিকা

২১. দৃষ্টান্তগর্ভজিনস্তুতিদ্বাত্রিংশিকা

২২. শান্তিদ্বাত্রিংশিকা

২৩. ভক্ত্যতিশয়দ্বাত্রিংশিকা

২৪. আদিদেবস্তব

২৫. নেমিস্তব

২৬. মুনিসুব্রতদেবস্তব

২৭. জিনস্তোত্র

২৮-৪৪. ষোড়শিকা সাধারণজিনস্তব

(গ) নাট্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থ ও অন্যান্য –

৪৫. দ্রব্যালঙ্কার

৪৬. নাট্যদর্পণ

৪৭. হৈমবৃহদ্বৃত্তিন্যাস

এবার সংক্ষেপে গ্রন্থগুলির সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্।

(ক) বিবিধপ্রকার রূপক –

১. **নলবিলাস ঃ**

বিদর্ভরাজ ভীমরথের কন্যা দময়ন্তীর সঙ্গে নিষধাধিপতি নলের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত। মূলতঃ মহাভারতে বর্ণিত নল-দময়ন্তী আখ্যান থেকে উপাদান সংগ্রহ করলে-ও স্বীয় প্রতিভাস্পর্শে রামচন্দ্র এটিতে একটি আলাদা মাত্রা যোগ করেছেন।

কাহিনীর মূল বিন্যাস মহাভারত-অনুসারী । রূপকটির পঞ্চম অঙ্কে 'নলান্বেষণ' নামক একটি গর্ভাঙ্কের উপস্থাপনা করা হয়েছে যেখানে নল-পরিত্যক্তা দময়ন্তীর দুর্দশা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, গর্ভাঙ্কে উপস্থাপিত দময়ন্তী চরিত্রটিতে স্বয়ং দময়ন্তী-ই অভিনয় করছেন।

আরেকটি বিষয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। রূপকটিকে মঞ্চে অভিনয়োপযোগী ও বাস্তবোপযোগী করে তোলার জন্য মহাভারতে বর্ণিত যাবতীয় অলৌকিক ঘটনা রামচন্দ্র বর্জন করেছেন। তাই কলহংসের দ্বারা সংবাদপ্রেরণ, কলির নল-শরীরে প্রবেশ, পাখিদের দ্বারা নলের বস্ত্রাদির অপহরণ ইত্যাদির বিবরণ এই রূপকে নেই। হংসের পরিবর্তে 'কলহংস' নামক এক ব্যক্তির দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছে।কলি পরিবর্তিত হয়েছেন কলচুরি রাজ্যের নৃপতিরূপে, যিনি নলের ক্ষতিসাধনে সদা তৎপর। দময়ন্তী চরিত্রটি বিষয়ে লক্ষণীয়, মহাভারতের দময়ন্তীর চারিত্রিক দৃঢ়তা এখানে অনুপস্থিত, রামচন্দ্রের দময়ন্তী অনেক বেশি কোমল ও কাতর প্রকৃতির।

২. সত্যহরিশ্চন্দ্র ঃ

রামচন্দ্র এটিকে 'আদিরূপক' নামে অভিহিত করেছেন। পরিভাষামতে এটিকে নাটক বলা চলে। কারণ নাটকের বিভিন্ন লক্ষণ, যথা – প্রসিদ্ধ কাহিনী, ধীরোদাত্ত নায়ক ইত্যাদি এই রূপকে পাওয়া যায়। ছয় অঙ্কে নির্মিত এই রূপকের মূল বস্তু সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্রের জীবনের কাহিনী।

প্রথম অঙ্কে আশ্রমমৃগ হত্যার মধ্যে রাজার দুর্ভাগ্যের সূচনা। চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনাপরম্পরায় দুর্দৈবপীড়িত রাজা একে-একে রাজ্য, পত্নী ও পুত্রকে হারান। পঞ্চম অঙ্কে রাজা জনৈক ব্যক্তির জীবনরক্ষার জন্য স্বীয় জীবনবিসর্জনে উদ্যত হন। উল্লেখ্য, শ্রীহর্ষরচিত নাগানন্দের নায়ক জীমূতবাহন-ও গরুড়ের প্রাণরক্ষার্থে নিজের প্রাণবিসর্জনে উদ্যত হয়েছিলেন; রামচন্দ্র সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের-ই অনুসরণে হরিশ্চন্দ্রের জীবনবিসর্জনের কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন। যাই হোক্, এরপর ষষ্ঠ তথা অন্তিম অঙ্কে পুত্রের শবদর্শনে-ও স্থিরচিত্ত রাজা ধৈর্য ও স্থৈর্যের চরম পরীক্ষা দেন। অনন্তর অন্তরীক্ষ থেকে দু'জন দেবতার আগমন হয় ও তাঁরা জানান, হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠতার পরীক্ষা

নেওয়ার জন্য-ই তাঁকে এতরকম বিপদের সম্মুখীন করা হয়েছিল এবং সেই পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরিশেষে রাজা রাজ্য, পত্নী, পুত্র সকলকে ফিরে পান ও নাটকের ইতিবাচক সমাপ্তি ঘটে।

রূপকটির কাহিনী ও তার বুনন অতি আকর্ষক। মহাত্মা হরিশচন্দ্রের চরিত্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। বুভুক্ষু অবস্থাতে-ও জনৈকা বৃদ্ধার থেকে খাদ্যগ্রহণে অসম্মতি, ভিক্ষার পরিবর্তে মৃত্যু-ও শ্রেয়ঃ এরূপ চিন্তা – এরকম কয়েকটি ঘটনায় প্রতিফলিত রাজা হরিশচন্দ্রের মানসিক দৃঢ়তা বাস্তবিক-ই পাঠক ও দর্শকের মর্মমূলকে স্পর্শ করে যায়। তবে কাব্যকরণের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির কারণে কোথাও-কোথাও রূপকের স্বাভাাবিক গতি সামান্য ব্যাহত হয়েছে এবং অদ্ভুতরসের প্রচুর প্রয়োগের কারণে রূপকটি যথেষ্ট মঞ্চোপযোগী হয়ে ওঠার পথে কিছু অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে।

৩. কৌমুদীমিত্রানন্দ ঃ

এটি একটি দশ অঙ্কের প্রকরণ। কাহিনী কবিকল্পিত। কৌতুকনগরের অধিবাসী জিনসেনের পুত্র মিত্রানন্দ এবং ঋষিকন্যা কৌমুদীর প্রণয়বৃত্তান্ত অবলম্বনে এটি রচিত।

গ্রন্থারম্ভে প্রস্তাবনা অংশে মুদ্রালঙ্কার প্রয়োগদ্বারে সুকৌশলে নাট্যকারের নামটি জানানো হয়েছে।প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, নায়ক মিত্রানন্দ তাঁর বন্ধু মৈত্রেয়র সঙ্গে বরুণদ্বীপে আসেন ও প্রথম দর্শনে-ই অনুপম রূপলাবণ্যময়ী কৌমুদীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন। কৌমুদীর কুলপতি পিতা এদের বিবাহে সম্মত হন।

দ্বিতীয় অঙ্কে মিত্রানন্দ জনৈক সিদ্ধরাজের প্রাণরক্ষা করেন; স্বয়ং বরুণদেব উপহারস্বরূপ তাঁকে একটি দিব্যহার প্রদান করেন।

তৃতীয় অঙ্কটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। এক দুর্বল মুহূর্তে কৌমুদী মিত্রানন্দকে বলে ফেলেন যে, তাঁর পিতা ও তাঁর পরিজনেরা কেউ-ই প্রকৃত তপস্বী নন। তিনি আরো এক ভয়ঙ্কর তথ্য জানান যে, ইতিপূর্বে যে বণিকদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়েছে, তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে। কৌমুদী মিত্রানন্দকে পরামর্শ দেন যে, তাঁরা দুজনে লঙ্কায় পালিয়ে যাবেন ; কিন্তু যাওয়ার আগে মিত্রানন্দ যেন তাঁর পিতার থেকে সর্পদংশনের চিকিৎসার মন্ত্রটি শিখে নেন। মিত্রানন্দ সেই মন্ত্রশিক্ষা করেন ও তারপর উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, কৌমুদীর কথানুসারে দুজনে লঙ্কার রাজধানী 'রঙ্গশালা'-তে উপস্থিত হন ; কিন্তু সেখানে প্রবেশমাত্র চোর সন্দেহে মিত্রানন্দকে বন্দী করা হয় এবং বিচারের জন্য তাকে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায়, লঙ্কার রাজাকে আকস্মিকভাবে সর্পদংশন করে। মিত্রানন্দ মন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা রাজার জীবন বাঁচান এবং পুরস্কারস্বরূপ প্রভূত সম্মান ও সম্পদ লাভ করেন।

ষষ্ঠ অঙ্কের আরম্ভ হচ্ছে একটি বিষ্কম্ভকের দ্বারা। এই অঙ্কে বন্ধু মৈত্রেয়র সঙ্গে মিত্রানন্দের পুনর্মিলন ঘটে।

সপ্তম অঙ্কে কৌমুদীর সখী সুমিত্রা এবং মিত্রানন্দের বন্ধু মকরন্দের প্রণয় ও পরিণয়ের বিবরণ রয়েছে।

অষ্টম অঙ্কে এরা চারজনে একচক্রা নগরীতে উপস্থিত হয়। সেখানে এক কাপালিক মিত্রানন্দকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু মকরন্দের বুদ্ধিবলে সেই কাপালিকের-ই মৃত্যু হয়।

নবম অঙ্কে নরদত্ত নামে এক বণিক মকরন্দর সমস্ত ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে নেয় এবং মকরন্দকে ম্লেচ্ছ প্রমাণিত করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। চরম মুহূর্তে মিত্রানন্দ এসে মকরন্দর প্রাণরক্ষা করেন।

দশম অঙ্কে জনৈক সিদ্ধরাজ কৌমুদী ও সুমিত্রাকে হরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে মিত্রানন্দ ও মকরন্দ সেখানে উপস্থিত হয়ে দু'জনকে রক্ষা করেন। যাবতীয় বিপদের অবসানে এরপর তাঁরা সুখে বসবাস করতে থাকেন।

এই রূপকের কাহিনীবিন্যাসে দণ্ডীর দশকুমারচরিতের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে দক্ষতায় দণ্ডী তাঁর গ্রন্থে ঘটনাবলী বিধৃত করেছেন, সেই প্রয়োগনৈপুণ্য এই রূপকের কোথাও পাওয়া যায় না। নাট্যকার রূপকের আত্মভূত রসকে পরিত্যাগ করে ক্রমাগত অজস্র বিপদ ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য অজস্র অতিলৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার সংযোজন করে গেছেন। 'History of Sanskrit Literature' গ্রন্থে যথার্থ-ই বলা হয়েছে–"The story resembles those of Dandin's Dasakumaracarita and the author might have done well if he had attempted to write in the same strain and form ; for there is not much merit in the play as a romantic piece, nor is it remarkable on the poetic side.''[১২]

অজস্র ঘটনাজালে আচ্ছন্ন এই প্রকরণটিতে না আছে শৃঙ্গাররসের যথাযথ ব্যবহার, না আছে হাস্যরসের কুশল প্রয়োগ। রসোদ্বোধের এই অপকর্ষ আচ্ছাদনের জন্য-ই যেন নাট্যকার এই রূপকে ভূরিপরিমাণ অদ্ভুত রসের প্রয়োগ করেছেন। ডঃ. কীথ তাঁর 'Sanskrit Drama' গ্রন্থে যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন– " The work is of course wholly without interest other than that presented by so many marvels appearing to the sentiment of wonder

in the audience.''[১৩] তবে বলা বাহুল্য, অত্যধিক মাত্রায় চর্চিত অদ্ভুতরস সহৃদয় দর্শকের চিত্তে বিশেষ আনন্দের সৃষ্টি করতে পারে নি।

৪. নির্ভয়ভীমব্যায়োগ ঃ

এটি একটি ব্যায়োগ জাতীয় দৃশ্যকাব্য। একাঙ্ক এই রূপকের উপাদান মহাভারত থেকে গৃহীত।

এক ব্রাহ্মণ যুবার প্রাণরক্ষার্থে ভীমসেন স্বয়ং বকাসুরের খাদ্যরূপে তার কাছে যান। ভীমের মৃত্যুর আশঙ্কায় দ্রৌপদী আত্মহত্যায় উদ্যত হন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। অবশেষে বকরাক্ষসকে হত্যা করে ভীমসেনের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে রূপকটির শুভসমাপ্তি ঘটে।

কাহিনীনির্বাচনে রামচন্দ্র নাট্যকার ভাসের 'মধ্যমব্যায়োগ' দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন; সেটি বিচারসাপেক্ষ। তবে শ্রীহর্ষরচিত নাগানন্দের প্রভাবের বিষয়টি কোনো বিচারের অপেক্ষা রাখেনা । ব্রাহ্মণযুবার মাতা এবং পত্নীর রোদন ও বিলাপদৃশ্যটি অবিকল নাগানন্দের অনুরূপ। এক-ই ভাবে, ব্রাহ্মণযুবার জন্য ভীমসেনের স্বীয় প্রাণবিসর্জনের সঙ্কল্পে গরুড়ের জন্য জীমূতবাহনের প্রাণত্যাগের ছায়া সুস্পষ্ট।

এই রূপকটির অনায়াস রচনাশৈলী ও সাবলীল ভাষা যথার্থ-ই অভিনয়োপযোগী। নাট্যকার একদিকে ভীমসেনের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে বীর ও রৌদ্ররসের কুশল প্রয়োগ করেছেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণযুবার মাতা ও পত্নীর মর্মন্তুদ বিলাপে করুণরসের সুদক্ষ উদ্বোধ ঘটিয়েছেন। সর্বথা বিচারে নিঃসংশয়ে এটিকে একটি উত্তম মানের নাট্যকৃতি বলা যেতে পারে।

৫. রঘুবিলাস ঃ

এটি আট অঙ্কবিশিষ্ট একটি নাটক। রঘুবিলাসের প্রস্তাবনায় (এই রূপকটি সহ) রামচন্দ্র কর্তৃক বিরচিত পাঁচটি গ্রন্থের ('পঞ্চপ্রবন্ধ') উল্লেখ রয়েছে। অন্য চারটি গ্রন্থ হল – নলবিলাস, রাঘবাভ্যুদয়, যাদবাভ্যুদয় এবং দ্রব্যালঙ্কার। আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে এই 'রঘুবিলাস' থেকে-ই রামচন্দ্র সর্বাধিক উদাহরণ দিয়েছেন।

নাটকটির উপাদান রামায়ণ থেকে সংগৃহীত হলে-ও অজস্র কল্পিত ঘটনার সমাবেশে এটি নাট্যকারের প্রায়-স্বরচিত কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।

নাটকটির সূচনা হচ্ছে লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রের বনগমনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় অঙ্কে পাতাললঙ্কার রাজা চন্দ্রোদরের পুত্র বিরাধের ছদ্মবেশে রাবণের আগমন ঘটে। রাক্ষসদের যুদ্ধনিবারণের জন্য রাম ও লক্ষ্মণ কুটির ছেড়ে বাইরে যান, সেই অবকাশে রাবণ সীতাকে হরণ করেন। তৃতীয় অঙ্কে আছে সীতাবিরহিত রামচন্দ্রের আকুল বিলাপের বর্ণনা। এর-ই মধ্যে সেই ছদ্মবেশে রাবণ পুনরায় রামচন্দ্রের কুটিরে আসেন ও রাম-লক্ষ্মণের আশ্রয়ে সুরক্ষিতা পত্নী পত্রলেখাকে প্রার্থনা করেন। এই সময়ে জনৈক বিদ্যাধরের প্রবেশ ঘটে এবং রাবণ অদৃশ্য হয়ে যান। চতুর্থ অঙ্কে রয়েছে লঙ্কাপুরীর মনোরম বিবরণ। পঞ্চম অঙ্কটি নানাবিধ কল্পিত কাহিনীতে পূর্ণ। বিভীষণের সাবধানবাণী রাবণ অমান্য করেন। বালীর পুত্র চন্দ্ররাশি রামের পক্ষ থেকে সংবাদবাহকরূপে রাবণের কাছে উপস্থিত হন। রাবণ মায়ার সাহায্যে চন্দ্ররাশির কাছে একথা প্রতিপাদন করেন যে, হনুমানের পিতা পবনঞ্জয় রাবণের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। সেই মায়ার দ্বারা রাবণ আরো জানান যে, সীতা রাবণকে গভীরভাবে ভালবাসেন। যাই হোক্, এরপর সুগ্রীব ও তার বানরসেনা নিয়ে রামচন্দ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

ষষ্ঠ অঙ্কে রয়েছে যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা। ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ চেতনা হারালেন। সকলের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যে জনৈক বিদ্যাধরের আগমন ঘটে এবং তিনি জানান যে, কৈকেয়ীর ভ্রাতা দ্রোণঘ্নের কন্যা বিশল্যার স্নানবারি দ্বারা সিঞ্চন করলে লক্ষ্মণ পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হবেন। অঙ্গদ ও অন্যান্যরা তৎক্ষণাৎ সেই জলসংগ্রহের জন্য উদ্যত হলেন।

সপ্তম অঙ্কে মারীচ ও মন্দোদরীকে সঙ্গে নিয়ে মায়া আসেন রাবণের কাছে। সীতার প্রতি আকর্ষণ পরিত্যাগের জন্য মায়া রাবণকে বহু অনুরোধ করলে-ও রাবণ তাতে কর্ণপাত করেন না।

অষ্টম তথা অন্তিম অঙ্কে রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে। নাট্যকারের স্বাধীন কল্পনায় রাবণ জনকের ছদ্মবেশে সীতার কাছে গিয়ে রামের মৃত্যুসংবাদ দান করেন। সেই কথা শুনে সীতা অগ্নিপ্রবেশপূর্বক আত্মহননে উদ্যত হন। এই চরম মুহূর্তে অন্যান্য সকলে সেখানে সমবেত হন। নেপথ্যে থেকে রাবণের মৃত্যুঘোষণার মধ্যে দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি সাধিত হয়।

বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করলে-ও কাহিনীর ঘটনাবিস্তারে রামচন্দ্র অনেকাংশে জৈন রামায়ণ ও জৈন সাহিত্যকে অনুসরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই রূপকের কাহিনীতে নাট্যকার অনেক অভিনব ঘটনার সংযোজন করেছেন। বিরাধের ছদ্মবেশে রাবণের আগমন ও সীতাহরণ, বালীর পুত্র চন্দ্ররাশির রামচন্দ্রের সমর্থকরূপে আগমন, মায়ার ভূমিকা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল উদ্ধারের উপায়, রাবণকর্তৃক জনকের ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি রামায়ণ- অনুল্লেখিত অজস্র ঘটনায় নাট্যকারের প্রতিভার

স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এর সঙ্গে- সঙ্গে মায়া দ্বারা আকৃতি পরিবর্তন, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিবিধ অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ-ও করা হয়েছে। সীতাহরণের পর রামচন্দ্রের আকুল বিলাপে করুণরসের সামান্য ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। এই অংশে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এ উর্বশীর অর্ন্তধানের পর পুরূরবার বিলাপের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত ও তজ্জনিত উৎকণ্ঠার পরিবর্তে গীতিধর্মিতা ও কাব্যময়তা-ই এই রূপকের প্রাণ হয়ে উঠেছে। নাটকের উপযোগী বলিষ্ঠ সংলাপের পরিবর্তে দীর্ঘ কাব্যাংশ এই রূপকে অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। রামচন্দ্রের সমকালে নাট্যে কবিত্বের আতিশয্য হয়তো প্রশংসনীয় ছিল; কিন্তু আধুনিক নাট্যতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এটিকে নাট্যকারের পরিমিতিবোধের অভাবরূপে-ই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

তবে রামচন্দ্রের এই নাটকটি কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। অনামা কোনো এক কবি 'রঘুবিলাসনাটকোদ্ধার' নামে রঘুবিলাসের একটি সংক্ষিপ্তসার নির্মাণ করেন, যেটি আয়তনে মূল রচনার প্রায় অর্ধেক। এতে কেবলমাত্র চতুর্থ অঙ্কে তিনটি নতুন শ্লোকের সংযোজন করা হয়েছে।

৬. মল্লিকামকরন্দ ঃ

এটি ছয় অঙ্কবিশিষ্ট একটি রূপক। প্রস্তাবনায় নাট্যকার বলছেন এটি একটি নাটক। কিন্তু কাহিনী কবিকল্পিত বলে এটিকে প্রকরণ বলা-ই যুক্তিসঙ্গত। রামচন্দ্র নাট্যদর্পণ গ্রন্থে এটিকে প্রকরণের উদাহরণরূপে-ই উল্লেখ করেছেন। তবে প্রকরণ সাধারণতঃ দশঅঙ্কবিশিষ্ট হয়ে থাকে, এটি ছয় অঙ্কের। উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণে শুদ্ধ প্রকরণের উদাহরণ দেওয়ার সময় একবারমাত্র এই রূপকটির উল্লেখ করা হয়েছে।

রূপকের প্রস্তাবনা অংশে মুদ্রালঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে নিপুণ কৌশলে নাট্যকারের নাম জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রথম অঙ্কে রাজকন্যা মল্লিকা গভীর রাতে কন্দর্পমন্দিরে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। মকরন্দ তাঁকে নিরস্ত করেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হন। মল্লিকা তাঁর কর্ণভূষণ মকরন্দকে দান করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনীটি বেশ নাটকীয়। অক্ষক্রীড়ায় মকরন্দ সর্বস্বান্ত হন। এমতাবস্থায় মল্লিকার পিতা তাঁকে রক্ষা করেন। তিনি মল্লিকার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত মকরন্দকে জানান। তিনি বলেন, তিনি মল্লিকার পালক-পিতা মাত্র। মল্লিকা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাধররাজ বৈনতেয় ও রানী চন্দ্রলেখার সন্তান। ষোল বছর আগে একটি মল্লিকাগাছের নীচে তিনি তাকে কুড়িয়ে পান। মল্লিকার হাতে বিদ্যাধররাজের নামখোদিত একটি আংটি ছিল এবং চুলের মধ্যে জড়ানো ছিল একটি ভূর্জপত্র যাতে

লেখা ছিল –'ষোল বছর পর চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশ দিনে এর স্বামী ও রক্ষককে বলপূর্বক হত্যা করে একে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো'। মকরন্দ মল্লিকাকে রক্ষার জন্য সঙ্কল্প নেন। কিন্তু হঠাৎ করে কোনো এক রহস্যময় শরীরী মল্লিকাকে অপহরণ করে নিয়ে চলে যায়।

তৃতীয় অঙ্কে জানা যায় মল্লিকাকে বিদ্যাধররাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। তৎকালীন বিদ্যাধররাজ চিত্রাঙ্গদ মল্লিকাকে বিবাহ করতে চান; মল্লিকা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইত্যবসরে মকরন্দ সেখানে উপস্থিত হন ও মল্লিকার মাতা চিত্রলেখা তাঁকে দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

চতুর্থ অঙ্কে হতাশ মকরন্দ বনে চলে যান। সেখানে তিনি একটি টিয়াপাখি দেখতে পান, যে মকরন্দর সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে। বিস্মিত মকরন্দ পাখিটিকে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর স্পর্শমাত্রে পাখিটি একটি মানুষে পরিণত হয়। ইনি প্রকৃতপক্ষে বৈভল নগরীর এক সমুদ্রবণিক, যার নাম বৈশ্রবণ। তাঁকে এবং তাঁর পত্নী মনোরমাকে চন্দ্রলেখা (মল্লিকার মাতা) এভাবে শাপগ্রস্ত করে দিয়েছিলেন। বৈশ্রবণ আরো জানান যে, চন্দ্রলেখা একজন দুশ্চরিত্রা নারী, যিনি পূর্বে ঋষি গন্ধমূষিকের আশ্রমে বাস করতেন। মকরন্দ এসব কথা চিত্রাঙ্গদকে জানানোর জন্য বিদ্যাধররাজ্যে ফিরে আসেন এবং আসামাত্র চিত্রাঙ্গদের সৈন্যদের হাতে বন্দী হন।

পঞ্চম অঙ্কে বৈশ্রবণ ও মনোরমা মকরন্দের সাহায্যার্থে সেখানে উপস্থিত হন। অন্যদিকে মল্লিকা প্রথমে মাতা ও পরে চিত্রাঙ্গদকে মকরন্দের প্রতি তাঁর গভীর প্রণয়ের কথা ব্যক্ত করেন।

ষষ্ঠ অঙ্কের আরম্ভ হচ্ছে একটি বিষ্কম্ভকের মধ্যে দিয়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে মল্লিকা চিত্রাঙ্গদকে বিবাহে সম্মত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সম্মতি ছিল মল্লিকার ছলনামাত্র। এরপর ঋষি গন্ধমূষিকের আদেশ আসে যে, অন্য কারো সঙ্গে বিবাহের পূর্বে কন্যাকে যক্ষাধিপতির সঙ্গে বিবাহ করতে হবে – এটি-ই বিদ্যাধররাজ্যের রীতি। সেই রীতি মান্য করে যক্ষরাজের সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং দেখা যায় যক্ষরাজের ছদ্মবেশে স্বয়ং মকরন্দ-ই সেখানে উপস্থিত। অনন্তর সকলের সম্মতি ও আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে রূপকটির মঙ্গলময় সমাপ্তি ঘটে।

কাহিনীর সারদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, এটি কৌমুদীমিত্রানন্দের মত-ই অনাকর্ষক একটি রূপক। এখানে-ও নাট্যকার ক্রমাগত অতিলৌকিক ও অলৌকিক ঘটনাসমূহের সন্নিবেশ করে গিয়েছেন, এখানে-ও শৃঙ্গার বা হাস্যের মত মনোগ্রাহী রসের পরিবর্তে অদ্ভুতরসের প্রাধান্য। নাট্যরসে বঞ্চিত কষ্টকল্পনাক্লিষ্ট এই রূপকটি তাই সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে না।

৭. রোহিণীমৃগাঙ্ক ঃ

এটি রামচন্দ্র বিরচিত তৃতীয় প্রকরণ। মূল গ্রন্থটি এখনো অনাবিস্কৃত। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে এই প্রকরণ থেকে দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা থেকে এই গ্রন্থের কাহিনী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে নামদৃষ্টে অনুমান করা যেতে পারে, এটি রোহিণী ও মৃগাঙ্ক নামক প্রণয়ীযুগলের প্রেমকাহিনী।

৮. রাঘবাভ্যুদয় ঃ

এটি রামচরিতমূলক দশ অঙ্কবিশিষ্ট একটি নাটক। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে প্রসঙ্গক্রমে দশবার এই রচনার উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহট্টীপণিকা গ্রন্থে-ও রামচন্দ্র বিরচিত দশাঙ্ক নাটক বলে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪]

ইতিপূর্বে আমরা রামচন্দ্র-রচিত 'রঘুবিলাস' নামক রামচরিতাত্মক একটি রূপকের কথা জেনেছি। রঘুবিলাসের সূচনা হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের ঘটনার দ্বারা; আলোচ্যমান 'রাঘবাভ্যুদয়' এর সূচনা হচ্ছে রাম ও সীতার স্বয়ম্বর দ্বারা। অতএব বোঝা-ই যাচ্ছে দুটি রূপকের কাহিনী প্রায় একপ্রকার।

এক-ই ব্যক্তি শ্রীরামের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে একাধিক গ্রন্থ নির্মাণে ভবভূতির প্রভাব স্পষ্ট, যিনি এই এক-ই বিষয়ের আধারে মহাবীরচরিত এবং উত্তররামরচিত রচনা করেছেন।

রাঘবাভ্যুদয় রঘুবিলাসের আগে রচিত হয়েছে, কারণ রঘুবিলাসের প্রস্তাবনায় এই নাটকের নাম পাওয়া যায়।

৯. যাদবাভ্যুদয় ঃ

গ্রন্থটি অপ্রাপ্ত। নাট্যদর্পণের টীকায় আটবার এই রূপকটির উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণসমূহদৃষ্টে অনুমান করা যায়, শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যাভিষেক এই রূপকের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু।

নামসাদৃশ্যে অনুমান করা হয়, এটি রাঘবাভ্যুদয়ের মত দশ অঙ্কে রচিত একটি নাটক। নাট্যদর্পণে বিমর্শসন্ধির 'সম্ফেট' নামক অঙ্গটির উদাহরণে যাদবাভ্যুদয়ের সপ্তম অঙ্ক থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে।

রচনার অন্তিম শ্লোকে নাট্যকার মুদ্রালঙ্কারের দ্বারা নিজের নাম জ্ঞাপন করেছেন।

১০. বাণমালা ঃ

এটি রামচন্দ্র কর্তৃক বিরচিত একটি নাটিকা।

গ্রন্থটি অপ্রাপ্ত, তাই এর কাহিনী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। নাট্যদর্পণে একবার মাত্র বাণমালা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে দময়ন্তী রাজা নলকে তাঁর অবিশ্বস্ততার জন্য তিরস্কার করছেন। অতএব বোঝা যায়,এই নাটিকার নায়ক হলেন নিষধাধিপতি নল। সম্ভবতঃ বাণমালা হচ্ছেন সেই নায়িকা, যার প্রতি বিবাহিত নল আসক্ত হন এবং সেই কারণে তিনি জ্যেষ্ঠা নায়িকা দময়ন্তীর কাছে তিরস্কৃত হন। অনুমান করা যেতে পারে, অন্যান্য নাটিকার মত এখানে-ও অন্তিমে জ্যেষ্ঠা নায়িকা দময়ন্তীর অনুমত্যনুসারে রাজা নল ও কনিষ্ঠা নায়িকা বাণমালার মিলন ঘটে।

(খ) কাব্য ও স্তোত্র –

১. কুমারবিহারশতক ঃ

এটি একটি খণ্ডকাব্য। গুজরাটের 'অণহিলপুর পাটন' নামক রাজ্যের রাজা কুমারপাল কর্তৃক নির্মিত 'কুমারবিহার' নামক একটি চৈত্যের প্রশংসাকল্পে এই কাব্যের রচনা।

এই খণ্ডকাব্যটি মোট একশত ষোলোটি শ্লোকে নির্মিত। এগুলির মধ্যে প্রথম আটটি শ্লোক জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের স্তুতিমূলক। এগুলি স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত।

অবশিষ্ট একশত আটটি শ্লোকে রামচন্দ্র কুমারবিহারের মন্দিরটির অসাধারণ সুন্দর বর্ণনা করেছেন। মন্দিরটির বিশালত্ব-পাবনত্ব-সৌন্দর্য-সমৃদ্ধি সমস্ত বিষয় কবির চমৎকার বর্ণনাদ্বারে পাঠকের মানসপ্রত্যক্ষে পরিণত হয়। লক্ষ-লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমনে মন্দিরটি সদা পূর্ণ থাকত।মন্দিরের অভ্যন্তরগাত্রটি ছিল স্বর্ণনির্মিত ও বহু মণিরত্নখচিত। দেওয়ালে অঙ্কিত ছিল বহু চিত্র। স্থানে-স্থানে স্বর্ণময় পাত্রের দ্বারা মন্দিরগাত্রের শোভা বর্ধিত করা হয়েছিল। মন্দিরের অসংখ্য স্ত স্তগুলির প্রতিটি ছিল নানাবিধ মূল্যবান পাথরের দ্বারা খোদিত। মন্দিরের মধ্যস্থলে ছিল তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের একটি অসাধারণ শৈল্পিক মূর্তি। সুন্দরী নারীরা এই মূর্তির সামনে নৃত্যপ্রদর্শন করতেন। সর্বত্র মঙ্গলগান গীত হত। মন্দিরটি যেন পৃথিবীপৃষ্ঠে দেবগণের লীলাক্ষেত্র রূপে বিরাজমান ছিল। রচনার অন্তিম শ্লোকে কবি বলছেন, এই অনন্যসাধারণ মন্দিরটির মাহাত্ম্যের যথাযথ বর্ণনা স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মার পক্ষে-ও অসম্ভব; তাঁর মত স্বল্পধী ব্যক্তির ক্ষমতা তো নিতান্ত-ই নগণ্য।

কাব্যটি প্রধানতঃ স্রগ্ধরা ছন্দে নির্মিত; মধ্যে-মধ্যে বসন্ততিলক ও শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের-ও প্রয়োগ করা হয়েছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান্‌, রূপকাদি অর্থালঙ্কারের নিপুণ প্রয়োগে কাব্যটি অসাধারণ শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।এই গ্রন্থে-ও কবি মুদ্রালঙ্কারের মাধ্যমে নিজের নাম জ্ঞাপন করেছেন। বিবেকসাগর গণি নামক জনৈক জৈনাচার্যের শিষ্য সুধাভূষণ গণি এই কাব্যটির উপর 'অবচূর্ণী' নামক একটি টীকা রচনা করেছিলেন।সুশ্রাব্য ও সার্থক পদসমূহের যথাযথ প্রয়োগে নির্মিত এই খণ্ডকাব্যটি রামচন্দ্রের কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। সমগ্র জৈন সাহিত্যে এই কাব্যটি একটি বিশেষ সম্মানের আসন অলংকৃত করে রয়েছে।

২. সুধাকলশ ঃ

মূল গ্রন্থটি অপ্রাপ্ত। নাট্যদর্পণের টীকায় তিনবার এই কাব্যটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্যটির নাম এবং উদ্ধৃত উদাহরণগুলি দর্শনে অনুমিত হয়, এটি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত সুভাষিতাবলী শ্রেণীর একটি রচনা।

কাব্যটি মূলতঃ প্রাকৃতে রচিত। রামচন্দ্র যে সংস্কৃতর সঙ্গে-সঙ্গে প্রাকৃত ভাষাতে-ও পারঙ্গম ছিলেন, এই কাব্যটি তার যথার্থ প্রমাণ।

৩. দোধকপঞ্চশতী ঃ

এই গ্রন্থটি-ও পাওয়া যায়নি। পুরাতনপ্রবন্ধসংগ্রহে বলা হয়েছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য) রামচন্দ্র আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্তে এই কাব্যটি রচনা করেন। অতএব এই মত অনুসারে এটি-ই রামচন্দ্রের অন্তিম রচনাকৃতি। নামদৃষ্টে মনে হয় এটি দোধক ছন্দে রচিত পাঁচশত শ্লোকের সমষ্টি।

৪. যুগাদিদেবদ্বাত্রিংশিকা ঃ

এটি প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের প্রশস্তি। ঋষভদেবকে-ই 'যুগাদিদেব' নামে অভিহিত করা হত। তিনি জৈনযুগের 'আদি' অর্থাৎ প্রথম প্রবক্তা–এই অর্থে। এটি বত্রিশটি শ্লোকে নির্মিত, যার অধিকাংশ-ই বংশস্থবিল ছন্দে রচিত।

৫. ব্যতিরেকদ্বাত্রিংশিকা ঃ

এটি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের প্রশস্তি। ব্যতিরেক অলঙ্কারে ভূষিত বত্রিশটি শ্লোকে পার্শ্বনাথকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, গণেশ, কার্তিকেয় ও গৌতম বুদ্ধের চেয়ে মহত্তর বলে প্রশংসা করা হয়েছে।

৬. প্রসাদদ্বাত্রিংশিকা ঃ

এটি-ও পার্শ্বনাথের স্তুতিমূলক স্তোত্র। এখানে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত বত্রিশটি শ্লোকে পার্শ্বনাথের 'প্রসাদ' অর্থাৎ প্রসন্নতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৭. অপহ্নুতিদ্বাত্রিংশিকা ঃ

এটি জিনদেবের প্রশংসাসূচক শ্লোকগুচ্ছ। বত্রিশটি শ্লোকের অধিকাংশ-ই অপহ্নুতি অলঙ্কারে ভূষিত। এই স্তোত্রটি বংশস্থবিল বৃত্তে নির্মিত।

৮. অর্থান্তরন্যাসদ্বাত্রিংশিকা ঃ

এটি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উদ্দেশ্যে রচিত বত্রিশটি শ্লোকের একটি স্তোত্রগাথা। অধিকাংশ শ্লোক, নামদৃষ্টে-ই বোঝা যাচ্ছে, অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারে শোভিত। এই স্তোত্রটি-ও বংশস্থবিল বৃত্তে রচিত।

৯. জিনস্তুতিদ্বাত্রিংশিকা ঃ

বত্রিশটি শ্লোকে নির্মিত এই প্রশস্তিটি (সাধারণভাবে) সমস্ত জৈন তীর্থঙ্করদের উদ্দেশ্যে রচিত। কেবল অন্তিম শ্লোকটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত, অন্য সবকটির ছন্দ বসন্ততিলক। এই প্রশস্তি টির মধ্যে কবি উপমা অলঙ্কারের অজস্র প্রয়োগ করেছেন।

১০. দৃষ্টান্তগর্ভজিনস্তুতিদ্বাত্রিংশিকা ঃ

নামদৃষ্টে-ই বোঝা যাচ্ছে এটি জিনদেবের উদ্দেশ্যে রচিত, দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে ভূষিত বত্রিশটি শ্লোকের একটি স্তোত্র।

১১. শান্তিদ্বাত্রিংশিকা ঃ

'শান্তিনাথ' নামক জনৈক তীর্থঙ্করের প্রশংসাকল্পে বংশস্থবিল বৃত্তে রচিত বত্রিশটি শ্লোকের একটি প্রশস্তিগাথা।

১২. ভক্ত্যতিশয়দ্বাত্রিংশিকা ঃ

পার্শ্বনাথের উদ্দেশ্যে উপজাতি ছন্দে রচিত বত্রিশটি শ্লোকের একটি স্তোত্র। প্রতিটি শ্লোকে জৈনধর্মের একান্ত অনুগত ভিক্ষু রামচন্দ্রের ভক্তির পরাকাষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩. নেমিস্তব ঃ

'নেমিনাথ' নামক জনৈক তীর্থঙ্করের প্রশংসাকল্পে নির্মিত চব্বিশটি শ্লোকের একটি প্রশস্তি গাথা।

১৪. মুনিসুব্রতদেবস্তব ঃ

নামদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে এটি 'সুব্রতদেব' নামক এক তীর্থঙ্করের প্রশস্তিকল্পে নির্মিত। এটিতে চব্বিশটি শ্লোক রয়েছে ; প্রতিটি বংশস্থবিল ছন্দে রচিত।

১৫. ষোড়শিকা সাধারণজিনস্তব ঃ

এটি প্রকৃতপক্ষে সতেরোটি স্তোত্রের একটি গুচ্ছ। প্রতিটি স্তোত্র ষোলোটি শ্লোকে নির্মিত। প্রথম স্তোত্রটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে অন্যগুলির থেকে পৃথক । এটি বিভিন্ন ছন্দে নির্মিত। এই স্তোত্রের অন্তিম শ্লোকে মুদ্রালঙ্কারের দ্বারা কবি স্বীয় নাম জ্ঞাপন করেছেন।অবশিষ্ট ষোলোটি স্তোত্র (সামান্যতঃ) সমস্ত তীর্থঙ্করের প্রশংসাকল্পে রচিত।এগুলির প্রতিটি অনুষ্টুভ্ ছন্দে নির্মিত। সবকটি স্তোত্রের অন্তিম শ্লোকটি এক।

(গ) নাট্যতত্ত্বগ্রন্থ ও অন্যান্য –

১. নাট্যদর্পণ ঃ

নাট্যদর্পণ গ্রন্থটি রচনায়, রামচন্দ্র সহাধ্যায়ী গুণচন্দ্রের সাহায্য নিয়েছেন। বর্তমান গবেষণাগ্রন্থটি নাট্যদর্পণের উপর-ই নির্মিত। তাই বিশদ বিবরণ এখানে নিস্প্রয়োজন। শুধু এটুকু উল্লেখ করা থাক্, এটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত নাট্যতত্ত্বসংক্রান্ত একটি গ্রন্থ।

২. দ্রব্যালঙ্কার ঃ

এটি-ও রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের যৌথ রচনা। এই গ্রন্থটির বিষয় হল জৈন ন্যায়। গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দ্রব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গুণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পর্যায় সম্পর্কে

আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির সূত্র তথা কারিকা এবং টীকা – দুই-ই রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের দ্বারা রচিত।[১৫]

৩. হৈমবৃহদ্বৃত্তিন্যাস ঃ

এই গ্রন্থটি অপ্রাপ্ত। তবে নামদর্শনে মনে হয়, এটি ব্যাকরণগত আলোচনায় সমৃদ্ধ একটি ন্যাস গ্রন্থ।

রামচন্দ্রের রচনাশৈলীর সামগ্রিক বিচার ঃ

রামচন্দ্রের রচনাগুলির পর্যালোচনান্তে প্রথম যে বিষয়টি আমাদের মনে উদিত হয়, সেটি হল তাঁর রচনাবলীর বিস্ময়াবহ বিশালত্ব ও বৈবিধ্য। এই প্রচুরসংখ্যক রচনা নিঃসন্দেহে রচয়িতার পাণ্ডিত্য, সৃজনক্ষমতা, উৎসাহ সবকিছুকে প্রমাণ করে। সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিস্তৃত পরিধিতে-ও এত প্রভূত পরিমাণ গ্রন্থের রচনাকারী সারস্বত সাধকের নিদর্শন খুব কম। আরো যে বিষয়টি এখানে উল্লেখ্য , তিনি যে কেবলমাত্র একটি ধারার রচনানির্মাণে সন্তুষ্ট থেকেছেন, তা নয়। যেমন রচনা করেছেন কুমারবিহারশতকের মত অনুপম খণ্ডকাব্য, যেমন রচনা করেছেন বিভিন্ন প্রকার রূপক, যেমন নির্মাণ করেছেন অসাধারণ কিছু প্রশস্তি ,সেই এক-ই কবিত্বশালী ব্যক্তির লেখনীতে রচিত হয়েছে নাট্যদর্পণের মত নাট্যতত্ত্বসংক্রান্ত সুগভীর আলোচনা এবং দ্রব্যালঙ্কারের মত জৈন ন্যায়ের গ্রন্থ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আচার্য রামচন্দ্রের নাম তাই সর্বদা সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টিশীল রচয়িতাদের তালিকার অন্যতমরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

রামচন্দ্র নিজের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি থেকে তাঁর বংশপরিচয়াদি সম্পর্কিত তথ্য না পাওয়া গেলে-ও এই সচেতনতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এবিষয়ে তিনি মহাকবি কালিদাসের মত নীরব থাকেননি, বরং নাট্যকার ভবভূতির সঙ্গে-ই এক্ষেত্রে তাঁর সাদৃশ্য। রামচন্দ্র তৎকর্তৃক রচিত প্রতিটি গ্রন্থে স্বীয় রচনার প্রশস্তি করেছেন। নলবিলাসের প্রস্তাবনায় রামচন্দ্র বলছেন, তিনি-ই রসাত্মক বাক্য সমূহের একমাত্র অধীশ্বর – 'কবিঃ কাব্যে রামঃ সরসবচসামেকবসতিঃ' (নলবিলাস, ১/২)। তিনি স্বয়ং আরো বলেছেন, তাঁর রচনা পাঠের সময় প্রতিবার রসাস্বাদন ঘটে এবং প্রতিটি রসানুভূতি পূর্বের চেয়ে অধিকতর সুখাবহ হয়, যা অন্য কোনো কবি বা নাট্যকারের রচনায় দুর্লভ–

"প্রবন্ধা ইক্ষুবৎ প্রায়ো হীয়মানরসাঃ ক্রমাৎ।
কৃতিস্তু রামচন্দ্রস্য সর্বা স্বাদু পুরঃ পুরঃ ॥"(নলবিলাস,১/৪)

প্রাগ্‌ভাবী কবি মুরারির প্রতি রামচন্দ্রের একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল। নলবিলাসে-ই তিনি বলেছেন, শব্দবৈচিত্র্যপ্রধান মুরারির রচনা অপেক্ষা তাঁর রচনা বহুগুণে শ্রেয়ঃ। কারণ শব্দবিন্যাসের পরিবর্তে কাব্যের প্রাণভূত রসের উদ্বোধের বিষয়ে-ই তিনি অনেক বেশি মনোযোগী –

"প্রবন্ধানাধাতুং নবভণিতিবৈদগ্ধ্যমধুরান্
কবীন্দ্রা নিস্তন্দ্রাঃ কতি নহি মুরারিপ্রভৃতয়ঃ।
ঋতে রামান্নান্যঃ কিমুত পরকোটৌ ঘটয়িতুং
রসান্ নাট্যপ্রাণান্ পটুরিতি বিতর্কো মনসি নঃ ॥" (নলবিলাস, ১/৩)

রঘুবিলাসের প্রস্তাবনা অংশে স্বীয় পাণ্ডিত্যের বর্ণনায় রামচন্দ্র স্বয়ং বলছেন –

"পঞ্চপ্রবন্ধমিষপঞ্চমুখানকেন বিদ্বন্মনঃ সদসি নৃত্যতি যস্য কীর্তিঃ।
বিদ্যাত্রয়ীচণমচুম্বিতকাব্যতন্দ্রং কস্তং ন বেদ সুকৃতী কিল রামচন্দ্রম্ ॥" [১৬]

এইসব সুদৃঢ় মন্তব্যগুলির মাধ্যমে গ্রন্থকার রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার আত্মপ্রত্যয় স্পষ্ট অনুভব করা যায়। শান্তিনাথ নামক মহাকাব্যের রচয়িতা জৈনাচার্য মাণিক্যচন্দ্রসূরি যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন –

"স রামঃ কবিরুদ্দামঃ প্রবন্ধাব্ধিং প্রবধ্য যঃ।
প্রিয়াং চমৎকৃতিং প্রত্যাহরতি প্রীণয়তি ক্ষমাম্ ॥" [১৭]

নাট্যকার রামচন্দ্র যাবতীয় নাট্যকৌশল প্রয়োগে সুদক্ষ ছিলেন। নাটকীয় চমৎকারিত্ববিধানের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি বিভিন্ন সন্ধ্যঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। নাট্যদর্পণের টীকায় উদ্ধৃত সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণগুলির সিংহভাগ তাঁর স্বকৃত রচনাবলী থেকে-ই গৃহীত। নাটকীয় সংলাপকে আরো শক্তিশালী করে তোলার জন্য বিভিন্ন বীথ্যঙ্গের সাবলীল সন্নিবেশ করেছেন। পতাকাস্থানকের ব্যবহার বিষয়ে-ও রামচন্দ্রের পটুতা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। এবিষয়ে রঘুবিলাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। সন্ধি, অর্থোপক্ষেপক, অর্থপ্রকৃতি, প্রস্তাবনা ইত্যাদি সকল প্রকার নাট্যকৌশলের সুচারু প্রয়োগে নাটকীয় ঘটনার সংযোগসূত্র হয়ে উঠেছে দৃঢ়বদ্ধ। নাট্যকাহিনীর পরিচ্ছন্ন, সুগ্রথিত ও সুসংবদ্ধ উপস্থাপনা নাট্যকৌশলপ্রয়োগবিষয়ে রামচন্দ্রের সবিশেষ অধিকারের প্রমাণ বহন করে।

নাট্যতত্ত্বের নিয়মানুসারে রামচন্দ্র নাট্যবস্তুর উৎস বা উপাদান সংগ্রহ করেছেন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাসাদি থেকে। কিন্তু মূল কাহিনীর রেখামাত্র গ্রহণের পর ঘটনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন – সব তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। এপ্রসঙ্গে নলবিলাস ও রঘুবিলাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়, যেখানে নাট্যকার অসংখ্য নতুন ঘটনা ও কাহিনীর সন্নিবেশ করেছেন, যা উৎস-গ্রন্থগুলিতে নেই। যেমন কাঠামো-মাত্রকে আশ্রয় করে মৃন্ময়ী প্রতিমা রূপ পরিগ্রহ করে কুশলী

মৃৎশিল্পীর হাতে, তেমনিভাবে রামায়ণাদি আকর গ্রন্থ থেকে উপাদানমাত্রকে গ্রহণ করে ‘আপন মনের মাধুরী মিশায়ে’ কথাশিল্পী রামচন্দ্র গড়ে তুলেছেন তাঁর মানসী কাব্যপ্রতিমাকে।

জৈন ভিক্ষু রামচন্দ্রের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় জীবনে জৈন ধর্মের আত্তীকরণ এবং তার প্রচার ও প্রসার। এই ধর্মের বিস্তারকল্পে তীর্থঙ্করগণ, জিনদেব, নেমিদেব প্রমুখের প্রশংসায় তিনি যে স্তোত্রগুলি রচনা করেছেন তার প্রতিটিতে জৈন ধর্মের এই একনিষ্ঠ সেবকের ভক্তি ও আনুগত্যের নিদর্শন অনায়াসবোধ্য।

ছন্দ এবং অলঙ্কার প্রয়োগে-ও রামচন্দ্র সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ স্তোত্র-ই বংশস্থবিল ছন্দে রচিত।মনে হয়, এই ছন্দটির উপর তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। তবে এর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি অনুষ্টুভ্, মন্দাক্রান্তা, বসন্ততিলক,উপজাতি,দ্রুতবিলম্বিত ইত্যাদি ছন্দ-ও একইরকম সাবলীলতায় ব্যবহার করেছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে নিষ্ণাত রামচন্দ্র অর্থান্তরন্যাস, দৃষ্টান্ত, উপমা, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি ইত্যাদি অলঙ্কার প্রয়োগে যথেষ্ট দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। রামচন্দ্রের সবকটি স্তোত্র সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী রীতিতে নির্মিত। ছন্দ-শব্দালঙ্কার-অর্থালঙ্কার–শব্দগুণ-অর্থগুণ ইত্যাদি যাবতীয় রসোৎকর্ষহেতুর সমাবেশে রামচন্দ্রের স্তোত্রগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রশস্তিমূলক রচনাসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

রামচন্দ্র তাঁর রচনাগুলিতে বহু সুভাষিত প্রয়োগ করেছেন। এগুলি তাঁর অতি প্রিয় ছিল। নির্ভয়ভীমব্যায়োগের প্রস্তাবনায় নিজের সুভাষিতগুলিকে তিনি আনন্দবর্ষণের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন –

“সূক্তয়ো রামচন্দ্রস্য বসন্তঃ কলগীতয়ঃ।
স্বাতন্ত্র্যমিষ্টযোগশ্চ পঞ্চৈতে হর্ষবৃষ্টয়ঃ॥” [১৮]

নাট্যদর্পণগ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকে রামচন্দ্র বলেছেন, তিনি বহু গ্রন্থ, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। পণ্ডিতকুলতিলক এই জ্ঞানতপস্বী বাস্তবিক-ই একদিকে পূর্বাচার্যদের রচিত যাবতীয় তাত্ত্বিক গ্রন্থ, অন্যদিকে পূর্ববর্তী কবিদের যাবতীয় কাব্যনাটক নিঃশেষে পাঠ করেছেন। এই বিপুল অধ্যয়নের প্রভাব তাঁর রচনাগুলির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

রামচন্দ্র তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে ভবভূতি, কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভাস, শূদ্রক প্রমুখের রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।আগে-ও বলা হয়েছে, রামচন্দ্র সম্ভবতঃ ভবভূতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে-ই শ্রীরামের জীবনের একাধিক পর্যায় নিয়ে একাধিক রূপক রচনা করেছেন। রামচন্দ্র-রচিত প্রকরণগুলির মধ্যে ভবভূতির মালতীমাধবের প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। যদি-ও কৈশিকীবৃত্তির আধিক্যের কারণে নাট্যদর্পণে তিনি এই প্রকরণটির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বে-ও অসংখ্য ঘটনার

সন্নিবেশ, কাহিনীতে বহু অতিলৌকিক ও অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা, অদ্ভুত রসের প্রাধান্য, বর্ণনাবাহুল্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে রামচন্দ্র যে এই প্রকরণটির কাছে কতখানি ঋণী, সংস্কৃত সাহিত্যের মনোযোগী পাঠকের কাছে তা অনায়াসবোধ্য। উল্লেখ্য, রামচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বসূরী রাজশেখর এবং মুরারির রচনা-ও অত্যন্ত বর্ণনাবহুল। এ বিষয়ে রামচন্দ্র এই দুজনের দ্বারা-ও প্রভাবিত হয়েছেন – এমনটি ভাবা অযৌক্তিক নয়।

কালিদাস-পরবর্তী সমস্ত কবিদের মত রামচন্দ্র-ও কালিদাসের অনুকরণের চেষ্টা করেছেন। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রঘুবিলাসের প্রথম অঙ্কের আরম্ভ হচ্ছে একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে। এই ঘটনা অভিজ্ঞানশকুন্তলমে হংসপদিকার গীতের মাধ্যমে পঞ্চমাঙ্কের আরম্ভের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার নলবিলাসের চতুর্থ অঙ্কে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বর্ণনার মধ্যে রঘুবংশমে বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের ছায়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। তবে বলা বাহুল্য, কালিদাসোচিত কবিত্বশক্তির অভাববশতঃ রামচন্দ্রের এই প্রয়াস অধিকাংশ স্থলে-ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শ্রীহর্ষের নাট্যকৃতি-ও রামচন্দ্রের রচনায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। রাঘবাভ্যুদয়ে সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে কন্দর্পবশে ভ্রম করছেন, ঠিক যেমনভাবে রত্নাবলী নাটিকায় সাগরিকা রাজা উদয়নকে অনঙ্গজ্ঞানে ভুল করেছেন। সত্যহরিশ্চন্দ্রে রাজা হরিশ্চন্দ্র নাগানন্দের নায়ক জীমূতবাহনের মত অন্যের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের প্রাণবিসর্জনে উদ্যত হয়েছেন।

ভাস ও শূদ্রকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় রামচন্দ্রের নাটকের সংলাপে। এই দুই পূর্বসূরীর মতন রামচন্দ্র-ও তাঁর রূপকগুলির বহু স্থলে অভিনয়োপযোগী ছোট-ছোট সংলাপ রচনা করেছেন, যা সুধী পাঠকসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল।

স্বয়ং ঈশ্বরের নির্মাণে-ও ত্রুটি থাকে, সামান্য মানবের 'কা কথা!' রামচন্দ্রের রচনার প্রধানতম ত্রুটি হল, স্বীয় বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য তাঁর অত্যধিক আসক্তি। বিনা দ্বিধায় তাঁর রচনাকৃতিকে আমরা তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী বলে অভিহিত করতে পারি। ফলতঃ অঙ্গুলিগণ্য অত্যুচ্চমানের বিদ্বানরা-ই তাঁর রচনার রসবোধে সক্ষম; এই রচনাগুলির আস্বাদ্যমানতা সাধারণ জনগণের বোধ ও বুদ্ধির বহু ঊর্দ্ধে।

নাট্যরচনার ক্ষেত্রে রামচন্দ্র তাঁর কাব্যকরণপাটব প্রদর্শনের সম্ভাব্য একটি স্থল-ও পরিহার করেননি। কিন্তু এই কাব্যময় নাটকগুলি সহৃদয় সামাজিকের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারেনি। রামচন্দ্রের সমকালে এমনিতে-ই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবধান ক্রমবর্ধমান। সংস্কৃত ক্রমশঃ প্রাত্যহিক ব্যবহার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রধান কথ্যভাষারূপে উত্থান হচ্ছে প্রাকৃতের। স্বভাবতঃ-ই

সংস্কৃতের উত্তমমানের কাব্যচর্চা-ও ক্রমহ্রাসমান। এই পরিস্থিতিতে করণীয় ছিল সরল ও স্বচ্ছ সংস্কৃত রচনা, যা সংস্কৃতের সাথে জনসাধারণের দূরত্ব কমাতে অল্পবিস্তর সাহায্য করতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে রামচন্দ্র উপস্থিত করলেন স্বতঃস্ফূর্ততাবিবর্জিত,পাণ্ডিত্যকণ্টকিত,কষ্টকল্পনাক্লিষ্ট, অনাবশ্যকভাবে অলংকৃত এবং ফলতঃ অবধারিতভাবে কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট একগুচ্ছ কাব্যকৃতি, যা কোনোভাবে-ই সাধারণ পাঠক-দর্শকের কাছে সমাদৃত হতে পারল না।

রামচন্দ্র সমকালীন রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর বহু রচনায় তৎকালীন রাজবংশ ও তৎকালীন রাজার প্রশস্তি কীর্তন করা হয়েছে। খুব স্বাধীনমনস্ক কবি হলে তিনি এরকম সভাকবি-জাতীয় কাজ করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

সমকালীন সাংস্কৃতিক প্রভাবকে-ও রামচন্দ্র অতিক্রম করে উঠতে পারেননি। এসময়ের প্রামাণ্য কবিরূপে রাজশেখর ও মুরারির নাম প্রসিদ্ধ, যে দুজনের-ই রচনাশৈলী অতিদীর্ঘ, অলংকৃত ও বর্ণনাবহুল। এই এক-ই ধারার অনুগামী হয়ে রামচন্দ্র-ও তাঁর নাটকগুলির মধ্যে স্রগ্ধরাদি দীর্ঘ ছন্দে রচিত দীর্ঘতর কাব্যাংশের সন্নিবেশ করেছেন, যা নাটকের স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রায়শঃ-ই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। নাট্যদর্পণে বিধৃত নাটকলক্ষণে তিনি নিজে-ই বলেছেন, নাটক হবে 'স্বল্পপদ্যং লঘুগদ্যম্'। কিন্তু তাঁর রচনায় বহু স্থলে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। রামচন্দ্র যদি-ও তাঁর কাব্যকে 'প্রসন্নার্থ' রূপে অভিহিত করেছেন, কিন্তু প্রচুর পদ্যযুক্ত এবং এক-ই সঙ্গে সমাসবদ্ধ দীর্ঘ গদ্যযুক্ত তাঁর কাব্যকৃতি সহৃদয় সামাজিকের প্রসন্নতাবিধানে কতখানি সার্থক, তা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখে।

হাস্যরসনির্মাণে কবি রামচন্দ্রের অক্ষমতা লক্ষণীয়। কালিদাস বা শূদ্রকের স্তরের হাস্যরসাত্মক রচনা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সামান্য হাস্যরসের ব্যবহার পাওয়া যায় নলবিলাসের বিদূষক চরিত্রের আচার-ব্যবহারে, তার আকারসদৃশ 'লম্বোদর' নামে, পরিচারিকাদের সঙ্গে তার হাস্য-পরিহাসে। কিন্তু এই অংশগুলি-ও অত্যন্ত স্থূল ও বৈচিত্র্যহীন। হাস্যরসের এই অভাবকে পরিপূরণ করার জন্য-ই হয়তো রামচন্দ্রতাঁর রূপকগুলিতে অদ্ভুতরসের অজস্র প্রয়োগ করেছেন।একজন যুবাবয়স্ক নাট্যকারের রচনায় হাস্যরসের এই অভাব আমাদের বিস্মিত করে। সম্ভবতঃ জৈন ধর্মের কঠোর নিয়ম ও অনুশাসন রামচন্দ্রকে অতি গম্ভীর প্রকৃতির এক ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল ; সেই গাম্ভীর্য-ই তাঁর রচনার সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছিল।

রামচন্দ্র রচিত কাব্যগুলির মধ্যে একাধিক রচনায় এক-ই চরিত্রের ব্যবহার পাওয়া যায়। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।'লম্বস্তনী' নাম্নী এক নারীচরিত্রের ব্যবহার হয়েছে তিনটি রূপকে – নলবিলাস, সত্যহরিশচন্দ্র এবং কৌমুদীমিত্রানন্দে। 'ঘোরঘোণ' নামক এক পুরুষচরিত্রের ব্যবহার

হয়েছে নলবিলাস ও কৌমুদীমিত্রানন্দে। একাধিক রচনায় এক-ই চরিত্রব্যবহারের বিষয়টি যেন নাট্যকারের চিন্তার দৈন্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

রামচন্দ্র এক-ই শ্লোক একাধিক রচনায় ব্যবহার করেছেন – এমন-ও হয়েছে। যেমন– "পরোপনীতশব্দার্থাঃ স্বনাম্না কৃতকীর্তয়ঃ।
নিবদ্ধারো2ধুনা তেন বিশ্রম্ভতেষু কঃ সতাম্ ॥"
– এই শ্লোকটি কৌমুদীমিত্রানন্দ এবং মল্লিকামকরন্দ এই দুটি রূপকে-ই দেখতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত "প্রবন্ধা ইক্ষুবৎ...." ইত্যাদি শ্লোকটি নলবিলাস, সত্যহরিশ্চন্দ্র ও কৌমুদীমিত্রানন্দ রূপকে ; "প্রবন্ধানাধাতুঃ ......" ইত্যাদি শ্লোকটি নলবিলাস ও কৌমুদীমিত্রানন্দ রূপকে ; "সূক্তয়ো রামচন্দ্রস্য ..... " ইত্যাদি শ্লোকটি নির্ভয়ভীমব্যায়োগ ও সত্যহরিশচন্দ্র রূপকে পরিলক্ষিত হয়।[১৯]

রামচন্দ্র রামায়ণ-মহাভারত থেকে-ই সর্বাধিক কাহিনীসূত্র সংগ্রহ করেছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তাঁর রচনায় হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বহু বক্রোক্তি রয়েছে। নলবিলাসে ব্রাহ্মণদের অপরিমিত লোভের নিন্দা রয়েছে। কৌমুদীমিত্রানন্দে যজ্ঞাদিতে বলিদানের প্রবল প্রতিবাদ রয়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, রামচন্দ্র হিন্দুদের প্রধান তিনজন দেবতা ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমালোচনা করেছেন; কারণ এঁরা সকলে-ই বিবাহিত, ভোগসুখে আসক্ত এবং অজিতেন্দ্রিয়। 'ব্যতিরেকদ্বাত্রিংশিকা' স্তোত্রে তিনি জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথকে উক্ত তিন দেবতার চেয়ে মহত্তর বলে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, সহৃদয় ও সংবেদনশীল পাঠক একজন কবির রচনায় এজাতীয় ধর্মান্ধতা আশা করেন না।

রামচন্দ্রের কোনো রচনা-ই উল্লেখযোগ্য রকমের ভাবগম্ভীর বা ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে উঠতে পারেনি; কারণ শব্দবিন্যাসের চমৎকারিত্ব-ই রামচন্দ্রের রচনার মূল ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। রামচন্দ্র স্বয়ং যদি-ও কাব্যে রসকে-ই প্রধান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর নিজের রচনায় রসের সার্থক প্রয়োগ কম। তাঁর কাব্যে বস্তুলঙ্কাররসরূপ ধ্বনিত্রয় উপেক্ষিত, প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে শব্দবিন্যাসের চারুত্ব ও চমৎকৃতি। রামচন্দ্রের যথেষ্ট নিজস্বতা ও স্বকীয়তা ছিল; রচনায় অজস্র অভিনব স্বকপোলকল্পিত ঘটনার সন্নিবেশ তার প্রমাণ। কিন্তু সহজাত প্রতিভার অভাবে ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লালসায় তাঁর কাব্যগুলি চেষ্টাকৃত কৃত্রিমকাব্যে পর্যবসিত হয়েছে। তাই প্রবন্ধশতকর্তৃ রামচন্দ্রের নাম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে রচনার সংখ্যাগত ভিত্তিতে, গুণগত উৎকর্ষভিত্তিতে নয়।

নাট্যদর্পণের অপর রচয়িতা আচার্য গুণচন্দ্রের জীবন বিষয়ে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এই জানা যায় যে, তিনি ছিলেন রামচন্দ্রের সহাধ্যায়ী অর্থাৎ তিনি-ও জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের শিষ্য। সমকালীন হলে-ও, রামচন্দ্রের চেয়ে বয়সে সম্ভবতঃ তিনি একটু ছোট ছিলেন। তবে বয়সে ছোট হলে-ও বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের দিকে তিনি কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না। কারণ, সে ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের মত পণ্ডিত নিজ গ্রন্থের সহায়ক রচয়িতা রূপে তাঁকে গ্রহণ করতেন না। সোমপ্রভসূরি-বিরচিত 'কুমারপালপ্রতিবোধ' নামক রচনার অন্তিম শ্লোকে বিখ্যাত জৈন দার্শনিক মহেন্দ্রসূরি এবং বর্ধমানগণির সঙ্গে গুণচন্দ্রের নামের-ও অনুরূপ সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০]

গুণচন্দ্রের জীবন, বংশপরিচয়, জন্মস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। রামচন্দ্রের সহায়তাকল্পে নাট্যদর্পণ ও দ্রব্যালঙ্কার গ্রন্থরচনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন – একথা আমরা জানি। এতদ্ব্যতীত তৎকর্তৃক রচিত অন্য কোনো গ্রন্থের নাম অদ্যাবধি জানা যায় নি। গুণচন্দ্র বহু রচনার দ্বারা যশ উপার্জনে বিমুখ ছিলেন বলে মনে হয় ; এই জ্ঞানতপস্বী সম্ভবতঃ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের মধ্যে-ই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। শাসকের রোষদৃষ্টিতে রামচন্দ্রের অপমৃত্যুর মত কোনো ঘটনা গুণচন্দ্রের বিষয়ে জানা যায় না। ধরে নেওয়া যেতে পারে, তিনি যথাযথভাবে তাঁর জীবন অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ A History of Sanskrit Literature, Arthur A. Macdonell, পৃঃ -৪০
২. দ্রষ্টব্য ঃ প্রভাবকচরিত, জিনবিজয় মুনি, শ্লোকসংখ্যা-১২৯-১৩৫.
৩. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, কে. এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ -২১৩
৪. দ্রষ্টব্য ঃ প্রবন্ধকোশ, রাজশেখর সূরি, 'আভড় প্রবন্ধ', পৃঃ -৯৮.
৫. দ্রষ্টব্য ঃ নলবিলাস, রামচন্দ্র সূরি, ভূমিকা অংশ, পৃঃ -৩৬
৬. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২১২.
৭. দ্রষ্টব্য ঃ তত্রৈব
৮. দ্রষ্টব্য ঃ প্রবন্ধচিন্তামণি, মেরুতুঙ্গসূরি, পৃঃ -৮৯.
৯. দ্রষ্টব্য ঃ তদেব, পৃঃ- ৯৭
১০. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ -২১৯
১১. দ্রষ্টব্য ঃ নলবিলাস, ঐ, পৃঃ-৩৩
১২. History of Sanskrit Literature , S.N. Dasgupta & S.K. De, পৃঃ -৪৭৬
১৩. The Sanskrit Drama in its origin, development, theory and practice, A. Berriedale. Keith, পৃঃ -২৫৭
১৪. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৩২
১৫. দ্রষ্টব্য ঃ তদেব, পৃঃ-২২২.
১৬. দ্রষ্টব্য ঃ নলবিলাস, ঐ,পৃঃ-৩৩

১৭. দ্রষ্টব্য ঃ তদেব, পৃঃ-৩২
১৮. দ্রষ্টব্য ঃ তদেব, পৃঃ-৩৩
১৯. দ্রষ্টব্য ঃ তদেব, পৃঃ-৩২
২০. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২১৭.

গ্রন্থপরিচয় ঃ

'নাট্যদর্পণ' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র নামে দুই জৈনাচার্য। পণ্ডিতরা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীকে এঁদের স্থিতিকালরূপে চিহ্নিত করেছেন। এঁরা দু'জনে আচার্য হেমচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, দশরূপকের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এঁরা নাট্যদর্পণ গ্রন্থের রচনা করেন। মূলতঃ নাট্যশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে-ই এই গ্রন্থটি রচিত হলে-ও, গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে রচয়িতাদের চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রন্থপ্রণেতাদ্বয় এঁদের পূর্বকালীন ও সমকালীন যাবতীয় গ্রন্থের নিঃশেষে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁদের সেই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নচ্ছটায় সমগ্র গ্রন্থটি উদ্ভাসিত। এঁরা বহুস্থলে পূর্বাচার্যদের মতের বিরোধিতা করেছেন; এমনকি আচার্য ভরতের সর্বজনস্বীকৃত অভিমতবিশেষের-ও খণ্ডন করে স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ গ্রন্থকারদের জৈনধর্মাবলম্বিতার কারণে ব্রাহ্মণ্যশাসিত সংস্কৃত জগতে এই গ্রন্থটিকে যথোপযুক্ত খ্যাতির আলোয় আসতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির অজস্র স্বাক্ষরসম্বলিত এই গ্রন্থটি সত্য-ই বিশদ চর্চার অপেক্ষা রাখে।

আধুনিক কালপরিধিতে নাট্যদর্পণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঔফ্রেক্টনির্মিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের তালিকায়। ১৮৯২-৯৫ সালে প্রকাশিত পিটারসনের গ্রন্থতালিকাতে 'নাটকদর্পণ' নামে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯২৩ সালে 'জার্ণাল এশিয়াটিক'-এ অধ্যাপক লেভি-ও 'নাটকদর্পণ' নামে এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতে 'নাট্যদর্পণ' নামক একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কারণ, নাট্যদর্পণের অন্তর্গত বলে উল্লিখিত বহু উদ্ধৃতি নাট্যদর্পণের উপলভ্যমান সংস্করণে পাওয়া যায় না। ডঃ. কে. এইচ. ত্রিপাঠী এরকম দুটি ক্ষেত্রের কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' গ্রন্থের উপর রচিত টীকায় পণ্ডিত রঙ্গনাথাচার্য নাট্যদর্পণসম্মত নান্দীর যে লক্ষণটি উদ্ধার করেছেন, নাট্যদর্পণের বর্তমান সংস্করণে সেটি পাওয়া যায় না। আবার ভরতমল্লিক তাঁর ভট্টিকাব্যের টীকায় 'কাহল' নামক বাদ্যযন্ত্রের যে লক্ষণটি নাট্যদর্পণধৃত বলে উদ্ধৃত করেছেন, উপলভ্যমান সংস্করণে সেটি-ও পাওয়া যায়নি। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালে 'নাট্যদর্পণ' নামে একাধিক গ্রন্থের প্রচলন ছিল।

যৌথ রচনাকর্তৃত্ব ঃ

আলোচ্য নাট্যদর্পণগ্রন্থটি একটি যৌথ রচনা, যার রচনাকার দু'জন – রামচন্দ্র এবং গুণচন্দ্র। যৌথরচনাকর্তৃত্ব প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অভিনব ঘটনা নয়। অতি-পরিচিত উদাহরণরূপে কাশিকাগ্রন্থের রচয়িতা বামন ও জয়াদিত্যের নাম করা যেতে পারে।

নাট্যদর্পণনির্মাণে গুণচন্দ্রের অবদান যে ঠিক কতখানি, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে মনে হয়, এই গ্রন্থরচনায় রামচন্দ্রের-ই প্রধান স্থান; তিনি গুণচন্দ্রকে সহকারীপদে বরণ করেছিলেন। এই মতের কারণরূপে বলা যেতে পারে যে, রামচন্দ্র তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও কবিপ্রতিভার কারণে গুণচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত একক গ্রন্থগুলির প্রতিটিতে তাঁর অসাধারণ ধীশক্তির অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। নাট্যদর্পণগ্রন্থে ব্যবহৃত বহু উদ্ধৃতি রামচন্দ্র-রচিত কাব্যনাটকাদি থেকে গৃহীত; কোনোটি-ই গুণচন্দ্রের রচনারূপে স্বীকৃত নয়। এই সকল কারণে মনে করা অসঙ্গত নয় যে, নাট্যদর্পণরচনায় রামচন্দ্রের অবদান ও কৃতিত্ব গুণচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি।

গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার ঃ

'নাট্যদর্পণ' নাম থেকে-ই বোঝা যায়, গ্রন্থটি নাট্যতত্ত্বের দর্পণবিশেষ। বাস্তবিক-ই, নাট্যতত্ত্বের অন্তর্গত প্রায় সর্ববিধ বিষয়ে এই গ্রন্থে সুষ্ঠু আলোকপাত করা হয়েছে।

গ্রন্থের সূচনা হচ্ছে জৈনী বাগ্‌দেবীর স্তুতিমূলক মঙ্গলাচরণের দ্বারা। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়বস্তু দুটি ভাগে বিভক্ত – কারিকা এবং বৃত্তি। সূত্রাকারে নিবদ্ধ কারিকাগুলি অনুষ্টুভ্ ছন্দে নির্মিত। বর্ণনীয় বিষয়গুলির চুম্বকসার বিবৃত হয়েছে কারিকাগুলির মধ্যে; টীকায় রয়েছে এদের বিশদ ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থে সর্বসাকুল্যে দুইশত ছয়টি কারিকা রয়েছে।

কারিকাগুলিকে মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলির নাম 'বিবেক'। প্রথম বিবেকের নাম – 'নাটকনির্ণয়ঃ'। এতে প্রথমে-ই আলোচিত হয়েছে নাট্যের লক্ষণ এবং নাট্যের ভেদ। নাট্যশাস্ত্রোক্ত দশপ্রকার রূপকের সঙ্গে নাটিকা ও প্রকরণীকে যোগ করে রূপকের দ্বাদশবিধত্ব নির্ধারিত হয়েছে। সর্ববিধ রূপকের মধ্যে নাটকের স্থান যেহেতু প্রধান, তাই সর্বপ্রথম বিবেকে নাটকের যাবতীয় তত্ত্ববিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে নাটকের অঙ্কলক্ষণ ও পরিমাণ, অর্থোপক্ষেপক, অবস্থা, পতাকাস্থান, অর্থপ্রকৃতি, সন্ধি, সন্ধ্যঙ্গ প্রভৃতি তত্ত্ব-ও বিশদে আলোচিত হয়েছে। বৃহদায়তন এই প্রথম বিবেকটি মূল গ্রন্থের প্রায় অর্ধভাগ জুড়ে বিস্তৃত; কারিকাসংখ্যা চৌষট্টি।

দ্বিতীয় বিবেকের নাম – ‘প্রকরণাদ্যেকাদশরূপনির্ণয়ঃ’। নাটক ব্যতীত অবশিষ্ট একাদশপ্রকার রূপকের সোদাহরণ আলোচনায় এটি সমৃদ্ধ। এই বিবেকের কারিকাসংখ্যা সাঁইত্রিশ।

তৃতীয় বিবেকের নাম– ‘বৃত্তিরসভাবাভিনয়বিচারঃ’। নামদৃষ্টে-ই বর্ণনীয় বিষয়বস্তু অনুমেয়। ভারত্যাদি চতুর্বিধ বৃত্তি, শৃঙ্গারাদি রস, রসদোষ, স্থায়িভাব-ব্যভিচারিভাব-অনুভাব, বাচিকাদি চতুর্বিধ অভিনয় ইত্যাদির বিচার রয়েছে এই বিবেকে। রসবিমর্শে গ্রন্থকারদের বিশ্লেষণীক্ষমতা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এই বিবেকের কারিকাসংখ্যা একান্নটি।

চতুর্থ বিবেকের নাম – ‘সর্বরূপকসাধারণলক্ষণনির্ণয়ঃ’। নান্দী, ধ্রুবা, উত্তমাদি ত্রিবিধ নাটকীয় পাত্র, নায়কের গুণ, নায়িকার প্রভেদ, নারীদের যৌবনস্থ ধর্ম ইত্যাদির আলোচনায় এই বিবেকটি সমৃদ্ধ। বিভিন্ন নাট্যচরিত্রের ব্যবহরণীয় ভাষা, নাটকের চরিত্রগুলির নাম ইত্যাদি বিষয়ে-ও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিবেকের কারিকাসংখ্যা চুয়ান্ন।

নাট্যদর্পণের বৃত্তি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের দ্বারা-ই রচিত। কারিকাতে উল্লিখিত বিষয়সমূহের সোদাহরণ বিস্তৃত বর্ণনায় সমৃদ্ধ এই বৃত্তিটি। বস্তুতঃপক্ষে, কারিকা নয়, বৃত্তির আলোচনা-ই এই গ্রন্থের প্রধান অংশ। নাট্যতত্ত্বজগতে নাট্যদর্পণের যা যা অভিনবত্ব, যা কিছু অবদান – সব এই বৃত্তি অংশে-ই বিধৃত। পূর্বাচার্যদের অভিমতের আলোচনা, সমালোচনা, স্থলবিশেষে তার খণ্ডন – সব রয়েছে এই বৃত্তিতে । সঙ্গে-সঙ্গে প্রচুর উদাহরণসন্নিবেশের কারণে বৃত্তিবোধ যথেষ্ট সুকর হয়ে উঠেছে। উদাহরণগুলির একটি বিরাট অংশ রামচন্দ্রের স্বকৃত রচনা থেকে উদ্ধৃত। এ প্রসঙ্গে রসগঙ্গাধরকার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কথা মনে আসে, যাঁর গ্রন্থে বিধৃত প্রতিটি উদাহরণ তাঁর নিজের রচনা। তবে নাট্যদর্পণে রামচন্দ্রের রচনাবলী থেকে গৃহীত উদাহরণের সঙ্গে সঙ্গে অভিনবভারতী, দশরূপক ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে-ও অনেক উদাহরণ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থস্থ কারিকার বিবরণের পরে বৃত্তির অন্তিম অংশে সট্টক, শ্রীগদিত, দুর্মল্লিকা, প্রস্থান, কাব্য, রাসক, নাট্যরাসক, ভাণিকা ইত্যাদি ত্রয়োদশ প্রকার নাট্যভেদের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে।

এবার আমরা গ্রন্থের মূল অংশের আলোচনায় প্রবেশ করবো।

প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোক ঃ

গ্রন্থের শুভারম্ভ হচ্ছে প্ররোচনার মাধ্যমে । নাট্যশাস্ত্রকার মহর্ষি ভরত প্ররোচনার সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন –

“জয়াভ্যুদয়িনী চৈব মঙ্গল্যা বিজয়াবহা।
সর্বপাপপ্রশমনী পূর্বরঙ্গে প্ররোচনা ॥” (না.শা.২০/২৮)

–অর্থাৎ প্ররোচনা হল জয় ও অভ্যুদয়সম্পন্ন, মঙ্গলজনক, বিজয়সূচক এবং সর্বপাপবিনাশক। নাটকের পূর্বরঙ্গে এই প্ররোচনা বিধেয়। পরভাবী দশরূপককার ধনঞ্জয় অন্যভাবে প্ররোচনার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, প্রস্তুত অর্থের প্রশংসাপূর্বক শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তির উন্মুখীকরণকে বলা হয় প্ররোচনা – 'উন্মুখীকরণং তত্র প্রশংসাতঃ প্ররোচনা'(দশ.রূ. ৩/৬)।

আলোচ্য নাট্যদর্পণগ্রন্থের ক্ষেত্রে প্ররোচনার দ্বিতীয় লক্ষণটি অধিকতর সঙ্গত। কারণ, গ্রন্থকাররা প্রারম্ভিক শ্লোকগুচ্ছের মধ্যে স্বকৃত গ্রন্থের প্রশংসাদ্বারে পণ্ডিত ও বিদ্বদ্‌বর্গের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। সুধীসমাজের ইতিবাচক অনুমোদন ব্যতিরেকে গ্রন্থরচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ, তাঁরা-ই হলেন সদ্‌গ্রন্থের প্রকৃত বিচারক। মহাকবি কালিদাসের ভাষায়–

"তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্‌ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥" (রঘুবংশম্‌ ১/১০)

এক-ই সঙ্গে এই প্রারম্ভিক শ্লোকগুচ্ছে অনুবন্ধচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব-ও অনায়াসবোধ্য। গ্রন্থের সূচনায় অনুবন্ধচতুষ্টয়ের উল্লেখের রীতি সংস্কৃত সাহিত্যে অতিপ্রাচীন। 'অনু পশ্চাৎ স্বজ্ঞানোত্তরং বধ্‌নাতি আসঞ্জয়তি প্রবর্তয়তি ইত্যনুবন্ধাঃ' – অর্থাৎ যে বিষয়সমূহের জ্ঞান উৎপন্ন হলে গ্রন্থবিশেষের অধ্যয়নে অধ্যেতার প্রবৃত্তি জন্মায়, তাকে-ই অনুবন্ধ বলা হয়। বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী – এই হল চারপ্রকার অনুবন্ধ। 'নাট্যদর্পণ' গ্রন্থের বিষয় নাট্যতত্ত্ব; অধিকারী হলেন নাট্যতত্ত্বে বিশারদ পণ্ডিতবর্গ; প্রয়োজন হল এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত তত্ত্ববিষয়ে বৈদুষ্য অর্জন এবং সম্বন্ধ হল গ্রন্থ ও গ্রন্থপাঠকের মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক অথবা জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক ভাব।

গ্রন্থারম্ভের এই শ্লোকগুচ্ছটি বারোটি শ্লোকে নিবদ্ধ। তন্মধ্যে প্রথমটি মঙ্গলাচরণাত্মক। কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, এভাবে কার্যারম্ভ হলে তার নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি হয়। ন্যায়সম্মত ভাষানুসারে, মঙ্গলাচরণ বিঘ্নধ্বংসের মাধ্যমে কার্যের পরিসমাপ্তির জনক হয়। অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদী নব্যনৈয়ায়িকদের মতে, গ্রন্থাদির সমাপ্তির সঙ্গে মঙ্গলাচরণের সম্পর্ক নেই; মঙ্গলাচরণের ফল বা কার্য হল কেবলমাত্র বিঘ্নধ্বংস। স্বমতের সমর্থনে তাঁরা বাণভট্টের কথাকাব্য 'কাদম্বরী'-র উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনরা অবশ্য বাণভট্টের ক্ষেত্রে বিঘ্নবাহুল্য ইত্যাদির উল্লেখ করে মঙ্গলাচরণের সার্থকতা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। যাই হোক্‌, কার্যকারণ সম্বন্ধ থাক্‌ বা না-ই থাক্‌, সিদ্ধান্ত হল এই যে, কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ অবিগীত শিষ্টাচার এবং তা অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। মহামুনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের প্রথম সূত্র 'বৃদ্ধিরাদৈচ্‌'-এ,'বৃদ্ধিঃ' শব্দের আদিপ্রয়োগবিষয়ে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির বহুশঃ উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক – 'মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষকাণি ভবন্ত্যায়ুষ্মত্‌পুরুষকাণি

চাধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধিযুক্তা যথা স্যুরিতি'। কলাপব্যাকরণে-ও 'মঙ্গলহেতবে নিজকৃতে নির্বিঘ্নসিদ্ধিরীপ্সুঃ' ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলাচরণ অবশ্যকরণীয় – এমন কথা বলা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল গ্রন্থ-ই মঙ্গলাচরণাত্মক শ্লোক দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বী দার্শনিকদের বিরচিত গ্রন্থগুলি-ই কেবলমাত্র এর ব্যতিক্রম।

প্রথম শ্লোক – ''চতুর্বর্গফলাং নিত্যং জৈনীং বাচমুপাস্মহে।
রূপৈর্দ্বাদশভির্নিত্যং যয়া ন্যায়ে ধৃতং পথি ॥''

– নাট্যদর্পণের গ্রন্থকাররা জৈনমতাবলম্বী হলে-ও, তাঁরা কিন্তু মঙ্গলাচরণের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন। এই শ্লোকে যে দেবতার বন্দনা করা হয়েছে, তিনি হলেন 'জৈনী বাক্'– 'জিন' অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দেবী-ই মনুষ্যজীবনে চতুর্বর্গের ফলপ্রদায়িনী। আচার-সূত্রকৃত-স্থান-সমবায়-ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞাপ্তি বা ভগবতী-জ্ঞাতাধর্মকথা- উপাসকদশা-অন্তকৃদ্দশা-অনুৎকরউপপাতিকদশা-প্রশ্নব্যাকরণ-বিপাকশ্রুত-দৃষ্টিবাদ – জৈনধর্মের এই দ্বাদশ অঙ্গের দ্বারা ইনি-ই সমগ্র বিশ্বকে ধর্মতঃ ধারণ করে আছেন। 'রূপৈর্দ্বাদশভিঃ' পদের দ্বারা নাট্যদর্পণসম্মত দ্বাদশপ্রকার রূপকের কথা বলা হচ্ছে বলে-ও মনে করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই নাট্যোদ্ভূত আনন্দের দ্বারা দেবী জৈনী বাক্ সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন – এরকম ব্যাখ্যা হতে পারে।

এই নমস্কারশ্লোকটির বিষয়ে স্বকৃত বৃত্তিতে গ্রন্থকারদ্বয় বিস্তৃত ব্যাখ্যা রেখেছেন। যেমন, প্রশ্ন উঠতে পারে, চতুর্বর্গ তো সকল প্রকার মানুষের জন্য নয়; চতুর্থ বর্গটি কেবলমাত্র সংসারত্যাগী মুক্তিকামী সন্ন্যাসীদের জন্য। সেক্ষেত্রে ত্রিবর্গলাভেচ্ছু সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে কি সমাধান? উত্তরে বলা হচ্ছে, যে মানুষের ক্ষেত্রে যেটি ইষ্টসিদ্ধির সহায়ক বা প্রয়োজন, সেটি-ই তার কাছে মুখ্য, অপরাপরগুলি গৌণ – 'তেন পুরুষভেদেনৈক-দ্বি-ত্রিপুরুষার্থফলত্বে2পি চতুর্বর্গফলত্বং ন বিহন্যতে'।[২]

উপাস্যা জৈনী ভারতীর সমীপস্থ হয়ে এঁরা নিত্য এঁর আরাধনা করেন – 'সমীপবৃত্ত্যা চ তদেকশরণত্বমাত্মনঃ খ্যাপিতম্'।[৩]

'দ্বাদশ অঙ্গ' – অংশে সংখ্যার বিশেষ উল্লেখের দ্বারা সম্ভবতঃ ভিন্নমার্গাবলম্বী জৈনদর্শনের ব্যবচ্ছেদ সূচিত হয়েছে, যে মার্গে দ্বাদশ অঙ্গের ধারণাটি সমর্থিত নয় – 'সংখ্যানির্দেশেন চানিয়ন্ত্রিতসংখ্যায়া জিনবাচঃ প্রস্তুতাতুল্যত্বেন ব্যবচ্ছেদঃ কথ্যতে'।[৪]

'ন্যায্যে পথি' অংশের দ্বারা জৈনধর্মনির্দেশিত দান-অহিংসাদি নীতির দ্বারা পূত পন্থার কথা বলা হচ্ছে – 'পথি ইতি পুরুষার্থপ্রাপণোপায়ত্বাদহিংসাদানাদিকং কর্ম লক্ষ্যতে'।[৫]

প্রারম্ভিক এই নমস্কারশ্লোকটির মধ্যে দিয়ে গ্রন্থকারদের কাব্যভাবনা ও আধ্যাত্মিকভাবনা – দুয়ের-ই প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে জৈনধর্মের প্রতি এঁদের প্রগাঢ় ভক্তি এবং অন্যদিকে কাব্য তথা নাট্যতত্ত্বের ব্যাপ্তির প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা – এই দুই-ই যথাযথভাবে পাঠকের মানসলোকে প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় শ্লোক – দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হচ্ছে, গ্রন্থকারদ্বয় অন্যান্য কবি ও রচনাকারদের বহুসংখ্যক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। শ্লোকে 'মহাকবি'শব্দের ব্যবহার উপলক্ষণ। কেবলমাত্র কবিগণের কাব্য-ই নয়, পূর্বসূরী সকল নাট্যতত্ত্বজ্ঞদের রচনার-ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন ও আত্তীকরণের যথেষ্ট প্রমাণ এই গ্রন্থের সর্বত্র বিদ্যমান। ভাস-কালিদাস প্রমুখ মহাকবিদের রচনা এবং নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী, দশরূপক, শৃঙ্গারপ্রকাশ, কাব্যানুশাসন ইত্যাদি বিবিধ তত্ত্বগ্রন্থের সঙ্গে এঁরা সুপরিচিত ছিলেন। রামচন্দ্র নিজে-ও বহুসংখ্যক রূপক, স্তোত্র ইত্যাদির রচয়িতা । সেই সকল গ্রন্থ থেকে তিনি বহু উদ্ধৃতি নাট্যদর্পণে ব্যবহার করেছেন। এব্যাপারে 'রসগঙ্গাধর'রচয়িতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের সঙ্গে রামচন্দ্রের আংশিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় শ্লোক – নাট্যদর্পণকারদের মতে কথা, আখ্যায়িকা ইত্যাদি শ্রব্য সাহিত্যকৃতি অপেক্ষা নাট্যকৃতি বহুগুণে শ্রেয়ঃ। তাঁদের মতে, কথাদি রচনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রয়োজন হল ভাষার কারুকার্য এবং সেই কারণে-ই ছন্দ-অলঙ্কারাদি প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে কথাদি সাহিত্য সৃষ্টি করা অতিদুরূহ কোনো বিষয় নয়। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এই মতটি একেবারে অযৌক্তিক নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বাণভট্টের 'কাদম্বরী', 'হর্ষচরিত' অথবা দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত'-এর উল্লেখ করতে পারি, যেসব গ্রন্থে বর্ণনার ঘনঘটা, অলঙ্কারের অপর্যাপ্ত প্রয়োগ, ছন্দপ্রয়োগের চমৎকারিত্ব – এসব-ই রচনার সিংহভাগ অধিকার করে রেখেছে; কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু স্থানে-স্থানে ছিন্নসূত্র হয়ে পড়েছে।কিন্তু সার্থক নাট্যরচনায় এই জাতীয় দীর্ঘ বর্ণনার সুযোগ-ই থাকে না । কারণ, নাটক হল দৃশ্যকাব্য, যা দর্শকদের সামনে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়। নাটকের ভাষাকে তাই অবশ্য-ই হতে হবে মঞ্চোপযোগী, গতিময়। ভাষার ছটায় কাহিনীর গতি রুদ্ধ করে দর্শকদের ধৈর্যপরীক্ষা সার্থক নাট্যকারের অভিপ্রায় হতে পারে না। বিভাবাদি ভাবের সহায়তায় দর্শকদের চিত্তস্থিত স্থায়িভাবের রসত্বপ্রাপ্তি-ই হল নাটকের প্রাণ । নায়ক, নায়িকা, অন্যান্য চরিত্র, গতিময় ঘটনা, আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়, নাটকীয় সংলাপ, নাটকীয় পরিবেশ, বিভিন্ন নাট্যকৌশল – এগুলি হল নাটকের প্রাসঙ্গিক বস্তুসমূহ। এই সকল সহায়ক অঙ্গের দ্বারা দর্শকচিত্তে রসের উন্মেষ ঘটানো-ই হল নাটকের উদ্দেশ্য আর এখানে-ই অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির থেকে নাটকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা।

চতুর্থ শ্লোক – নাটকরচনা বা অভিনয় – এই দুই-এর অধিকারী ব্যক্তিকে নৃত্য-গীত-বাদ্য এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ পারঙ্গম হতে হবে। অমরকোষে 'নাট্য'শব্দের অর্থ এরকম বলা হচ্ছে –

‘তৌর্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদ্যং নাট্যমিদং ত্রয়ম্’। অতএব নাট্যদর্পণকাররা যথার্থ-ই বলেছেন, তৌর্যত্রিকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নাটক রচনা বা অভিনয় কোনোটির-ই ক্ষমতা রাখেন না। এই তিনটি বিষয়কে একত্রে সঙ্গীত বলা হয়, যা নাটকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– ‘গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে’।

নাট্যকারপদবীলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে লোকাচার সম্বন্ধে-ও বিশেষ ভাবে অবগত থাকতে হবে। মহামুনি ভরতের মতে, নাটক হল ‘ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ’। অতএব জাগতিক বিষয়সমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত নাটক রচনা বা অভিনয় যথাযথ ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। নাট্যদর্পণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কাব্যতত্ত্বজ্ঞরা-ই লোকবৃত্তকে রচনার অন্যতম সহায়ক কারণরূপে গণ্য করেছেন। আচার্য বামন তাঁর কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি গ্রন্থে লোকবৃত্তকে কাব্যাঙ্গরূপে স্বীকার করেছেন– “লোকো বিদ্যা প্রকীর্ণঞ্চ কাব্যাঙ্গানি। লোকবৃত্তং লোকঃ।” (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, প্রথম অধিকরণ, তৃতীয় অধ্যায়)। আচার্য মম্মট-ও তাঁর ‘কাব্যপ্রকাশ’ গ্রন্থে কাব্যরচনার কারণের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য করেছেন এই লোকবৃত্তকে – ‘লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ’ (কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লাস)। নাটক তথা কাব্য তথা যেকোনো রচনার মূল উৎস সর্বদা-ই জাগতিক জীবন। সেখান থেকে বিবিধ বিষয় আহরণ করে ‘আপন মনের মাধুরী মিশায়ে’ কবি তাঁর রসোত্তীর্ণ রচনা সৃষ্টি করেন। অতএব লোকস্থিতি, লোকাচার, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই পৃথিবীর বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে নাট্যকার ও নট-কে অবশ্য-ই অবহিত হতে হবে।

পঞ্চম শ্লোক – সেই ব্যক্তি-ই কবিপদবাচ্য, যিনি তাঁর লেখনীর সঞ্জীবনীরসে মর্ত্যবাসী মানুষদেরকে অমৃতের আস্বাদ দিতে পারেন। কাব্যরসের আস্বাদনের মত অনির্বচনীয় আনন্দ একমাত্র জনৈক সুকবি-ই পাঠক বা দর্শককে দান করতে পারেন। এবং রসোল্লসিত এইরকম রচনাতে কবিভারতী সানন্দ নৃত্যপরা মূর্তিতে বিরাজিতা থাকেন। শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কবি Longfellow-র ‘The Singers’-এর অংশবিশেষ প্রণিধানযোগ্য –

“ God sent his singers upon earth
with songs of sadness and of mirth,
that they might touch the heart of men,
And bring them back to Heaven again.”[৬]

ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্লোক – এই দুটি শ্লোকে নাট্যদর্পণকাররা রচনায় রসের শ্রেষ্ঠত্বের উদ্‌ঘোষণা করছেন। তাঁদের মতে, কোনো বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি কাব্যরচনায় কেবলমাত্র শব্দার্থের চমৎকারিত্বের প্রতি মনোযোগী হন এবং কাব্যের প্রাণসার রসকে উপেক্ষা করেন, তবে তিনি কখনো-ই সুকবিপদবাচ্য হতে পারবেন না–

“নানার্থশব্দলৌল্যেন পরাঞ্চো যে রসামৃতাৎ।
বিদ্বাংসস্তে কবীন্দ্রাণাং অর্হন্তি ন পুনঃ কথাম্ ॥
শ্লেষালঙ্কারভাজো2পি রসনিষ্যন্দকর্কশাঃ।
দুর্ভগা ইব কামিন্যঃ প্রীণন্তি ন মনো গিরঃ ॥”

প্রাচীনকাল থেকে-ই কাব্যের মূল তত্ত্ব, কাব্যপ্রয়োজন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিপশ্চিতদের মধ্যে মতপার্থক্য চলে আসছে। সেই বিভিন্ন প্রকার মত থেকে একেকটি মার্গ বা প্রস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। যথা – অলঙ্কারপ্রস্থান, গুণপ্রস্থান, রীতিপ্রস্থান, রসপ্রস্থান ইত্যাদি। প্রথমোক্ত তিনপ্রকার প্রস্থানের অনুসারীরা যথাক্রমে অলঙ্কার, গুণ ও রীতিকে কাব্যের প্রাণ বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি হল কাব্যের বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপকরণ। কাব্যের আন্তর সৌন্দর্য্য হল রস। মহামুনি ভরত রসপ্রস্থানের উদ্গাতা। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে – ‘ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে’ (না.শা. ৬/৩২) । অলঙ্কারাদি বাহ্য উপকরণ হল কাব্যের আভরণস্বরূপ। রসহীন কাব্যে অলঙ্কারাদিসংযোগ লাবণ্যহীন নারীদেহে ভূষণসজ্জার মতন-ই অর্থহীন। অতএব সার্থক কাব্য হল সেটি-ই, যা রসচর্বণার মাধ্যমে পাঠককে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকের প্রবেশাধিকার দেয়। কাব্যপাঠের এই আনন্দকে মম্মটাচার্য ‘সদ্যঃপরনির্বৃতিঃ’ নামে অভিহিত করেছেন। এই আনন্দ হল ‘ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ’। ‘সদ্যঃপরনির্বৃতিঃ’ পদের ব্যাখ্যায় মম্মটাচার্য বলছেন – ‘সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্’ (কাব্যপ্রকাশ. প্রথম উল্লাস)।

রসোত্তীর্ণ কোনো কাব্যপাঠমাত্র সহৃদয় যে অনির্বচনীয় সুখানুভূতি প্রাপ্ত হন, তাই হল কাব্যের প্রাণ। উত্তরসূরী পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এবিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন কাব্যপাঠের প্রয়োজনবাক্যে ‘পরমাহ্লাদ’ পদসন্নিবেশের দ্বারা। দার্শনিক Aristotle-এর মতটি-ও এবিষয়ে প্রণিধেয় –“The object of poetry, as of all the fine arts, is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure.”[৭] আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোকে এই রসবাদকে-ই আরো একটু পরিশীলিত রূপ দান করে ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলে অভিমত পোষণ করেছেন। এই ধ্বনি ত্রিবিধ – বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি। কোনো সার্থক কাব্যে প্রথমোক্ত দুই প্রকার ধ্বনি পরিণামে রসধ্বনিতে পর্যবসিত হয় – এই হল তাঁর মত। অতএব সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হচ্ছে, আনন্দবর্ধনাচার্য-ও রসকে-ই কাব্যের আত্মাস্বরূপ বলে মনে করেছেন।

অতএব দেখা গেল, রসবিষয়ে নাট্যদর্পণকারদের অভিমত যথেষ্ট-ই যুক্তিসঙ্গত এবং পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী বহু কাব্যতত্ত্বজ্ঞের সমর্থনপ্রাপ্ত। এঁরা আরো বলছেন, শ্লেষাদি অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব

সত্ত্বে-ও, নীরস কাব্য অসুন্দরী সালঙ্কারা অঙ্গনার মত, সহৃদয়ের হৃদয়কে কখনো-ই আকর্ষণ করতে পারে না। নাট্যদর্পণকারদের এই উক্তিতে আমরা আনন্দবর্ধনাচার্যের মতের ছায়া দেখতে পাই, যখন কাব্যে প্রতীয়মান অর্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন–

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্ ।

যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥"(ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত)

– যেমনভাবে অলঙ্কারপরিহিতা হয়ে-ও, লাবণ্যহীনা কোনো নারী সহৃদয়ের মনকে মুগ্ধ করতে পারে না, অনুরূপে প্রতীয়মান অর্থ হল কাব্যদেহের সেই লাবণ্যস্বরূপ, যা না থাকলে অলঙ্কারাদি শত বাহ্য উপকরণের প্রয়োগে-ও কাব্য কখনো-ই চমৎকারিত্ব অর্জন করতে পারে না।

অষ্টম শ্লোক – অষ্টম শ্লোকে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র কাব্যে ঔচিত্যের প্রশংসা করছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ে যাওয়ার আগে ঔচিত্য কাকে বলে, সেবিষয়ে সামান্য ধারণা করে নেওয়া অসঙ্গত হবে না।

সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় ঔচিত্য একটি বিশেষ মতবাদ। আলঙ্কারিক রুদ্রট এর প্রবক্তা। কবির মুখ্য কর্ম হল রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে কাব্যে বাচ্য ও বাচকের উপনিবন্ধন। এই উপযোগিতাবিধানের ক্ষেত্রে কবিকে যে নিয়মটি মেনে চলতে হয়, তাকে-ই অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় ঔচিত্য। কবি তাঁর রচনায় এমন কিছুকে স্থান দেবেন না, যা পাঠকের রসোদ্বোধের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। আনন্দবর্ধনাচার্যকৃত ধ্বন্যালোকের এই অংশটি এখানে স্মরণীয়–

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্ ।

প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা ॥" (ধ্বন্যালোক, ৩/১৫)

পরভাবী আলঙ্কারিক ভোজদেব-ও তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশে বলেছেন –'ঔচিত্যং বচসাং প্রকৃত্যনুগতং সর্বত্র পাত্রোচিতা পুষ্টিঃ স্বাবসরে রসস্য' (শৃ.প্র. একাদশ অধ্যায়)।

রূপক-ও কাব্য। সেখানে-ও কবিকে ঔচিত্যের এই নিয়ম মেনে চলতে হয়। নির্দেশ রয়েছে –

"যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।

বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ ॥"(সা.দ. ৬/৫০)

– অর্থাৎ নায়কের বা রসের পক্ষে যা অনুচিত, সেই বিরুদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করা উচিত, অথবা তা অন্যভাবে কল্পনা করা উচিৎ। তাই দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে রূপকগুলি রচিত হয়েছে, সেগুলিতে শ্রীরামের চরিত্রের হীনতা প্রতিপন্ন হয়, এমন বিষয়গুলি, যথা – বালিবধাদি, অন্যভাবে চিত্রিত হয়েছে। মহাবীরচরিতে বলা হচ্ছে, বালী রামবধের জন্য এলে শ্রীরামচন্দ্র আত্মরক্ষার্থে তাকে হত্যা করেন। অন্যদিকে উদাত্তরাঘবে এই বালিবধের ঘটনাটির উল্লেখ-ই করা

হয়নি। এখানে-ই ঔচিত্যের প্রয়োগ, যার দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করে, এমন কোনো ঘটনা সংযোজিত না হওয়ায় দর্শকচিত্তে রসোদ্বোধ নির্বাধ থাকতে পেরেছে।

নাট্যদর্পণকারদের মতে, কবিযশোলিপ্সু কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই ঔচিত্যের উপর বিশেষ অধিকার একান্ত প্রয়োজন। পার্থিব সম্পদের নিরিখে তিনি কপর্দকশূন্য ভিক্ষুক বা মহৈশ্বর্যশালী নরপতি যা-ই হোন্ না কেন, ঔচিত্যসম্পদে সমৃদ্ধ না হলে কাব্যনির্মাণব্যাপারে তিনি কখনো-ই সার্থকতা অর্জন করতে পারবেন না। ঔচিত্যজ্ঞান ব্যতিরেকে কাব্যরচনার তাঁর সেই প্রয়াস বিদ্বৎমণ্ডলীর উপহাসের বিষয়ে পরিণত হবে–

"আরঙ্কাৎ ভূপতিং যাবৎ ঔচিতীং ন বিদন্তি যে ।
স্পৃহয়ন্তি কবিত্বায় খেলনং তে সুমেধসাম্ ॥ "

নবম থেকে দ্বাদশ শ্লোক – অন্তিম শ্লোকচতুষ্টয়ে নাট্যদর্পণকাররা 'কবিত্ব' অর্থাৎ ব্যক্তির কাব্যকরণের ক্ষমতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করছেন। তাঁদের মতে, সকল প্রকার বিদ্যার চরম উৎকর্ষ, সারাৎসার হল কবিত্ব। লাবণ্যহীন নারীদেহ যেমন অসম্পূর্ণ ও অসুন্দর, বিপশ্চিৎদের ক্ষেত্রে কবিত্বহীনতা-ও তেমনি অসম্পূর্ণতার কারণ। এই কারণে-ই 'ত্রিবিদ্যাবিদ্' পণ্ডিতরা-ও কাব্যরচনায় উৎসাহ অনুভব করেন। কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র অনুসারে এই 'ত্রিবিদ্যা' হল আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও বার্তা। আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কবিদ্যা, ত্রয়ী হল ঋক্-সাম-যজুঃ এই তিনপ্রকার বেদ এবং বার্তা হল বাণিজ্যবিদ্যা। জৈন ঐতিহ্যানুসারে অবশ্য তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণ ও সাহিত্য-কে ত্রিবিদ্যা বলে মনে করা হয়। যেহেতু আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতারা জৈন, অতএব আমরা দ্বিতীয় অর্থকে-ই অধিকতর গ্রাহ্য মনে করব। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, এঁদের মতে, সাহিত্যবিদ্ পণ্ডিতরা-ও কবিত্বলাভে অভিলাষী। স্পষ্ট-ই প্রতীত হচ্ছে, অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যকৃতি অপেক্ষা কাব্যকৃতি এঁদের কাছে অনেক বেশি আদরণীয় । তাই সাহিত্যবিদ্ হওয়া সত্ত্বে-ও 'কাব্যবিদ্' হওয়ার জন্য তাঁরা নিরত সচেষ্ট থাকেন। কারণ একটি-ই – কাব্যরচনার শক্তি বা কবিত্ব-ই হল সকল প্রকার বিদ্যার প্রাণ। ভামহাচার্যের 'কাব্যালঙ্কার'-এর এই শ্লোকটি এ প্রসঙ্গে অবশ্য-ই উদ্ধারের অপেক্ষা রাখে –

"ন স শব্দো ন তদ্‌বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ ॥"(কাব্যালঙ্কার, ৫/৪)

–অর্থাৎ ভামহাচার্যের-ও মতে, সকল বিদ্যার আত্যন্তিক পরিণতি ঘটে সৎকাব্যরচনার মাধ্যমে, অন্যভাবে নয়। নাট্যদর্পণকারদের মতে, পণ্ডিতব্যক্তির কবিত্বাভাব, মৃগনয়না নারীর সদোষ অবয়বের মত-ই পীড়াদায়ক। কেবল পীড়াদায়ক-ই নয়, কবিত্বাভাব বিদ্বান্‌দের চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ – 'অকবিত্বং পরস্তাবত্ কলঙ্কঃ পাঠশালিনাম্' ।

নাট্যদর্পণকারদের এই মত কতটা যুক্তিসহ, তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এঁদের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে সঙ্গতভাবে-ই মনে হয় যে, এঁদের মতে, কাব্যরচনা-ই হল বিদ্যাচর্চার পরম লক্ষ্য। ভাষান্তরে, বিদ্বান্‌মাত্রের-ই কাব্যচর্চা করা উচিৎ । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রতিভা বিহনে রসোত্তীর্ণ কাব্যরচনা করা কখনো-ই সম্ভবপর নয়। কাব্যরচনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কাব্যতাত্ত্বিকগণ প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস – এই তিনটিকে ব্যস্ত বা সমস্তভাবে স্বীকার করেছেন। এই কারণত্রয়ের মধ্যে প্রতিভাকে কিন্তু সকলে-ই কাব্যকারণরূপে স্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে ভামহাচার্য বলছেন – 'কাব্যং তু জায়তে জাতু কস্যচিত্ প্রতিভাবতঃ' (কাব্যালঙ্কার,১/৫)। আচার্য বামন বলছেন – 'কবিত্ববীজং প্রতিভানম্' (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, প্রথম অধিকরণ, তৃতীয় অধ্যায়)। এ হল সেই শক্তি, যা ব্যতীত কাব্যনির্মাণ অসম্ভব। কাব্যপ্রকাশকারের ভাষায় – 'যাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেত্, প্রসৃতং বোপহসনীয়ং স্যাত্'। বামনাচার্যের কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিতে-ও এর সমর্থন মেলে – 'যস্মাদ্ বিনা কাব্যং ন নিষ্পদ্যতে, নিষ্পন্নং বা হাস্যায়তনং স্যাত্' (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, প্রথম অধিকরণ, তৃতীয় অধ্যায়)। আনন্দবর্ধনাচার্য-ও বলছেন, কবির অপাণ্ডিত্যজনিত দোষকে প্রতিভার দ্বারা আবৃত করা যায়; কিন্তু প্রতিভাবিহীনতাজনিত দোষকে কোনোভাবে-ই সংবৃত করা যায় না –

"অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য ঝটিত্যেবাবভাসতে ॥"(ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্যোত)

এই প্রতিভা একান্তভাবে-ই সহজাত। বলা-ই হয়ে থাকে - "Poets are born, not made."। সহস্র সারস্বত সাধনাতে-ও এই শক্তির পরিস্ফুরণ ঘটানো সম্ভব নয়। এটি একান্তভাবে সহজাত ;ব্যক্তির পূর্বজন্মের সংস্কারপ্রসূত গুণবিশেষ। বামনাচার্যের মতে – 'জন্মান্তরসংস্কারাপেক্ষিণী সহজা'। ক্রমাগত চর্চা ও সাধনা ঈশ্বরদত্ত এই ক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে পারে মাত্র, এর সৃষ্টি করতে পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রে-ই একান্ত দুর্লভ এই ক্ষমতার অধিকারী – একথা যথার্থ নয়। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে –

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুলর্ভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা ॥"(অগ্নিপুরাণ, ৩৩৭তম অধ্যায়)

হর্ষচরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসে বাণভট্ট-ও বলেছেন –

"সন্তি শ্বানো ইবাসংখ্যা জাতিভাজো গৃহে গৃহে।
উৎপাদকা ন বহবঃ কবয়ঃ শরভা ইব ॥"

একজন প্রকৃত বিদ্বান্ বা একজন প্রকৃত কাব্যবোদ্ধা যে সার্থক কাব্যরচয়িতা হবেন-ই – এমন কোনো নিয়ম নেই; যিনি কাব্যরসিক, তিনি কবি না-ও হতে পারেন। এই কারণে রাজশেখর তাঁর ‘কাব্যমীমাংসা’ গ্রন্থে প্রতিভাকে কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী – এই দু’টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

নাট্যদর্পণকাররা সম্ভবতঃ বিপশ্চিদ্‌বর্গকে কাব্যরচনার ব্যাপারে উৎসাহী বা মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন। কারণ, সার্থক কাব্যরচনার দ্বারা-ই যশোলিপ্সু পণ্ডিতগণ চিরন্তন খ্যাতি অর্জন করতে পারেন। রসোত্তীর্ণ রচনার মাধ্যমে সহৃদয় পাঠককে তাঁরা অনির্বচনীয় আনন্দ দান করতে পারেন এবং সেই আনন্দাস্বাদন-ই পাঠকের মানসলোকে তাঁদেরকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নাট্যদর্পণকারের মতে, কাব্যরচনা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করে জগৎবাসীকে সুখী করার চেষ্টা, চোখ বন্ধ করে পর্বতারোহণের মতন নিষ্ফল ও ব্যর্থ–

“কবিত্ববন্ধ্যাঃ ক্লিশ্যন্তে সুখীকর্ত্তুং জগন্তি যে।
নেত্রে নিমীল্য বিদ্বাংসঃ তে2ধিরোহন্তি পর্বতম্ ॥”

চৌর্যবৃত্তি দ্বারা কবিখ্যাতি অর্জনে সচেষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নিষেধবাক্য উচ্চারণ করেছেন রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র। কালিদাসাদি কবিশ্রেষ্ঠর রচনা থেকে তস্করবৃত্তির দ্বারা যাঁরা কাব্যরচনা করেন, তাঁদের সেই অপকার্য অতি গর্হণীয়। আচার্য রাজশেখর তাঁর ‘কাব্যমীমাংসা’ গ্রন্থে বলেছেন, অন্য কবির রচনা থেকে দ্ব্যর্থক একটি-ও শব্দচয়ন গর্হিত অপরাধ। বিল্‌হণের ‘বিক্রমাঙ্কদেবচরিত’-এ ‘plagiarist’ ব্যক্তিকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে –

“সাহিত্যপয়োনিধিমন্থনোত্থং
কর্ণামৃতং রক্ষত হে কবীন্দ্রাঃ।
যদস্য দৈত্যা ইব লুণ্ঠনায়
কাব্যার্থচৌরাঃ প্রগুণীভবন্তি ॥ ” (বিক্রমাঙ্কদেবচরিত , ১/১১)

কুশীলকবৃত্তির দ্বারা কবিপদবাচ্য হওয়ার পরিবর্তে কবি হতে না পারা-ও বরং ভাল। ভামহাচার্য প্রায় অনুরূপ উক্তি করেছেন – কবি না হতে পারা শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ নয়; কিন্তু ‘কুকবি’ হওয়া মৃত্যুর সমান –

“অনাকবিত্বমধর্মায় ব্যাধয়ে দণ্ডনায় বা।
কুকবিত্বং পুনঃ সাক্ষাৎ মৃতিমাহুর্মনীষিণঃ ॥”(কাব্যালঙ্কার,১/১২)

রাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসায় এই কথার-ই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়– “বরমকবির্ন পুনঃ কুকবিঃ স্যাৎ। কুকবিতা হি সোচ্ছ্বাসং মরণম্।”(কাব্যমীমাংসা, পঞ্চম অধ্যায়)

প্রথম বিবেক

গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ ঃ

গ্রন্থের প্রথম বিবেকের শুভারম্ভ হল মঙ্গলাচরণের দ্বারা। পূর্বে-ই বলা হয়েছে, উপাস্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম, রাজা ও গুণিজনের পাদবন্দনা ইত্যাদি দ্বারা গ্রন্থারম্ভ ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে এক অবিগীতশিষ্টাচার; গ্রন্থের অগ্রগতির পথে বিঘ্নধ্বংস এই মঙ্গলাচরণের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থে-ও এই এক-ই কারণে আরাধ্যা দেবীর আশীর্বাদলাভ ও সম্ভাব্য বিঘ্নধ্বংস করার জন্য মঙ্গলশ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে। টীকাতে তাই বলা হচ্ছে – 'শিষ্টসময়পরিপালনায় প্রত্যূহব্যূহোপশমনায় চ '।[৮]

প্রারম্ভিক শ্লোকগুচ্ছের প্রথমটিকে-ই মঙ্গলাত্মক নমস্কারশ্লোকরূপে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কারিকা ও বৃত্তির এককর্তৃকত্ব বোঝানো-ই এর উদ্দেশ্য। টীকায় তাই বলা হচ্ছে– 'ব্যাখেয়ব্যাখ্যানয়োরেককর্তৃকত্বখ্যাপনার্থময়মেব শ্লোকো বিবরণস্যাপ্যাদাবধীত ইতি' ।[৯]

'জৈনী বাক্' হলেন এই গ্রন্থের রচয়িতাদের উপাস্যা দেবী। বাগ্‌দেবীর আরাধনাদ্বারে গ্রন্থারম্ভের ঐতিহ্য অতি সনাতন। উদাহরণস্বরূপ – সাহিত্যদর্পণের ''শরদিন্দুসুন্দররুচিঃ...'' ইত্যাদি; কাব্যাদর্শের ''চতুর্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূর্মম...'' ইত্যাদি, কাব্যপ্রকাশের ''নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাম্...'' ইত্যাদি, সরস্বতীকণ্ঠাভরণের ''ধ্বনির্বর্ণাঃ পদং বাক্যম্...'' ইত্যাদি উল্লেখ্য।

নাট্যদর্পণে বাগ্‌দেবীর প্রণাম একটু বিশিষ্ট ভাবে করা হয়েছে। ইনি হলেন 'জৈনী' – জিনদের আরাধ্যা বাগ্‌ভারতী। এখানে 'জিন' শব্দের অর্থ কিন্তু কেবলমাত্র মহাবীর-প্রদর্শিত মার্গাবলম্বী জৈনরা নন; 'জিন' শব্দের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের বোঝানো হচ্ছে। যাঁরা সংযতেন্দ্রিয় ঋষিতুল্য ব্যক্তি, তাঁদের বাক্য-ই 'জৈনী বাক্' শব্দের দ্বারা সূচিত হচ্ছে। বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে – 'জিনানাং রাগাদিজেতৄণাং লক্ষণপ্রণয়ণাপেক্ষেয়ং জৈনী'।[১০]

ডঃ.কে.এইচ.ত্রিবেদীর মতে, জিনশব্দের দ্বারা ভরতাদি প্রাচীন ঋষিদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে –"….. the authors indirectly praise the speech of the great sages like Bharata."[১১] কেবলমাত্র প্রাচীনরা-ই নন, সংযতচিত্ত নবীন তাত্ত্বিকদের রচনা-ও 'জৈনী' পদবাচ্য হতে পারে। বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে–'নবেক্ষা2র্বাচীনদৃশঃ সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাং তৎ কর্তুং প্রভবন্তি'।[১২]

জৈনী বাগ্‌দেবীর প্রণাম দ্বারা গ্রন্থারম্ভ, আচার্য হেমচন্দ্রের প্রতি(তাঁর) শিষ্যদ্বয়ের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন। হেমচন্দ্র-ও তাঁর 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থের সূচনা করেছেন এই এক-ই দেবীর প্রতি নমস্কার জানিয়ে–

"অকৃত্রিমস্বাদুপদাং পরমার্থাভিধায়িনীম্।
সর্বভাষাপরিণতাং জৈনীং বাচমুপাস্মহে ॥"

যাই হোক্, উপাসিতা এই বাগ্‌দেবী হলেন অভিনয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এটি জানা যাচ্ছে শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'রূপৈঃ' পদটির দ্বারা । বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – "রূপ্যন্তে অভিনীয়ন্তে ইতি রূপাণি নাটকাদীনি। অনভিনেয়ানাং রূপশব্দাপ্রতীতেঃ সামান্যনির্দেশে2পি বাচো2ভিনেয়ত্বং লক্ষ্যতে"।[১৩] নাটকাদি রূপকে বর্ণিত নায়ক ও প্রতিনায়কের যথাক্রমিক প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় কর্মবিবরণের দ্বারা ন্যায় ও অন্যায়ের বোধ দর্শকদের চিত্তে জাগ্রত হয়। এভাবে-ই এই দেবী দ্বাদশপ্রকার রূপকের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে ন্যায়সঙ্গত পথে পরিচালিত করেন।

নমস্কারশ্লোকের দ্বিতীয়চরণে দ্বাদশপ্রকার রূপকের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জৈন ধর্মগ্রন্থ আগমের সংখ্যা-ও বারোটি। 'দ্বাদশ' সংখ্যাটি রচয়িতাদের ধর্মভাবনার সঙ্গে সংযুক্তির ফলে একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। পূর্বসূরী দশরূপককার ধনঞ্জয়-ও স্বীয় গ্রন্থের নমস্কারশ্লোকে বিষ্ণুর দশাবতারের সঙ্গে দশবিধ রূপকের একটি সাংখ্যসম্বন্ধ স্থাপন করেছেন –

"দশরূপানুকারেণ যস্য মাদ্যন্তি ভাবকাঃ।
নমঃ সর্ববিদে তস্মৈ বিষ্ণবে (ভরতায় চ) ॥" (দশ.রূ. ১/২)

সম্ভবতঃ ধনঞ্জয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে-ই রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র তাঁদের গ্রন্থের মঙ্গলশ্লোকটি এরকম দ্ব্যর্থবহভাবে রচনা করেছেন।

'চতুর্বর্গফলাম্' পদটি কিছু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 'চতুর্বর্গ' অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। নাট্যদর্পণকারদের মতে, কাব্যের প্রয়োজন হল এই চতুর্বর্গপ্রাপ্তি। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী বহু আচার্য-ও কাব্যফলবিষয়ক আলোচনায় এটিকে-ই মুখ্যফলরূপে গণ্য করেছেন। ভামহাচার্য বলেছেন – "ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্ ॥"(কাব্যালঙ্কার,১/২)

রুদ্রটাচার্য, কুন্তকাচার্য এঁরা-ও কাব্যফলরূপে চতুর্বর্গকে স্বীকার করেছেন। দর্পণকার বিশ্বনাথ-ও বলেছেন – 'চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি'(সা.দ. ১/২) – অল্পধী ব্যক্তিরা-ও যার দ্বারা সহজে চতুর্বর্গ লাভ করতে পারে, কাব্য হল সেই প্রয়োজনের সাধন।

কাব্য তথা নাটকাদিতে নায়কচরিত্র রাজ্যাদিলাভরূপ জাগতিক প্রয়োজন, প্রণয়ের প্রয়োজন এবং কোথাও কোথাও ধর্মীয় প্রয়োজন– এই তিনটি বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন– এরকম আমরা সর্বদা-ই দেখতে পাই। এই তিনটির মধ্যে-ও আবার প্রণয়ব্যাপার-ই সংস্কৃত কাব্যাদিতে বেশী আলোচিত – তা-ও আমরা জানি। অতএব কাব্য যে সাক্ষাৎরূপে ত্রিবর্গের সাধন, তা স্পষ্ট। কিন্তু চতুর্থ বর্গ অর্থাৎ 'মোক্ষ', যা কিনা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর অন্বেষ্টব্য, তা কিভাবে কাব্যের ফল হয়? উত্তর হল – 'রামাদিবদ্ বর্তিতব্যম্, ন রাবণাদিবৎ'– ইত্যাদির দ্বারা ন্যায়-অন্যায়ের বোধ জাগ্রত করে মানুষকে ধর্মসঙ্গত পথের দিক্‌নির্দেশ করে এই কাব্য। এবং যেহেতু ধর্মাচরণের আত্যন্তিক পরিণতি হল মোক্ষলাভ বা ভাষান্তরে ধর্ম হল মোক্ষলাভের হেতু, অতএব ধর্ম ও মোক্ষের এই আন্তঃসম্পর্কের পারম্পর্যে মোক্ষ-ও কাব্যের ফলরূপে বিবেচিত হবে। টীকাতে তাই বলা হয়েছে– 'যদ্যপি সাক্ষাত্ ধর্মকামার্থফলান্যেব নাটকাদীনি, তথাপি 'রামবদ্ বর্তিতব্যং ন রাবণবৎ' ইতি হেয়োপাদেয়হানোপাদানপরতয়া ধর্মস্য চ মোক্ষহেতুতয়া মোক্ষো2পি পারম্পর্যেণ ফলম্'।[১৪]

উল্লেখ করা যেতে পারে, আচার্য ভরত, আচার্য আনন্দবর্ধন, আচার্য অভিনবগুপ্ত – এঁরা সকলে প্রত্যেক রসের-ই একটি-না-একটি পুরুষার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে – এরকম বলেছেন। যেমন – শৃঙ্গার ও হাস্য কামপ্রধান, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত ধর্মপ্রধান, রৌদ্র ও করুণ অর্থপ্রধান এবং শান্তরস হল মোক্ষপ্রধান। ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশে শৃঙ্গারের-ও চারটি ভাগ বর্ণনা করা হয়েছে – ধর্মশৃঙ্গার, কামশৃঙ্গার, অর্থশৃঙ্গার এবং মোক্ষশৃঙ্গার।

নাট্যদর্পণকারদের কাব্যভাবনায় রসের প্রাধান্য অন্যত্র বহুশঃ প্রকাশিত হলে-ও, প্রারম্ভিক নমস্কারশ্লোকে কিন্তু কোথাও রসের ইঙ্গিত নেই। এই শ্লোকটি বিবেচনা করার পর শুধু এই অর্থ-ই আসে যে, কাব্যপাঠের বা কাব্যরচনার উদ্দেশ্য হল চতুর্বর্গলাভ, সৎ জীবনচর্যার উপদেশলাভ, ধর্মলাভ, মোক্ষপ্রাপ্তি ইত্যাদি। কিন্তু কাব্যের প্রধান প্রয়োজন এগুলি নয়। কাব্যের প্রথমতম ও প্রধানতম প্রয়োজন হল রসচর্বণা। রসোদ্বোধ ব্যতিরেকে কোনো কাব্য কখনো-ই সার্থকতা পেতে পারে না। কাব্য যে সব সময় উপনিষদ্ বা মহাভারতের মত মোক্ষপ্রধান হবে, তা নয়। কিন্তু ইহলোকে অর্থ ও কাম যে ধর্মবিরোধী হতে পারে না, সৎকাব্যমাধ্যমে রসের আবরণে সেই উপদেশদান হবে। নীরস, শুষ্ক উপদেশগুচ্ছ কখনো পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করতে পারে না। তাই কাব্যতাত্ত্বিকরা আর সকল প্রয়োজন অপেক্ষা রসাস্বাদনকে-ই কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনরূপে নির্দ্বিধায় অভিহিত করেছেন। কাব্যের উপদেশনা হবে কান্তাসম্মিত – প্রিয়া নারীর অনুরোধের মত। বেদ-ইতিহাসাদি গ্রন্থ থেকে-ও ন্যায়সঙ্গত জীবনচর্যার রূপরেখা পাওয়া যায়; কিন্তু তা নিতান্ত-ই নীরস, যা সহৃদয়ের রসজ্ঞ হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু সেই বস্তু-ই যখন কাব্যমাধ্যমে রসার্দ্রভাবে

আসে, তখন পাঠক সানন্দে সেই দেশনাকে তাঁর জীবনে বাস্তবায়িত করেন, যেমনভাবে রোগনিবৃত্তির জন্য কটুস্বাদ ঔষধের পরিবর্তে মিষ্ট ঔষধ সবার কাছে-ই অধিকতর প্রীতিপ্রদ হয়ে থাকে– 'কটুকৌষধোপশমনীয়স্য রোগস্য সিতশর্করোপশমনীয়ত্বে কস্য বা রোগিণঃ সিতশর্করাপ্রবৃত্তিঃ সাধীয়সী ন স্যাত্?' (সা.দ. প্রথম পরিচ্ছেদ)

দেখা গেল, মঙ্গলশ্লোকে কাব্যের প্রাথমিক এবং আত্যন্তিক প্রয়োজন রসাস্বাদনের বিষয়টি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র উল্লেখ করলেন না। নৈতিকতার কারণে কাব্যপাঠ – এই তাঁদের সিদ্ধান্ত। ডঃ. ত্রিবেদী তাই যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন – "The authors of ND seem to believe that literature should convey some moral. Thus they stand not for 'Art for Art's sake', but for 'Art for morality." [১৫]

'নাট্য'পদের ব্যুৎপত্তি ঃ

'নাট্য' পদটি 'নট্' (মতান্তরে 'নাট্') ধাতুর সঙ্গে 'ষ্যঞ্' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। 'নট্' ধাতুর অর্থ অবস্পন্দন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা। অন্তর অভিভূত হলে ভাবের উন্মেষ ঘটে, সেই উন্মেষে দেহ ও মন চঞ্চল হয়, বাক্যের স্ফুরণ ঘটে, অঙ্গবিক্ষেপ হয়। মানস চঞ্চলতার এই বাহ্যপ্রকাশকে-ই নাট্য বলা হয়।

মহর্ষি ভরত বলেছেন, স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা ললিতাত্মক নাট্যকলাকে সৃষ্টি করেছেন – 'এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা ললিতাত্মকম্' (না.শা. ১/১৮)। যে বস্তু অন্যত্র অপ্রকাশ, অসুন্দর, তাকে প্রকাশ ও সুন্দররূপে উপস্থাপিত করার নাম-ই নাট্য। আচার্য ভরতের মতে, ত্রিলোকের ভাবসমূহকে অনুকরণ করার নাম নাট্য – 'ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্' (না.শা. ১/১০৭)। আবার 'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যম্' (না.শা. ১/১১২)– এই কথার দ্বারা তিনি মানুষের প্রবৃত্তিসমূহের অনুকরণকে নাট্য নামে অভিহিত করেছেন। আচার্য সাগরনন্দী নাটকলক্ষণরত্নকোশে নাট্যের অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন –

"অবস্থা যা তু লোকস্য সুখদুঃখসমুদ্ভবা ।
তস্যাস্ত্বভিনয়ঃ প্রাজ্ঞৈর্নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥" (না.ল.র. পঞ্চম অধ্যায়)

–অর্থাৎ জাগতিক সুখদুঃখ থেকে সঞ্জাত মানুষের যে অবস্থা, তার-ই অভিনয় নাট্যপদবাচ্য। আচার্য ভরতের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণে দশরূপককার ধনঞ্জয় বলেছেন – 'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্'(দশ.রূ.১/৭)। অতএব দেখা যাচ্ছে, পূর্বাপর সকল নাট্যতাত্ত্বিকের মতে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা জীবন, জগৎ ও অবস্থার যথার্থ অনুকরণের নাম নাট্য। আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক- আহার্য – এই চর্তুবিধ অভিনয়ের

দ্বারা নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণ এই অনুকরণ করে থাকেন। 'অনুকরণ' কথাটির অর্থ হল – আচার-আচরণ, বেশভূষা, বাক্যবিন্যাসাদি দ্বারা কাব্যে বর্ণিত চরিত্রসমূহের প্রতিটি অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন, যার দ্বারা 'নট' অর্থাৎ অভিনেতাতে সেইসকল চরিত্রের তাদাত্ম্যবোধ জন্মায়। যেমন, নট এমনভাবে রামচন্দ্রের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ইত্যাদির অনুকরণ করবেন, যাতে সামাজিকের দৃষ্টিতে নট-ই রামচন্দ্ররূপে প্রতীত হবেন। দর্পণকারের ভাষায় – 'নটৈরঙ্গাদিভী রামযুধিষ্ঠিরাদীনামবস্থানুকরণমভিনয়ঃ' (সা.দ.ষষ্ঠ অধ্যায়)। নট এবং রামচন্দ্রের এই অভেদ প্রতিপত্তির নাম-ই অবস্থার যথার্থ অনুকৃতি এবং অবস্থার এই সার্থক অনুকৃতির নাম-ই 'নাট্য'।

নাট্যের আরেক নাম রূপ। কারণ, অনুকরণাত্মক নাট্য চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, নাট্যে তো শ্রব্য অংশ-ও থাকে; তবে নাট্যকে কেবলমাত্র দর্শনীয় রূপে স্বীকার করা হচ্ছে কেন? উত্তরে বলা যায়, নাট্যে শ্রব্য অংশের পরিবর্তে দৃশ্য বা অভিনেয় অংশের প্রাধান্য অনেক বেশি। 'প্রাধান্যেনৈব ব্যপদেশো ভবতি' এই নিয়মানুসারে প্রধানতঃ দর্শনযোগ্যতার জন্য-ই নাট্য 'রূপ' নামে অভিহিত।

নাট্যের অপর নাম 'রূপক'। রূপক কথাটির অর্থ হল, কোনো বস্তুতে অপর কোনো বস্তুর রূপ বা অবস্থার আরোপ – 'রূপারোপাত্তু রূপকম্' (সা.দ.৬/১)। রূপক অলঙ্কারে যেমন উপমেয় মুখাদিতে সাদৃশ্যবশতঃ উপমান চন্দ্রাদির আরোপ হয়, তেমনি নাট্যের ক্ষেত্রে নটে রামচন্দ্রাদি পাত্রের অবস্থা আরোপিত হয়, তাই নাট্য 'রূপক' নামে অভিহিত। এ কারণে-ই বলা হয়েছে –

"যথা মুখাদৌ পদ্মাদেরারোপো রূপকং মতম্।
তথৈব নায়কারোপো নটে রূপকমুচ্যতে ॥"

অতএব দেখা গেল, নাট্য, রূপ ও রূপক – তিনটি পারিভাষিক শব্দ সমার্থক। দশরূপকের টীকাকার ধনিকের মতে, দৃশ্যকাব্যের এই বিভিন্ন নামের মূলে আছে প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভিন্নতা। দৃশ্যকাব্যের বিভিন্ন নাম তার বিভিন্ন প্রবৃত্তিনিমিত্তের সূচনা করে অর্থাৎ এই জাতীয় রচনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে।

অতএব অনুকরণাত্মকতা, দৃশ্যমানতা এবং আরোপ্যমানতা– দৃশ্যকাব্যের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দৃশ্যকাব্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর রসোপজীব্যতা। রস-ই হল দৃশ্যকাব্যের প্রাণস্বরূপ। নাট্যের প্রাণভূত এই রস নট, নাট্যকার এবং প্রেক্ষক – এই তিনের চেতনা ও অনুভূতির অন্তরঙ্গতার সম্মেলনে যথাযথভাবে উৎপন্ন হয়। মোহিতলাল মজুমদার সম্ভবতঃ এই কারণে-ই নাট্যকে 'আর্টের ডিমোক্রেসি'রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

নাট্যের প্রকারভেদ ঃ

পূর্বে-ই বলা হয়েছে, অবস্থার অনুকরণ-ই হল অভিনয়। এই অভিনয় চার প্রকারের – আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য। মঞ্চে নট-নটীর অঙ্গ-সঞ্চালনাদি হল আঙ্গিক অভিনয়। নাটকের চরিত্রানুসারী বচনবিন্যাসকে বলা হয় বাচিক অভিনয়, যা একান্তভাবে নাট্যকারের রচনা। তৃতীয় প্রকার হল আহার্য অভিনয়। আহার্য শব্দের অর্থ আহরণীয়। বেশভূষা বা পোষাক-পরিচ্ছদাদির অনুকরণ-ই হল আহার্য অভিনয়। নাটকের চতুর্থপ্রকার অভিনয় হল সাত্ত্বিক। স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ ইত্যাদি হল সাত্ত্বিকভাব। সাত্ত্বিকভাবের যথাযথ অনুকরণ হল সাত্ত্বিক অভিনয়। এই চারপ্রকার অভিনয়ের মধ্যে আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় প্রধানভাবে নট-নটীর ব্যাপার, বাচিক অভিনয় কবি বা নাট্যকারের ব্যাপার এবং আহার্য অভিনয় রূপশিল্পীর ব্যাপার হলে-ও, পরিণামে এই চার প্রকার অভিনয়ব্যাপার-ই কিন্তু নট-নটীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

শ্রব্যকাব্যাদিতে-ও রস-ভাব-নায়ক-নায়িকাদি বিষয় বর্তমান থাকে। মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেক'-এ বলা হয়েছে –

''অনুভাববিভাবানাং বর্ণনা কাব্যমুচ্যতে।
তেষামেব প্রয়োগস্তু নাট্যং গীতাদিরঞ্জিতম্ ॥''

– এর-ই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – ''সামান্যেন উভয়মপি চ তৎ শাস্ত্রবদ্ বিধিনিষেধব্যুৎপত্তিফলম্ । কেবলং ব্যুৎপাদ্যজনজাড্যাজাড্যতারতম্যাপেক্ষয়া কাব্যনাট্যশাস্ত্ররূপো2য়ম্ উপায়ভেদঃ, ন ফলভেদঃ '' (ব্যক্তিবিবেক,প্রথম বিমর্শ)। এখানে কিন্তু কেবলমাত্র প্রত্যক্ষীভাবনযোগ্য নাটকাদি দৃশ্যকাব্যের কথা-ই আলোচিত হয়েছে– কথাদি শ্রব্যকাব্য নয়। এবং তা জানা যাচ্ছে 'অভিনেয়স্য' পদটির প্রয়োগের দ্বারা। টীকাতে আরো বলা হচ্ছে, এখানে কেবলমাত্র রসপ্রধান নাটকাদির বিষয়ে-ই আলোচনা করা হচ্ছে। রস যেখানে গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান সেইসকল দৃশ্যকাব্য, যথা– দুর্মিলিতা-শ্রীগদিত-ভাণী ইত্যাদির (অর্থাৎ উপরূপকের) কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে না। তাই অভিনয়ের বহুপ্রকার প্রভেদ কথিত হলে-ও, এখানে কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ দ্বাদশপ্রকারের অভিনেয় বস্তুর লক্ষণাদি নিরূপণ করা হবে।গ্রন্থকারদের অভিরুচি-ই এবিষয়ে প্রমাণ। টীকাতে বলা হচ্ছে – 'লক্ষণীয়বাহুল্যে2পি যাবত্যেব ভাগে লক্ষয়িতুঃ শ্রদ্ধা, তাবানেব লক্ষে'।[১৬] এই কারণে-ই কোহলাচার্যসম্মত সাটক ইত্যাদি নাট্যের অবান্তর ভেদগুলি এই গ্রন্থে পরিগণিত হয়নি।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নাট্যভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্যদর্পণকাররা তাঁদের স্বকীয়তার সাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা পূর্বসূরী সকল নাট্যতত্ত্বজ্ঞদের মতামত পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পূর্বসূরী যেখানে নাট্যের দশটি ভেদকে পরিগণনা করেছেন, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র সেখানে

দু'টি অতিরিক্ত ভেদ স্বীকার করে দ্বাদশপ্রকার রূপকের আলোচনা করছেন। এই দ্বাদশ প্রকার রূপক হল – ১. নাটক, ২. প্রকরণ, ৩. নাটিকা, ৪. প্রকরণী, ৫.ব্যায়োগ, ৬. সমবকার, ৭. ভাণ, ৮. প্রহসন, ৯.ডিম, ১০. অঙ্ক, ১১. ঈহামৃগ এবং ১২. বীথী –

"নাটকং প্রকরণং চ নাটিকা প্রকরণ্যথ।

ব্যায়োগঃ সমবকারঃ ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ ॥

অঙ্ক ঈহামৃগো বীথী চত্বারঃ সর্ববৃত্তয়ঃ।

ত্রিবৃত্তয়ঃ পরে ত্বষ্টৌ কৈশিকীপরিবর্জনাৎ ॥" (না.দ. ১/৩,৪)

কারিকাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, গ্রন্থকাররা এই বারোটি রূপভেদকে তিনটি ভিন্ন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করছেন। 'নাটকং প্রকরণং চ'– এই অংশে 'চ' পদটির দ্বারা উক্ত রূপকদ্বয়কে অন্যান্য ভেদগুলির থেকে পৃথক করা হচ্ছে। এই পার্থক্য অবশ্য-ই অধিকপ্রাধান্যজ্ঞাপক। এঁদের মতে, নাটক ও প্রকরণ যেহেতু মহাপুরুষের পুণ্যচরিত অবলম্বনে রচিত এবং এই দু'টি রূপক যেহেতু সকল প্রকার পুরুষার্থলাভের সহায়ক, এই দুটি কারণে-ই অন্যান্য রূপক অপেক্ষা এই দু'য়ের প্রাধান্য। টীকাতে বলা হচ্ছে – 'সর্বপুরুষার্থফলত্বেন মহাপুরুষোপদেশার্হচরিতত্বেন চ প্রবন্ধেষু নাটকপ্রকরণয়োঃ প্রাধান্যম্'।[১৭] 'নাটিকা প্রকরণ্যথ' – এই অংশে 'অথ' পদটির দ্বারা প্রথম চারপ্রকার রূপককে অবশিষ্ট আটটি রূপক থেকে পৃথক করা হয়েছে। প্রাগুক্ত চারপ্রকার রূপকের প্রতিটি পঞ্চসন্ধিসমন্বিত, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক এই দুই প্রকার অর্থোপক্ষেপকপ্রয়োগার্হ এবং মহান্ ব্যক্তিদের জীবনের উপর আধারিত – এই কারণত্রয় এগুলিকে অপরাপর রূপকগুলি থেকে পৃথক করেছে – 'অথশব্দো নাটকাদিচতুষ্টয়াদপূর্ণসন্ধিত্বেন বিষ্কম্ভকপ্রবেশকাযোগ্যত্বেনানুপদেশার্হচরিতপ্রায়ত্বেন চোত্তরেষাং পার্থক্যং জ্ঞাপয়তি'।[১৮]

নাট্যদর্পণকাররা বৃত্তিকে এই বর্গীকরণের অপর একটি হেতুরূপে উপন্যস্ত করেছেন। বৃত্তি হল নট-নটীগণের বেশভূষা, নৃত্য-বাদ্য-সঙ্গীতাদি পরিবেশনের এক বিশেষ প্রচেষ্টা বা প্রযত্ন, যার মাধ্যমে সমগ্র অভিনয় ব্যাপারটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। 'বর্ততে রসঃ অনয়া' – এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা বোঝা যায়, আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ চেষ্টার মাধ্যমে অভিনয় ব্যাপারের সামগ্রিক, সাবলীল, বহিরঙ্গ প্রকাশের দ্বারা রসের উজ্জীবন ঘটানো-ই বৃত্তির কাজ। এই বৃত্তি চার প্রকার – কৈশিকী, সাত্ত্বতী, আরভটী এবং ভারতী। এদের মধ্যে শেষোক্তটি শব্দবৃত্তি, অন্যগুলি অর্থবৃত্তি। রসভেদে বৃত্তির প্রয়োগভেদ ঘটে। এব্যাপারে সাধারণ নিয়মটি হল –

"শৃঙ্গারে কৈশিকী বীরে সাত্ত্বত্যারভটী পুনঃ।

রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী ॥"(সা.দ. ৬/১২২)

–অর্থাৎ, শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় কৈশিকী, বীররসের বর্ণনায় সাত্ত্বতী, রৌদ্র ও বীভৎস রসবর্ণনায় আরভটী এবং অন্য সকল রসের বর্ণনায় ভারতী নামক বৃত্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে । নাট্যদর্পণকারদের মতে, প্রথমোক্ত নাটকাদি চারপ্রকার রূপভেদে চতুর্বিধ বৃত্তির-ই প্রধান ও অপ্রধানভাবে সমাবেশ হবে। কিন্তু অপর আটপ্রকার রূপকে কৈশিকী ব্যতীত অপর তিনটি বৃত্তি প্রয়োজনানুসারে ব্যস্ত বা সমস্তভাবে প্রযুক্ত হবে। দ্বিতীয় বর্গের আটটি রূপকের মধ্যে ব্যায়োগ-সমবকার-ঈহামৃগ এবং ডিমের ক্ষেত্রে লক্ষণে নির্দিষ্ট কোনো বৃত্তির উল্লেখ না থাকায়, এই চারটিতে কবি বা নাট্যকার তিনটি বৃত্তির ইচ্ছানুসারী প্রয়োগ করবেন। অন্যদিকে ভাণ-প্রহসন-অঙ্ক-বীথী –এই চারটিতে লক্ষণে বৃত্তিনির্দেশ থাকায় লক্ষণোক্ত বৃত্তির প্রধানভাবে এবং অন্য বৃত্তিগুলির গৌণভাবে ব্যবহার করা যাবে। কৈশিকী বৃত্তির ব্যবহার শেষোক্ত আটটি রূপভেদে সর্বথা পরিহরণীয় – এই হল নাট্যদর্পণকারদের অভিমত।

সমবকারবিষয়ে টীকাতে বিশদে বলা হয়েছে, সমবকারে যদি-ও শৃঙ্গাররস থাকে, কিন্তু তৎসত্ত্বে-ও শৃঙ্গারোপযোগী বৃত্তি অর্থাৎ কৈশিকীর প্রয়োগ সমবকারে করা যাবে না। নাট্যদর্পণকারদ্বয়ের মতে, কামের প্রকাশমাত্রে-ই শৃঙ্গার স্ফুরিত হয় না; শৃঙ্গার হল বিলাসাদির বিশেষ উৎকর্ষ। 'শৃঙ্গার' শব্দে ব্যুৎপত্তি অন্বেষণ করলে-ও এটি-ই দেখা যাবে – 'শৃঙ্গং কামস্য পরাং কাষ্ঠাম্ ঋচ্ছতি ইতি শৃঙ্গারঃ' । সাহিত্যদর্পণে বলা হচ্ছে– 'শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদঃ' (সা.দ. ৩/১৮৩)।'লক্ষ্মী' টীকাতে-ও বলা হচ্ছে – 'শৃঙ্গমৃচ্ছতি কারণত্বেন প্রাপ্নোতীতি শৃঙ্গারপদব্যুৎপত্তিরবধেয়া'– অর্থাৎ কামের বিশেষ প্রকাশ যখন বিলাসাদির তুঙ্গ স্পর্শ করে, তখন তা শৃঙ্গারের বিষয়ীভূত হয়, তৎপূর্বে নয়। সমবকার নামক রূপভেদটি বীর বা রুদ্রপ্রকৃতির নায়ক ও প্রতিনায়কবিশিষ্ট হয় এবং এই প্রকারের নায়কদের পক্ষে বিলাসাদির উৎকর্ষের দ্বারা শৃঙ্গারের সুষ্ঠু উজ্জীবন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই টীকাতে বলা হচ্ছে –' ন খলু কামমাত্রং শৃঙ্গারঃ, কিন্তু বিলাসোৎকর্ষঃ; ন চাসৌ রৌদ্রপ্রকৃতীণাং নেতৃণাম্' ।[১৯]

বৃত্তিব্যবহারের উপর ভিত্তি করে দ্বাদশপ্রকার রূপকের এই বিভাগ সর্বজনসমর্থিত নয়। নাটক ও প্রকরণে চারপ্রকার বৃত্তি থাকতে পারে বলে নাট্যদর্পণকাররা মনে করেন। দশরূপকে এর সমর্থন থাকলে-ও, সাহিত্যদর্পণে কিন্তু বলা হচ্ছে, এ দু'টিতে আরভটী থাকবে না। নাট্যদর্পণ অনুসারে ভাণে কৈশিকী থাকবে না। সাহিত্যদর্পণ ও দশরূপক উভয়ত্র-ই বলা হচ্ছে, ভাণে প্রধানতঃ ভারতী বৃত্তি থাকলে-ও, অপ্রধানভাবে কৈশিকী ও সাত্ত্বতী থাকতে পারে। ব্যায়োগে কৈশিকী বাদে অপর তিনটি বৃত্তি থাকবে – রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের এই অভিমত বিশ্বনাথের দ্বারা সমর্থিত হলে-ও, ধনঞ্জয়ের মতে, এখানে ভারতীবৃত্তি থাকে না। সমবকারের বৃত্তিবিষয়ে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের মতামত পূর্বে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এঁরা দু'জন এবিষয়ে মহর্ষি ভরতের অনুগামী। কিন্তু সাহিত্যদর্পণে বলা

হয়েছে, সমবকারে প্রধানত ভারত্যাদি বৃত্তি থাকলে-ও, গৌণভাবে কৈশিকী-ও থাকতে পারে –'বৃত্তয়ো মন্দকৌশিক্যো...' (সা.দ. ৬/২৩৭)। দশরূপকে বলা হচ্ছে, সমবকারে প্রধানতঃ সাত্ত্বতীবৃত্তির সঙ্গে অপ্রধানভাবে কৈশিকীবৃত্তি থাকতে-ও পারে। বীথীর বৃত্তিবিধান বিষয়ে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের মত সাহিত্যদর্পণ ও দশরূপকের একেবারে বিরোধী। নাট্যদর্পণমতে বীথীতে কৈশিকীবৃত্তি থাকবে না। বিপরীতে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বীথীতে কৈশিকীর-ই প্রাধান্য স্বীকার করা হচ্ছে। অঙ্কের বৃত্তিবিষয়ে বিশেষ বৈমত্য নেই । সকলের-ই মতে, অঙ্ক প্রধানতঃ ভারতীবৃত্তিনির্ভর। ঈহামৃগবিষয়ে নাট্যদর্পণে কৈশিকী বাদে অপর তিনটি বৃত্তিপ্রয়োগের বিধান আছে। কিন্তু দশরূপকে ঈহামৃগে ভারতীবৃত্তির বিধান স্বীকৃত হয়নি। প্রহসনবিষয়ে আবার নাট্যদর্পণ ও দশরূপকের মতৈক্য বর্তমান। উভয়ের মতে, এর প্রধান বৃত্তি হল ভারতী। অন্যদিকে সাহিত্যদর্পণমতে, আরভটী ব্যতীত অন্য তিনপ্রকার বৃত্তি-ই প্রহসনে প্রয়োগযোগ্য।

বিহঙ্গদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, রূপকের সংখ্যাবিচারবিষয়ে নাট্যদর্পণকারদ্বয় যথেষ্ট নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মহর্ষি ভরত থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল নাট্যতত্ত্বজ্ঞরা যেখানে দশপ্রকার রূপকের কথা স্বীকার করছেন, সেখানে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নাটিকা ও প্রকরণী নামক দু'টি অতিরিক্ত রূপকের উল্লেখ করে তাঁদের চিন্তাধারার বিশিষ্টতার প্রমাণ রেখেছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় বুঝতে পারা যায় যে, রূপকের সংখ্যা যে কেবলমাত্র দশটি নয়, ততোধিক – এই তথ্যের প্রথম উদ্‌ঘোষক কিন্তু রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নন। মহর্ষি ভরত প্রধানতঃ দশপ্রকার রূপকের কথা স্বীকার করলে-ও, 'নাটিকা' নামক রূপকের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তার লক্ষণনির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, এটি হল একটি সঙ্কীর্ণ রূপক। একাধিক শুদ্ধ রূপকের লক্ষণ যে রূপকে বিদ্যমান থাকে, সেটি-ই হল সঙ্কীর্ণ রূপক। ভরতোক্ত দশটি রূপক হল শুদ্ধ এবং নাটিকা হল সঙ্কীর্ণ– এই ভিত্তিতে ধনঞ্জয় নাটিকাকে প্রধান রূপকগুলির তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে অবলোককার ধনিক নাটিকা এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকরণিকাকে-ও রূপকসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শৃঙ্গারপ্রকাশকার ভোজদেব দশরূপকসম্মত প্রধান দশপ্রকারের সঙ্গে 'নাটিকা' ও 'সট্টক' নামক রূপকদ্বয়কে স্বীকার করেছেন। আচার্য সোমেশ্বর আবার এই বারো প্রকারের সঙ্গে কোহলাচার্য-কথিত 'ত্রোটক'কে-ও স্বীকার করছেন। আচার্য হেমচন্দ্র ভোজদেবের মতকে সমর্থন করেছেন। রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র তাঁদের শ্রদ্ধেয় আচার্যর পদাঙ্ক অনুসরণে দ্বাদশপ্রকার রূপককে অঙ্গীকার করেছেন – এমন চিন্তা অসঙ্গত নয়। তাঁরা সট্টকের পরিবর্তে 'প্রকরণী'-কে রূপকের অবান্তর ভেদ বলে চিহ্নিত করেছেন– এইমাত্র প্রভেদ। সট্টককে তাঁরা নাট্যের অন্যান্য (অপেক্ষাকৃত অল্প প্রাধান্যযুক্ত) বিভাগের মধ্যে প্রথমে স্থান দিয়েছেন। কারিকাতে এর উল্লেখ নেই, এর বিবরণ আছে বৃত্তিতে। নাট্যদর্পণে সট্টককে অধিক গুরুত্ব না দেওয়ার কতগুলি কারণ

উপন্যস্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, সট্টক আদ্যন্ত প্রাকৃত রচনা। অতএব প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকাদির সঙ্গে একে এক বর্গে রাখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, নাটিকার সঙ্গে সট্টকের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য খুব বেশী নয়। তাই সট্টককে পৃথক রূপকরূপে স্বীকার করে একটি অপ্রয়োজনীয় ভেদসৃষ্টি করা সমীচীন নয়। তৃতীয়তঃ, সট্টকের রূপকত্ব স্বীকার করেছেন আচার্য কোহল; নাট্যশাস্ত্রকার মহর্ষি ভরত সট্টককে প্রধান রূপকসমূহের অন্তর্গত বলে স্বীকার করেননি। নাট্যদর্পণকাররা যেহেতু প্রধানতঃ মহর্ষি ভরতকে-ই অনুসরণ করেছেন, তাই তাঁরা-ও সট্টককে প্রধান রূপকবর্গের অন্তর্গত করে এটির লক্ষণনির্ণয় করেননি।

নাটকলক্ষণ ঃ

নাট্যদর্পণমতে অবস্পন্দনার্থক 'নাট্' ধাতুর সঙ্গে 'ণ্বুল্'প্রত্যয়যোগে নাটকপদটি নিষ্পন্ন। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'নাটকমিতি নাটয়তি বিচিত্রং রঞ্জনাপ্রবেশেন সভ্যানাং হৃদয়ং নর্তয়তীতি নাটকম্'।[২০] দ্বাদশপ্রকার রূপকের মধ্যে নাট্যদর্পণকাররা প্রথমে-ই নাটকের লক্ষণনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন। নাটকের মধ্যে সর্বপ্রকার পুরুষার্থলাভের উপায় নিহিত থাকে এবং রাজাদের অভ্যুদয়ের বর্ণনা থাকে – এই দুটি কারণে নাটক-ই রূপকসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। টীকাতে বলা হচ্ছে – 'অভিনেয়সমুদায়াত্ প্রধানপুরুষার্থপ্রবৃত্তবিনেয়রাজাদিব্যুৎপাদনগুণেন নাটকং নির্ধার্যতে'।[২১] দশরূপককার-ও রূপকলক্ষণনির্ণয়াবসরে প্রথমে নাটকলক্ষণনির্ণয় করছেন। তবে তাঁর যুক্তি অন্য – নাটক হল বিবিধ রসের আধার এবং বিভিন্ন প্রকার নাটকীয় কৌশল, যেমন – সন্ধি, অর্থপ্রকৃতি, অবস্থা ইত্যাদি – এসব-ই নাটকে বিদ্যমান থাকে। এটি-ই অন্যান্য রূপক অপেক্ষা নাটকের গুরুত্বের কারণ বলে ধনঞ্জয়ের অভিমত।

যাই হোক্, আমরা নাট্যদর্পণের নাটকলক্ষণে ফিরে আসি। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কারিকাটি হল–

"খ্যাতাদ্যরাজচরিতং ধর্মকামার্থসৎফলম্ ।
সাঙ্কোপায়-দশা-সন্ধি দিব্যাঙ্গং তত্র নাটকম্ ॥" (না.দ. ১/৫)

কারিকা সংখ্যায় মাত্র একটি। টীকাতে এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে; সেই আলোতে-ই আমরা উদ্ধৃত কারিকাটির আলোচনা করব।

প্রথমে-ই আসছে নাটকের কাহিনী, যা হবে প্রখ্যাত এবং অতীত রাজার চরিত্রের উপর নির্মিত। এই খ্যাতত্ব তিনভাবে হতে পারে– নাম, দেশ অথবা কার্যকলাপের দ্বারা। নাম ও কার্যাদির দ্বারা খ্যাতি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন– 'হরিশ্চন্দ্রচরিতম্',

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্','বেণীসংহারম্' ইত্যাদি । বিশেষ হল দেশের দ্বারা খ্যাতির বিষয়টি। এর উদাহরণে রাজা উদয়নের উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি বৎসদেশের রাজা হওয়া সত্ত্বে-ও, বাসবদত্তালাভরূপ ঘটনাটি যেহেতু কৌশাম্বীতে সংঘটিত হয় এবং উদয়নের চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ যেহেতু কৌশাম্বীতে সংঘটিত ব্যাপারপরম্পরার দ্বারা-ই ঘটে, তাই উদয়নের যশ বিস্তৃত হয়েছে কৌশাম্বীরাজ্যকে কেন্দ্র করে – এমন বলা অনুচিত নয়। উল্লেখ্য, উদাহরণটি সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে গৃহীত।

'আদ্য' শব্দের দ্বারা বর্তমান রাজাদের কীর্তিবর্ণনের নিরাস করা হচ্ছে। বর্তমান রাজাদের অতীত কীর্তির বিবরণ থাকে না এবং অতীতের মহারাজদের পরিবর্তে বর্তমান রাজাদের চরিতবর্ণনা পূর্বরাজাদের অবমাননা-ও বটে। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ রাজাদের কীর্তি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয় বলে, তা কখনো-ই নাটকের ইতিবৃত্ত হতে পারে না। 'চর্যতে স্মেতি চরিতম্'– 'চরিত' শব্দটির এই ব্যুৎপত্তি-ও নাটকীয় কাহিনীর অতীতির দিকে-ই নির্দেশ করে। সাহিত্যদর্পণ, দশরূপকাদি গ্রন্থে-ও রামায়ণাদি-প্রসিদ্ধ বিখ্যাত বৃত্তকে-ই নাটকের কাহিনীরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অল্প কথায়, প্রধানতঃ পূর্বরাজাদের আচরিত কার্যকলাপ-ই নাটকীয় ঘটনারূপে লিপিবদ্ধ হবে; তবে সামান্য কিছু কবিকল্পনার অবকাশ রাখা যাবে না– এমন-ও নয়।

দশরূপকে নাট্যকাহিনীর একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হচ্ছে – কাহিনী হবে 'আধিকারিক'। দশরূপকের প্রথম প্রকাশে আধিকারিকের লক্ষণ এভাবে নিরূপিত হচ্ছে –

"অধিকারঃ ফলস্বাম্যমধিকারী চ তৎপ্রভুঃ।
তন্নির্বৃত্তমভিব্যাপি বৃত্তং স্যাদাধিকারিকম্ ॥" (দশ.রূ. ১/১২)

– ফলের স্বামিত্বকে বলা হয় অধিকার এবং যিনি তাতে (অর্থাৎ সেই ফলস্বামিত্বে) প্রভু (অর্থাৎ ফললাভে সমর্থ), তিনি হলেন অধিকারী। অধিকারী কর্তৃক নিষ্পাদ্য, আফলোদয় নির্বাহিত বৃত্তকে-ই আধিকারিক বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হচ্ছে – 'কারণাৎ ফলযোগস্য বৃত্তং স্যাদাধিকারিকম্' (না.শা. ১৯/৪)।

'রাজচরিতম্'– রাজার চরিতকথা বলতে এখানে সাধারণভাবে ক্ষত্রিয়মাত্রের-ই কথা বলা হয়েছে, কেবলমাত্র রাজ্যাভিষিক্ত রাজাদের কথা নয়। অন্যথা শ্রীরাম-জীমূতবাহন-পার্থ প্রমুখ অনভিষিক্তদের কীর্তিকলাপ নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারত না।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ অবধান দিতে হবে। নাট্যদর্পণমতে এই ক্ষত্রিয় রাজা সর্বদা 'মর্ত্য' অর্থাৎ মানুষ হবেন। নাটকের নায়ক কখনো-ই দিব্য হতে পারবেন না। এর কারণরূপে বলা হচ্ছে – নাটকাদির মধ্যে সঠিক জীবনচর্যার উপদেশ থাকে; কিন্তু দেবতাদের পক্ষে যে কোনো

দুরূহ বিষয়ের-ই ইচ্ছামাত্র সম্পাদনসিদ্ধি থাকায়, ফললাভের জন্য তাঁদের কোনো প্রয়াস করার প্রয়োজন-ই হয় না। এই কারণে-ই দিব্য চরিত্রের কীর্তিকলাপ নাটকীয় ঘটনারূপে উপস্থাপিত হতে পারে না – এই হল রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের অভিমত – 'দেবতানাং তু দুরুপপাদস্যাপ্যর্থস্যেচ্ছামাত্রত এব সিদ্ধিরিতি তচ্চরিতমশক্যানুষ্ঠানত্বাৎ ন মর্ত্যানামুপদেশযোগ্যম্'।[22] ব্যতিক্রম কেবলমাত্র দীপ্তরসাত্মক সমবকার নামক রূপক। এখানে উপদেশনীয় কিছু থাকে না বলে, নেতা দিব্য হতে-ও পারেন; তবে এখানে-ও মর্ত্য ক্ষত্রিয় নায়কের উপস্থিতি-ই অধিকতর বাঞ্ছিত। আবার অন্যত্র বলা হচ্ছে যে, উত্তম প্রকৃতির কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো দেবতা, পতাকানায়ক বা প্রকরীনায়ক রূপে প্রধান ক্ষত্রিয়নায়কের সহায়কের ভূমিকায় থাকতে পারেন। এর দ্বারা প্রকৃত ভক্তের সাহায্যার্থে দেবতারা যে মর্তে অবতীর্ণ হন, দর্শক-পাঠক একথা বুঝতে পারেন। উদাহরণরূপে বলা যেতে পারে – (দেবতাসহায়)'নাগানন্দ' নাটকে গৌরী, (উত্তম ব্যক্তিসহায়)রামপ্রবন্ধগুলিতে সুগ্রীবাদি।

অতএব দেখা গেল, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মর্ত্য কোনো ক্ষত্রিয় নায়ক হবেন । এব্যাপারে অন্যান্য নাট্যতাত্ত্বিকরা স্পষ্টতঃ-ই ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, সর্বোপরি নাট্যশাস্ত্রে নাটকীয় নায়কের দিব্যত্বকে এবং ধীরোদাত্তত্বকে সমর্থন করা হয়েছে, যার উল্লেখ আমরা নাট্যদর্পণে পাই না। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে –

"প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কম্ ।

রাজর্ষিবংশচরিতং তথা দিব্যাশ্রয়াস্থিতম্ ॥"(না.শা. ১৮/১০)

সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে –

"প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।

দিব্যো2থ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ ॥"(সা.দ. ৬/৯)

– অর্থাৎ নাটকের নায়ক হবেন প্রখ্যাতবংশজ, প্রতাপশালী, ধীরোদাত্ত কোনো রাজর্ষি অথবা দিব্য বা দিব্যাদিব্য কোনো ব্যক্তি। সাহিত্যদর্পণে 'দিব্যাদিব্য' পদটির ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, যিনি দিব্য হলে-ও নিজেকে মানুষ বলে মনে করেন, তিনি দিব্যাদিব্য। এই পদের ব্যাখ্যায় 'লক্ষ্মী' টীকায় বলা হচ্ছে –'মানুষ্যাং দেবেনোৎপাদিতো দিব্যাদিব্যো যথা যুধিষ্ঠিরাদিঃ' – মানুষীর গর্ভে দেবতার দ্বারা উৎপাদিত সন্তান হলেন দিব্যাদিব্য, যার উদাহরণ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব। মহর্ষি ভরত-ও সম্ভবতঃ 'দিব্যাশ্রয়াস্থিতম্' পদটির দ্বারা এই অর্থটি-ই গ্রহণ করেছেন। দশরূপকে অবশ্য কেবলমাত্র রাজর্ষি ও দিব্য ব্যক্তির কথা-ই স্বীকার করা হচ্ছে, দিব্যাদিব্য নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল নায়কের ধীরোদাত্তত্ব। আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাবান্, অতিগম্ভীর, মহাসত্ত্ব, ধীরপ্রকৃতি, বিনয়াচ্ছন্ন গর্ব ও দৃঢ়ব্রত নায়ক-ই হলেন ধীরোদাত্ত নায়ক। নায়কভেদবিষয়ে এ ব্যাপারে

বিশদ আলোচনা করা হবে। নাট্যতত্ত্বের যাবতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থে নাটকীয় নায়কের ধীরোদাত্তত্ব সমর্থন করা হয়েছে, ব্যতিক্রম নাট্যদর্পণ। এই গ্রন্থের নায়কভেদবিষয়ক আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, নাটকের নায়ক ধীরোদ্ধতাদি অন্য তিন প্রকারের-ও হতে পারে। যথা – 'বেণীসংহার'-এর নায়ক ভীমসেন ধীরোদ্ধত, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর নায়ক উদয়ন ধীরললিত, 'মহাবীরচরিতম্'-এর নায়ক শ্রীরামচন্দ্র ধীরপ্রশান্ত ইত্যাদি।

নাটকের নায়িকা সম্পর্কে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে যে, নায়িকা মানুষী হতে পারেন, দিব্য হতে-ও বাধা নেই। কারণ, নায়িকাচরিত্রের সর্বদা-ই নায়কচরিত্রে অন্তর্ভাব ঘটায় নাটকাদিতে নায়িকার স্থান গৌণ, নায়ক-ই প্রধান। লক্ষণীয় যে, নাট্যতত্ত্বের অধিকাংশ গ্রন্থ যেখানে নাটকের নায়িকার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নীরব, নাট্যদর্পণে সেখানে সামান্য হলে-ও কিছু অন্ততঃ বলা হয়েছে ।

নাটক হবে অঙ্ক, দশা বা অবস্থা , উপায় বা অর্থপ্রকৃতি, সন্ধি ইত্যাদি যুক্ত –'সাঙ্কোপায়-দশা-সন্ধি ....' (না.দ. ১/৫)। অর্থোপক্ষেপক-ও এই তালিকার অন্তর্গত, যদি-ও কারিকায় এর উল্লেখ নেই। এই বিষয়ে টীকায় কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি,যথাস্থানে প্রতিটি বিষয়ের বিশদ আলোচনা রয়েছে।

অঙ্কসংখ্যা বিষয়ে এখানে কিছু বলা না হলে-ও, পরে অঙ্কলক্ষণবিচারের সময় বলা হচ্ছে, যেকোনো নাটকে ন্যূনপক্ষে পাঁচটি এবং সর্বাধিক দশটি অঙ্ক থাকবে। নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে এ বিষয়ে এক-ই কথা বলা হচ্ছে। অবস্থা, অর্থপ্রকৃতি, অর্থোপক্ষেপক, সন্ধি – এগুলির প্রতিটির পাঁচটি করে প্রকার এবং চৌষট্টি প্রকার সন্ধ্যঙ্গ নাটকে সন্নিবেশিত হবে।

নাট্যদর্পণমতে নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, নাটক হবে 'ধর্মকামার্থসৎফলম্' – ধর্ম, কাম এবং অর্থরূপ ফলপ্রদায়ী। এই তিনটি ব্যস্ত বা সমস্ত ভাবে নাটকের প্রধান ফলরূপে বিবেচিত হবে।'মোক্ষ' নামক চতুর্থ ফলটি ধর্ম থেকে-ই সম্ভূত বলে, এটি গৌণফলরূপে বিবেচিত। আগমাদি থেকে-ও পরিণামে চতুর্বর্গলাভ হয়, কিন্তু তা ভবিষ্যৎকালিক । নাটক পাঠ বা দর্শনে সদ্যঃ ধর্মাদিরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে – এই হল ফলপ্রদায়িত্ববিষয়ে আগম ও নাটকের প্রভেদ। এই ধর্মফল আবার দুই প্রকার – ১. দৃষ্টফল – দয়া, দম, দান, ন্যায় ইত্যাদি এবং ২. আমুষ্মিক বা পারত্রিক ফল – রাজ্যাদি ইষ্টলাভে রাজার সাফল্য । সকল প্রকার ভোগসুখ পরিত্যাগপূর্বক কৃচ্ছ্রসাধন বা ব্রতাচরণকে এখানে আমুষ্মিক ফল বলা হচ্ছে না; ক্ষত্রিয় রাজার উপযোগী রাজ্যবিজয়াদি-ই এখানে পারত্রিক ফল রূপে বিবেচিত হচ্ছে। দিব্যা বা কুলজা স্ত্রীসম্ভোগ, সঙ্গীত-বাদ্য, উপবনবিহার ইত্যাদি হল কামফল। শত্রুধ্বংস, সন্ধি-বিগ্রহাদি রাজ্যপরিচালনপদ্ধতির চিন্তন ও তার সাফল্য হল অর্থফল।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় অবশ্য-ই আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নাটক তথা কাব্যাদির প্রয়োজন তথা প্রাথমিক লক্ষণ হল রসোদ্বোধ। এখানে কিন্তু সেই রসসৃষ্টির বিষয়টি একেবারে অস্পৃষ্ট। এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক নমস্কারশ্লোকের মত এখানে-ও 'Art for Morality'- র-ই উদ্ঘোষণা, 'Art for art's sake'-এর নয়। নাটকাদি থেকে পাঠক বা দর্শকচিত্তে রসের জাগৃতি না হলে, তা কখনো-ই সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ সর্বত্র তাই বলা হচ্ছে, নানারসনিরন্তর নাটকে বিবিধ রসের বিচিত্র বিলাস অবশ্যকরণীয় । তবে-ই সেই নাটক উপদেশদানের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখার্ত, শ্রমার্ত, শোকার্ত এমন কি তপস্বীদের-ও পরমানন্দলাভের উপায় হয়ে উঠতে পারে, অন্যথায় নয়। বস্ত্বলঙ্কারাদির আবরণে রস যেন কখনো-ই তিরোভূত না হয়। বিভাবানুভাবব্যভিচারিভাবের সংযোগে দর্শকমানসে রসোৎপত্তি-ই হল নাটকের মূল প্রয়োজন। সাহিত্যদর্পণ এবং দশরূপকে নাটকে রসের ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ-ও রয়েছে। বলা হচ্ছে, নাটকের অঙ্গীরস হবে বীর অথবা শৃঙ্গার; অন্যান্য রসগুলি অঙ্গরসরূপে এগুলির সহায়ক হবে এবং নির্বহণসন্ধি অর্থাৎ নাটকের অন্তিম অংশে অদ্ভুতরসের প্রবর্তন করতে হবে। শিঙ্গভূপাল তাঁর 'রসার্ণবসুধাকর' গ্রন্থে বলছেন– 'শৃঙ্গারবীরান্যতরপ্রধানরসসংশ্রয়ঃ' (রসার্ণবসুধাকর, তৃতীয় বিলাস)। 'অন্যতর' পদটির দ্বারা এখানে শান্তরসের গ্রহণ হয়েছে। অর্থাৎ নাটকে স্বীকৃত অঙ্গীরসের সংখ্যা হল তিনটি – বীর, শৃঙ্গার ও শান্ত। ক্রমিক উদাহরণ – 'বেণীসংহারম্', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্'।

নাট্যশাস্ত্রাদিতে নাটকের কিছু অতিরিক্ত লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে, নাটকের নায়ক হবেন বিলাস, ঋদ্ধি ইত্যাদি গুণযুক্ত এবং নানাবিধ বিভূতিসংযুত – 'নানাবিভূতিসমৃদ্ধিবিলাসাদিগুণৈর্যুতম্' (না.শা.১৮/১১)। সাহিত্যদর্পণে-ও 'বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবদ্‌যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ' (সা.দ. ৬/৭)– ইত্যাদি অংশে এক-ই কথা বলা হচ্ছে। বিলাস হল নায়কের গুণবিশেষ। 'ধীরা দৃষ্টির্গতিশ্চিত্রা বিলাসে সস্মিতং বচঃ' ইত্যাদি হল বিলাসের লক্ষণ। ঋদ্ধি অর্থাৎ অভ্যুদয়। আদিপদের দ্বারা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্যাদির গ্রহণ হচ্ছে। 'গুণবদ্' পদের দ্বারা শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, ওজঃ, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, কান্তি ও সমাধি – এই দশপ্রকার শব্দগুণ এবং অর্থগুণকে বোঝানো হয়। নাটকে এইসব গুণগুলির সন্নিবেশ অবশ্যকর্তব্য। সাহিত্যদর্পণে বলা হচ্ছে, নাটকে নায়কের কার্যসাধনে যত্নবান্ কিছু পাত্রপাত্রী থাকবে, যাদের সংখ্যা হবে চার বা পাঁচ। আরো বলা হচ্ছে, নাটকের বন্ধন হবে গোপুচ্ছাগ্রের ন্যায়; গরুর লেজের কেশরাজির ন্যায় নাটকের অঙ্কগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হবে অথবা মতান্তরে গরুর লেজের কেশগুচ্ছের কোনো-কোনো কেশ যেমন ছোট,

আবার কোনোটি বড় হয়, তেমনি নাটকের কোনো ঘটনা শুরু হয়ে মুখসন্ধিতে, কোনোটি বিস্তৃততর হয়ে প্রতিমুখসন্ধিতে, কোনোটি আবার আরো প্রসারিত হয়ে অন্যান্য সন্ধিগুলিতে সমাপ্ত হবে।

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে নাটকের অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সূত্রধার পূর্বরঙ্গসমাপনান্তে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর 'তদ্বদপরঃ' কোনো ব্যক্তি কাব্যারম্ভ করবেন। অবলোকটীকায় এই অপর ব্যক্তিকে স্থাপক বলা হচ্ছে – 'স চ কাব্যার্থস্থাপনাৎ সূচনাৎ স্থাপকঃ'(দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ)। এই স্থাপক দিব্য, মর্ত্য অথবা মিশ্রভাবে নাট্যকথার সূচনা করবেন। এই সূচনা তিনভাবে সম্ভব – বস্তুনির্দেশের দ্বারা – যথা উদাত্তরাঘবে, বীজনির্দেশের দ্বারা – যথা রত্নাবলীতে এবং পাত্রনির্দেশের দ্বারা – যথা অভিজ্ঞানশকুন্তলমে । এরপর ঋতুবিশেষকে আশ্রয় করে কাব্যার্থানুগত মধুর শ্লোকাদির দ্বারা সভাস্থ গুণীজনের চিত্তবিনোদন করতে হবে। এই প্রসাদনব্যাপারে স্থাপক সংস্কৃতপ্রায় ভারতীবৃত্তির আশ্রয় নেবেন। এই ভাবে নাট্যবস্তুর প্রশংসাপূর্বক নাট্যব্যাপারের প্রতি দর্শকচিত্তের আকর্ষণ উৎপাদন করতে হবে।

নাটকের সূচনা হবে প্রস্তাবনার দ্বারা। দশরূপককারের মতে, প্রস্তাবনার তিনপ্রকার ভেদ– প্রয়োগাতিশয়, কথোদ্‌ঘাত এবং প্রবৃত্তক। অপরাপর সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ প্রস্তাবনার পঞ্চবিধত্ব সমর্থন করেছেন। অতিরিক্ত ভেদ দুটি হল – উদ্‌ঘাত্যক এবং অবলগিত। নাটকে থাকবে ত্রয়োদশ প্রকার বীথ্যঙ্গ । নায়কের বা রসের পক্ষে অনুচিত কোনো বিষয় নাটকে সন্নিবিষ্ট হবে না। উদাহরণস্বরূপ – শ্রীরামচন্দ্রের ছলপূর্বক বালিবধের ঘটনাটি মহাবীরচরিতে সন্নিবিষ্ট করা হয়নি; তৎপরিবর্তে রাবণসুহৃদ্ বালী রামচন্দ্রকে বধ করতে এসে রামের দ্বারা নিহত হন –এইরূপে কাহিনীবিন্যাস করা হচ্ছে।

নাটকে বীজাদি পাঁচপ্রকার অর্থপ্রকৃতি, বিষ্কম্ভকাদি পাঁচ প্রকার অর্থোপক্ষেপক ইত্যাদি বিভাগ থাকবে। চৌষট্টি প্রকার অঙ্গসহ মুখাদি পাঁচপ্রকার সন্ধির যথাযথ বিন্যাস করতে হবে। পতাকাবৃত্ত অনুরূপভাবে বিন্যস্ত হবে; তার অনুসন্ধি এক-আধটি কম হতে পারে। প্রকরী সন্ধিহীন ভাবে বিন্যস্ত হবে।

নাটকের আদ্যংশে কার্যযুক্তি অনুসারে বিষ্কম্ভক সন্নিবেশিত করতে হবে। বস্তুবিস্তারে নাট্যমধ্যে নীরস বিষয় পরিত্যাগ করে নাট্যকার যদি তাকে প্রদর্শিত করতে চান, তবে তাঁকে বিষ্কম্ভক রচনা করতে হবে। যদি কোনো সরস বস্তু মূল থেকে-ই প্রবর্তিত হয়, তবে আমুখকে অনুসরণ করে আদিতে একটি অঙ্ক সন্নিবিষ্ট করতে হবে। দশরূপকে বলা হচ্ছে –

"যদা তু সরসং বস্তু মূলাদেব প্রবর্ততে।
আদাবেব তদাঙ্কঃ স্যাদামুখাক্ষেপসংশ্রয়ঃ ॥" (দশ.রূ. ৩/২৯)

নায়কের প্রকারভেদ ঃ

নাট্যদর্পণে নায়কের চতুর্বিধত্বের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু নায়কের সামান্যলক্ষণবিষয়ে বিশেষ কিছু নির্দেশ করা হয়নি। তাই অপরাপর গ্রন্থ থেকে নায়কলক্ষণ বিষয়ে কিছু তথ্যসংগ্রহ করে নিয়ে নায়কভেদ বিষয়ে প্রবেশ করা-ই সমীচীন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে –

"ব্যসনী প্রাপ্তদুঃখো বা যুজ্যতে2ভ্যুদয়েন যঃ।

তথা পুরুষবাহুল্যে প্রধানো নায়কঃ স্মৃতঃ ॥

যত্রানেকস্য ভবতো ব্যসনাভ্যুদয়ৌ পুনঃ।

প্রকৃষ্টৌ যস্য তৌ স্যাতাং স ভবেৎ তত্র নায়কঃ ॥" (না.শা. ২৪/২১,২২)

– নাট্যে বহু পুরুষচরিত্রের ক্ষেত্রে যে দুর্ভাগ্যহত বা বিপন্ন ব্যক্তি অবশেষে উন্নতি লাভ করেন, তিনি-ই নায়ক, তিনি-ই প্রধান। যখন এরূপ একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তখন যাঁর উন্নতি প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাঁকে-ই নায়ক বলা হয়।

দশরূপকে আবার বিশেষ কতগুলি গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে নায়ক বলা হয়েছে–

"নেতা বিনীতো মধুরস্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।

রক্তলোকঃ শুচির্বাগ্মী রূঢ়বংশঃ স্থিরো যুবা ॥

বুদ্ধ্যুৎসাহস্মৃতিপ্রজ্ঞাকলামানসমন্বিতঃ ।

শূরো দৃঢ়শ্চ তেজস্বী শাস্ত্রচক্ষুশ্চ ধার্মিকঃ ॥ " (দশ.রূ. ২/১,২)

– অবলোক অনুসরণে এর অর্থ অনুধাবন করলে আমরা জানতে পারবো, নায়ক হবেন বিনয়গুণসম্পন্ন, প্রিয়দর্শন, সর্বস্বদায়ক , ক্ষিপ্রকারী, প্রিয়ভাষী, সর্বজনপ্রিয়, বাহ্যাভ্যন্তরশুচি, বাগ্মী, উচ্চকুলসম্ভূত, ধীরস্বভাব, বুদ্ধিপ্রজ্ঞাদিবিশিষ্ট, কলাজ্ঞানী, বীর, দৃঢ়চেতা, তেজস্বী, শাস্ত্রবিদ্, ধার্মিক ও যুবা।

সাহিত্যদর্পণে নায়কের সামান্যলক্ষণে দশরূপকোক্ত গুণগুলির অধিকাংশ-ই সমর্থিত হয়েছে–

"ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকঃ রূপযৌবনোৎসাহী।

দক্ষো2নুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা ॥" (সা.দ. ৩/৩৬)

– ত্যাগী, কর্মকুশল, কুলীন, বুদ্ধিমান, রূপবান্, তরুণ , লোকপ্রিয়, তেজ-বৈদগ্ধ্য-চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে নায়ক বলা হবে। নাটকরক্ষণরত্নকোশে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে, বীজ-বিন্দ্বাদিসম্বলিত নাটকের নাট্যকে (অর্থাৎ অভিনয়কে) যিনি সমাপ্তিতে নিয়ে যান, তিনি-ই নায়ক – 'বীজবিন্দ্বাদিসংবলিতস্য নাটকস্য নাট্যমন্তং নয়তীতি নায়কঃ' (না.ল.র. পঞ্চম অধ্যায়) ।

নাট্যদর্পণে নায়কের একমাত্র আবশ্যিক গুণরূপে ধৈর্য অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির স্থৈর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা নায়কের সর্বপ্রকার ভেদের-ই অনুগত। অর্থাৎ নাট্যদর্পণমতে, মহাব্যসনে-ও অকাতরত্ব-ই নায়কের সামান্যলক্ষণ। এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়– অন্যান্য গ্রন্থে উত্তম-মধ্যম-অধমভেদে নায়কের ত্রিধা বিভাগ করা হলে-ও, নাট্যদর্পণকারদ্বয় নায়ককে উত্তম ও মধ্যম – এই দু'টি প্রকারে বিভক্ত করছেন। এঁদের মতে, বিবিধ অসাধারণ গুণের অধিকারী ধীরোদ্ধতাদি নায়কদের অধমপাত্ররূপে বর্ণন অনুচিত; উত্তম ও মধ্যম পাত্ররূপে এঁদের বর্ণনা-ই সমীচীন। তাই টীকায় বলা হচ্ছে– 'যদ্যপি স্বস্থানে সর্বমপি উত্তমমধ্যমাধমভেদেন ত্রিধা, তথাপি ধীরোদ্ধতাদয়ঃ স্বভাবাঃ উত্তমমধ্যমভেদেনৈব বর্ণনীয়াঃ '।[২৩]

অনন্তর নায়কের প্রকারভেদ। নায়ক চতুর্বিধ – ধীরোদ্ধত, ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরললিত। এই মত নির্দ্বিধায় সর্বসম্মত। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা যাক্, নাট্যশাস্ত্রে ধীরোদ্ধতাদি চতুর্বিধ নায়কের পৃথক লক্ষণ নির্ণীত হয়নি। কেবল কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি কোন্ প্রকৃতির নায়ক হতে পারেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে। নাট্যদর্পণে এবিষয়ে বলা হচ্ছে, দেবতারা ধীরোদ্ধত, সেনাপতি ও অমাত্যগণ ধীরোদাত্ত, বণিক্ ও বিপ্রগণ ধীরশান্ত প্রকৃতির নায়করূপে বর্ণিত হন। রাজগণ ধীরোদ্ধতাদি চারপ্রকারের-ই হতে পারেন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে, রাজগণ ধীরললিত প্রকৃতির নায়ক হবেন – 'স্যুর্ধীরললিতাঃ নৃপাঃ' (না.শা.২৪/১৮)। এই বিষয়ে নাট্যদর্পণকারদ্বয় স্পষ্টতঃ-ই নাট্যশাস্ত্রের বিরোধিতা করছেন। বাস্তবিক-ই, মহর্ষি ভরতের এই মতটি কিছু বিচারের অবকাশ রাখে। একদিকে নাটকলক্ষণরচনার সময় তিনি বলছেন, নাটকের ইতিবৃত্ত কোনো রাজর্ষিকে নিয়ে রচিত হলে, সেই রাজা অবশ্য-ই ধীরোদাত্ত প্রকৃতির হবেন। আবার নায়কভেদবিষয়ে এসে তিনি বলছেন, রাজগণ হবেন ধীরললিত প্রকৃতির। উভয় বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধ স্পষ্ট। এর সমাধানকল্পে-ই রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র বলছেন, রাজগণ চার প্রকারের-ই পাত্র হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভীমসেন ধীরোদ্ধত প্রকৃতির রাজা, যিনি 'মধ্যমব্যায়োগ'-এর নায়ক, ধীরললিত প্রকৃতির রাজা উদয়ন 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর নায়ক, 'মহাবীরচরিত'-এর নায়ক রামচন্দ্র ধীরপ্রশান্তপ্রকৃতির এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর দুষ্যন্তাদি ধীরোদাত্ত প্রকৃতির।

নাট্যশাস্ত্রসম্মত অপর একটি বিষয়-ও যথার্থ নয় বলে মনে হয়। বলা হচ্ছে, সেনাপতি ও মন্ত্রীরা হবেন ধীরোদাত্ত প্রকৃতির – 'সেনাপতিরমাত্যশ্চ ধীরোদাত্তৌ প্রকীর্তিতৌ' (না.শা. ২৪/১৮)। আবার বলা হচ্ছে, ব্রাহ্মণ ও বণিক্‌রা হবেন ধীরশান্ত প্রকৃতির – 'ধীরপ্রশান্তা বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণা বণিজস্ত থা' (না.শা.২৪/১৯)। কিন্তু সেনাপতি ও মন্ত্রিগণ যে ব্রাহ্মণ বা বণিক্ শ্রেণীসম্ভূত হবেন না, এমন

কথা নাট্যতত্ত্বে কোথাও বলা নেই। বরং সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হবেন– এরকম-ই বলা হয়েছে। অতএব আচার্য ভরতের এই বক্তব্যটি-ও সর্বথা সঙ্গত নয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, নায়কের শ্রেণীবিভাগবিষয়ে একটি সাধারণ নিয়ম থাকলে-ও, বহুশঃ তার ব্যতিক্রম-ও পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়ের ভাষায় বললে, এই প্রাতিস্বিক ধর্মগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট নায়কের স্বরূপের ব্যবস্থাপক, তদতিরিক্ত অন্য-ব্যবচ্ছেদক নয়। যেমন – ব্রাহ্মণদের জন্য ধীরপ্রশান্ত শ্রেণীর নির্দেশ করা হলে-ও, জামদগ্ন্য পরশুরামের অতিক্রূর কর্মাদির জন্য তাঁকে ধীরোদ্ধত শ্রেণীতে-ই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে– অন্যত্র নয়। 'ভাষাপ্রকৃতিবেষাদেঃ কার্যতঃ ক্বাপি লঙ্ঘনম্'– এই বক্তব্য সর্বথা সত্য।

দেবতাদের ক্ষেত্রে ধীরোদ্ধতত্ব মর্ত্য মানুষদের অপেক্ষায় চিত্রিত হয়। তাই শঙ্করের ধীরোদাত্ত রূপ, ব্রহ্মার ধীরশান্ত রূপ ইত্যাদির বর্ণনা আমরা পেয়ে থাকি।

রাজগণ প্রয়োজনানুসারে চতুর্বিধ হতে পারেন– এ আমরা আগে-ই জেনেছি। এবিষয়ে অবলোককার বলছেন, ধীরললিতত্বাদি চারপ্রকার নায়কবৈশিষ্ট্য নায়কের চতুর্বিধ অবস্থাভেদের পরিচায়কমাত্র, জাতিবাচক শব্দের মত নির্দিষ্টস্বরূপ নয় – 'ধীরললিতাদিশব্দাশ্চ যথোক্তগুণসমারোপিতাবস্থাভিধায়িনঃ' (দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ)। এক-ই গরুকে বাল্যাবস্থায় বৎস, অধিক বয়সে বৃষ এবং পূর্ণবয়সে মদোদ্ধত অবস্থায় মহোক্ষ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু জাতিবাচক গো-শব্দে সর্বদা-ই গরুর অভিধান হয়, অন্য কোনো কিছুর নয়। অনুরূপভাবে, এক-ই নায়ক অবস্থাভেদে ধীরোদাত্তাদি বিবিধ রূপে পরিচিত হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে – 'মহাবীরচরিত' নাটকে পরশুরামের "কৈলাসোদ্ধার..." (২/১৬) ইত্যাদি উক্তির মাধ্যমে ধীরোদ্ধত, "ব্রাহ্মণাতিক্রমত্যাগো..." (২/১০) ইত্যাদির দ্বারা ধীরোদাত্ত, আবার "পুণ্যা ব্রাহ্মণজাতিঃ..." (৪/২২) ইত্যাদি উক্তির মাধ্যমে ধীরললিত চরিত্রবৈশিষ্ট্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। এভাবে এক-ই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার নায়কোচিত গুণে সমন্বিত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছেন। এটি কোনো দোষ নয়। চরিত্রের বিভিন্ন অবস্থাভেদে বিভিন্ন প্রকার গুণের প্রকাশ-ই স্বাভাবিক। কারণ, চরিত্রদের আধার হল জীবন এবং জীবন বিবিধ আবেগের আধার। তবে এই জাতীয় উপস্থাপনা অপ্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রে-ই অধিকতর সঙ্গত; প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সর্বদা-ই অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত। তাই ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন প্রধান নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে ধীরোদ্ধত নায়কের ন্যায় কপটতাপূর্বক বালিবধ নিন্দার্হ হয়েছে। নাট্যদর্পণকারদ্বয়-ও এই বিষয়ে পূর্ণ সমর্থন করছেন যে, গুণান্তর কেবলমাত্র গৌণ নায়কের চরিত্রচিত্রণে-ই ঘটানো যাবে, প্রধান নায়কের ক্ষেত্রে নয়– 'গৌণনেতৄণাং তু স্বভাবান্তরমপি পূর্বস্বভাবত্যাগেন নিবধ্যতে'। [২৪]

আগে-ই বলা হয়েছে, নাট্যদর্পণমতে সকল প্রকার নায়কের সামান্যলক্ষণ হল ধীরত্ব অর্থাৎ সর্বাবস্থায় অকাতরত্ব । এবার এতদতিরিক্ত বিশেষ লক্ষণগুলি পৃথক আলোচনা করা যাক –

১. ধীরোদ্ধত ঃ

'ধীরোদ্ধতশ্চলশ্চণ্ডঃ দর্পী দম্ভী বিকত্থনঃ' (না.দ.১/৮)– এই হল নাট্যদর্পণসম্মত ধীরোদ্ধতনায়কলক্ষণ। টীকাসহায়তায় এই লক্ষণের জ্ঞাতার্থ হল– সর্বাবস্থায় অকাতর, চঞ্চল অর্থাৎ অনবস্থিত, রুদ্র, শৌর্যাদিমদমত্ত, কূটপ্রয়োগে দক্ষ এবং স্বপ্রশংসী নায়ককে ধীরোদ্ধত নায়ক বলা হবে।

দশরূপকে এই নায়কের লক্ষণ এভাবে নিরূপিত হচ্ছে–

"দর্পমাৎসর্যভূয়িষ্ঠো মায়াছদ্মপরায়ণঃ ৷৷

ধীরোদ্ধতস্ত্বহংকারী চলশ্চণ্ডো বিকত্থনঃ ।" (দশ.রূ. ২/৫,৬)

–এখানে আবার ধীরোদ্ধত নায়কের অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে। তিনি হবেন মৎসর অর্থাৎ অসহিষ্ণু, মন্ত্রবলে অবিদ্যমান বস্তু প্রকাশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন মায়াবী এবং বঞ্চনাপর। উদাহরণরূপে জামদগ্ন্য পরশুরামের উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহিত্যদর্পণে-ও ধীরোদ্ধত নায়কের দশরূপকসম্মত লক্ষণগুলি-ই সমর্থিত হয়েছে–

"মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলো2হংকারদর্পভূয়িষ্ঠঃ।

আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ ৷৷" (সা.দ. ৩/৩৯)

ধীরোদ্ধত নায়কের উদাহরণরূপে ভীমসেনের উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ধীরোদাত্ত ঃ

'ধীরোদাত্তো2তিগম্ভীরঃ ন্যায়ী সত্ত্বী ক্ষমী স্থিরঃ'(না.দ. ১/৮)–এই হল নাট্যদর্পণসম্মত ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ।অতিগম্ভীর অর্থাৎ যার চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ সহজবোধ্য নয়, ন্যায়বান্, শোকক্রোধাদির দ্বারা অনভিভবনীয়, ক্ষমাবান্ এবং হিতাহিতবিবেচনাপূর্বক যিনি কার্যে ব্রতী হন, তিনি ধীরোদাত্তপ্রকৃতির নায়ক।

দশরূপকে ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ নিরূপিত হচ্ছে এভাবে –

"মহাসত্ত্বো2তিগম্ভীরঃ ক্ষমাবানবিকত্থনঃ ৷৷

স্থিরো নিগূঢ়াহঙ্কারো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ ।" (দশ.রূ. ২/৪,৫)

– শোকক্রোধাদির দ্বারা যাঁর চিত্ত অভিভূত হয় না, অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট, ক্ষমাপরায়ণ, 'অবিকত্থন' অর্থাৎ আত্মশ্লাঘাবিমুখ, স্থিরচরিত্র, 'নিগূঢ়মান' অর্থাৎ যাঁর অহঙ্কার বিনয় দ্বারা আচ্ছন্ন এবং দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ অঙ্গীকারপালনে কৃতসংকল্প – এবংবিধ গুণবান্ নায়ক হলেন ধীরোদাত্ত নায়ক। .... এখানে একটি বিষয় প্রণিধেয়। স্থৈর্য, দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণের উল্লেখ তো নায়কের সামান্যলক্ষণে কথিত হয়েছে, আবার এগুলির উল্লেখ কি পুনরুক্তিদোষ নয়? সমাধানে ধনিক বলছেন – 'আধিক্যপ্রতিপাদনার্থম্' (দশ.রূ.দ্বিতীয় প্রকাশ)। ধীরোদাত্ত নায়কের মধ্যে নায়কের সামান্য গুণাবলী অধিক মাত্রায় থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই এই পুনরুল্লেখ দোষাবহ নয়। এই প্রকার নায়কের উদাহরণরূপে 'নাগানন্দ'-এর জীমূতবাহন, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর রাজা দুষ্যন্ত প্রমুখ উপন্যস্ত হয়েছেন।

সাহিত্যদর্পণে দশরূপকনির্ণীত ধীরোদাত্তলক্ষণ-ই সমর্থিত হয়েছে–

''অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ॥'' (সা.দ.৬/৩৮)

ভাবপ্রকাশনে-ও এক-ইভাবে ধীরোদাত্ত লক্ষণটি নির্ণীত হয়েছে।

৩. ধীরললিত ঃ

নাট্যদর্পণমতে, শৃঙ্গারপরায়ণ, গীতবাদ্যাদি কলাবিদ্যায় আগ্রহী ও নিপুণ, মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত রেখে যিনি সুখী অর্থাৎ নিশ্চিন্ত এবং অক্রূরাচারী ব্যক্তি হলেন ধীরললিত প্রকৃতির নায়ক – 'শৃঙ্গারী ধীরললিতঃ কলাসক্তঃ সুখী মৃদুঃ'(না.দ.১/৯) । সচিবাদির উপর রাজ্যের যোগক্ষেমের চিন্তা ন্যস্ত থাকায় ধীরললিত নায়ক হন নিশ্চিন্ত প্রকৃতির। চিন্তারহিত বলে-ই তিনি নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা ও ভোগসুখাদির প্রতি আসক্ত। শৃঙ্গারপরায়ণতার কারণে তিনি কোমল স্বভাববিশিষ্ট এবং সুখী।

দশরূপকে অবিকল এক-ই মত পোষণ করা হচ্ছে – 'নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ কলাসক্তঃ সুখী মৃদুঃ' (দশ.রূ. ২/৩)। সাহিত্যদর্পণকার দশরূপকের অনুসরণে-ই ধীরললিত নায়কের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করছেন –'নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ' (সা.দ.৬/৪০)। ভাবপ্রকাশনে-ও রাজ্যভোগাদিব্যাপারে নিশ্চিন্ত, যৌবনোদ্ধত, বিলাসী, ভোগরসিক, ললিত ও রতিপ্রিয় নায়ককে ধীরললিত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন রত্নাবলী নাটকের বৎসরাজ উদয়ন।

৪. ধীরশান্ত ঃ

নাট্যদর্পণে ধীরশান্ত নায়কের লক্ষণে বলা হয়েছে – 'ধীরশান্তো2নহঙ্কারঃ কৃপালুর্বিনয়ী নয়ী'(না.দ.১/৯)– নিরহঙ্কার, কৃপাপর, বিনীত ও ন্যায়বান্ নায়ক ধীরশান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট। এখানে ধীরশান্ত নায়কের দ্বিজত্বাদি বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। অন্য একটি বিষয় এখানে প্রণিধেয় – ধীরশান্ত নায়কের লক্ষণ ধীরোদাত্ত নায়কলক্ষণের অনুরূপ হয়ে যাচ্ছে না কি? বৃত্তিতে সমাধানে বলা হচ্ছে, ধীরোদাত্ত নায়ক বিনয়াচ্ছন্ন গর্বযুক্ত, কিন্তু ধীরশান্ত নায়ক সর্বাবস্থায় নিরহঙ্কার – এই হল দুয়ের প্রভেদ – ''অনহঙ্কারঃ সর্বথাপ্যনবলেপঃ । ধীরোদাত্তস্তু বিনয়াচ্ছন্নাবলেপ ইতি ভেদঃ'' ।[২৫]

দশরূপকে ধীরশান্ত নায়কের লক্ষণে বলা হচ্ছে– 'সামান্যগুণযুক্তস্তু ধীরশান্তো দ্বিজাদিকঃ' (দশ.রূ. ২/৪) – নায়কের গুণসামান্য অর্থাৎ বিনয়াদির দ্বারা যুক্ত ব্রাহ্মণাদি ধীরশান্ত প্রকৃতির নায়ক। বৃত্তিকার ধনিক অবশ্য এতাদৃশ গুণোপেত বিপ্র, বণিক্, অমাত্যপুত্র প্রভৃতিকে ধীরশান্ত নায়করূপে গণ্য করেছেন – 'দ্বিজাদিক ইতি বিপ্রবণিক্সচিবাদীনাং প্রকরণনেতৃণামুপলক্ষণম্' (দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ) – প্রকরণের নায়কমাত্র-ই ধীরপ্রশান্ত। এই প্রকার নায়কের মধ্যে নিশ্চিন্ততা, কলাপ্রিয়তাদি গুণের সমাবেশ থাকলে-ও, এই নায়ককে ধীরললিত শ্রেণীভুক্ত না করে ধীরপ্রশান্ত পর্যায়ভুক্ত করা-ই ধনিকের অভিপ্রায় – 'নৈশ্চিন্ত্যাদিগুণসম্ভবে2পি বিপ্রাদীনাং শান্ততৈব, ন লালিত্যম্' (দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ)।

সাহিত্যদর্পণে-ও নায়কের সামান্যগুণোপেত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ধীরপ্রশান্ত শ্রেণীর নায়ক বলা হচ্ছে – 'সামান্যগুণৈর্ভূয়ান্ দ্বিজাদিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ' (সা.দ.৩/৪১)। এই প্রকার নায়কের উদাহরণ হলেন – 'মালতীমাধবম্'-এর মাধব, 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর চারুদত্ত প্রভৃতি।

নায়কভেদ আলোচনার পরিশেষে বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, এই সর্বপ্রকার বিশেষ লক্ষণগুলি বস্তুতঃ উপলক্ষণমাত্র। সর্বপ্রকার নায়কের চরিত্রে নাটকের প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য নায়কগুণের সমাবেশ ঘটতে-ই পারে– 'উপলক্ষণমাত্রং চৈতৎ, তেনোদ্ধতাদীনাং যথৌচিত্যমপরে2পি ধর্মা দ্রষ্টব্যা ইতি'। [২৬]

নাট্যদর্পণে নায়কভেদ সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছু বলা না হলে-ও, সাহিত্যদর্পণ, দশরূপকাদি গ্রন্থে নায়কের অপর চারপ্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে – অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ এবং ধৃষ্ট। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল–

১. অনুকূল – একনায়িকানিরত নায়ক হলেন অনুকূল নায়ক।

২. দক্ষিণ – বহু স্ত্রীর প্রতি সমান অনুরাগবিশিষ্ট নায়ক হলেন দক্ষিণ নায়ক। দশরূপকমতে, নবীনা নায়িকার প্রতি অনুরক্ত হয়ে-ও যিনি জ্যেষ্ঠা নায়িকার প্রতি পূর্ববৎ ব্যবহার করেন, নতুন প্রণয়ের কথা তাঁকে জানতে দেন না, তিনি হলেন দক্ষিণ নায়ক ।

৩. শঠ – যে নায়ক এক নায়িকার প্রতি অনুরক্ত, অথচ অন্য নায়িকার প্রতি বাহ্য অনুরাগ প্রদর্শন করে গূঢ়ভাবে তাঁর অপ্রিয় কার্য করেন, তাঁকে শঠ নায়ক বলা হয়।

৪. ধৃষ্ট – কৃতাপরাধ অথচ নিঃশঙ্ক, তিরস্কৃত হয়ে-ও লজ্জাহীন, দৃষ্টদোষ হলে-ও মিথ্যাবাদী – এই রকম নায়ককে বলা হয় ধৃষ্ট নায়ক।

অতএব ধীরোদাত্তাদি নায়কগণের প্রতিটি অনুকূলাদি ভেদে চার ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণে নায়ক হলেন ষোলো প্রকার। এই ষোলো প্রকার নায়ক আবার উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে বিভক্ত। অতএব নায়ক হলেন আটচল্লিশ প্রকার – সাহিত্যদর্পণ ও দশরূপক উভয়ত্র-ই এই মত সমর্থিত হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় বলার অপেক্ষা রাখে – প্রধান বা অপ্রধান যে কোনো নায়কচরিত্রে অবস্থাভেদে দাক্ষিণ্যাদি একাধিক গুণের সমাবেশ দূষণীয় নয়। যেমন – কোনো নায়ক প্রথমে জ্যেষ্ঠার প্রতি সহৃদয় বলে তিনি দক্ষিণ নায়ক, গোপনে কনিষ্ঠার প্রতি আসক্ত হলে তিনি-ই শঠ, আবার জ্যেষ্ঠার কাছে চিহ্নিত হওয়ার পর তিনি-ই ধৃষ্টনায়করূপে পরিগণিত হন।

নাটকীয় কথাবস্তু ঃ

কবিনির্মিত রূপকের কাহিনীকে বলে নাটকীয় কথাবস্তু। সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ নাটকীয় কথাবস্তুর দুইটি প্রকার স্বীকার করেছেন – মুখ্য বৃত্ত এবং প্রাসঙ্গিক বৃত্ত। প্রকারদ্বয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করে নাট্যদর্পণকার বলছেন – 'মুখ্যমিষ্টফলং বৃত্তম্ অঙ্গং প্রাসঙ্গিকং ক্বচিৎ'(না.দ. ১/১০)।

মুখ্যবৃত্ত সমগ্র নাটক জুড়ে পরিব্যাপ্ত থাকে। সেই কারণে-ই এটি হল প্রধান বৃত্ত। এই বৃত্তে নাটকের প্রধান ফল নিহিত থাকে। কবি বা নাট্যকার যে প্রয়োজন অর্থাৎ ফল প্রাপ্তির জন্য সর্বথা প্রয়াস করেন, তা এই অংশ জুড়ে-ই বিধৃত।অল্পকথায়, এটি-ই হল নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু, নাটকের প্রধান প্রয়োজন এই অংশে-ই সাধিত হয়। টীকাতে তাই বলা হচ্ছে – 'অনেন চ যৎ ফলবৎ বৃত্তং তদিহ মুখ্যম্'।[২৭]

নাট্যশাস্ত্রাদি গ্রন্থে রূপকের প্রধান প্রতিপাদ্য এই মুখ্যবৃত্তকে-ই আধিকারিক বৃত্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। দশরূপকে আধিকারিক বস্তুর লক্ষণ এভাবে নির্ণীত হয়েছে –

"অধিকারঃ ফলস্বাম্যমধিকারী চ তৎপ্রভুঃ।

তন্নির্বৃত্তমভিব্যাপি বৃত্তং স্যাদাধিকারিকম্ ॥'' (দশ.রূ.১/১২)

–'অধিকার' অর্থাৎ ফলের উপর স্বামিত্ব। ফল বলতে এখানে রূপকের মুখ্য প্রয়োজনকে বোঝানো হচ্ছে। এই মুখ্য প্রয়োজনে যাঁর অধিকার, তিনি-ই হলেন ফলস্বামী বা অধিকারী। রূপকে নায়ক ফলভোক্তা বলে তিনি-ই অধিকারী। সুতরাং নায়ক বা অধিকারীর বৃত্তান্ত হল নাটকের আদ্যন্ত প্রতিপাদ্য বিষয়, যা নাটকের প্রধান ফলোদয় অবধি বিদ্যমান থাকে। অধিকারীকে আশ্রয় করে বর্ণিত এই নাট্যবস্তুকে-ই বলা হয় আধিকারিক বৃত্ত। মহর্ষি ভরত-ও বলছেন – 'কারণাৎ ফলযোগস্য বৃত্তং স্যাদাধিকারিকম্' (না.শা.১৯/৩)। সাহিত্যদর্পণকার-ও অনুরূপভাবে আধিকারিকবৃত্তের লক্ষণ বিধান করেছেন –

"অধিকারঃ ফলে স্বাম্যমধিকারী চ তৎপ্রভুঃ ।

তস্যেতিবৃত্তং কবিভিরাধিকারিকমুচ্যতে ॥" (সা.দ. ৬/৪৩)

ভাবপ্রকাশনে-ও বলা হচ্ছে – 'বৃত্তান্তো নায়কাদীনামত্র স্যাদাধিকারিকঃ' (ভাব.প্র.৭/১৩৪)।

প্রাসঙ্গিক বৃত্ত হল সেটি, যা কিনা মুখ্য বা আধিকারিক বৃত্তের সহায়তাকল্পে রচিত । মুখ্য বৃত্ত হল অঙ্গী, প্রাসঙ্গিক বৃত্ত তার অঙ্গ । মুখ্য ফলের পরিপুষ্টি ও তার সিদ্ধির জন্য আগত বৃত্ত-ই হল প্রাসঙ্গিক বৃত্ত। টীকাতে বলা হচ্ছে – 'প্রসঙ্গাৎ পরকীয়যত্নাৎ আগতং প্রাসঙ্গিকম্'।[২৮] অভিনবগুপ্তাচার্য তাঁর অভিনবভারতীটীকাতে বিশদে বলছেন – "প্রসক্তির্হি প্রসঙ্গঃ। তত আগতং প্রাসঙ্গিকং, প্রসজ্যতে বা প্রধানফলনিষ্পত্তয়ে ইতি প্রসঙ্গতস্তত আগতমিতি " (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়) । মহর্ষি ভরত বলছেন – 'তস্যোপকরণার্থং তু কীর্ত্যতে হ্যানুষঙ্গিকম্' (না.শা. ১৯/৪) । 'তস্য' অর্থাৎ ' আধিকারিকবৃত্তস্য' ; আধিকারিক বস্তুর প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, তার উপকারহেতু আনুষঙ্গিক অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক বৃত্তের অবতারণা করা হয়। দর্পণকার-ও এক-ই মত ব্যক্ত করছেন – 'অস্যোপকরণার্থং তু প্রাসঙ্গিকমীষ্যতে' (সা.দ. ৬/৪৪)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও নাটকের প্রধান কথাবস্তুর মধ্যে তার-ই পরিপোষক অন্য কথাকে আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক বস্তু আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে – 'কথায়ামেব কথান্তরমুপকৃদানুষঙ্গিকমিতি' (না.ল.র. চতুর্থ অধ্যায়) ।

দশরূপকে প্রাসঙ্গিক বৃত্তের লক্ষণ একটু বিশিষ্ট । এখানে বলা হচ্ছে, আধিকারিক বৃত্তের প্রয়োজনে যা উপস্থাপিত, অথচ প্রাসঙ্গিকভাবে যার নিজের প্রয়োজন-ও সিদ্ধ হয়, সেটিকে প্রাসঙ্গিক বৃত্ত বলা হয় – 'প্রাসঙ্গিকং পরার্থস্য স্বার্থো যস্য প্রসঙ্গতঃ' (দশ.রূ. ১/১৩)। ধনিক তাঁর অবলোকাখ্য টীকায় বলছেন – 'যস্যেতিবৃত্তস্য পরপ্রয়োজনস্য সতস্তৎপ্রসঙ্গাৎ স্বপ্রয়োজনসিদ্ধিস্তৎ প্রাসঙ্গিকমিতিবৃত্তং প্রসঙ্গনির্বৃত্তেঃ' (দশ.রূ.প্রথম প্রকাশ)। অতএব আধিকারিক বস্তুর সিদ্ধির পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বৃত্তের স্বীয় প্রয়োজনের-ও সংসিদ্ধি ঘটে – এই হল দশরূপককারের মত। নিজপ্রয়োজনসিদ্ধির বিষয়টি

পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক অস্পৃষ্ট ছিল, ধনঞ্জয় প্রথম এবিষয়ে বিশেষ নির্দেশ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভাবপ্রকাশনে আচার্য শারদাতনয়-ও এক-ই মত পোষণ করেছেন। তত্রোক্ত প্রাসঙ্গিকলক্ষণটি হল–

"যশ্চোপনায়কাদীনাং বৃত্তান্তো নায়কার্থকৃৎ ।

স নান্তরীয়কশ্চার্থঃ প্রাসঙ্গিক উদাহৃতঃ ॥" (ভাব.প্র.সপ্তম অধ্যায়)

দশরূপকে প্রাসঙ্গিক বৃত্তকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে – পতাকা ও প্রকরী – 'সানুবন্ধং পতাকাখ্যং প্রকরী চ প্রদেশভাক্' (দশ.রূ.১/১৩)। আধিকারিক অর্থাৎ মুখ্য নাট্যবস্তুর সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কযুক্ত যে প্রাসঙ্গিক বস্তু রূপকে অধিক দূর বিস্তৃত ও দীর্ঘকাল যাবৎ স্থায়ী, সেই প্রাসঙ্গিক বস্তু পতাকা নামে অভিহিত। রামায়ণে বর্ণিত সুগ্রীববৃত্তান্ত বা বিভীষণবৃত্তান্ত নায়ক রামচন্দ্রের মুখ্য ফললাভের সহায়ক এবং এই বৃত্তান্ত অধিক দূরাবধি বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী ;তাই সুগ্রীব বা বিভীষণের বৃত্তান্ত পতাকা নামে পরিচিত। অন্যদিকে প্রধানবৃত্তের উপকারক স্বল্পদেশস্থায়ী বৃত্তের নাম হল প্রকরী। যেমন – রামচরিতমূলক রূপকে শ্রমণাদির বৃত্তান্ত ।

অতএব দেখা গেল, নাটকীয় ইতিবৃত্ত প্রধানতঃ দ্বিবিধ – মুখ্য বা আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক বস্তুর দুটি ভেদ – পতাকা ও প্রকরী। সুতরাং বৃত্ত সাকুল্যে ত্রিবিধ । এই আধিকারিকাদি বস্তুত্রয় আবার প্রখ্যাত, উৎপাদ্য ও মিশ্র ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । এই তিনটি শ্রেণী অনুসারে আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক বৃত্তকে কোনো-কোনো সমালোচক নয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। ধনঞ্জয়-ও এই মতের-ই অনুসারী । উপরন্তু এই নয়টি বিভাগকে তিনি আবার দিব্য, দিব্যাদিব্য ও মর্ত্যভেদে মোট সাতাশ ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তের অবতারণার ক্ষেত্রে নাট্যদর্পণে অপর একটি বিষয়ের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সর্বপ্রকার নাটকে প্রাসঙ্গিক বৃত্তের সন্নিবেশ বাধ্যতামূলক নয়। নায়ক যখন ফলসিদ্ধির প্রয়োজনে অন্যদের সহায়তার অপেক্ষা রাখেন, একমাত্র সেখানে-ই প্রাসঙ্গিক বৃত্ত রচনার অবকাশ। নায়কের প্রয়োজন না থাকলে নাটকে প্রাসঙ্গিক বৃত্তের অবতারণা নিরর্থক ও অবান্তর । রামচরিতমূলক রূপকগুলিতে সীতা-উদ্ধাররূপ মুখ্য বৃত্তটি সুগ্রীবমৈত্রী-বিভীষণরক্ষা-রাবণবধ ইত্যাদি ঘটনার অপেক্ষা রাখে। যথাযথ প্রসঙ্গক্রমে আগত এই বস্তুগুলিকে তাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তরূপে অবতারণা করা হয়েছে। বিপরীতে, ভট্টশ্রী ভবনুত চূড়া বিরচিত 'কৌশলিকা' নামক নাটিকাতে নায়ক বৎসরাজের কৌশলিকাপ্রাপ্তির জন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন না থাকায়, এখানে কোনো প্রাসঙ্গিক বৃত্ত সংযোজন করা হয়নি। টীকাতে 'সত্যহরিশ্চন্দ্র' নাটকটির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে

প্রতিজ্ঞানির্বাহ করার জন্য রাজা হরিশ্চন্দ্রের কোনো সহায়তার অপেক্ষা নেই, তাই এই নাটকে প্রাসঙ্গিক বৃত্ত-ও অনুপস্থিত।

নাট্যদর্পণে নাটকীয় ইতিবৃত্তকে আবার দর্শনযোগ্যতা অনুসারে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – সূচ্য, প্রযোজ্য, অভ্যূহ্য এবং উপেক্ষ্য। নাট্যদর্পণের কারিকায় এদের লক্ষণগুলি হল –

"নীরসানুচিতং সূচ্যং প্রযোজ্যং তদ্বিপর্যয়ঃ।

উহ্যং তদ্বিনাভূতং উপেক্ষ্যং তু জুগুপ্সিতম্ ॥" (না.দ.১/১১)

টীকাসহায়ে এই চারটি প্রকারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে-

১. সূচ্য – সূচ্য হল নাটকীয় বৃত্তের সেই অংশ, যা নীরসতাহেতু লোকমনোরঞ্জন করতে অক্ষম অথবা সরস হলে-ও অনৌচিত্যবশতঃ অদর্শনীয় । যথা – আলিঙ্গন-চুম্বনাদি। এই সূচ্য অংশগুলি বিষ্কম্ভকাদি অর্থোপক্ষেপকের দ্বারা সূচিত করতে হবে, অভিনয়ের দ্বারা নয়।

২. প্রযোজ্য – সূচ্যবিষয়ের বিপরীত হল প্রযোজ্যবিষয়। নাম-ই অর্থপ্রকাশক। আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা যা মঞ্চে প্রয়োগযোগ্য, তাই হল প্রযোজ্য। প্রযোজ্য অংশটি হয় সরস এবং প্রদর্শনযোগ্য।

৩.অভ্যূহ্য – এটি হল প্রণিধানগম্য বিষয়, যা মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয় না। যেমন– একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন যে পাদবিহরণের দ্বারা হয়, তা সর্বজ্ঞাত; বিষয়টি স্বয়ংসিদ্ধ । তাই মঞ্চে পাদচারণা প্রদর্শন ব্যতীত-ই যাত্রা বোঝানো যেতে পারে। এরূপ বিষয়-ই হল অভ্যূহ্য বিষয়।

৪. উপেক্ষ্য – নাটকে পরিত্যাজ্য লজ্জাজনক এবং অসঙ্গত বিষয় হল উপেক্ষ্য বিষয় । যেমন – ভোজন, শয়ন, স্নান, শৌচকর্ম ইত্যাদি । নাটকে এগুলির প্রদর্শন সর্বথা নিষিদ্ধ। উত্তররামচরিতে শ্রীরামের অঙ্কে সীতার শয়ন বা নলবিলাসে অরণ্যে দময়ন্তীর শয়নাদি ঘটনা নাটকের মূল ঘটনার প্রয়োজনে সংযোজিত; তাই এগুলির মঞ্চে প্রদর্শন দোষাবহ নয়।

উপেক্ষ্য ও সূচ্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, সূচ্যবিষয়গুলি অর্থোপক্ষেপকদ্বারে সূচিত করা যেতে পারে; উপেক্ষ্য বিষয়গুলির সূচনা-ও নাটকে নিষিদ্ধ ।

নাটকীয় ঘটনাপরম্পরায় বিবিধ প্রকার ফলের প্রসঙ্গ আসে। তাদের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ, তা কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মসিদ্ধ নয়। কবি তথা নাট্যকারের ইচ্ছা-ই এবিষয়ের নির্ধারক। বহুবিধ ফলের মধ্যে কবি যেটিকে প্রাধান্য দেবেন, সেটি-ই মুখ্য ফলরূপে বিবেচিত হবে। তিনি যে ফলের বিশেষ উৎকর্ষ বিধানপূর্বক নাটকরচনা করবেন, সেটি-ই প্রধানতম ফলরূপে পরিগণিত হবে। অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বসহকারে যেসব নাটকীয় প্রয়োজনের সিদ্ধি হবে, সেগুলি হবে গৌণ ফল। টীকাতে বলা হচ্ছে – 'ইহ তাবৎ ন নিসর্গতঃ কিঞ্চিৎ চরিতং মুখ্যমঙ্গং বা, কিন্তু বহুস্বপি ফলেষু

কবির্যস্যাত্যন্তমুৎকর্ষমভিপ্রৈতি তৎফলমিষ্টম্’।[২৯]অভিনবভারতীতে-ও কবির অনন্যপরতন্ত্র ইচ্ছার-ই প্রাধান্য বিবক্ষিত – ‘কবির্যৎ ফলমুত্কর্ষেণ বিবক্ষতি তৎ প্রধানফলম্’ (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। তাই দেখা যায়, রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত রূপকগুলিতে সুগ্রীবের মৈত্রী, শরণাগত বিভীষণকে রক্ষা, রাবণবধ ইত্যাদি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ফলবিশিষ্ট ঘটনাগুলি থাকলে-ও, পরিণামে কিন্তু এগুলি গুণীভূত হয়ে যায়; সীতা-উদ্ধরণরূপ ঘটনাটি-ই প্রধান বা মুখ্য ফলরূপে বিবেচিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাটকীয় ঘটনাবলীর প্রয়োজনের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করার সময় নাট্যকার যথেচ্ছাচারী হতে পারবেন না। তাঁকে ফল ও ফলভোক্তার সম্বন্ধের ঔচিত্য বিষয়ে বিশেষভাবে অবধান দিতে হবে। ধীরোদাত্তাদি চারপ্রকার নায়কের চরিত্রে কোন্ ফলটি সর্বাপেক্ষা সুপ্রযুক্ত হবে, তা নির্ণয় করার জন্য নাট্যকার ঔচিত্যের সহায়তা নেবেন।

নাটকীয় সংলাপ ও তার ভেদ ঃ

নাটকরচনা করার সময় নাট্যকারকে অনেকাংশে-ই নির্ভর করতে হয় বাচিক অংশ অর্থাৎ সংলাপের উপর। সংলাপের মাধ্যমে-ই লৌকিক চরিত্রগুলি অলৌকিক বিভাবে পরিণত হয়; যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহায়তায় পরিণামে দর্শকচিত্তের স্থায়িভাবকে উদ্বোধিত ও পরিপুষ্ট করে রসে পরিণত করে। নাটকীয় ইতিবৃত্তে চরিত্রসৃষ্টির এটি অন্যতম উপাদান। সংলাপ চরিত্রের মৌখিক ভাষামাত্র হলে চলবে না, তাকে হতে হবে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যাতে ঐ সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রবিশেষের সামগ্রিক ও সার্থক অভিব্যক্তি ঘটতে পারে।

নাটকে যেহেতু নানা রস ও নানা চরিত্রের সমাবেশ হয়, তাই নাটককে বাস্তবানুগ করে তুলতে গেলে সংলাপের তথা ভাষার বৈচিত্র্য অপরিহার্য। এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে অবশ্য-ই হতে হবে পাত্রানুসারী । অজ্ঞ- অশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে তত্ত্বকথা অথবা শিক্ষিত উত্তমপাত্রের মুখে অমার্জিত ভাষা নিতান্ত অস্বাভাবিক। এই কারণে সংস্কৃত নাটকে কেবলমাত্র নানাপ্রকার সংস্কৃত বাচনভঙ্গী-ই নয়, উপরন্তু প্রাকৃতভাষার-ও অবতারণা করা হয়ে থাকে। নাটকীয় চরিত্রের একান্ত প্রয়োজনীয় এই সংলাপ তথা নাট্যোক্তির লক্ষ্য ও সার্থকতা বিষয়ে সমালোচক Hudson যথার্থ-ই বলেছেন – “ Dialogue then becomes an essential adjunt to action, or even an integral part of it; .... Yet the prinicipal function of dialogue in the drama as well as novel is, as I have said, in direct connection with characterization.”[৩০]

একটি বিষয়ে এখানে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নাটকের সংলাপ যেমন স্বাভাবিক হবে, তেমনি তার মধ্যে কিছু নাটকীয়তার উপাদান-ও থাকা প্রয়োজন। নাটক যেহেতু একটি বিশেষ প্রকার

শিল্প, তাই নাটককে একেবারে বাস্তবের প্রতিরূপ না করে , তাকে করে তোলা উচিৎ কিছুটা আবেগধর্মী। অতএব স্বাভাবিকভাবে-ই মঞ্চে নাটকীয়তা প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম অর্থাৎ নাটকীয় ভাষা তথা সংলাপের কিছুটা অলংকৃত, কিছুটা অসাধারণ হওয়াটা একান্ত কাম্য। এই সালংকারত্ব-ই নাটকীয় সংলাপকে প্রাত্যহিক সংলাপের ঊর্দ্ধে উন্নীত করে এবং এই অসাধারণত্ব-ই পরিণামে সহৃদয়ের চিত্তের রসোদ্বোধের কারণ হয়, যে রসোল্লাসে নাটকের সার্থকতা।

শেক্সপীয়ারের বর্ণনাশক্তিকে লক্ষ্য করে জনৈক সমালোচক বলেছেন – " The plays are full of such descriptive passages as can nullify the achievements of decorator and mechanic." সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে-ও এই উক্তিটি সর্বাঙ্গীনভাবে সত্য ও যথার্থ। সংলাপ ও তার ভাষায় এমনি শক্তি যে, এককালে যখন রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যসজ্জার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, তখন বিষয়ের বর্ণনা শুনে-ই দর্শকবৃন্দ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতেন এবং এই অসাধারণ মানসপ্রত্যক্ষের দ্বারা-ই তাঁদের রসোপলব্ধি ঘটত । 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর বর্ষাবর্ণনা বা 'অভিজ্ঞানশকুন্ত লম্'-এর প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগের বর্ণনা সংলাপের দ্বারা মানসপ্রত্যক্ষের অনন্য উদাহরণ।

অতএব বোঝা গেল, বিবিধ চরিত্রের আন্তরিক উন্মোচন, তাদের মনোজগতের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের যথাযথ বর্ণনার জন্য নাটকের বাচিক অংশ অর্থাৎ সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্ববহ । নাট্যদর্পণে সংলাপকে নাটকীয় ইতিবৃত্তের বিভাগনির্ণয়ের একটি বিশেষ আঙ্গিকরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

নাট্যদর্পণ অনুসারে সংলাপ পাঁচপ্রকার – প্রকাশ, স্বগত, অপবারিত, জনান্তিক ও আকাশভাষিত । দশরূপকে এই বিভাগ একটু অন্যভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে নাটকীয় বস্তুকে নাট্যধর্ম অনুসারে প্রাথমিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে – সর্বশ্রাব্য, নিয়তশ্রাব্য এবং অশ্রাব্য। নিয়তশ্রাব্যর আবার দুটি উপবিভাগ– জনান্তিক এবং অপবারিত –

" সর্বেষাং নিয়তস্যৈব শ্রাব্যমশ্রাব্যমেব চ ।

সর্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাদশ্রাব্যং স্বগতং মতম্ ॥

দ্বিধান্যন্নাট্যধর্মাখ্যং জনান্তমপবারিতম্ ।" (দশ.রূ. ১/৬৪,৬৫)

ভাবপ্রকাশনে আবার সংলাপকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে – শ্রাব্য এবং অশ্রাব্য । অতঃপর শ্রাব্যর সর্বশ্রাব্য ও নিয়তশ্রাব্য, অশ্রাব্যর অপবারিত ও জনান্তিক – এইভাবে চতুর্বিধ সংলাপ স্বীকার করা হয়েছে।

একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। আচার্য ধনঞ্জয়,আচার্য শারদাতনয় প্রমুখ আকাশভাষিত বা আকাশোক্তিকে এই ভেদব্যবস্থার মধ্যে গণ্য করেননি। এঁরা সকলে আকাশভাষিতকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

একটি নাট্যধর্মরূপে স্বীকার করে পৃথকভাবে তার লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। নাট্যদর্পণে কিন্তু এমনটি করা হয়নি। আকাশভাষিত মূলতঃ যেহেতু একপ্রকার নাটকীয় সংলাপ, তাই একে নাট্যোক্তিসমূহের আলোচনার অন্তর্গত করে নাট্যদর্পণকাররা সঠিক সিদ্ধান্ত-ই নিয়েছেন।

এবার নাট্যদর্পণসম্মত সংলাপগুলির ক্রমিক আলোচনা করা হচ্ছে –

১.প্রকাশ ঃ

'প্রকাশং জ্ঞাতমন্যেষাম্'(না.দ. ১/১১) – অর্থ স্পষ্ট । নাটকের সর্বজনশ্রাব্য, সর্বজনজ্ঞাতব্য অংশের নাম প্রকাশ। টীকাতে বলা হচ্ছে – 'যদ্ বৃত্তমগোপ্যতয়া অন্যেষামাত্মব্যতিরিক্তানামপি জ্ঞাপ্যং তৎ প্রকাশত ইতি প্রকাশম্'[৩১] – অর্থাৎ অগোপনীয়তার কারণে যে বৃত্তান্ত সর্বলোকের শ্রবণীয়, সেই বিষয়-ই হল প্রকাশ।

সাহিত্যদর্পণে ও দশরূপকে এক-ইভাবে প্রকাশের লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রকাশের পৃথক উল্লেখ অনুপস্থিত। অধ্যাপক বলবীর তাই মনে করেন, 'প্রকাশ' নামক নাট্যধর্মটি পরবর্তীকালের সংযোজন। তবে এই মত যুক্তিসহ নয়। কারণ, সামান্যতঃ নাটকের সব অংশ-ই সমস্ত ব্যক্তির শ্রবণযোগ্য; এটি-ই সাধারণ নিয়ম। তাই নাটকে পৃথক ভাবে 'প্রকাশ' এরূপ নির্দেশ থাকে না। কেবলমাত্র স্বগত বা আত্মগত অংশের সমাপ্তির পর পুনরায় সর্বশ্রাব্য অংশে প্রত্যাবর্তনের জন্য 'প্রকাশ'-এর নির্দেশ করা হয়ে থাকে, অন্যত্র নয়। সংলাপপ্রধান নাটকের অধিকাংশ-ই সর্বশ্রাব্য, তাই আলাদাভাবে সর্বত্র এই নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। অতএব প্রকাশ নাট্যধর্মটি নাট্যশাস্ত্রোত্তর যুগের সংযোজন, এরকম কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

২. স্বগত ঃ

'স্বগতং স্বহৃদি স্থিতম্' (না.দ.১/১১) – নাট্যদর্পণে এভাবে স্বগতলক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। গোপনীয়তার কারণে যে বৃত্তান্ত কারো কাছে প্রকাশযোগ্য নয়, তাই হল স্বগত। টীকায় বলা হচ্ছে – 'যদ্ পুনরন্যেষাং গোপ্যতয়া স্বহৃদ্যেব স্থিতং তৎ স্বগতম্'[৩২] – বক্তা ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তির অশ্রাব্য সংলাপের নাম স্বগত।

নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হচ্ছে – 'হৃদয়স্য বচো যত্তু তদাত্মগতমিষ্যতে'(না.শা.২৫/৮৮) – অর্থ স্পষ্ট । দশরূপক এবং সাহিত্যদর্পণে স্বগতের লক্ষণ প্রায় অনুরূপ । দশরূপকে বলা হচ্ছে – 'স্যাদশ্রাব্যং স্বগতং মতম্' (দশ.রূ. ১/৬৪) । সাহিত্যদর্পণকারের মতে – 'অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ

স্বগতং মতম্' (সা.দ.৬/১৩৭)। অতএব স্বগতর লক্ষণ ও তার সংজ্ঞা বিষয়ে পূর্বাপর সকল নাট্যতাত্ত্বিকরা প্রায় এক-ই প্রকার মত প্রকাশ করেছেন।

নাট্যশাস্ত্রাদিতে 'স্বগত' ও 'আত্মগত' শব্দদ্বয় এক-ই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশরচয়িতা সাগরনন্দী কিন্তু ত্রিপতাকাকার ব্যবহারের ভিত্তিতে এই দু'য়ের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। বলা হচ্ছে –

"স্বগতম্ আত্মগতং চৈব স্বয়ং ত্রিপতাকাপাণিনা।

যৎ পঠেৎ তত্র সংযোজ্যং দ্বয়ম্ এতৎ প্রযোক্তৃভিঃ ॥" (না.ল.র. অষ্টাদশ অধ্যায়)

এবিষয়ে এতদতিরিক্ত বিশদ ব্যাখ্যা তাঁর গ্রন্থে অনুপস্থিত এবং এই মতটি যে যথেষ্ট যুক্তিবহ এবং প্রাঞ্জল নয়, তা বলা বাহুল্য।

এবার স্বগতর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক্ । আমরা দেখেছি, মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য নাটকীয় পাত্ররা যাতে শুনতে না পায়, এমনভাবে কোনো চরিত্রের যে উক্তি, তাই হল স্বগত। অনেক নাট্যতাত্ত্বিকের মতে, এই নাট্যোক্তিটি সহজ নয়, এটি কৃত্রিম । তাঁদের মতে, মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রবিশেষ স্বগতোক্তি করবে এবং সন্নিহিত অন্য চরিত্রগুলি তা শুনতে পেয়ে-ও না শোনার ভান করবে, এটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক, যা নাটকের নাটকীয়তা ও দৃশ্যমানতাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করে। এঁদের মতে, সুস্থমস্তিষ্কের মানুষ একা-একা কথা বলে না, কথা বলতে হলে শ্রোতার প্রয়োজন। আবার প্রেক্ষাগৃহে দর্শক-ই শ্রোতা, অতএব নাটকীয় চরিত্রের স্বগতোক্তিতে দোষ নেই – এমন কথা-ও বলা যাবে না। কারণ, প্রেক্ষক শ্রোতা হলে-ও নাটকীয় চরিত্র নয়। নাটকীয় চরিত্রের সংলাপের শ্রোতা অপর নাটকীয় চরিত্র-ই হবে, দর্শক নয়। নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বলে-ই দর্শকচিত্তে বিভাবাদির দ্বারা রসোদ্বোধ ঘটে থাকে। অতএব সবদিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে, নাটকে স্বগতোক্তি স্বাভাবিক নয় – বরং কৃত্রিম ।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, স্বগতোক্তি একটি কৃত্রিম নাট্যকৌশল হলে-ও, কালিদাস, ভাস, ভবভূতি বা পাশ্চাত্যের শেক্সপীয়ার প্রমুখ নাট্যকারমুখ্যগণ এই রীতিটিকে-ই পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে এমন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন যে, সেগুলিকে অস্বাভাবিক মনে হওয়া দূরস্থান, বরং এগুলির জন্য-ই নাটকগুলি আরো বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। শেক্সপীয়ারের নাটকগুলিতে soliloquy-র একটি বিশেষ স্থান আছে। উদাহরণস্বরূপ 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেটের, 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে ব্রুটাসের, 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথের স্বগত ভাষণগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' - এর পঞ্চমাঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের "রম্যাণি বীক্ষ্য...", 'উত্তররামচরিতম্' -এ শ্রীরামচন্দ্রের "অদ্বৈতং

সুখদুঃখয়োরনুগতম্..." ইত্যাদি উক্তি শুধু কাব্যমাধুর্যে অনন্য-ই নয়, নাটকীয় চরিত্রগুলির তৎকালীন মানস অবস্থার বিবরণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়-ও বটে।

আবার অনেক সময় নাটকে এমন কতগুলি চরিত্র থাকে, বিশেষতঃ প্রেমিকচরিত্র ও খলচরিত্র, যাদের গোপন রহস্য অন্য কোনো চরিত্রের কাছে ব্যক্ত করা চলে না; অথচ এই চরিত্রগুলির উন্মোচন একান্ত আবশ্যক । সেই সময় এইসব চরিত্রগুলির অন্তর্বিশ্লেষণে স্বগত ভাষণ শুধু আবশ্যক-ই নয়, এটি-ই একমাত্র উপায় । Hudson তাঁর 'An Introduction to the Study of Literature' গ্রন্থে সুন্দরভাবে এই প্রয়োজনটিকে ব্যাখ্যা করেছেন – "They think aloud to themselves and we overhear what they say." অতএব ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুসরণে আমরা বলতে পারি – " স্বগতভাষণ একেবারে অচল ও অধম, ঠিক এইরূপ কটূক্তি না করে Jones এর ভাষায় 'it is never permissible to do by soliloquy what can be adequately done by dialogue' ইহাই বক্তব্য"।[৩৩]

উপর্যুক্ত আলোচনায় বোঝা গেল, কোনো-কোনো সমালোচকের মতে 'স্বগত' নামক নাট্যোক্তিটি কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট । কারণ, এতে মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্ররা চরিত্রবিশেষের দ্বারা উচ্চারিত সংলাপ শুনতে পেয়ে-ও না শোনার ভান করে, যা অত্যন্ত অস্বাভাবিক । এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত সঙ্গত ভাবে-ই প্রশ্নযোগ্যতা রাখে। নাটকে অনেক কিছু-ই abstract অর্থাৎ বিমূর্ত ভাবে উপস্থাপিত হয়, যা দর্শকদের অনুমান করে নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ সখীত্রয়ের বৃক্ষমূলে জলসিঞ্চন বা পুষ্পচয়ন বা 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এ বিদূষকের রাজাকে বলাকাশ্রেণী দেখানোর দৃশ্যগুলির কথা বলা যেতে পারে । এগুলিকে যখন আমরা কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট বলে মনে করি না, তখন স্বগত ভাষণের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে-ও প্রশ্ন না ওঠা-ই যুক্তিসঙ্গত।

এই স্বগতভাষণের আরো একটি রূপ দেখা যায়, পাশ্চাত্যের নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা যাকে 'Incidental aside' বলেন। এটি বস্তুতঃ একধরনের সংলাপ বা dialogue, তবে আংশিক স্বগত । এটি প্রকাশ্য উক্তির মত সর্বশ্রাব্য নয়, আবার একক স্বগতের মত সকলের অশ্রাব্য-ও নয়। রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত পাত্র-পাত্রীগণের মধ্যে যারা বাঞ্ছিত, তাদের পক্ষে এগুলি শ্রাব্য; কিন্তু যে বা যারা অবাঞ্ছিত, তাদের পক্ষে এগুলি অশ্রাব্য। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বে এই আংশিক স্বগত সংলাপের দুটি রূপ – অপবারিত এবং জনান্তিক।

৩. অপবারিত ঃ

নাট্যদর্পণধৃত অপবারিতলক্ষণটি হল – 'পরাবৃত্য রহস্যাখ্যা2ন্যস্মৈ তদপবারিতম্' (না.দ.১/১২) – রঙ্গমঞ্চে অবাঞ্ছিত পাত্র-পাত্রীদের দিকে পিছন ফিরে কোনো বিশেষ বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে আলাপকে বলা হয় অপবারিত। এজাতীয় উক্তিবিশেষে অবাঞ্ছিতদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের পিছনে রাখা হয়। এই কারণে 'অপবারিত' শব্দটির ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'অপবার্যতে বহূনাং প্রচ্ছাদ্যত ইত্যপবারিতম্'।[৩৪]

মহর্ষি ভরতের মতে, অন্য সকলের থেকে গোপন করে বিশ্বাস্য কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো বিষয়কে প্রকাশ করার নাম অপবারিত। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'নিগূঢ়ভাবসংযুক্তমপবারিতকং স্মৃতম্' (না.শা.২৫/৮৯)। এই অংশটির ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন – 'নিগূঢ়ভাবো নিগূঢ়নং সর্বেষাং যন্নিগুহ্যতে এক এব শৃণুয়াদিতি তদপবারিতম্' (না.শা.পঞ্চবিংশ অধ্যায়)।

দশরূপকসম্মত অপবারিতলক্ষণটি হল – 'রহস্যং কথ্যতে2ন্যস্য পরাবৃত্ত্যাপবারিতম্' (দশ.রূ. ১/৬৬) – অন্যদের দিকে পিছন ফিরে বিশেষ নাটকীয় পাত্রের সঙ্গে গোপন আলাপকে-ই অপবারিত বলা হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ, রূপ গোস্বামী প্রমুখের সম্মত অপবারিত লক্ষণটি-ও দশরূপকের অনুসারী ।

৪. জনান্তিক ঃ

জনান্তিক নামক নাট্যোক্তির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'ত্রিপতাকান্তরোন্যেন জল্পো যস্ত জ্জনান্তিকম্' (না.দ.১/১৩) – রঙ্গমঞ্চে যে নাটকীয় চরিত্রের কাছ থেকে কোনো বিষয় গোপন করতে হবে, তার দিকে হাতটি ত্রিপতাকার মত করে, অপরের সঙ্গে সংলাপের নাম জনান্তিক। জনান্তিক জাতীয় সংলাপের ক্ষেত্রে মঞ্চে উপস্থিত নাট্যচরিত্রগুলির মধ্যে মাত্র একজনের কাছে কোনো বিষয় গোপন করা হয়, মঞ্চস্থ অন্য চরিত্রগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকেন। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে স্পষ্ট ভাবে বলা হচ্ছে – 'যত্রান্যেন সহ জল্পো জনানামেকস্যৈব গোপ্যত্বাৎ বহূনামন্তিকং শ্রাব্যতয়া নিকটং জনান্তিকম্'।[৩৫]

'ত্রিপতাকা' নামক একটি হস্তমুদ্রার দ্বারা এই গোপন করার অভিনয়টি করা হয়ে থাকে। নাট্যদর্পণমতে, করতলের অনামিকা অঙ্গুলিটি বক্র করে, অন্য চারটি অঙ্গুলিকে উত্তোলিত রাখলে যে মুদ্রার সৃষ্টি হয়, তার নাম ত্রিপতাকা। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'উর্দ্ধসর্বাঙ্গুলির্বক্রানামিকঃ করস্ত্রিপতাকঃ'।[৩৬] দশরূপকের টীকাকার ধনিক-ও ত্রিপতাকার অবিকল এক বিবরণ দিয়েছেন– 'উর্দ্ধসর্বাঙ্গুলং বক্রানামিকত্রিপতাকালক্ষণং করম্' (দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা

যেতে পারে, এই ত্রিপতাকা নামক হস্তমুদ্রার আরো একটি প্রকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজবিরচিত 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' নামক মহাকাব্যের দ্বাবিংশতি সর্গের একনবতিসংখ্যক শ্লোকের টীকায় বলা হচ্ছে – 'কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োরগ্রসংযোগো সংযোগী যত্র ভাসতে তর্জনীমধ্যানামাপ্রসারস্ত্রিপতাকঃ করঃ' – অর্থাৎ কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করে অন্য তিনটি অঙ্গুলি উত্তোলিত থাকলে, সেই মুদ্রাকে ত্রিপতাকা বলা হয়ে থাকে।

নাট্যশাস্ত্রাদি গ্রন্থে জনান্তিকের লক্ষণটি একটু অন্যপ্রকার। নাট্যশাস্ত্রে জনান্তিকের লক্ষণটি হল –

"হস্তমন্তরিতং কৃত্বা ত্রিপতাকং প্রযোক্তৃভিঃ ।

জনান্তিকং প্রযোক্তব্যমপবারিতকং তথা ॥" (না.শা.২৫/৯৪)

– ত্রিপতাকাবৎ হস্তমুদ্রার দ্বারা অন্য সকল ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণা বা আলাপকে বলা হয় জনান্তিক। দশরূপককার ধনঞ্জয়ের অভিমতটি এক-ই রকম। কারিকায় বলা হচ্ছে – "ত্রিপতাকাকরেণান্যানপবার্যান্তরা কথাম্ ॥

অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্জনান্তে তজ্জনান্তিকম্ ।" (দশ.রূ. ১/৬৫,৬৬)

– প্রবর্তিত নাট্যসংলাপের মাঝে ত্রিপতাকামুদ্রাযুক্ত হাতের দ্বারা অন্যদের বারণ করে দুজনের মধ্যে পারস্পরিক সংলাপকে জনান্তিক বলে। সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত জনান্তিকের লক্ষণটি ধনঞ্জয়োক্ত লক্ষণের অবিকল অনুরূপ। পরভাবী রূপগোস্বামী-ও তাঁর 'নাটকচন্দ্রিকা' গ্রন্থে এক-ই ভাবে জনান্তিকের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন –

" ত্রিপতাককরেনান্যানপবার্যান্তরা কথাম্ ।

যা মিথঃ ক্রিয়তে দ্বাভ্যাং তজ্জনান্তিকমুচ্যতে ॥"(না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ৫৯২)

একটি বিষয় এখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাট্যশাস্ত্র এবং তদনুসারী পরভাবী দশরূপকাদি গ্রন্থে প্রদত্ত জনান্তিকলক্ষণটি অনেকাংশে অপবারিতর অনুরূপ। অপবারিত উক্তিতে অবাঞ্ছিতর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়, জনান্তিক উক্তিতে ত্রিপতাকাবৎ হস্তভঙ্গির দ্বারা অবাঞ্ছিতকে বারণ করা হয়। অর্থাৎ একমাত্র ত্রিপতাকার প্রয়োগ ব্যতীত অপবারিত ও জনান্তিকের বৈশিষ্ট্যগত ও প্রয়োজনগত কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই একজন নাট্যকার যে স্থলে অপবারিতর প্রয়োগ করছেন, সেই স্থলে বা অনুরূপ অন্য কোনো স্থলে তিনি জনান্তিকের প্রয়োগ-ও করতে পারেন; ত্রিপতাকা নামক হস্তমুদ্রার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি – এই হবে একমাত্র পার্থক্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যকার শ্রীহর্ষ তাঁর নাট্যকৃতিগুলির কোনোটিতে জনান্তিকের প্রয়োগ করেননি, অপবারিত দ্বারা-ই তাঁর সংশ্লিষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে বরং নাট্যদর্পণের আলোচনায় এই দুই প্রকার সংলাপের প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়। এঁদের লক্ষণ অনুসারে, কোনো বিষয় যখন মঞ্চস্থ পাত্র-পাত্রীদের মাত্র একজন জানে, বাকিরা জানে না, তখন অপবারিত। জনান্তিক এর সম্পূর্ণ বিপরীত; যেখানে মাত্র একজনের কাছে কোনো বিষয় গোপন করা হয়, অন্যরা সবাই জানে। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – "যদ্বৃত্তমেকস্যৈব গোপ্যং বহূনামগোপ্যং তজ্জনান্তিকম্ । তদ্বিপরীতমপবারিতম্"। [৩৭] অতএব স্পষ্ট-ই দেখা যাচ্ছে, অপবারিত ও জনান্তিকের ভেদবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রাদির চেয়ে নাট্যদর্পণের আলোচনাটি অধিকতর প্রাঞ্জল। অভিনবভারতীতে-ও এক-ই ভাবে উভয়ের ভেদ নির্দেশ করা হয়েছে – "সর্বেষাং যন্নিগূহ্যতে এক এব শৃণুয়াদিতি তদপবারিতম্। জনান্তিকম্ একান্তিকত্বং চৈকস্যৈব নিগূহ্যত ইতি বিশেষঃ"(না.শা.পঞ্চবিংশ অধ্যায়)।

৫.আকাশোক্তি ঃ

আকাশোক্তির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'আকাশোক্তিঃ স্বয়ম্প্রশ্নপ্রত্যুত্তরমপাত্রকম্' (না.দ.১/১৩)। রঙ্গমঞ্চের কোনো চরিত্র যখন অদৃশ্য কোনো পাত্র-পাত্রীর উক্তিশ্রবণের অভিনয় দ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তরদ্বারে আলাপ করে, সেইরকম ভাষণকে আকাশোক্তি বলা হয়।

নাট্যদর্পণমতে এই আকাশোক্তি দুই প্রকারে প্রবর্তিত হতে পারে। প্রথমতঃ, অদৃশ্য পাত্রের প্রশ্নের উত্তরে নিজের উত্তরদান এবং দ্বিতীয়তঃ, নিজের প্রশ্নের উত্তরে অদৃশ্য পাত্রের প্রত্যুত্তরশ্রবণ। টীকাতে বলা হয়েছে - 'ক্বচিৎ স্বোত্তরার্থমনুভাষণচ্ছায়য়া পরকীয়ঃ প্রশ্নঃ ক্বচিৎ স্বপ্রশ্নস্যানুভাষণচ্ছায়য়া পরকীয়মুত্তরমিত্যুভয়মপ্যাকাশোক্তিরীতি'।[৩৮] নাট্যদর্পণকারদের এই আলোচনাটি অনেকাংশে-ই অভিনবভারতী-অনুসারী । বিশেষ এইমাত্র যে, আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে, মঞ্চস্থ চরিত্রটি যখন অদৃশ্য পাত্রের প্রশ্ন শুনে উত্তরদানে প্রবৃত্ত হবে, তখন সে 'মৈবং ব্রবীষি' – এই কথাটি বলে উত্তরদান আরম্ভ করবে – 'উত্তরত্বেন যানি কৃতানি বাক্যানি 'মৈবং ব্রবীষি' ইতি তৈঃ প্রযোজয়েদিতি'(না.শা.পঞ্চবিংশ অধ্যায়)।

শূন্য বা আকাশের দিকে তাকিয়ে এরূপ উক্তি করা হয় বলে, এই ক্রিয়ার নাম আকাশোক্তি। এই উক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, অদৃশ্য সেই পাত্র-পাত্রীর উক্তি অপরের শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, এমনকি দর্শকের-ও নয়। মঞ্চে উপস্থিত একমাত্র চরিত্রটি-ই একমাত্র শ্রোতা।

নাট্যশাস্ত্রে এজাতীয় নাট্যোক্তিকে 'আকাশবচন' নামে অভিহিত করা হয়েছে –

"দূরস্থাভাষণং যৎ স্যাদশরীরনিবেদনম্ ॥

পরোক্ষান্তরিতং বাক্যমাকাশবচনং তু তৎ।

তত্রোত্তরকৃতৈর্বাক্যৈঃ সংলাপং সংপ্রয়োজয়েৎ ॥''(না.শা. ২৫/৮৬,৮৭)

– অর্থ স্পষ্ট । মঞ্চে অপ্রবিষ্ট অশরীরী কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রশ্নোত্তরদ্বারে কৃত সংলাপকে আকাশবচন বলা হয়।

দশরূপকে এই নাট্যোক্তির নাম আকাশভাষিত –

"কিং ব্রবীষ্যেবমিত্যাদি বিনা পাত্রং ব্রবীতি যৎ ।

শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যেকস্তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্ ॥'' (দশ.রূ. ১/৬৭)

– কোনো এক পাত্র, অন্য কোনো পাত্রের উপস্থিতি ছাড়া-ই, যেন অনুক্ত অর্থবিশেষ শ্রবণ করে, 'কি বলছ' ইত্যাদি প্রকারে যে আলাপ করে, তাকে আকাশভাষিত বলা হয়। পরভাবী দর্পণকার দশরূপকের অবিকল অনুসরণে আকাশভাষিতর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন।

আকাশোক্তির প্রয়োজনবিষয়ে নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য সাগরনন্দী বলেছেন, দৃশ্যকাব্যে চরিত্রসংখ্যা হ্রাস করার জন্য আকাশোক্তির প্রয়োজন। দৃশ্যকাব্যে যখন অত্যল্প পরিমাণ সংলাপ কথনের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে স্বল্প সংলাপের জন্য পৃথক পাত্রপ্রবেশ না ঘটিয়ে, আকাশবচন, নেপথ্যোক্তি বা লেখের মাধ্যমে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে হয় –

" স্বল্পং কার্যমভিপ্রেতং বক্তুং পাত্রেণ কিং ফলম্ ।

আকাশবাঙ্-নেপথ্যোক্তি-লেখান্ তত্রাবকাশয়েৎ ॥''(না.ল.র.অষ্টাদশ অধ্যায়)

একটিমাত্র নাটকীয় পাত্রের দ্বারা অভিনেয় ভাণ নামক রূপকে আকাশভাষিতের বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য রূপকে এর প্রয়োগ খুব-ই সীমিত। তবে আমাদের অতিপরিচিত একটি নাটক থেকে আকাশোক্তির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর তৃতীয় অঙ্কে আকাশের দিকে কণ্বশিষ্যের এই উক্তি – " প্রিয়ংবদে ! কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি নীয়ন্তে। (শ্রুতিমভিনীয়) কিং ব্রবীষি, আতপলঙ্ঘনাদ্ বলবদস্বস্থা শকুন্তলা, তস্যাঃ শরীরনির্বাপণায় ইতি" – আকাশোক্তির উদাহরণ। সাম্প্রতিক কালের একক অভিনয় বা Mono-acting-এর ক্ষেত্রে আকাশোক্তির অস্তিত্ব বজায় আছে।

আদর্শ ইতিবৃত্ত ঃ

নাটকীয় ইতিবৃত্তের বিবিধ প্রকার ভেদ বিষয়ে নাট্যদর্পণে পূর্বে-ই আলোচনা করা হয়েছে। এবার একটি আদর্শ ইতিবৃত্তের মধ্যে কি কি বিষয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন, নাট্যদর্পণকাররা সে সম্বন্ধে আলোকপাত করছেন।

নাটক মূলতঃ হবে গদ্যে রচিত । কারণ গদ্যে নির্মিত রচনা-ই দর্শকের সুখাববোধের পক্ষে অধিক উপযোগী । এই গদ্য সুশ্রাব্য শব্দে ও সহজ ভাষায় রচিত হওয়া উচিৎ ; কঠিন এবং অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ যথাসম্ভব পরিহার করা উচিৎ । দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের পরিবর্তে সমাসবিহীন ছোট-ছোট শব্দ নাট্যভাষার পক্ষে অধিক উপযুক্ত । পরভাবী দর্পণকার-ও বলেছেন – 'ভবেদগূঢ়শব্দার্থঃ ক্ষুদ্রচূর্ণকসংযুতঃ' (সা.দ.৬/১২)। নাটক প্রধানতঃ গদ্যে রচিত হবে – এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নাটকে পদ্যের প্রয়োগ-ও থাকবে, তবে তার পরিমাণ হবে অল্প – 'স্বল্পপদ্যম্' (না.দ.১/১৪) ।

প্রধান নাটকীয় ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন অবান্তর বৃত্ত নাটকে সংযোজন করা যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এগুলি যেন মূল বৃত্তের উপকারক হয় । বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'নাট্যে হি তদেবাবান্তরং বৃত্তমাযোজ্যং যৎ পারম্পর্যেণ প্রধানফলসাধকম্' ।[৩৯] উদাহরণরূপে রত্নাবলী নাটিকার বানরের আগমনবৃত্তান্তটির উল্লেখ করা যায়, যে ঘটনার অব্যবহিত পরে-ই সাগরিকার অনুরাগের সূচনা । আবার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র বিরচিত 'নলবিলাস' নাটকে কাপালিক ও বিদূষকের বাহুযুদ্ধরূপ অবান্তর বৃত্তটিকে-ও এর উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে; কারণ এই বাহুযুদ্ধের ফলে-ই দময়ন্তীর প্রতিকৃতিটি ভূমিতে পতিত হয় এবং সেই চিত্রদর্শনে নিষধরাজ নলের মনে দময়ন্তীর প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হয়।

নাটকের মধ্যে সমুদ্র, নদী, সূর্য, চন্দ্র, বসন্তাদি ঋতু, প্রভাতাদি সময়, পর্বত, জলক্রীড়া, মধুপান ইত্যাদির বর্ণনা থাকতে পারে; তবে তা যেন প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হয়। বিনা প্রয়োজনে, কেবল কাব্যরচনামানসে উক্ত বিষয়গুলির বর্ণনা করা যাবে না। বৃত্তিতে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে – 'সিন্ধ্বাদিকং হি কাব্যকণ্ডূবশান্নিষ্ফলং ন বর্ণনীয়ম্' ।[৪০] প্রসঙ্গক্রমে এগুলির বর্ণনা করতে হলে-ও, একটি বা দুটি শ্লোকের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অন্যথায় এইসব প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনা নাটকের স্বচ্ছন্দ গতিকে হ্রাস করে দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠবে।

নাটক নানারসনিরন্তর হলে-ও, একটি মাত্র রস অঙ্গীরস রূপে এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় রসগুলি অঙ্গরস রূপে সন্নিবিষ্ট হয়। অঙ্গরসগুলির কাজ হল মূল রসকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ মূল রসের পরিপোষকতা করা। নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা বীর এবং শৃঙ্গাররসের মধ্যে যেকোনো একটি রসের অঙ্গিত্ব স্বীকার করেছেন। দশরূপকে বলা হয়েছে – 'একো রসো2ঙ্গীকর্তব্যো বীরঃ শৃঙ্গার এব বা' (দশ.রূ. ৩/৩৩) । চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য নাটকের নির্বহণসন্ধিতে থাকবে অদ্ভুতরসের সন্নিবেশ। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'নির্বহণে কর্তব্যো নিত্যং হি রসো2দ্ভুতঃ' (না.শা. ১৮/৪৩)।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, শৃঙ্গার-বীর-রৌদ্রাদি রসের প্রয়োগের মাধ্যমে যথাক্রমে স্ত্রীরত্ন-সাম্রাজ্য-শত্রুধ্বংসের ন্যায় ফলপ্রাপ্তি ঘটে থাকে। এজাতীয় অসাধারণ ফলের প্রাপ্তির জন্য-ই নাটকে এতরকম রসের সন্নিবেশ ঘটানো হয়ে থাকে।

বৃত্তিতে আরো বলা হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য যে রূপকমাত্র-ই রসাশ্রয়ী। কিন্তু তাই বলে রসের অত্যধিক পরিপোষকতা করে নাটকের মূল কথাবস্তুকে গুণীভূত করা এবং কথাবস্তু থেকে রসকে বিচ্ছিন্ন করা কখনো-ই বিধেয় নয়।

নাটকে উপমাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ অবশ্য-ই থাকবে। ভাবপ্রকাশনধৃত নাটকলক্ষণে বলা হয়েছে – 'শোভিতং চাপ্যলঙ্কারৈরুপমাদিভিঃ' (ভাব.প্র. অষ্টম অধিকার)। কিন্তু (রসের মত) অলঙ্কারের প্রয়োগ-ও যেন এমন না হয়, যাতে মূল নাট্যবস্তু থেকে দর্শকের মনোযোগ ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। অনুরূপে বিভিন্ন অঙ্গরস, সন্ধ্যঙ্গ ইত্যাদি-ও এমনভাবে প্রযুক্ত হবে, যাতে এগুলি মূল রসের অনুভবে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি না করে এবং পরিণামে মূল কাহিনীর অগ্রগতির সহায়ক হয়ে ওঠে। দশরূপককারের এই উক্তিটি এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক –

"ন চাতিরসতো বস্তু দূরং বিচ্ছিন্নতাং নয়েৎ ।

রসং বা ন তিরোদধ্যাদ্ বস্ত্বলঙ্কারলক্ষণৈঃ ॥"(দশ.রূ.৩/৩২)

প্রাগুক্ত কোনো বিষয়ের পুনরুল্লেখ করতে হলে 'কর্ণে' – এই মঞ্চকৌশলটির প্রয়োগদ্বারে সংশ্লিষ্ট পাত্রের কর্ণে বিষয়টি বলতে হবে। এর দ্বারা অভিনয়ে পুনরুক্তিদোষ পরিহার করা যায়।

নাটকীয় ঘটনাবলীর বিন্যাস হবে গোপুচ্ছের ন্যায় । গোপুচ্ছে যেমন কয়েকটি কেশ হ্রস্ব, কয়েকটি তদপেক্ষা দীর্ঘ এবং কয়েকটি তদপেক্ষা-ও দীর্ঘ হয়, তেমনি নাটকের ঘটনাগুলির একেকটির একেক রকম বিস্তার হবে। কোনোটি মুখসন্ধিতে-ই সমাপ্ত হবে, কোনোটি প্রতিমুখসন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, আবার কোনোটি নাটকের অন্তিম অংশ নির্বহণসন্ধি পর্যন্ত প্রসারিত হবে। বৃত্তিতে 'রত্নাবলী' নাটিকার উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, যেখানে বসন্তোৎসবরূপ ক্ষুদ্র ঘটনাটি কেবলমাত্র মুখসন্ধিতে নিবদ্ধ; মুখসন্ধিতে উপন্যস্ত বাভ্রব্য প্রমুখের কাহিনী নির্বহণসন্ধির শুরুতে পুনরায় উল্লিখিত হচ্ছে এবং সাগরিকালাভরূপ প্রধান ফলপ্রাপ্তির বিষয়টি মুখ থেকে শুরু করে নির্বহণসন্ধি পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে, নাটকের বন্ধন হবে গোপুচ্ছাগ্রের ন্যায় – 'কার্যং গোপুচ্ছাগ্রং কর্তব্যং কাব্যবন্ধমাসাদ্য'(না.শা.১৮/৪২)। এই অংশটির ব্যাখ্যায় অভিনবভারতীতে একটি মতের উল্লেখ করা হয়েছে –'ক্রমসূক্ষ্মাঙ্গমিতি কেচিৎ' (না.শা.অষ্টাদশ অধ্যায়) – অর্থাৎ নাটকের অঙ্কগুলিকে

ক্রমে স্বল্পায়তন করতে হবে। বলা বাহুল্য যে, এই মতটি যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়। অদ্যাবধি প্রাপ্ত কোনো নাটকে এইরকম অঙ্কবিন্যাস দেখা যায় না।

নাটকে কোন্-কোন্ বিষয় অবশ্যপ্রযোজ্য, তা আলোচনার পর কোন্-কোন্ বিষয় নাটকে পরিহার্য, সেগুলির কথা-ও নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে। এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক কারিকাটি নিম্নরূপ –

"অযুক্তং চ বিরুদ্ধং চ নায়কস্য রসস্য বা।

বৃত্তং যৎ তৎ পরিত্যাজ্যং প্রকল্প্যমথবান্যথা ॥" (না.দ.১/১৮)

–যে সকল ঘটনা নাটকের নায়ক ও রসের পক্ষে অনুচিত এবং বিরুদ্ধ, সেই সকল ঘটনা পরিহার্য অথবা উপায়ান্তরের দ্বারা নির্দোষরূপে উপস্থাপনীয়।

বৃত্তিতে নায়ক এবং রসের অনুচিত ও বিরুদ্ধ বস্তুগুলি উদাহরণযোগে প্রাঞ্জল করা হয়েছে। ধীরললিত কোনো নায়কের দ্বারা পরস্ত্রীসম্ভোগ হল অনুচিত বিষয়; স্বভাবে উদ্ধতভাব হল বিরুদ্ধ বিষয়। শৃঙ্গাররসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি হল অনুচিত বিষয়; বীভৎসরসের প্রকাশ হল বিরুদ্ধ বিষয়। এজাতীয় সর্বপ্রকার অনৌচিত্য এবং বিরোধ নাটকে সর্বথা বর্জনীয়। যদি কোনো কারণে নাটকে এরকম কোনো ঘটনা সন্নিবেশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন অন্য কোনো উপায়ে এমনভাবে এগুলির উপস্থাপন করতে হবে, যাতে এগুলি প্রাসঙ্গিক, স্বাভাবিক ও যথাযথ রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন – 'নলবিলাস' নাটকে ধীরললিত নায়ক কর্তৃক স্বীয় পত্নীপরিত্যাগের ন্যায় অনুচিত ঘটনাকে উচিৎ রূপে উপস্থাপিত করার জন্য কাপালিকবৃত্তান্তের অবতারণা করা হয়েছে।

অঙ্কলক্ষণ ঃ

নাটকলক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণে 'সাঙ্কোপায়-দশা-সন্ধি'– এই বিশেষণটির প্রয়োগ করা হয়েছে। নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেই অঙ্কবিষয়ে এবার আলোচনা করা হচ্ছে।

অঙ্কলক্ষণবিষয়ে নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য সাগরনন্দী বলছেন – 'অঙ্কশ্চাখ্যানগ্রন্থস্য পরিচ্ছেদয়িতা' (না.ল.র. পঞ্চম অধ্যায়) – গ্রন্থকে যা পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে, তাই অঙ্ক। নাট্যদর্পণকারদ্বয় প্রথমে-ই অত্যন্ত সযুক্তিক ভাবে নাটকে এই অঙ্কবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তাঁদের মতে, অঙ্কভেদের কারণ– 'অবস্থায়াঃ সমাপ্তির্বা ছেদো বা কার্যযোগতঃ' (না.দ.১/১৯) । বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। বাচিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা নাট্যবস্তুকে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করার জন্য যে গতির প্রয়োজন, সেই গতির পাঁচটি অবস্থা – প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম। এই পঞ্চপ্রকার অবস্থার যে কোনোটির উপক্রমপূর্বক সমাপ্তিতে অথবা কার্যবশতঃ বিচ্ছেদে অঙ্কের অবতারণা । সূচনাপূর্বক যে কোনো অবস্থার পরিসমাপ্তিতে অঙ্কের

অবতারণা করা হয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অবস্থার সমাপ্তি না ঘটলে-ও, দূর দেশে গমন বা বহুদিনব্যাপী কোনো কার্যের সংঘটনা, যা একদিনে অভিনয়সাধ্য নয়, ইত্যাদি ক্ষেত্রে-ও কার্যবশতঃ নাটকে যে বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়, তার জন্য অঙ্কের অবতারণা করা হয়।

নাটকে অঙ্কবিন্যাসের এই কারণবিশ্লেষণ আমরা অন্যান্য নাট্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থে পাই না। গ্রন্থে আলোচিত এই বিষয়টি সেদিক থেকে বিচার করলে যথেষ্ট অভিনব। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য। যে সকল নাট্যকার অঙ্কের পরিসমাপ্তি না করে কোনো অঙ্কের মধ্যপথে অবস্থাবিশেষের সমাপ্তি ঘটান, নাট্যদর্পণকাররা তাঁদের সমালোচনা করেছেন। প্রয়োজনে একটি অবস্থা একাধিক অঙ্ক ব্যাপৃত হতে পারে; কিন্তু একটি অঙ্কের সমাপ্তির পূর্বে একটি অবস্থার সমাপ্তি নাট্যদর্পণকারদের মনোনীত নয়। বৃত্তিতে এই বিষয়টি কেবলমাত্র 'বৃদ্ধসম্প্রদায়'-এর মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমালোচনার লক্ষ্য যে কারা, তা এখানে স্পষ্ট নয়।

যাই হোক্, আমরা অঙ্কের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি। অঙ্ক হবে 'সবিন্দুঃ' – অর্থাৎ বিন্দুসহ। বিন্দু কি, এ ব্যাপারে সংক্ষেপে বলা যায় – 'অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্' (সা.দ. ৬/৬৬) – আনুষঙ্গিক অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক কোনো কার্যের দ্বারা নাটকের মূল প্রয়োজনের বিচ্ছেদ ঘটলে-ও যা নাটকীয় কাহিনীর বিচ্ছেদহীনতার কারণ হয়, যার জন্য ঘটনার সংহতি বিনষ্ট হয় না, তার নাম বিন্দু। নাট্যশাস্ত্রমতে –

"প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্ ।
যাবৎ সমাপ্তিঃ কার্যস্য স বিন্দুরিতি কথ্যতে ॥" (না.শা. ১৯/২৩)

জলে তৈলবিন্দুর মত নাটকীয় ঘটনার বিস্তারে সাহায্য করে এই বিন্দু, নাটকীয় ঘটনার গতিকে দ্রুততর করে। তবে বিন্দুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারিতা হল, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অঙ্কের ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ রচনা করা। পূর্বোত্তর অঙ্কদ্বয় যাতে অসম্বদ্ধ হয়ে না পড়ে, তারজন্য-ই পূর্ব অঙ্কের অন্তিমে বিন্দু নিবেশ করা হয়ে থাকে। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে –'পূর্বোত্তরয়োরঙ্কয়োরসম্বদ্ধার্থত্বং মা ভূদিতি পূর্বাঙ্কস্যান্তে বিন্দুর্নিবন্ধনীয়ঃ'।[৪১] এখানে 'নলবিলাস' নাটকের স্বয়ংবরাঙ্কের একটি শ্লোককে বিন্দুর উদাহরণরূপে উদ্ধার করা হয়েছে, যেখানে জনৈক বন্দী কর্তৃক শ্লিষ্টপদসমূহের দ্বারা সূর্যাস্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে পরবর্তী অঙ্কের ভাবী দময়ন্তীপরিত্যাগরূপ ঘটনার সূচনা করা হচ্ছে –

" বিন্যস্যাভিনবোদয়ে শ্রিয়ময়ং রাজ্ঞি প্রতাপোজ্ঝিতো
দূতস্য ব্যসনীব ধূসরকরঃ সন্ত্রুট্যদাশাস্থিতিঃ ।
নিদ্রায়দ্দললোচনাং কমলিনীং সন্তজ্য মধ্যে বনং
ক্রামত্যম্বরখণ্ডমাত্রবিভবো দেশান্তরং গোপতিঃ ॥"

বিন্দুনিবেশের এই কার্যকারিতাবিষয়ে দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণের সমর্থন পাওয়া যায়। সাহিত্যদর্পণ অনুসারে অঙ্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল – 'বিচ্ছিন্নাবান্তরৈকার্থঃ কিঞ্চিৎসংলগ্নবিন্দুকঃ' (সা.দ. ৬/১৩)। অবান্তর অর্থাৎ আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা, যা অবশ্য-ই এক অঙ্কে সমাপ্ত হবে, তার সঙ্গে মূল নাটকীয় বৃত্তের সংযোগসাধনের জন্য বিন্দুর নিবেশ অবশ্যকরণীয়। দশরূপকের অঙ্কলক্ষণে-ও বলা হয়েছে – 'বিন্দুব্যাপ্তিপুরস্কৃতঃ' (দশ.রূ.৩/৩০)। অতএব দেখা যাচ্ছে, নাট্যতত্ত্বমূলক বিবিধ গ্রন্থে অঙ্কের অন্তিমে বিন্দুনিবেশের স্পষ্ট নির্দেশ করা হয়েছে।

নাট্যদর্পণের টীকায় আরো একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। অঙ্কে বিন্দুনিবেশ 'উপযোগাপেক্ষম্'। তাই নাটকের অন্তিম অঙ্কের শেষে বিন্দুনিবেশ অপ্রয়োজনীয়। অনুরূপে একাঙ্ক রূপকসমূহ এবং সমবকারাদি রূপকভেদ, যেখানে অঙ্কসমূহ পরস্পর সুসম্বদ্ধ নয়, সেখানে বিন্দুনিবেশের প্রয়োজন নেই – 'সর্বরূপকপর্যন্তাঙ্কেষ্বেকাঙ্কেষু চ রূপকেষু সমবকারাদ্যঙ্কেষু চোপযোগাভাবাদ্ বিন্দোরনিবন্ধঃ'।[৪২]

অঙ্কের নাট্যদর্পণধৃত পরবর্তী লক্ষণ হল 'দৃশ্যার্থঃ'– নাটকে নায়কের চরিত অর্থাৎ জীবন ও কার্যকলাপ, তাঁর সুখদুঃখাদি অনুভূতিসমূহ ইত্যাদির বিশদ বিবরণ থাকবে। কারণ, নায়ক হলেন নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, যাঁকে ঘিরে নাটকীয় ঘটনার আবর্তন; তাঁর চরিতসাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে দর্শকচিত্তে রসের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধন অসম্ভব। এই চরিত্রবর্ণন হবে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ দর্শকের সাক্ষাৎকৃত। সাহিত্যদর্পণ এবং দশরূপক, উভয়ত্র-ই বলা হচ্ছে – 'প্রত্যক্ষনেতৃচরিতঃ'– অর্থাৎ দর্শকবৃন্দের সম্যক্ পরিবোধের জন্য নায়কের জীবন ও কার্যকলাপের বিবরণ স্পষ্টভাবে, দৃশ্যমানভাবে উল্লিখিত হতে হবে। ধনিক বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন – 'রঙ্গপ্রবেশে সাক্ষাৎ নির্দিশ্যমাননায়কব্যাপারঃ' (দশ.রূ.তৃতীয় প্রকাশ)। টীকাতে বলা হচ্ছে, বিবাহাদি উৎসব এবং শাপাবসানাদি-ও প্রত্যক্ষযোগ্য। কারণ, এগুলি দর্শকদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' ত্রোটকে উর্বশীর শাপাবসানে লতাভাবের বিনাশ ইত্যাদি উপন্যস্ত হয়েছে । অতএব, সমাসতঃ দর্শকদের মনোরঞ্জনক্ষম বিষয়সমূহ-ই নাটকে প্রদর্শিতব্য, অন্যান্য বিষয় নয়। অন্য বিষয়গুলি অভ্যুহ্য অর্থাৎ প্রণিধানগম্যভাবে উপস্থিত হবে অথবা সূচ্য অর্থাৎ নীরসতা বা অশালীনতার কারণে প্রদর্শিত হবে না।

অতএব দেখা গেল, নায়কের কার্যকলাপাদির প্রত্যক্ষীকরণ অঙ্কে অবশ্যকর্তব্য। সাহিত্যদর্পণ এবং দশরূপকে অঙ্কের অন্যতম একটি বিশেষণ হল – 'আসন্ননায়কঃ'। মিতভাষিণীটীকায় বলা হচ্ছে, নাটকের প্রতিটি অঙ্কে নায়কের উপস্থিতি সম্ভবপর না-ও হতে পারে, কিন্তু তার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন বা তার বারম্বার উল্লেখের দ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবে হলে-ও নায়কপ্রসঙ্গ প্রধানভাবে অভিব্যক্ত হবে। যেমন

– 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে নায়ক দুষ্যন্ত অনুপস্থিত থাকলে-ও, ঐ অঙ্কে বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ পরিলক্ষিত হয়।

নাট্যদর্পণে অঙ্কে প্রদর্শিতব্য বিষয়গুলির কয়েকটির উপর নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যথা – নাটকের প্রধান নায়কের অর্থাৎ অধিকারীর 'অভিঘাত' অর্থাৎ রক্তাক্ত প্রহার, বধ ইত্যাদি প্রদর্শন করা যাবে না। বিষ্কম্ভকাদি অর্থোপক্ষেপকের মধ্যে-ও এই বিষয়গুলির নিবেশ করা যাবে না। বৃত্তিতে বিশদে বলা হচ্ছে, এই অভিঘাত পরকৃত হলে নিষিদ্ধ হবে, স্বকৃত হলে নয়। যেমন – 'সত্যহরিশ্চন্দ্র'-এ রাজা হরিশ্চন্দ্র দেবোৎসর্গের জন্য যখন স্বীয় দেহমাংস স্বয়ং কর্তন করছেন, তা প্রদর্শন দোষাবহ নয়। অন্যকৃত শব্দের দ্বারা-ও এখানে শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদেরকে-ই বুঝতে হবে, স্বপক্ষীয়দের নয়। উদাহরণস্বরূপ 'নাগানন্দ' নাটিকার দৃশ্যবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে জীমূতবাহন সর্পকুলের রক্ষার কারণে নিজেকে গরুড়ের প্রতি সমর্পণ করছেন – এই দৃশ্যটি মঞ্চে প্রদর্শনযোগ্য। কিন্তু কোনোভাবে-ই বিপক্ষীয় কোনো ব্যক্তিকর্তৃক প্রধান নায়কের বধ বা প্রহার অঙ্কে উপস্থাপন করা অভিপ্রেত নয়। নাট্যশাস্ত্র থেকে এর সমর্থনে শ্লোক উদ্ধার করা যায় –

" অঙ্কে প্রবেশকে চ প্রকরণমাশ্রিত্য নাটকে বাপি ।

ন বধঃ কর্তব্যঃ স্যাদ্যো2ভ্যুদয়ী নায়কঃ খ্যাতঃ ॥" (না.শা.১৮/৩৯)

দশরূপকে-ও বলা হয়েছে – 'নাধিকারিবধং ক্বাপি' (দশ.রূ. ৩/৩৬)। ধনিক বিশদে বলছেন – 'অধিকৃতনায়কবধং প্রবেশকাদিনা অপি ন সূচয়েত্' (দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ)।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধেয়। বধপ্রহারাদি প্রদর্শনের নিষেধ কিন্তু কেবলমাত্র প্রধান নায়কের ক্ষেত্রে, অপ্রধান পতাকানায়ক বা প্রকরীনায়কের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোক্তব্য নয়। তাই 'রঘুবিলাস' নাটকে শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের প্রবেশ দোষাবহ নয়। কারণ, সীতা-আনয়নরূপ কার্যের ফলস্বামিত্বের কারণে শ্রীরাম-ই এখানে প্রধান নায়ক, লক্ষ্মণ হলেন গৌণ, পতাকানায়ক।

নাট্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, প্রধান নায়কের বন্ধন-পলায়ন-সন্ধি ইত্যাদি-ও প্রদর্শিতব্য নয়; একমাত্র যদি এগুলি কোনো বিশিষ্ট ফলের কারণরূপে গণ্য হয়ে থাকে, তবে-ই এগুলিকে অঙ্কে সন্নিবিষ্ট করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'বাসবদত্তানৃত্তবার' রূপকে উজ্জয়িনীতে রাজা উদয়নের বন্ধনের দৃশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে, যা পরিণামে নায়কের রাজ্যপ্রাপ্তির কারণ হয়। অতএব, এই ঘটনার অঙ্কে সন্নিবেশে কোনো বাধা নেই। নাট্যশাস্ত্রে-ও প্রত্যক্ষভাবে নায়কের অপসরণ, বন্ধন বা সন্ধির প্রদর্শন নিষিদ্ধ। তদনুসারে, এসব ঘটনা বিবিধ নাট্যকৌশল বা কাব্যশ্লেষের দ্বারা বোঝানো যেতে পারে। অতএব প্রধান নায়কের বধপ্রহারাদি এবং বিশেষ ফললাভ ব্যতিরেকে বন্ধনাদির

সন্নিবেশ অঙ্কে নিষিদ্ধ। সমগ্র নাট্যসাহিত্যে ভাসরচিত 'উরুভঙ্গ'-ই একমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে অন্তিমে প্রধান নায়কের বধ দেখানো হয়েছে।

অঙ্কের দৈর্ঘ্যবিষয়ে এবার আলোচনা করা যাক্ । নাট্যদর্পণে এবিষয়ে নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে – 'চতুর্যামো মুহূর্ততঃ'(না.দ.১/১৯) – অর্থাৎ নাটকে অঙ্কবিশেষের নিম্নসীমা হল এক মুহূর্ত এবং ঊর্দ্ধসীমা চারযাম। এক মুহূর্ত্ত = ৪৮ মিনিট এবং চার যাম = ১২ ঘণ্টা। এক মুহূর্তের চেয়ে কম হলে অঙ্কে নাট্যরসের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। আবার ১২ ঘণ্টার অতিরিক্ত দীর্ঘ হলে প্রাত্যহিক কার্যাদি সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

নাট্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, একটি অঙ্কে বহুসংখ্যক প্রাসঙ্গিক কার্য নিবন্ধনীয় হওয়া উচিৎ নয়। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হচ্ছে – 'ন যুক্তো বহুভিঃ কার্যৈঃ' (সা.দ. ৬/১৩) – অর্থাৎ একটি অঙ্কে বহুপ্রকার কার্যের অবতারণা তথা সম্পাদন করা যাবে না। যদি প্রয়োজনবশতঃ এরূপ করতে হয়, তাহলে তা আবশ্যক কার্যাদি, যথা সন্ধ্যাবন্দনা-ভোজনাদির সঙ্গে অবিরোধিভাবে করতে হবে। সাহিত্যদর্পণের মিতভাষিণীটীকায় বিশদে বলা হচ্ছে, যে শ্রেণীর পাত্রের যা অবশ্যসম্পাদনীয় কার্য, তার সঙ্গে সংঘাত না করে একাধিক কার্যের সূচনা করা যেতে পারে। যেমন – কোনো ব্রাহ্মণজাতীয় পাত্রের পক্ষে সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি আবশ্যক কর্ম। সেই সময় উক্ত পাত্র উক্ত কর্ম উল্লঙ্ঘন করে অন্য কার্যে লিপ্ত হতে পারবে না। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হচ্ছে –

"একাঙ্কেন কদাচিৎ বহূণি কার্যাণি যোজয়েদ্ধীমান্।
আবশ্যকাবিরোধেন তত্র কাব্যানি কার্যাণি ॥" (না.শা.১৮/২২)

নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে – 'একদিবসপ্রবৃত্তঃ কার্যস্ত্বঙ্কঃ' (না.শা.১৮/২১) – একটি অঙ্ক একটি দিনের মধ্যে সমাপ্ত হবে । দশরূপকে আরো বলা হচ্ছে – 'একাহচরিতৈরেকার্থম্' (দশ.রূ. ৩/৩৬)– অর্থাৎ একটি অঙ্কে একটিমাত্র দিনের মধ্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে নায়ক কার্যব্যাপৃত থাকবেন। এক অঙ্কমধ্যে একাধিক দিবসব্যাপ্তি ও একাধিক কার্যব্যাপ্তি নিষিদ্ধ। ভাবপ্রকাশনে-ও এক-ই মত পোষণ করে বলা হচ্ছে –

"নায়কস্য যদেকাহচরিতপ্রতিপাদকঃ।
একপ্রয়োজনাশ্লিষ্টঃ .... ॥" (ভাব.প্র.অষ্টম অধিকার)

অনন্তর অঙ্কে প্রবিষ্ট পাত্রগণের সংখ্যা। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, একটি অঙ্কে পাত্রের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে চার বা পাঁচ, মধ্যমপক্ষে আট এবং অধিকপক্ষে দশ পর্যন্ত হতে পারে। অঙ্কে প্রবিষ্ট পাত্রসংখ্যা অবশ্য-ই নাটকীয় প্রয়োজন এবং সুষ্ঠু সম্পাদনের উপর নির্ভর করে বিহিত হবে, ইচ্ছানুসারে নয়; তবে এই সংখ্যা কোনোভাবে-ই দশের বেশি হবে না। সেক্ষেত্রে আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ

অভিনয়ের যথাযথ প্রত্যক্ষীকরণ ও রসাস্বাদন দর্শকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে । তাই বহুব্যক্তিসাধ্য পর্বতারোহণাদি কার্যের অঙ্কে নিবেশ অনুচিত বলে নাট্যদর্পণকারদের মত। সমবকারাদি রূপকের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম সর্বথা প্রযোজ্য নয়। কারণ, সমবকারে দ্বাদশসংখ্যক বিখ্যাত ধীরোদাত্ত দিব্য বা মনুষ্যনায়ক থাকেন। অতএব এসব ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দশরূপক, ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে কিন্তু বলা হচ্ছে, একটি অঙ্কে তিনজন বা চারজন নাটকীয় চরিত্র থাকতে পারে, তার বেশি নয়।

পাত্রসংখ্যা যাই হোক্ না কেন, বিনা কারণে কারো প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটবে না। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হচ্ছে –

“নাহেতুকঃ প্রবেশো2ঙ্কে কস্যাপি জায়তে ত্বপি।

নিষ্ক্রান্তিরপি ততঃ স্যাদ্ ব্যালম্ব্যার্থং প্রসঙ্গং চ ॥” (না.ল.র. পঞ্চম অধ্যায়)

অঙ্কের শেষে, স্বীয় কার্যসমাপনান্তে সকলে প্রস্থান করবেন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – ‘রঙ্গং তু যে প্রবিষ্টাঃ সর্বেষাং ভবতি তত্র নিষ্ক্রামঃ’ (না.শা. ১৮/২৩)। পরভাবী শারদাতনয়-ও বলেছেন – ‘সমস্তপাত্রনিষ্ক্রামাবসানো2ঙ্কো2ভিধীয়তে’ (ভাব.প্র. অষ্টম অধিকার)। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে – ‘অন্তনিষ্ক্রান্তনিখিলপাত্রঃ’ (সা.দ. ৬/১৯) ।

এরপর নাটকের অঙ্কসংখ্যার বিচার। পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য অনুসারে-ই নাট্যদর্পণে অঙ্কসংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়েছে। নাটকে অঙ্কসংখ্যা হবে ন্যূনপক্ষে পাঁচ, অধিকপক্ষে দশ। নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী মধ্যমপক্ষে ছয়-সাত-আট বা নয় অঙ্কের-ও নাটক হতে পারে। এই বিষয়টি টীকায় বিশদে আলোচনা করা হচ্ছে। যদি আরম্ভাদি পঞ্চাবস্থার প্রতিটি এক-ই অঙ্কে পরিসমাপ্ত হয়, তবে অঙ্কসংখ্যা হবে পাঁচ। যদি কোনো ক্ষেত্রে একটি অবস্থা দুটি অঙ্কব্যাপী হয়, তবে একটি হবে উপক্রমাঙ্ক, অপরটি উপসংহারাঙ্ক এবং অপর চারটি অবস্থার জন্য চারটি অঙ্ক; অতএব এখানে অঙ্কসংখ্যা হবে ছয়। এভাবে অপরাপর ক্ষেত্রগুলিতে-ও অবস্থার অঙ্কব্যাপিত্বের উপর নির্ভর করে অঙ্কসংখ্যা স্থিরীকৃত হবে। কোনো-কোনো সময় একটি অবস্থা তিনটি অঙ্কব্যাপী-ও হতে পারে । যেমন – ‘বেণীসংহার’ নাটকের গর্ভসন্ধি অংশে প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থাটি নাটকের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম – এই তিন অঙ্ক জুড়ে বিধৃত।

অবস্থাবিন্যাস যেমন-ই হোক্, নাটকের অঙ্কসংখ্যা কখনো-ই দশের বেশী হবে না। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে – ‘পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্তিতাঃ’ (সা.দ. ৬/৮)। দশরূপকে-ও বলা হচ্ছে – ‘পঞ্চাঙ্কমেতদবরং দশাঙ্কং নাটকং পরম্’ (দশ.রূ. ৩/৩৮)। নাটিকা ও প্রকরণী – এই

দুই ক্ষেত্রে একটি অঙ্কে একাধিক অবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে বলে এদের অঙ্কসংখ্যা চারটি এবং তা দোষাবহ নয়।

সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে অঙ্কের আরো কতগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে, নাট্যদর্পণে যার উল্লেখ নেই। যেমন সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে, অঙ্কের প্রতিপাদ্য বিষয় অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দে নির্মিত হবে না; ভাষা হবে সহজগম্য ও পরিচিত। এতে গদ্যের আধিক্য থাকলে-ও, অল্পবিস্তর পদ্য অর্থাৎ শ্লোকাদি থাকতে পারে। চূর্ণকজাতীয় ক্ষুদ্র শ্লোকের ব্যবহার কাম্য। বহু প্রকার চিত্তবিনোদনকারী ঘটনা অঙ্কে স্থান নেবে। বীজ অর্থাৎ নাটকীয় বৃত্তের মূল হেতু, যার বহুধা বিস্তারে নাটকের বিকাশ ও অগ্রগতি, তা কখনো অঙ্কমধ্যে পরিসমাপ্ত হবে না। নাটকের অন্তিমে ফলপ্রাপ্তির মাধ্যমে বীজের সার্থকতা, তাই নাটকের মধ্যে ফলোদয় হয়ে গেলে পরবর্তী অঙ্কগুলির আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। দশরূপকে বলা হচ্ছে, অঙ্কে পতাকাস্থানের ব্যবহার কাম্য।

তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে আলোচিত হলে-ও, নাট্যদর্পণে বিস্ময়করভাবে অনুল্লেখিত, তা হল অঙ্কে রসের ব্যবহার। সাহিত্যদর্পণে বলা হচ্ছে, প্রতিটি অঙ্ক হবে – 'রসভাবসমুজ্জ্বলঃ' (সা.দ. ৬ /১২)। অঙ্কমধ্যে প্রধান চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্ঞী-সেনাপতি-বিদূষক-বণিগাদি বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্রগুলি-ও বিবিধ ঘটনাদ্বারে এমন ভাবে চিত্রিত হবে, যাতে সেগুলি রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস প্রভৃতির উদ্বোধ ঘটায়। দশরূপকে অঙ্কে রসের প্রয়োগ নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, অনুভাব-বিভাব-ব্যভিচারিভাবের দ্বারা দর্শকচিত্তে রসের আস্বাদন ঘটানো অঙ্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। রসের অতি-ব্যবহার দ্বারা নাট্যবস্তুকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, আবার ঘটনার বাহুল্যে বা উপমাদি অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগে রসকে ভারাক্রান্ত-ও করা যাবে না। অঙ্কের প্রধান রস অর্থাৎ অঙ্গীরস হবে বীর অথবা শৃঙ্গার; অন্যান্য রসগুলি প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গরসরূপে ব্যবহৃত হবে। চমৎকারিত্বসৃষ্টির জন্য নির্বহণসন্ধিতে অর্থাৎ নাটকের অন্তিম অঙ্কের অন্তিম অংশে অদ্ভুত রসের প্রয়োগ করতে হবে। এবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশটি হল – 'নির্বহণে কর্তব্যে নিত্যং হি রসো2দ্ভুতঃ' (না.শা. ১৮/৪৩) ।

অঙ্কে যে যে বিষয়ের প্রদর্শন করা যাবে না, তার তালিকায় নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, দূরদেশে গমন, নগরাবরোধ, রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ-বিপ্লব, রতিমূলক আচার-আচরণ, মৃত্যু, হস্ত-পদচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয় অঙ্কমধ্যে দেখানো যাবে না। প্রয়োজনে বিষ্কম্ভকাদি পঞ্চপ্রকার অর্থোপক্ষেপকের দ্বারা এগুলি সূচিত করা যাবে মাত্র। দেশান্তরগমনরূপ মুখ্যকার্যে বিশ্রামগ্রহণ-শয়ন-পান-ভোজনাদি বহু নীরস এবং অবান্তর কার্য থাকে, অঙ্কমধ্যে যেগুলির নিবেশ সর্বথা অপ্রয়োজনীয় । তবে সমবকারাদি রূপক, যেখানে নায়ক দিব্য, সেখানে অধ্বগমন দেখানো যেতে পারে। কারণ, দিব্যপুরুষদের পক্ষে

স্বল্পসময়ে গগনমার্গে বিচরণ সম্ভবপর। নগরাবরোধের ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক যুদ্ধাস্ত্রসজ্জা বা সুড়ঙ্গনির্মাণাদির ন্যায় সময়সাপেক্ষ কার্য অঙ্কে প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। রাজ্যের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, রাজগণের পদচ্যুতি বা তাঁদের বিনাশ, দেশে বন্যা-দুর্ভিক্ষজনিত সঙ্কটাবস্থা, 'আদি' পদের দ্বারা গৃহীত সমাজবিপ্লব, ধর্মবিপ্লব ইত্যাদি-ও অঙ্কে প্রদর্শনীয় নয়। অঙ্কে ব্রীড়াকর রতিমূলক আচরণসমূহ যথা – দন্তচ্ছেদ, নখচ্ছেদ, শয়ন, অধরপান, স্নান, অনুলেপনাদির ব্যবহার ইত্যাদির প্রদর্শন করা যাবে না। দশরূপকে এর সঙ্গে বসনগ্রহণকে-ও অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। বধ তথা মৃত্যুর দৃশ্য অঙ্কে দেখানো যাবে না। 'সমীক' অর্থাৎ হস্ত-পাদাদির ছেদ-ও অঙ্কে প্রদর্শিতব্য নয়। কেবলমাত্র অঙ্গচ্ছেদ-ই এখানে বিবক্ষিত; তাই 'নাগানন্দ'-তে জীমূতবাহনের ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষণবৈকল্যের দৃশ্যায়ন দোষাবহ নয়। সাহিত্যদর্পণে দূর থেকে কোনো ব্যক্তিকে আহ্বান, বিবাহ,অভিশাপ,উৎসর্গাদির বর্ণনাকে-ও এই নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্গত করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে-ও আমরা এর সমর্থন পাই।

একটি বিষয় এখানে বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। নাট্যদর্পণকারদের মতানুসারে, উল্লিখিত বিষয়গুলি অঙ্কমধ্যে দেখানো যাবে না; কিন্তু বিষ্কম্ভকাদি পঞ্চপ্রকার অর্থোপক্ষেপকের অন্যতম দ্বারা এগুলি সূচিত করা যাবে। এই মত নাট্যশাস্ত্রানুসারী । নাট্যশাস্ত্রে অঙ্কে অপ্রদর্শিতব্য বিষয়গুলির তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে – 'অপ্রত্যক্ষকৃতানি প্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি' (না.শা.১৮/৩৯)। দশরূপকের অবলোকটীকায় ধনিক বলেছেন –'অঙ্কৈর্নৈবোপবধ্নীত, প্রবেশকাদিভিরেব সূচয়েদিত্যর্থঃ' (দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ)। সাহিত্যদর্পণে কিন্তু উক্ত বিষয়গুলি সর্বথা বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; প্রবেশকাদিদ্বারে-ও এগুলির সূচনা দর্পণকারের অনভিপ্রেত– 'এভিঃ বর্জিতঃ' (সা.দ. ৬/১৮)। দর্পণকারের মত অনুসরণ করলে আমাদের কিন্তু বহুবিধ অসঙ্গতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন – মহাকবি ভবভূতির 'উত্তরামচরিত' নাটকের কুম্ভাঙ্কে তিলোত্তমা ও সানুমতীর দ্বারা কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও লঙ্কাপুরীর অবরোধ, প্রাবৃডঙ্কে কঙ্কালকের দ্বারা বালীর মৃত্যু ইত্যাদি বৃত্তান্ত প্রবেশকাদির দ্বারা সূচিত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যদর্পণ অনুসরণ করলে এগুলি আলঙ্কারিক নীতির উল্লঙ্ঘন বলে মনে করতে হবে। নাটকলক্ষণরত্নকোশের পঞ্চম অধ্যায়ে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

রূপকে অপ্রদর্শিতব্য এইসকল সামান্য নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম-ও আছে। মহাকবি ভাসের বেশ কয়েকটি নাটকে এই রীতিসমূহ লঙ্ঘিত হয়েছে। 'ঊরুভঙ্গ' নাটকে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ, 'অভিষেক' নাটকে বালীর বধ ও মৃত্যু, 'প্রতিমা' নাটকে দশরথের মৃত্যু – এসব-ই মঞ্চস্থ করা হয়েছে। মহাকবি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রথমাঙ্কে শ্রীরামের বক্ষে সীতার শয়ন, মহাকবি

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের তৃতীয়াঙ্কের বহু দৃশ্যে রতিমূলক আচরণ, দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলাকে চুম্বনোদ্যোগ, এই নাটকের-ই চতুর্থাঙ্কে পতিগৃহে প্রেরণের প্রাক্কালে দুই সখী কর্তৃক শকুন্তলার প্রসাধন ও বেশরচনা – ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে আলঙ্কারিক নীতিলঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়; যদি-ও নাটকের গতি এই সব ঘটনাগুলির দ্বারা কোনোভাবে-ই বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

বধ তথা মৃত্যুর বিষয়ে-ও কিছু বক্তব্য আছে। পূর্বে-ই আলোচনা করা হয়েছে, প্রবেশকাদির দ্বারা এগুলির সূচনা হবে; মঞ্চে এগুলি উপস্থাপিত করা যাবে না। এমনকি রাবণ, কংস, দুর্যোধন প্রমুখ প্রতিনায়কের বধ-ই যেখানে নাটকের উদ্দেশ্য, সেখানে-ও এই সকল দৃশ্য মঞ্চে দর্শকসমক্ষে ঘটানো নিষিদ্ধ। কিন্তু অভিনবভারতী থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীন কিছু সমালোচক মঞ্চে মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা সমর্থন করতেন। এ প্রসঙ্গে অভিনবভারতীতে দুইটি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি মতে বলা হচ্ছে, আঘাতজনিত মৃত্যু মঞ্চে বর্জনীয়, কিন্তু ব্যাধিজনিত মৃত্যু সর্বথা বর্জনীয় নয়। দ্বিতীয় মতে বলা হচ্ছে, অঙ্কের শেষে বা শেষাংশে যবনিকাপতনের অব্যবহিতপূর্বে, যেসব ক্ষেত্রে নিষ্ক্রমণাদির সমস্যা নেই, সেখানে মঞ্চে মৃত্যুদৃশ্য দেখানো যেতে পারে – 'কিঞ্চিদন্যসম্বন্ধিন্যা ক্রিয়য়া সম্পাদ্যং যথা চক্রেণ দৈত্যস্য শিরশ্চেদং, কিঞ্চিদন্যসম্বন্ধিক্রিয়ানৈরপেক্ষ্যেণেব ব্যাধ্যভিঘাতাদিপ্রভবম্, তত্রাদ্যস্যৈব নিষেধঃ ক্রিয়তে', 'অপুনর্জনিনিষ্ক্রান্তিরহিতপ্রকৃতির্বিধায়েতি' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

অর্থোপক্ষেপক ঃ

পূর্বকৃত নাট্যবস্তুর আলোচনায় আমরা দেখেছি, নাটকীয় কাহিনীর চতুর্বিধ প্রকার হতে পারে – প্রযোজ্য, সূচ্য, অভ্যুহ্য এবং উপেক্ষ্য।যে সকল ঘটনা সুন্দর, সমুন্নত এবং রস ও ভাবযুক্ত, কেবল সেই সকল ঘটনা-ই দৃশ্যকাব্যে উপস্থাপনীয়। এগুলির মধ্যে দিয়ে সহৃদয় দর্শকের চিত্তে বিমল আনন্দের সঞ্চার ঘটে। বিপরীতে যে সকল ঘটনা রসহীন, শিষ্টাচারবিরোধী বা অনুন্নতমানের, অথচ ঘটনার পূর্বাপর সংযোগ রক্ষার জন্য ঐকান্তিকভাবে অপেক্ষিত, দৃশ্যকাব্যে এবংবিধ ঘটনাগুলির কেবলমাত্র সূচনা করা হয়; বিশদে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় না। শেষোক্ত ঘটনাগুলিকে-ই বলা হয় সূচ্য। দশরূপকে সূচ্যবস্তুর লক্ষণনির্ণয়পূর্বক বলা হয়েছে –'নীরসো2নুচিতস্তত্র সংসূচ্যো বস্তুবিস্তরঃ'(দশ.রূ.১/৫৭) – অর্থাৎ নীরস এবং অনুচিত বস্তু বা ঘটনা সূচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় । অর্থোপক্ষেপক হল সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সেই বিশিষ্ট আঙ্গিক, যার দ্বারা রূপকের এই সূচ্যবিষয়গুলির প্রতিপাদন করা হয়ে থাকে। অর্থোপক্ষেপকের লক্ষণটি পর্যালোচনা করলে রূপকে এর বহুবিধ উপযোগিতার বিষয়টি সহজে-ই প্রণিধান করা যায় –

১. রূপকের অঙ্কমধ্যে যা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়, সেগুলি এই নাট্যকৌশলটির মাধ্যমে সংবাদরূপে মধ্যম বা অধম শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীদের দ্বারা সূচিত হয়।

২. সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব অনুসারে যুদ্ধ, মৃত্যু, অবরোধ, অভিশাপ, বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিনয় নিষিদ্ধ। কিন্তু এই বিষয়গুলিকে একেবারে বাদ দিলে নাট্যবস্তুর পরিসর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই উক্ত বিষয়গুলির সম্পর্কে কোনো সংবাদ বা ফলাফল জ্ঞাপনের জন্য অর্থোপক্ষেপকের ব্যবহার করা হয়। যথা – অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ দুর্বাসার অভিশাপ। নাটকে এর প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করা হয়নি; তৎপরিবর্তে চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভকের দ্বারা নেপথ্য থেকে এটি সূচিত হয়েছে।

৩.সংস্কৃত নাটকে কালিক ঐক্য অর্থাৎ 'Unity of time' বিষয়ে নিয়মের কোনো কঠোরতা নেই । কিন্তু দুটি অঙ্কের মধ্যে কালের ব্যবধান দীর্ঘ হলে, অনেক সময় অঙ্কদ্বয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা, পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর কিঞ্চিৎ সূচনা না দিলে পূর্বাপর ঘটনাগুলির সংযোগ ও সামঞ্জস্যবিধানে অসুবিধা হয়; ঘটনাগুলিকে বিশৃঙ্খল বলে মনে হয় এবং ফলতঃ রূপকের সামগ্রিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই অন্তর্বর্তী অবস্থা ও ঘটনাপ্রবাহের সূচনার জন্য-ই অর্থোপক্ষেপকের অবতারণা করা হয়। এর ফলে দীর্ঘকালের ঘটনাবহুল দীর্ঘ কাহিনী সংক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

৪. শুধু সমগ্র দৃশ্যকাব্যটি-ই নয়, পৃথকভাবে একেকটি অঙ্ক-ও যাতে সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ হতে পারে, সেই জন্য-ও অর্থোপক্ষেপকের প্রয়োজন। একদিনের ঘটনা একটি অঙ্কে দর্শনীয় হলে-ও, সেই ঘটনাটি যদি সুদীর্ঘ হয়, তবে অঙ্কচ্ছেদ করে তার কিয়দংশ অর্থোপক্ষেপকে সূচ্য। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে –

"দিনাবসানে কার্যং যদ্দিনেনৈবোপপদ্যতে।

অর্থোপক্ষেপকৈর্বাচ্যং অঙ্কচ্ছেদং বিধায় তৎ ॥" (সা.দ.৬/৫৩)

৫. ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় অর্থোপক্ষেপকের আরো একটি প্রয়োজনীয়তাবিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, শুধু যে অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে-ই অর্থোপক্ষেপকের অবতারণা করা হয় তাই নয়, প্রস্তাবনার পর অর্থাৎ নাটকের প্রারম্ভে-ও এগুলি বিন্যস্ত হতে পারে। আগে-ই বলা হয়েছে, নাট্যকাহিনীর মধ্যে যা কিছু সরস, একমাত্র সেগুলি-ই অভিনেয় ও প্রদর্শনীয় । কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এমন-ও হতে পারে যে, সরস, চমকপ্রদ ঘটনা দিয়ে নাটকটি আরম্ভ করার পূর্বে প্রাক্তন অবস্থা ও পরিস্থিতির উপর আলোকপাত না করা হলে, প্রারম্ভিক ঘটনাটি দুর্বোধ্য মনে হয়। অথচ প্রাক্তন ব্যাপারগুলি নীরসত্বহেতু অভিনয়যোগ্য-ও নয় । সেই অবস্থায় নাটকের উপোদ্ঘাতরূপে অর্থোপক্ষেপকের অবতারণাপূর্বক প্রাক্তন বিষয়ের সূচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং তার ফলে নাটকীয় কাহিনীর পূর্বাপর সংযোগটি-ও অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে সূচ্য ও দৃশ্য-শ্রব্য ভেদে ইতিবৃত্তের প্রভেদ করা হয়নি। এজাতীয় ভেদ অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালের। নাট্যশাস্ত্রে 'অর্থোপক্ষেপক' সংজ্ঞাটির ব্যবহার হয়েছে মাত্র একবার; ঊনবিংশ অধ্যায়ের একশ দশ সংখ্যক শ্লোকে। পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে (না.শা. ১৯/১১১ – ১১৬) পাঁচটি অর্থোপক্ষেপকের লক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলি অনেকের মতে প্রক্ষিপ্ত । এই মতটি মানলে বলতে হয় যে, মূল নাট্যশাস্ত্রে অর্থোপক্ষেপক সংজ্ঞাটি এবং চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখের কোনো লক্ষণ ছিল না। অর্থোপক্ষেপকের অন্য দুটি ভেদ অর্থাৎ বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

আচার্য সাগরনন্দীর মতে – 'অর্থোপক্ষেপকা অর্থপ্রতিপাদকাঃ' (না.ল.র.ষষ্ঠ অধ্যায়) – অর্থ বা বস্তুর উপক্ষেপ অর্থাৎ সূচনা বা প্রতিপাদন হয় যার মাধ্যমে, তাকে-ই সাধারণভাবে অর্থোপক্ষেপক বলা হয়।

সাহিত্যদর্পণে অর্থোপক্ষেপক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় । দর্পণকার বলেছেন –

"অঙ্কেম্বদর্শনীয়া যা বক্তব্যৈব চ সম্মতা ।
যা চ স্যাদ্‌বর্ষপর্যন্তং কথা দিনদ্বয়াদিজা ॥
অন্যা চ বিস্তরা সূচ্যা সার্থোপক্ষেপকৈর্বুধৈঃ ।
বর্ষাদূর্ধ্বং তু যদ্বস্তু তৎ স্যাৎ বর্ষাদধোভবম্ ॥" (সা.দ.৬/৫১,৫২)

– যে বৃত্তগুলি অঙ্কে স্পষ্টতঃ প্রদর্শনের অযোগ্য অথচ ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অবশ্যকর্তব্য, যে সকল ঘটনা একাধিক দিনব্যাপী (তা দুদিনব্যাপী হোক্ বা বর্ষব্যাপী হোক্) এবং যে সকল ঘটনা অতিবিস্তৃত, অর্থোপক্ষেপকের মাধ্যমে তাদের সূচনা করতে হবে। যে বস্তু একবৎসরের বেশি সময়ে সংঘটিত হয়েছে, তা এক বৎসরের মধ্যে সংঘটিত বলে ধরে নিতে হবে।

এই অর্থোপক্ষেপক পাঁচপ্রকার – বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার এবং অঙ্কাস্য। নাট্যদর্পণোক্ত অঙ্কাস্য, নাট্যশাস্ত্রাদি বিভিন্ন গ্রন্থে 'অঙ্কমুখ' নামে অভিহিত । পরিভাষা যাই হোক্, লক্ষণগুলি অনুরূপ।

এবার একে-একে অর্থোপক্ষেপকগুলির আলোচনা করা যাক্ –

১.বিষ্কম্ভকলক্ষণ ঃ

অর্থোপক্ষেপকমাত্রের-ই সামান্য ধর্ম হল দৃশ্যকাব্যের নীরস, অপ্রদর্শনযোগ্য, দীর্ঘ অথচ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সূচনা করা – এ আমরা পূর্বে-ই আলোচনা করেছি। বিষ্কম্ভক নামক অর্থোপক্ষেপকটির দ্বারা বর্তমান, অতীত ও অনাগত – এই তিনপ্রকার কালের ঘটনার সংক্ষেপে সূচনা হয়। টীকাতে বলা হচ্ছে, স্মরণযোগ্য অতীত বিষয় বিষ্কম্ভকের আধার হবে। আবার বলা হচ্ছে, এই অতীতের সীমা ব্যক্তির প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে। তাই রাম-যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় চির অতীত কোনো বিষয় অথবা অল্পকাল-অতীত কোনো বিষয় – দুই-ই বিষ্কম্ভকের দ্বারা সূচিত হতে পারে।

বিষ্কম্ভক সংস্কৃত এবং প্রাকৃত – উভয় ভাষাতে-ই হতে পারে। এতে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দের বাহুল্য থাকবে না, ভাষা হবে সাবলীল। এর প্রয়োগ হবে মধ্যম ও নীচপাত্রের দ্বারা, উত্তমপাত্র বিষ্কম্ভকের প্রযোক্তা হবেন না। বিষ্কম্ভক অঙ্কের আদিতে হলে, তা প্রস্তাবনার অব্যবহিত পরে প্রযুক্ত হবে; উদাহরণ – রত্নাবলী,প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ইত্যাদি। অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে প্রযুক্ত হলে তা পূর্বোত্তর অঙ্কদ্বয়ের ঘটনার মধ্যে সেতুরচনা করবে। বিষ্কম্ভক শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাতে বলা হচ্ছে – 'বিষ্কভ্নাত্যনুসন্ধানেন বৃত্তম্ উপষ্টম্ভয়তীতি বিষ্কম্ভকঃ'।[৪৩] সাহিত্যদর্পণের লক্ষ্মীটীকায় বিষ্কম্ভকশব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে বলা হচ্ছে – 'বিষ্কভ্নাতি মধ্যমাংশপূরণেন পূর্বপরাঙ্কগতবৃত্তান্তং প্রতিপাদয়তি যঃ স তথোক্তঃ'। বৈষ্ণব আলঙ্কারিক রূপগোস্বামী-ও নাটকচন্দ্রিকায় বলেছেন – 'ভবেত্ বিষ্কম্ভকো ভূতভাবিবস্ত্বংশসূচকঃ' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ৫৭৬) । অর্থাৎ সব নাট্যবিদ্‌দের মতে-ই, অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার সংক্ষেপে সূচক হয় যে অর্থোপক্ষেপক, তার নাম বিষ্কম্ভক।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে নির্ণীত বিষ্কম্ভকলক্ষণটি সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। আচার্য সাগরনন্দীর মতে, নায়ক বা প্রতিনায়ক – উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধহীন অথচ কাহিনীর সূচকরূপে (যে অথবা যা) কোনো কারণে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়, তার নাম বিষ্কম্ভক –

"কুতো2পি স্বেচ্ছয়া প্রাপ্তঃ সম্বদ্ধো নোভয়োরপি।

বিষ্কম্ভকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কথার্থস্যাপি সূচকঃ ॥" (না.ল.র.ষষ্ঠ অধ্যায়)

লক্ষণ এবং সাগরনন্দীর ব্যাখ্যা থেকে মনে হতে পারে, যেন পাত্রকে-ই বিষ্কম্ভক বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থটি হল, এরূপ পাত্রের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থোপক্ষেপকবিশেষের নাম বিষ্কম্ভক। লক্ষণটি নিঃসন্দেহে অভিনব, কিন্তু সর্বজনসম্মত নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভাবপ্রকাশনকার আচার্য শারদাতনয় তাঁর গ্রন্থের সপ্তম অধিকারে এই মতটির উল্লেখ করেছেন।

একটি বিষয় উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন। আচার্য কোহলের মতে, বিষ্কম্ভক কেবলমাত্র দৃশ্যকাব্যের প্রথম অঙ্কের আরম্ভে-ই প্রযুক্ত হয়, অন্যত্র নয়। নাট্যশাস্ত্রে একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে,

বিষ্কম্ভক কেবলমাত্র নাটকের মুখসন্ধিতে থাকবে, অন্যত্র নয় – 'নাটকমুখন্ধিমাত্রসঞ্চারঃ' (না.শা.১৯/১১১)। আচার্য ভোজ-ও তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন। কিন্তু এই মতটি যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়। কারণ বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন অঙ্কে ও বিভিন্ন সন্ধিতে বিষ্কম্ভক প্রযুক্ত হয়েছে। নাট্যদর্পণকারদ্বয়-ও এই মতদুটিকে অনুল্লিখিত রেখে এবিষয়ে তাঁদের অসহমত পোষণ করেছেন।

এই বিষ্কম্ভকের দুইটি প্রকার –

১.শুদ্ধ – শুদ্ধবিষ্কম্ভক কেবলমাত্র মধ্যমশ্রেণীর নাটকীয় পাত্রের দ্বারা সূচিত হবে, এতে নীচপাত্রের প্রবেশ ঘটবে না। পাত্রের মধ্যমত্ব রাজাপেক্ষ অর্থাৎ রাজার তুলনায় এদের স্থান মধ্যম। এই তালিকায় রয়েছেন অমাত্য, সেনাপতি, বণিক্, ব্রাহ্মণ, রাজকুমার, রানী, কোনো বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিনায়ক, প্রতিনায়িকা প্রমুখ। শুদ্ধ বিষ্কম্ভকের ভাষা হবে সংস্কৃত। এমনকি এখানে কোনো নারীচরিত্র থাকলে তিনি-ও সংস্কৃতে কথা বলবেন। দশরূপকে বলা হয়েছে – 'একানেককৃতঃ শুদ্ধঃ (দশ.রূ. ১/৬০)। পরভাবী রূপগোস্বামী নাটকচন্দ্রিকায় বলেছেন – 'শুদ্ধঃ কেবলমধ্যো2য়মেকানেককৃতো ভবেৎ' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ৫৭৭)। নাট্যদর্পণে 'মধ্যৰ্মৈজনৈঃ' পদে বহুবচনদৃষ্টে মনে হয়, এঁরা বিষ্কম্ভকের বহুব্যক্তিপ্রয়োগত্বের পক্ষে। কিন্তু বৃত্তিতে বলা হয়েছে, বহুজন তো বটে-ই, ক্ষেত্রবিশেষে একজন মধ্যমপাত্র-ও স্বগতোক্তি, আকাশোক্তি ইত্যাদির দ্বারা বিষ্কম্ভকের উপস্থাপনা করতে পারেন।

পরভাবী দর্পণকার তাঁর বিষ্কম্ভকলক্ষণের 'মধ্যমেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভ্যাং' অংশে এক বা দুইজন পাত্রের দ্বারা বিষ্কম্ভক প্রযুক্ত হবে – এই মত পোষণ করেছেন। সম্ভবতঃ দশরূপকের টীকাকার ধনিকের মতটি বিশ্বনাথ গ্রহণ করেছেন। 'একানেককৃতঃ শুদ্ধঃ' – এই অংশের ব্যাখ্যায় ধনিক বলেছেন – 'একেন দ্বাভ্যাং শুদ্ধো ভবতি' (দশ.রূ. প্রথম প্রকাশ)। সাহিত্যদর্পণের টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় 'বা'-এর অনুক্তসমুচ্চয়ার্থ গ্রহণ করে বহুবচনকে-ও স্বীকার করেছেন।

২. সঙ্কীর্ণ – বিষ্কম্ভকের দ্বিতীয় প্রকারটি হল সঙ্কীর্ণ। এতে মধ্যমপাত্রের সঙ্গে নীচপাত্র-ও থাকবে। স্বাভাবিকভাবে ভাষা হবে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে মিশ্রিত। নীচপাত্র বলতে দাস,চেট ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। এদের ভাষা যেহেতু প্রাকৃত, তাই সঙ্কীর্ণ বিষ্কম্ভকের ভাষা হবে মিশ্রিত।

নাট্যদর্পণে কোনো প্রকার বিষ্কম্ভকের-ই উদাহরণ দেওয়া হয় নি। আমরা এখানে কতগুলি উদাহরণ উপন্যস্ত করছি –

১. শুদ্ধবিষ্কম্ভক –

ক. একপাত্রপ্রযোজ্য –

অ. 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যবর্তী ঋষিকুমারের সংলাপ

আ. 'মালতীমাধব'-এ শ্মশানে কপালকুণ্ডলার সংলাপ

খ. বহুপাত্রপ্রযোজ্য –

অ. 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সংলাপ

আ. 'উত্তররামচরিতম্'-এ প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে আত্রেয়ী ও বাসন্তীর সংলাপ

২. সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র বিষ্কম্ভক –

অ. 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী অংশে

আ. 'রামাভিনন্দ' নাটকে ক্ষপণক ও কাপালিকের সংলাপ

২.প্রবেশকলক্ষণ ঃ

বিষ্কম্ভক এবং প্রবেশকের লক্ষণ প্রায় একপ্রকার। টীকাতে বলা হচ্ছে – 'সর্বং বিষ্কম্ভকলক্ষণমত্রাতিদিশ্যতে।'[৪৪] 'অতিদেশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল– 'অন্যধর্মস্যান্যত্রাভিসম্বন্ধো2তিদেশঃ' – বিষয়বিশেষের লক্ষণসমূহ বিষয়ান্তরে প্রয়োগ করার নাম অতিদেশ। প্রবেশক কেবলমাত্র নীচশ্রেণীর নাটকীয় পাত্র দ্বারা প্রযুক্ত হবে – এইটুকু-ই বিষ্কম্ভকলক্ষণের অপবাদ । এই পাত্রদের কোনো নিজস্ব কার্য থাকবে না, এঁরা নায়কের কার্যনিষ্ঠ হবেন মাত্র। এই মতটি সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে গৃহীত। সেখানে-ও বলা হচ্ছে –'অন্যে ত্বাহুঃ – উদাত্তং স্বাত্মকার্যবিশ্রান্তং বচনং নিষিধ্যতে' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়) । অভিনবভারতীতে ব্যবহৃত উদাহরণটি-ও ('আজ্ঞপ্তাস্মি ভর্তৃদারিকয়া') নাট্যদর্পণে অবিকলভাবে উদাহৃত হয়েছে। পাত্র যেহেতু নিম্নশ্রেণীর, অতএব প্রবেশকে ভাষা-ও হবে সংস্কৃতেতর। বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃত যেমন – মাগধী, শকারী, শৌরসেনী ইত্যাদিতে প্রবেশক প্রযুক্ত হবে।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে, প্রবেশক প্রযুক্ত হবে অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে – 'অঙ্কান্ত রানুসারী'(না.শা.১৮/৩৩)। অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে, দৃশ্যকাব্যের আদিতে প্রবেশকের প্রয়োগ হবে না – 'প্রবেশকো2পি প্রথমোপক্ষেপে ন যোগ্য ইতি যুক্তম্' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়) । তবে প্রয়োজনে প্রস্তাবনার পর প্রবেশক প্রযুক্ত হলে-ও হতে পারে। দশরূপকে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রবেশক কেবলমাত্র অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে-ই প্রযুক্ত হতে পারে, অঙ্কারম্ভে কখনো-ই নয় – 'প্রবেশো2ঙ্কদ্বয়স্যান্তঃ' (দশ.রূ.১/৬১)। পরভাবী বিশ্বনাথ-ও দশরূপকের মত-ই সমর্থন করেছেন । নাট্যদর্পণে এবিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। তবে 'কেচিত্ প্রবেশকং প্রথমাঙ্কস্যাদৌ নেচ্ছন্তি'[৪৫] –

এই বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা এই মতের প্রতি তাঁদের অসমর্থন সূচিত হয়েছে। সম্ভবতঃ প্রথমাঙ্কে-ও প্রবেশক প্রযুক্ত হতে পারে – এই এঁদের অভিমত।

প্রবেশক শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয় করে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'অপ্রত্যক্ষান্ অর্থান্ সামাজিকহৃদয়ে প্রবেশয়তীতি প্রবেশকঃ'।[৪৬] এই ব্যাখ্যা অনেকাংশে অভিনবভারতী-অনুসারী। পরবর্তীকালে সাহিত্যদর্পণগ্রন্থের টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একটু অন্যভাবে এর ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন – 'প্রবেশয়তি পরবর্তিপাত্রপ্রবেশং সূচয়তীতি প্রবেশকঃ' (সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) – মঞ্চে পরবর্তী পাত্রসূচনা করা-ই হল প্রবেশকের কাজ এবং একারণে-ই এর এই নাম।

প্রবেশকের-ও কোনো উদাহরণ নাট্যদর্পণে প্রদত্ত হয় নি। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কতগুলি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি –

১. 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে চেটীর দ্বারা উপস্থাপিত অংশ

২. 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠাঙ্কের প্রারম্ভে রক্ষিদ্বয়, ধীবর ইত্যাদি নীচ পাত্র দ্বারা প্রযোজিত অংশ

৩. 'বেণীসংহার' নাটকের তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে রাক্ষসদ্বয়ের দ্বারা প্রযোজিত অংশ ইত্যাদি ।

নাট্যশাস্ত্রমতে প্রকরণ এবং নাটকে প্রবেশক প্রযুক্ত হতে পারে – 'প্রকরণনাটকবিষয়ে প্রবেশকো নাম বিজ্ঞেয়ঃ' (না.শা. ১৯/১১৪) । কিন্তু নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, নাটক-নাটিকা-প্রকরণ-প্রকরণী – এই চারপ্রকার রূপকভেদে প্রবেশক প্রযুক্ত হতে পারবে। এবিষয়ে এখানে যথেষ্ট যুক্তিসহ আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত চারটি রূপভেদ হল দৃশ্যকাব্যের সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রকার, যেগুলি ঘটনাবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং নাটকীয় গতিযুক্ত। বিষ্কম্ভক এবং প্রবেশক – দুটি-ই সময়সাপেক্ষ এবং বিবিধ তথ্যের পরিবেশক। ব্যায়োগাদি একাঙ্ক রূপকে অধিক সময় বা ঘটনাবাহুল্য কোনোটির-ই অবকাশ নেই। কারণ, এসব রূপকে কাহিনী অর্থাৎ কথাবস্তুটি-ই আকারে অতি সংক্ষিপ্ত । সমবকারে তিনটি অঙ্ক থাকলে-ও, অঙ্কগুলি অসূত্রিত। ডিম এবং ঈহামৃগে কথাবস্তুটি স্বল্প দিনে অভিনীত। এগুলিতে তাই বিষ্কম্ভক-প্রবেশকের প্রয়োগের অবসর থাকে না; তৎপরিবর্তে অঙ্কাস্য-অঙ্কাবতার-চূলিকা প্রযুক্ত হয়।

বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সেগুলি উপস্থাপিত করছি –

১. সাদৃশ্য –

ক. উভয়ে-ই অতীত ও অনাগত ঘটনাদির সূচক

খ. উভয়ে-ই সংক্ষিপ্তার্থ।অতিসংক্ষেপে ঘটনাদির সূচনা বিষ্কম্ভক-প্রবেশকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. বৈসাদৃশ্য –

ক. বিষ্কম্ভক কেবলমাত্র মধ্যমপাত্র দ্বারা প্রযোজিত (শুদ্ধপক্ষে) অথবা মধ্যম ও নীচ উভয়বিধ পাত্রের দ্বারা প্রযোজিত (সঙ্কীর্ণপক্ষে)। বিপরীতে প্রবেশক কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর পাত্রদের দ্বারা প্রযোজিত।

খ. বিষ্কম্ভকে ভাষা সংস্কৃত অথবা সংস্কৃত-প্রাকৃতে মিশ্রিত। প্রবেশকে ভাষা কেবলমাত্র প্রাকৃত।

গ. বিষ্কম্ভক দৃশ্যকাব্যের আদিতে প্রযুক্ত হতে পারে। প্রবেশক সর্বদা অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে প্রযুক্ত হবে।

ঘ. অধ্যাপক জাগীরদার বিষ্কম্ভক-প্রবেশকের আরেকটি পার্থক্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, বিষ্কম্ভকের দ্বারা নেপথ্যের ঘটনাসমূহের পরিবেশন ঘটে। বিপরীতে প্রবেশককে তিনি সাধারণ মঞ্চদৃশ্যপরিবর্তনমাত্র বলে মনে করেছেন, তদতিরিক্ত কিছু নয়। 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর তিনটি প্রবেশকের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন – "All the Pravesakas here have practically nothing to add to the story; on the other hand, every one of them introduces the following main scene........ the Pravesaka is merely a scene-shift." তুলনায় বিষ্কম্ভকের দ্বারা মূল কাহিনীর অগ্রগতি সাধিত হয় – " It gives the audience information about an incident which, for some reason, has not been represented on the stage .... If the Viskambhaka is a vital factor in the plot-development, we can understand why the traditional authorities speak of Madhyamapatra i.e. character of an intermediary status and Sanskrit language (mainly) in this connection."[৪৭]

৩.অঙ্কাস্যলক্ষণ ঃ

অঙ্কাস্যলক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণকাররা খুব বিস্তৃত আলোচনায় যাননি। অত্রধৃত অঙ্কাস্যলক্ষণ হল – 'অঙ্কাস্যমন্তপাত্রেণ ছিন্নাঙ্কমুখযোজনম্' (না.দ.১/২৬) – অর্থাৎ অঙ্কবিশেষের অন্তিমে অভিনয়কারী পুরুষ বা স্ত্রীপাত্রের দ্বারা ছিন্ন অঙ্কের (অর্থাৎ যে অঙ্কের অভিনয় হচ্ছে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্কের) অর্থাৎ পরবর্তী অঙ্কের বিষয় সূচিত হলে, তাকে অঙ্কাস্য বলা হয়।

মহাবীরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তিম অংশটি এখানে উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে –

(প্রবিশ্য) সুমন্ত্রঃ – "ভগবন্তৌ বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ ভবতঃ সভার্গবান্ আহ্বয়েতে ইতি।

ইতরে তু – ক্ব ভগবন্তৌ?

সুমন্ত্রঃ – মহারাজদশরথস্যান্তিকে।

ইতরে – তদনুরোধাৎ তত্রৈব গচ্ছামঃ।

ইত্যঙ্কসমাপ্তৌ ততঃ প্রবিশন্ত্যপবিষ্টা বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশতানন্দজনকপরশুরামাঃ।”

– উদাহৃত অংশে পূর্ব অঙ্কের শেষে প্রবিষ্ট সুমন্ত্র নামক পাত্রের দ্বারা শতানন্দ-জনকের কথাভাগের বিচ্ছেদ এবং পরবর্তী অঙ্কের প্রারম্ভ সূচিত হওয়ায়, এটি অঙ্কাস্যের উদাহরণ ।

নাট্যদর্পণধৃত অঙ্কাস্যলক্ষণ একান্তভাবে-ই দশরূপক-অনুসারী। এমনকি উদাহরণটি-ও উক্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত। নাট্যশাস্ত্রে-ও অঙ্কাস্যলক্ষণ প্রায় অনুরূপ। কেবলমাত্র সেখানে ‘অঙ্কাস্য’ শব্দের পরিবর্তে ‘ অঙ্কমুখ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে –

“বিশ্লিষ্টমুখমঙ্কস্য স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা ।

যদুপক্ষিপ্যতে পূর্বং তদঙ্কমুখমুচ্যতে ॥'' (না.শা. ১৯/১১৬)

ধনঞ্জয় ও ধনিক নিরূপিত অঙ্কাস্যের লক্ষণ এবং উদাহরণ বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন – ''এতচ্চ ধনিকমতানুসারেণোক্তম্। অন্যে তু অঙ্কাবতারেণৈবেদং গতার্থম্ ইত্যাহুঃ'' (সা.দ.ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) – ধনিকের মতানুসারে এটি অঙ্কাস্য; অন্যান্য আলঙ্কারিকদের মতে এটি অঙ্কাবতার। বিশ্বনাথ অঙ্কাস্যকে অস্বীকার করেননি, অঙ্কাবতারের একটি প্রভেদরূপে স্বীকার করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে বিশ্বনাথ অন্যতম অর্থোপক্ষেপকের নাম করেছেন অঙ্কমুখ। লক্ষণে বলেছেন –

''যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাখিলা।

তদঙ্কমুখমিত্যাহুর্বীজার্থখ্যাপকং চ তৎ ॥'' (সা.দ. ৬/৫৯)

– লক্ষণোক্ত ‘অঙ্ক’ শব্দের অর্থ অঙ্কের অংশবিশেষ। যখন কোনো অঙ্কের অংশবিশেষে পরবর্তী সকল অঙ্কের পূর্বাভাস দেওয়া হয়, তখন তা অঙ্কমুখ নামে উক্ত হয়। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট দৃশ্যকাব্যটির বীজ সূচিত হয়। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও অনুরূপভাবে অঙ্কমুখলক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে – ‘যেনৈকত্র সকলানামঙ্কানাং সূত্রণং ক্রিয়তে তদঙ্কমুখম্’(না.ল.র.ষষ্ঠ অধ্যায়)। সাহিত্যদর্পণে ভবভূতি-বিরচিত ‘মালতীমাধব’ প্রকরণের প্রথমাঙ্কের আরম্ভের অংশটিকে অঙ্কমুখের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত করা হয়েছে, যেখানে কামন্দকী ও অবলোকিতার কথোপকথনের দ্বারা পরবর্তী অঙ্কসমূহের সংক্ষিপ্তসার সূচিত হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, মালতীমাধবের কোনো কোনো সংস্করণে এটিকে বিষ্কম্ভক বলা হয়েছে।

অঙ্কমুখের অপর একটি উদাহরণরূপে সাহিত্যদর্পণের মিতভাষিণীটীকায় রূপগোস্বামীর ‘ললিতমাধব’ নাটকের প্রথমাঙ্কে গার্গী ও পৌর্ণমাসীর মধ্যে বিধৃত কথোপকথনের অংশটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. চূলিকালক্ষণ ঃ

যবনিকার অন্তরালবর্তী পাত্র-পাত্রীর দ্বারা কোনো বিষয়ের সূচনা করা হয় চূলিকা নামক অর্থোপক্ষেপকের দ্বারা। নাট্যদর্পণে চূলিকালক্ষণ নির্ণীত হচ্ছে এভাবে – 'বস্তুনঃ সূচনং চূলা পাত্রৈর্নেপথ্যসংস্থিতৈঃ' (না.দ.১/২৬)– চূড়া অর্থাৎ শিখার সঙ্গে সাদৃশ্যহেতু এর এরূপ নাম। টীকাতে বলা হচ্ছে – 'সা চূড়েব চূলিকা রঙ্গাভিনেয়ার্থস্য নেপথ্যপাত্রোক্তেঃ শিখাকল্পত্বাৎ'[৪৮] – যেমন কোনো ব্যক্তির মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিখা বর্তমান থাকে, তেমনি মঞ্চে যবনিকার অন্তরাল থেকে নেপথ্যোক্তির দ্বারা চূলিকার প্রয়োগ হয়।

নাট্যদর্পণের টীকায় চূলিকার তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি 'উত্তররামচরিতম্'-এর দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে – (নেপথ্যে) ''স্বাগতং তপোধনায়াঃ।(ততঃ প্রবিশতি তপোধনা) '' – এই অংশে নেপথ্যপাত্র বাসন্তিকার দ্বারা তপোধন আত্রেয়ীর প্রবেশ সূচিত হওয়ায় চূলিকা হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণটি রামচন্দ্রের স্বকৃত নাটক 'নলবিলাস'-এর দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে গৃহীত – (নেপথ্যে) ''স্বাগতং সপরিচ্ছদায় কলহংসায়।(ততঃ প্রবিশতি কলহংসো মকরিকাপ্রভৃতিকশ্চ পরিবারঃ)''– এই অংশে নেপথ্যপাত্র শেখরের দ্বারা কলহংসের আগমন সূচিত হওয়ায় এটি চূলিকার উদাহরণ।

তৃতীয় উদাহরণটি রত্নাবলী থেকে গৃহীত –

" অস্তাপাস্তসমস্তভাসি নভসঃ পারং প্রয়াতে রবা -
বাস্থানীং সময়ে সমং নৃপজনঃ সায়ন্তনে সম্পতন্ ।
সম্প্রত্যেষ সরোরুহদ্যুতিভূষঃ পাদাংস্তবাসেবিতুং
প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দশামুদয়নস্যেন্দোরিবোদীক্ষতে ॥''

– উক্ত অংশে বন্দীর নেপথ্যোক্তির দ্বারা সাগরিকা বুঝতে পারছেন, তিনি যাঁকে কন্দর্প ভাবছিলেন, তিনি-ই প্রকৃতপক্ষে মহারাজ উদয়ন; এভাবে উদয়নের সূচনার কারণে এটি চূলিকা।

নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে, নেপথ্য থেকে কোনো বিষয়সূচনাকে বলা হয় চূলিকা –

" অন্তর্যবনিকাসংস্থৈঃ সূতাদিভিরনেকধা।
অর্থোপক্ষেপণং যত্তু ক্রিয়তে সা হি চূলিকা ॥'' (না.শা. ১৯/১১৩)

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি সমস্ত গ্রন্থে চূলিকার এরূপ লক্ষণ-ই নির্ণীত হয়েছে। রসার্ণবসুধাকরে চূলিকাকে দু'টি অবান্তর ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – ১. চূলিকা এবং ২. খণ্ডচূলিকা (রসার্ণবসুধাকর, তৃতীয় বিলাস)।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে একটু অন্যভাবে চূলিকালক্ষণটি নির্ণয় করা হয়েছে। এতদনুসারে, যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত সূত, মাগধ ও বন্দিগণের দ্বারা ঘটনার কথা সংক্ষেপে উক্ত হলে, সেই প্রকার অর্থোপক্ষেপককে চূলিকা বলা হয় –

" যথাপটীমধ্যগতৈঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ।

অর্থোপক্ষেপণং যত্র ক্রিয়তে সা হি চূলিকেতি ॥" (না.ল.র.ষষ্ঠ অধ্যায়)

– ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, সূতপদের অর্থ সারথি, মাগধ অর্থাৎ স্তুতিপাঠক এবং বন্দী অর্থাৎ 'নগ্নাচার্য'। ডঃ. রাঘবনের মতে, 'নগ্নাচার্য' পদের অর্থ স্তুতিপাঠক। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে কোশপ্রমাণ দেখালে-ও, স্তুতিপাঠক অর্থে এই পদটির প্রয়োগ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। নাটকলক্ষণরত্নকোশের কোনো-কোনো সংস্করণে নগ্নাচার্যের পরিবর্তে 'নান্দ্যাচার্য' পদটির ব্যবহার পাওয়া যায় । এই পাঠে সমস্যার সমাধান সম্ভব। কারণ, নান্দ্যাচার্য পদের অর্থ মঙ্গলপাঠক এবং এটি একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রঙ্গমঞ্চে পাত্র-পাত্রী উপস্থিত না থেকে যদি যবনিকার অন্তরাল থেকে কোনো বিষয়ের সূচনা করা হয়, সেখানে চূলিকা হয়। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ দুর্বাসার অভিশাপ নেপথ্য থেকে সূচিত হলে-ও, সেইসময় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা মঞ্চে উপস্থিত থাকায়, এটি চূলিকা নয়, বিষ্কম্ভকের অংশবিশেষ।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'নাসূচিতঃ প্রবিশেত্ পাত্রঃ'– সূচনা তথা পরিচয় ব্যতীত কোনো (গুরুত্বপূর্ণ) নাটকীয় পাত্র মঞ্চে প্রবেশ করবে না। চূলিকা নামক অর্থোপক্ষেপকের দ্বারা প্রধানতঃ এই নাটকীয় প্রয়োজনটি-ই সাধিত হয়। তদুপরি, চূলিকার দ্বারা ঘটনাবিশেষের-ও সূচনা করা যায়। যেমন – রঙ্গমঞ্চে সংগ্রামপ্রদর্শন নিষিদ্ধ, অথচ সংগ্রামের ফলাফল ঘোষণার প্রয়োজন আছে। তাই 'মহাবীরচরিতম্'-এর চতুর্থাঙ্কের প্রথমে – "ভো ভো বৈমানিকাঃ । প্রবর্তন্তাং রঙ্গমঙ্গলানি" – ইত্যাদির পর " রামেণ পরশুরামো জিতঃ" – এই নেপথ্যোক্তির দ্বারা দেবগণকর্তৃক রাম-পরশুরাম সংগ্রামে পরশুরামের পরাজয়সংবাদের সূচনা হয়েছে চূলিকার মাধ্যমে।

অন্যদিকে চূলিকার মাধ্যমে বিষয়সূচনার দ্বারা মঞ্চে অভিনয়কারী পাত্র -পাত্রীর সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভবপর । নাট্যপরিচালক অর্থাৎ সূত্রধারের পক্ষে এটি বিশেষ সুবিধাবহ।

৫. অঙ্কাবতারলক্ষণ ঃ

যেখানে প্রবিষ্টপাত্রের দ্বারা সূচিত পূর্ববর্তী অঙ্কের ঘটনার অবিচ্ছিন্ন বৃত্তান্তরূপে অপর একটি অঙ্ক আরম্ভ হয়, তাকে অঙ্কাবতার বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রবেশক বা বিষ্কম্ভক না থাকার জন্য সূচ্য

কোনো বিষয়ের অবতারণা হয় না। প্রকৃতপক্ষে এটি বৃহদাকার একটি অঙ্কের দুটি ভাগ মাত্র; অঙ্কটি যাতে অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে এর মূলগত ভাবটিকে-ও যাতে অক্ষুণ্ন রাখা যায়, এই কারণে-ই এই অর্থোপক্ষেপকটির অবতারণা করা হয়।

অঙ্কাবতারের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের প্রথমাঙ্কের শেষাংশটি উপন্যস্ত করা হয়েছে। বিদূষক বলছেন – "তেন হি দ্বাবপি দেব্যাঃ প্রেক্ষাগেহং গত্বা সঙ্গীতোপকরণং কৃত্বা তত্রভবতো দূতং বিসর্জয়তম্ অথবা মৃদঙ্গশব্দ এবৈনমুত্থাপয়িষ্যতি"। অতঃপর হরদত্ত ও গণদাস, দুই বিবদমান নাট্যাচার্যের প্রস্থান এবং মৃদঙ্গধ্বনি শুনে সপরিজন রাজার সঙ্গীতগৃহের দিকে গমনের পর প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে। এর পর শুরু হয় দ্বিতীয় অঙ্ক। যবনিকা উত্তোলনের পরে-ই দেখা যায়, সপরিজন রাজা প্রেক্ষাগৃহের আসনে উপবিষ্ট। এখানে দ্বিতীয় অঙ্কটি, প্রথমাঙ্কের শেষে আগত পাত্রদের দ্বারা, প্রথম অঙ্কের-ই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে উপস্থিত হয়েছে; অতএব প্রথমাঙ্কের শেষাংশটি হল অঙ্কাবতারের উদাহরণ।

টীকায় অঙ্কাবতারের অপর একটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এটি কোন্ পূর্বাচার্যের মত, তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এই মত অনুসারে, অঙ্কবিশেষের যে অংশে অন্যান্য অঙ্কসমূহ তথা সমগ্র নাটকের মূল সূত্র অর্থাৎ বীজের অবতারণা করা হয়, সেটির-ই নাম অঙ্কাবতার। উদাহরণস্বরূপ 'রত্নাবলী' নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্কের "ঈদৃশস্য কন্যারত্নস্য ঈদৃশে এব বরে অভিলাষেণ ভবিতব্যম্"– এই অংশটির উল্লেখ করা হয়েছে ,যে অংশে নায়ক-নায়িকার অনুরাগরূপ বীজের সূচনা পরিদৃষ্ট হয় ।

অঙ্কাবতারের তৃতীয় লক্ষণরূপে যে বিষয়টি নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে উল্লিখিত হচ্ছে, সেটি যথেষ্ট জটিলতাময়। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে অঙ্কাবতারের-ই অপর নাম গর্ভাঙ্ক – 'অয়ং চ গর্ভাঙ্কো2প্যুচ্যতে'। গর্ভাঙ্কের লক্ষণ আলোচনায় নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে –

"অঙ্কান্তরেব চাঙ্কো নিপততি যস্মিন্ প্রয়োগমাসাদ্য।

বীজার্থযুক্তিযুক্তো গর্ভাঙ্কো নাম বিজ্ঞেয়ঃ॥"[৪৯]

– বীজসমন্বিত, অঙ্কবিশেষের-ই অর্ন্তগত অংশের নাম গর্ভাঙ্ক। লক্ষণসঙ্গতির কারণে একে অঙ্কাবতার বলায় কোনো ভুল নেই ।

স্বাভাবিকভাবে-ই প্রশ্ন ওঠে, নাট্যদর্পণকাররা এরকম একটি অদ্ভুত অভিমত পোষণ করলেন কি ভাবে? সম্ভবতঃ নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত অঙ্কাবতারলক্ষণ-ই এর ভিত্তি। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে –

"অঙ্কান্তরে2থবাঙ্কে নিপততি যস্মিন্ প্রয়োগমাসাদ্য।

বীজার্থযুক্তিযুক্তো বিজ্ঞেয়ো2ঙ্কাবতারো2সৌ ॥"(না.শা.১৯/১১৫)

– নাট্যশাস্ত্রোক্ত এই অঙ্কাবতারলক্ষণ যে নাট্যদর্পণোদ্ধৃত গর্ভাঙ্কলক্ষণের অত্যন্ত সদৃশ, তা স্পষ্ট ।

তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, নাট্যদর্পণের এই মত মোটে-ই যুক্তিসহ নয়। অঙ্কাবতার অর্থোপক্ষেপকের প্রকারবিশেষ; মঞ্চে অপ্রদর্শনযোগ্য ঘটনাদির সূচনা করা যার কাজ। অন্যদিকে, অঙ্কের মধ্যে প্রবিষ্ট অপর একটি অঙ্কের নাম গর্ভাঙ্ক । স্পষ্টত-ই বোঝা যাচ্ছে, দুটি বিষয় চরিত্রে এবং কার্যকারিতায় সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব এরকম বিসদৃশ দুটি বিষয়কে কখনো-ই অভিন্ন বলা যেতে পারে না। এপ্রসঙ্গে পূর্বভাবী বা পরভাবী কোনো আচার্যের সমর্থন-ও পাওয়া যায় না।

নাট্যশাস্ত্রের অঙ্কাবতারলক্ষণে বলা হয়েছে,দুটি অঙ্কের মধ্যস্থলে অথবা কোনো একটি অঙ্কে বীজের অর্থযুক্ত হয়ে প্রযুক্ত অর্থোপক্ষেপককে অঙ্কাবতার বলা হয়। দর্পণকারের মতে, অঙ্কবিশেষের সঙ্গে ভেদ না রেখে অর্থাৎ পূর্ববর্তী অঙ্কের অংশবিশেষরূপে সেই অঙ্কের শেষে পাত্রগণ কর্তৃক পরবর্তী অঙ্কের সূচনা করা হলে, যেখানে পরবর্তী অঙ্কের অবতারণা হয়,তাকে অঙ্কাবতার বলে –

"অঙ্কান্তে সূচিতঃ পাত্রৈস্তদঙ্কস্যাবিভাগতঃ ।
যত্রাঙ্কো2বতরত্যেষো2ঙ্কাবতার ইতি স্মৃতঃ ॥"(সা.দ.৬/৫৮)

নাটকলক্ষণরত্নকোশের অঙ্কাবতারলক্ষণটি সাহিত্যদর্পণের-ই অনুরূপ –

"সমাপ্যমান একস্মিন্নঙ্কে হ্যন্যস্য সূচনম্ ।
সমাসতো হি নাট্যজ্ঞৈঃ সো2ঙ্কাবতার ইষ্যতে ॥" (না.ল.র. ষষ্ঠ অধ্যায়)

অঙ্কাবতারের উদাহরণরূপে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চমাঙ্কের শেষে পাত্র-পাত্রীগণ কর্তৃক সূচিত ষষ্ঠাঙ্কের কথা বলা যেতে পারে ।

পঞ্চপ্রকার অর্থোপক্ষেপকের প্রয়োগব্যবস্থাবিষয়ে বলা হচ্ছে – যেখানে দীর্ঘকালব্যাপী ঘটনার সূচনার প্রয়োজন, সেখানে প্রবেশক ও বিষ্কম্ভকের প্রয়োগ হবে; স্বল্প সময়ের ঘটনার ক্ষেত্রে অঙ্কাস্য, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ঘটনার সূচনার জন্য অঙ্কাবতারের প্রয়োগ হবে । নাট্যদর্পণের এই মত সর্বাংশে অভিনবগুপ্তের মতানুসারী –" মাসকৃতং বর্ষসঞ্চিতং বা যচ্চ তৎ কার্যং সামাজিকানাং হৃদয়গতং তস্মাৎ প্রবেশকবিষ্কম্ভকৌ কর্তব্যৌ। পরিমিতন্তু যদনুসন্ধেয়ং তত্রাঙ্কমুখমল্পানুসন্ধেয়ে চূলিকা, অল্পতমে অঙ্কাবতারঃ" (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

অর্থোপক্ষেপক ও তার পঞ্চবিধ প্রকারের প্রাচীনতম উল্লেখের প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত বলছেন, আচার্য কোহলের গ্রন্থে এদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় –'কোহলো2র্থোপক্ষেকপঞ্চকমুক্তবান্' (না.শা.অষ্টাদশ অধ্যায়)। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'অর্থোপক্ষেপক' শব্দটির উল্লেখ নেই। উপরন্তু নাট্যশাস্ত্রে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক – অর্থোপক্ষেপকের কেবল এই দুটি প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে; অন্য তিনটির উল্লেখ নেই। নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিক্ষিপ্ত অসংলগ্নভাবে এই আলোচনা করা

হয়েছে। এই অধ্যায়ে ২৬ – ৩০ নং. এবং ৩৩ – ৩৭ নং. শ্লোকে প্রবেশকবিষয়ে আলোচনা রয়েছে। মধ্যবর্তী ৩১ – ৩২ নং. শ্লোকের বিষয় অঙ্কের স্থান-কাল। ৩৭ নং. শ্লোকের পর শুরু হয়েছে অঙ্কসংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনা ও তারপর প্রকরণবিষয়ে বিশদ আলোচনা । এরপর ৫৪ – ৫৫ নং. শ্লোকে বিষ্কম্ভক এবং শুদ্ধ-সংকীর্ণ ভেদে তার দ্বৈবিধ্যের আলোচনা রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের মত প্রামাণ্য গ্রন্থে অর্থোপক্ষেপকবিষয়ক আলোচনায় এই রকম অসম্পূর্ণতা ও অসম্বদ্ধতাদৃষ্টে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভরতমুনির সময় নাট্যতত্ত্বের এই বিশিষ্ট আঙ্গিকটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে ওঠেনি, যেভাবে পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা এর বিস্তৃত আলোচনা পাই। অভিনবগুপ্তাচার্য তাই আচার্য কোহলকে-ই অর্থোপক্ষেপকসমূহের প্রবক্তারূপে অভিহিত করেছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । নাট্যশাস্ত্রের ঊনবিংশ অধ্যায়ে ১১০ – ১১৬ নং. অবধি সাতটি শ্লোকে পাঁচপ্রকার অর্থোপক্ষেপকের লক্ষণ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের সম্পাদকের অভিমত, উক্ত সাতটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই প্রাচীন গ্রন্থে কালপ্রবাহে অনেক নতুন বিষয় সংযুক্ত হয়েছে, যেগুলির অন্যতম হল অর্থোপক্ষেপকবিষয়ক এই শ্লোকসপ্তক। কোহলাচার্য অথবা সংগ্রহকারের মতের সমর্থনে কোনো রচয়িতা নাট্যশাস্ত্রে এই বিষয়টিকে পরবর্তীকালে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এগুলির মধ্যে সপ্তমটি অর্থাৎ ১১৬ নং. শ্লোকটি নিঃসন্দেহে কোহলাচার্যের গ্রন্থ থেকে গৃহীত । নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রবেশকবিষয়ে আলোচনা করার সময় অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় ১১৫ নং. শ্লোকটি উদ্ধার করছেন 'যথোক্তম্' বলে; অর্থাৎ এটি-ও নাট্যশাস্ত্রকারের নয়, অন্য কোনো রচয়িতার। ১১১ নং. শ্লোকটি-ও কোহলাচার্যের রচনা থেকে কেবল চতুর্থপাদে ভিন্ন। অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় কোহলাচার্যের শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন –

" মধ্যমপুরুষনিযোজ্যো নাটকমুখসন্ধিমাত্রসঞ্চারঃ ।

বিষ্কম্ভকো হি কার্যো নাটকযোগে প্রবেশকবৎ ॥"(না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়) নাট্যশাস্ত্রধৃত ১১১ নং. শ্লোকটির চতুর্থপাদটি হল – 'পুরোহিতামাত্যকঞ্চুকিভিঃ'; এইমাত্র পার্থক্য, অবশিষ্ট অংশটি অভিন্ন। ১১২ নং. এবং ১১৪ নং. শ্লোকটি নাট্যশাস্ত্রের-ই অষ্টাদশ অধ্যায় থেকে গৃহীত, যথাক্রমে ৫৫ নং. এবং ৩৩ নং. শ্লোক । এই সাতটি শ্লোক যে মূল নাট্যশাস্ত্রের অংশ নয়, উত্তরকালের সংযোজন, এই মতের সমর্থনে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল, অভিনবগুপ্ত এই শ্লোকসপ্তকের উপর টীকা রচনা করেননি। নিঃসন্দেহে এগুলি প্রক্ষিপ্ত রচনা।

সূচ্য বিষয়ের জ্ঞাপনের জন্য অর্থোপক্ষেপকসমূহের প্রয়োগ ও তার প্রয়োজনবিষয়ে আলোচনা করা হল। এই পাঁচপ্রকার অর্থোপক্ষেপকের মধ্যে প্রবেশক ও বিষ্কম্ভক নিঃসন্দেহে একেকটি দৃশ্য এবং এদের স্থান অঙ্কের বাইরে। কোনো ক্ষেত্রে-ই এদের স্থান পরিবর্তিত হয় না। পক্ষান্তরে চূলিকা,

অঙ্কাস্য ও অঙ্কাবতার – এই তিনটি কখনো-ই অঙ্কের বাইরে থাকে না। চূলিকা অঙ্কের মধ্যে, অবশিষ্ট দুটি অঙ্কের শেষাংশে সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব এরা অঙ্কের বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হতে পারে। কোহলাচার্য তাই অঙ্কের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেছেন। অভিনবগুপ্ত বলছেন – 'তথা চোক্তং কোহলেন – ত্রিধাঙ্কো2ঙ্কাবতারেণ চূড়য়াঙ্কমুখেন বা'(না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

অঙ্কাস্য ও অঙ্কাবতার – এই দুটি অর্থোপক্ষেপকের দ্বারা-ই পূর্ব অঙ্কের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে পরবর্তী অঙ্কের সূচনা হয়। স্বাভাবিকভাবে-ই প্রশ্ন উদিত হতে পারে যে, পরবর্তী অঙ্কটি অবতারণার প্রয়োজন কি ? উত্তরে বলা যেতে পারে, অতিরিক্ত দীর্ঘ একটি অঙ্ক দর্শকচিত্তে বৈচিত্র্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে। ঘটনার গতিতে সামান্য বিরতি দর্শকচিত্তের রসগ্রাহিতার সহায়ক। তাছাড়া নাটকের অঙ্কগুলির দৈর্ঘ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা-ও প্রয়োজন। একটি অঙ্ক অতিরিক্ত দীর্ঘ এবং অন্যগুলি ক্ষুদ্র – এরূপ অসমতা রূপকে অভিপ্রেত নয়।

মূলতঃ এই হল পঞ্চবিধ অর্থোপক্ষেপকের মূল তত্ত্ব। তবে অর্থোপক্ষেপকের সামান্যলক্ষণ এবং এর পঞ্চবিধ ভেদের স্বরূপ বিষয়ে বহু মতবিরোধ থাকায় সমগ্র বিষয়টি যথেষ্ট দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অঙ্কাস্য ও অঙ্কাবতারের লক্ষণবিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন কথা বলেছেন। কোনো-কোনো নাট্যতত্ত্ববিদ্ আবার গর্ভাঙ্ক বলে অপর একটি সংজ্ঞা ও বিভাগের অবতারণা করে বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলেছেন।

অর্থপ্রকৃতি ঃ

অর্থোপক্ষেপকবিষয়ক আলোচনার পর নাট্যদর্পণকারদ্বয় নাটকীয় ফলসিদ্ধির হেতুগুলি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই হেতুগুলির পারিভাষিক নাম অর্থপ্রকৃতি । গ্রন্থের কোথাও কিন্তু এই অর্থপ্রকৃতি শব্দটির প্রয়োগ নেই; এদের কেবলমাত্র 'ফলস্য হেতবঃ' অর্থাৎ ফলনিষ্পাদনের কারণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা অবশ্য অর্থপ্রকৃতি শব্দটি-ই ব্যবহার করবো ।

নাটকমাত্রের-ই একটি মুখ্য ফল বা কার্য থাকে, যা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যাবতীয় নাটকীয় ঘটনার বিন্যাস এবং যাবতীয় নাটকীয় চরিত্রের কার্যকলাপের বিস্তার। নাট্যের মূল প্রয়োজনসিদ্ধির এই হেতুগুলিকে-ই বলা হয় অর্থপ্রকৃতি –'প্রক্রিয়তে প্রয়োজনং সাধ্যতে আভিরিতি প্রকৃতয়ঃ, অর্থস্য প্রকৃতয় ইতি অর্থপ্রকৃতয়ঃ' – এই হল অর্থপ্রকৃতির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। অর্থপ্রকৃতি এক অন্যতম নাটকীয় কৌশল অর্থাৎ Dramatic Technique.

অর্থপ্রকৃতির স্বরূপবিষয়ে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বৈমত্য দেখা যায়। নাট্যশাস্ত্রের নীরবতা-ই সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ। আচার্য অভিনবগুপ্ত এই পাঁচটিকে বলেছেন ফলের হেতু – 'যত্রার্থঃ ফলং তস্য প্রকৃতয় উপায়াঃ ফলহেতব ইত্যর্থঃ'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। এবিষয়ে নাট্যদর্পণকারদের অভিমত অবিকল অনুরূপ । দশরূপকের টীকাকার ধনিক এবং দর্পণকার বিশ্বনাথের মত-ও অভিনবগুপ্তের অনুসারী। অর্থাৎ এঁদের মতে অর্থপ্রকৃতিগুলি নাট্যপ্রয়োজনসিদ্ধির হেতুস্বরূপ – 'প্রয়োজনসিদ্ধিহেতবঃ'। অন্যদিকে ভোজদেব এবং শারদাতনয়ের মতে, অর্থপ্রকৃতিগুলি হল 'কথাশরীরহেতবঃ' – অর্থাৎ নাটকীয় কথাবস্তুর শরীরভূত উপাদান । আবার আচার্য সাগরনন্দীর মতে, এগুলি হল নাটকীয় বস্তুর স্বভাব। অর্থাৎ নাটকীয় বস্তু হতে হলে এই পাঁচটিকে থাকতে-ই হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, অর্থপ্রকৃতির স্বরূপবিষয়ে নাট্যতত্ত্বজ্ঞদের মধ্যে সবিশেষ বৈমত্য বর্তমান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর অসাধারণ সমীক্ষাত্মক গ্রন্থে ('ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক') একটি অত্যন্ত যুক্তিসহ বিষয়ের প্রতি দিক্‌নির্দেশ করেছেন। উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা গেল, অধিকাংশ নাট্যতত্ত্ববিদের মতে, অর্থপ্রকৃতিগুলি হল নাটকের মুখ্য প্রয়োজন চরিতার্থ করার উপাদান। এখন প্রশ্ন, অন্য চারটি প্রয়োজনসিদ্ধির হেতু হলে-ও, 'কার্য' কিভাবে কার্যসিদ্ধির হেতু হতে পারে ? কারণ, কার্য-ই হল নাটকের মুখ্য ফল বা প্রয়োজন, যাকে লাভ করার জন্য অর্থপ্রকৃতিগুলির প্রয়োজন হয় । এর সমাধানকল্পে ডঃ. মুখোপাধ্যায় বলেছেন, অর্থপ্রকৃতি শব্দের যদি 'নাটকীয় বিষয়বস্তুর উপাদান' এরূপ অর্থ করা হয়, তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। কারণ সেক্ষেত্রে পঞ্চাঙ্গ বিষয়বস্তুর মধ্যে বীজ, বিন্দু প্রভৃতির ন্যায় কার্য-ও একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়।

অর্থপ্রকৃতির স্বরূপ নিয়ে মতভেদ থাকলে-ও এর সংখ্যা বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। নাট্যশাস্ত্রে বীজ-বিন্দু-পতাকা-প্রকরী-কার্য – এই পাঁচটিকে অর্থপ্রকৃতির পাঁচটি ভেদরূপে উল্লেখ করা হয়েছে –

"বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্যমেব চ।
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি ॥" (না.শা.১৯/২১)

নাট্যতত্ত্বের অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থে অর্থপ্রকৃতির এই পাঁচটি ভেদ-ই স্বীকৃত হয়েছে।

নায়কের দ্বারা মুখ্যফলের প্রাপ্তি হল যেকোনো নাটকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নায়ককে নানাবিধ প্রচেষ্টার আশ্রয় নিতে হয় এবং এই বিবিধ প্রচেষ্টাকালে নায়ককে নানারকম প্রতিকূলতার-ও সম্মুখীন হতে হয়। মর্ত্য মানব এই নায়ক যখন তাঁর একার শক্তিতে এইসকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পারেন না, তখন তাঁর সাহায্যার্থে কিছু অন্যান্য চরিত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট কিছু অন্যান্য ঘটনার অবতারণা করতে হয়। এই সহায়তার বিষয়টি পরিবেশনের জন্য

কয়েকটি অর্থপ্রকৃতির প্রয়োগ করা হয়। আবার নায়ক যদি অমিতপরাক্রমী হন এবং তিনি তাঁর ফলপ্রাপ্তির যাবতীয় বাধাবিঘ্ন কেবল নিজশক্তিতে দূরীভূত করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অন্য কোনো সহায়কের প্রয়োজন হয় না এবং তৎসূচক অর্থপ্রকৃতিগুলির প্রয়োগের-ও প্রয়োজন হয় না। নাট্যদর্পণে তাই স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, নাটকের প্রয়োজন ও কাহিনী অনুসারে পঞ্চবিধ অর্থপ্রকৃতির 'যথারুচি' প্রয়োগ নাট্যকারের কর্তব্য । সকল প্রকার অর্থপ্রকৃতি সকল প্রকার নাটকে অবশ্য যোজনীয় – এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে – ''ন সর্বত্র প্রারম্ভাদিবৎ সর্বা অর্থপ্রকৃতয়ো2পি। অপি তু যস্য নায়কস্য যেনার্থপ্রকৃতিবিশেষেণ প্রয়োজনসংপত্তিরধিকা তদেব প্রধানম্, অন্যত্তু ভবদপি গুণভূতমসৎকল্পম্'' (না.শা. উনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যে প্রয়োগের এই অবশ্যম্ভাবিতার উপর ভিত্তি করে নাট্যদর্পণে অর্থপ্রকৃতিগুলিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে –

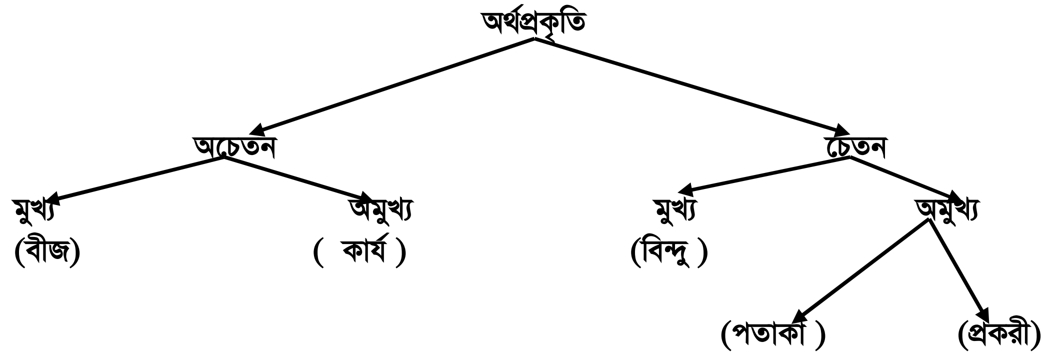
১. 'অচেতন' অর্থাৎ প্রধান উপাদান । বীজ ও কার্য – এই দুটি অর্থপ্রকৃতি হল প্রধান। একটি উপায়, অপরটি উপেয়; একটি সাধন, অপরটি সাধ্য; একটিতে ঘটনার সূচনা, অন্যটিতে তার উপসংহার । অতএব এই দুটি উপাদান যেকোনো নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। অচেতন উপাদান আবার মুখ্য ও অমুখ্য ভেদে দ্বিধা। বীজ হল মুখ্য এবং কার্য হল অমুখ্য।

২. 'চেতন' অর্থাৎ গৌণ বা উপকরণভূত উপাদান। বিন্দু, পতাকা ও প্রকরী –এই তিনটি হল এজাতীয় অর্থপ্রকৃতি । চেতন উপাদান-ও মুখ্য-অমুখ্য ভেদে দুই প্রকার । তন্মধ্যে বিন্দু হল মুখ্য, কারণ এটি নাটকের মূল কথাসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে সহায়তা করে । চেতন অমুখ্য উপাদান আবার দুই প্রকার –

ক. যেখানে নায়কের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সহায়কের-ও ফলপ্রাপ্তি ঘটে – 'পতাকা' এবং

খ. যেখানে কেবলমাত্র নায়কের ফলপ্রাপ্তির জন্য সহায়ক কাজ করেন; তাঁর নিজের কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় না – 'প্রকরী'।

উল্লিখিত ভেদব্যবস্থাকে একটি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে –



উল্লিখিত পঞ্চবিধ অর্থপ্রকৃতির মধ্যে বীজ ও বিন্দু হল সর্বপ্রধান; কারণ এই দুটি সমগ্র নাটক জুড়ে পরিব্যাপ্ত থাকে।

উল্লেখ্য, অর্থপ্রকৃতির ভেদবিষয়ক নাট্যদর্পণোক্ত এই আলোচনাটি অবিকল অভিনবগুপ্তাচার্যের মতানুসারী। অভিনবভারতীর সংশ্লিষ্ট অংশটি প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধার করা হল – 'তত্র জড়চেতনতয়া দ্বিধাকরণম্। জড়শ্চ মুখ্যকারণভূতঃ, গূঢ়তরো বা, আদ্যং বীজং দ্বিতীয়ং কার্যং করণীয়ং প্রযোক্তব্যমিত্যর্থে। চেতনো2পি দ্বিধা মুখ্য উপকরণভূতশ্চ। অন্ত্যো2পি দ্বিধা স্বার্থসিদ্ধিসহিততয়া পরার্থসিদ্ধয়া যুক্তঃ শুদ্ধয়াপি চ, তত্রাদ্যো বিন্দুঃ দ্বিতীয়ঃ পতাকা তৃতীয়ঃ প্রকরী" (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

এবার পঞ্চবিধ অর্থপ্রকৃতির প্রতিটির ক্রমিক আলোচনা করা যাক্ । এদের মধ্যে প্রথম হল বীজ।

১. বীজ ঃ

রূপকের প্রারম্ভে স্বল্পাকারে নির্দিষ্ট হেতু-ই হল বীজ। ধান্যাদি শস্যের বীজ যেমন প্রথমে অঙ্কুরিত হয়, পরে পল্লবিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়, রূপকে-ও তেমনি অল্পমাত্র সমুদ্দিষ্ট হয়ে, যা বহুভাবে বিস্তৃতি লাভ করে, সেই নাট্যবৃত্তকে বলা হয় বীজ । এই বীজ হল রূপকের ফললাভের প্রাথমিক হেতু বা সাধক। নাট্যদর্পণোক্ত বীজলক্ষণে তাই বলা হয়েছে – 'স্তোকোদ্দিষ্টঃ ফলপ্রান্তঃ হেতুর্বীজং প্ররোহণাৎ' (না.দ.১/২৯)।

নাটকের মুখ্য ইতিবৃত্তের সূচক এই বীজের প্রয়োগ হয় আমুখ বা প্রস্তাবনার অব্যবহিত পরে । আমরা সকলে-ই জানি, নাটকের যে অংশে নটী, বিদূষক, পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ সূত্রধারের অনুচর প্রমুখ সূত্রধারের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজ-নিজ কর্তব্যবিষয় অবলম্বনপূর্বক বিচিত্র বাক্যের দ্বারা নাটকের সূচনা বিষয়ে পারস্পরিক আলাপ করেন, তাকে-ই প্রস্তাবনা বলা হয়। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, বহুশঃ এরকম দেখা যায় যে, প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত কোনো শ্লোক বা গদ্যাংশের পুনরায় আবৃত্তির মাধ্যমে বীজের বিন্যাস ঘটে । উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী', 'সত্যহরিশ্চন্দ্র' ও 'যাদবাভ্যুদয়' – এই তিনটি রূপকের প্রস্তাবনার অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা রত্নাবলীর উদাহরণটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করলাম –

"দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশো2প্যন্তাৎ ।

আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ ॥"

– উল্লিখিত শ্লোকটি 'রত্নাবলী' নাটিকায় সূত্রধারোক্ত প্রস্তাবনার অর্ন্তগত শ্লোকবিশেষ । আবার এই শ্লোকটি উচ্চারণ করতে-করতে অন্যতম নাটকীয় চরিত্র মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ ঘটছে। রত্নাবলী

নাটিকার মুখ্যফল হল উদয়ন ও রত্নাবলীর মিলন। দৈবের আনুকূল্য ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছে । উদয়ন ও রত্নাবলীর ভাবী মিলনের সঙ্কেত প্রস্তাবনার এই অংশে নিহিত রয়েছে,সুতরাং এটি বীজের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, বীজের বিন্যাসের দ্বারা কয়েক প্রকার নাটকীয় প্রয়োজন সাধিত হতে পারে। যেমন – বীজের দ্বারা নাট্যবস্তু অর্থাৎ অভিনেয় বৃত্তান্তের সূচনা হতে পারে। 'রত্নাবলী' থেকে গৃহীত উপর্যুক্ত উদাহরণে এই প্রয়োজনটি সাধিত হয়েছে।

কোনো সময় বীজের মাধ্যমে কোনো ভাবী বিপদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়, যে বিপদ থেকে মুক্তিলাভ-ই হয় সেই নাটকের মুখ্য ফল। 'মায়াপুষ্পক' নামক রূপক থেকে এর উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে –

"কৈকেয়ী ক্ব পতিব্রতা ভগবতী ক্বেবংবিধং বাগ্বিপং
ধর্মাত্মা ক্ব রঘূদ্বহঃ ক্ব গমিতো2রণ্যং সজায়ানুজঃ ।
ক্ব স্বচ্ছো ভরতঃ ক্ক বা পিতৃবধান্মাত্রাধিকং দহ্যতে
কিং কৃত্বেতি কৃতো ময়া দশরথে2বধ্যে কুলস্য ক্ষয়ঃ ॥"

– উল্লিখিত শ্লোকে শাপ নামক জনৈক চরিত্রের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, দশরথের মৃত্যু ইত্যাদি কথিত হচ্ছে। ঘটনাপরম্পরায় এই সমস্ত বিপদ কাটিয়ে উঠে রাবণবধ, সীতাপ্রাপ্তি ইত্যাদি হল এই নাটকের প্রধান ফল ।

কখনো-কখনো বীজের দ্বারা সৌভাগ্য-ও সূচিত হতে পারে । যেমন – 'তাপসবৎসরাজ্য' নামক রূপকের –'অমচ্ছো বি এবং সামিণা অপ্পণো পডিকূলমায়রং তেণ দংড আয়াসিদো...'– ইত্যাদি অংশে মাণবক নামক চরিত্রের মুখে স্বামীর প্রতিকূল আচরণকারী অমাত্যদের শাস্তি তথা সংশ্লিষ্ট রাজার হিতসাধন – দুই-ই সূচিত হয়েছে।

আবার কখনো-কখনো বীজের মাধ্যমে আপতিত বিপদের সমাধানের সূচনা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ মুদ্রারাক্ষসের – "আঃ! ক এষ ময়ি জীবতি চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ? নন্দকুলকালভুজগীং কোপানলবহুলনীলধূমলতামদ্যাপি বধ্যঃ কো নেচ্ছতি শিখাং মে ?"– ইত্যাদি অংশে চন্দ্রগুপ্তের পরাজয়ের সম্ভাবনায় সেই বিপদের সমাধানকল্পে চাণক্যের অবতরণ সূচিত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রোক্ত বীজলক্ষণটি হল –

"স্বল্পমাত্রং সমুৎসৃষ্টং বহুধা যদ্ বিসর্পতি।
ফলাবসানং যচ্চৈব বীজং তৎ পরিকীর্তিতম্ ॥'' (না.শা. ১৯/২২)

–অর্থাৎ বীজ রূপকের প্রথমদিকে স্বল্পমাত্রায় প্রক্ষিপ্ত হয়ে পরবর্তীকালে বহুধারায় বিস্তৃত হয় এবং শেষপর্যন্ত রূপকে ফললাভের হেতুরূপে গণ্য হয়।

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে এভাবে-ই বীজের লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে, ধর্ম-অর্থ-কাম – এই ত্রিবর্গের সাধনস্বরূপ যে নাটকীয় ফল, তার প্রধান হেতু হল এই বীজ – 'হেতুর্যৎ স্যাৎ ত্রিবর্গস্য তদ্বীজমিতি কথ্যতে' (ভাব.প্র.সপ্তম অধিকার)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বীজলক্ষণনির্ণয়াবসরে মহর্ষি ভরতের মতটি-ই অনুসৃত হয়েছে। তবে অতিরিক্ত এই যে, আচার্য সাগরনন্দীর মতে, 'শ্লেষ' অর্থাৎ দ্ব্যর্থবচন, 'ছায়া' অর্থাৎ কথাসাম্য এবং 'উপক্ষেপ' অর্থাৎ অর্থের কোনো বিষয়ের উপস্থাপন – এই অঙ্গগুলির দ্বারা অল্পমাত্রায় সমুদ্দিষ্ট নাটকীয় বস্তুর অঙ্গবিশেষের নাম বীজ। বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে – 'কিঞ্চিৎ স্তোকং শ্লেষচ্ছায়োপক্ষেপপ্রভৃতিভিরঙ্গৈঃ সমুদ্দিষ্টং কথিতম্' (না.ল.র. চতুর্থ অধ্যায়)।

শ্লেষাদির মাধ্যমে বীজন্যাসের উপদেশ নাটকলক্ষণরত্নকোশ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না। আচার্য সাগরনন্দী মতটি ভরতের বলে বিশ্বাস করেন বলে মনে হয়। সপ্তম পরিচ্ছেদে মুখসন্ধিবিষয়ক আলোচনায় সাগরনন্দী 'তথা অন্যথাপ্যাচার্য আহ' বলে "যস্মিন্নাখ্যানবীজস্য শ্লেষেণ ছায়য়াপি বা..." শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের যে সংস্করণটি আচার্য সাগরনন্দী ব্যবহার করেছিলেন, তাতে সম্ভবতঃ বর্তমান শ্লোকটির আলোচনা ছিল।

২. পতাকা ঃ

নাট্যশাস্ত্রে বীজ-বিন্দু-পতাকা-প্রকরী-কার্য – এই ক্রমে অর্থপ্রকৃতিগুলির আলোচনা রয়েছে। নাট্যদর্পণে প্রসিদ্ধ এই ক্রম ভঙ্গ করে বীজের পর পতাকার আলোচনা করা হচ্ছে।

আধিকারিক বৃত্তের ফলসিদ্ধির জন্য অনেক সময় অনেক গৌণবস্তুর অবতারণা করতে হয়। নাট্যপ্রয়োজনে প্রসঙ্গতঃ অবতারিত এই গৌণবস্তুকে-ই বলে আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক বস্তু। আধিকারিক বস্তুর ফলনির্বহণে সাহায্য করা-ই এর কাজ। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে – 'কথায়ামেব কথান্তরমুপকারকৃদানুষঙ্গিকমিতি' (না.ল.র. চতুর্থ অধ্যায়)– নাট্যের প্রধান কথাবস্তুর মধ্যে তার পরিপোষক অন্য কথাকে বলা হয় প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক বস্তু । যাই হোক্ , এই প্রাসঙ্গিক বৃত্তের দুটি প্রকার – পতাকা ও প্রকরী। এবার নাট্যদর্পণসম্মত পতাকালক্ষণের আলোচনা করা যাক্ ।

আধিকারিক নাট্যবস্তুর সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কযুক্ত যে প্রাসঙ্গিক বস্তু নাটকে অধিক দূর বিস্তৃত ও দীর্ঘকালস্থায়ী, প্রধান ইতিবৃত্তের উপকারক সেই প্রাসঙ্গিক বস্তু পতাকা নামে অভিহিত । যেমন –

রামায়ণে বর্ণিত সুগ্রীববৃত্তান্ত বা বিভীষণবৃত্তান্ত নায়ক রামচন্দ্রের রাবণবধ ও সীতাপ্রাপ্তিরূপ মুখ্য ফললাভের সহায়ক এবং এগুলি রূপকের বিস্তৃত অংশ নিয়ে পরিব্যাপ্ত ; তাই সুগ্রীব বা বিভীষণের বৃত্তান্ত পতাকা নামে পরিচিত ।

পতাকাবৃত্তের নায়ককে পতাকানায়ক বলা হয়। অবশ্য উল্লেখ্য যে, প্রধান নায়কের ফললাভের সঙ্গে-সঙ্গে পতাকানায়কের স্বকীয় কিছু ফলসিদ্ধি-ও থাকে। যেমন – রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের মুখ্যফলপ্রাপ্তি হল সীতা উদ্ধার। তাঁর এই কাজের ফলনির্বহণে সহায়তা করেছেন পতাকানায়ক সুগ্রীব ও বিভীষণ। শেষোক্ত দুজনের-ও কিন্তু যথাক্রমে কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কার আধিপত্যলাভরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটেছে। অতএব দেখা গেল, পতাকানায়ক প্রধান নায়কের কার্যসাধনে সাহায্য করেন এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের নিজেদের-ও কিছু ফলপ্রাপ্তি ঘটে। অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে – 'যস্য সংবন্ধি বৃত্তং সংচিদনুসন্ধানং পরস্য প্রয়োজনসংপত্তয়ে ভবদপি স্বপ্রয়োজনং সম্পাদয়তি' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রের পতাকালক্ষণে-ও এক-ই কথা বলা হয়েছে; যে বৃত্ত নায়কের প্রয়োজনসাধনের সঙ্গে-সঙ্গে পতাকানায়কের নিজের অভীষ্ট-ও সিদ্ধ করে, তাকে পতাকা বলা হয় –

"যদ্বৃত্তং হি পরার্থং স্যাৎ প্রধানস্যোপকারকম্ ।
প্রধানবচ্চ কল্পেত পতাকা সাভিধীয়তে ॥" (না.শা. ১৯/২৪)

পরভাবী দর্পণকার, দশরূপককার, ভাবপ্রকাশনকার প্রমুখ সকলে-ই পতাকার লক্ষণ নির্ণয়ে নাট্যশাস্ত্রের-ই অনুসরণ করেছেন।

পৌরুষাদি গুণের দীপ্তিতে পতাকাবৃত্তের ঔজ্জ্বল্য-ও হবে যথেষ্ট। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে – 'যস্যা বৃত্তং বর্তনং পরার্থং পরপ্রয়োজনার্থং প্রধানস্যোপকারকং ভবেৎ, স্বয়মপি পৌরুষাতিশয়ার্থং প্রধানবৎ কল্পেত সা পতাকা' (না.ল.র. চতুর্থ অধ্যায়)।

পূর্বে-ই বলা হয়েছে, নাট্যদর্পণমতে পতাকা, প্রকরী ও বিন্দু রূপকের কথাবস্তুর গৌণ বা উপকরণ ভূত উপাদান। তার মধ্যে-ও পতাকা ও প্রকরী হল অমুখ্য । অতএব বোঝা যাচ্ছে, নাটকে পতাকার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী নয় । নায়ক যদি স্বীয় ফলসিদ্ধির ব্যাপারে অন্য কোনো সহায়কের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে পতাকার প্রয়োগ হবে। নায়ক যদি নিজশক্তিতে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে মুখ্য ফললাভে সক্ষম হন, সেক্ষেত্রে পতাকাপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই। টীকায় তাই বলা হয়েছে – 'যদি ফলসাধনে সাহায্যাপেক্ষাণাং নায়কানাং বৃত্তং নিবধ্যতে, তদা পতাকা ভবতি ন তু স্বপরাক্রমবহুমানিনামিতি' ।[৫০]

অতএব দেখা গেল, পতাকাবৃত্তে বিন্যস্ত সমধিক ব্যাপ্তিযুক্ত প্রাসঙ্গিক কাহিনী নায়ক ও পতাকানায়ক – উভয়কে ঘিরে আবর্তিত হয়। লক্ষণীয়, আচার্য সাগরনন্দী কেবলমাত্র নায়কের সহায়ককে-ই পতাকানায়কের মর্যাদা দেননি; তাঁর মতে, প্রতিনায়কের সহায়ক অর্থাৎ নায়কের বিরুদ্ধাচারী-ও পতাকানায়ক বলে গণ্য হতে পারেন। তাই পতাকানায়কের উদাহরণরূপে তিনি 'বেণীসংহার' নাটকের প্রধান নায়ক ভীমসেনের প্রতিনায়ক দুর্যোধনের সহায়ক কর্ণের নামোল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে এই বিষয়টি যথেষ্ট যুক্তিসহ। কারণ, নায়কের বিরুদ্ধাচারীর কার্যকলাপ-ও নাটকীয় ঘটনার বিস্তার ও অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট প্রয়োজন। অন্যথায়, রূপকে তা সন্নিবেশের কোনো অর্থ-ই থাকে না।

পতাকানায়কের এমন কোনো স্বকীয় ফল থাকতে পারে না, যা প্রধানবৃত্তের উপকারক নয়। প্রধানবৃত্তের উপকারকরূপে পতাকানায়ক কিছু স্বকীয় ফললাভ করতে পারেন। যেমন – শ্রীরামের সাহায্যকারী সুগ্রীব লাভ করেন তাঁর হৃতরাজ্য। পতাকানায়কের এতাদৃশ ফল নাট্যকার যদি দেখান, তবে তা গর্ভসন্ধি বা বিমর্শসন্ধির মধ্যে দেখাতে হবে। নাট্যদর্পণের কারিকায় পতাকার বিস্তার সম্পর্কে তাই বলা হচ্ছে – 'আবিমর্শ পতাকা চেৎ'(না.দ.১/২৯)। নাট্যশাস্ত্রে-ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে – 'আগর্ভাদ্বিমর্শাদ্বা পতাকা বিনিবর্ততে' (না.শা.১৯/২৯)। পতাকানায়কের ফলসিদ্ধি কোনোমতে-ই নির্বহণসন্ধিতে উপস্থাপিত হবে না; যেহেতু সেটি কেবলমাত্র প্রধান নায়কের ফলনির্বহণের জন্য নির্দিষ্ট। মুখ্যফলনিষ্পাদনের প্রাধান্য এবং গুরুত্ব নায়ক ও পতাকানায়কের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়া অভিপ্রেত নয়। অভিনবগুপ্তাচার্য তাই বলেছেন – 'নির্বহণপর্যন্তে তৎফলে ক্রিয়মাণে তুল্যকালয়োরুপকার্যোপকারকত্বাভাবাৎ তেন প্রধানোপকারো (কারভাবোত্তর) ন ভবেৎ' (না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণকারদ্বয়ের মতে, রথোপরি নিহিতা পতাকা যেমন নিজের সৌন্দর্যের সঙ্গে-সঙ্গে রথের-ও সৌন্দর্য সম্পাদন করে, তেমনি পতাকায় বিন্যস্ত কাহিনীর দ্বারা নায়ক ও পতাকানায়ক উভয়ের-ই উপকারসাধন হয়, এই সাদৃশ্যহেতু এর পতাকা নামকরণ – 'স্বার্থায় প্রবৃত্তো যো হেতুশ্চেতনঃ পরস্য প্রধানস্য প্রয়োজনং সম্পাদয়তি স প্রসিদ্ধিপ্রাশস্ত্যহেতুত্বাৎ পতাকেব পতাকা'।[৫১]

যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার পতাকাদর্শনে স্বপক্ষের সৈন্যরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সাহায্য করে; অতএব সৈন্যাধ্যক্ষের পতাকা তাঁর উপকারক। অনুরূপে দূরব্যাপী পতাকাবৃত্ত-ও প্রধানবৃত্তের উপকারক।এই সাদৃশ্যবশতঃ-ই পতাকা নামকরণ – দশরূপকের টীকাকার ধনিকের এই অভিমত। আচার্য সাগরনন্দীর মত একটু অন্যরকম। ধ্বজের উপর নিহিত পতাকার মত পতাকাবৃত্ত। পতাকা যেমন একস্থানে থেকে সকল সৈন্যকে দ্যোতিত করে, তেমনি দৃশ্যকাব্যের পতাকা নামক এই

প্রাসঙ্গিক বৃত্তটি একস্থানে বর্তমান থেকে সমগ্র দৃশ্যকাব্যটিকে দ্যোতিত করে – ''ধ্বজোপরি নিহিতপতাকেব পতাকা। যথেয়মেকদেশস্থায়িনী সকলং সৈন্যং দ্যোতয়তি তথা চেয়মপি নাটকৈকদেশবর্তিনী নাটকং সকলমেব প্রকাশয়তি'' (না.ল.র.চতুর্থ অধ্যায়)।

পতাকাস্থানক ঃ

পতাকা আলোচনার অব্যবহিত পরে (অন্য অর্থপ্রকৃতিগুলির আলোচনা না করে) নাট্যদর্পণকারদ্বয় পতাকাস্থানকের আলোচনা করছেন।

কেবল নামসাদৃশ্য নয়, পতাকার মত পতাকাস্থানক-ও নাটকে প্রাসঙ্গিক এবং মুখ্যপ্রয়োজনের উপকারসাধক । নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে – 'উপকারিত্বমাত্রসাম্যাৎ পতাকাস্থানস্য তুল্যং পতাকাস্থানকম্'।[৫২] তবে টীকাতে-ই আবার পতাকা ও পতাকাস্থানকের পার্থক্যের নির্দেশ-ও করা হয়েছে –

প্রথমতঃ, নাটকে সাধারণতঃ একটি-ই মাত্র পতাকা থাকে (ব্যতিক্রম – রামচরিতে সুগ্রীব ও বিভীষণ), কিন্তু পতাকাস্থানক নাটকে একাধিকবার প্রযুক্ত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রবিশেষে পতাকা ব্যতিরেকে-ও নাটক নির্মিত হতে পারে। কিন্তু নাট্যদর্পণমতে, অলঙ্করণস্বরূপ এই পতাকাস্থানক বাদে রূপকনির্মাণ করা যেতে পারে না ।

তৃতীয়তঃ, পতাকার মত এটি নিরন্তর প্রযুক্ত হয় না। সমগ্র নাটকীয় বৃত্তের মধ্যে-মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার ব্যবধানে পতাকাস্থানক প্রযুক্ত হয়।

চতুর্থ পার্থক্যটি নির্দেশ করেছেন আচার্য অভিনবগুপ্ত। তাঁর মতে, পতাকাস্থানক পতাকার মত দীর্ঘ হয় না; তাই রূপকে তার স্থান-ও পতাকার মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে – 'প্রধানবচ্চ কল্প্যতেতি পতাকালক্ষণে2ভিধানাদ্ বহুতরেতিবৃত্তে ব্যাপকতা নায়কস্য, অস্য তু পরিমিতেতিবৃত্তব্যাপকত্বমিত্যপি বিশেষঃ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়) ।

নাটকের আবেদনকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য নাট্যকার যেসকল নাট্যকৌশলের অবতারণা করেন, পতাকাস্থানক তাদের অন্যতম। পতাকাস্থানক আকস্মিক ও ভাব্যর্থসূচক। অকস্মাৎ উপস্থিতি এবং ভাবী বিষয়ের সূচনা-ই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য । কখনো একটি ঘটনা, কখনো নূতন একটি পরিস্থিতি, কখনো বা সামান্য উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে অনবদ্য এই নাট্যকলাটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। পতাকাস্থানকের লক্ষণে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে –

"বিচিন্তিতার্থাৎ পরপ্রাপ্তিঃ বৃত্তে যত্রোপকারিণী।
পতাকাস্থানকং তৎ তু ... ॥" (না.দ.১/৩০)

– কোনো একটি বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনা করতে করতে, অতর্কিতভাবে তৎসদৃশ অন্য বিষয়ের অবতারণা-ই হল পতাকাস্থানক। এই অংশে প্রদর্শিত আগন্তুক ঘটনাবিশেষের অথবা পরিবেশিত সংবাদবিশেষের লক্ষ্য হল ভাব্যর্থসূচনা এবং এই কারণে-ই নাটকের মুখ্যফলপ্রাপ্তিতে পতাকাস্থানকের প্রয়োজন ও উপযোগিতা । টীকায় তাই বলা হচ্ছে – 'অধ্যবসিতাৎ প্রয়োজনাদুপায়াচ্চান্যস্য প্রয়োজনস্যোপায়স্য চ প্রাপ্তির্যত্রেতিবৃত্তে উপকারিণী প্রধানফলোপকারিকা তদিতিবৃত্তং পতাকাস্থানকম্'। [৫৩]

মহর্ষি ভরতকে অনুসরণ করে-ই নাট্যদর্পণের পতাকাস্থানকলক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে এর লক্ষণটি নিম্নরূপ–

"যত্রার্থে চিন্তিতে2ন্যস্মিংস্তল্লিঙ্গো2ন্যঃ প্রযুজ্যতে।

আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানকং তু তৎ ॥" (না.শা. ১৯/৩০)

– অর্থ এক-ই । একটি বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনা করতে-করতে অতর্কিতে অনুরূপ বিষয়ান্তরের অবতারণাকে বলা হয় পতাকাস্থানক। আচার্য সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে এই লক্ষণটির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এবং অভিনবগুপ্তাচার্য – উভয়ের মতে, লক্ষণে ব্যবহৃত 'লিঙ্গ' পদটি হেতু অর্থে গৃহীত। অন্যদিকে 'আগন্তুক ভাব' পদটি নিয়ে উভয়ের বৈমত্য দেখা যায়। অভিনবগুপ্তের মতে, 'আগন্তুক ভাব' শব্দের অর্থ সহকারিকৃত –'সহকারিকৃতমাগন্তুকমুচ্যতে'(না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)। অপরদিকে, আচার্য সাগরনন্দী এই শব্দটিকে পরিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। 'দশরথাঙ্ক' নামক রূপক থেকে গৃহীত উদাহরণের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'আগন্তুক ভাব' অর্থাৎ বিষাদাদি ব্যভিচারিভাব। ডঃ. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এক্ষেত্রে 'ভাব'শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করা খুব যুক্তিসহ নয়। কারণ, দর্শকের মানসিক প্রস্তুতির জন্য কুশলী নাট্যকার কাহিনীর অগ্রগতির মধ্যে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন, একথা সত্য; কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সেই ইঙ্গিত আগন্তুক কোনো ব্যভিচারিভাবের দ্বারা না-ও হতে পারে।

যাই হোক্, নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে-ই পরভাবী বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাগরনন্দী, শারদাতনয়, শিঙ্গভূপাল প্রমুখ সকলে পতাকাস্থানকের লক্ষণ বিধান করেছেন; কেবল দশরূপককার আচার্য ধনঞ্জয়ের অভিমতটি অন্যপ্রকার। দশরূপকধৃত পতাকাস্থানের লক্ষণটি হল – 'প্রস্তুতাগন্তুভাবস্য বস্তুনো2ন্যোক্তিসূচকম্' (দশ.রূ. ১/১৪)– অর্থাৎ যেখানে প্রস্তুত ভাবী বস্তুর সমান বৃত্ত বা সমান বিশেষণ দ্বারা অন্যোক্তিময় বিষয়ের সূচনা করা হয়, তাকে পতাকাস্থান বলে। আচার্য রুদ্রটের মতে, এই অন্যোক্তি অপ্রস্তুতপ্রশংসার-ই নামান্তর। টীকাকার ধনিক ব্যাখ্যায় বলেছেন – 'প্রাকরণিকস্য ভাবিনো2র্থস্য সূচকং রূপং পতাকাবদ্ ভবতীতি পতাকাস্থানকম্' (দশ.রূ. প্রথম

প্রকাশ) – প্রাকরণিক ভাবী ঘটনার সূচক যে ইতিবৃত্ত, পতাকাতুল্য বলে তাকে-ই পতাকাস্থানক বলা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভাবপ্রকাশনকার শারদাতনয়ের মতে, পতাকাস্থানক কেবল ভাবী ঘটনার নয়, অতীত ঘটনার-ও সূচক হতে পারে –

"সূচনোপায়মেবাহুঃ পতাকাস্থানকং বুধাঃ ।

অতীতানাগতে কার্যে কথ্যেতে যত্র বস্তুনা ॥" (ভাব.প্র. সপ্তম অধিকার)

নাট্যশাস্ত্রমতে পতাকাস্থানকের চতুর্বিধ প্রকার হতে পারে – 'চতুষ্পতাকাপরং নাটকে কার্যমিষ্যতে' (না.শা. ১৯/৩৬)। নাট্যদর্পণ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে ভরতকথিত এই চাতুর্বিধ্যকে স্বীকার করা হয়েছে। ভাবপ্রকাশন ও নাটকলক্ষণরত্নকোশে নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণগুলি অবিকল উদ্ধার করা হয়েছে। কেবল দশরূপককারের অভিমতটি একটু অন্যরকম; যথাসময়ে এসকল মতামতের আলোচনা করা হবে।

এবার নাট্যদর্পণোক্ত চতুর্বিধ পতাকাস্থানকের লক্ষণগুলির ক্রমিক আলোচনা করা হচ্ছে –

১. প্রথমপ্রকার পতাকাস্থান – প্রথমপ্রকার পতাকাস্থানকের লক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'সহসেষ্টার্থলাভশ্চ' (না.দ.১/৩১)– আকস্মিকভাবে উপস্থিত কোনো আগন্তুক বিষয় যদি আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা অধিক চমৎকৃতির কারণ হয়, তখন সেটি প্রথম প্রকার পতাকাস্থানক রূপে অভিহিত হয়।

এর উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী', 'নলবিলাস', 'নাগানন্দ' – এই তিনটি রূপক থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আমরা কেবল প্রথমটির আলোচনা করছি–

সাগরিকায়াং পাশাবলম্বনপ্রবৃত্তায়াং বাসবদত্তেতি মন্যমানো রাজা পাশাদ্ বিমোচয়তি, তদা তদুক্ত্যা সাগরিকাং প্রত্যভিজ্ঞায়াহ – "কথং মে প্রিয়া সাগরিকা ? অলমলমতিমাত্রেণ" ইত্যাদি ।

– উল্লিখিত অংশে বাসবদত্তার কণ্ঠপাশমোচনে রাজার উদ্যোগ হল আলোচ্য বিষয়। যাঁর পাশমোচনে রাজা উদ্যত, তিনি বাসবদত্তা নন, সাগরিকা – এটি আগন্তুক বিষয় । আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা আগন্তুক বিষয়টি অধিকতর আনন্দের কারণ এবং তা রাজা ও সাগরিকার ভাবিমিলনের সূচক। অতএব এটি প্রথম প্রকার পতাকাস্থানকের অতি উত্তম উদাহরণ।

প্রথমপ্রকার পতাকাস্থানকের নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণটি হল –

"সহসৈবার্থসম্পত্তির্গুণবত্যুপকারতঃ ।

পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্তিতম্ ॥" (না.শা. ১৯/৩১)

– অতর্কিতে আগত অধিকতর গুণযুক্ত ঘটনাবিশেষ, যা মুখ্যফলপ্রাপ্তির উপকারক, তাকে প্রথমপ্রকার পতাকাস্থানক বলা হয়। আচার্য সাগরনন্দী এই লক্ষণের ব্যাখ্যায় বৃত্তিতে বলছেন – 'উপকারতঃ অভিবাঞ্ছনসিদ্ধিনিষ্পাদনতঃ'(না.ল.র. দশম অধ্যায়) – ঈপ্সিত সিদ্ধিসাধনের পক্ষে যা উপযোগী। কোনো-কোনো সংস্করণে নাট্যশাস্ত্রোক্ত এই লক্ষণটির ''সহসৈবার্থনিষ্পত্তিঃ ......" – এরূপ পাঠান্তর পাওয়া যায়। 'নিষ্পত্তিঃ' পদের ব্যাখ্যায় আচার্য সাগরনন্দী বলছেন – 'তৎক্ষণাদেব সমীহিতস্যার্থস্য নিষ্পত্তিঃ'(না.ল.র. দশম অধ্যায়) – ঈপ্সিত ফলের পক্ষে উপকারক সহসা উৎসৃষ্ট বিষয়ের অবতারণা হল নিষ্পত্তি । এই বিষয়ের সাধন-ই হল প্রথম প্রকার পতাকাস্থানকের বৈশিষ্ট্য।

২. দ্বিতীয়প্রকার পতাকাস্থানক – দ্বিতীয়প্রকার পতাকাস্থানকের লক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'শ্লিষ্টসাতিশয়া চ বাক্'(না.দ. ১/৩১)। টীকার সাহায্যে এই কারিকার নিস্কৃষ্ট অর্থ হল – 'শ্লিষ্ট' অর্থাৎ রূপকের মুখ্য তথা প্রস্তুত বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত – 'শ্লিষ্টা প্রকৃতসম্বদ্ধা'; 'সাতিশয়' পদের অর্থ হল অতিশয়োক্ত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত; অভিনবভারতী উল্লেখ্য – 'অতিশয়োক্ত্যাদিনা যোজনং তন্নিমিত্তবশাদ্যাদ্বচনং সাতিশয়ম্' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। অতএব লক্ষণলব্ধ সামগ্রিক অর্থটি দাঁড়াল – প্রস্তুত বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ান্তর যখন অতিশয়োক্ত্যাদির দ্বারা পরিবেশিত হয়, মুখ্যার্থের উপকারক সেই বাক্যকে দ্বিতীয়প্রকার পতাকাস্থানক বলা হয়।

নাট্যদর্পণে এই পতাকাস্থানকের উদাহরণরূপে 'রামাভ্যুদয়' রূপকের দ্বিতীয় অঙ্কের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে –

সীতাং প্রতি সুগ্রীবস্য সন্দেশোক্তিঃ –

"বহুনাত্র কিমুক্তেন ? পারে2পি জলধেঃ স্থিতাম্ ।

অচিরাদেব দেবি! ত্বাম্ আহরিষ্যতি রাঘবঃ ॥"

– উল্লিখিত সুগ্রীবোক্তির প্রস্তুত বিষয় হল সমুদ্রপারে রামচন্দ্রের অবস্থিতি । এর সঙ্গে সঙ্গে অতিশয়োক্তির দ্বারা সীতার আশু উদ্ধার-ও সূচিত হচ্ছে । অতএব এটি দ্বিতীয়প্রকার পতাকাস্থানকের উদাহরণ।

এই উদাহরণটি নাট্যদর্পণকাররা সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে গ্রহণ করেছেন। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, অভিনবভারতীতে উল্লিখিত অংশটি 'রামাভ্যুদয়'-এর তৃতীয় অঙ্কের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে নাট্যদর্পণে এটিকে উক্ত রূপকের দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়প্রকার পতাকাস্থানকের নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণটি হল –

“ বচঃ সাতিশয়ং শ্লিষ্টং কাব্যবন্ধসমাশ্রয়ম্ ।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতম্ ॥” (না.শা.১৯/৩২)

– নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য সাগরনন্দী এই লক্ষণের ব্যাখ্যায় বলেছেন, একাধিক অর্থের নির্দেশক শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থবাচক উক্তি, যা কিনা প্রস্তুত কাব্যের আশ্রয়স্বরূপ, তাকে-ই দ্বিতীয়প্রকার পতাকাস্থানক বলা হয় ।

সাহিত্যদর্পণে প্রায় অনুরূপভাবে এই প্রকার পতাকাস্থানকের লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে –

“বচঃ সাতিশয়ং শ্লিষ্টং নানাবন্ধসমাশ্রয়ম্ ।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতম্ ॥” (সা.দ. ৬/৪৭)

– ‘নানাবন্ধঃ’ পদের অর্থ বিবিধ বিশেষণযুক্ত – ‘নানাবন্ধো বিবিধবিশেষণসম্বন্ধঃ’ (সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। অতএব দর্পণকারসম্মত লক্ষণটির পূর্ণ অর্থ হল – অতিশয়ভাবে শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক এবং বিবিধ বিশেষণযুক্ত বাক্যকে দ্বিতীয়প্রকার পতাকাস্থানক বলা হয়।

৩. তৃতীয়প্রকার পতাকাস্থানক – তৃতীয় প্রকার পতাকাস্থানকের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – ‘দ্বয়র্থা চ (বাগিতি)’ (না.দ.১/৩১) – শ্লেষাদি অলঙ্কার প্রয়োগদ্বারে দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দ্বারা প্রস্তুত অর্থাৎ কাব্যের মুখ্য বস্তুর উপযোগী অর্থান্তরের সূচনা হয় তৃতীয়প্রকার পতাকাস্থানের দ্বারা।

নাট্যদর্পণে রত্নাবলী নাটিকা থেকে এই প্রকার পতাকাস্থানকের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে –

‘‘ ‘প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দশামুদয়নস্যেন্দোরিবোদীক্ষতে’ ইতি শ্রুত্বা সাগরিকা – ‘ অয়ং সো রায়া উদয়ণো, জস্স অহং তাদেণ দিন্না’ ইতি ।”

– উল্লিখিত অংশের আক্ষরিক অর্থ হল চন্দ্রের উদয়সূচনা। কিন্তু শ্লেষালঙ্কার প্রয়োগদ্বারে, দ্ব্যর্থবোধক শব্দমাধ্যমে নায়িকা সাগরিকার রাজা উদয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সূচিত হচ্ছে, যা কিনা এই নাটিকার প্রস্তুত বিষয় উদয়ন-রত্নাবলীর ভাবী মিলনের ইঙ্গিতবাহী। অতএব এটি তৃতীয়প্রকার পতাকাস্থানকের উত্তম উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে এই পতাকাস্থানকটিকে চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর লক্ষণটি হল –

“দ্বয়র্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ ।
উপন্যাসসুযুক্তশ্চ তচ্চতুর্থমুদাহৃতম্ ॥” (না.শা. ১৯/৩৪)

লক্ষণোক্ত ‘উপন্যাসসুযুক্তঃ’ পদের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্য বলছেন – ‘উপন্যাসে বস্ত্বন্তরোপক্ষেপে সুষ্ঠু সংপদ্যতে’ (না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)। অতএব টীকার সাহায্যে এই লক্ষণটির নিস্কৃষ্ট অর্থটি হল

যেখানে দ্ব্যর্থক, সুশ্লিষ্ট বচনবিন্যাসের দ্বারা মুখ্য বিষয়ের উপকারক বিষয়ান্তরের সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটে, তাকে চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থান বলা হয়। স্পষ্ট-ই দেখা যাচ্ছে, নাট্যদর্পণোক্ত তৃতীয়প্রকার এবং নাট্যশাস্ত্রোক্ত চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানকের লক্ষণদুটি সর্বথা অনুরূপ; পার্থক্য কেবলমাত্র নামকরণে।

সাহিত্যদর্পণে-ও নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে এই প্রকার পতাকাস্থানককে চতুর্থরূপে অভিহিত করে লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে –

"দ্ব্যর্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ।

প্রধানার্থান্তরাক্ষেপী পতাকাস্থানকং পরম্ ॥" (সা.দ. ৬/৪৯)

– সুন্দর শ্লেষযুক্ত, উভয়ার্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক বচনবিন্যাস, যা কাব্যে প্রযুক্ত হয়ে প্রধান অর্থান্ত রের সূচক হয়, তাকে চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানক বলা হয়।

বস্তুতঃপক্ষে, নাট্যদর্পণোক্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (নাট্যশাস্ত্রাদিমতে চতুর্থ) পতাকাস্থানকের মধ্যে মৌলিক কোনো প্রভেদ নেই। তবে সাহিত্যদর্পণোক্ত লক্ষণটির ভিত্তিতে ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় এদের মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন । তাঁর মতে, তৃতীয় ভেদটিকে যখন মুখ্যার্থের সূচক বলা হচ্ছে ('প্রধানার্থান্তরাক্ষেপী'), তখন দ্বিতীয় ভেদটি সম্ভবতঃ গৌণার্থের অর্থাৎ বীজের সূচক – এইভাবে এদের মধ্যে একটি ভেদ নিরূপণ করা যেতে পারে।

৪. চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানক – চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানকের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল– 'অপ্রকটে শ্লিষ্টস্পষ্টপ্রত্যভিধা2পি চ' (না.দ. ১/৩১)। টীকায় বলা হয়েছে – 'অপ্রকট' অর্থাৎ প্রত্যুত্তরকারীর অবিজ্ঞাত বস্তু, 'শ্লিষ্ট' অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক।অতএব একাধিক ব্যক্তির কথোপকথনাবসরে প্রত্যুত্তরকারীর অজ্ঞাত কোনো বিষয়, দ্ব্যর্থক শব্দমাধ্যমে প্রস্তুত বিষয় অর্থাৎ মুখ্যফলের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে স্পষ্ট প্রতীত হলে, তাকে চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানক বলা হয়।

নাট্যদর্পণে চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানকের উদাহরণরূপে মুদ্রারাক্ষসের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে –

চাণক্যঃ –" অপি নাম দুরাত্মা রাক্ষসো গৃহ্যেত ?

এবমস্ফুটে2র্থে উপক্ষিপ্তে (প্রবিশ্য) সিদ্ধার্থকঃ – ' অয্য ! গহিদো ইতি। অতএব পুনঃ চাণক্যঃ – (সহর্ষমাত্মগতম্) 'হন্ত ! গৃহীতো দুরাত্মা রাক্ষসঃ ইতি।"

– উল্লিখিত অংশে চাণক্য ও সিদ্ধার্থক নামক এক সংবাদবাহকের কথোপকথন বর্ণিত হচ্ছে । চাণক্যের অভীপ্সিত বিষয় হল মলয়কেতুর প্রধানমন্ত্রী রাক্ষসকে বশীকৃত করা । এবিষয়ে সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত সিদ্ধার্থক কর্তৃক উক্ত 'গৃহীত' পদটির দ্বারা চাণক্য তাঁর ঈপ্সিত অর্থের ধারণা করে নিলেন

যে, রাক্ষস ধরা পড়েছেন। রাক্ষসের আয়ত্তীকরণের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের ভাবী বিজয়রূপ মুখ্যার্থের সূচনা থাকায় এটি চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানকের উত্তম উদাহরণ ।

নাট্যশাস্ত্রে এইপ্রকার পতাকাস্থানককে তৃতীয়প্রকার পতাকাস্থানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । তত্রোক্ত লক্ষণটি হল –

"অর্থোপক্ষেপণং যত্র লীনং সবিনয়ং ভবেৎ ।

শ্লিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়মিদমিষ্যতে ॥" (না.শা. ১৯/৩৩)

আচার্য সাগরনন্দী তাঁর গ্রন্থে এই লক্ষণটির অর্থ করেছেন – 'লীন' অর্থাৎ অস্ফুটরূপে, 'সবিনয়' অর্থাৎ ঔদ্ধত্যবর্জিত ভাবে, শ্লিষ্ট উত্তর-প্রত্যুত্তরযুক্ত কথোপকথনের মাধ্যমে অর্থের উপক্ষেপণ ঘটলে, তাকে তৃতীয়প্রকার পতাকাস্থানক বলা হয়। দর্পণকারের দ্বারা প্রদত্ত এই শ্রেণীর পতাস্থানকলক্ষণটি নাট্যশাস্ত্রের অবিকল অনুরূপ । কেবল 'সবিনয়' পদটির টীকানুগত অর্থটি হল 'সনিশ্চয়' – অর্থাৎ প্রথমে যে বাক্যার্থ অস্পষ্ট, কিন্তু অন্তে সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতার্থ, মুখ্য বিষয়বস্তুর সূচক (অর্থোপক্ষেপক), সশ্লিষ্ট উত্তর-প্রত্যুত্তরবিশিষ্ট পতাকাস্থানকের নাম তৃতীয়প্রকার পতাকাস্থানক ।

পতাকাস্থানকবিষয়ক আলোচনার অন্তে স্পষ্ট-ই বোঝা যাচ্ছে, নাট্যদর্পণকাররা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণ করেছেন। কেবলমাত্র ভরতকথিত তৃতীয়টিকে চতুর্থপ্রকার এবং চতুর্থটিকে তৃতীয়প্রকার পতাকাস্থানকরূপে গণ্য করা ব্যতীত অন্যান্য লক্ষণাদি সম্পূর্ণ একরকম। একমাত্র প্রথমপ্রকার পতাকাস্থানকের 'নলবিলাস' থেকে গৃহীত উদাহরণটি ব্যতীত অন্যান্য সবকটি উদাহরণ অভিনবভারতী থেকে-ই গৃহীত।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকল নাট্যতাত্ত্বিক পতাকাস্থানকের আলোচনায় মহর্ষি ভরতের-ই অনুসরণ করেছেন; একমাত্র ব্যতিক্রম দশরূপককার ধনঞ্জয় । তাঁর অভিমতটি এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

আচার্য ধনঞ্জয় পতাকাস্থানকের দুটিমাত্র ভেদ স্বীকার করেছেন – তুল্যসংবিধান এবং তুল্যবিশেষণ। যেখানে প্রস্তুত বা প্রাকরণিক বিষয়ের ভাবী অর্থ অন্যোক্তির মাধ্যমে সূচিত হয়, সেখানে তুল্যসংবিধান নামক পতাকাস্থানকের প্রয়োগ হয়। অন্যদিকে, যেখানে প্রাকরণিক বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে সমান বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা মুখ্য বিষয় সূচিত হয়, সেখানে তুল্যবিশেষণ নামক পতাকাস্থানকের প্রয়োগ হয়।

তুল্যসংবিধান ও তুল্যবিশেষণ ভেদে পতাকাস্থানকের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করে ধনঞ্জয় নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র মত পোষণ করেছেন। পরভাবী আচার্য শারদাতনয়, শিঙ্গভূপাল, রূপ গোস্বামী প্রমুখ দশরূপককারের এই মতকে নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁদের মতে,

ভরতোক্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার পতাকাস্থানক তুল্যসংবিধানশ্রেণীর এবং চতুর্থটি হল তুল্যবিশেষণশ্রেণীর । ভাবপ্রকাশনে তাই বলা হয়েছে –

"আদিতস্ত্রিতয়ং তুল্যসংবিধানাত্মকং ভবেৎ।

চতুর্থং চ ভবেত্তুল্যবিশেষণসমন্বিতম্ ॥" (ভা.প্র. সপ্তম অধিকার)

আকস্মিকভাবে ভবিষ্যৎ সূচনা করা পতাকাস্থানকের বৈশিষ্ট্য হলে-ও, এটি যে সর্বদা শুভ সূচনা করে, তা নয়; এর দ্বারা অশুভ-ও সূচিত হতে পারে । আমাদের আলোচিত চতুর্বিধ উদাহরণে শুভসূচনা দেখা গেছে। অশুভসূচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'উত্তররামচরিতম্'-এর প্রথম অঙ্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। চিত্রদর্শনকালে রামচন্দ্রের সীতাপ্রেমের অনির্বচনীয় প্রকাশ – 'কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ' – অর্থাৎ প্রিয়তমাবিষয়ক কোন্ বস্তু প্রিয় নয়, যদি পুনরায় বিরহ অসহ্য না হয়। এমন সময় 'দেঅ উঅত্থিদো' – এই প্রতিহারীবচনের দ্বারা দুর্মুখের উপস্থিতিজ্ঞাপনের ছলে কুশলী নাট্যকার ভবভূতি রাম-সীতার আসন্ন বিরহের অশুভ সূচনা করলেন।

অনেক সময় দেখা যায়, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণের উক্তির দ্বারা সৃষ্ট পতাকাস্থানকে যে ভবিষ্যৎ সূচিত হয়, তা পাত্রপাত্রীরা বুঝতে পারে না, কিন্তু দর্শকরা বুঝতে পারে। আবার কখনো-কখনো ভবিষ্যদ্বিষয়ক সূচনাটি নাটকীয় চরিত্র এবং দর্শক – কেউ-ই বুঝতে পারে না; পরে ঘটনাপরম্পরায় তা বোঝা যায়। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটিকে আধুনিক আলঙ্কারিকরা নাটকের মধ্যে একজাতীয় বৈসাদৃশ্য বা 'contrast' রূপে অভিহিত করেন। এই বৈসাদৃশ্যমূলক পতাকাস্থানকে বাংলায় নাট্যশ্লেষ এবং ইংরাজীতে 'Dramatic Irony' বলা হয়ে থাকে।

এইভাবে কখনো দর্শকের জ্ঞাতে - নাটকীয় চরিত্রের অজ্ঞাতে , কখনো উভয়ের অজ্ঞাতে, কখনো অশ্লেষ - কখনো সশ্লেষ বচনবিন্যাসের মাধ্যমে, কখনো আকস্মিক একটি ঘটনায়, কখনো উক্তি-প্রত্যুক্তিদ্বারে, কখনো বা সামান্য একটি উক্তির মাধ্যমে এই পতাকাস্থানক বা নাট্যশ্লেষের সূচনা করা হয় এবং এর ফলে সৃষ্ট অসাধারণ চমৎকৃতির দ্বারা সহৃদয়চিত্ত গতানুগতিকতামুক্ত এক গভীর রসময়তায় নিমগ্ন হন।

নাটকের মাধুর্যবৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য এই পতাকাস্থানকের প্রয়োগবিষয়ে কোনো নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা নেই। কোনো-কোনো সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতে মুখসন্ধি থেকে আরম্ভ করে সন্ধিচতুষ্টয়ে চতুর্বিধ পতাকাস্থানকের প্রয়োগ হবে। সাহিত্যদর্পণে আমরা পূর্বাচার্যদের এই অভিমতটির উল্লেখ পাই – 'যৎ পুনঃ কেনচিদুক্তম্ – মুখসন্ধিমারভ্য সন্ধিচতুষ্টয়ে ক্রমেণ ভবন্তি ইতি' (সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) । নির্বহণসন্ধিতে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়ার উপযোগী কোনো ভাবী ঘটনা থাকে না, এটি-ই সম্ভবতঃ এই অভিমতের কারণ। কিন্তু এই মতটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। আচার্য অভিনবগুপ্ত

স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন – 'অত্র চ যুক্তির্ন লক্ষ্যতে, ন বা চমৎকারত্বং ভজতীত্যসদেব' (না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)। দর্পণকার-ও পূর্বাচার্যদের এই মতের বিরুদ্ধে অন্য একটি মত উত্থাপন ও সেটি সমর্থনপূর্বক বলেছেন – 'তদন্যে ন মন্যন্তে, এষামত্যন্তমুপাদেয়ানামনিয়মেন সর্বত্রাপি সর্বেষামপি ভবিতুং যুক্তত্বাত্' (সা.দ.ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) – অর্থাৎ অত্যন্ত উপাদেয়তার কারণে নাটকের যেকোনো স্থলে যেকোনো প্রকার পতাকাস্থানকের প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই অনবদ্য নাটকীয় কৌশলটিকে কোনো নিয়মসূত্রে বাঁধা সর্বথা অযৌক্তিক ।

সকল দেশের সকল ভাষার সাহিত্যে-ই এই পতাকাস্থানকের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সশ্লেষ শ্রেণীর পতাকাস্থানকের প্রয়োগ অন্যান্য ভাষায় এক প্রবিরল বিষয়। সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্পদ্ অনন্ত; তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এজাতীয় পতাকাস্থান অনায়াসসাধ্য এবং সেই কারণে-ই সংস্কৃতে এই শ্রেণীর পতাকাস্থানকের বহুল প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এইসব পতাকাস্থানকের উক্তি-প্রত্যুক্তির তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা বা সূক্ষ্ম সূচনা ইতরজনবোধ্য নয়; সাধারণ দর্শকের রসবোধের অনেক ঊর্দ্ধে এর স্থান। এর রসাস্বাদনের ক্ষমতা একমাত্র সহৃদয় বিদগ্ধজনের। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত রূপককে 'Aristocratic'বলে মনে করেন। জনসাধারণ যা অনায়াসে বুঝতে পারে, অনায়াসে যা থেকে আনন্দ আহরণ করতে পারে, তাই হল জনসাধারণের নাটক অর্থাৎ লোকনাট্য । অন্যদিকে সম্ভ্রান্তজনের দেশাচার, যুগধর্মসম্মত সুরুচি এবং সভ্যতার চিত্র পরিবেশিত হয় যে নাটকে, তা হল 'Aristocratic'। এই দিক থেকে বিচার করলে সংস্কৃত রূপক যে বাস্তবিক-ই 'Aristocratic', তা অনস্বীকার্য এবং সংস্কৃত রূপকের এই অনন্যসাধারণ আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণরূপে পতাকাস্থানকের গুরুত্ব অপরিসীম ।

৩.প্রকরী ঃ

প্রাসঙ্গিক বৃত্তের দ্বিতীয় প্রকারটির নাম প্রকরী। নাট্যদর্পণমতে এটি-ও রূপকের উপকরণভূত এবং অমুখ্য উপাদান; পতাকার অনুরূপ ।

কেবলমাত্র প্রধান নায়কের ইতিবৃত্তের উপকারক ও স্বল্পদেশস্থায়ী কাহিনীর নাম প্রকরী । যেমন – রামচরিতমূলক নাটকগুলিতে বর্ণিত জটায়ুবৃত্তান্ত ।

'প্রকরোতি নায়কচরিতস্য উৎকর্ষং জনয়তীতি প্রকরী' – এই হল প্রকরীপদের ব্যুৎপত্তি । প্রকৃষ্টভাবে নায়ককে সাহায্যের কারণে এর এই নাম । আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে, নিজস্ব ফলের কথা চিন্তা না করে, একান্ত পরার্থপর ভাবে নায়কের সহায়তা করার কারণে এই ইতিবৃত্তের প্রকরী নামকরণ। অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে – 'প্রকর্ষেণ স্বার্থানপেক্ষয়া করোতীতি' (না.শা.ঊনবিংশ

অধ্যায়) । নাট্যদর্পণ গ্রন্থে-ও এবিষয়ে অনুরূপ অভিমত পোষণ করা হয়েছে। আচার্য সাগরনন্দীর মতে, 'প্রকরী' অর্থাৎ পুষ্পরাশির ন্যায় অবস্থিত শোভাসম্পাদনকারী বৃত্তের নাম প্রকরী – 'পুষ্পপ্রকরবন্নিহিতা যা শোভাং জনয়তি সা প্রকরী' (না.ল.র. চতুর্থ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণমতে, পতাকার ন্যায় প্রকরীর প্রয়োগ-ও রূপকে অবশ্যম্ভাবী নয়। নায়কের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন অনুসারে নাট্যকার নাটকে প্রকরীর সংযোজন করবেন; এ বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারিকায় বলা হচ্ছে – 'প্রকরী চেৎ ক্বচিদ্ ভাবী' (না.দ.১/৩২)। 'চেৎ' পদের ব্যাখ্যায় টীকায় স্পষ্ট বলা হচ্ছে – 'চেদিত্যনেন পতাকাবদনবশ্যম্ভাবিত্বমাহ'।[৫৪]

আচার্য ভরত প্রকরীর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন এভাবে –

"ফলং প্রকল্প্যতে যস্যাঃ পরার্থায়ৈব কেবলম্।

অনুবন্ধবিহীনত্বাৎ প্রকরীতি বিনির্দিশেৎ ॥" (না.শা. ১৯/২৫)

– যে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অনুবন্ধহীন অর্থাৎ বহুদূরব্যাপী নয় এবং যা পরার্থে অর্থাৎ নায়কের ফললাভে সহায়ক, তাকে বলা হয় প্রকরী। নাটকলক্ষণরত্নকোশের প্রকরীলক্ষণ নাট্যশাস্ত্রের প্রায় অবিকল অনুরূপ। বৃত্তিতে আচার্য সাগরনন্দী আরো বিশদে বলছেন, যার ফল অর্থাৎ প্রয়োজন কেবল পরের উদ্দেশ্যে প্রকল্পিত, তাই প্রকরী। 'অনুবন্ধ' অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তন, তার দ্বারা 'বিহীন' অর্থাৎ ত্যক্ত; আরম্ভের পরে-ই শেষ – এই হল এর অর্থ – " যস্যাঃ ফলং প্রয়োজনং পরার্থং পরস্য হেতোঃ প্রকল্প্যতে জায়তে। অনুবন্ধো নৈরন্তর্যেণ প্রবর্তনং, তেন বিহীনাং ত্যক্তাম্ । উৎপন্নপ্রনষ্টামিত্যর্থঃ"(না.ল.র. চতুর্থ অধ্যায়)। অন্যদিকে আচার্য শারদাতনয় প্রকরীর স্বরূপ নির্ণয়াবসরে বলেছেন –

"শোভায়ৈ বেদিকাদীনাং যথা পুষ্পাক্ষতাদয়ঃ ।

অথর্তুবর্ণনাদীনাং প্রসঙ্গে প্রকরী ভবেৎ ॥" (ভাব.প্র.সপ্তম অধিকার)

– পুষ্প, চাল ইত্যাদি যেমন যজ্ঞবেদীর শোভা বর্ধন করে, তেমনি নাটকে প্রসঙ্গতঃ উপস্থাপিত ঋতুবর্ণনাদির দ্বারা যা নাটকের মূল বৃত্তের উৎকর্ষসাধনে সহায়ক হয়, তার নাম প্রকরী ।

রূপকের মুখ্যফললাভের সহায়ক হলে-ও, পতাকার তুলনায় প্রকরীর ব্যাপ্তি অনেক কম । সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে – 'প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা' (সা.দ.৬/৬৮)। দশরূপককার অতি-সংক্ষেপে প্রকরীর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন – 'প্রকরী চ প্রদেশভাক্' (দশ.রূ.১/১৩) – স্বল্পদেশস্থ কাহিনীর নাম প্রকরী । একদেশস্থ এই প্রকরী এত-ই সংক্ষিপ্ত যে, এর মাধ্যমে কোনো চরিত্রের নিজস্ব কোনো প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ নেই। দর্পণকার বলেছেন – 'প্রকরীনায়কস্য স্যান্ন স্বকীয়ং ফলান্তরম্' (সা.দ.৬/৬৮)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রকরীনায়কের নিজস্ব ফললাভ না ঘটার বিষয়ে

দশরূপককার সম্ভবতঃ সহমত নন । কারণ, প্রকরীর উদাহরণরূপে তিনি রামায়ণের শ্রমণাদিবৃত্তান্তের উল্লেখ করেছেন, যেখানে প্রকরীনায়কের (শ্রমণাদির) রামচন্দ্রের পুণ্যসাক্ষাৎরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটেছে।

প্রসঙ্গতঃ পতাকা ও প্রকরীর পার্থক্যের বিষয়টি স্পর্শ করে যাওয়া যাক্। পতাকা ও প্রকরীর প্রধান পার্থক্য হল –

১.পতাকা বহু দূর ব্যাপ্ত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত আর প্রকরী হল স্বল্পব্যাপী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ।

২.পতাকা নাটকের অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকে এবং তা নায়কের ফললাভের অন্যতম সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে, নাটকের অত্যল্প স্থানে প্রকরীর উদ্ভব ও মুখ্যফললাভের কিঞ্চিৎ সহায়ক হয়ে উদ্ভবের প্রায় অব্যবহিত পরে-ই এর বিলুপ্তি ।

৩.পতাকানায়কের নিজস্ব ফলপ্রাপ্তি থাকে, কিন্তু প্রকরীনায়কের তাদৃশ কোনো ফললাভ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধি থাকে না।

৪. বিন্দু ঃ

কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপনে যখন নাটকের মুখ্য ঘটনার গতি ব্যাহত হয়, তখন প্রাসঙ্গিক বস্তুর অবসানে বিচ্ছিন্ন ঘটনাস্রোতটিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি সংযোগসূত্রের প্রয়োজন হয়। প্রাসঙ্গিক ঘটনার পূর্ব ও পরবর্তী মুখ্য ঘটনাংশের এই সংযোগহেতুকে-ই বলা হয় বিন্দু । বিচ্ছিন্ন ঘটনাটির পুনরারম্ভে কোনো বিশেষ বচন বা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই বিন্দুর প্রকাশ ঘটে । বিন্দুর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঘটনার পুনরায় সংযোগ ঘটে, মুখ্য ঘটনাপ্রবাহ দ্রুততর হয়, সর্বোপরি বহু ঘটনার সমাবেশ হলে-ও নাটকীয় ঐক্য ও সংহতি বর্তমান থাকায়, মুখ্য বিষয়টি বিশৃঙ্খল হতে পারে না। `Unity of Action' এর বিন্দু একটি অমোঘ উপায়।

জলে পতিত একটি তৈলবিন্দু যেমন জলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি যাবতীয় নাটকীয় ইতিবৃত্ত জুড়ে বর্তমান থাকার কারণে বিন্দু নামকরণ। নাট্যদর্পণের টীকায় তাই বলা হয়েছে – 'সর্বব্যাপিত্বাদ্ বা জলে তৈলবিন্দুরিব বিন্দুঃ'।[৫৫] নাটকলক্ষণরত্নকোশে বিন্দুর নামকরণের বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । বলা হচ্ছে – ধারা বিচ্ছিন্ন হলে-ও পটলপ্রান্তে (অর্থাৎ খড়ের চালের ছাঁচে) মধ্যে-মধ্যে পতিত জলবিন্দু যেমন জলের পতন অর্থাৎ বর্ষণকে অভিব্যঞ্জিত করে, তেমনি বিন্দু-ও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ঘটনার অবতারণার পরে-ও নাটকের মুখ্য প্রয়োজনকে সূচিত করে। বৃত্তিতে বলা হয়েছে – 'বিন্দুরিব বিচ্ছিন্নায়ামপি ধারায়াং যথা জলবিন্দুঃ পটলপর্যন্তেষ্বন্তরান্তরা লব্ধনিজনিপাতঃ পয়সাং পতনমভিব্যঞ্জয়তি, তথায়মপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ' (না.ল.র.চতুর্থ অধ্যায়)।

বিন্দুর কাজ সংযোজন । বীজ বিচ্ছিন্ন হলে-ই বিন্দু আবশ্যক ; তা প্রাসঙ্গিক বস্তুর আবির্ভাবে-ই হোক্ বা অন্য কোনো কারণে-ই হোক্ । নাট্যশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে –

"প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্ ।

যাবৎ সমাপ্তির্বন্ধস্য স বিন্দুরিতি সংজ্ঞিতঃ।" (না.শা. ১৯/২৩)

– অর্থাৎ নাটকের মুখ্য প্রয়োজন বা মূল লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন হলে-ই মুখ্য ঘটনার অবিচ্ছেদের জন্য বিন্দুর প্রয়োজন হয় এবং এই প্রয়োজন নাটকের সমাপ্তি পর্যন্ত থাকতে পারে । তাই বিন্দু কেবলমাত্র প্রতিমুখসন্ধিতে প্রযুক্ত হবে – নাট্যতত্ত্বের এই প্রচলিত নিয়মটিকে কোনোমতে-ই যুক্তিসহ বলা চলে না ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বীজ ও বিন্দু – অর্থপ্রকৃতির এই দুটি ভেদ-ই যাবতীয় নাট্যবস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে বর্তমান থাকতে পারে। পার্থক্য কেবল এইমাত্র যে, বীজের সূচনা মুখসন্ধি থেকে, বিন্দুর সূচনা মুখসন্ধির পর। এবিষয়ে অভিনবগুপ্তাচার্যের মতটি উদ্ধার করা হল – 'বীজং চ মুখসন্ধেরেব প্রবর্ত্যাত্মানমুন্মেষয়তি বিন্দুস্তদনন্তরমিতি বিশেষো2নয়োঃ, দ্বে অপি তু সমস্তে তিবৃত্তব্যাপকে' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণের টীকায় অভিনবভারতীর এই অংশটি অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে।

নাটকীয় ফলনির্বহণে বিন্দুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ফল নায়কের, তাঁর সহায়ক অর্থাৎ পতাকানায়কের অথবা উভয়ের হতে পারে। বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রগুলির কার্যকলাপের অবিচ্ছিন্নতা ও প্রধান ঘটনাস্রোতের সঙ্গে এগুলির সংযোগসাধনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিন্দুর দ্বারা-ই সাধিত হয়। বিন্দুর মাধ্যমে নায়ক প্রতিনায়কের এবং বিপরীতক্রমে প্রতিনায়ক নায়কের যাবতীয় কার্যকলাপ বিষয়ে অবহিত হতে পারেন। নাট্যদর্পণে বিন্দুর উদাহরণরূপে 'রাঘবাভ্যুদয়' ও 'তাপসবৎসরাজ' থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা আলোচনার জন্য প্রথমটি গ্রহণ করছি–

" কলত্রমপি রক্ষিতুং নিজমশক্তমাত্মান্বয় -

প্রসূতমভিবীক্ষ্য মামহহ ! জাতলজ্জাজ্বরঃ।

প্রকাশয়িতুমক্ষমঃ ক্ষণমপি স্বমাস্যং জনে

প্রয়াতি চরমোদধৌ পতিতুমেষ দেবো রবিঃ ॥"

– উল্লিখিত শ্লোকটি 'রাঘবাভ্যুদয়' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক থেকে গৃহীত শ্রীরামের খেদোক্তি। সুগ্রীবের ইতিবৃত্ত শ্রবণাবসরে নায়ক রামচন্দ্র প্রতিনায়ক রাবণের দ্বারা সীতাহরণের কথা স্মরণ করে স্বীয়

অক্ষমতার জন্য কাতর বোধ করছেন । সুগ্রীববৃত্তরূপ প্রাসঙ্গিক ঘটনার অন্তে পুনরায় মূল ঘটনাস্রোতে ফিরে আসার কারণে এটি বিন্দুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিন্দুর লক্ষণনির্ণয়াবসরে বিশ্বনাথ, ধনঞ্জয়, শারদাতনয় প্রমুখ সকলে মহর্ষি ভরতকে-ই অনুসরণ করেছেন । এঁদের সকলের মতে, অবান্তর অর্থের দ্বারা বিচ্ছেদের পর মূল ঘটনাকে অবিচ্ছিন্ন রাখার হেতুকে বিন্দু নামে অভিহিত করা হয় – 'অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্' (দশ.রূ. ১/১৭)। ভাবপ্রকাশনে 'মানজ' ও 'বিপত্তিজ' ভেদে দু'প্রকার বিন্দুর কথা বলা হয়েছে। ক্রোধের দ্বারা মানজ এবং শোকের দ্বারা বিপত্তিজ বিন্দুর উদ্ভব –

"বিন্দুর্মানবিপত্তিভ্যাং দ্বিরূপঃ কথ্যতে বুধৈঃ ।
ক্রোধেন মানজো বিন্দুঃ শোকেন স্যাদ্বিপত্তিজঃ ॥"(ভাব.প্র. সপ্তম অধিকার)

নাটকলক্ষণরত্নকোশোক্ত বিন্দুলক্ষণটি নাট্যশাস্ত্রানুসারী। তবে প্রসঙ্গক্রমে আচার্য সাগরনন্দী বিন্দুবিষয়ক আরো দুটি অভিমতের উল্লেখ করেছেন। কারো-কারো মতে, নাটকে বর্ণিত কাহিনীর মূলবিষয়টি যদি অপমান ও উৎসাহের সঙ্গে প্রতিটি অঙ্কে কীর্তিত হয়, তবে তাকে বিন্দু বলা হয়। যেমন – রাঘবাভ্যুদয়ে কেকয়ীর কথা এবং বেণীসংহারে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের বিষয়টি প্রতিটি অঙ্কে অপমানের সঙ্গে কীর্তিত । এইভাবে উৎসাহের সঙ্গে নাগানন্দের প্রতিটি অঙ্কে জীমূতবাহনের নামকীর্তন-ও বিন্দুর উদাহরণ ।

বিন্দুসম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটিতে বলা হচ্ছে, রাবণবধপ্রসঙ্গে মারীচ-খর প্রভৃতি ও তাদের সৈন্যবর্গ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ – এদের ধারাবাহিক নিধন অথবা কৌরবদের বিনাশ প্রসঙ্গে দ্রোণাদির ধারাবাহিক নিধন – এগুলি-ও বিন্দুরূপে পরিগণিত ।

উল্লেখ্য, এই দুটি মতের কোনোটির-ই প্রবক্তা আচার্যের নাম সাগরনন্দী উল্লেখ করেননি । অতএব, এই মতগুলির উৎস কোন্ গ্রন্থ , তা জানা যায় না।

৫. কার্য ঃ

নাটকমাত্রের-ই একটি মুখ্য ফল বা উদ্দেশ্য থাকে, এই উদ্দেশ্য-ই হল নাটকের কার্য। নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, প্রধান নায়কের বিবিধ কার্যাবলীর দ্বারা (ক্ষেত্রবিশেষে পতাকানায়কের ও প্রকরীনায়কের কার্যের দ্বারা-ও বটে) উপ্ত বীজটি যখন নাটকের মুখ্য ফলে পরিণত হয়, নাটকের সেই অন্তিম অংশকে কার্য নামক অর্থপ্রকৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ক্ষুদ্রাকারে নিহিত নাটকীয় বীজটি যখন পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হয়ে ফলনির্বহণে উপস্থিত হয়, তখন তাকে কার্য বলা হয়। টীকায় বলা হচ্ছে, দ্রব্য-ক্রিয়া-গুণাদি সর্বপ্রকার বস্তু এই কার্যসাধনের সহায়ক হয়। প্রভূত উৎসাহ, শক্তি ও সুগুপ্ত

নীতির দ্বারা প্রধান নায়ক এই আকাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করেন । তাই 'কার্য' পদের মধ্যে জনপদ-কোশ-দুর্গাদি নানাবিধ বিষয়, সামাদি চতুর্বিধ উপায় ইত্যাদি সমস্ত কিছুর অন্তর্ভাব করা যেতে পারে। অর্থাৎ নায়কের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ-ই হল কার্যের প্রয়োজন। উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণের টীকায় বিধৃত এই আলোচনাটি সম্পূর্ণতঃ অভিনবভারতী-অনুসারী। প্রাসঙ্গিকবোধে দ্বিতীয়টির অংশবিশেষ উদ্ধার করা হল – "দ্রব্যক্রিয়াগুণপ্রভৃতিঃ সর্বো2র্থঃ (যস্য) সহকারী (তৎ) কার্যমিত্যুচ্যতে। ... তেন জনপদকোশদুর্গাদিকব্যাপারবৈচিত্র্যং সামাদ্যুপায়বর্গ ইত্যেতৎ সর্বং কার্যে2ন্তর্ভবতি" (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়) ।

নাট্যশাস্ত্রোদ্ধৃত কার্যলক্ষণটি হল –

" যদাধিকারিকং বস্তু সম্যক্ প্রাজ্ঞৈঃ প্রযুজ্যতে ।

তদর্থো যঃ সমারম্ভস্তৎ কার্যং পরিকীর্তিতম্ ॥" (না.শা. ১৯/২৩)

– আধিকারিক বস্তু অর্থাৎ প্রধান নায়কের ইতিবৃত্ত । এই প্রধান নায়কের যা মুখ্য প্রয়োজন, যাকে প্রাপ্তির জন্য যাবতীয় নাটকীয় উদ্যম ও প্রচেষ্টার বিস্তার, তার-ই নির্বহণের নাম কার্য ।

দর্পণকারের মতে, যে সাধ্যবস্তু অপেক্ষিত, যার উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যাপারের প্রবৃত্তি এবং যা সিদ্ধ করার জন্য যাবতীয় আয়োজন,তাকে-ই কার্য বলা হয় –

"অপেক্ষিতং তু যৎসাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ ।

সমাপনং তু যৎসিদ্ধ্যৈ তৎ কার্যমিতি সম্মতম্ ॥"(সা.দ. ৬/৬৯)

নাটকলক্ষণরত্নকোশে প্রায় অবিকলরূপে কার্যের লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। আচার্য রূপগোস্বামী-ও বলেছেন – 'বস্তুনস্তু সমস্তস্য সাধ্যং কার্যমিতি স্মৃতম্' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ৫৩) ।

দশরূপকে বলা হয়েছে – 'কার্যং ত্রিবর্গস্তচ্ছুদ্ধমেকানেকানুবন্ধি চ' (দশ.রূ.১/১৬) – কার্য বা নাটকীয় ফল হবে ধর্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গসমন্বিত। এই ফল শুদ্ধ অর্থাৎ একানুবন্ধী এবং অনেকানুবন্ধী ভেদে দ্বিবিধ। যখন এই কার্য ধর্ম-অর্থ-কামের যেকোনো একটির সাধক, তখন তা শুদ্ধ (বা একানুবন্ধী)। যখন এই কার্য ধর্মার্থকামের একাধিকের সাধক, তখন তা অনেকানুবন্ধী । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভোজদেবের শৃঙ্গারপ্রকাশে-ও কার্যকে ত্রিবর্গের সাধনরূপে উল্লেখ করা হয়েছে – 'ধর্মার্থকামানামন্যতমং হি পুরুষার্থঃ কার্যমিতি আমনন্তি' (শৃ.প্র.দ্বাদশপ্রকাশ)।

পঞ্চবিধ অর্থপ্রকৃতিবিষয়ক সোদাহরণ ব্যাখ্যার পর রূপকে এদের কোন্‌টির কি পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা, সেবিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। রূপকের মুখ্যফলপ্রাপ্তিতে এদের কোন্‌টির কতখানি অবদান, সেই ভিত্তিতে এই প্রয়োজননির্ধারণ ।

এই পাঁচ প্রকার অর্থপ্রকৃতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল বীজ ও বিন্দু । কারণ, রূপকে এই দুটি উপাদান সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। নাটকের প্রারম্ভে উপ্ত ফলের প্রধান হেতুস্বরূপ বীজ, সমগ্র নাটকব্যাপী বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অন্তিমে ফলে পরিণতি পায়। অন্যদিকে , মুখ্যবস্তুর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় সংযোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনে নির্বহণসন্ধি ব্যতীত নাটকের যেকোনো অংশে বিন্দুর প্রয়োগ করা হয়। অতএব রূপকে এই দুয়ের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত।

অন্যদিকে পতাকা, প্রকরী ও কার্যের গুরুত্ব রূপকে অপেক্ষাকৃত অল্প। পতাকা ও প্রকরীর বিষয়ে আগে-ই বলা হয়েছে যে, নাটকের প্রধান নায়কের শক্তির আধিক্য বা ন্যূনতা অনুসারে এই দুটির প্রয়োগ হবে না অথবা হবে। অর্থাৎ নাটকে পতাকা ও প্রকরী প্রয়োগের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

কার্যের স্বল্প গুরুত্বের বিষয়টি একটু চিন্তার অবকাশ রাখে। প্রশ্ন উঠতে পারে, নাটকের যা প্রধান অপেক্ষিত ফল, যার জন্য নাটকীয় পাত্র-পাত্রীদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও যার প্রাপ্তিতে নাটকের সিদ্ধি, সেই ফলনির্বহণ বিবৃত হয় কার্য নামক অর্থপ্রকৃতিদ্বারে। তাহলে নাট্যদর্পণকাররা এটিকে গৌণ অর্থপ্রকৃতিগুলির অর্ন্তগত করলেন কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে, বীজাদি অর্থপ্রকৃতি, আরম্ভাদি অবস্থা, মুখাদি সন্ধি, নাটকীয় বস্তুর বিন্যাস ও গতি – এই সবকিছুর ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল এই কার্য। নাট্যকার কার্যের প্রয়োগ করেন না, কার্যের নিষ্পাদন হয় । বীজের প্রয়োগ বা ক্ষেত্রবিশেষ পতাকার প্রয়োগ বিষয়ে নাট্যকারকে চিন্তাপূর্বক উপযুক্ত পরিস্থিতি প্রস্তুত করতে হয়; কার্যে তার প্রয়োজন হয় না। কার্যের বাহ্য অবয়ব নির্মাণের জন্য নাট্যকার প্রয়াস নেন, কিন্তু কার্যের আন্তরিক চরিত্র নাট্যকারের সৃষ্টিনিরপেক্ষ। তাই সম্ভবতঃ কার্যের এই স্বাভাবিক ও অনায়াস ধর্মের জন্য-ই নাট্যদর্পণে এটিকে স্বল্প গুরুত্বের অর্থপ্রকৃতিরূপে গণ্য করা হয়েছে।

শূদ্রকবিরচিত 'মৃচ্ছকটিকম্'-এ আর্যক প্রধান নায়ক চারুদত্তের সহায়ক এবং কাহিনীর অন্তে তাঁর নিজের-ও রাজ্যলাভরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটছে; অতএব তিনি হলেন পতাকানায়ক । এই রূপকে এই পতাকাবৃত্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার বীরনাগবিরচিত 'কুন্দমালা' রূপকে প্রকরী বৃত্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে বাল্মীকি কর্তৃক সীতা ও লবকুশের রক্ষণাবেক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। আবার, রামচরিতমূলক রূপকগুলিতে সুগ্রীব ও বিভীষণের পতাকাবৃত্ত এবং জটায়ুর প্রকরীবৃত্ত – উভয়ে-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, পতাকা ও প্রকরীহীন রূপকে কার্য অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বের অবকাশ রাখে।

পতাকাবৃত্ত প্রধান হলে অনেক ক্ষেত্রে এটি সন্ধিযুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে এই সন্ধিগুলিকে 'অনুসন্ধি' বলা হয়। অনুসন্ধিগুলির কাজ হল প্রধান সন্ধিগুলির কাজে সহায়তা করা। রূপকে

অনুসন্ধিগুলির ভূমিকা গৌণ। টীকায় বলা হয়েছে – 'যদ্যপি পতাকায়াঃ প্রধানত্বে মুখ্যেতিবৃত্তবৎ সন্ধয়ঃ স্যুস্তথাপি তে2নুসন্ধয়ো মুখ্যসন্ধ্যুপযোগিত্বেন গৌণত্বাৎ'।[৫৬] তা না হলে একদিকে যেমন পতাকা নাটকের মুখ্যবৃত্তের সঙ্গে সমগুরুত্বে আসীন হবে, তেমনি অন্যদিকে নাটকের সন্ধিসংখ্যা-ও অনভিপ্রেত ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

পতাকার অনুসন্ধি বিষয়ে নাট্যদর্পণের কারিকায় বলা হচ্ছে – 'পতাকায়াঃ প্রধানত্বে2নুসন্ধিঃ সূচনাদিভিঃ' (না.দ.১/৩৩)। 'সূচনাদিঃ' পদের ব্যাখ্যায় টীকায় বলা হচ্ছে – 'আদিশব্দাৎ ক্বচিদূহ্যন্তে , লেশতো নিবধ্যন্তে চ, ন মুখসন্ধিভ্যঃ পৃথগ্গণ্যতে'[৫৭] – অর্থাৎ মুখসন্ধ্যাদির মত সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে অনুসন্ধিগুলির বর্ণনা হবে না । কোথাও এগুলির কেবল সূচনা হবে; কোথাও 'উহাপোহ' অর্থাৎ তর্ক দ্বারা এদের অনুমান করে নিতে হবে; কোথাও বা এদের বর্ণনা হবে, তবে অতি-সংক্ষেপে, অল্প পরিসরে।

যেকোনো রূপক যেমন অন্ততঃ মুখ ও নির্বহণ সন্ধিযুক্ত হয়, তেমনি প্রধান পতাকাবৃত্তে-ও অন্ততঃ মুখ ও নির্বহণ অনুসন্ধি থাকবে। প্রয়োজনে প্রতিমুখাদি অনুসন্ধি-ও প্রয়োগ করা যেতে পারে; তবে তা নাট্যকারের ইচ্ছাধীন ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পতাকাবৃত্তের অনুসন্ধিবিষয়ক এই আলোচনাটি নাট্যদর্পণকারদের অভিনব আবিষ্কার নয়। অভিনবগুপ্তের মতে, আচার্য লোল্লট এই মতের প্রবক্তা। এই তথ্যটির প্রমাণস্বরূপ অভিনবভারতীর অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে – 'তথা লোল্লটাদ্যাস্তু মন্যন্তে পরার্থে সাধয়িতব্যে পতাকানায়কস্যেতিবৃত্তভাগা অনুসন্ধয়ঃ ...' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। নাট্যশাস্ত্রে-ও এবিষয়টির উল্লেখ রয়েছে –

"একো2নেকো2পি বা সন্ধিঃ পতাকায়াং তু যো ভবেৎ ।
প্রধানার্থানুযায়িত্বাদনুসন্ধিঃ প্রকীর্ত্যতে ॥" (না.শা. ১৯/২৮)

অবস্থা ঃ

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ মানবজীবন। এর-ই মধ্যে ক্রমাগত সংগ্রাম করে মানুষ লাভ করে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য। কাব্য বা নাটকের ইতিবৃত্ত মানবজীবনের-ই প্রতিবিম্ব। তাই বাস্তবজীবনের মত রূপকের নায়ককে-ও তার ঈপ্সিত ফললাভের জন্য নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। নায়কের কায়মনোবাক্যগত এই প্রচেষ্টা বা কার্যের পাঁচটি স্তর বা 'stage'-কে বলা হয় কার্যের অবস্থা । নাটকের কার্যাবস্থা নাটককে গতিশীল

করে তোলে, ঈপ্সিত ফললাভকে ত্বরান্বিত করে। এই অবস্থা সংখ্যায় পাঁচটি – আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি এবং ফলাগম । নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে –

" প্রারম্ভশ্চ প্রযত্নশ্চ তথা প্রাপ্তেশ্চ সংভবঃ ।

নিয়তা চ ফলপ্রাপ্তি ঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ ॥" (না.শা. ১৯/৮)

নাট্যদর্পণোক্ত কারিকায় এই অবস্থাগুলিকে 'ধ্রুব' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য রূপে গণ্য করা হয়েছে। টীকায় বলা হচ্ছে – 'ধ্রুবমিতি প্রধানে বৃত্তে পঞ্চানাম্ অবশ্যম্ভাবমাহ'।[৫৮] অভিনবগুপ্তাচার্য-ও ভরতোক্ত কারিকায় ব্যবহৃত একাধিক 'চ' শব্দের কারণব্যাখ্যাবসরে এই অবস্থাগুলির অবশ্যম্ভাবিত্বের উল্লেখ করেছেন – 'চকারৈস্তথাশব্দেন চাবশ্যম্ভাবিক্রমত্বমাসামুচ্যতে' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। তবে পঞ্চাবস্থার অবশ্যপ্রয়োগবিষয়ক এই বিধি মূলতঃ নাটক এবং নাটকলক্ষণানুসারী প্রকরণ, নাটিকা ও প্রকরণীর জন্য প্রযোজ্য; ব্যায়োগাদি অন্যান্য রূপকে প্রয়োজনবোধে অবস্থাসমূহের সংখ্যা ন্যূন হলে-ও তা দোষাবহ নয়।

আরম্ভাদি পঞ্চবিধ অবস্থার যে ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, অবিকল সেই ক্রমে রূপকে এদের প্রয়োগ করতে হবে। ভরতোক্ত কারিকটিতে প্রযুক্ত 'পঞ্চমঃ' পদের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত-ও বলেছেন – 'পঞ্চম ইত্যনেন ক্রমো বিবক্ষিত ইতি দর্শয়তি' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। মানুষ সর্বপ্রথম বিশেষ কোনো ফলপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, অনন্তর সেটি লাভ করার জন্য তৎপর হয়, ক্রমশঃ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তারপর একসময় যাবতীয় বিঘ্নের অপসারণে ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত রূপে প্রতিভাত হয় এবং সবশেষে তার আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ বাস্তবিকরূপে সম্পন্ন হয়। নাট্যদর্পণের টীকায় বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে – 'প্রেক্ষাপূর্বকারিণাং হি প্রথমমারম্ভস্ততঃ প্রযত্নস্ততঃ সম্ভাবনা ততো নিশ্চয়স্ততঃ ফলপ্রাপ্তিরিত্যয়মেব ক্রম ইতি'।[৫৯]যেমন বস্তুজগতে, তেমনি রূপকের ক্ষেত্রে-ও ঘটনার গতিপ্রকৃতি ঠিক এই ক্রমে-ই প্রবাহিত হয়।

পঞ্চবিধ অবস্থায় বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে যেমন নায়ক, তার সহায়ক অর্থাৎ পতাকানায়ক, প্রতিনায়ক প্রমুখের কার্যকলাপের বিবরণ থাকবে, তেমনি সমান প্রাধান্যে থাকবে দৈবের আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যের বিবরণ। দৈববশতঃ কোনো কর্মের আরম্ভ হয়ে গেলে-ও, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কিন্তু মানুষের-ই উপর । ভাগ্য ও পুরুষকার – এই দুয়ের মেলবন্ধন-ই যাবতীয় ফলাফলের উৎস। নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে– 'দৈবমানুষব্যাপারয়োঃ পরস্পরাপেক্ষয়ৈব শুভাশুভফলসাধকত্বাৎ'।[৬০]দৈব দ্বারা প্রাথমিক ভাবে ক্রিয়ার সূচনা হলে-ও, পুরুষার্থ ব্যতীত কেবল দৈবনির্ভর মানুষের ফলপ্রাপ্তি কখনো-ই সম্ভব হয় না – 'দৈবাদপ্যর্থং পশ্যন্তঃ পুণ্যমুপচেতুং মানুষে কর্মনি প্রবর্তেরন্'।[৬১] উল্লেখ্য, দৈব ও পুরুষকারের এই সহযোগিতার বিষয়টি সম্ভবতঃ অভিনবভারতী

থেকে গৃহীত। অভিনবভারতীর অংশবিশেষ প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধার করা হল – 'দৈবসাধ্যমপি চ সমুদ্রদত্তাভিমতপ্রাপ্ত্যাদিকং পুণ্যোপার্জনং প্রযত্নবহুমানসিদ্ধয়ে দৈবসাহায্যস্য পুরুষকারস্য ফলবর্তিতা তদ্যুৎপত্তিলাভায় প্রদর্শ্যত ইতি' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণের টীকায় একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে । অনেক সময় দেখা যায়, আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের জন্য নায়কের বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; আবার এমন-ও দেখা যায়, নায়ক ফলপ্রাপ্তির জন্য খুব একটা চেষ্টা করেন না, কেবল দৈবের আনুকূল্য দ্বারা তাঁর বাঞ্ছিত ইষ্টপ্রাপ্তি ঘটে। এর উদাহরণরূপে আমরা 'মৃচ্ছকটিকম্' রূপক ও তার নায়ক চারুদত্তের কথা উল্লেখ করতে পারি, যেখানে নায়কের বিশেষ কোনো কর্মপ্রচেষ্টা ব্যতিরেকে, কেবল ভাগ্যের আনুকূল্য দ্বারা-ই চারুদত্তের বসন্তসেনালাভ ও রাজ্যলাভরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটছে। দৈবের পরিবর্তে পুরুষকারে বিশ্বাসী নাস্তিকদের মনে দৈবের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য-ই এজাতীয় রূপকের রচনা । কিন্তু প্রশ্ন হল, এইসকল ক্ষেত্রে দৈব ও পুরুষকারের সমপ্রাধান্য না থাকার কারণে, এইসকল রূপকে অবস্থাসমূহের প্রয়োগ কি অনুচিত ? উত্তরে বলা হচ্ছে, না, অনুচিত নয়। কারণ, যত-ই দৈবপ্রাধান্য থাক্ না কেন, রূপকের পরিণতিতে একমাত্র ফলভোক্তা হলেন নায়ক এবং নায়কের এই ফলপ্রাপ্তি আরম্ভাদি পঞ্চবিধ অবস্থা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। টীকায় একটি উদাহরণদ্বারে বিষয়টি প্রাঞ্জল করা হয়েছে। যেমন বিধিমত উপ্ত না হলে-ও, বৃষ্টিসিক্ত ভূমিতে পতিতমাত্র বীজ অঙ্কুরোদ্গমাদি স্তরের মাধ্যমে পরিণামে পত্রপুষ্পে শোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি পুরুষার্থ ব্যতীত কেবল দৈবানুকূল্যের দ্বারা ফলনির্বহণ ঘটলে, সেইক্ষেত্রে-ও পঞ্চবিধ অবস্থার প্রয়োগ অবশ্যকরণীয় ।

নাট্যশাস্ত্রে অবস্থার লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে এইভাবে –

"সংসাধ্যে ফলযাগে তু ব্যাপারঃ কারণস্য যঃ ।
তস্যানুপূর্ব্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোক্তৃভিঃ ॥ "(না.শা. ১৯/৭)

– নাটকের ফললাভে উৎসাহী নায়কাদির কর্মপ্রচেষ্টাসমূহকে অবস্থা বলা হয়। আনুপূর্বিক অর্থাৎ যথাক্রমে এই অবস্থার পঞ্চবিধত্ব সম্পর্কে প্রযোক্তা অর্থাৎ নাট্যকারের যথাযথ জ্ঞান প্রয়োজন। দশরূপক, ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি সমস্ত গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে অবস্থাসমূহের লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে।আচার্য সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে ভরতোক্ত লক্ষণগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে গদ্যাকারে নিবদ্ধ করেছেন।

নাট্যতত্ত্বের কোনো গ্রন্থে পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি এবং পঞ্চ অবস্থার প্রভেদ নির্ণয় করা হয়নি। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, অর্থপ্রকৃতি হল মূলতঃ নাট্যবস্তুর উপাদান কারণ এবং অবস্থা হল নায়কের মানসিক বৃত্তির সঙ্গে সম্বদ্ধ ঘটনাবলীর স্তরবিশেষ । বীজাদি অর্থপ্রকৃতি সমূহ হল নাটকীয়

কথাবস্তুর ঔপাদানিক বিভাজন বা ‘Physical division’, আরম্ভাদি অবস্থাসমূহ হল নাট্যবস্তুর মনোবৈজ্ঞানিক বিভাজন বা ‘Psychological division’ ।

এবার পঞ্চবিধ অবস্থার ক্রমিক আলোচনা করা হচ্ছে–

১.আরম্ভ ঃ

নাটকীয় ঘটনাটির যেখানে উদ্ভব হয়, সেখানে-ই ‘আরম্ভ’। নাটকীয় গতির এটি-ই প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় নাটকীয় বীজ উপ্ত হয় এবং বিশেষ ফললাভের জন্য নায়কের ঔৎসুক্য বা অভিলাষ প্রকাশিত হয়। সুতরাং মুখ্য ফললাভের জন্য নাট্যবস্তুর উদ্ভব-ই হল আরম্ভ।

নাট্যদর্পণোক্ত আরম্ভলক্ষণটি হল – ‘ফলায়ৌৎসুক্যমারম্ভঃ’ (না.দ. ১/৩৫)। নাটকমাত্রের-ই একটি মুখ্য ফল বা মুখ্য প্রয়োজন থাকে, যাকে প্রাপ্ত করার জন্য নায়কের যাবতীয় প্রচেষ্টার বিস্তার । এই মুখ্যফললাভের প্রতি নায়কের ঔৎসুক্য হল আরম্ভ নামক কার্যাবস্থার অন্যতম উপাদান। ‘ঔৎসুক্য’ শব্দের অর্থ হল ঈপ্সিত বস্তুর প্রতি আগ্রহ, তজ্জনিত স্মরণ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি। অভিনবভারতীতে-ও বলা হয়েছে – ‘যদৌৎসুক্যমাত্রং তদ্বিষয়স্মরণোৎকণ্ঠানুরূপম্’ (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। তবে কেবলমাত্র ঔৎসুক্যমাত্রে-ই এর নিবৃত্তি নয়। তার সঙ্গে- সঙ্গে ঈপ্সিত ফললাভের উদ্দেশ্যে কিছু প্রাথমিক ক্রিয়াপ্রচেষ্টা-ও আরম্ভ নামক অবস্থার অন্তর্গত । অতএব ঔৎসুক্য ও অধ্যবসায় – এই দুটি হল আরম্ভের প্রধান উপাদান। ফলের প্রতি আগ্রহ এবং সেই আগ্রহকে ফলে পরিণত করার চেষ্টা – এই দুটি মিলে আরম্ভের সৃষ্টি । নাট্যদর্পণের টীকায় তাই বলা হয়েছে –
‘উপায়বিষয়মৌৎসুক্যমৌৎসুক্যানুগুণো ব্যাপারশ্চারম্ভ ইত্যর্থঃ’।[৬২]

নাট্যদর্পণকাররা ‘বেণীসংহার’ ও ‘নলবিলাস’ থেকে আরম্ভের দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা প্রথমটির আলোচনা করছি –

সহদেবং প্রতি ভীমঃ – “অথ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কেন পণেন সুযোধনং প্রতি সন্ধিং কর্তুং প্রহিতঃ ?
সহদেবঃ – আর্য ! ননু পঞ্চভির্গ্রামৈঃ ইতি।”

– সমস্ত রাজ্যের পরিবর্তে মাত্র পাঁচটি গ্রাম গ্রহণে অস্বীকৃত, ক্রুদ্ধ ভীমসেন। যুধিষ্ঠির তথা পঞ্চপাণ্ডবের সমগ্ররাজ্যলাভরূপ ফল তাঁর ঈপ্সিত । কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তির জন্য ঔৎসুক্য এবং পরবর্তীকালে তদনুসারী কর্মপ্রচেষ্টা ও তৎপরতার কারণে এটি আরম্ভ নামক অবস্থার উত্তম উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে আরম্ভ নামক অবস্থার লক্ষণটি নিম্নরূপ –

“ঔৎসুক্যমাত্রবন্ধস্তু যদ্বীজস্য নিবধ্যতে ।
মহতঃ ফলযোগস্য স ফলারম্ভ ইষ্যতে ॥” (না.শা. ১৯/৯)

– ফলোদয়রূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বীজ সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য জন্মায়, তাকে আরম্ভ বলা হয়। সাগরনন্দী নাট্যশাস্ত্রোক্ত এই সংজ্ঞাটিকে-ই সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত করেছেন – 'তত্র বীজৌৎসুক্যমাত্রবন্ধ আরম্ভঃ' (না.ল.র. দ্বিতীয় অধ্যায়)। ভাবপ্রকাশন, দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে-ও নাট্যশাস্ত্রের-ই অনুসরণে আরম্ভলক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

২. প্রযত্ন ঃ

প্রযত্ন হল ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তিসংক্রান্ত ব্যাপারবিশেষ। অভীষ্ট ফলোদয়ের পথে বাধা বা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে সেই ফললাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। নাটকীয় গতির এই দ্বিতীয় অবস্থাকে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা প্রযত্ন নামে অভিহিত করেছেন ।

নাট্যদর্পণে-ও নাটকীয় ফললাভের জন্য দ্রুত প্রচেষ্টাকে প্রযত্ন বলা হয়েছে – 'প্রযত্নো ব্যাপৃতৌ ত্বরা' (না.দ. ১/৩৫)। টীকায় আরো বলা হচ্ছে, কোনো নাটকীয় চরিত্র যখন এরূপ চিন্তা করে যে, বিশেষ এই উপায়টি ব্যতীত তার ঈপ্সিত ফললাভের অন্য কোনো উপায় নেই, তখন সেই উপায়ের প্রতি তার যে অত্যধিক আগ্রহাতিশয্য পরিলক্ষিত হয়, তার নাম প্রযত্ন – 'মুখ্যফলোপায়ব্যাপারণে ত্বরা অনেনোপায়েন বিনা ফলং ন ভবতীতি নিশ্চয়েন পরমৌৎসুক্যং প্রকর্ষেণ যত্নঃ প্রযত্নঃ'।[৬৩]ফলের প্রতি ঔৎসুক্যমাত্র হল আরম্ভ, অত্যধিক ঔৎসুক্য হল প্রযত্ন – এই হল আরম্ভ ও প্রযত্নের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ।

প্রযত্নের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে 'রত্নাবলী' এবং 'নলবিলাস' থেকে । আমরা প্রথমটির আলোচনা করছি –

রত্নাবলী – 'তহা বি নত্থি অণ্ণো দংসণোবাউ ত্তি জহা তহা আলিহিয় জধাসমীহিদং করইস্‌সং ইতি ।'

– 'রত্নাবলী' নাটিকার নায়িকা সাগরিকার অভীষ্ট হল বৎসরাজ উদয়নকে লাভ করা। কিন্তু তাঁকে লাভ করা তো দূরস্থান, তাঁর দর্শন-ও দুর্লভ। রাজাকে দেখার অন্য কোনো উপায় নেই দেখে, তাঁর ছবি এঁকে সেই প্রতিকৃতি দেখার ইচ্ছা জাগল সাগরিকার মনে। অনন্যোপায়া সাগরিকার রাজার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এই প্রচেষ্টা প্রযত্ন নামক অবস্থার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে প্রযত্নের লক্ষণ এভাবে নির্দেশ করা হয়েছে–

"অপশ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং ব্যাপারো যঃ ফলং প্রতি।
পরং চৌৎসুক্যগমনং স প্রযত্নঃ প্রকীর্তিতঃ ॥" (না.শা. ১৯/১০)

– ফলপ্রাপ্তির অদর্শনে ফললাভের উদ্দেশ্যে নায়কের চেষ্টা ও ঔৎসুক্যজনিত কার্যের নাম প্রযত্ন। রূপগোস্বামী-ও নাট্যশাস্ত্রানুসরণে প্রযত্নলক্ষণ নির্ণয় করেছেন – 'যত্নস্তু তৎফলপ্রাপ্তাবৌৎসুক্যেন তু

বর্তনম্' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ৬৩)। সাগরনন্দী প্রযত্নলক্ষণ নির্ণয় করেছেন এইভাবে –'ফলযোগমপশ্যত এব তত্র ব্যাপারঃ প্রযত্নঃ' (না.ল.র. দ্বিতীয় অধ্যায়) । প্রযত্নের দশরূপকধৃত লক্ষণটি হল – 'প্রযত্নস্তু তদবাপ্তৌ ব্যাপারো2তিত্বরান্বিতঃ' (দশ.রূ.১/২০) – ফলের অপ্রাপ্তিতে ফললাভের জন্য ত্বরান্বিত ব্যাপার প্রযত্ন নামে অভিহিত। দর্পণকারবিহিত প্রযত্নসংজ্ঞাটি দশরূপকোক্ত সংজ্ঞার-ই অনুরূপ।

৩. প্রাপ্ত্যাশা ঃ

সংঘাত-ই হল নাটকীয় ক্রিয়ার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষের চরম রূপ দৃষ্ট হয় তৃতীয় প্রকার অবস্থায়। পুনঃ পুনঃ উপায় ও অপায়, আশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে দিয়ে ঘটনাপ্রবাহ অগ্রসর হতে থাকে এবং অবশেষে ফলপ্রাপ্তির অনুকূল অবস্থা ও সম্ভাবনা দেখা দেয় । এইভাবে রূপকের যে অংশে প্রতিবন্ধকতার দূরীকরণের দ্বারা ফললাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাকে প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থারূপে অভিহিত করা হয়। নাট্যদর্পণোক্ত প্রাপ্ত্যাশালক্ষণে তাই বলা হচ্ছে – 'ফলসম্ভাবনা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত্যাশা হেতুমাগতঃ' (না.দ.১/৩৫)। অবিরাম প্রচেষ্টার পর রূপকের এই অবস্থায় নায়কের ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নায়ক দ্বিগুণিত উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে অবশিষ্ট বাধাবিঘ্ন দূর করে ফলনির্বাহের প্রতি তৎপর হন।

প্রাপ্ত্যাশার উদাহরণ গৃহীত হয়েছে 'বেণীসংহার' ও 'নলবিলাস' থেকে। আমরা প্রথমটির আলোচনা করছি–

ভীমঃ –''কৃষ্টা যেন শিরোরুহেষু পশুনা পাঞ্চালরাজাত্মজা
যেনাস্যাঃ পরিধানমপ্যপহৃতং রাজ্ঞাং গুরূণাং পুরঃ।
যস্যোরঃস্থলশোণিতাসবমহং পাতুং প্রতিজ্ঞাতবান্
সো2য়ং মদ্ভুজপঞ্জরান্তরগতঃ সংরক্ষ্যতাং কৌরবাঃ ॥''

– উদ্ধৃত অংশে দুঃশাসননিধনরূপ ঘটনার দ্বারা দুর্যোধনাদি অবশিষ্ট কৌরবদের আশুনিধনের সূচনা এবং তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভরূপ মুখ্যফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনার কারণে এটি প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থার যথাযথ উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত্যাশাকে বলা হয়েছে 'প্রাপ্তিসম্ভব' । তত্রোক্ত লক্ষণটি হল –

"ঈষৎপ্রাপ্তির্যদা কাচিৎ ফলস্য পরিকল্প্যতে ।
ভাবমাত্রেণ তং প্রাহুর্বিধিজ্ঞঃ প্রাপ্তিসম্ভবম্ ॥'' (না.শা.১৯/১১)

–'ভাব' অর্থাৎ সম্ভাবনামাত্রের দ্বারা বাঞ্ছিত ফলের প্রাপ্তি ঈষৎভাবে সূচিত হলে,পণ্ডিতরা তাকে-ই প্রাপ্তিসম্ভব বলেন। এই কারিকার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্যের বক্তব্য – 'উপায়মাত্রেণ লব্ধেন যদা কদাচিদ্ বিশিষ্টফলপ্রাপ্তিরীষত্ কল্প্যতে সংভাবনামাত্রেণ স্থাপ্যতে, ন তু নিশ্চীয়তে তদা প্রাপ্তেঃ সম্ভবঃ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণটিকে সমাসতঃ বলেছেন সাগরনন্দী – 'ভাবমাত্রেণ ফলস্য যা প্রাপ্তিঃ সা প্রাপ্তিসম্ভবঃ' (না.ল.র. দ্বিতীয় অধ্যায়)– মনে-মনে ফলের প্রাপ্তিকে প্রাপ্তিসম্ভব বলা হয়। দশরূপকধৃত প্রাপ্ত্যাশালক্ষণটি হল – 'উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ' (দশ.রূ.১/২১)– উপায় এবং অপায়ের শঙ্কার দ্বারা ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে প্রাপ্ত্যাশা বলা হয়। দর্পণকার স্বীয় গ্রন্থে ধনঞ্জয়োক্ত লক্ষণটির-ই পুনরুক্তি করেছেন। রূপগোস্বামী-ও ফললাভের সম্ভাবনাকে প্রাপ্ত্যাশা নামে অভিহিত করেছেন – 'প্রাপ্ত্যাশা তু নিজার্থস্য সিদ্ধিসম্ভাবনা মতা' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ৬৫)।

৪.নিয়তাপ্তি ঃ

নাট্যাবস্থার চতুর্থটির নাম নিয়তাপ্তি। নাট্যদর্পণে এর লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে এইভাবে – 'নিয়তাপ্তিরুপায়ানাং সাকল্যাৎ কার্যনির্ণয়ঃ' (না.দ.১/৩৬)। প্রাপ্ত্যাশা নামক তৃতীয় অবস্থায় ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলে-ও পুনরায় নানা বিঘ্ন ও সঙ্কট উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বে-ও, নায়কের নিজের এবং অন্যান্য সহকারীদের সহায়তায় প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত হয় এবং বিঘ্নসমূহ অপসারিত হয়। এভাবে দৃশ্যকাব্যে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ও আনুকূল্যে আগত বিঘ্নসমূহের অপসারণ এবং ফলনির্বহণে যে নিশ্চিন্ততার অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাকে নিয়তাপ্তি নামক অবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। অভিনবভারতীতে-ও নিয়তাপ্তির বৈশিষ্ট্য এইভাবে নির্ণীত হয়েছে – 'ফলস্য প্রকর্ষেণাপ্তির্যতঃ সহকারিবর্গঃ প্রতিবন্ধকবিধ্বংসনসহিততা চ' (না. শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে 'বেণীসংহার' এবং 'রাঘবাভ্যুদয়' থেকে নিয়তাপ্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে । বেণীসংহারের উদাহরণটি নিম্নরূপ–

"কর্তা দ্যূতচ্ছলানাং জতুময়শরণোদ্দীপনঃ সো2ভিমানী
রাজা দুঃশাসনাদের্গুরুরনুজশতস্যাঙ্গরাজস্য মিত্রম্ ।
কৃষ্ণাকেশোত্তরীয়ব্যপনয়নপটুঃ পাণ্ডবা যস্য দাসাঃ
ক্বাস্তে দুর্যোধনো2সৌ ন রুষা দ্রষ্টুমভ্যাগতৌ স্বঃ ॥"

– উল্লিখিত অংশে ভীম এবং অর্জুন দুর্যোধননিধনমানসে তাঁর অন্বেষণ করছেন। দুর্যোধনের বিনাশের মাধ্যমে পাণ্ডবদের যাবতীয় বাধাবিঘ্নের সমাপ্তি ঘটায় এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভরূপ মুখ্যফলের প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হওয়ায় এটি নিয়তাপ্তির উত্তম উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে নিয়তাপ্তির লক্ষণটি নিম্নরূপ –

" নিয়তাং চ ফলপ্রাপ্তিং যদা ভাবেন পশ্যতি ।

নিয়তাং তাং ফলপ্রাপ্তিং সগুণাং পরিচক্ষতে ॥" (না.শা. ১৯/১২)

– যখন সম্ভাবনার পর ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেখা যায়, নানাবিধ গুণযুক্ত সেই অবস্থাকে নিয়তাপ্তি বলা হয়। ভাবপ্রকাশনে অনুরূপভাবে নিয়তাপ্তির লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে –

"নিযুক্তা নু ফলপ্রাপ্তির্যদা হ্যেবং প্রপশ্যতি ।

নিয়তাং নু ফলপ্রাপ্তিং সগুণাং তাং বিনির্দিশেৎ ॥" (ভাব.প্র.সপ্তম অধিকার)।

সাগরনন্দীর মতে, ফলপ্রাপ্তির নিশ্চিত উপস্থিতির নাম নিয়তাপ্তি – 'নিয়তা নিশ্চিতা ফলপ্রাপ্তিরুপস্থিতৈবেতি যাবৎ' (না.ল.র. দ্বিতীয় অধ্যায়)। দর্পণকারের মতে , অপায়ের অভাবহেতু নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তিকে নিয়তাপ্তি বলে – 'অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা' (সা.দ.৬/৭৩)। দর্পণকারোক্ত লক্ষণটি দশরূপকধৃত লক্ষণের অবিকল অনুরূপ। নাটকচন্দ্রিকাতে-ও বলা হয়েছে – 'নিয়তাপ্তিরবিঘ্নেন কার্যসংসিদ্ধিনিশ্চয়ঃ'(না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ৬৮)।

এই নিয়তাপ্তি নামক অবস্থাটির ভিত্তিতে ডঃ. কে. এইচ. ত্রিবেদী পাশ্চাত্য রূপক এবং সংস্কৃত রূপকের মধ্যে একটি পার্থক্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন । ন্যায়ের জয়,অন্যায়ের পরাজয় – বস্তুজগতে সর্বদা এমনটি দেখা যায় না । বহু সময় মানুষের সৎ, অনলস, একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এঁদেরকে আমরা `Tragic Hero' রূপে অভিহিত করি। পাশ্চাত্যের বহু রূপকে জীবনের এই মহাসত্যের প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু জীবন-জগৎ সম্পর্কে ভারতীয়গণের চূড়ান্ত ইতিবাচক মনোভাবের কারণে সংস্কৃত রূপকে নায়কের কখনো পরাজয় হয় না। অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা থাকলে-ও, সে সমস্ত অপসারিত করে নায়ক তাঁর ঈপ্সিত ফললাভ করেন, উড্ডীন করেন তাঁর সাফল্যের জয়পতাকা।

৫. ফলাগম ঃ

নাটকীয় ক্রিয়ার পঞ্চম এবং সর্বশেষ অবস্থার নাম ফলাগম। এটিকে কোথাও ফলাগম, কোথাও-বা ফলপ্রাপ্তি নামে অভিহিত করা হয়েছে। পূর্বোক্ত চারটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে নাট্যবস্তু এই

পরিণামের দিকে-ই অগ্রসর হয়। সমস্ত প্রতিবন্ধকতার অবসানে ফলাগম নামক এই অন্তিম অবস্থায় নায়কের সমস্ত প্রচেষ্টা ঈপ্সিত ফলের সাথে অন্বিত হয় ।

ফলাগমের নাট্যদর্পণোক্ত লক্ষণটি হল – 'সাক্ষাদিষ্টার্থসম্ভূতিঃ নায়কস্য ফলাগমঃ' (না.দ.১/৩৬)। এই অবস্থায় 'সাক্ষাৎ' অর্থাৎ সমনন্তর অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ ফলপ্রাপ্তি ঘটে। দানাদি পুণ্যকর্মের ফললাভের জন্য যেমন পরজন্ম তথা পরলোকের অপেক্ষা থাকে, নাটকীয় ফলপ্রাপ্তি কিন্তু সেইরকম নয়। নায়কের যাবতীয় প্রচেষ্টার পর নাটকের অন্তিম এই অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ফলোদয় ঘটে। টীকায় তাই বলা হয়েছে – 'সাক্ষাৎ সমনন্তরং, ন তু দানাদিভ্যঃ স্বর্গাদিফলমিব জন্মান্তরভাবিনী'। [৬৪]

ফলাগম নামক অবস্থায় প্রাপ্ত ফল সম্পূর্ণরূপে নায়কগামী। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অবস্থায় নায়িকা, সহায়ক, প্রতিনায়ক প্রমুখের কার্যকলাপের বর্ণনা থাকলে-ও, এই অবস্থায় যাবতীয় ঘটনার আবর্তন কেবলমাত্র নায়ককে কেন্দ্র করে। অভিনবভারতীতে তাই বলা হচ্ছে – 'নাটকেষু নাবশ্যং সর্বা নায়কস্য সাক্ষাদেবোপনিবন্ধনীয়াঃ, অপি তু সচিবাদিগতত্বেনাপি ফলযোগস্তু সাক্ষাদেব তদ্গত ইতি' (না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে 'বেণীসংহার' এবং 'রাঘবাভ্যুদয়' থেকে ফলাগমের উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে। বেণীসংহারের উদাহরণটির আলোচনা করা হল –

''ভূমৌ ক্ষিপ্ত্বা শরীরং নিহিতমিদমসৃক্ চন্দনাভং ময়াঙ্গে
লক্ষ্মীরার্যে নিষণ্ণা চতুরুদধিপয়ঃ সীময়া সাধুমুর্ব্যা ।
ভৃত্যা মিত্রাণি যোধাঃ কুরুবলমনুজা দগ্ধমেতদ্ রণাগ্নৌ
নামৈকং যদ্ ব্রবীষি ক্ষিতিপ! তদধুনা ধার্তরাষ্ট্রস্য শেষম্ ॥''

– উদ্ধৃত অংশে দুর্যোধনের নিধনের সঙ্গে-সঙ্গে কৌরবদের সমূল বিনাশ এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভরূপ মুখ্যফলের সিদ্ধি ঘটায় এটি ফলাগমের যথাযথ উদাহরণ। নাট্যশাস্ত্রে ফলযোগের লক্ষণটি হল –

" অভিপ্রেতং সমগ্রং চ প্রতিরূপং ক্রিয়াফলম্ ।
ইতিবৃত্তে ভবেদ্ যস্মিন্ ফলযোগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ '' (না.শা. ১৯/১৩)

– যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের অভিপ্রেত ও উপযুক্ত ফললাভ ঘটে নাট্যবৃত্তের যে অংশে, তাকে-ই ফলযোগ নামক অবস্থারূপে অভিহিত করা হয়। নাটকলক্ষণরত্নকোশ, ভাবপ্রকাশন সর্বত্র এক-ই ভাবে ফলাগমের লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। দশরূপককারের মতে – 'সমগ্রফলসম্পত্তিঃ ফলযোগো যথোদিতঃ' (দশ.রূ. ১/২২)– সমগ্র ফলসম্পত্তিলাভকে বলা হয় ফলাগম । দর্পণকার-ও ধনঞ্জয়ের অনুসরণে ফলাগমলক্ষণটি নির্ণয় করেছেন।

সন্ধি ঃ

'সন্ধি' কথাটির অর্থ সংযোগ। এই সংযোগ একদিকে যেমন সন্ধির সঙ্গে সন্ধিফলের যোগ, অপরদিকে তেমনি সন্ধিফলের সঙ্গে মুখ্যফলের যোগ। মুখ্যফললাভের জন্য যে নাটকীয় ক্রিয়া, তার একেকটি অবস্থা হল সন্ধি। নাট্যবস্তু নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে; এই অগ্রগতির একেকটি স্তরকে সন্ধিরূপে আখ্যাত করা হয়। প্রত্যেকটি সন্ধির একেকটি বিশেষ ফল আছে । সেই ফলগুলি আবার মুখ্যফললাভের সহায়ক এবং মুখ্যফলের সঙ্গে অন্বিত। সুতরাং মুখ্য প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আনুষঙ্গিক স্বকীয় প্রয়োজনের সঙ্গে নাট্যাংশগুলির পারস্পরিক সংযোগকে সন্ধি নামে অভিহিত করা হয়। নাট্যদর্পণের টীকায় বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে– 'মুখ্যস্য স্বতন্ত্রস্য মহাবাক্যার্থস্যাংশাঃ ভাগাঃ পরস্পরং স্বরূপেণ চাঙ্গৈঃ সন্ধীয়ন্ত ইতি সন্ধয়ঃ'[৬৫]– মানবশরীরে সন্ধি যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের সংযোগ সাধন করে দেহের যথাযথ বিন্যাসে সাহায্য করে, তেমনিভাবে নাটকে প্রযুক্ত সন্ধি নাটকীয় ইতিবৃত্তের অংশসমূহের পারস্পরিক সংযোগ সাধনের দ্বারা নাট্যবস্তুর সামগ্রিকতার সামঞ্জস্য বিধান করে ।

ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে সন্ধির সামান্যলক্ষণ নির্ণয় করা হয়নি । তবে অভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন– 'অর্থাবয়বাঃ সন্ধীয়মানাঃ পরস্পরমঙ্গৈশ্চ সন্ধয় ইতি সমাখ্যা নিরুক্তা, তদেষাং সামান্যলক্ষণম্' (না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)। এর অর্থ – ইতিবৃত্তের অবয়বগুলি পরস্পরের সঙ্গে এবং নিজ-নিজ অঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্ধি আখ্যা লাভ করে।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও এক-ইভাবে সন্ধিলক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে – ''সন্ধিঃ পরস্পরং কথার্থানাং সজ্ঘটনম্। যথোক্তং সন্ধীয়ন্তে2র্থাঃ পরস্পরমেভিরিতি সন্ধয়ঃ'' (না.ল.র সপ্তম অধ্যায়) – কাহিনীগত ঘটনাগুলির পরস্পর সংযোজন-ই সন্ধি। ঘটনাগুলি এদের দ্বারা সংযোজিত হয় বলে-ই এদেরকে সন্ধি বলা হয়।

সন্ধির দশরূপকধৃত লক্ষণটি হল – 'অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি' (দশ.রূ.১/২৩)– একটি প্রধানফলের সঙ্গে সংযুক্ত বৃত্তমধ্যস্থ বিভিন্ন কথাংশের মুখ্যপ্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধকে বলা হয় সন্ধি। পরভাবী ভাবপ্রকাশনকার, দর্পণকার প্রমুখ সকলে দশরূপকের লক্ষণটির-ই পুনরুক্তি করেছেন।

এই সন্ধি সংখ্যায় পাঁচটি – মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, আমর্শ ও নির্বহণ। নাট্যদর্পণের কারিকায় বলা হচ্ছে – 'মুখং প্রতিমুখং গর্ভামর্শ-নির্বহণান্যমী' (না.দ.১/৩৭) । নাট্যশাস্ত্রাদি অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে

'আমর্শকে 'অবমর্শ' বা 'বিমর্শ' নামে এবং 'নির্বহণ'-কে 'উপসংহৃতি' নামে আখ্যাত করা হয়েছে। পারিভাষিক শব্দটি যাই হোক্ না কেন, স্বরূপগতবিচারে এদের কোনো পার্থক্য নেই।

সন্ধির উৎপত্তিবিষয়ে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, আরম্ভাদি পঞ্চবিধ অবস্থার বিদ্যমানতায় যথাক্রমে মুখাদি পঞ্চবিধ সন্ধির উদ্ভব হয়। অর্থাৎ অবস্থা ও সন্ধিসমূহের মধ্যে সর্বদা একটি সংযোগ বর্তমান থাকে। প্রতিটি সন্ধি যথাক্রমিক অবস্থার যোগে উৎপন্ন হয় এবং সেই বিশেষ অবস্থাটির সমাপ্তিতে সেই বিশেষ সন্ধিটির-ও সমাপ্তি ঘটে। টীকায় তাই বলা হচ্ছে – 'অবস্থাভিঃ প্রারম্ভাদিভিরনুগতা অনুযাতা, অবস্থাসমাপ্তৌ সমাপ্যন্ত ইত্যর্থঃ'।[৬৬]পরভাবী দর্পণকার-ও সন্ধিসমূহের উৎপত্তিতে অবস্থার সংযোগের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন –

" যথাসংখ্যমবস্থাভিরাভির্যোগাত্তু পঞ্চভিঃ ।

পঞ্চধৈবেতিবৃত্তস্য ভাগাঃ স্যুঃ পঞ্চসন্ধয়ঃ ॥" (সা.দ.৬/৭৪)

সন্ধির উৎপত্তিবিষয়ে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের অভিমতটি নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে । বলা হচ্ছে–

"অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ পঞ্চাবস্থাসমন্বিতাঃ ॥

যথাসংখ্যেন জায়ন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চ সন্ধয়ঃ। " (দশ.রূ. ১/২২,২৩)

– পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হলে যথাক্রমে মুখাদি পঞ্চসন্ধির উদ্ভব হয়। অর্থাৎ আচার্য ধনঞ্জয়ের মতে, নাটকের যে অংশটি বীজ নামক অর্থপ্রকৃতি এবং আরম্ভ নামক অবস্থা যুক্ত, সেটি-ই মুখসন্ধি। এভাবে বিন্দুর সঙ্গে প্রযত্নের সংযোগে প্রতিমুখসন্ধি, পতাকার সঙ্গে প্রাপ্ত্যাশার যোগে গর্ভসন্ধি, প্রকরীর সঙ্গে নিয়তাপ্তির যোগে বিমর্শ বা অবমর্শসন্ধি এবং কার্যের সঙ্গে ফলাগমের সংযোগে নির্বহণ বা উপসংহৃতি নামক সন্ধির উদ্ভব হয় । আচার্য শারদাতনয়-ও এই এক-ই মতের সমর্থক। ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে–

"পঞ্চাবস্থাসমেতার্থপ্রকৃতীনাং যথাক্রমম্।

যথাসংখ্যেন জায়ন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চ সন্ধয়ঃ ॥" (ভাব.প্র. সপ্তম অধিকার)

নাটকচন্দ্রিকাকার রূপগোস্বামী-ও বলেছেন –

"একৈকস্যাস্তবস্থায়াঃ প্রকৃত্যা চৈকয়ৈকয়া।

যোগঃ সন্ধিরিতি জ্ঞেয়ো নাট্যবিদ্যাবিশারদৈঃ ॥" (না.চ. শ্লোকসংখ্যা–৪৩)

তবে দশরূপককারের এই অভিমতটি কতখানি যুক্তিসহ, তা কিন্তু বিচারের অপেক্ষা রাখে । কারণ–

১. বীজের প্রয়োগ কেবলমাত্র মুখসন্ধিতে সীমাবদ্ধ, একথা সঠিক নয়। বীজের বিস্তার, বস্তুতঃপক্ষে, সমগ্র নাটক জুড়ে। মুখসন্ধিতে বীজের কেবল উপন্যাস ঘটে; নাটকের পরবর্তী যাবতীয় ঘটনাসমূহে, বিভিন্ন ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই বীজের-ই ফলে পরিণতির বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

২. বিন্দুর প্রয়োগ কেবলমাত্র প্রতিমুখসন্ধিতে হবে – একথা-ও ঠিক নয়। নাটকের মুখ্য প্রয়োজন বিচ্ছিন্ন হলে-ই, মুখ্য ঘটনার অবিচ্ছেদ অর্থাৎ `continuity'র জন্য বিন্দুর প্রয়োজন হয় এবং এই প্রয়োজন রূপকের সমাপ্তি পর্যন্ত থাকতে পারে।

৩. পতাকা ও প্রকরী যথাক্রমে গর্ভ ও অবমর্শসন্ধিতে যোক্তব্য – একথা-ও ঠিক নয়। কারণ, আগে-ই বলা হয়েছে, পতাকা ও প্রকরী নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। যে স্থলে নায়ক কেবল নিজশক্তিতে ফললাভে অক্ষম, সেখানে-ই পতাকা-প্রকরীর প্রয়োগের অবকাশ; অন্যথায় নয়। পতাকা-প্রকরীহীন নাটকে-ও পঞ্চবিধ সন্ধির প্রয়োগ তাই সর্বথা নির্দোষ।

৪. পতাকার প্রয়োগবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, মুখ থেকে আরম্ভ করে অবমর্শ পর্যন্ত সবকটি সন্ধির যেকোনোটিতে পতাকার প্রয়োগ হতে পারে। যেমন – 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের বিদূষকচরিতরূপ পতাকাবৃত্তটি প্রতিমুখ, গর্ভ ও অবমর্শ সন্ধিতে বিদ্যমান।

৫. প্রকরীর প্রয়োগ হবে কেবলমাত্র অবমর্শসন্ধিতে – একথা-ও যুক্তিসহ নয়। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের ব্রহ্মচারিবৃত্তান্ত একটি প্রকরী, যা উপস্থাপিত হয়েছে মুখসন্ধিতে।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে তাই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি এবং পঞ্চ অবস্থার সংযোগে পঞ্চসন্ধির উদ্ভব – দশরূপকোক্ত এই অভিমতটি কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থপ্রকৃতি,অবস্থা ও সন্ধি – তিনটি তত্ত্বের-ই পাঁচটি করে ভেদ বলে-ই সম্ভবতঃ এই যান্ত্রিক পদ্ধতিটির কল্পনা করা হয়েছে।

নাট্যদর্পণে যেহেতু কেবলমাত্র অবস্থার সঙ্গে সন্ধির উৎপত্তিকে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং নাটকে পঞ্চবিধ অবস্থাসমূহের প্রয়োগ যেহেতু অবশ্যকরণীয়, সেই কারণে-ই নাটক ও তৎসম-লক্ষণবিশিষ্ট প্রকরণ, নাটিকা ও প্রকরণীতে পঞ্চসন্ধির প্রয়োগ-ও অবশ্যম্ভাবী। সমবকারাদি রূপকে অবস্থার সংখ্যা ন্যূন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সন্ধির সংখ্যা-ও তদনুরূপ হবে। পতাকাখ্য সমধিক ব্যাপ্ত প্রাসঙ্গিকবৃত্তে মুখাদি সন্ধির ন্যায় অনুসন্ধির-ও প্রয়োগ হতে পারে।

প্রারম্ভিক ও অন্তিম – অর্থাৎ মুখ ও নির্বহণাখ্য সন্ধিদ্বয় প্রতিপ্রকার রূপকে অবশ্যপ্রযোজ্য। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে– 'মুখনির্বহণে তত্র কর্তব্যে কবিভিঃ সদা' (না.শা. ১৯/৪৭)। এই দুটির মধ্যবর্তী বীজবিকাশের অন্য তিনটি ভেদ অর্থাৎ প্রতিমুখ, গর্ভ ও অবমর্শ সন্ধি সর্বপ্রকার দৃশ্যকাব্যে

না-ও থাকতে পারে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে– রূপক পূর্ণসন্ধি হওয়া-ই কর্তব্য, তবে তা হীনসন্ধি-ও হতে পারে। নিয়মানুসারে তা পঞ্চসন্ধি হওয়া উচিৎ, কিন্তু কারণ থাকলে তা হীনসন্ধি-ও হতে পারে –

"পূর্ণসন্ধি চ কর্তব্যং হীনসন্ধ্যপি বা পুনঃ ।
নিয়মাৎ পূর্ণসন্ধিঃ স্যাদ্ধীনসন্ধ্যথ কারণাৎ ॥" (না.শা. ১৯/১৭)

পূর্ণসন্ধি না হলে, নাট্যশাস্ত্রানুসারে নিম্নোক্ত প্রকারে সন্ধিলোপ হওয়া উচিৎ–

"একলোপে চতুর্থস্য দ্বিলোপে ত্রিচতুর্থয়োঃ ।
দ্বিতীয়ত্রিচতুর্থানাং ত্রিলোপে লোপ ইষ্যতে ॥" (না.শা. ১৯/১৮)

– যদি একটি সন্ধির লোপ করতে হয়, তবে সেটি চতুর্থ অর্থাৎ বিমর্শ সন্ধির লোপ হবে। দুটি সন্ধিবর্জনের ক্ষেত্রে গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধির লোপ হবে এবং তিনটি সন্ধিবর্জিত হলে প্রতিমুখ, গর্ভ ও বিমর্শসন্ধির লোপ হবে।

নাট্যশাস্ত্রসম্মত দশবিধ রূপকের মধ্যে পঞ্চসন্ধি রূপক কেবলমাত্র দুটি – নাটক ও প্রকরণ। ডিম ও সমবকার চতুঃসন্ধি, ব্যায়োগ ও ঈহামৃগ ত্রিসন্ধি এবং প্রহসন, বীথী, অঙ্ক ও ভাণ দ্বিসন্ধি – এই হল নাট্যশাস্ত্রের বিধান। বলা বাহুল্য যে, কেবলমাত্র মুখ ও নির্বহণ সন্ধিসমন্বিত দৃশ্যকাব্যকে উত্তমমানের রূপকপদবাচ্য বলা যেতে পারে না। প্রতিমুখ, গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধির মাধ্যমে-ই নাটকের যথার্থ গতিবেগ সৃষ্টি হয়, যা দর্শকচিত্তে আগ্রহ ও উত্তেজনার সঞ্চার করে। দ্বিসন্ধি রূপকগুলির ক্ষেত্রে কাহিনীবিস্তারের অভাববশতঃ নাটকীয় উৎকণ্ঠা অর্থাৎ `dramatic suspense' তৈরি হতে পারে না; ফলতঃ সেই রূপক সহৃদয়ের চিত্তকে তৃপ্ত করতে পারে না।

পঞ্চপ্রকার সন্ধির স্বরূপ আলোচনা করা হল। নাটকের গতিশীল ঘটনাপ্রবাহ এই পাঁচটি সন্ধিতে আরোহণ ও অবরোহণের মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি অনুসারে পাশ্চাত্য নাটকে-ও এইরকম বিভাগ দৃষ্ট হয় । যথা –

১.Introduction বা Exposition
২. Rising action, Growth বা Complication
৩.Climax, Crisis, বা Turning point
৪.Falling Action, Resolution বা Denouement
৫.Conclusion বা Catastrophe.

ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে, উক্ত পঞ্চাংশের যে Rising Action, তা সংস্কৃত নাটকের মুখ ও প্রতিমুখসন্ধি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশগুলি যথাক্রমে গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ

সন্ধির-ই সমধর্মী । Exposition অঙ্গটির অনুরূপ সন্ধিনাম সংস্কৃতে নেই, এটি মুখসন্ধির অন্তর্গত।

পঞ্চসন্ধির ভেদগুলির আলোচনায় নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা প্রায় সকলে-ই নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করেছেন। কেবলমাত্র সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য মাতৃগুপ্ত-রচিত সন্ধিলক্ষণসমূহ উদ্ধার করেছেন। এবার একে-একে এই পঞ্চবিধ সন্ধির প্রকারগুলির অলোচনা করা হচ্ছে –

১. মুখসন্ধি ঃ

নাট্যদর্পণসম্মত মুখসন্ধিলক্ষণটি হল – 'মুখং প্রধানবৃত্তাংশঃ বীজোৎপত্তিরসাশ্রয়ঃ' (না.দ.১/৩৮)– নাটকের যে অংশে নাটকীয় ইতিবৃত্তের হেতুস্বরূপ বীজ উপন্যস্ত হয় এবং সেই বীজ নানা প্রয়োজন এবং শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রসের কারণ হয়ে থাকে, তাকে-ই মুখসন্ধি বলা হয় । এটি 'আরম্ভ' নামক কার্যাবস্থাসমন্বিত। মুখ নামক অঙ্গটি দিয়ে যেমন মানবশরীরের আরম্ভ, তেমনি মুখসন্ধিদ্বারে-ই নাট্যবস্তুর আরম্ভ – এই কারণে এই সন্ধির এই নামকরণ। অভিনবভারতীতে-ও বলা হয়েছে – 'প্রাগারম্ভভাবিত্বান্মুখমিব মুখম্' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। নাট্যের এই অংশে নাট্যকার বীজের উপন্যাস এবং বিভিন্ন বিষয় ও ভাবের অবতারণা করেন। কিছু প্রধান নাটকীয় চরিত্র নাট্যের এই অংশে উপস্থাপিত হয়ে নাট্যের মূল অভিপ্রায়কে পরিচালিত করে।

মুখসন্ধির উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণগ্রন্থে 'রত্নাবলী' ও 'সত্যহরিশ্চন্দ্র' রূপকদ্বয়ের প্রথম অঙ্কের উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা প্রথমটির বিশদ আলোচনা করবো–

'রত্নাবলী'-র প্রথম অঙ্কে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক উচ্চারিত "দ্বীপাদন্যস্মাদপি ..." ইত্যাদি শ্লোকে উদয়ন-রত্নাবলীর মিলনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের বীজ উপন্যস্ত । অন্যদিকে এই অঙ্কটি বিবিধ প্রকার রসে-ও মণ্ডিত।যেমন – উদয়ন-রত্নাবলীর মিলন দ্বারা উদয়নের রাজ্যবিস্তারে অভিলাষী অমাত্য যৌগন্ধরায়ণের চিত্তে উদ্রিক্ত বীররস; বসন্তাগমে উদয়নের চিত্তে শৃঙ্গাররস; পৌরজনের উৎসবমত্ততায় অদ্ভুতরস এবং উদ্যানগমনে উদয়নের চিত্তে পুনরুদ্রিক্ত শৃঙ্গাররস ইত্যাদি।এইভাবে 'রত্নাবলী'-র প্রথম অঙ্কের এই অংশে বীজের উপন্যাস ও নানাবিধ রসের উদ্রেকের কারণে এই অংশটি মুখসন্ধির একটি যথাযথ উদাহরণ।

উল্লেখ্য, 'রত্নাবলী'-র এই অংশটি অভিনবভারতীতে-ও মুখসন্ধির উদাহরণরূপে আলোচিত। অভিনবগুপ্তাচার্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটিকে-ই নাট্যদর্পণে একটু বিস্তারিত ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে মুখসন্ধির লক্ষণটি হল –

"যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।

কাব্যে শরীরানুগতা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্ ॥ " (না.শা.১৯/৩৯)

– রূপকের যে অংশে বিবিধ বিষয় ও রসের হেতুস্বরূপ বীজের উৎপত্তি ঘটে, শরীরানুগামী (শরীরে মুখবৎ প্রধান) সেই অংশকে মুখসন্ধি নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তী দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে এক-ই ভাবে মুখসন্ধির লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

পূর্বে-ই বলা হয়েছে, সাগরনন্দী মাতৃগুপ্তরচিত সন্ধিসমূহের লক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, মুখসন্ধিতে তিনটি বিষয় থাকবে – প্রার্থনা, আরম্ভ এবং সাধ্যোপগমন–

"প্রার্থনা বিষয়ৌৎসুক্যমারম্ভো হেতুচিন্তনম্।

বীজং সাধ্যোপগমনং মুখসন্ধিরিতি ত্রয়ম্ ॥" (না.ল.র. সপ্তম অধ্যায়)

– 'প্রার্থনা' অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য; 'আরম্ভ' অর্থাৎ কারণের অন্বেষণ এবং 'সাধ্যোপগমন' অর্থাৎ বীজের উপন্যাস।

ভাবপ্রকাশনোক্ত মুখসন্ধির লক্ষণটি নাট্যশাস্ত্রানুসারী। তবে বীজের রসোৎপত্তিবিষয়ে এই গ্রন্থে বিশদ আলোচনা রয়েছে, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। প্রথমে এখানে একটি পূর্বপক্ষ উত্থাপন করে বলা হচ্ছে, বীজের রসোৎপত্তিসামর্থ্য নেই; কারণ ধর্মাদি ত্রিবর্গের সঙ্গে বীজের সম্বন্ধ নাট্যের এই প্রাথমিক অংশে অনুভব করা দুঃসাধ্য –

"বীজোৎপত্তির্ন হেতুঃ স্যাদ্রসাণাং মুখসন্ধিভাক্।

তেষাং ত্রিবর্গসম্বন্ধঃ প্রায়ো যস্মান্ন দৃশ্যতে ॥" (ভাব. প্র. সপ্তম অধিকার)

– এবার এই মতটির বিরুদ্ধে ভাবপ্রকাশনকার শারদাতনয় স্বীয় মতের উপস্থাপন করছেন। তদনুসারে, কামোপযোগী শৃঙ্গার ও অদ্ভুত রস; অর্থোপযোগী বীর ও রৌদ্র রস; ধর্ম ও অর্থ – উভয়োপযোগী করুণরস এবং ক্ষেত্রবিশেষে হাস্যাদি অন্যান্য রসগুলি চরিত্র অনুসারে ত্রিবর্গসাধকরূপে কাজ করে থাকে। অতএব বীজ তথা মুখসন্ধির রসোৎপত্তি নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না; এরা নিঃসন্দেহে রসোৎপাদক।

২. প্রতিমুখসন্ধি ঃ

মুখসন্ধিতে সমুপন্যস্ত মুখ্যফলের প্রধান হেতুস্বরূপ বীজটি অন্যান্য অবান্তর ঘটনার প্রয়োগবশে অদৃশ্যবৎ হয়ে পড়লে-ও, রূপকের যে অংশে তা পুনরায় সংলক্ষ্য হয়ে বিকাশলাভ করে, তাকে প্রতিমুখসন্ধি বলা হয়। নাট্যদর্পণে এর লক্ষণটি হল – 'প্রতিমুখং কিয়ল্লক্ষ্য-বীজোদ্‌ঘাট-সমন্বিতঃ' (না.দ.১/৩৮)। এই সন্ধিটি 'প্রযত্ন' নামক কার্যাবস্থাসমন্বিত। মুখসন্ধির ঘটনাবলীর

অনুসরণে এই সন্ধিতে ঘটনার বিকাশ ঘটে, তাই এর নাম প্রতিমুখসন্ধি। টীকায় বলা হয়েছে – 'মুখস্যাভিমুখ্যেন বর্তত ইতি প্রতিমুখম্'। [৬৭]

নাট্যদর্পণে 'রত্নাবলী'-র দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে প্রতিমুখসন্ধির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই নাটিকার প্রথম অঙ্কে মুখসন্ধিতে "দ্বীপাদন্যস্মাদপি..." ইত্যাদি শ্লোকে যে বীজ উপন্যস্ত হয়েছিল, বসন্তোৎসব-অনঙ্গপূজা প্রভৃতি অবান্তর ঘটনার প্রয়োগে সেই বীজ যেন অলক্ষিত হয়ে পড়েছিল; অর্থাৎ রূপকের মুখ্য প্রয়োজন গৌণ ও যেন অদৃশ্য হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় রূপকের দ্বিতীয় অঙ্কে সুসঙ্গতা কর্তৃক উদয়ন ও সাগরিকার মিলনের আয়োজনের দ্বারা সেই অলক্ষিত বীজটির যেন পুনরায় উদ্‌ঘাটন হল। অতএব এই অংশটি প্রতিমুখসন্ধির উত্তম উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, মুখসন্ধিতে ন্যস্ত বীজ কোথাও দৃষ্ট, আবার বিরুদ্ধ ঘটনার উপচারবশতঃ কোথাও বা বিনষ্টবৎ থেকে-ও উদ্‌ঘাটিত হলে, তাকে প্রতিমুখসন্ধি বলা হয় –

"বীজস্যোদ্‌ঘাটনং যত্র দৃষ্টনষ্টমিব ক্বচিৎ ।

মুখন্যস্তস্য সর্বত্র তদ্বৈ প্রতিমুখং স্মৃতম্ ॥" (না.শা. ১৯/৪০)

–প্রতিকূল নানা ঘটনার উপস্থাপনার ফলে এই সন্ধিতে বীজটি-ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। তখন এরূপ আশঙ্কা জাগে, বীজ বুঝি বিনষ্ট হল। কখনো আবার অনুকূল অবস্থায় নষ্টপ্রায় বীজ প্রকাশমান হয় এবং তার বিকাশের জন্য প্রযত্ন দেখা যায় । এভাবে বীজের কিঞ্চিৎ লক্ষ্য, কিঞ্চিৎ অলক্ষ্য অবস্থার নাম-ই প্রতিমুখসন্ধি। অভিনবভারতীতে সুন্দরভাবে বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে – ''বীজস্যোদ্‌ঘাটনং তাবৎ ফলানুগুণো দশাবিশেষঃ। তদ্ দৃষ্টমপি বিরোধিসংনিধের্নষ্টমিব, পাংসুনা পিহিতস্যেব বীজস্যাঙ্কুররূপমুদ্‌ঘাটনম্'' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়) ।

দশরূপকে প্রতিমুখসন্ধির যে লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ – 'লক্ষ্যালক্ষ্যতয়োদ্ভেদস্তস্য প্রতিমুখং ভবেৎ' (দশ.রূ.১/৩০) – বীজ কোথাও লক্ষিত অবস্থায়, কোথাও বা অলক্ষিত অবস্থায় থেকে উদ্ভিন্ন হলে, তাকে প্রতিমুখসন্ধি বলা হয়। সাহিত্যদর্পণ ও নাটকচন্দ্রিকায় দশরূপকের অনুসরণে প্রতিমুখসন্ধিলক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। ভাবপ্রকাশনকারের অভিমতটি-ও অনুরূপ – 'দৃশ্যাদৃশ্যতয়া বীজব্যক্তিঃ প্রতিমুখং ভবেৎ' (ভাব. প্র.সপ্তম অধিকার)।

সাগরনন্দী উল্লিখিত মাতৃগুপ্তরচিত প্রতিমুখসন্ধিলক্ষণে বলা হয়েছে, এই সন্ধিতে তিনটি বিষয় থাকবে – লাভ, প্রসর ও বিন্দু –

''লাভঃ সাধনসম্পত্তিঃ প্রসরঃ প্রসৃতা ক্রিয়া ।

বিন্দুঃ সাধনসম্বন্ধঃ ইতি প্রতিমুখে ত্রয়ম্ ॥'' (না.ল.র. সপ্তম অধ্যায়)

– 'লাভ' হল উপায়ের দ্বারা সম্পদ্প্রাপ্তি; 'প্রসর' হল কর্মের বিস্তার এবং 'বিন্দু' হল সাধনের সঙ্গে সম্বন্ধ।

৩. গর্ভসন্ধি ঃ

প্রতিমুখসন্ধিতে বিকাশপ্রাপ্ত বীজটি যেখানে বারংবার হ্রাস ও অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে-ই গর্ভসন্ধি বলা হয়। নাট্যদর্পণে এই সন্ধির লক্ষণটি হল – 'বীজস্যৌন্মুখ্যবান্ গর্ভঃ লাভালাভগবেষণৈঃ' (না.দ.১/৩৯)। এই সন্ধিটি 'প্রাপ্ত্যাশা' নামক কার্যাবস্থাযুক্ত। ফলের সম্ভাবনা গর্ভে নিহিত থাকে বলে এই সন্ধির নাম গর্ভ। অভিনবভারতীতে-ও বলা হচ্ছে – 'প্রাপ্তিসম্ভবাখ্যয়াবস্থয়া যুক্তত্বেন ফলস্য গর্ভীভাবাৎ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে 'বেণীসংহার'-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে গর্ভসন্ধির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এই তিনটি অঙ্কে কর্ণ ও অশ্বত্থামার কলহ, যুদ্ধের জন্য দুর্যোধনের উদ্যম, দুর্যোধন-দুঃশাসনের বধে ভীমসেনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি বিবিধ ঘটনাজালে পুনঃ পুনঃ অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে নাট্যবস্তুর হেতুভূত বীজটির প্রকাশ ঘটছে; অতএব এটি গর্ভসন্ধির উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে গর্ভসন্ধির যে লক্ষণটি নির্দেশ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ –

"উদ্ভেদস্তস্য বীজস্য প্রাপ্তিরপ্রাপ্তিরেব বা।
পুনশ্চান্বেষণং যত্র স গর্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥" (না.শা. ১৯/৪১)

– রূপকের যে অংশে বীজের উন্মেষ, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি ঘটে এবং বারংবার বীজের অন্বেষণ করা হয়, তাকে-ই গর্ভসন্ধি বলা হয়।

প্রতিমুখসন্ধিতে কখনো লক্ষ্য, কখনো বা অলক্ষ্য থেকে যে বীজ ঈষৎ উদ্ভিন্ন হয়, তার বিশেষ বিকাশ সাধিত হয় গর্ভসন্ধিতে। প্রতিমুখসন্ধি অপেক্ষা এই সন্ধিটিতে নায়কাদির সম্মুখে অধিক প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হয়, যার ফলস্বরূপ নায়কাদির চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদি বর্ধিত হয় এবং দর্শকের নাটকীয় উৎকণ্ঠা-ও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে-ও, রূপকের এই অংশে, কোথাও বীজের আবির্ভাব হয়, পুনরায় তা অন্তর্হিত হয়, অনন্তর দৃষ্টনষ্ট সেই বীজের জন্য চলতে থাকে অন্বেষণ। নষ্টপ্রায় এই বীজটিকে উদ্ধার করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকলে-ও, সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়। দশরূপকের 'অবলোক' টীকায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে – 'প্রতিমুখসন্ধৌ লক্ষ্যালক্ষ্যরূপতয়া স্তোকোদ্ভিন্নস্য বীজস্য সবিশেষোদ্ভেদপূর্বকঃ সান্তরায়ো লাভঃ, পুনর্বিচ্ছেদঃ, পুনঃপ্রাপ্তিঃ, পুনশ্চ তস্যৈবান্বেষণং বারংবারং সো2নির্ধারিতৈকান্তফলপ্রাপ্ত্যাশাত্মকো গর্ভসন্ধিরিতি' (দশ.রূ. প্রথম প্রকাশ) –অর্থাৎ প্রতিমুখসন্ধিতে

লক্ষিত ও অলক্ষিতরূপে কিঞ্চিৎ উদ্ভিন্ন বীজের বিশেষ উদ্ভেদপূর্বক প্রতিকূলতার মধ্যে লাভ, পুনরায় বিচ্ছেদ, পুনরায় প্রাপ্তি, আবার বিচ্ছেদ এবং পুনরায় তার অন্বেষণ, পুনঃপুনঃ সেই অনির্ধারিত কিন্তু ঐকান্তিক ফললাভাত্মক ব্যাপার-ই গর্ভসন্ধি ।

এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, গর্ভসন্ধিতে ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না, কিছুটা সম্ভাবনা দেখা যায় মাত্র। এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে নাট্যদর্পণে গর্ভ ও অবমর্শসন্ধির প্রধান পার্থক্যটি নিরূপণ করা হয়েছে। গর্ভসন্ধিতে সম্ভাবনা প্রধান, প্রাপ্তি গৌণ; বিপরীতে অবমর্শসন্ধিটি প্রাপ্তিপ্রধান ও ফলনিশ্চয়াত্মক । টীকায় বলা হয়েছে – ‘‘ইহ গর্ভসন্ধাবপ্রাপ্ত্যংশঃ প্রধানঃ, ফলসম্ভাবনাত্মকত্বাৎ, অন্যথা ফলনিশ্চয়াত্মক এব স্যাৎ। অবমর্শসন্ধৌ তু প্রাপ্ত্যংশঃ প্রধানঃ, ফলনিশ্চয়রূপত্বাদিতি বিশেষঃ”।[৬৮] অভিনবভারতীতে-ও এবিষয়ে অনুরূপ অভিমত পোষণ করা হয়েছে।

দশরূপক, ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণাদি যাবতীয় গ্রন্থে গর্ভসন্ধির লক্ষণনির্ণয়ে নাট্যশাস্ত্রের-ই অনুসরণ করা হয়েছে । সাহিত্যদর্পণের লক্ষণটি নিম্নে উদ্ধার করা হল –

“ ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন ।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ ॥’’ (সা.দ.৬/৭৮)

নাটকলক্ষণরত্নকোশোক্ত মাতৃগুপ্তরচিত গর্ভসন্ধিলক্ষণে বলা হয়েছে, এই সন্ধির তিনটি অংশ– সম্ভোগ, উদ্ভেদ ও পতাকা –

“সম্ভোগো যোগ্যতা তত্র উদ্ভেদঃ সিদ্ধিদর্শনম্ ।
মিত্রসম্পৎ পতাকেতি ত্রয়ং গর্ভে প্রকীর্তিতম্ ॥’’ (না.ল.র. সপ্তম অধ্যায়)

– ‘সম্ভোগ’ অর্থাৎ সেই বিষয়ে যোগ্যতা; ‘উদ্ভেদ’ অর্থাৎ ফলসিদ্ধির আভাসমাত্র দর্শন এবং ‘পতাকা’ অর্থাৎ মিত্রলাভ।

একটি বিষয় এখানে বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি এবং পঞ্চ অবস্থার ক্রমিক সমন্বয়ে পঞ্চসন্ধির উদ্ভব – দশরূপকপ্রোক্ত এই মত অনুসারে গর্ভসন্ধিতে ‘পতাকা’ নামক অর্থপ্রকৃতির প্রয়োগ বিধেয়। কিন্তু গর্ভসন্ধির লক্ষণে ‘পতাকা স্যান্ন বা’ এই উক্তির মাধ্যমে আচার্য ধনঞ্জয় এই সন্ধিতে পতাকার উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ গর্ভসন্ধিতে পতাকা থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। ভাবপ্রকাশনে-ও এক-ই অভিমত পোষণ করা হয়েছে। এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে পতাকাযুক্ত ও পতাকাবিহীন গর্ভসন্ধির উদাহরণরূপে যথাক্রমে ‘মালতীমাধবম্’ ও ‘মালবিকাগ্নিমিত্রম্’-এর উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বকৃত লক্ষণে আচার্য রূপগোস্বামী গর্ভসন্ধিতে পতাকার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন –

"দৃষ্টাদৃষ্টস্য বীজস্য গর্ভো হ্রাসান্বেষণাৎ।

দ্বাদশাঙ্গো ভবেদেব পতাকাংশানুসারতঃ ॥"(না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ১৭৭)

৪. বিমর্শ ঃ

বিমর্শসন্ধির নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'উদ্ভিন্নসাধ্যবিঘ্নাত্মা বিমর্শো ব্যসনাদিভিঃ' (না.দ.১/৩৯) – রূপকের যে অংশে মুখ্যফললাভের উপায় গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিকতর সমুদ্ভিন্ন হয়ে-ও, বিবিধ বিঘ্নের ফলে বীজের বিকাশ পুনরায় ব্যাহত হয়, তাকে-ই বিমর্শসন্ধিরূপে অভিহিত করা হয়। এই সন্ধিটি 'নিয়তাপ্তি' নামক কার্যাবস্থা সমন্বিত । 'ব্যসন' শব্দের দ্বারা বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে-সঙ্গে অভিশাপাদি বিঘ্নের-ও গ্রহণ হচ্ছে। টীকায় তাই বলা হচ্ছে – 'ব্যসনাদিভিরিতি আদিশব্দাৎ শাপাদিপরিগ্রহঃ'। [৬৯]

রূপকের ফলাগমের পথে এই সন্ধির মধ্যে-ই চরম অন্তরায়সমূহ পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী গর্ভসন্ধিতে ফলোদয়ের সম্ভাবনার পরে-ও, এই সন্ধিতে নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। যেমন নায়কাদি নাট্যচরিত্র, তেমনি দর্শক-ও চরম উৎকণ্ঠা অনুভব করতে থাকেন এবং ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। অভিনবভারতীতে এই সন্ধিটিকে তাই 'সন্দেহাত্মক' বলা হয়েছে। প্রবল বাধার কারণে নাটকীয় গতির এই পর্যায়ে নায়কাদি চরিত্র ফললাভবিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু বিপদে মুহ্যমান বা হতোদ্যম না হয়ে, 'বিঘ্নৈরপি হন্যমানাশ্চ মহাত্মানো বিশেষতো যতন্তে' – এই শাশ্বত নিয়ম অনুসারে তাঁরা ফললাভবিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হন এবং অবশেষে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়।

পূর্বসন্ধিতে নিশ্চয়, এই সন্ধিতে আবার সংশয় – এই বিষয়টি খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। তবে অভিনবগুপ্তাচার্য তাঁর গ্রন্থে এর একটি সুন্দর মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বারংবার প্রবল ও প্রবলতর বাধার সম্মুখীন হওয়া, তৎসত্ত্বে-ও হতাশ না হয়ে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া এবং পরিণামে জয়লাভের দ্বারা সাফল্য অর্জন করা – এই ঘটনাপরম্পরায় একদিকে যেমন নায়কচরিত্রের কর্মতৎপরতা ও উদ্যম সহস্র গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি তাঁর দৃঢ়তা-তেজস্বিতা-পরাক্রমাদি গুণদর্শনে দর্শকচিত্তে-ও এই নায়ক সর্বগুণান্বিত যথার্থ নায়কের আসনে বৃত হন। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' – এই ধ্রুব সত্যকে স্মরণে রেখে পুনঃপুনঃ বাধার সম্মুখীন হয়ে-ও, সাভিমানী নায়ক স্বীয় সম্মানরক্ষার্থে মুহ্যমান হন না; প্রত্যুতঃ নিজের পুরুষকারকে সহস্র গুণ বর্ধিত করে কর্মে নিযুক্ত হন। অভিনবভারতীতে তাই বলা হয়েছে – 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানীতি পশ্যতা তদত্র ময়া বিঘ্নাপসারণং কর্তব্যমিতি সাভিমানং স্বমুদ্যোগসূত্রং সহস্রগুণীকুরুতে'

(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। সহৃদয় দর্শক-ও, বলা বাহুল্য, নায়কের এতরকম প্রতিকূলতাদর্শনে স্বীয় বাধাবিঘ্নাদিপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান এবং নায়কের জয়লাভে নিজের জয়লাভের প্রোজ্জ্বল আশাব্যঞ্জক অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

'বিমর্শ' শব্দের অর্থ বিশেষ চিন্তা। রূপকের এই পর্যায়ে বহু বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণ ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন বলে, এই সন্ধির নাম বিমর্শ। নাট্যদর্পণের টীকায় সুন্দর ভাবে এই ব্যাখ্যাটি করা হয়েছে – 'বিমৃশতি বলবদন্তরায়হেতুসম্পাতপ্রত্যাসন্নমপি সাধ্যং প্রতি সন্দেধি নেতা2স্মিন্নিতি বিমর্শঃ'।[৭০]

নাট্যদর্পণে 'ব্যসন' পদটির বিবিধ অর্থ অনুসারে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বিমর্শসন্ধির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। 'বিঘ্ন' অর্থে 'রামাভ্যুদয়'-এর, 'দৈবত বিপদ' অর্থে 'বিধিবিলসিত' নামক রূপকের, 'ক্রোধ' অর্থে 'বেণীসংহার'-এর এবং 'অভিশাপ' অর্থে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। শেষোক্ত উদাহরণটি-ই আমাদের সর্বাধিক পরিচিত। চতুর্থ অঙ্কে উপনিবদ্ধ দুর্বাসার অভিশাপের কারণে রাজা দুষ্যন্ত বিস্মৃত হলেন শকুন্তলাকে, নিষ্ঠুর ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। শকুন্তলা-দুষ্যন্তের মিলনরূপ বীজের বিকাশে প্রচণ্ড সংশয় দেখা দিল। ষষ্ঠ অঙ্কে অঙ্গুরীয়ক লাভের পর রাজার স্মৃতি জাগ্রত হল এবং নাটকীয় ফলপ্রাপ্তির স্থির নিশ্চয় সূচিত হল। অতএব এটি বিমর্শসন্ধির অতি উত্তম উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে বিমর্শসন্ধির স্বরূপটি নির্ণয় করা হয়েছে এভাবে –

"গর্ভনির্ভিন্নবীজার্থো বিলোভনকৃতো2থবা।
ক্রোধব্যসনজো বাপি স বিমর্শ ইতি স্মৃতঃ ॥" (না.শা.১৯/৪২)

– গর্ভসন্ধিতে প্রকাশিত বীজ সম্বন্ধে প্রলোভন,ব্যসন বা ক্রোধহেতু চিন্তাকে বিমর্শ বলা হয়। দশরূপকের টীকায় বিশদে বলা হয়েছে, 'অবমর্শন' অর্থাৎ পর্যালোচনা। তা ক্রোধ, ব্যসন বা বিলোভনের দ্বারা 'এই অর্থ দ্বারা হওয়া উচিৎ' এরূপ অবধারিত ঐকান্তিক ফলপ্রাপ্তিবিষয়ক গর্ভসন্ধিতে উদ্ভিন্ন বীজার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে বিমর্শসন্ধি হয়। কারিকায় বলা হচ্ছে–

"ক্রোধেনাবমৃশেদ্যত্র ব্যসনাদ্বা বিলোভনাৎ।
গর্ভনির্ভিন্নবীজার্থঃ সো2বমর্শ ইতি স্মৃতঃ ॥" (দশ.রূ. ১/৪৩)

ভাবপ্রকাশনে আচার্য শারদাতনয় দশরূপকোক্ত লক্ষণটির পুনরুক্তি করেছেন মাত্র। সাহিত্যদর্পণে-ও প্রায় এক-ই ভাবে এই সন্ধির স্বরূপ কথিত হয়েছে–

"যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতো2ধিকঃ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্শ ইতি স্মৃতঃ ॥" (সা.দ.৬/৭৯)

নাটকলক্ষণরত্নকোশে উক্ত আচার্য মাতৃগুপ্তকথিত বিমর্শসন্ধির লক্ষণে বলা হয়েছে, এই সন্ধির তিনটি অংশ – নাশ, সবিঘ্নতা এবং বীজসম্পত্তি–

"নাশঃ কারণবৈধুর্যং কিঞ্চিচ্ছ্রেয়ঃ সবিঘ্নতা।

পুনর্বীজেন সম্পত্তির্বিমর্শে ত্রিতয়ং ভবেৎ ॥" (না.ল.র.সপ্তম অধ্যায়)

– 'নাশ' অর্থাৎ কারণবৈধুর্য্য, 'সবিঘ্নতা' অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ এবং 'বীজসম্পত্তি' অর্থাৎ বীজের পুনরায় পুষ্টি ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য,দশরূপককারের মত অনুসারে, বিমর্শসন্ধি 'নিয়তাপ্তি' নামক কার্যাবস্থা এবং 'প্রকরী' নামক অর্থপ্রকৃতির দ্বারা যুক্ত। কিন্তু সমস্ত রূপকে এই নিয়মটিকে বলবৎ হতে দেখা যায় না। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর সানুমতী-আখ্যানটিকে প্রকরীবৃত্তরূপে গণ্য করা যেতে পারে, যা বিমর্শসন্ধিতে উপস্থাপিত। আবার 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর ব্রহ্মচারিবৃত্তান্তরূপ প্রকরীটি কিন্তু মুখসন্ধিতে উপস্থাপিত।অতএব বিমর্শসন্ধিতে প্রকরীর প্রয়োগ আবশ্যক – এমন কথা যুক্তিসঙ্গত নয়।

৫. নির্বহণসন্ধি ঃ

নানাবিধ ভাব ও রসের আশ্রয়রূপ মুখাদি সন্ধিচতুষ্টয়ে বিক্ষিপ্ত বীজ এবং বিষয়সমূহ রূপকের যে অংশে মুখ্য প্রয়োজনসাধনে সংহত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাকে নির্বহণসন্ধি বলা হয়। নাট্যদর্পণোক্ত নির্বহণসন্ধিলক্ষণটি নিম্নরূপ –

"সবীজবিকৃতাবস্থা নানাভাবা মুখাদয়ঃ ।

ফলসংযোগিনো যস্মিন্ অসৌ নির্বহণো ধ্রুবম্ ॥"(না.দ.১/৪০)

সমস্ত প্রকার অন্তরায় দূরীকরণের দ্বারা অবস্থা ও পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় এই সন্ধিতে সমগ্র ঘটনাস্রোত ক্রমে মুখ্যফলাভিমুখী হয়ে ওঠে। যাবতীয় ঘটনা, যাবতীয় প্রারব্ধ কর্ম নাটকের মুখ্যফলসাধনের জন্য প্রবর্তিত হয়। এই সন্ধি 'ফলাগম' নামক অবস্থার দ্বারা সমন্বিত ।

'নির্বহতি মুখ্যফলং সম্পদ্যতে অস্মিন্নিতি নির্বহণম্' – এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই সন্ধিতে নাটকের মুখ্যফল সম্পাদিত হয় বলে, এর নাম নির্বহণ। নাটকীয় ব্যাপার অর্থাৎ action এখানে-ই শেষ হয় বলে এই সন্ধির অপর নাম 'উপসংহৃতি' ।

নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে, বীজাদি পঞ্চবিধ অবস্থা বিভিন্ন স্থায়িভাব, ব্যভিচারিভাব ও সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা মণ্ডিত হয়। অবস্থাসমূহের সঙ্গে সংযোগের কারণে মুখাদি সন্ধিগুলি-ও নানাবিধ ভাবের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে ওঠে। সুখপ্রাপ্তিরূপ মুখ্যফলের ক্ষেত্রে সন্ধিগুলিতে রতি-হাস-উৎসাহ-বিস্ময় প্রভৃতি স্থায়িভাবের এবং ধৃতি-গর্ব-ঔৎসুক্য-মদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের প্রাধান্য থাকে। অন্যদিকে

দুঃখহানিরূপ মুখ্যফলে ক্রোধ-শোক-ভয়-জুগুপ্সা ইত্যাদি স্থায়িভাব এবং আলস্য-উগ্রতা ইত্যাদি ব্যভিচারিভাবের বাহুল্য থাকে। উভয়বিধাত্মক ফললাভের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও পাত্র-পাত্রীর স্বভাববিচারপূর্বক বিবিধ ভাবের প্রয়োগ হয়। উক্ত বিষয়ের সমর্থনে অভিনবভারতীর অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে – 'যদা তু সুখপ্রাপ্তেঃ ফলবত্ত্বং তদা রতিহাসাদিবাহুল্যং প্রারম্ভাদীনাং; দুঃখহানেস্তু ফলত্বে ক্রোধশোকাদিদুঃখাত্মকভাবাদ্ বাহুল্যং; উভয়ত্র স্বোচিতব্যভিচারিসহিতং দ্রষ্টব্যম্' (না.শা. উনবিংশ অধ্যায়)। নির্বহণসন্ধি নামক রূপকের অন্তিম অংশে স্থায়ী-ব্যভিচারী-সাত্ত্বিকভেদে যাবতীয় ভাব এবং তদুদ্রিক্ত যাবতীয় রসের সামগ্রিক এবং সক্রিয় সংহতিসাধন ঘটে ।

যেহেতু রূপকে কোনো কাহিনীর প্রারম্ভ হলে, তার সমাপ্তি-ও অবশ্যকর্তব্য, তাই মুখসন্ধির মত নির্বহণসন্ধি-ও সর্বপ্রকার রূপকে অবশ্য প্রযোজ্য। লক্ষণোক্ত 'ধ্রুবম্' পদটির ব্যাখ্যায় নাট্যদর্পণের টীকায় তাই বলা হয়েছে – 'ধ্রুবমিতি প্রারম্ভস্য নির্বাহাবিনাভাবিত্বাৎ সর্বরূপকেস্বস্যাবশ্যম্ভাবমাহ'।[৭১]

নাট্যদর্পণে নির্বহণসন্ধির উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী'-র উল্লেখ করা হয়েছে। এই নাটিকার চতুর্থ তথা অন্তিম অঙ্কে উপনিবদ্ধ ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ করে অবশেষে উদয়ন ও রত্নাবলীর মিলনরূপ মুখ্য ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত নির্বহণসন্ধির বিস্তার।

নাট্যদর্পণের টীকায় জনৈক পূর্বাচার্যের দ্বারা কথিত নির্বহণসন্ধির অপর একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে । তদনুসারে, আরম্ভাদি অবস্থা তথা মুখাদি সন্ধিতে বিন্যস্ত যাবতীয় ঘটনাবলীর সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ হয় রূপকের যে অন্তিম অংশে, তাকে-ই নির্বহণসন্ধি বলা হয়। টীকাতে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে এভাবে – 'কেচিত্তু মুখাদয়ঃ সন্ধয়ো2বস্থাশ্চ যত্র পৃথক্- পৃথক্ সংক্ষেপতঃ পুনরুল্লিখ্যন্তে, তং নির্বহণসন্ধিমাহুঃ'।[৭২] নাট্যদর্পণকাররা স্বরচিত 'সত্যহরিশ্চন্দ্র' শীর্ষক রূপকের ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে এই মতটির সমর্থনসূচক একটি শ্লোকের উদাহরণ দিয়েছেন –

দেবঃ –

" আখেটো মুনিকন্যকা কুলপতিঃ কীরঃ শৃগালো2ধ্বগাঃ

বিপ্রো ম্লেচ্ছপতির্মনুষ্যমরণং লম্বস্তনী মান্ত্রিকঃ ।

উদ্‌বদ্ধঃ পুরুষো বিয়চ্চরবধূর্গোমায়ুনাদঃ ফণী

সর্বসত্ত্বপরীক্ষণোৎসুকরসৈরস্মাভিরেতৎ কৃতম্॥"

–রূপকের অন্তিম অংশে উল্লিখিত এই শ্লোকে মৃগয়াদির দ্বারা মুখসন্ধি; 'কীর' অর্থাৎ টিয়াপাখির উল্লেখের দ্বারা প্রতিমুখসন্ধি; পর্যটকের দ্বারা গর্ভসন্ধি এবং বিভিন্ন মনুষ্যের কার্যকলাপের দ্বারা

বিমর্শসন্ধিতে বিধৃত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সূচনা করা হয়েছে । অতএব শেষোক্ত লক্ষণ অনুসারে এটি নির্বহণসন্ধির উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রোক্ত নির্বহণসন্ধিলক্ষণটি হল –

"সমানয়নমর্থানাং মুখার্থানাং সবীজিনাম্ ।
নানাভাবোত্তরাণাং যদ্ ভবেন্নির্বহণং তু তৎ ॥" (না.শা. ১৯/৪৩)

–মুখাদিতে প্রতিপাদিত বীজযুক্ত বিষয়সমূহের পরিণতি ও ফলের সঙ্গে যোগকে-ই নির্বহণ আখ্যা দেওয়া হয়।

নির্বহণসন্ধির দশরূপকধৃত লক্ষণটি-ও নাট্যশাস্ত্রানুসারী –

"বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্ ॥
ঐকার্থ্যমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।" (দশ.রূ. ১/৪৮,৪৯)

– অর্থাৎ মুখাদি সন্ধিতে প্রকীর্ণ বীজ রূপকের যে স্থানে এসে সংহতভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থে উপনীত হয়, সেই সন্ধিকে-ই নির্বহণসন্ধি বলা হয়। ভাবপ্রকাশন এবং পরবর্তী সাহিত্যদর্পণে দশরূপকোক্ত লক্ষণটির-ই প্রায় অবিকল পুনরুক্তি করা হয়েছে।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও মুখাদি সন্ধিচতুষ্টয়ে প্রস্তাবিত বীজাদি ব্যাপারের নিঃশেষ সমাপ্তিকে নির্বহণসন্ধি বলা হয়েছে– 'পূর্বং প্রস্তাবিতানাং বীজাদীনামর্থানাং যত্র নিব্যূঢ়তয়া সমাপনং তন্নির্বহণমিত্যর্থঃ' (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)। আচার্য সাগরনন্দী উল্লিখিত মাতৃগুপ্তসম্মত নির্বহণসন্ধিলক্ষণে এর তিনটি অংশের উল্লেখ করা হয়েছে – অভীষ্ট লাভ, সিদ্ধি এবং নির্বাহ–

"অভিপ্রেতার্থসম্পত্তিঃ সিদ্ধিঃ সাধ্যস্য সিদ্ধতা ।
প্রারব্ধস্য চ নির্বাহো ভবেন্নির্বহণে ত্রয়ম্ ॥" (না.ল.র.সপ্তম অধ্যায়)

– 'অভীষ্টলাভ' অর্থাৎ অভিপ্রেত বিষয়ের পুষ্টি; 'সিদ্ধি' অর্থাৎ সাধ্যের সিদ্ধভাব এবং 'নির্বাহ' অর্থাৎ প্রারব্ধ কার্যের নির্বহণ।

মুখ্যতঃ এই হল নাটকের পঞ্চবিধ সন্ধির মূল তত্ত্ব। দৃশ্যকাব্যে মুখ্য ফললাভের মুখ্য উপায় অর্থাৎ হেতুস্বরূপ বীজের এভাবে-ই প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি ঘটে। ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন– " প্রথমে বীজ, পরে অঙ্কুর, এই অঙ্কুরের প্রথমে ঈষৎ, পরে পূর্ণ প্রকাশ, অতঃপর প্রকাশিত অঙ্কুরের বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পথে বাধা ও অবশেষে ফল, ইহাই সকল দেশের নাট্যরচনার গতিপ্রকৃতি ।"[৭৩]

সন্ধ্যঙ্গসমূহ ঃ

নাট্যদর্পণের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি হল সন্ধ্যঙ্গ। এদের প্রয়োগাবসরবিষয়ে বলা হয়েছে, যেহেতু প্রতিটি রূপকের আদিতে মুখসন্ধি এবং অন্তিমে নির্বহণসন্ধি থাকবে-ই, অতএব সর্বপ্রকার রূপকে মুখসন্ধ্যঙ্গ এবং নির্বহণসন্ধ্যঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। প্রতিমুখাদি সন্ধির অঙ্গগুলির প্রয়োগ অনুসারে সন্নিবেশ ঘটে। সন্ধ্যঙ্গগুলি সর্বদা প্রস্তাবনার পরবর্তী অংশে প্রযুক্ত হবে। কারণ, প্রস্তাবনা মূল নাটকের অংশ নয়। অভিনবভারতীতে-ও বলা হয়েছে – 'প্রস্তাবনা ন তাবদ্রূপকাঙ্গং নটবৃত্তব্যাপ্ততয়েতিবৃত্তাননুপ্রবেশাত্' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়); অতএব সেখানে সন্ধি বা সন্ধ্যঙ্গের অবতারণার প্রশ্ন ওঠে না।

নাট্যদর্পণে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, একটি বিশেষ সন্ধ্যঙ্গ কেবলমাত্র একটি-ই বিশেষ সন্ধির অন্তর্ভাবে প্রযুক্ত হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; সেটি অন্য সন্ধির অঙ্গরূপে-ও প্রযুক্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, চৌষট্টি প্রকার সন্ধ্যঙ্গের অল্প কতগুলি ব্যতীত অন্য সবগুলি-ই নির্দিষ্ট সন্ধি বাদে-ও অন্যত্র প্রযুক্ত হয়। এই সন্ধ্যঙ্গটি এই সন্ধির অন্তর্গত – এরূপ প্রসিদ্ধির অর্থ হল, এই অঙ্গটি এই সন্ধিতে-ই অধিকাংশ সময় প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনে এদের অন্যত্র প্রয়োগে-ও কোনো বাধা নেই। উল্লেখ্য, অভিনবভারতী-তে এই মত-ই পোষণ করা হয়েছে। সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগবিষয়ে উদ্ভট প্রমুখ পূর্বাচার্যগণ সন্ধি এবং ক্রমে যে নিয়মের আবশ্যিকতার কথা বলেছেন, অভিনবগুপ্ত তার বিরোধিতা করেছেন। স্থানব্যত্যয়ের উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের অংশবিশেষের উল্লেখ করা হচ্ছে, যেখানে মুখসন্ধির অঙ্গ যুক্তি, গর্ভসন্ধিতে প্রযুক্ত হয়েছে (''তেজস্বী রিপুহতবহুদুঃখপারম্''–এই অংশে); কিন্তু রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত না ঘটায় এই প্রয়োগ দোষাবহ হয়নি।

অতএব রসাভিব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে নাটকে সন্ধ্যঙ্গসমূহের প্রয়োগ করতে হবে, কেবলমাত্র তাত্ত্বিক নিয়ম পালন করলে চলবে না। অনির্ধারিত ক্ষেত্রে সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ যদি নাট্যরসকে উজ্জীবিত করে, তবে তা কখনো-ই দোষের কারণ হতে পারে না। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে–

''যথাসন্ধি তু কর্তব্যান্যেতান্যঙ্গানি নাটকে।

কবিভিঃ কাব্যকুশলৈঃ রসভাবানবেক্ষতু॥'' (না.শা. ১৯/১০৪,১০৫)

'যথাসন্ধি' অংশের ব্যাখ্যায় অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে, রসস্ফুরণের প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গগুলির প্রয়োগ হবে, নিয়ম অনুসারে নয়– 'যথাসন্ধিকৃতঃ কর্তব্যানীতি বচনং প্রত্যুত সন্ধ্যৌচিত্যেনৈষাং নিবন্ধনম্' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। পরভাবী বিশ্বনাথের-ও মতে –

''রসব্যক্তিমপেক্ষ্যৈষামঙ্গানাং সন্নিবেশনম্ ।

ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥'' (সা.দ. ৬/১২০)

নাটকচন্দ্রিকায় রূপগোস্বামী-ও বলেছেন –

''রসভাবানুরোধেন প্রয়োজনমবেক্ষ্য চ।

সাফল্যং কার্যমঙ্গানামিত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে ॥''(না.চ.শ্লোকসংখ্যা –৩৩৭)

নির্দিষ্ট ক্রমে সন্ধ্যঙ্গগুলির বিন্যাস করতে হবে, অভিনবগুপ্ত এই মত-ও সমর্থন করেননি– ''ন চ ক্রমেণানেনৈব তানি প্রযোজ্যানীতি বচনমস্তি। সদপি বা ন্যায়াপেতম্'' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

অতএব দেখা গেল, রসপ্রধান নাটকে রসস্ফুরণের ব্যাঘাত না ঘটলে অনির্দিষ্ট সন্ধিতে এবং অনির্দিষ্ট ক্রমে সন্ধ্যঙ্গসমূহের প্রয়োগ দূষণীয় নয়। আবার একটি সন্ধির অন্তর্গত সবকটি অঙ্গ যে এক-ই সন্ধিতে অবশ্য প্রযোজ্য, তা-ও নয়। অনেক আলঙ্কারিক সন্ধ্যঙ্গগুলিকে মুখ্য ও গৌণ বা প্রধান ও অপ্রধান ভেদে দুইভাগে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে, প্রধান অঙ্গগুলি নাটকে অবশ্য-ই থাকতে হবে, অপ্রধানগুলির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। নাট্যদর্পণে এমনকি এ-ও বলা হচ্ছে, কিছু সন্ধ্যঙ্গকে অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত করে সন্ধ্যঙ্গের সংখ্যা হ্রাস করা-ও সম্ভবপর – 'সংখ্যাসংক্ষেপশ্চাঙ্গানাং পরস্পরান্তর্ভাবে'।[৭৪] কিন্তু পূর্বাচার্যদের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এবং অঙ্গসমূহের বৈচিত্র্যসৃষ্টির সূক্ষ্ম পার্থক্যবশতঃ চৌষট্টি প্রকার অঙ্গ-ই স্বীকৃত হয়েছে।

অনন্তর সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগের প্রয়োজন। নাট্যশাস্ত্রে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারে সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োজন বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'উদাত্ত' অর্থাৎ মহৎ কাব্য-ও অঙ্গহীন অবস্থায় প্রযুক্ত হলে সহৃদয়ের মনোরঞ্জন করে না; বিপরীতে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কাব্য অঙ্গসমূহের সুষ্ঠু প্রয়োগবলে সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারে। এমন কথা-ও বলা হচ্ছে যে, অঙ্গহীন ব্যক্তি যেমন কোনো কাজ আরম্ভ করতে পারে না, অঙ্গহীন কাব্য-ও তেমনি প্রয়োগের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না –

''অঙ্গহীনো নরো যদ্বন্নৈবারম্ভক্ষমো ভবেৎ।

অঙ্গহীনং তথা কাব্যং ন প্রয়োগক্ষমং ভবেৎ ॥'' (না.শা. ১৯/৫৩)

নাট্যদর্পণে সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগের প্রধানতঃ দুই প্রকার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি হল, নাটকের মূল কাহিনীকে বিস্তারিত করা। যেকোনো নাটকের মূল বৃত্তটি আয়তনে অতি সামান্য। সেই সামান্য বিষয়কে পল্লবিত করে, গুণালঙ্কারাদির প্রবেশে রসসৃষ্টি করে সহৃদয়ের কাছে নিবেদন করার অবসর সৃষ্টি করে সন্ধ্যঙ্গগুলি। অন্যথা নাটকাদি রূপকের আয়তনবৃদ্ধি হতে পারে না। টীকাতে উদাহরণমুখে বলা হচ্ছে, রামায়ণের কাহিনীকে সামান্য কয়েকটি বাক্যে বিধৃত করা যায় – শ্রীরামের পত্নী রক্ষোরাজ রাবণের দ্বারা অপহৃতা হলেন, রাম জটায়ুর সহায়তায় সুগ্রীবের বানররাজ্যে গমন করলেন, বানরসেনার সাহায্যে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে রাবণকে নিধন করে

সীতাকে উদ্ধার করলেন – এই হল রামকাহিনীর সার। কিন্তু এই সূত্রাকার কাহিনী কখনো-ই প্রয়োগযোগ্য হতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন কাহিনীবিস্তারণার, যা সম্ভব হয় সন্ধ্যঙ্গসমূহের সন্নিবেশের মাধ্যমে। নাট্যশাস্ত্রে এই কথা-ই বলা হয়েছে – 'ইষ্টার্থস্য রচনা' (না.শা. ১৯/৫১)। উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলছেন – 'অভীষ্টস্য প্রয়োজনস্য রসাস্বাদকৃতঃ রচনা বিস্তারণা'(না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)। নাট্যশাস্ত্রে আরো বলা হচ্ছে, সন্ধ্যঙ্গের আরেকটি প্রয়োজন হল– 'প্রকাশ্যানাং প্রকাশনম্'(না.শা.১৯/৫২) – অর্থাৎ কেবলমাত্র সামগ্রিক রূপকের-ই নয়, তার সঙ্গে-সঙ্গে রূপকের অন্তর্গত ঘটনাবিশেষের-ও বিস্তারণার কাজ করে সন্ধ্যঙ্গ।

অতএব অভীষ্ট বিষয়ের যথাযথ বিন্যাসে রচনা এবং প্রয়োজনে ঘটনাবিশেষকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা সন্ধ্যঙ্গসমূহের প্রথম উপযোগিতা। অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে,এটি হল সন্ধ্যঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন; সন্ধ্যোপাসনাদির ন্যায় অদৃষ্ট প্রয়োজন বা পূর্বরঙ্গাদির ন্যায় উভয়রূপ প্রয়োজন নয় – ''আদ্যন্তু প্রয়োজনং চমৎকারকৃতং স্মৃতিদৃষ্টমপি প্রত্যক্ষবিশেষসিদ্ধমেব। ন তু সন্ধ্যোপাসনাদিবদদৃষ্টং নাপি পূর্বরঙ্গাঙ্গবদুভয়রূপমিত্যর্থঃ'' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগের দ্বিতীয় প্রয়োজন হল চমৎকারিত্বসৃষ্টি । রামকাহিনীর উদাহরণটি দিয়ে-ই বলা যেতে পারে, ক্ষুদ্রায়তন হলে এই কাহিনীটির চমৎকারিত্বসৃষ্টির সম্ভাবনা হত স্বল্প। প্রারম্ভাদি পঞ্চ অবস্থা , বীজাদি পঞ্চ উপায় এবং মুখাদি পঞ্চ সন্ধি সমন্বিত হলে-ও , সন্ধ্যঙ্গগুলির অসন্নিবেশে এর যথাযথ বিস্তার ঘটতে পারত না এবং সেক্ষেত্রে নাটকীয় অভিনবত্বসৃষ্টির অবকাশ-ও পাওয়া যেত না। অতএব প্রয়োগকে আশ্চর্যমণ্ডিত করে তুলে দর্শকচিত্তে আনন্দদান সন্ধ্যঙ্গের সুষ্ঠু প্রয়োগ ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, বহুশ্রুত কোনো কাহিনী-ও সন্ধ্যঙ্গের সুদক্ষ প্রয়োগে নতুন মাত্রা লাভ করে – 'পুনরুচ্যমানমপি বৃত্তমঙ্গভঙ্গ্যা নিবদ্ধমপুনরুক্তমিবাভাতি'।[৭৫]অভিনবভারতীতে-ও এই কথা বলা হয়েছে – 'পুনঃ পুনঃ শ্রুতমপি যদভিখ্যানং ইতিবৃত্তং তত এব নাশ্চর্যকারি তদপি অঙ্গযোজনায়ামপূর্বতামিব দধদদ্ভুততামেতি' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। কেবলমাত্র চমৎকারিত্বসৃষ্টি-ই নয়, দর্শকচিত্তে কৌতুহল এবং নাটকীয় উৎকণ্ঠা অব্যাহত রেখে কাহিনীর অভিনবত্ব অবিনষ্ট রাখা-ও সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগের দ্বারা-ই সম্ভব। নাট্যশাস্ত্র এবং দশরূপকে এই প্রয়োজনটিকে বলা হচ্ছে – 'বৃত্তান্তস্যানুপক্ষয়ঃ' (না.শা. ১৯/৫১) ।

নাট্যদর্পণের এই সন্ধ্যঙ্গবিষয়ক আলোচনা বহুলাংশে নাট্যশাস্ত্র ও অভিনবভারতীটীকা এবং দশরূপকের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সন্ধ্যঙ্গের যে ষড়্‌বিধ প্রয়োজনের উল্লেখ রয়েছে, নাট্যদর্পণে সেগুলি-ই একটু সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সন্ধ্যঙ্গের একটি প্রয়োজনরূপে গোপনীয় বিষয়কে গোপন রাখার কথা বলা হয়েছে ('গোপ্যগুপ্তিঃ'), নাট্যদর্পণে এই

বিষয়টি অস্পৃষ্ট – এইমাত্র প্রভেদ। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ-ও তাঁর সাহিত্যদর্পণে সন্ধ্যঙ্গের এই ষড়্বিধ প্রয়োজন স্বীকার করেছেন –

"ইষ্টার্থরচনাশ্চর্যলাভো বৃত্তান্তবিস্তরঃ।

রাগপ্রাপ্তিঃ প্রয়োগস্য গোপ্যানাং গোপনং তথা।

প্রকাশনং প্রকাশ্যানামঙ্গানাং ষড়্বিধং ফলম্ ॥" (সা.দ. ৬/১১৬,১১৭)

পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ প্রমুখ আলঙ্কারিক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগকর্তা বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। যেমন – নায়ক ও প্রতিনায়ক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ করবেন; অন্যথায় পতাকাদিতে, অথবা তা-ও না হলে অন্যান্য নাট্যলক্ষণাদিতে সন্ধ্যঙ্গ সম্পাদন করতে হবে। সন্ধ্যঙ্গগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকের প্রধান পুরুষপাত্রের দ্বারা প্রযোজিত হবে; কিন্তু উপক্ষেপাদি তিনটি মুখসন্ধ্যঙ্গ বীজার্থের স্বল্পপ্রকাশহেতু কোনো অপ্রধান পাত্রের দ্বারা প্রয়োগ করানো যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি। এবিষয়ে নাট্যদর্পণে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

এবার ক্রমান্বয়ে চৌষট্টি প্রকার সন্ধ্যঙ্গের সোদাহরণ লক্ষণ আলোচনা করা হচ্ছে। মুখসন্ধির বারোটি অঙ্গ দিয়ে আলোচনার আরম্ভ হবে –

মুখসন্ধ্যঙ্গ ঃ

পঞ্চসন্ধির মধ্যে প্রথম হল মুখসন্ধি। তাই নাট্যদর্পণে সন্ধ্যঙ্গবিষয়ক আলোচনার সূচনা করা হচ্ছে মুখসন্ধির অঙ্গগুলির দ্বারা। মুখসন্ধির অঙ্গসংখ্যা বারোটি – উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, সমাহিতি, উদ্ভেদ,করণ, বিলোভন, ভেদ, প্রাপণ, যুক্তি, বিধান এবং পরিভাবনা। এগুলির মধ্যে প্রথম ছয়টি একান্তভাবে কেবলমাত্র মুখসন্ধিতে প্রযুক্ত হয়, অন্য কোনো সন্ধিতে নয়। এই ছয়টি অঙ্গের প্রথম তিনটিকে কারিকায় উক্ত ক্রমে এবং মুখসন্ধির প্রথমাংশে, চতুর্থটিকে মধ্যাংশে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্গদুটিকে শেষাংশে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। প্রথম পাঁচটি এবং ভেদ নামক অঙ্গটি মুখসন্ধিতে অপরিহার্য। বিলোভনাদি ছয়টি অঙ্গ মুখসন্ধিতে অপরিহার্য নয়;প্রয়োজনানুসারে এদের প্রয়োগ হতে পারে। ভেদ নামক অঙ্গটি, যা পাত্রবিশেষের প্রস্থানসময়ে প্রযুক্ত হয়, স্বাভাবিকভাবে-ই প্রবেশক-বিষ্কম্ভকের শেষে অথবা অঙ্কের শেষে নিবিষ্ট হবে, অন্যত্র নয়।

ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে-ও মুখসন্ধির বারোটি অঙ্গ-ই স্বীকৃত হয়েছে। তবে নাট্যদর্পণোক্ত 'সমাহিতি' ও 'প্রাপণ'-এর পরিবর্তে 'সমাধান' ও 'প্রাপ্তি' নামদুটি গ্রহণ করা হয়েছে। দশরূপক-সাহিত্যদর্পণাদি পরবর্তী প্রায় সকল গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রকে অবিকল অনুসরণ করা হয়েছে। আচার্য

সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে মুখসন্ধ্যঙ্গের ভরতকথিত লক্ষণগুলি-ই অবিকল উদ্ধারপূর্বক আলোচনা করেছেন।

১. উপক্ষেপ – উপক্ষেপের লক্ষণ নির্ণয় করে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'বীজস্যোপ্তিরুপক্ষেপঃ' (না.দ.১/৪৩) – বিস্তৃত কাব্যার্থের মূলীভূত অংশ অর্থাৎ বীজের প্রথম সূচনা হয় মুখসন্ধির যে অঙ্গে, তার নাম উপক্ষেপ। কাব্যে রসস্ফুরণের প্রথম কারণ হল বীজ, যা বিবিধভাবে পল্লবিত হয়ে নাটকীয় কথাবস্তুকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এই বীজের প্রথম উপস্থাপনাকে-ই বলা হয় উপক্ষেপ। সাহিত্যদর্পণের মিতভাষিণীটীকায় বলা হয়েছে – 'উপক্ষেপণম্ আদৌ নাট্যকারেণ উপস্থাপনমিত্যুপক্ষেপঃ'।[৭৬]

নাট্যশাস্ত্রে উপক্ষেপলক্ষণে বলা হচ্ছে – 'কাব্যার্থস্য সমুৎপত্তিরুপক্ষেপ ইতি স্মৃতঃ' (না.শা.১৯/৬৯)। টীকায় বিস্তৃতভাবে বলা হচ্ছে, কাব্যশরীরের প্রধান অংশ যে রস, সেই রসোদ্ভবের প্রধান কারণ বীজ; তাকে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করে যে সন্ধ্যঙ্গ, তার-ই নাম উপক্ষেপ। পরবর্তীকালীন দশরূপক, সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে উপক্ষেপের অনুরূপ লক্ষণ-ই স্বীকৃত হয়েছে। নাটকচন্দ্রিকাকার রূপগোস্বামী-ও বলেছেন – 'উপক্ষেপস্তু বীজস্য সূচনং কথ্যতে বুধৈঃ'(না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ৭৮)।

উপক্ষেপের উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার প্রারম্ভের শ্লোকটি উদ্ধার করা হয়েছে –

''দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপিজলনিধের্দিশ্যো2প্যন্ত্যাৎ।

আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ ॥''

– মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের উদ্দেশ্য হল রত্নাবলীর সঙ্গে বৎসরাজ উদয়নের মিলনসাধন। এই মিলনে যে দৈবের আনুকূল্য আছে, উক্ত শ্লোকটিতে তা স্পষ্ট। এভাবে রত্নাবলীপ্রাপ্তিরূপ কার্যের বীজ উপন্যস্ত হওয়ায় এখানে উপক্ষেপ নামক মুখসন্ধ্যঙ্গ হয়েছে ।

২.পরিকর – নাট্যদর্পণধৃত পরিকরলক্ষণটি হল – 'স্বল্পন্যাসঃ পরিক্রিয়া' (না.দ. ১/৪৩)– উপক্ষেপে সংক্ষিপ্ত আকারে উপন্যস্ত বীজটি বিশেষবচনমুখে যে সন্ধ্যঙ্গে খানিকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তার নাম পরিক্রিয়া বা পরিকর। নাট্যশাস্ত্রে পরিকরের লক্ষণ হল – 'সমুৎপন্নার্থবাহুল্যং জ্ঞেয়ঃ পরিকরঃ পুনঃ' (না.শা. ১৯/৭০)। এখানে 'অর্থ' কথাটির অর্থ হল নাট্যপ্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের বাহুল্য বা বিস্তারে পরিকর নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়। দশরূপকে-ও বীজের বিস্তারকে পরিকর বলা হয়েছে – 'তদ্বাহুল্যং পরিক্রিয়া' (দশ.রূ. ১/২৭)। বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে নাট্যশাস্ত্রধৃত পরিকরলক্ষণটিকে উদ্ধার করেছেন। মিতভাষিণীটীকায় প্রাঞ্জলরূপে বলা হয়েছে – 'সমুৎপন্নস্য প্রাগেব জ্ঞাতস্য অর্থস্য

নাটকীয়বস্তুনঃ বীজস্যেতি ভাবঃ বাহুল্যং বহুলীকারঃ পূর্বাপেক্ষয়া অধিকতয়া আবির্ভাবঃ ইতি যাবৎ'।[৭৭]

পরিকরের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে ভট্টনারায়ণরচিত 'বেণীসংহার' নাটকে সহদেবের প্রতি ভীমসেনের উক্তি উদ্ধার করা হয়েছে –

''প্রবৃদ্ধং যদ্বৈরং মম খলু শিশোরেব কুরুভিঃ

ন তত্রার্যো হেতুর্ভবতি ন কিরীটী ন চ যুবাম্ ।

জরাসন্ধস্যোরঃস্থলমিব বিরূঢ়ং পুনরপি

ক্রুধা ভীমঃ সন্ধিং বিঘটয়তি যূয়ং ঘটয়তঃ ॥''

– এই নাটকের ''লাক্ষাগৃহানলবিষান্নসভাপ্রবেশৈঃ'' ইত্যাদি অংশে উপক্ষেপ নাম সন্ধ্যঙ্গে ভীম ধার্তরাষ্ট্রদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং উল্লিখিত ''প্রবৃদ্ধং যদ্বৈরং'' ইত্যাদি অংশে এই ক্রোধ আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এখানে পরিকর নামক মুখ্যসন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে। অভিনবভারতীতে-ও পরিকরের উদাহরণরূপে এই শ্লোকটি-ই ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. পরিন্যাস – উপক্ষেপে উপন্যস্ত এবং পরিকরে আংশিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নাট্যবীজটি যে অংশে নিশ্চিতরূপে, সন্দেহাতীতরূপে দর্শকহৃদয়ে উপস্থাপিত হয়, মুখসন্ধির সেই অঙ্গটির নাম পরিন্যাস। নাট্যদর্পণধৃত পরিন্যাসলক্ষণটি হল –'বিনিশ্চয়ঃ পরিন্যাসঃ'(না.দ.১/৪৩)। লক্ষণটির ব্যাখ্যাটি একান্ত ভাবে অভিনবভারতী-অনুসারী। সেখানে-ও বলা হচ্ছে – 'ততো2পি নিশ্চয়াপত্তিরূপতয়া পরিতো হৃদয়ে সো2র্থো ন্যস্যতে' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। সাহিত্যদর্পণের বৃত্তিতে বিশ্বনাথ কবিরাজ-ও এই ব্যাখ্যা-ই দিয়েছেন।

নাট্যশাস্ত্রমতে, উপন্যস্ত বীজের বাহুল্যে পরিকর, আর পরিকরের নিষ্পত্তি অর্থাৎ সিদ্ধিতে পরিন্যাস – 'তন্নিষ্পত্তিঃ পরিন্যাসঃ'(না.শা. ১৯/৭০)। দশরূপক এবং সাহিত্যদর্পণে অবিকল এই লক্ষণটি-ই উদ্ধৃত হয়েছে। নাটকচন্দ্রিকায় রূপগোস্বামী-ও বলেছেন – 'বীজনিষ্পত্তিকথনং পরিন্যাস ইতীর্যতে' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ৮৪)।

উপক্ষেপ-পরিকর-পরিন্যাস – এই তিনটি অঙ্গের-ই মুখ্য কাজ হল কাব্যার্থকে উপস্থাপিত করা। কিন্তু এই উপস্থাপনার মধ্যে একটি ক্রমিক পার্থক্য রয়েছে। উপক্ষেপ অংশে কাব্যার্থ অতি-সংক্ষেপে উপন্যস্ত হয়, পরিকর অংশে তদপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে এবং পরিন্যাস অংশে আরো বিস্তৃত হয়ে নিশ্চিতরূপে কাব্যার্থকে পাঠকচিত্তে উপস্থাপিত করে। কাব্যার্থপ্রকাশের বিভিন্ন তিনটি অবস্থার এরূপ ক্রমিক উপস্থাপনাহেতু এই তিনটি অঙ্গ সর্বদা এই ক্রমে-ই সন্নিবেশিত হয়। এই

পারম্পর্যবিষয়ে টীকায় তাই বলা হচ্ছে – 'অনুক্ষিপ্তশ্চার্থো ন বিস্তার্যতে, অবিস্তারিতশ্চ ন নিশ্চীয়ত ইতি ত্রয়াণামপ্যেষামুদ্দেশক্রমেণৈব নিবন্ধঃ'।[৭৮]

নাট্যদর্পণে পরিন্যাসের তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি 'রাঘবাভ্যুদয়'-এর মতিসাগর-জনক কথোপকথনের অংশবিশেষ, দ্বিতীয়টি 'বেণীসংহার'-এর প্রথমাঙ্কের "চঞ্চদ্ভুজভ্রমিত....." ইত্যাদি শ্লোকটি এবং তৃতীয়টি এঁদের রচিত 'রোহিণীমৃগাঙ্ক' প্রকরণের প্রথমাঙ্ক থেকে গৃহীত। এখানে তৃতীয়টি-ই উদ্ধার করা হল –

মৃগাঙ্কং প্রতি বসন্তঃ – "কুমার! মা শঙ্কিষ্ঠাঃ।

উন্মত্তপ্রেমসংরম্ভাদ্ আরভন্তে যদঙ্গনাঃ।

তত্র প্রত্যূহমাধাতুং ব্রহ্মা2পি খলু কাতরঃ ॥"

৪.সমাহিতি – সমাহিতি বা সমাধানের নাট্যদর্পণোক্ত লক্ষণটি হল – 'পুনর্ন্যাসো সমাহিতিঃ' (না.দ.১/৪৩)– মুখসন্ধির প্রথম তিনটি অঙ্গ দ্বারা উপস্থাপিত বীজের, বাগ্‌বৈচিত্র্যদ্বারে পুনরায় স্পষ্টতা প্রতিপাদন করার নাম সমাহিতি। এই অঙ্গটি নাটকের প্রধান নায়কের অনুমোদনে প্রযুক্ত হয়। 'সমাধান' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে অভিনবগুপ্তাচার্য তাই বলছেন – 'যস্মিন্ বীজং তদানীং প্রধাননায়কানুগতত্বেন সম্যগাহিতং ভবতীতি' (না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রে সমাধানের লক্ষণ হল – 'বীজার্থস্যোপগমনং সমাধানম্' (না.শা.১৯/৭২)। সাহিত্যদর্পণে-ও প্রায় অনুরূপভাবে সমাধানস্বরূপ নিরূপিত হয়েছে – 'বীজস্যাগমনং যত্তু তৎ সমাধানমুচ্যতে' (সা.দ. ৬/৮৫)। দশরূপকে-ও বলা হচ্ছে – 'বীজাগমঃ সমাধানম্' (দশ.রূ.১/২৮)। অর্থ এক-ই। 'আগম' বা 'আগমন' শব্দটির অর্থ পুনরায় আধান। বিবিধ কার্যবশতঃ নাট্যবীজ অলক্ষিতে চলে গেলে, মুখসন্ধির যে অংশে নাট্যকার পুনরায় তাকে স্থাপন করেন, তাই সমাধান – এই হল সারকথা।

নাট্যশাস্ত্র এবং পরবর্তী দশরূপকাদি গ্রন্থে 'বিলোভন' নামক সন্ধ্যঙ্গের স্থান চতুর্থ; সমাধান রয়েছে সপ্তম স্থানে। কিন্তু অঙ্গগুলির ক্রমবিন্যাসে যেহেতু নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, তাই নাট্যদর্পণে চতুর্থস্থানে সমাধানের আলোচনা করা হয়েছে।

'বেণীসংহার'-এর প্রথম অঙ্ক থেকে একটি শ্লোক সমাধানের উদাহরণরূপে উদ্ধার করা হয়েছে –

(নেপথ্যে) –"ভো ভোঃ! দ্রুপদ-বিরাট-বৃষ্ণ্যন্ধক-সহদেবপ্রভৃতয়ো2স্মদক্ষৌহিণীপতয়ঃ! কৌরবচমূপ্রধানাশ্চ যোধাঃ! শ্রূয়তাম্–

যৎ সত্যব্রতভঙ্গভীরুমনসা যত্নেন মন্দীকৃতং

যদ্বিস্মর্তুমপীহিতং শমবতা শান্তিং কুলস্যেচ্ছয়া।

তদ্‌দ্যূতারণিসম্ভৃতং নৃপসুতাকেশাম্বরকর্ষণৈঃ

ক্রোধজ্যোতিরিদং মহৎকুরুবনে যৌধিষ্ঠিরং জৃম্ভতে ॥"

– প্রথমাঙ্কের "স্বস্থা ভবন্তি...." ইত্যাদি শ্লোকাংশে ভীমসেনের বাক্যে যে বীজের সূচনা হয়েছিল, এই শ্লোকটিতে নাটকের প্রধান নায়ক যুধিষ্ঠিরের দ্বারা তা অনুমোদিত হয়েছে। অতএব এটি সমাধান নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

দশরূপকে 'বেণীসংহার'-এর "চঞ্চদ্‌ভুজভ্রমিত ...." ইত্যাদি শ্লোকটি সমাধানের উদাহরণরূপে উদ্ধার করা হয়েছে, যেটি নাট্যদর্পণাদি অন্য সকল গ্রন্থে পরিন্যাসের উদাহরণরূপে গৃহীত।

৫.উদ্ভেদ – উদ্ভেদের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'স্বল্পপ্ররোহ উদ্ভেদঃ' (না.দ. ১/৪৪) – নাট্যবীজের প্রথম প্রকাশ হল উদ্ভেদ। প্রস্তাবনার পরবর্তী অংশে উপ্ত এই বীজটি মুখসন্ধির যে অঙ্গে নাটকীয় কার্যসাধনের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রয়াস করে, তার নাম উদ্ভেদ। যেমনভাবে ভূমিন্যস্ত বীজ ভূমিকে উদ্ভিন্ন করে প্রকাশিত হয়, তেমনিভাবে নাট্যবীজ প্রথম উদ্ভিন্ন হয় এই অংশে। এটি কিন্তু বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম নয়, ভূমি বিদীর্ণ করে বীজের প্রথম প্রকাশমাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নয়। প্রতিমুখসন্ধিতে-ও বীজের প্রকাশ ঘটে। প্রতিমুখসন্ধির লক্ষণে-ই বলা হচ্ছে, মুখসন্ধিতে উপ্ত বীজটি কখনো লক্ষিত, কখনো অলক্ষিতভাবে, কখনো অনুকূল, কখনো প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যেখানে প্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি-ই প্রতিমুখসন্ধি। কিন্তু উদ্ভেদ নামক অঙ্গটিতে বীজের প্রথম উৎপত্তি, প্রকাশ নয়। এ যেন ভূমিতে উপ্ত বীজের প্রথম আলোকদর্শন, উদ্‌গম নয়। উদ্ভেদ নামক অঙ্গটি এই কারণে-ই মুখসন্ধির অঙ্গ, প্রতিমুখসন্ধির নয়। অভিনবভারতীতে বিশদে বলা হচ্ছে – 'ন চেদমুদ্‌ঘাটনং যেন প্রতিমুখং ভবেৎ, ... উদ্ঘাটনেন বিনাপি প্ররোহমাত্রমনুস্থানানুগুণ্যাৎ ভূমিসংশ্লেষ ইব বীজস্য' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রে উদ্ভেদের লক্ষণ হল – 'বীজার্থস্য প্ররোহো যঃ স উদ্ভেদ ইতি স্মৃতঃ' (না.শা.১৯/৭৪)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে উদ্ভেদের সংজ্ঞারূপে নাট্যশাস্ত্রের মত-ই উদ্ধৃত হয়েছে। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হচ্ছে – 'বীজার্থস্য প্ররোহঃ স্যাদুদ্ভেদঃ'(সা.দ.৬/৮৬)। নাটকচন্দ্রিকাতে রূপগোস্বামী বলছেন – 'বীজস্য তু য উদ্ঘাটঃ স উদ্ভেদ ইতি স্মৃতঃ' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ১১১)– অর্থাৎ বীজের প্রথমতম উদ্ঘাটন হল উদ্ভেদ– এই হল সর্বসম্মত অভিমত।

নাট্যদর্পণে 'বেণীসংহার' থেকে উদ্ভেদের উদাহরণ গৃহীত হয়েছে। দ্রৌপদীর "নাথ! পুনরপি ত্বয়া2গত্যাহং সমাশ্বাসয়িতব্যা"–এই বচনের উত্তরে ভীমসেন বলছেন –

"অয়ি ! কিমদ্যাপ্যলীকশ্বাসনাভিঃ!

ভূয়ঃ পরিভবক্লান্তিলজ্জাবন্ধুরিতাননম্।

অনিঃশেষিতকৌরবং ন পশ্যসি বৃকোদরম্ ॥"

–কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব চলছে। এমতাবস্থায় যুদ্ধ হবে কিনা, এ বিষয়ে পাঞ্চালী সংশয়ের মধ্যে আছেন। এমন সময় যুদ্ধের দুন্দুভি শুনে দ্রৌপদী বৃকোদরকে আশ্বস্ত করতে বলায় ভীমসেন এই বাক্য বলছেন। ভীমসেনের ক্রোধোদ্দীপক বাক্য-ই এই নাটকের বীজ। আলোচ্য অংশে সেই বীজ নাটকীয় কার্যসাধনের জন্য প্রথম পরিস্ফুট হচ্ছে বলে, এটি উদ্ভেদ নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ। অভিনবভারতীতে-ও এটি উদ্ভেদের উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

নাট্যদর্পণে উদ্ভেদের অপর একটি লক্ষণ-ও উল্লেখ করা হয়েছে, যেটি অন্যান্য কিছু আচার্যের অভিমত। এঁদের মতানুসারে – 'গূঢ়ভেদনমুদ্ভেদঃ' [৭৯]– অর্থাৎ গূঢ় বা গোপন বীজের প্রকটনের নাম উদ্ভেদ। যেমন – রত্নাবলী নাটিকার প্রথমাঙ্কে "অস্তাপাস্তসমস্তভাসি" ইত্যাদি বৈতালিকের স্তুতিতে প্রথমে কুসুমায়ুধের ছলে বৎসরাজ উদয়নের প্রকৃত সত্তা তিরোহিত হয়েছিল। কিন্তু বৈতালিকের উক্তির শেষাংশে ('উদয়নস্যেন্দোরিবোদ্বীক্ষতে') 'উদয়ন' শব্দের দ্বারা সেই গূঢ় বস্তু প্রকাশিত হওয়ায় এখানে উদ্ভেদ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণটি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্ররচিত 'রাঘবাভ্যুদয়' থেকে গৃহীত, যেখানে কামদেবরূপে প্রতিভাত রামচন্দ্রের স্বরূপ লবঙ্গিকার কথার দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে।

গুপ্ত বীজের প্রকাশ উদ্ভেদ – এই অভিমতটি একান্তভাবে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের । প্রথম উদাহরণটি-ও দশরূপক থেকে-ই গৃহীত।

৬.করণ – করণের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'করণং প্রস্তুতক্রিয়া' (না.দ.১/৪৪)– রূপকে কথানুরূপ প্রকৃত কার্যের আরম্ভ যেখানে সূচিত হয়, রূপকের সেই অংশকে করণ বলে। কার্য শুরু হওয়ার পর কখনো কখনো অন্যান্য বিষয়ের উপস্থাপনার জন্য নাট্যবীজ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অলক্ষিতে চলে যায়। তখন এই সন্ধ্যঙ্গের মাধ্যমে যথার্থ নাটকীয় কার্যারম্ভ সূচিত হয়। কোথাও আবার এই সন্ধ্যঙ্গের দ্বারা পরবর্তী অঙ্কের বৃত্ত অভিব্যঞ্জিত হয়। তাই প্রকৃত কার্যারম্ভকে করণ বলা হয়।

নাট্যশাস্ত্রধৃত করণের লক্ষণটি হল – 'প্রকৃতার্থসমারম্ভঃ করণং নাম তদ্ভবেৎ' (না.শা. ১৯/৭৪) । সাহিত্যদর্পণ ও দশরূপকে অনুরূপ অভিমত পোষণ করা হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'করণ'-এর পরিবর্তে 'কারণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যদি-ও নির্ণীত লক্ষণটি এক-ই।

নাট্যদর্পণে করণের প্রথম উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর প্রথমাঙ্কের নিম্নলিখিত অংশটি উল্লেখ করা হয়েছে –

''সহদেব – 'আর্য! গচ্ছামো বয়ং গুরুজনানুজ্ঞাতা বিক্রমানুরূপমাচরিতুম্। ভীমঃ – এতে চ বয়মুদ্যতা এবার্যস্যাজ্ঞামনুষ্ঠাতুম্ ।''

– উল্লিখিত অংশে সহদেব ও ভীমসেনের কথোপকথনের দ্বারা পরবর্তী অঙ্কে প্রস্তূয়মান যুদ্ধারম্ভ সূচিত হওয়ায় করণ নামক মুখসন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্ররচিত 'যাদবাভ্যুদয়' থেকে গৃহীত, যেখানে কংসের উক্তির মাধ্যমে পরবর্তী অঙ্কে প্রস্তূয়মান মল্লরঙ্গভূমির সূচনা হচ্ছে।

নাট্যদর্পণে করণের অপর একটি লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। এই মতানুসারে, আশীর্বাদ ইত্যাদির দ্বারা বিপদের প্রশমনকে করণ বলা হয়েছে। এর উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এ ভীমের প্রতি দ্রৌপদীর – 'জং অসুরসমরাভিমুহস্‌স হরিণো মঙ্গলং তং তুম্‌হাণং ভোদু'– এই উক্তিটির উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই অভিমতের প্রবক্তা বলতে কোন্ আচার্যর কথা বলা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।

৭. বিলোভন – নাট্যদর্পণে বিলোভনের লক্ষণ হল – 'বিলোভনং স্তুতের্গার্ধ্যম্' (না.দ.১/৪৪) – নাট্যফলের সাথে সম্বদ্ধ কোনো বস্তু বা প্রধান কোনো গুণবান্ নাটকীয় চরিত্রের স্তুতির নাম বিলোভন। নাট্যবীজের কোনো প্রয়োজনীয় অংশের প্রশংসা করে প্রেক্ষকসাধারণের গোচরীভূত করা হলে তাকে-ও বিলোভন আখ্যায় অভিহিত করা হয়। তবে প্রধানতঃ নায়কাদির বীরত্বশৌর্যবীর্যাদি গুণবর্ণনাত্মক উক্তিকে-ই বিলোভন বলা হয়। টীকায় 'গার্ধ্যম্' পদের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে – 'অভিলাষস্থিরীকরণম্'। ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য মনস্থির করা এবং তদ্বিষয়ে প্রলুব্ধ করার জন্য-ই এই সন্ধ্যঙ্গের নাম বিলোভন।

নাট্যশাস্ত্রধৃত বিলোভনলক্ষণটি হল – 'গুণনির্বর্ণনং চৈব বিলোভনমিতি স্মৃতম্'(না.শা.১৯/৭১)। দশরূপকে বলা হচ্ছে –'গুণাখ্যানং বিলোভনম্' (দশ.রূ. ১/২৭)। সাহিত্যদর্পণে প্রদত্ত বিলোভনলক্ষণ দশরূপকের অনুরূপ। পরভাবী রূপগোস্বামী নাটকচন্দ্রিকায় বলেছেন – 'নায়কাদিগুণানাং যদ্বর্ণনং তদ্বিলোভনম্'(না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ৮৭)– অর্থাৎ নায়কাদি প্রধান চরিত্রের গুণবর্ণনে-ই বিলোভন নামক সন্ধ্যঙ্গের নিবেশ – এই হল সর্বসম্মত মত।

নাট্যদর্পণে 'বেণীসংহার'-এর প্রথমাঙ্কে দ্রৌপদীর একটি উক্তি বিলোভনের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হয়েছে। ''চঞ্চদ্‌ভুজভ্রমিত ....'' ইত্যাদি শ্লোকের পর দ্রৌপদী ভীমসেনকে বলছেন – ''নাধ! কিং দুক্করং তএ পরিকুবিএণ। তা অণুগিণ্‌হংতু এদং ববসিদং দেবতাউ ।'' – এই অংশে সুযোধনবধে উদ্দীপ্ত করার জন্য ভীমসেনের বীর্যের প্রশস্তি করায় বিলোভন নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে, উপক্ষেপ-পরিকর-পরিন্যাস-বিলোভন – এই সন্ধ্যঙ্গচতুষ্ক অধিকাংশ সময়ে মুখসন্ধিতে প্রযুক্ত হয়। নাট্যশাস্ত্রের সন্ধ্যঙ্গ আলোচনায় পরিন্যাসের পরে-ই বিলোভনের স্থান। নাট্যদর্পণে-ও এই মত স্বীকৃত হয়েছে যে, পরিন্যাসের অব্যবহিত পরে-ই বিলোভনের প্রয়োগ হবে। কিন্তু এটি যেহেতু অন্যান্য সন্ধিতে-ও অঙ্গরূপে প্রযুক্ত হতে পারে, সেই কারণে নাট্যদর্পণে নাট্যশাস্ত্রোক্ত ক্রমে এই আলোচনা করা হয়নি এবং তা প্রয়োজনীয়-ও নয়। অভিনবভারতীতে-ও বলা হয়েছে – 'আনন্তর্যনিয়মস্তু নাস্তি, সন্ধ্যন্তরাণাং সামাদীনাং মধ্যে2নুপ্রবেশাৎ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

৮.ভেদন – ভেদনের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল –'ভেদনং পাত্রনির্গমঃ' (না.দ.১/৪৪)– রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত পাত্রপাত্রীরা স্বীয় কার্যসাধনের পর মঞ্চ থেকে বহির্গমন করে যে অংশে, সেই অঙ্গের নাম ভেদন। এই ব্যাখ্যাটি একান্তভাবে অভিনবগুপ্তের মতানুসারী। অভিনবভারতীতে প্রাঞ্জল করে বলা হচ্ছে – 'পাত্রসংঘাতস্য যন্নিজপ্রয়োজনোপক্ষেপেণ নিষ্ক্রমণসিদ্ধয়ে ভেদনং প্রকরণমিব স ভেদঃ'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়) – অর্থাৎ নিজ নিজ প্রয়োজন উপস্থাপিত করে একত্রে মিলিত পাত্রগণের মঞ্চনিষ্ক্রমণের নাম ভেদ।

নাট্যদর্পণে ভেদনের উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে যুদ্ধ হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয়ান্বিত দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করার জন্য ভীমসেন বলছেন –

"অয়ি সুক্ষত্রিয়ে!

অন্যোন্যাস্ফালনমিবদ্বিপরুধিরবসাসান্দ্রমস্তিষ্কপঙ্কে

মগ্নানাং স্যন্দনানামুপরিকৃতপদন্যাসবিক্রান্তপত্তৌ।

স্ফীতাসৃক্‌পানগোষ্ঠীরসদশিবশিবাতূর্যনৃত্যৎকবন্ধে

সংগ্রামৈকার্ণবান্তঃপয়সি বিচরিতুং পণ্ডিতাঃ পাণ্ডুপুত্রাঃ ॥"

– এই শ্লোকটির মাধ্যমে পাণ্ডবগণের রণনৈপুণ্যের কথা জানিয়ে, সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে ভীমসেন মঞ্চ থেকে প্রস্থান করছেন। অতএব এটি ভেদন নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ। উল্লেখ্য, অভিনবভারতীতে-ও ভেদনের উদাহরণরূপে এই শ্লোকটি-ই উপন্যস্ত হয়েছে।

এরপর নাট্যদর্পণকারদ্বয় ভেদের দ্বিতীয় একটি লক্ষণের উল্লেখ করছেন, যে মত অনুসারে উৎসাহপ্রদানের নাম ভেদ। এই মতের প্রবক্তা আচার্যের নামোল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই অভিমতটি একান্তভাবে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। তত্রোক্ত ভেদলক্ষণটি হল – 'ভেদঃ প্রোৎসাহনা মতা'(দশ.রূ.১/২৯) – অর্থাৎ সম্যক্ উৎসাহদানকে ভেদ বলা হয়। উদাহরণরূপে উপর্যুক্ত

"অন্যোন্যাস্ফালন...." ইত্যাদি শ্লোকটি উপন্যস্ত হয়েছে। এর দ্বারা বিষণ্ণা দ্রৌপদীর ক্রোধ ও উৎসাহরূপ বীজের অনুরূপ উৎসাহদানের ফলে ভেদ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

নাট্যদর্পণে তৃতীয় একটি অভিমতের-ও উল্লেখ করা হয়েছে। এই মতানুসারে, বীজের ফলোৎপত্তির পক্ষে প্রতিকূল সম্মিলিত শত্রুপক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার নাম ভেদ। এই বিষয়টি একটু বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এই মতের প্রবক্তারূপে কোনো আচার্যর নাম নাট্যদর্পণে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যদিকে নাট্যশাস্ত্রোক্ত ভেদলক্ষণটি হল– 'সংঘাতভেদনার্থো যঃ স ভেদ ইতি কীর্তিতঃ' (না.শা.১৯/৭৫)। অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা ব্যতীত এই লক্ষণটির আরো একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যেখানে বলা হচ্ছে, চরিত্রসমূহের মধ্যে মিলনভঙ্গকে-ই ভেদ বলা হয়। অতএব মনে করা যেতে পারে যে, এই অভিমতটি নাট্যশাস্ত্রকারের-ই। শৃঙ্গারপ্রকাশরচয়িতা ভোজ-ও ভেদের লক্ষণ এইভাবে-ই নির্ণয় করেছেন – 'সংঘাতরূপভেদঃ'। পরবর্তীকালে সাহিত্যদর্পণকার বলছেন, বহুজনের মধ্যে একজনের পৃথকীকরণের নাম ভেদ – 'ভেদঃ সংহতভেদনম্' (সা.দ. ৬/৮৭)। 'বেণীসংহার'-এর অন্ত র্গত "অতএবাদ্য প্রভৃতি ভিন্নো2হং ভবদ্ভ্যঃ" ইত্যাদি ভীমসেনের উক্তিটি এখানে ভেদের উদাহরণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামী নাট্যশাস্ত্র ও দশরূপকের মতকে সমন্বিত করে ভেদলক্ষণ নির্ধারণ করেছেন – 'বীজস্যোত্তেজনং ভেদো যদ্বা সংঘাতভেদনম্'(না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ১১৪)।

উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণ বাদে অন্যান্য সকল গ্রন্থে এই সন্ধ্যঙ্গটি 'ভেদ' নামে উল্লিখিত।

৯.প্রাপণ – নাট্যদর্পণে প্রাপণের লক্ষণটি এইরূপ – 'প্রাপণং সুখসম্প্রাপ্তিঃ' (না.দ.১/৪৫) – ফলপ্রাপ্তির আশায় নায়ক-নায়িকার চিত্তে যে সুখ উপস্থিত হয়, সেটি-ই প্রাপণ নামক মুখসন্ধ্যঙ্গ। 'সুখ' শব্দের অর্থ এখানে সুখহেতু। অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে – 'সুখয়তীতি সুখং তাদৃশস্য বস্তুনঃ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

প্রাপণের উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর প্রথমাঙ্কের নিম্নলিখিত অংশটি উদাহৃত হয়েছে –

(প্রবিশ্য)কঞ্চুকী – "কুমার! এষ খলু ভগবান্ বাসুদেবঃ পাণ্ডবপক্ষপাতামর্ষিতেন কুরুরাজেন সংযময়িতুমারব্ধঃ। ততঃ স মহাত্মা দর্শিতবিশ্বরূপতেজঃসম্পাতমূর্ছিতমবধূয় কুরুবলমস্মদ্সেনাসন্নিবেশমনুপ্রাপ্তঃ। যতো দেবঃ কুমারমবিলম্বিতং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।"

– এই অংশে কঞ্চুকী কর্তৃক ভীমসেন অবগত হচ্ছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সঙ্গে দৌত্যে অসফল হয়েছেন এবং কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এই ঘটনার দ্বারা ভীমসেনের চিত্তে আনন্দের উদ্রেক হচ্ছে, কারণ তিনি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ইচ্ছুক। নায়কচিত্তে

সুখাগমের কারণে এখানে প্রাপণ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। উল্লেখ্য , অভিনবভারতীতে-ও বেণীসংহারের এই অংশটি প্রাপণের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হয়েছে।

নাট্যদর্পণ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থে প্রাপণের পরিবর্তে 'প্রাপ্তি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে এর লক্ষণটি হল – 'জাভিগমনং প্রাপ্তিরিত্যভিসংজ্ঞিতা' (না.শা. ১৯/৭১)। দশরূপক এবং সাহিত্যদর্পণ উভয়ত্র 'প্রাপ্তিঃ সুখাগমঃ' – এই হল প্রাপ্তির লক্ষণ। নাটকচন্দ্রিকায় রূপগোস্বামী বলেছেন – 'প্রাজ্ঞৈঃ সুখস্য সংপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিরিত্যভিধীয়তে' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা– ৯৪)। অর্থ সর্বত্র এক-ই। নায়ক-নায়িকাদির সুখহেতুর উৎপত্তিতে প্রাপ্তি নামক সন্ধ্যঙ্গটি হয়ে থাকে।

নাট্যদর্পণে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কোনো কোনো সময় নাটকীয় বৈচিত্র্যবিধানের জন্য নাট্যকার একটি সন্ধিতে একটি-ই সন্ধ্যঙ্গ একাধিকবার প্রয়োগ করতে পারেন। যেমন– 'বেণীসংহার'-এর প্রথমাঙ্কে-ই প্রাপণ নামক সন্ধ্যঙ্গটি আরো একবার প্রযুক্ত হয়েছে–

চেটী (দ্রৌপদীম্ উদ্দিশ্য সানন্দম্) – ''ভট্টিণি! পরিকুবিদো বিঅ কুমারো লক্খীয়দি।

দ্রৌপদী – এবং তা অবধীরণা বি মং এসা সমাসামেদি। তা ইধ য্যেব উবব সিঅ সুণামো দাব নাধস্স ববসিদম্।

ভীমঃ – মথ্নামি কৌরবশতং ন সমরে কোপাদ্

দুঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যুরস্তঃ।

সংচূর্ণয়ামি গদয়া ন দুর্যোধনোরূ

সন্ধিং করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন ॥

দ্রৌপদী – (সহর্ষম্)অসুদপুরবং ইদিসং বয়ণং,তা পুণো বি ভণ।''

– উল্লিখিত অংশে ভীমসেনের বীরত্বব্যঞ্জক কথা শুনে দ্রৌপদী হৃষ্ট হলেন। ভীমের ক্রোধরূপ বীজ থেকে এটি-ই সূচিত হচ্ছে যে, তিনি অচিরে-ই তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন করবেন। এই ফলপ্রাপ্তির আশাতে দ্রৌপদীর অন্তরে সুখাগম ঘটছে। অতএব এটি প্রাপণ নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ। উল্লেখ্য, দশরূপক এবং পরবর্তী সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে প্রাপ্তির উদাহরণরূপে বেণীসংহারের এই অংশটি-ই উল্লিখিত হয়েছে।

১০.যুক্তি – 'যুক্তিঃ কৃত্যবিচারণা' (না.দ. ১/৪৫)– এই হল নাট্যদর্পণধৃত যুক্তিলক্ষণ। দোষ-গুণবিচারপূর্বক কোনো কার্যের পর্যালোচনা করা হয় যে সন্ধ্যঙ্গে, সেটির নাম যুক্তি। এই অংশে নাটকীয় পাত্রের অভীষ্ট অর্থের অবধারণ, সমর্থন বা স্থিরতা বর্ণিত হয় এবং এই স্থিরীকরণ করা হয় কার্যবিশেষের দোষ-গুণাদিবিচারপূর্বক।

নাট্যদর্পণে যুক্তির দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি 'উদাত্তরাঘব' থেকে গৃহীত লক্ষ্মণের উক্তি –

"কিং লোভেন বিলজ্ঘিতঃ স ভরতো যেনৈতদেবং কৃতং
মাত্রা স্ত্রীলঘুতাং গতা কিমথবা মাতৈব মে মধ্যমা?
মিথ্যৈতন্মম চিন্তিতং দ্বিতয়মপ্যার্যানুজো2সৌ গুরুঃ
মাতা তাতকলত্রমিত্যনুচিতং মন্যে বিধাত্রা কৃতম্ ॥"

– উক্ত শ্লোকটিতে লক্ষ্মণ শ্রীরামের বনবাসগমনের কারণ অনুসন্ধান করছেন। এর কারণ কি ভরতের লোভ? অথবা মাতা কৈকেয়ীর চিত্তের লঘুতা ইত্যাদি বিমর্শপূর্বক অবশেষে লক্ষ্মণ এই সিদ্ধান্তে আসছেন যে, বিধাতার অভিপ্রায়-ই রামের বনবাসের প্রকৃত কারণ। এইরূপ চিন্তাভাবনা এবং অনন্তর কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায়, এটি যুক্তি নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

দ্বিতীয় উদাহরণটি 'রাঘবাভ্যুদয়' থেকে গৃহীত, 'মতিসাগর' চরিত্রটির সংলাপের কিয়দংশ ।

নাট্যশাস্ত্রে যুক্তির লক্ষণ হল –'সম্প্রধারণমর্থানাং যুক্তিরিত্যভিধীয়তে' (না.শা. ১৯/৭১)। দশরূপক এবং সাহিত্যদর্পণে-ও যুক্তির অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। নাটকচন্দ্রিকায় রূপগোস্বামীকৃত যুক্তিলক্ষণটি হল– 'সম্যক্প্রয়োজনানাং হি নির্ণয়ো যুক্তিরিষ্যতে'(না.চ. শ্লোকসংখ্যা–৯০)। অভিনবভারতীতে, প্রকাশিতব্য বিষয়ের প্রকাশন যুক্তি নামক সন্ধ্যঙ্গের কাজ –এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে।

১১.বিধান – নাট্যদর্পণে বিধান নামক সন্ধ্যঙ্গটির লক্ষণ হল – 'বিধানং সুখদুঃখাপ্তিঃ' (না.দ.১/৪৫) – নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের সুখ বা দুঃখের উৎপত্তি হয় যে সন্ধ্যঙ্গে, তার নাম বিধান। রূপকে নায়কাদির হৃদয়ে বিভিন্ন ঘটনাপরম্পরায় সুখ-দুঃখের ভাব উদিত হয়। সুখ-দুঃখমিশ্রিত এই অবস্থাকে বলা হয় বিধান। অভিনবভারতীতে প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হচ্ছে – 'ব্যামিশ্রতয়া সুখ-দুঃখে অভিধীয়েতে যত্রেতি বিধানম্'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

এই সন্ধ্যঙ্গটি চার প্রকারের হতে পারে –

প্রথমতঃ – এক-ই পাত্রে সুখ ও দুঃখ উভয়ের উৎপত্তি। এর উদাহরণরূপে 'মালতীমাধব' প্রকরণের একটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে –

মাধবঃ – "যদ্ বিস্ময়স্তিমিতমস্তমিতান্যভাব -
মানন্দমন্দমমৃতপ্লবনাদিবাভূৎ ।
তৎসন্নিধৌ তদধুনা হৃদয়ং মদীয়-
মঙ্গারচুম্বিতমিব ব্যথমানমাস্তে ॥"

– মালতী ও মাধবের ভাবী অনুরাগের হেতু হল, মাধবের দ্বারা মালতীর দর্শন। মালতীকে দেখার পর মাধবের হৃদয়ে যুগপৎ সুখ ও দুঃখের উদয় হয়েছে; অতএব এটি বিধান নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ।

উল্লেখ্য, দশরূপকে বিধানের উদাহরণরূপে এই শ্লোকটি-ই উদ্ধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ – ভিন্ন পাত্রে সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি। এর উদাহরণরূপে 'তাপসবৎসরাজ' রূপকের ''দৃষ্টিং প্রেমভরালসাং ময়ি মুহুর্বিন্যস্য লজ্জাবতী'' ইত্যাদি শ্লোকটি উপন্যস্ত হয়েছে, যেখানে প্রবাসবশতঃ বাসবদত্তার দুঃখ এবং বৎসরাজের আনন্দের কারণে বিধান নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

তৃতীয়তঃ – এক ব্যক্তির চিত্তে কেবল সুখের উদয়। যেমন – 'রত্নাবলী' নাটিকার ''কুসুমসুকুমারমূর্তির্দধতী....'' ইত্যাদি শ্লোকটি রাজা উদয়নের সুখাগমহেতু বিধান নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

চতুর্থতঃ – এক ব্যক্তির চিত্তে কেবল দুঃখের উদয়। যথা – রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র বিরচিত 'নির্ভয়ভীম' নামক ব্যায়োগে ''অন্যায়ৈকজুষঃ শঠব্রতপুষো.....'' ইত্যাদি শ্লোকে ভীমসেনের দুঃখের বর্ণনায় বিধান নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে বিধানের লক্ষণ হল – 'সুখদুঃখকৃতো যো2র্থস্তদ্বিধানমিতি স্মৃতম্'(না.শা. ১৯/৭৩)। দশরূপকে বিধানের লক্ষণটি হল – 'বিধানং সুখদুঃখকৃৎ'(দশ.রূ.১/২৮)। সাহিত্যদর্পণে বিধানের স্বরূপ আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রের লক্ষণটি অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে। রূপগোস্বামীকৃত বিধানলক্ষণটি হল – 'সুখদুঃখকরং যত্তু তদ্বিধানং বুধাঃ বিদুঃ' (না.চ. শ্লোক সংখ্যা – ১০০) –অতএব নায়কাদির চিত্তে সুখ-দুঃখাদির উদ্রেকে বিধান নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ – এই হল সর্বসম্মত অভিমত।

নাট্যদর্পণে প্রাপ্তি (বা প্রাপণ) এবং বিধানের মধ্যে একটি প্রভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। তদনুসারে, ফলপ্রাপ্তির আশা বা সম্ভাবনায় যে সুখাগম, তার নাম প্রাপ্তি; অন্যদিকে বিধানে সুখের আশা নয়, সম্যক্‌রূপে সুখের উৎপত্তি – এই হল উভয়ের পার্থক্য।

১২.পরিভাবনা – 'বিস্ময়ঃ পরিভাবনা'(না.দ.১/৪৫)– এই হল নাট্যদর্পণসম্মত পরিভাবনালক্ষণ। অতিরিক্ত কৌতুহলবশতঃ কোনো বিষয়ের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা-ই হল পরিভাবনা। অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে – 'কৌতুকেণ জিজ্ঞাসাতিশয়েন ব্যামিশ্রো য আবেগঃ সা পরিভাবনা' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে পরিভাবনার দু'টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি 'নাগানন্দ' নাটিকা থেকে, দ্বিতীয়টি 'রোহিণীমৃগাঙ্ক' নামক প্রকরণ থেকে। এখানে প্রথমটি-ই উদাহৃত হচ্ছে–

(মলয়বতীং দৃষ্ট্বা) জীমূতবাহনঃ –

"স্বর্গস্ত্রী যদি তৎ কৃতার্থমভবচক্ষুঃসহস্রং হরেঃ
নাগী চেন্ন রসাতলং শশভৃতা শূন্যং মুখে2স্যাঃ সতি।
জাতির্নঃ সকলা2ন্যজাতিজয়িনী বিদ্যাধরী চেদিয়ং
স্যাৎ সিদ্ধান্বয়জা যদি ত্রিভুবনে সিদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাস্ততঃ॥"

– উল্লিখিত শ্লোকে মলয়বতীদর্শনে জীমূতবাহনের চিত্তে বিবিধ প্রশ্নের উদয় হচ্ছে – ইনি কি স্বর্গবাসিনী অপ্সরা, না কি পাতালবাসিনী নাগী? অথবা ইনি কোনো বিদ্যাধরী? অথবা ইনি কোনো সিদ্ধপুরুষের সন্তান? এইরূপ কৌতুহলপূর্ণ বিমর্শের কারণে এখানে পরিভাবনা নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে কৌতুহলের বশে কোনো জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আবেগকে পরিভাবনা নামে অভিহিত করা হয়েছে – 'কুতূহলোত্তরাবেগা বিজ্ঞেয়া পরিভাবনা' (না.শা. ১৯/৭৩)। সাহিত্যদর্পণে-ও অনুরূপে পরিভাবনালক্ষণ নির্ণীত হয়েছে – 'কুতূহলোত্তরা বাচঃ প্রোক্তা তু পরিভাবনা' (সা.দ. ৬/৮৬)। 'কুতূহল' শব্দের ব্যাখ্যায় মিতভাষিণীটীকায় বলা হচ্ছে –'রম্যবস্তুসমালোকে লোলতা স্যাৎ কুতূহলম্'– অর্থাৎ রমণীয় কোনো বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দ হল কৌতুহল এবং সেই কৌতুহলপূর্ণ বাক্য-ই হল পরিভাবনা। নাটকচন্দ্রিকায় আবার বলা হচ্ছে – 'শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাদ্যঃ পরিভাবনা' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা–১০৬)– বিবিধ বচন দ্বারা দর্শকচিত্তে চমৎকারি গুণাদি বিষয়ের অবতারণার নাম পরিভাবনা।

দশরূপকধৃত পরিভাবনালক্ষণটি একটু ভিন্ন। এখানে পরিভাবনার পরিবর্তে 'পরিভাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এতদনুসারে 'পরিভাবো2দ্ভুতাবেশঃ' (দশ.রূ. ১/২৯) – অদ্ভুত আবেশকে বলা হয় পরিভাব। রূপকে বিবিধপ্রকার বাক্য দ্বারা নাটকীয় পাত্রপাত্রীর অন্তরে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগে এবং যখন সেই অনুভূতি সহৃদয়মানসে সংক্রামিত হয়ে আশ্চর্য এক আবেশের সৃষ্টি করে, তখন পরিভাব নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়ে থাকে – এই হল দশরূপককারের অভিমত।

এই সন্ধ্যঙ্গটির স্বরূপ এবং উদাহরণদৃষ্টে খুব স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ অলঙ্কারের কথা মনে আসে। ডঃ. কে. এইচ. ত্রিপাঠীর মতে, সম্ভবতঃ এই জাতীয় কিছু-কিছু সন্ধ্যঙ্গ পরবর্তীকালে অলঙ্কারে রূপান্তরিত হয়েছে– "It is probable that some of the Angas like this later on developed into figure of speech."[৮০] তবে এই মত কতটা যুক্তিসহ, তা অবশ্য বিচারের অপেক্ষা রাখে।

প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গ ঃ

নাট্যদর্পণসম্মত প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গের সংখ্যা তেরোটি – বিলাস, ধূনন, রোধ, সান্ত্বন, বর্ণসংহৃতি, নর্ম, নর্মদ্যুতি, তাপ, পুষ্প, প্রগমন, বজ্র, উপন্যাস ও উপসর্পণ। এগুলির মধ্যে বিলাসাদি প্রথম আটটি সন্ধ্যঙ্গ নাটকীয় প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করা হবে অর্থাৎ এদের প্রয়োগ আবশ্যিক নয়। কিন্তু পুষ্পাদি অন্তিম পাঁচটি অঙ্গের প্রয়োগ প্রতিমুখসন্ধিতে অবশ্যকরণীয়।

প্রতিমুখসন্ধির অঙ্গগুলির নাম নিয়ে বিভিন্ন প্রকার মত রয়েছে । নাট্যশাস্ত্রে নাট্যদর্পণোক্ত ধূনন, রোধ, সান্ত্বন, তাপ, প্রগমন ও উপসর্পণের পরিবর্তে যথাক্রমে বিধূত, নিরোধ, পর্যুপাসন, তাপন, প্রগয়ণ ও পরিসর্য শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। দশরূপকে নাট্যশাস্ত্রসম্মত তাপন ও পরিসর্যের পরিবর্তে শম ও পরিসর্প শব্দদুটির ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে সাগরনন্দী নাট্যশাস্ত্র ও দশরূপকের একটি মিশ্র তালিকা স্বীকার করেছেন। দর্পণকার আবার বিধূতের পরিবর্তে বিধৃত নামক শব্দটি স্বীকার করেছেন; এতদ্ব্যতীত নাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গগুলিকে-ই তিনি গ্রহণ করেছেন।

১.বিলাস– বিলাসের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল– 'বিলাসো নৃস্ত্রিয়োরীহা' (না.দ.১/৪৬) – নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক রতিভোগেচ্ছার নাম বিলাস। অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে – 'রতিলক্ষণস্য ভাবস্য হেতুভূতো যো ভোগো বিষয়ঃ প্রমদা পুরুষো বা তদর্থা যা সমীহা স বিলাসঃ'(না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়) – অর্থাৎ রতিরূপ ভাবের হেতুভূত যে প্রচেষ্টা, লিপ্সা বা সমীহা, তার-ই নাম বিলাস।

নাট্যদর্পণে বিলাসের তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে, দ্বিতীয়টি 'নলবিলাস'-এর তৃতীয় অঙ্ক থেকে এবং তৃতীয়টি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র বিরচিত 'কৌমুদীমিত্রানন্দ' নামক প্রকরণের তৃতীয় অঙ্ক থেকে। আমরা প্রথমটি-ই ব্যাখ্যাপূর্বক আলোচনা করবো –

রাজা আহ – ''কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি।

অকৃতার্থে2পি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিপ্রলভ্যতে। কুতঃ–

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতো2পি নয়নে যৎপ্রেষয়ন্ত্যা2নয়া

যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।

মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সা সাসূয়মুক্তা সখী।

সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামী স্বতাং পশ্যতি ॥''

–উল্লিখিত অংশে দেখা যাচ্ছে, রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভোগের জন্য সবিশেষ ইচ্ছা পোষণ করছেন। রতিসম্ভোগের এই আকাঙ্ক্ষার কারণে এখানে বিলাস নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। উল্লেখ্য, অভিনবগুপ্তাচার্য-ও বিলাসের উদাহরণরূপে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর এই অংশটি উপন্যস্ত করেছেন।

এই সন্ধ্যঙ্গটি প্রতিমুখসন্ধির আরম্ভে-ই প্রয়োগ করতে হবে। মুখসন্ধিতে আরব্ধ রত্যাদি ভাবসমূহ প্রতিমুখসন্ধিতে এসে বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবসমূহের সহায়তায় শৃঙ্গারাদি রসে পরিণত হয়। এবং এই পরিণমন প্রধানতঃ বিলাস নামক সন্ধ্যঙ্গের দ্বারা-ই সংঘটিত হয়ে থাকে। বিলাসের গুরুত্ব ও প্রাধান্য প্রতিপাদন করে নাট্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে যে, প্রতিমুখসন্ধির অন্যান্য অঙ্গগুলিকে বিলাসের-ই পরিপোষক রূপে উপস্থাপিত করা উচিৎ – 'বিলাসপ্রকাশকান্যেব চেতরাণ্যঙ্গানি নিবন্ধনীয়ানি'।[৮১]অতএব প্রতিমুখসন্ধির সূচনাতে-ই বিলাসের উপন্যাস করা উচিৎ।

দেখা গেল, পুরুষপক্ষে রমণী এবং রমণীপক্ষে পুরুষের পারস্পরিক মিলনের জন্য যে ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাকে বিলাস বলা হচ্ছে। শৃঙ্গাররসপ্রধান অর্থাৎ কামফল রূপকের ক্ষেত্রে বিলাসের এই লক্ষণ সঙ্গত হলে-ও, অন্যরসপ্রধান রূপকে লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। তাই এক্ষেত্রে একটু ব্যাপকতর অর্থের আশ্রয় নিতে হবে। যেকোনো অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ-ই বিলাস নামক সন্ধ্যঙ্গের বিষয় – এই ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে লক্ষণসঙ্গতি বিহিত হবে। যেমন – বীররসপ্রধান নাটকে উৎসাহ নামক ভাবটি বিলাসের দ্বারা প্রকাশিত হবে। অভিনবভারতীটীকা এই বিষয়টি প্রণিধানে বিশেষ সাহায্য করে। নাট্যশাস্ত্রে প্রদত্ত বিলাসলক্ষণে ('সমীহা রতিভোগার্থা বিলাস ইতি সংজ্ঞিতঃ' – না.শা. ১৯/৭৬) রতিপদটির আলোচনায় অভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন – "ইহ চ রতিগ্রহণং পুমর্থোপযোগি রসগতগতস্থায়িভাবোপলক্ষণং তেন বীরপ্রধানেষু রূপকেষু প্রতিমুখ এব হ্যাস্থা রতিরূপেণ উৎসাহঃ। সম্যগ্‌বিষয়া সমীহা চেষ্টা বিলাস ইতি মন্তব্যম্" (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)– অর্থাৎ 'রতি' শব্দটি এখানে তৎ-তৎ স্থায়িভাবের উপলক্ষকরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। যে রূপক যে ভাবপ্রধান, বিলাস নামক সন্ধ্যঙ্গে বিভাবাদিমুখে সেই ভাবের পরিপোষণ হয়ে রসে পরিণতি ঘটে। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে বীররসপ্রধান দৃশ্যকাব্যে বিলাসরূপ সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণসঙ্গতিতে কোনো অসঙ্গতি থাকে না।

দশরূপকে বিলাসের লক্ষণটি হল – 'রত্যর্থেহা বিলাসঃ স্যাদ্' (দশ.রূ. ১/৩২) সাহিত্যদর্পণে নাট্যশাস্ত্রের অনুরূপে বিলাসলক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। রূপ গোস্বামীর মতে – 'বিলাসঃ সঙ্গমার্থস্তু ব্যাপারঃ পরিকীর্তিতঃ'(না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ১২৫)– অর্থ সর্বত্র এক-ই– রতিভোগবিষয়ে নায়ক-নায়িকার বাসনার নাম বিলাস।

নাট্যদর্পণে বিলাসের একটি বিখ্যাত অথচ বহু-সমালোচিত উদাহরণের উল্লেখ করা হয়েছে। 'বেণীসংহার'-এর দ্বিতীয় অঙ্কে দুর্যোধনের সঙ্গে রাণী ভানুমতীর বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বেণীসংহার বীররসাত্মক নাটক। কিন্তুকৌরব-পাণ্ডবগণ যখন তুমুল যুদ্ধে রত, সেই অবস্থায় রসের কথা না ভেবে,নাট্যকার দুর্যোধনের সঙ্গে ভানুমতীর বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের বর্ণনায় বিলাস নামক সন্ধ্যঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে দোষাবহ হয়েছে।

নাট্যদর্পণকাররা এই প্রসঙ্গে 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের তৃতীয় উদ্দ্যোত থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করছেন–

"সন্ধিসন্ধ্যঙ্গঘটনং রসবন্ধব্যপেক্ষয়া।

ন তু কেবলশাস্ত্রার্থস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥"

–অর্থাৎ সন্ধি হোক্ বা সন্ধ্যঙ্গ, রূপকে সমস্ত কিছুর প্রয়োগ হবে রসাভিব্যঞ্জনের প্রয়োজনে; শাস্ত্রস্থিতি অথবা প্রচলিত প্রথাগত নিয়মপালনের উদ্দেশ্যে নয়। উল্লিখিত উদাহরণে বিলাসের অযথাযথ প্রয়োগে রস নয়, রসাভাসের সৃষ্টি হয়েছে; যদি-ও প্রতিমুখসন্ধিতে বিলাস নামক অঙ্গটির প্রয়োগ অবশ্যকর্তব্য।প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অভিনবভারতীতে-ও এক-ইভাবে ধ্বনিকারের শ্লোকটি সহ এই আলোচনাটি করা হয়েছে।

২.ধূনন – নাট্যদর্পণসম্মত ধূননলক্ষণটি হল – 'ধূননং সান্ন্যনাদরঃ' (না.দ.১/৪৬) এখানে 'সামন্' শব্দের অর্থ অনুরোধ বা অনুনয়। অনুনয়ের প্রতি অনাদর অর্থাৎ অনুরোধ অস্বীকার করার নাম ধূনন। 'অনাদর' শব্দে অল্পার্থে নঞ্-এর প্রয়োগ হয়েছে।অতএব অনুনয়ের প্রতি অল্প অনাদর বা অসম্মতির নাম ধূনন। অভিনবগুপ্তের মতে, পরে এই অনুরোধ স্বীকৃত হতে পারে, এমন সম্ভাবনা থাকে – 'পশ্চাৎ পুনরঙ্গীকরণমিতি' (না.শা. উনবিংশ অধ্যায়)।

ধূননের উদাহরণরূপে 'পার্থবিজয়' নাটক থেকে একটি অংশ উপন্যস্ত করা হচ্ছে–

যুধিষ্ঠিরঃ –"বৎস ভীমসেন!

অয়ং স কালঃ শূরাণাং খিন্নানাং যত্র বন্ধুষু।

আপদ্গতপরিত্রাণম্ অপূর্বো2নুনয়ক্রমঃ ॥

ভীমঃ – কো2য়মনেকবিধাপকারকারিণঃ কৌরবানুদ্দিশ্যার্যস্যার্দ্রভাবঃ।"

–চিত্রসেন কর্তৃক দুর্যোধন সমরে আহূত হয়েছেন এবং তাঁর পরাজয় প্রায় আসন্ন। এমতাবস্থায় যুধিষ্ঠির কৌরবদের সহায়তার জন্য ভীমসেনকে অনুরোধ করছেন।কিন্তু কৌরবদের বহুবিধ অপচেষ্টার কথা স্মরণে রেখে ভীমসেন অগ্রজের অনুরোধ অস্বীকার করছেন। অতএব এটি ধূনন নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণব্যতীত নাট্যতত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে এই অঙ্গটি 'বিধূত' নামে উল্লিখিত। নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, কৃত অনুনয়কে প্রথমে অস্বীকার করে, পরে স্বীকার করার নাম বিধূত – 'কৃতস্য অনুনয়স্যাদৌ বিধূতং হ্যপরিগ্রহঃ' (না.শা.১৯/৭৭)। সাগরনন্দী এবং দর্পণকার-ও অনুরূপে বিধূতলক্ষণ নির্ণয় করেছেন। নাটকচন্দ্রিকায় প্রদত্ত বিধূতলক্ষণটি হল –

"বিধূতং কথিতং দুঃখমভীষ্টার্থানবাপ্তিঃ।

অথবানুনয়াদীনাং বিধূতং স্যাত্ নিরাকৃতিঃ ॥"(না.চ.শ্লোকসংখ্যা–১৩০)

– এতদনুসারে অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি অথবা অনুরোধ অস্বীকার– এই দুটি ক্ষেত্রে বিধূত নামক সঙ্গ্যঙ্গের প্রয়োগ বিহিত হয়।

নাট্যদর্পণে বিধূতের আরেকটি লক্ষণ উদ্ধার করা হয়েছে। এতদনুসারে, ইচ্ছার অভাবের নাম বিধূত। নাট্যবীজ নষ্ট হলে,নাটকীয় পাত্রপাত্রী তজ্জনিত বিষাদে লক্ষ্যকে সুদূর পরাহত মনে করে অভীষ্টলাভের বিষয়ে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে পড়ে। এভাবে অভিপ্রেত বিষয় বেদনার কারণ হয়ে উঠলে বিধূত নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়। এই অভিমতটি একান্তভাবে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের । তত্রোক্ত বিধূতলক্ষণটি হল– 'বিধূতং স্যাদরতিঃ' (দশ.রূ. ১/৩৩)– অর্থাৎ অরতি বা রতিভাবের অভাব-ই হল বিধূত।

৩.রোধ – 'রোধো2র্তিঃ' (না.দ. ১/৪৮)– এই হল নাট্যদর্পণসম্মত রোধ নামক সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণ। 'অর্তি' শব্দের অর্থ দুঃখ বা খেদ। দৃশ্যকাব্যে উপস্থাপিত ঘটনাবিশেষ সুখ বা কল্যাণকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করে। এই প্রতিবন্ধকতার কারণে নায়ক-নায়িকার যে দুঃখ বা খেদের উদ্ভব হয়, তার-ই নাম রোধ।

রোধের দুটি উদাহরণ নাট্যদর্পণে উপন্যস্ত হয়েছে। প্রথমটি 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' থেকে এবং দ্বিতীয়টি 'সত্যহরিশ্চন্দ্র' থেকে গৃহীত । আমরা দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যাপূর্বক আলোচনা করছি–

রাজা–"দেবি। অবলম্বস্ব মদ্বচনম্। অত্রৈব তিষ্ঠ। অশিক্ষিতপাদচারা ন শক্ষ্যতি ভবতী ক্রমিতুং দর্ভাঙ্কুরবিধুরাসু বনবসুন্ধরাসু।

সুতারা – জং ভোদি, তং ভোদু। অহং গমিস্সং।

রাজা – (কুলপতিং প্রতি) ভগবন্!

ত্যজন্ হেম্নো লক্ষং চতুরুদধিকাঞ্চীং চ বসুধাং

সুধাম্ভোধিঃ স্নানাদপি সমধিকাং প্রীতিমভজম্।

সবৎসামেতাং তু প্রবসনপরাং বীক্ষ্য দয়িতাম্

ইদানীং মন্যে2হং জ্বলদনললীঢ়ং বপুরদঃ ॥"

– রাজা দেবী সুতারাকে কষ্টসঙ্কুল বনভূমিতে বিচরণ না করার জন্য অনুরোধ করছেন। কিন্তু সুতারা তাঁর অনুরোধ অস্বীকারপূর্বক চলে যেতে মনস্থ করছেন। স্ত্রী এবং সন্তানকে লাভ করে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু সুতারা তাঁকে ত্যাগ করে যেতে চাওয়ায় রাজা যেন অগ্নিদাহের মত দুঃখ অনুভব করছেন।এই অংশে নায়কের খেদ বর্ণিত হওয়ায়, এটি রোধ নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্র এবং দশরূপকে এই অঙ্গটির নাম 'নিরোধ'। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'যা তু ব্যসনসম্প্রাপ্তিঃ স নিরোধঃ প্রকীর্তিতঃ' (না.শা. ১৯/৭৯)– অর্থাৎ কোনো নতুন বিপদের উপস্থিতির নাম নিরোধ। দশরূপকে বলা হচ্ছে – 'হিতরোধো নিরোধনম্'(দশ.রূ.১/৩৪)– হিত বা কল্যাণ রোধের নাম নিরোধ। সাগরনন্দী এবং দর্পণকার আবার এই সন্ধ্যঙ্গটিকে 'বিরোধ' নামে অভিহিত করেছেন। সাগরনন্দীর মতানুসারে, বিপৎপাতের নাম-ই বিরোধ –'যা তু ব্যসনসম্প্রাপ্তির্বিরোধ ইতি কীর্তিতঃ'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)। সাহিত্যদর্পণোক্ত বিরোধলক্ষণটি এক-ই প্রকার। রূপ গোস্বামীর মতে-ও– 'যত্র ব্যসনমায়াতি বিরোধঃ স নিগদ্যতে'(না.চ.শ্লোকসংখ্যা–১৫৫) । সুতরাং সাময়িক বাধাবিপত্তি যখন নায়কনায়িকার অভীষ্টপ্রাপ্তির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে, সেই ঘটনা এবং তজ্জনিত দুঃখ বা খেদ হল নিরোধের বিষয়।

৪.সান্ত্বন – 'সান্ত্বনং সাম'(না.দ.১/৪৮)– এই হল নাট্যদর্পণসম্মত সান্ত্বনলক্ষণ। কোনো কারণে কেউ ক্রুদ্ধ হলে অনুনয়াত্মক মিষ্টবাক্য দ্বারা সেই ক্রোধ উপশমের চেষ্টার নাম সান্ত্বন।

'রামাভ্যুদয়' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে একটি অংশ সান্ত্বনের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে, যেখানে মারীচ রাবণের কাছে এসে শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্বের ব্যাখ্যা করছে এবং এ-ও বলছে যে, শ্রীরামের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে রাবণের অসি-ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এই কথা শুনে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মারীচকে বধ করতে উদ্যত হলে, প্রহস্ত নামক জনৈক রক্ষঃসেনাপতি রাবণকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন–

প্রহস্তঃ (পাদয়োর্নিপত্য)–"প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ। নেদমনুরূপং স্বামিনঃ। দেব!

লোকত্রয়ক্ষয়োদ্বৃত্ত-প্রকোপাগ্রেসরস্য তে।

ঈদৃশশ্চন্দ্রহাসস্য ভৃত্যেষ্বনুচিতঃ ক্রমঃ ॥

(পুনঃ ক্রমাদাহ) দেব! প্রসীদ! প্রণয়াদতিক্রমো2স্য, ন বামতয়া।"

–উল্লিখিত অংশে মারীচের প্রতি ক্রুদ্ধ রাবণের ক্রোধ প্রশমনের জন্য প্রহস্তের অনুনয়পূর্ণ বাক্যের প্রয়োগবশতঃ সান্ত্বন নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

নাট্যদর্পণ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে এই অঙ্গটি 'পর্যুপাসন' নামে উল্লিখিত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রমতে, নায়ক বা নায়িকার পূর্বকৃত কোনো দোষের জন্য অনুনয়পূর্ণ বাক্যকে পর্যুপাসন বলা

হয়– 'ক্রুদ্ধস্যানুনয়ো যস্ত ভবেৎ পর্যুপাসনম্' (না.শা.১৯/৮০)। নাট্যশাস্ত্রের অভিমত সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত করেছেন সাগরনন্দী – 'ক্রুদ্ধস্যানুনয়ঃ পর্যুপাসনম্'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়) । এক-ই কথা সমর্থন করেছেন সাহিত্যদর্পণকার। নাটক চন্দ্রিকাকারের মতে-ও – 'রুষ্টস্যানুনয়ো ধীরৈঃ পর্যুপাসনমীরিতমিতি' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ১৫৮) – রুষ্ট ব্যক্তির রোষ প্রশমনের জন্য অনুরোধপূর্ণ বাক্য হল সান্ত্বন।

নাট্যদর্পণে একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তদনুসারে, সান্ত্বনপ্রয়োগাবসরে 'বজ্র' নামক প্রতিমুখসন্ধির অপর একটি অঙ্গ প্রয়োগ করা হয়। প্রত্যক্ষভাবে রুক্ষ-নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগের নাম বজ্র। আর এই কর্কশ বাক্যের কারণে কোনো ব্যক্তি যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন মিনতিপূর্ণ বাক্যে তাকে প্রশমিত করার নাম হল সান্ত্বন। অতএব স্পষ্ট-ই বোঝা যাচ্ছে, বজ্র এবং সান্ত্বন এই দুটি অঙ্গের পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। 'বজ্র' প্রয়োগের কারণে সান্ত্বনপ্রয়োগের প্রয়োজন। ভাষান্তরে, বজ্র হল সান্ত্বনের কারণ। উল্লিখিত উদাহরণে মারীচের বক্তব্যে শ্রীরামের সঙ্গে সংগ্রামে রাবণ পরাস্ত হবেন – এই ইঙ্গিতে রাবণ আহত ও ক্রুদ্ধ হচ্ছেন;অতএব এটি বজ্রের উদাহরণ। এরপর ক্রুদ্ধ রাবণকে অনুরোধপূর্ণ বাক্য দ্বারা প্রশমিত করছেন প্রহস্ত, এটি সান্ত্বনের উদাহরণ।

এই আলোচনা থেকে দুইটি বিষয় অনুধাবন করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, একটি সন্ধ্যঙ্গ অপর একটি সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ ও পোষণে সহায়তা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অঙ্গসমূহের প্রয়োগে কোনো নির্দিষ্ট ক্রম অনুসৃত হতে পারে না বলে নাট্যদর্পণে যে অভিমত পোষণ করা হয়েছে, তা যথার্থ। কারণ, ক্রমানুসারে বিচার করলে বজ্রের স্থান সান্ত্বনের অনেক পরে। অথচ প্রকৃতপক্ষে বজ্রপ্রয়োগের পর-ই সান্ত্বনপ্রয়োগের অবসর ঘটে।

৫.বর্ণসংহৃতি – 'পাত্রৌঘো বর্ণসংহৃতিঃ' (না.দ.১/৪৮)– এই হল নাট্যদর্পণধৃত বর্ণসংহৃতির লক্ষণ। বৃত্তিতে এর অর্থ করা হয়েছে, পৃথক স্থিত পাত্রসমূহের কার্যব্যপদেশে একত্র সম্মেলনের নাম বর্ণসংহৃতি। 'বর্ণ' শব্দের অর্থ এখানে নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণ । এই পাত্রপাত্রীরা কারা, সেটি-ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এরা হল নায়ক, প্রতিনায়ক, নায়িকা এবং সহায়ক কোনো পাত্র। অতএব নির্দিষ্ট কোনো সময়ে, নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নায়ক-নায়িকা-প্রতিনায়ক-সহায়ক পাত্রগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার নাম বর্ণসংহৃতি – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত বর্ণসংহৃতিলক্ষণ।

বর্ণসংহৃতির উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার একটি অংশ উপস্থাপিত হয়েছে–

রাজা –" সুসঙ্গতে! ক্বাসৌ ক্বাসৌ (ইত্যতঃ আরভ্য)

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ।

কুতো2ন্যথা স্রবত্যেষঃ স্বেদচ্ছদ্মামৃতদ্রবম্ ॥ ''

– উল্লিখিত অংশে নায়ক রাজা উদয়ন, নায়িকা সাগরিকা এবং সহায়ক পাত্র বিদূষক বসন্তক ও সুসঙ্গতা নাম্নী দাসীর একত্র সম্মেলনে, উদয়ন-সাগরিকার প্রণয়বিকাশরূপ প্রচেষ্টায় বর্ণসংহৃতি নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে –'চাতুর্বর্ণ্যোপগমনং বর্ণসংহার ইষ্যতে' (না.শা. ১৯/৮২) । লক্ষণদৃষ্টে প্রথমে-ই মনে হয়, 'চতুর্বর্ণ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের পাত্রগণ যখন একত্র হয়ে কোনো বিষয় উপস্থাপিত করে, তখন তাকে বর্ণসংহার বলে,এই হল মহামুনির অভিমত। দশরূপকের টীকাকার ধনিক-ও 'চাতুর্বর্ণ্য' শব্দের ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের পাত্র – এই অর্থ স্বীকার করেছেন। কিন্তু অভিনবভারতীটীকায় এর অন্যরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অভিনবগুপ্ত 'চাতুর্বর্ণ্য' শব্দের অর্থ করেছেন নাটকীয় পাত্র। তাঁর মতে, বর্ণসংহার বলতে বোঝায় পৃথক স্থিত পাত্রচতুষ্টয়ের এক-ই কার্যসাধনের জন্য মিলিত হওয়া। তাই তিনি বলছেন – ''চাতুর্বর্ণ্যশব্দেন পাত্রাণ্যুপলক্ষ্যন্তে। তেন যত্র পাত্রাণি পৃথক স্থিতান্যপি ঢৌক্যন্তে স বর্ণসংহারঃ'' (না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)। এরপর তিনি আবার পূর্বাচার্যদের অভিমত উল্লেখ করে বলছেন, তাঁদের মতে, বীররসপ্রধান রূপকে নায়ক-প্রতিনায়ক এবং অন্যান্য সচিবরা থাকবেন; কামপ্রধান রূপকে নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য সহকারিরা থাকবেন। বর্ণসংহারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সম্মেলন হবে – এই মত অভিনবগুপ্তাচার্যের সম্মত নয়। বর্ণসংহারের বহু উদাহরণে-ই চারবর্ণের সম্মেলন হয়নি, এরকম দেখা যায়– 'যত্তু ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয়মেলনমিতি, তদফলত্বাদনাদৃত্যমেব' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়) ।পরভাবী দর্পণকার নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাটি অবিকল উল্লেখ করে অভিনবগুপ্তের মতটি-ও উপস্থাপিত করেছেন। নাটকচন্দ্রিকায় রূপগোস্বামী-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সম্মেলনে উপস্থাপিত বর্ণসংহারের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'মহাবীরচরিত' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে–

''পরিষদিয়মৃষীণামেষ বৃদ্ধো যুধাজিৎ

সহ নৃপতিরমাত্যৈর্লোমপাদশ্চ বৃদ্ধঃ।

অয়মবিরতযজ্ঞো ব্রহ্মবাদী পুরাণঃ

প্রভুরপি জনকানামদ্রুহো যাচকস্তে ॥''

–পরশুরামের প্রতি ঋষি বশিষ্ঠের উক্তি এটি। রামচন্দ্রের বিজয়কামনায় ঋষি-ক্ষত্রিয়-অমাত্যাদি বর্ণচতুষ্টয় সম্মিলিতভাবে পরশুরামের ক্রোধ প্রশমনের জন্য মিনতি করছেন;অতএব এটি বর্ণসংহার নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে বর্ণসংহারের আরো একটি লক্ষণের কথা বলা হচ্ছে। এতদনুসারে, বর্ণিত কোনো বিষয়ের তিরস্কারের নাম বর্ণসংহার। এখানে 'তিরস্কার' শব্দের অমনঃপূত হওয়া, গোপন রাখা, নিরাকরণ করা – এই অর্থগুলি গ্রহণ করা উচিৎ। এর উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার' থেকে দেবী ভানুমতীর একটি উক্তি উদ্ধার করা হয়েছে। কঞ্চুকী এসে রথের নিশানপতনের সংবাদ দেবীকে জানাচ্ছেন। প্রত্যুত্তরে ভানুমতী বলছেন – 'অংতরীয়দু তাব এদং সমত্থবং ভণানং বেয়জ্জুণিমঙ্গলুগ্ঘোসেন' – অর্থাৎ রথকেতনপতনের মতন অশুভ ঘটনার নিরাকৃতির জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা বেদপাঠ করানো হোক্। এভাবে বর্ণিত বিষয়ের অমাঙ্গল্য দূরীকরণের প্রচেষ্টার জন্য এটি বর্ণসংহারের উদাহরণ। এখানে 'বর্ণ' শব্দের অর্থ বর্ণিত বিষয়; সম্-হৃ ধাতুর অর্থ গোপন রাখা বা নিরাকরণ করা।

উল্লেখ্য, এই লক্ষণটি সাগরনন্দীবিরচিত নাটকলক্ষণরত্নকোশে পাওয়া যায়। তত্রোক্ত বর্ণসংহারলক্ষণটি হল – 'বর্ণিতস্যার্থস্য তিরস্কারে বর্ণসংহারঃ' (না.ল.র.অষ্টম অধ্যায়)। অবশ্য কেউ কেউ যে বর্ণচতুষ্টয়ের একত্রীভবনকে বর্ণসংহার বলেন, সেকথা-ও এখানে বলা হয়েছে –'চতুর্ণাং বর্ণানাং সম্মিলনমপি কো2পি বর্ণয়তি' (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)।

৬.নর্ম – নাট্যদর্পণে নর্মের লক্ষণটি এরূপ – 'ক্রীড়ায়ৈ হসনং নর্ম'(না.দ. ১/৪৯) –ক্রীড়াচ্ছলে হাস্য-পরিহাসের নাম নর্ম। নায়কাদি পাত্রপাত্রীগণ চিত্তবিনোদনের জন্য যে লঘু, কৌতুকপূর্ণ কথোপকথন করে থাকেন, তার নাম নর্ম।

নর্মের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'রত্নাবলী' নাটিকা থেকে তিনটি এবং 'নলবিলাস' নাটক থেকে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এক-ই রূপকে এক-ই সন্ধ্যঙ্গের বহুবার প্রয়োগ হতে পারে, এটি বোঝানোর জন্য-ই একাধিক উদাহরণ উপন্যস্ত করা হয়েছে। আমরা দুটি রূপক থেকে-ই একটি করে উদাহরণ ব্যাখ্যা করছি। প্রথমটি 'রত্নাবলী' থেকে –

সুসঙ্গতা – "সহি! জস্স কএ তুবং আগদা, সো অয়ং পুরদো চিট্ঠদি।

সাগরিকা – (সাসূয়ম্) সুসংগদে! কস্স কএ অহং আগদা?

সুসঙ্গতা – অয়ি অণ্ণসংকিদে ! ণং চিত্তফলহয়স্স, তা গিণ্হ এদং।"

– 'রত্নাবলী' নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে উদ্ধৃত সুসঙ্গতা-সাগরিকার এই পরিহাসপূর্ণ কথোপকথনটি নর্মের বিখ্যাত উদাহরণ। সাগরিকা তাঁর প্রেমিক উদয়নের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যখন একান্ত উৎসুক, তখন তাঁর সখী তাঁর সঙ্গে পরিহাস করছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণটি 'নলবিলাস' থেকে –

রাজা –" লম্বস্তনি! ইদমাসনমাস্যতাম্।

বিদূষকঃ – ভোদী! লংবত্থণীএ দুব্বলং খু এদং আসণং, তা তুমএ সাবহাণাএ উববিসিদব্বং।”

– এই উদাহরণে লম্বস্তনী নাম্নী রমণীর পৃথুলতা নিয়ে রাজা ও বিদূষকের মধ্যে পরিহাসপূর্ণ কথোপকথন নর্মের সার্থক উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রকার ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে বিহিত হাস্যকে নর্ম বলেছেন –‘ক্রীড়ার্থং বিহিতং যত্তু হাস্যং নর্মেতি তৎ স্মৃতম্’(না.শা. ১৯/৭৮)। দশরূপককারের মতে – ‘পরিহাসবচো নর্ম’(দশ.রূ.১/৩৩) – নায়ক-নায়িকা তাঁদের অন্তরঙ্গ পাত্রপাত্রীর সঙ্গে যে পরিহাসযুক্ত কথাবার্তা বলেন, তার নাম নর্ম। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হচ্ছে, নর্ম হবে শুদ্ধ ও ছলগর্ভ বাক্যের দ্বারা হৃদ্‌গত বাসনার প্রকাশ – ‘শুদ্ধমন্তর্গতাকূতং নর্ম স্যাচ্ছদ্মগর্ভকম্’(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়) । এরপর আচার্যের উক্তিরূপে সাগরনন্দী নর্মের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তা নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণের-ই সংক্ষিপ্তসার –‘উপস্থাপিতশৃঙ্গারং হাস্যপ্রবচনপ্রায়ং নর্ম বর্ণয়ন্ত্যাচার্যাঃ’ (না.ল.র. একাদশ অধ্যায়) – অর্থাৎ হাস্যপ্রধান সংলাপের মাধ্যমে শৃঙ্গারের উপস্থাপনাকে আচার্যগণ নর্ম নামে অভিহিত করেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ নর্মের সংজ্ঞারূপে অবিকল দশরূপকের সংজ্ঞাটি উদ্ধার করেছেন। রূপ গোস্বামীর অভিমত-ও অনুরূপ –‘পরিহাসপ্রধানং যদ্বচনং নর্ম তদ্বিদুরিতি ’(না.চ. শ্লোকসংখ্যা– ১৪২)।

৭.নর্মদ্যুতি – নর্মদ্যুতির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – ‘দোষাবৃতৌ তু তদ্‌দ্যুতিঃ’ (না.দ. ১/৪৯) – পাত্রবিশেষের দোষ আচ্ছাদনের জন্য যে নর্ম অর্থাৎ হাস্যপরিহাসমূলক কথাবার্তা বলা হয়, তার নাম নর্মদ্যুতি।

নর্মদ্যুতির উদাহরণরূপে ‘রত্নাবলী’ নাটিকা থেকে বিদূষক ও রাজা উদয়নের একটি কথোপকথন উদ্ধার করা হয়েছে–

“বিদূষকঃ – ভো ! অজ্জ বি এসা চউব্বেই বিয় বভণো রিয়াউ পঠিদং পযত্তা ।

রাজা – বয়স্য ! কিমপ্যন্যচেতসা ময়া নাবধারিতম্, তৎ কিমনয়োক্তম্ ?

বিদূষকঃ – ভো ! এদং এদাএ পঠিদং –

দুল্লহজণাণুরাও লজ্জা গরুই পরব্বসো অপ্পা ।

পিয়সহি! বিসমং পিম্ভং মরণং সরণং নবরমেক্কং ॥

রাজা – ভো মহাব্রাহ্মণ ! কো2ন্য এবং ঋচামভিজ্ঞঃ !”

– এই অংশে দেখা যাচ্ছে, বিদূষক বৈদিক ছন্দে কিছু রচনা করে রাজাকে শোনাতে চাইছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তিনি যে ছন্দে কাব্যরচনা করছেন, সেটি হল লৌকিক একটি ছন্দ, যার

নাম গাথা । বিদূষকের এই মূর্খতাকে রাজা লঘু ও পরিহাসাত্মক কথা বলে আচ্ছাদিত করছেন; অতএব এটি নর্মদ্যুতির উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে –'দোষপ্রচ্ছাদনার্থং তু হাস্যং নর্মদ্যুতিঃ স্মৃতা' (না.শা. ১৯/৭৮) – দোষপ্রচ্ছাদনের নিমিত্ত কৃত হাস্য হল নর্মদ্যুতি। লক্ষণের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্য বিশদে বলছেন – 'দোষো যেনোক্তেন প্রচ্ছাদয়িতুমিষ্যতে তস্যাপি হাস্যজননত্বেন নর্ম চ সুতরাং দ্যোতিতং ভবতীতি নর্মদ্যুতিঃ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে সাগরনন্দী বলেছেন, ক্রীড়ার ছলে অথবা প্রলুব্ধ করার ছলে হাস্যের নাম নর্মদ্যুতি– 'ক্রীড়াবিলোভনার্থং হাস্যং নর্মদ্যুতিঃ' (না.ল.র.অষ্টম অধ্যায়)।পরভাবী নাটকচন্দ্রিকাকারের মতে–'নর্মজাতা রুচিঃ প্রাজ্ঞৈর্নর্মদ্যুতিরুদীরিতা' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা–১৪৬) – নর্ম অর্থাৎ পরিহাসমূলক বাক্য থেকে যে অনুভবের সৃষ্টি হয়, তার নাম নর্মদ্যুতি।

নাট্যদর্পণে নর্মদ্যুতির আরেক প্রকার লক্ষণের আলোচনা করা হয়েছে । এতদনুসারে, হাস্যপরিহাসাত্মক কথোপকথনের মাধ্যমে যে নর্ম সৃষ্টি হয়, তাতে সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রী উত্তেজিত না হয়ে যদি ধৈর্যধারণ করেন, তবে তাকে-ই বলা হয় নর্মদ্যুতি । এর উদাহরণটি-ও 'রত্নাবলী' থেকে-ই গৃহীত –

সুসঙ্গতা –" সহি! অদক্খিন্না দাণি স তুবং, জা এবং ভট্টিণো হত্থাবলংবিয়া বি কোবং ন মুংচসি!

সাগরিকা – (সভ্রূভঙ্গমীষদ্ বিহস্য) সুসংগদে ইয়াণি পি ণ বিরমসি !"

–এই অংশে সুসঙ্গতার পরিহাসপূর্ণ বাক্যে অনুরাগরূপ যে বীজ উদ্ঘাটিত হয়েছিল, সাগরিকার ঈষৎ হাস্য দ্বারা সেই দোষ আচ্ছাদিত হয়ে ধৈর্যের প্রকাশ ঘটায়, নর্মদ্যুতি নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে ।

উল্লিখিত অভিমতটি একান্তভাবে দশরূপকানুসারী । তত্রোক্ত নর্মদ্যুতিলক্ষণটি হল – 'ধৃতিস্ত জ্জা দ্যুতির্মতা' (দশ.রূ.১/৩৩) । 'ধৃতি' শব্দের অর্থ ধৈর্য। ধৈর্যের স্থিতি-ই হল নর্মদ্যুতি। উক্ত উদাহরণটি-ও দশরূপক থেকে-ই গৃহীত । পরভাবী দর্পণকার-ও পরিহাসে অনুত্তেজিত থেকে ধৈর্যধারণ করাকে নর্মদ্যুতি বলেছেন –'ধৃতিস্তু পরিহাসজা নর্মদ্যুতিঃ' (সা.দ.৬/৯১) । তিনি অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে নাট্যশাস্ত্রের অভিমতটি-ও উল্লেখ করেছেন –'কেচিত্তু দোষস্যাচ্ছাদনং হাস্যং নর্মদ্যুতিঃ ইতি বদন্তি' (সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) ।

নাট্যদর্পণকাররা একটি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করেছেন । তাঁদের মতে, নর্ম এবং নর্মদ্যুতি – এই দুটি সন্ধ্যঙ্গ কামপ্রধান অর্থাৎ শৃঙ্গাররসাত্মক রূপকে সন্নিবেশিত হওয়া উচিৎ। কারণ, এজাতীয় রূপক মূলতঃ ও প্রধানতঃ নর্ম তথা হাস্যপরিহাসমূলক কৈশিকী বৃত্তিতে রচিত হয় । তাই এই শ্রেণীর রূপক-ই উক্ত সন্ধ্যঙ্গদুটি প্রয়োগের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ।

৮.তাপ – 'অপায়দর্শনং তাপঃ' (না.দ.১/৪৯) – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত তাপ নামক সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণ । এর অর্থ হল– 'অপায়' অর্থাৎ বাধা-বিঘ্নজনিত অনিষ্টের দর্শনে যে সন্তাপ বা খেদের সৃষ্টি হয়, তার নাম তাপ । রূপকে বিভিন্ন ঘটনায় পাত্রপাত্রীর অভীষ্টপূর্তির পথে কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সেই আশঙ্কায়, তজ্জনিত খেদে বা পরিতাপে তাপ নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয় ।

নাট্যদর্পণে তাপের উদাহরণরূপে 'পার্থবিজয়' রূপকের একটি অংশ উদ্ধার করা হয়েছে –

কঞ্চুকী – " ভো ভো লোকপালাঃ ! পরিত্রায়ধ্বম্ পরিত্রায়ধ্বম্।

এষা বধূর্ভরতরাজকুলস্য সাধ্বী

দুর্যোধনস্য মহিষী প্রিয়সঙ্গরস্য ।

বিস্মৃত্য পাণ্ডুধৃতরাষ্ট্রপিতামহাদীন্

গন্ধর্ববীরপশুভিঃ পরিভূয়তে স্ম ॥

যুধিষ্ঠিরঃ (শ্রুত্বা দুর্যোধনান্তঃপুরে মহতীমপায়শঙ্কামাবিষ্কুর্বন্নাহ) – অয়ি বৎস! স্বগোত্রপরিভাববিষ্কারনিষ্ঠুরঃ শব্দঃ । অদ্যাপ্যভ্রান্ত এবাসি । কঃ কো2ত্র ? চাপং চাপম্।" (ইতি চাপরোপণমভিনয়ন্ সসম্ভ্রমাদুত্তিষ্ঠতি)

– উল্লিখিত অংশে কঞ্চুকী কর্তৃক নিবেদিত সংবাদে দুর্যোধনের মহিষীর গন্ধর্বদের দ্বারা অসম্মানিত হওয়ায় কথা জ্ঞাত হচ্ছেন যুধিষ্ঠির।এই অনিষ্টদর্শনে তাঁর চিত্তে ক্রোধ ও খেদের সঞ্চারে তাপ নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে ।

নাট্যশাস্ত্র এবং সাহিত্যদর্পণে তাপের পরিবর্তে 'তাপন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে-ও বিঘ্নদর্শনের নাম তাপন –'অপায়দর্শনং যত্তু তাপনং নাম তদ্ভবেৎ' (না.শা. ১৯/৭৭)। সাহিত্যদর্পণকারের অভিমতটি আবার অন্যপ্রকার – 'উপায়াদর্শনং যত্তু তাপনং নাম তদ্ভবেৎ' (সা.দ. ৬/৯১)– তাপ বা কষ্টের থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে না পারা-ই হল তাপন ।

নাট্যদর্পণে অন্য আচার্যদের একটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে । এই মতে তাপের পরিবর্তে 'শমন' শব্দটি ব্যবহৃত। অনুনয় রক্ষা করা এবং 'অরতিনিগ্রহ' অর্থাৎ চিত্তের আনন্দবিধান হল শমনের লক্ষণ। প্রথমটির উদাহরণরূপে 'পার্থবিজয়' রূপক থেকে ভীমসেনের একটি উক্তি উদ্ধার করা হয়েছে–

ভীমঃ –" আঃ! ক এষ ময়ি স্থিতে ভরতকুলং পরিভবতি? অতঃপরং ন মর্ষয়ামি ।"

–পূর্বোক্ত উদাহরণে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ভরতকুল রক্ষার জন্য যে অনুরোধ করেছেন, এই অংশে ভীমসেন তা স্বীকার করছেন; অতএব এটি শমন নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

শমনের দ্বিতীয় লক্ষণটির উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর একটি অংশ উদ্ধার করা হয়েছে, যেখানে রাণী ভানুমতী দুঃস্বপ্নদর্শনজনিত অমঙ্গলের নিরাকরণ করছেন।

শমনের এই দ্বিতীয় প্রকারটি দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতানুসারী। সেখানে শমনের পরিবর্তে 'শম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তত্রোক্ত শমলক্ষণটি হল – 'তচ্ছমঃ শমঃ' (দশ.রূ.১/৩৩) – 'বিধূত' নামক সন্ধ্যঙ্গে (নাট্যদর্পণে যার নাম 'ধূনন') রূপকে মুখ্য পাত্রপাত্রীর অন্তরে যে অরতির (অরতি হল ইচ্ছার অভাব) উদ্ভব হয়েছিল, তা বিদূরিত হয়ে চিত্তে সন্তোষ উপস্থিত হলে, তা শমরূপে পরিগণিত হয় । পরবর্তীকালে নাটকচন্দ্রিকাকার রূপগোস্বামী-ও তাপনের পরিবর্তে 'শম' শব্দটি এবং দশরূপকোক্ত লক্ষণটি-ই স্বীকার করেছেন–'অরতেঃ শমনং ধীরৈঃ শম ইত্যভিধীয়তে' (না.চ.শ্লোক সংখ্যা– ১৩৫)।

৯.পুষ্প – পুষ্প নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল–'পুষ্পং বাক্যং বিশেষবৎ'(না.দ.১/৪৯) – বিশেষগুণান্বিত বাক্যকে পুষ্প বলা হয়। 'বিশেষবৎ' কথাটির অর্থ হল উৎকর্ষবিধায়ক শব্দ। নানা সুশোভিত শব্দসমন্বিত বাক্য-ই হল পুষ্প । স্বয়ংকথিত অথবা অপরোক্ত কোনো বাক্য যখন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুখশ্রাব্য শব্দ দ্বারা অধিকতর সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়, তখন সেই সন্ধ্যঙ্গের নাম পুষ্প। এই সন্ধ্যঙ্গের নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুন্দরভাবে রচিত কবরীতে পুষ্পসজ্জা যেমন অধিকতর সৌন্দর্যবিধান করে, অনুরূপে সাধারণভাবে কথিত কোনো বাক্যকে গুণান্বিত শব্দযোগে অধিকতর রসযুক্তভাবে প্রকাশ করার নাম পুষ্প।

নাট্যদর্পণে পুষ্পের উদাহরণরূপে 'বিলক্ষ্যদুর্যোধন' এবং 'সত্যহরিশ্চন্দ্র'– এই দুটি রূপকের অংশবিশেষ উদাহৃত হয়েছে । আমরা প্রথমটি উদাহৃত করছি –

ভীষ্মঃ – " এতৎ তে হৃদয়ং স্পৃশামি যদি বা সাক্ষী তবৈবাত্মজঃ সম্প্রত্যেব তু গোগ্রহে যদভবৎ তৎ তাবদাকর্ণ্যতাম্ ।

একঃ পূর্বমুদায়ুধৈঃ স বহুভির্দৃষ্টস্ততো2নন্তরং।

যাবন্তো বয়মাহবপ্রণয়িণস্তাবন্ত এবার্জুনাঃ ॥"

– উল্লিখিত উক্তিটি পিতামহ ভীষ্মের। তিনি বলছেন, প্রথমাবস্থায় যুদ্ধ করতে এসে তাঁরা একজন অর্জুনকে দেখেছিলেন। পরে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা যেন তাঁদের বাহিনীর মত বিশাল সংখ্যাতে অর্জুনকে প্রত্যক্ষ করছেন । এভাবে প্রথমার্দ্ধে কথিত যুদ্ধবিবরণ উত্তরার্ধে বিশিষ্টতর ভাবে প্রকাশিত হওয়ার কারণে এটি পুষ্প নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও বিশেষ বচনকে পুষ্প বলা হয়েছে – 'বিশেষবচনং যত্তু তৎ পুষ্পমিতি সংজ্ঞিতম্' (না.শা.১৯/৮০)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও এক-ই কথা বলা হয়েছে – 'বিশেষবচনং

পুষ্পম্' (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)। এখানে এক কার্যের প্রসঙ্গে অন্য কার্যের আধিক্যবর্ণনকে 'বিশেষ বচন' বলা হয়েছে। 'বিশেষবচন' শব্দের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে সাগরনন্দী বলছেন – 'অন্যত্র ক্রিয়ায়ামিতরক্রিয়াধিক্যং বিশেষবচনম্'।সাহিত্যদর্পণকার-ও বিশেষবচনকে পুষ্প নামে অভিহিত করেছেন– 'পুষ্পং বিশেষবচনং মতম্' (সা.দ. ৬/৯৩)।পরভাবী নাটকচন্দ্রিকাকার-ও বলেছেন –'সবিশেষাভিধানং যৎ পুষ্পং তদিতি সংজ্ঞিতম্'(না.চ. শ্লোকসংখ্যা–১৬২)। অতএব উৎকর্ষবান্ বাগ্‌বিন্যাসের নাম পুষ্প – এই হল সর্বসম্মত অভিমত ।

১০. প্রগমন – 'প্রগমঃ প্রতিবাক্‌শ্রেণিঃ' (না.দ.১/৫০) – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত প্রগমনলক্ষণ। প্রতিমুখসন্ধির যে অঙ্গে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক উত্তর-প্রত্যুত্তররূপ বাগ্‌বিন্যাসের দ্বারা নাট্যবীজের প্রকাশ ঘটে, তার নাম প্রগমন । এই উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ কথোপকথনের জন্য ন্যূনপক্ষে দুইজন এবং অধিকপক্ষে তদধিকসংখ্যক পাত্রপাত্রীর প্রয়োজন ।

নাট্যদর্পণে 'বেণীসংহার' এবং 'নলবিলাস' নাটকের অংশবিশেষ প্রগমনের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে । আমরা দ্বিতীয়টির আলোচনা করবো –

দময়ন্তী (ভুজমবলম্বিতে রাজনি ক্রমাদাহ) – "জই এবং মুংচ মে দাণিং।

রাজা – কথমপরাধকারী মুচ্যতে ?

দময়ন্তী – কিং এদিণা অবরুদ্ধং?

রাজা – এতেন ত্বৎপ্রতিকৃতিমালিখ্যাহমিয়তি বিরহানলে পাতিতঃ।

দময়ন্তী – (স্মিত্বা) জই এবং, তা অহং পি তে পাণিং গহিস্‌সং । তব পাণিলিহিতেণ পতেণ অহং পি এদাবত্থসরীরা জাদা ।"

– উল্লিখিত অংশটি 'নলবিলাস' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক থেকে উদ্ধৃত নল ও দময়ন্তীর সংলাপের অংশবিশেষ । এই উক্তিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায়, এটি প্রগমন নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ ।

নাট্যশাস্ত্রে এই সন্ধ্যঙ্গটির নাম 'প্রগয়ণ'। তত্রোক্ত লক্ষণটি হল– 'উত্তরোত্তরবাক্যং তু ভবেৎ প্রগয়ণং পুনঃ' (না.শা. ১৯/৭৯) – উত্তরোত্তর ক্রমাগত বাক্যবিন্যাসের নাম প্রগয়ণ। নাট্যশাস্ত্রের কোনো কোনো সংস্করণে আবার এরূপ পাঠান্তর আছে – '.... ভবেৎ প্রশমনং বুধাঃ'। এর ব্যাখ্যারূপে বলা যায়, কর্কশ বাক্যের উত্তরে কোমল বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা হৃদয়ে শান্তি স্থাপনের কারণে এই সন্ধ্যঙ্গের নাম প্রশমন । অভিনবভারতীতে আরো বলা হয়েছে, কোনো কোনো আচার্য আবার এটিকে 'প্রাগয়ণ' নামে-ও অভিহিত করেছেন । 'প্রাক্' অর্থাৎ পূর্বোক্ত বচন, তার উত্তর 'অয়নং' অর্থাৎ প্রাপ্তি

অর্থাৎ উত্তরবচনবিন্যাস–এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে–‘প্রাগিতি পূর্ববচনং ততো2য়নং প্রাপ্তিঃ যস্যোত্তরবচনস্যেতি’ (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়) ।

দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা – সর্বত্র প্রগমনের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে– উত্তরোত্তর বাগ্‌বিস্তারের নাম প্রগমন । সাহিত্যদর্পণের ‘কুসুমপ্রতিমা’ টীকার রচয়িতা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে, ‘উত্তরোত্তর বাক্য’ বলতে চিত্তাকর্ষক উত্তরকে বোঝানো হয় –‘উত্তরোত্তরম্ উৎকৃষ্টতরোত্তরস্বরূপং বাক্যং প্রগমনং নাম অয়ং স্যাৎ ’(সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

১১.বজ্র– বজ্রের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল– ‘বজ্রং প্রত্যক্ষকর্কশম্’ (না.দ. ১/৫০) –যখন নাটকীয় পাত্রপাত্রীর প্রতি অপরোক্ষে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে রূঢ় নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তখন বজ্র নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয় । এর দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের পূর্বোক্ত বচন অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্বকৃত কোনো কার্যকে ধূলিসাৎ করা হয়। এই সন্ধ্যঙ্গে নাটকীয় ভাষা হবে রুক্ষ ও পরুষ । বজ্রের মত তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী বাক্য প্রয়োগের জন্য এই সন্ধ্যঙ্গের নাম বজ্র ।

নাট্যদর্পণে বজ্রের অনেকগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; আমরা ‘বেণীসংহার’ থেকে গৃহীত উদাহরণটি আলোচনা করবো –

অশ্বত্থামা (কর্ণমুদ্দিশ্য) – “ রে রে রাধাগর্ভভারভূত ! সূতাপসদ !

কথমপি ন নিষিদ্ধো দুঃখিণা ভীরুণা বা

দ্রুপদতনয়পাণিস্তেন পিত্রা মমাদ্য।

তব ভুজবলদর্পাধ্মায়মানস্য বামঃ

শিরসি চরণ এষ ন্যস্যতে বারয়ৈনম্ ॥”

– উল্লিখিত অংশটি বেণীসংহারের তৃতীয় অঙ্ক থেকে গৃহীত । কর্ণ এবং অশ্বত্থামার বিবাদাবসরে অশ্বত্থামা অত্যন্ত পরুষ ভাষায় কর্ণের বীরত্বের বিষয়টিকে নস্যাৎ করছেন; অতএব এটি বজ্র নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ ।

নাট্যশাস্ত্রে বজ্রের লক্ষণ হল – ‘প্রত্যক্ষনিষ্ঠুরং যদ্বাক্যং বজ্রং তদভিধীয়তে’(না.শা.১৯/৮১)। দশরূপক,নাটকলক্ষণরত্নকোশ,সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকাদি পরভাবী সকল গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিক্ষিপ্ত প্রত্যক্ষ রূঢ়ভাষণকে বজ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে ।

বজ্র এবং সান্ত্বন – এই সন্ধ্যঙ্গদ্বয়ের একটি আন্তঃসম্পর্ক আছে, একথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বজ্রে প্রযুক্ত পরুষভাষণের কারণে সান্ত্বন নামক সন্ধ্যঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষোভপ্রশমনের অবসরটি সৃষ্টি হয়; তাই সর্বদা বজ্রের পরে-ই সান্ত্বন প্রযুক্ত হয় ।

১২.উপন্যাস – 'উপপত্তিরুপন্যাসঃ' (না.দ.১/৫০) –এই হল উপন্যাস নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ।'উপপত্তি' শব্দের অর্থ যুক্তি। যুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে যখন কোনো বিশেষ কার্য সাধন করা হয়, তখন উপন্যাস নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়ে থাকে । অতএব উপন্যাস হল বিশেষ কোনো কার্য সম্পন্ন করার জন্য যুক্তির অবতারণা ।

নাট্যদর্পণে 'কৃত্যারাবণ' এবং 'রঘুবিলাস' – এই দুটি রূপকের অংশবিশেষ উপন্যাসের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে। আমরা 'কৃত্যারাবণ'-এর উদাহরণটি আলোচনা করছি –

রাবণঃ – "সীতে ! আরুহ্যতাং পুষ্পকম্।

সীতা – হতাস ! অবি মরিস্সং, ন পুণ আরুহিস্সং।

রাবণঃ – আঃ! কিং বহুণা! যাবৎ করেণ দৃঢ়পীড়িতমুষ্টিযন্ত্রমুখায় চন্দ্রকিরণদ্যুতিচন্দ্রহাসেন ত্বৎপুরো বটুশিরঃকমলোপহার আরভ্যতে, সমধিরোহ শিবায় তাবৎ ।

সীতা – বরং অত্তণো সরীরস্স অচ্চাহিদং, ন উণ তবোধণাণং । ইয়ং অধিরুহামি মংদভাইণী । হা অজ্জুপত্ত " (ইতি রুদতী আরোহং নাটয়তি)

– উল্লিখিত অংশে দেখা যাচ্ছে, রাবণ সীতাকে তাঁর রথে আরোহণ করার জন্য আদেশ করলে সীতা তা প্রত্যাখ্যান করছেন। তদুত্তরে রাবণ বলছেন, সীতা যদি রথারোহণ না করেন, তবে তিনি সীতার সমক্ষে এক ব্রাহ্মণের মস্তকছেদন করবেন। একথা শুনে ভীতিবিহ্বলা সীতা রথে আরোহণ করছেন । এভাবে স্বীয় কার্যোদ্ধারের জন্য রাবণ যুক্তির অবতারণা করছেন ;অতএব এটি উপন্যাস নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও যুক্তির ক্রমবিন্যাসকে উপন্যাস বলা হয়েছে– 'উপপত্তিকৃতো যো2র্থঃ উপন্যাসশ্চ স স্মৃতঃ' (না.শা.১৯/৮১)। সাগরনন্দী নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে উপন্যাসলক্ষণ নির্ণয় করেছেন। দশরূপককারের মতে, প্রসন্ন বাক্য দ্বারা হেতুর উপন্যাসের মাধ্যমে বীজের উদ্ভেদ সূচিত হলে, তাকে উপন্যাস বলা হয় –'উপন্যাসস্তু সোপায়ম্' (দশ.রূ.১/৩৫)। দর্পণকারের মতে-ও প্রসন্নতাবিধানের নাম উপন্যাস– 'উপন্যাসঃ প্রসাধনম্' (সা.দ. ৬/৯৩) । নাটকচন্দ্রিকাকার রূপগোস্বামীর মতে – 'যুক্তিভিঃ সহিতো যো2র্থ উপন্যাস স ইষ্যতে' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা–১৬৮) – যুক্তিযুক্ত বচনের নাম উপন্যাস। কারো-কারো মতে, প্রসন্নতাবিধান-ই হোক্ বা যুক্তির ক্রমবিন্যাস-ই হোক্ –প্রণয়ব্যাপারে সাফল্যের উপায় উদ্ভাবন-ই এই সন্ধ্যঙ্গের মূল বিষয় ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য,শৃঙ্গারপ্রকাশকার ভোজ 'উপন্যাস' নামক প্রতিমুখসন্ধির এই অঙ্গটিকে স্বীকার করেননি ।

১৩.অনুসর্পণ – অনুসর্পণের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল–'নষ্টেষ্টেহা2নুসর্পণম্' (না.দ.১/৫০) – রূপকে নাট্যবীজরূপ ইষ্টবস্তু প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়ার পরে-ও প্রতিকূল ঘটনার উপস্থাপনায় মাঝে-মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। অদৃশ্যসেই বীজকে সর্বতোভাবে অন্বেষণ করার নাম-ই অনুসর্পণ।

'পার্থবিজয়' রূপকের একটি অংশ অনুসর্পণের উদাহরণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে–

দ্রৌপদী – "মহারায় ! ইমাং হি য্যেব দিবসপরিবত্তণ গণনাহিং কিণীভূদ-পরিভবুব্বেয়-দুকখস্স মে হিয়য়স্স পম্হুট্ঠো বিঅ অণজ্জদুস্সাসণেন অত্তণো কেসগ্গাহাবমাণবৃত্তংতো।"

– উল্লিখিত অংশটি যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি। দুঃশাসনকৃত কেশাকর্ষণের অপমান পাঞ্চালী বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় সেই অসম্মান আবার তাঁর স্মরণপথে উদিত হচ্ছে । প্রথমে দৃষ্ট, পরে নষ্ট বীজের পুনরন্বেষণের কারণে এটি অনুসর্পণ নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে এই সন্ধ্যঙ্গটির নাম পরিসর্প। সেখানে-ও বলা হচ্ছে, প্রথমে দৃষ্ট ও পরে নষ্ট বীজের অনুসরণ-ই পরিসর্প– 'দৃষ্টনষ্টানুসরণং পরিসর্পস্তু বর্ণ্যতে'(না.শা. ১৯ /৭৬)। 'পরিসর্প' শব্দের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলছেন, নাটকীয় বস্তুর প্রসরণ অর্থাৎ প্রসারের কারণে এই সন্ধ্যঙ্গটির এই নাম – 'প্রকৃতস্যার্থস্য পরিসর্পণাৎ প্রসরণাৎ পরিসর্পঃ' (না.শা. উনবিংশ অধ্যায়)। দশরূপকে আবার এই সন্ধ্যঙ্গটিকে অনুসর্পণ নামে-ই অভিহিত করা হয়েছে – 'দৃষ্টনষ্টানুসর্পণম্' (দশ.রূ.১/৩২)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে সাগরনন্দী-ও এক-ই অভিমত পোষণ করেছেন – 'প্রথমং দৃষ্টস্য পশ্চান্ন দৃষ্টস্যানুসরণং পরিসর্পঃ'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়) । রূপগোস্বামীর মতে, নষ্ট বস্তুর স্মৃতির নাম পরিসর্প – 'স্মৃতির্নষ্টস্য বীজস্য পরিসর্প ইতি স্মৃতঃ' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ১২৭)।

গর্ভসন্ধ্যঙ্গ ঃ

অনন্তর গর্ভসন্ধ্যঙ্গগুলির আলোচনা করা হচ্ছে। এদের সংখ্যা তেরোটি । যথা – সংগ্রহ, রূপ, অনুমান, প্রার্থনা, উদাহৃতি, ক্রম, উদ্বেগ, বিদ্রব, আক্ষেপ, অধিবল, মার্গ, অসত্যাহরণ এবং তোটক । এগুলির মধ্যে সংগ্রহ থেকে বিদ্রব পর্যন্ত আটটি সন্ধ্যঙ্গ নাট্যবীজের বিকাশ ও পরিপোষণে অত্যন্ত সহায়ক নয় বলে এগুলি অপ্রধান; শেষোক্ত পাঁচটি অঙ্গ বীজের পুষ্টিসাধনে প্রত্যক্ষভাবে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণভাবে সহায়তা করায় এগুলি প্রধান। দশরূপকের টীকাকার ধনিক-ও এই পাঁচটি অঙ্গের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন –'এষাং চ মধ্যে অভূতাহরণ-মার্গ-তোটকাধিবলাপেক্ষাণাং প্রাধান্যম্ ইতরেষাং যথাসম্ভবং প্রয়োগ ইতি ' (দশ.রূ.প্রথম প্রকাশ) । তবে ফলের উদ্ভেদের প্রকাশক বলে সংগ্রহ নামক অঙ্গটি অবশ্যনিবন্ধনীয় ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে-ও গর্ভসন্ধির তেরোটি অঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে নাট্যদর্পণোক্ত 'উদাহৃতি' ও 'আক্ষেপ' – এই দুটি অঙ্গকে যথাক্রমে 'উদাহরণ' ও 'আক্ষিপ্ত' নামে অভিহিত করা হয়েছে।'আক্ষিপ্ত'-স্থলে সাগরনন্দী 'উৎক্ষিপ্ত' এবং বিশ্বনাথ 'ক্ষিপ্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দশরূপককার ধনঞ্জয় 'প্রার্থনা' নামক অঙ্গটিকে বর্জন করে গর্ভসন্ধির বারোটি অঙ্গ স্বীকার করেছেন।

১.সংগ্রহ – নাট্যদর্পণধৃত সংগ্রহলক্ষণটি হল – 'সংগ্রহঃ সামদানাদিঃ' (না.দ.১/৫৩) –'সাম' কথার অর্থ প্রসন্ন করা, 'দান' কথার অর্থ স্বত্ববিসর্জনপূর্বক অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিছু সমর্পণ করা। এই সাম এবং দানসমন্বিত প্রিয় বাক্যকে সংগ্রহ নামে অভিহিত করা হয়। লক্ষণোক্ত 'সামদান' পদটি উপলক্ষণ; এর দ্বারা ভেদ ও দণ্ড এই উপায় দুটিকে-ও বোঝানো হয়েছে। বৃত্তিতে বলা হয়েছে –'সামদানে ভেদদণ্ডয়োরুপলক্ষণম্'[৮২]– ভেদ অর্থাৎ কূটকৌশল দ্বারা দুই মিত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, দণ্ড অর্থাৎ শাস্তিবিধান। লক্ষণোক্ত 'আদি' পদের দ্বারা মায়া-ইন্দ্রজাল ইত্যাদির গ্রহণ হয়েছে। অতএব সমাসতঃ বলা যায়, গর্ভসন্ধির যে অঙ্গে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড- ইন্দ্রজালাদিসমন্বিত বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তার নাম সংগ্রহ।

নাট্যদর্পণে প্রথমোক্ত চারটি প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সাম ও দানের উদাহরণ দুটি 'রত্নাবলী'-র তৃতীয় অঙ্ক থেকে গৃহীত –

রাজা – "বয়স্য ! ন খলু কিঞ্চিৎ ত্বয়ি ন সম্ভাব্যতে" – বিদূষকের প্রতি রাজার এই প্রিয়বাক্য প্রয়োগ সামের উদাহরণ। আবার বিদূষকমুখে সাগরিকার সঙ্কেতাদিবার্তা শ্রবণের পর রাজা পারিতোষিকরূপে একটি বলয় বিদূষককে প্রদান করছেন –

রাজা – "সাধু বয়স্য ! সাধু! ইদং তে পারিতোষিকং কটকং দদামি"– এটি দানের উদাহরণ।

ভেদ ও দণ্ডের উদাহরণ দুটি 'রঘুবিলাস'-এর যথাক্রমে পঞ্চম ও চতুর্থ অঙ্ক থেকে গৃহীত । বালিপুত্র ও সুগ্রীবের মধ্যে রাবণ কর্তৃক বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টাটি ভেদের উদাহরণ । রাবণকর্তৃক ভয়প্রদর্শনপূর্বক সীতাকে হরণের ঘটনাটি দণ্ডের উদাহরণ ।

সংগ্রহলক্ষণবিষয়ে নাট্যদর্পণের অভিমতটি নাট্যশাস্ত্রানুসারী। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে – 'সামদানাদিসম্পন্নঃ সংগ্রহঃ পরিকীর্তিতঃ'(না.শা. ১৯/৮৫)। দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতটি-ও অনুরূপ– 'সংগ্রহঃ সামদানোক্তিঃ'(দশ.রূ.১/৪০)।নাটকলক্ষণরত্নকোশে সাগরনন্দী-ও সামদানাদিযুক্ত বাক্যকে সংগ্রহ নামে অভিহিত করেছেন। সাহিত্যদর্পণকারের অভিমতটি একটু পৃথক। তদনুসারে সাম অর্থাৎ প্রিয়বাক্যকথনের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির নাম সংগ্রহ –

"...সংগ্রহঃ পুনঃ।

সামদানার্থসম্পন্নঃ ॥"(সা.দ.৬/৯৭)

নাটকচন্দ্রিকাকারের মতটি দর্পণকারের মতের অনুরূপ– 'সামদানার্থসংযোগঃ সংগ্রহঃ পরিকীর্তিতঃ' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা –১৯৪)।

২.রূপ – 'রূপ' নামক অঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'রূপং নানার্থসংশয়ঃ'(না.দ.১/৫৩)– কোনো বিষয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার সংশয়ের উত্থাপনে যখন বিষয়টির স্বরূপ অবধারণে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন সেই সন্ধ্যঙ্গটিকে রূপ নামে অভিহিত করা হয়। মুখসন্ধির 'যুক্তি' নামক অঙ্গটির সঙ্গে এই অঙ্গটির সাদৃশ্য সহজে-ই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রূপ হল বিমূর্তবিষয়সংক্রান্ত;অন্যদিকে যুক্তি মূর্তবিষয়ক – কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের দোষ-গুণ বিচারণাপূর্বক কোনো কাজের পর্যালোচনা করার নাম যুক্তি – এই হল রূপ ও যুক্তির বৈসাদৃশ্য। অভিনবভারতীতে-ও বলা হয়েছে –"যুক্তিস্তু নিয়তপ্রতিপত্তিপর্যন্তেতি বিশেষঃ। রূপমিতি চানিয়তা আকৃতিরুচ্যতে" (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে 'কৃত্যারাবণ' থেকে রূপের উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে –

রামঃ – " গিরিরয়মমরেন্দ্রেণাদ্য নির্লূনপক্ষঃ

কৃতরিপুরসুরেশৈঃ শাতিতো বৈনতেয়ঃ ।

অপরমিহ মনো মে যঃ পিতুঃ প্রাণভূতঃ

কিমুত বত স এষ ব্যতীতায়ুর্জটায়ুঃ ॥"

– উক্ত উদাহরণটিতে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্তে এরূপ সংশয়ের উদয় হচ্ছে – এটি কি একটি পর্বত, দেবরাজ ইন্দ্র যার পক্ষছেদন করেছেন ? অথবা বিনতাপুত্র তাঁর শত্রুরাজগণকর্তৃক নিহত হয়েছেন? অথবা এটি জটায়ুর মৃতদেহ? এরূপ চিন্তাভাবনা এবং তজ্জনিত সংশয়ের কারণে এটি রূপ নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ ।

রূপ নামক সন্ধ্যঙ্গটির স্বরূপবিচারে ডঃ.কে. এইচ ত্রিপাঠী মনে করেন, এই অঙ্গটি পরবর্তীকালে সন্দেহ নামক অলঙ্কারে পরিণতি লাভ করেছে ।

নাট্যদর্পণে রূপের অপর একটি লক্ষণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কোনো কোনো আচার্যের মতে,ফলপ্রাপ্তির প্রতীক্ষাকালে নায়কাদির মধ্যে বিতর্কিত বাক্যপ্রয়োগের নাম রূপ। উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধার করা হয়েছে –

রাজা – " প্রণয়বিশদাং দৃষ্টিং বক্ত্রে দদাতি ন শঙ্কিতা

ঘটয়তি ঘনং কণ্ঠাশ্লেষে রসান্ন পয়োধরৌ।

বদতি বহুশো গচ্ছামীতি প্রযত্নধৃতা2প্যহো

রময়তিতরাং সঙ্কেতস্থা তথাপি হি কামিনী ॥”

–কথং চিরয়তি বসন্তকঃ? কিং নু খলু বিদিতঃ স্যাদয়ং বৃত্তান্তো দেব্যাঃ?” –এই অংশে রত্নাবলীসমাগমরূপ প্রাপ্তির আনুগুণ্য এবং দেবী বাসবদত্তার শঙ্কারূপ বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায়, রূপ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

এই অভিমতটি একান্তভাবে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। তত্রোক্ত রূপলক্ষণটি হল –‘রূপং বিতর্কবদ্বাক্যম্’ (দশ.রূ. ১/৩৯)। উদাহরণটি-ও এই গ্রন্থ থেকে-ই গৃহীত। পরভাবী বিশ্বনাথ-ও এই মতটি সমর্থন করেছেন–‘রূপং বাক্যং বিতর্কবৎ’ (সা.দ.৬/৯৬)।

নাট্যদর্পণে রূপের আরো একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে– ‘চিত্রার্থং রূপকং বচঃ’[৮৩]– নানাপ্রকার বিস্ময়জনক বাক্যবিন্যাসের নাম রূপ। এর উদাহরণরূপে ‘বেণীসংহার’ নাটকের অন্তর্গত সুন্দরক-কর্তৃক যুদ্ধের বিচিত্র বিরণের অংশটি উল্লিখিত হয়েছে।

এই অভিমতটি যে কোন্ পূর্বাচার্যের, তা স্পষ্ট নয়। তবে নাট্যশাস্ত্রের রূপলক্ষণটি অনেকাংশে এর অনুরূপ।সেখানে বলা হয়েছে – ‘চিত্রার্থসমবায়ে তু বিতর্কো রূপমিষ্যতে’ (না.শা.১৯/৮৩)– অর্থাৎ বিস্ময়কর বিষয় সম্পর্কে বিতর্ককে বলা হয় রূপ। রূপলক্ষণনির্ণয়ে আচার্য সাগরনন্দী ভরতোক্ত লক্ষণটির-ই প্রায় পুনরুক্তি করেছেন।

৩.অনুমান – অনুমান নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – ‘অনুমা নিশ্চয়ো লিঙ্গাৎ’(না.দ. ১/৫৩)– ‘লিঙ্গ’ অর্থাৎ হেতুর দ্বারা কোনো বিষয়ে ধারণাকে বলা হয় অনুমান।

ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানের তিনটি তথ্য – সাধ্য, পক্ষ ও হেতু । ‘পর্বতো2য়ং বহ্নিমান্ ধূমাৎ’–এই অনুমিতিবাক্যে পর্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু বা লিঙ্গ। ধূমদর্শনে পর্বতে বহ্নির উপস্থিতি অনুমান করা হয়; অতএব ধূম হল বহ্নির অনুমাপক। ‘যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্রাগ্নিঃ’ এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের মাধ্যমে ‘পর্বতো বহ্নিমান্’ – এই অনুমিতি জ্ঞান হয়। অনুরূপে, রূপকে কোনো লিঙ্গ বা চিহ্নের দ্বারা কোনো বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিতকরণ বা স্থিরীকরণের নাম অনুমান।

নাট্যদর্পণে এই গর্ভসন্ধ্যঙ্গটির সঙ্গে ‘যুক্তি’ নামক মুখসন্ধ্যঙ্গটির একটি পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। কোনো বিষয়ের দোষ-গুণ বিবেচনাপূর্বক পর্যালোচনাত্মক ‘ঊহ’ অর্থাৎ বিতর্কের নাম যুক্তি। অন্যদিকে অনুমান হল কোনো বিষয়ে নিশ্চয়করণ বা স্থিরীকরণ। এই অভিমতটি অভিনবগুপ্তের মতানুসারী। অভিনবভারতীতে-ও এই দুই সন্ধ্যঙ্গের প্রভেদ নির্দেশপূর্বক বলা হচ্ছে – ‘অনুমানং নিশ্চয়াত্মকত্বাদূহঃ উপায়াযুক্তেরন্যত্বাৎ’(না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে অনুমানের দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে– প্রথমটি ভাসকৃত ‘স্বপ্নবাসবদত্তম্’ নাটকের চতুর্থাঙ্ক থেকে এবং দ্বিতীয়টি ‘যাদবাভ্যুদয়’ রূপকের ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে। আমরা প্রথমটি-ই এখানে উপস্থাপিত করছি –

রাজা–“পাদাক্রান্তানি পুষ্পাণি সোষ্ম চেদং শিলাতলম্।

নূনং কাচিদিহাসীনা মাং দৃষ্টা সহসা গতা ॥”

–এই শ্লোকটির প্রথমার্ধগত পদপিষ্ট পুষ্প ও উষ্ণ শিলাতল– এই দুটি চিহ্নের দ্বারা উত্তরার্ধগত ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্বের অনুমান করা হচ্ছে; অতএব এটি অনুমান নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, স্বপ্নবাসবদত্তমের অধুনাপ্রাপ্ত সংস্করণে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

আচার্য ভরতের মতে, রূপ বা আকার দেখে কোনো বিষয়কে জানার নাম অনুমান। নাট্যশাস্ত্রোক্ত অনুমানলক্ষণটি হল– ‘রূপানুরূপগমনমনুমানমিতি স্মৃতম্’(না.শা.১৯/৮৫)। রূপিত হয়– এই অর্থে রূপ শব্দের দ্বারা বস্তু-ই এখানে বিবক্ষিত। দশরূপককারের মতে– ‘অভ্যূহো লিঙ্গতো2নুমা’ (দশ.রূ. ১/৪০)– কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন বা হেতুকে নির্দেশ করার নাম অনুমান। নাটকলক্ষণরত্নকোশে সাগরনন্দী নাট্যশাস্ত্রের মতটি-ই সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন– ‘রূপানুগমনমনুমানম্’(না.ল.র.অষ্টম অধ্যায়)।সাহিত্যদর্পণকারের মতে, নিয়তসাধ্যসমানাধিকরণ সাধন থেকে সাধ্যের জ্ঞান-ই হল অনুমান – ‘লিঙ্গাদূহো2নুমানতা’(সা.দ.৬/৯৮)। এখানে ‘উহ’ শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিতর্ক নয়। পরভাবী রূপগোস্বামী অনুমানলক্ষণনির্ণয়ে দর্পণকারের মতটির অবিকল পুনরুক্তি করেছেন মাত্র।

৪.প্রার্থনা – প্রার্থনা নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – ‘প্রার্থনা ভাবযাচনম্’ (না.দ. ১/৫৩)– নাটকের মুখ্য ভাব তথা নাটকীয় কার্যের পক্ষে উপযোগী রতি-হর্ষ-উৎসাহ ইত্যাদি যাচ্ঞার নামক প্রার্থনা । রূপকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থাৎ সাধ্যফলের উপযোগী প্রধান যে ভাব, তদনুকূল বিষয়ের বিশেষ অভীপ্সা হল প্রার্থনা নামক সন্ধ্যঙ্গের বিষয়।

নাট্যদর্পণে প্রার্থনার দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি ‘দেবীচন্দ্রগুপ্ত’ এবং দ্বিতীয়টি ‘কৃত্যারাবণ’ নামক রূপকদ্বয় থেকে গৃহীত। আমরা প্রথমটি-ই আলোচনা করবো–

চন্দ্রগুপ্ত – “প্রিয়ে মাধবসেনে! ত্বমিদানীং মে বন্ধম্ আজ্ঞাপয়।

কণ্ঠে কিন্নরকণ্ঠি! বাহুলতিকাপাশঃ সমাসজ্যতাং

হারস্তে স্তনবান্ধবো মম বলাদ্ বধ্নাতু পাণিদ্বয়ম্।

পাদৌ ত্বজ্জঘনস্থলপ্রণয়িনী সন্দানয়েন্মেখলা

পূর্বং ত্বদ্গুণবদ্ধমেব হৃদয়ং বন্ধং পুনর্নার্হতি ॥”

–দেবীচন্দ্রগুপ্ত রূপকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে গৃহীত এই শ্লোকটি। শৃঙ্গাররসাত্মক এই রূপকে নায়ক চন্দ্রগুপ্ত নায়িকা মাধবসেনার কাছে রতিবিষয়ক অভিপ্রায় প্রকাশ করছেন। শৃঙ্গাররসের অনুকূল রতিভাবের যাচ্ঞার কারণে,এটি প্রার্থনা নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে প্রার্থনার লক্ষণটি হল– 'রতিহর্ষোৎসবানাং তু প্রার্থনা প্রার্থনা ভবেৎ' (না.শা.১৯/৮৬)– অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রকারের মতে-ও, রতি-হর্ষ-উৎসবাদির যাচ্ঞার নাম-ই হল প্রার্থনা।

নাট্যদর্পণে প্রার্থনার আরেকটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে– 'কেচিদভ্যর্থনামাত্রং প্রার্থনামাহুঃ'।[৮৪] অর্থাৎ কোনো-কোনো আচার্যর মতে, যেকোনো প্রকার যাচ্ঞার নাম-ই প্রার্থনা। এর উদাহরণরূপে 'রঘুবিলাস' নামক রূপকের একটি শ্লোক প্রদত্ত হয়েছে, যেখানে রাক্ষস, রাবণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।... এই অভিমতটি সম্ভবতঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশরচয়িতা সাগরনন্দীর । তত্রধৃত প্রার্থনালক্ষণে এই অভিমত-ই পোষণ করা হয়েছে– 'অভ্যর্থনাযুক্তং বচনং প্রার্থনা'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)।

কোনো কোনো আচার্য, যথা – দশরূপককার ধনঞ্জয়, তদ্‌ভ্রাতা ধনিক প্রমুখ এই অঙ্গটিকে স্বীকার করেননি। তাই এঁদের মতে গর্ভসন্ধির অঙ্গসংখ্যা বারোটি। পরভাবী দর্পণকার গর্ভসন্ধ্যঙ্গসমূহের আলোচনাবসরে প্রার্থনার আলোচনা করলে-ও, এই স্বীকৃতি যে কেবলমাত্র পূর্বাচার্যদের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ – একথা-ও বলেছেন। বিশ্বনাথ নির্বহণসন্ধিতে 'প্রশস্তি' নামক অঙ্গটিকে স্বীকার করেছেন। অতএব গর্ভসন্ধির প্রার্থনা নামক অঙ্গটিকে-ও স্বীকার করলে সন্ধ্যঙ্গসমূহের সংখ্যা চৌষট্টির পরিবর্তে পঁয়ষট্টি হয়ে যাবে,যা অসিদ্ধ। নাটকচন্দ্রিকাকার রূপগোস্বামী-ও প্রার্থনা নামক অঙ্গটিকে স্বীকার করেননি।

৫. উদাহরণ – উদাহরণ নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল– 'উদাহৃতিঃসমুৎকর্ষঃ'(না.দ.১/৫৪) – উৎকর্ষসূচক নাটকীয় বাক্যবিন্যাসের নাম উদাহৃতি বা উদাহরণ। লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রচলিত বস্তু অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষসহকারে কোনো বিষয় বর্ণনা করা হয় এই সন্ধ্যঙ্গে। 'উৎ' উপসর্গটি এখানে আধিক্যার্থে প্রযুক্ত, আ-হৃ ধাতুর অর্থ 'বাচন'। অতএব ব্যুৎপত্তিগতবিচারে-ও , আধিক্যযুক্ত বচন-ই উদাহরণ– একথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

নাট্যদর্পণে 'রত্নাবলী' নাটিকা থেকে মহারাজ উদয়নের দ্বারা উক্ত একটি শ্লোক উদাহৃতির উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে–

"মনঃ প্রকৃত্যৈব চলং দুর্লক্ষ্যং চ তথাপি মে।
কামেনেদং কথং বিদ্ধং? সমং সর্বৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥"

–উল্লিখিত শ্লোকটিতে অন্যান্য ধনুর্ধরগণ অপেক্ষা কামদেবের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করা হয়েছে। স্বভাবচঞ্চল মনকে এক-ই ক্ষেপে সবকটি শরের দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছে, এই বক্তব্যের দ্বারা পৃথিবীস্থ সকল ধনুর্ধারী অপেক্ষা পুষ্পশরের আধিক্যমুখে প্রশংসা করা হচ্ছে; অতএব এটি উদাহৃতি নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রধৃত উদাহৃতি লক্ষণটি হল– 'যৎ সাতিশয়বদ্‌বাক্যং তদুদাহরণং স্মৃতম্' (না.শা. ১৯/৮৪)। অভিনবভারতীতে ব্যাখ্যাপূর্বক বলা হচ্ছে – 'লোকপ্রসিদ্ধবস্তুপেক্ষয়া যৎ সাতিশয়মুচ্যতে উৎকর্ষমাবহতীত্যুদাহরণম্'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)– লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু অপেক্ষা অতিশয়িত অপর কোনো বস্তুর উৎকর্ষকথনকে-ই উদাহরণ নামে অভিহিত করা হয়। সাগরনন্দী 'সাতিশয়ং বচনমুদাহরণম্' (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)– এই উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট-ই নাট্যশাস্ত্রের মতকে অনুসরণ করেছেন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে, নিজের অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির উৎকর্ষজ্ঞাপক বিষয় বর্ণনার নাম উদাহরণ। নাটকচন্দ্রিকাকার রূপ গোস্বামী এক-ই অভিমত পোষণ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণধৃত উদাহরণটি সাহিত্যদর্পণে 'রূপ'নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে।

৬. ক্রম– নাট্যদর্পণসম্মত ক্রমলক্ষণটি হল– 'ক্রমো ভাবস্য নির্ণয়ঃ'(না.দ.১/৫৪)– ভাবের নির্ণয় অর্থাৎ নিশ্চিতকরণ করার জন্য ক্রম নামক সন্ধ্যঙ্গটির নিবেশ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন – ভাব কাকে বলা হয়? আচার্য ভানুদত্ত তাঁর 'রসতরঙ্গিনী' গ্রন্থে বলছেন– 'রসানুকূলো বিকারো ভাব ইতি হি তল্লক্ষণম্'(রসতরঙ্গিনী, প্রথম তরঙ্গ) – অর্থাৎ রসসৃষ্টির সহায়ক দৈহিক ও মানসিক বিকারের নাম ভাব। সাহিত্যদর্পণকারের মতে,নির্বিকারচিত্তের প্রাথমিক বিকারের নাম ভাব– 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া'– অর্থাৎ চিত্তে রসবিশেষের প্রকাশ-পরিস্ফুরণের প্রথম নিদর্শনকে ভাব বলা হয়ে থাকে। এই ভাবের নির্ণয় করা হয় গর্ভসন্ধির যে অঙ্গে, তার-ই নাম ক্রম।

নাট্যদর্পণে 'ভাব' শব্দটি দুটি বিশেষ আঙ্গিকে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথমতঃ,'ভাব' শব্দ এখানে 'পরাভিপ্রায়'-কে বুঝিয়েছে। অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির মনোগত অভিপ্রায় বা চিন্তার গতি সম্বন্ধে নিশ্চিতকরণ– এই হল একটি অর্থ। দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় চিত্তে নিরন্তর চিন্তিত অর্থাৎ ভাব্যমান কোনো বিষয়ের যথার্থ উপলব্ধি। অতএব অন্য ব্যক্তির অভিপ্রায় অথবা নায়কাদির নিজের অতিচিন্তিত কোনো বিষয়ে নির্ণয় করা হয় যে সন্ধ্যঙ্গে, তার নাম ক্রম। এই নির্ণয়-ও হবে 'উহ' অর্থাৎ তর্কবিতর্ক ও 'প্রতিভা' অর্থাৎ বুদ্ধি– এই সকল ভাবনাবিশেষের দ্বারা, যুক্তিসঙ্গতভাবে;অনুমাননির্ভরতায় নয়। 'ক্রম' শব্দটির প্রয়োগব্যাখ্যাবসরে অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে– 'বুদ্ধির্হি তত্র ক্রমতে, ন প্রতিহন্যতে'

(না.শা. উনবিংশঅধ্যায়) – বুদ্ধি অর্থাৎ যৌক্তিক চিন্তাধারার মাধ্যমে ভাবনির্ণয় করার নাম-ই ক্রম। নাট্যদর্পণকারদ্বয় এ বিষয়ে সহমত; বৃত্তিতে এই উক্তিটি অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে।

নাট্যদর্পণে ক্রমের দুটি উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে – প্রথমটি 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' থেকে, দ্বিতীয়টি শ্রীহর্ষকৃত 'রত্নাবলী' থেকে। আমরা প্রথমটির আলোচনা করছি–

চন্দ্রগুপ্তঃ – (ধ্রুবদেবীং দৃষ্ট্বা স্বগতমাহ)''ইয়মপি দেবী তিষ্ঠতি, যৈষা

রম্যাং চারতিকারিণীং চ করুণাং শোকেন নীতা দশাং

তৎকালোপগতেন রাহুশিরসা গুপ্তেব চান্দ্রী কলা।

পত্যুঃ ক্লীবজনোচিতেন চরিতানেন পুংসঃ সতঃ

লজ্জা-কোপ-বিষাদ-ভীত্যরতিভিঃ ক্ষেত্রীকৃতা তাম্যতি ॥''

– উল্লিখিত অংশে রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিভিন্ন লক্ষণদৃষ্টে রাজ্ঞী ধ্রুবদেবীর মানসিক বৈকল্যের নির্ণয় করছেন;অতএব এটি ক্রম নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রসম্মত ক্রমলক্ষণটি হল – 'ভাবতত্ত্বোপলব্ধিস্তু ক্রম ইত্যভিধীয়তে'(না.শা.১৯/৮৪) – অর্থাৎ ভাব্যমান বস্তু বিষয়ে ভাবনার আতিশয্যবশতঃ ইষ্টোপলব্ধির নাম ক্রম। দর্পণকার এবং নাটকচন্দ্রিকাকার-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন।

নাট্যদর্পণে ক্রমের আরেকটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো পূর্বাচার্যের মতে – 'ক্রমঃ সঞ্চিন্ত্যমানাপ্তিঃ' [৮৫] – অর্থাৎ অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির চিন্তা অনুযায়ী কার্য সাধিত হলে বা ইষ্টবস্তুর প্রাপ্তি হলে ক্রম নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়। এর উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী'-র তৃতীয় অঙ্ক থেকে রাজা ও বিদূষকের কথোপকথনটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই অংশে রাজা উদয়ন সাগরিকার সমাগম ইচ্ছা করে সেই বিষয়ে চিন্তা করছেন, কিন্তু সাগরিকার রূপে উপস্থিত হলেন বাসবদত্তা। এই ভ্রান্ত সাগরিকাপ্রাপ্তি-ই ক্রম।... এই অভিমতটি একান্তভাবে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের, যদি-ও নাট্যদর্পণকারদ্বয় তাঁর নামোল্লেখ করেননি। উদাহরণটি-ও দশরূপক থেকে-ই গৃহীত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ধনঞ্জয় ক্রম নামক এই সন্ধ্যঙ্গটির বিষয়ে অপর একটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। সেটি হল– 'ভাবজ্ঞানমথাপরে' (দশ.রূ. ১/৩৯)। এই মতানুসারে, যেখানে অপর কোনো নাটকীয় পাত্র বা পাত্রীর দ্বারা নায়কাদির ভাব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়, সেখানে ক্রম নাম সন্ধ্যঙ্গের নিবেশ ঘটে। ধনঞ্জয় এই মতটি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, তা নির্ণয় করা দুষ্কর।

নাট্যদর্পণে ক্রমের আরো একটি লক্ষণের কথা আলোচনা করা হয়েছে । এই মতানুসারে, ভবিষ্যৎ ঘটনার উপলব্ধির নাম ক্রম। উদাহরণস্বরূপ 'বেণীসংহার' নাটকের আচার্য কৃপ-কথিত একটি অংশের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তিনি দুর্যোধনকে বলছেন যে, ত্রিলোকবিজয়ী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা

যুদ্ধে অবশ্য-ই যুধিষ্ঠিরসেনাদের বিনাশ করবেন। এভাবে ভাবী ঘটনার বর্ণনাবশতঃ এখানে ক্রম নামক সন্ধ্যঙ্গের অবকাশ ঘটেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই অভিমতটি একান্তভাবে নাটকলক্ষণরত্নকোশরচয়িতা সাগরনন্দীর। তত্রোদ্ধৃত ক্রমলক্ষণটি হল –'ভবিষ্যৎতত্ত্বোপলব্ধিঃ ক্রমঃ' (না.ল.র. অষ্টমঅধ্যায়)। উদাহরণটি-ও উক্ত গ্রন্থ থেকে-ই গৃহীত।

৭. উদ্বেগ – নাট্যদর্পণানুসারে গর্ভসন্ধির সপ্তম অঙ্গটির নাম উদ্বেগ। তত্রোক্ত উদ্বেগলক্ষণটি হল– 'উদ্বেগো ভীঃ' (না.দ. ১/৫৪)। ব্যাখ্যায় বিশদে বলা হচ্ছে, দস্যু, তস্কর, নৃপ, শত্রু এবং নায়িকা থেকে উৎপন্ন ভীতির নাম উদ্বেগ।

গ্রন্থে চারটি বিষয়ের-ই উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। প্রথমটি অর্থাৎ তস্করাদিজনিত ভীতির উদাহরণরূপে অমাত্য শঙ্কুক-বিরচিত 'চিত্রোৎপলাবলম্বিতক' নামক প্রকরণের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে, যেখানে দস্যুদের আক্রমণে রাজগৃহ ভঙ্গ হওয়ার উপক্রমে নায়িকা, তৎসখী এবং স্থবিরগণ ভীতিবশতঃ আর্তনাদ করছেন।

দ্বিতীয়টি নৃপজনিত অর্থাৎ রাজবিহিত শাস্তি বা তৎকৃত অত্যাচারের ভীতি। এর উদাহরণরূপে 'মৃচ্ছকটিকম্'-এ সার্থবাহ চারুদত্তের চৌর–অপবাদে রাজদণ্ডের ভীতির বিষয়টি উপন্যস্ত হয়েছে।

আচার্য সাগরনন্দী এবং পরভাবী দর্পণকার অন্য কোনো বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ না করে, কেবল নৃপজনিত ভীতিকে-ই উদ্বেগ নামে অভিহিত করেছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থে বিধৃত উদ্বেগলক্ষণটি হল– 'নৃপাদিজনিতভয়মুদ্বেগঃ'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়); সাহিত্যদর্পণধৃত উদ্বেগলক্ষণটি হল– 'নৃপাদিজনিতা ভীতিরুদ্বেগঃ পরিকীর্তিতঃ'(সা.দ. ৬/১০০)।

উদ্বেগের তৃতীয় প্রকারটি হল অরিজনিত ভীতি। এর উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর পঞ্চমাঙ্কের অংশবিশেষ উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে পাণ্ডবগণের ভয়ে কৌরবপক্ষের ইতস্ততঃ পলায়নের কথা বলা হচ্ছে।

নাট্যশাস্ত্রধৃত উদ্বেগলক্ষণে উক্ত তিনটি বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়েছে। তত্রোক্ত লক্ষণটি হল– 'ভয়ং নৃপারিদস্যুত্থমুদ্বেগঃ পরিকীর্তিতঃ'(না.শা. ১৯/৮৮) – অর্থাৎ রাজা, শত্রু অথবা দস্যু থেকে উৎপন্ন ভয়ের নাম উদ্বেগ। নাটকচন্দ্রিকাকার রূপগোস্বামী উদ্বেগলক্ষণনির্ণয়ে মহর্ষি ভরতকে অনুসরণ করেছেন – 'শত্রুচৌরাদিসম্ভূতং ভয়মুদ্বেগমুচ্যতে' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ২০৬)। দশরূপককার ধনঞ্জয় আবার কেবল নাট্যদর্পণোক্ত এই তৃতীয় প্রকারটিকে উদ্বেগ বলে অভিহিত করেছেন। তন্মতে, শত্রুকর্তৃক উৎপন্ন ভীতির নাম উদ্বেগ– 'উদ্বেগো2রিকৃতা ভীতিঃ'(দশ.রূ.১/৪২)।

উদ্বেগের চতুর্থ বিষয়টি হল, প্রধানা নায়িকা ব্যতীত অন্যান্য নায়িকাদের ভীতি।এর উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার অংশবিশেষ উল্লিখিত হয়েছে যেখানে সাগরিকা, প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার কারণে ভীত হচ্ছেন।

উল্লেখ্য, এই বিষয়টিতে নাট্যদর্পণকারদ্বয় অভিনবভারতীর অনুসরণ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রোক্ত উদ্বেগলক্ষণে 'অরি'পদটির ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলেছেন – 'অরিশব্দান্নায়িকাদি' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)– অর্থাৎ তাঁর মতে, অন্য নায়িকা-ই অরিপদবাচ্য। এই মত অনেকাংশে-ই সমর্থনযোগ্য। কারণ, শৃঙ্গাররসমূলক রূপকে সাধারণতঃ শত্রুচরিত্র কম থাকে। সেক্ষেত্রে প্রতিকূল-আচরণকারিণী প্রাক্তন নায়িকা-ই প্রধানতঃ শত্রুতাচরণ করে থাকেন। সম্ভবতঃ এই কারণে-ই 'অরি'পদের দ্বারা তিনি পূর্বতন মহিষী প্রমুখ নায়িকাকে বুঝিয়েছেন।

৮. বিদ্রব – নাট্যদর্পণসঙ্গত বিদ্রবলক্ষণটি হল– 'দ্রবঃ শঙ্কা' (না.দ. ১/৫৪)– ভয়-ত্রাসজনক বস্তু বা ঘটনা থেকে আশঙ্কিত ভীতির নাম বিদ্রব। শব্দের ব্যুৎপত্তিবিচার করতে গিয়ে ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে – 'দ্রবতি শ্লথীভবতি হৃদয়ম্ অনয়েতি দ্রবঃ'।[৮৬] ব্যাখ্যাটি অনেকাংশে-ই অভিনবভারতীর অনুসারী। সেখানে-ও বলা হচ্ছে – 'বিদ্রবতি বিলীয়তে হৃদয়ং যেনেতি'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)– ভয়বশতঃ হৃদয় বা চিত্ত শ্লথ হয়ে যায় যে ঘটনার দ্বারা, তার-ই নাম বিদ্রব।

উদ্বেগ এবং বিদ্রবের লক্ষণদৃষ্টে দুটিকে সদৃশ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু উদ্বেগ হল আগত ভয়কারক ঘটনা, যা ইতিমধ্যে-ই সংঘটিত; অন্যদিকে বিদ্রব হল ভীতিপ্রদ অপকারক ঘটনার সম্ভাবনা– এই হল এদের পার্থক্য।

নাট্যদর্পণে 'কৃত্যারাবণ' রূপকের ষষ্ঠ অঙ্কের অংশবিশেষ বিদ্রবের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে –

(নেপথ্যে)– " হা অজ্জউত্ত! পরিত্তায়াহি পরিত্তায়াহি।

প্রতীহারী (শ্রুত্বা সসম্ভ্রমমাত্মগতম্) – অম্মো! ভট্টিণী বি অবকংদদি । (প্রকাশম্) ভট্টা! অংতেউরে মহন্তো কলকলো সুনীয়দি।

রাবণঃ – জ্ঞায়তাং কিমেতৎ।"

–এই অংশে দশানন রাবণের ত্রাস সূচিত হচ্ছে। অনাগত অথচ ভীতিপ্রদ ঘটনার সূচনার কারণে এটি বিদ্রব নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পরভাবী নাট্যতত্ত্ববিদ্ ভট্টশঙ্কুক-ও তাঁর বিদ্রব আলোচনায় এই উদাহরণটি-ই ব্যবহার করেছেন।

মুনিপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে বিদ্রবলক্ষণটি হল – 'শঙ্কাভয়ত্রাসকৃতো বিদ্রবঃ সমুদাহৃতঃ' (না.শা. ১৯/৮৮)। কোনো-কোনো সংস্করণে আবার 'নৃপাগ্নিভয়সংযুক্তঃ সম্ভ্রমো বিদ্রবঃ স্মৃতঃ'– এই পাঠটি-ও

পাওয়া যায়। সাহিত্যদর্পণকার ও সাগরনন্দীর মতে, শঙ্কা-ভয়-ত্রাস থেকে বিদ্রবের উৎপত্তি –'শঙ্কাভয়ত্রাসকৃতো বিদ্রবঃ'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)।

দশরূপককার ধনঞ্জয় 'বিদ্রব' শব্দের পরিবর্তে 'সম্ভ্রম' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। এই সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণনির্ণয়ে তিনি বলছেন– 'শঙ্কাত্রাসৌ চ সম্ভ্রমঃ' (দশ.রূ.১/৪২)। অবলোককার ধনিক ব্যাখ্যাপূর্বক বলেছেন, নাটকীয় পাত্রপাত্রীর অন্তরে কোনো কারণে যদি শঙ্কা ও ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং তা যদি প্রতিপক্ষের জয়লাভরূপ প্রত্যাশার দ্বারা যুক্ত থাকে, তবে তাকে সম্ভ্রম নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গরূপে আখ্যাত করা হয়।

উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণকারদ্বয় এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন না। তাঁদের মতে,সম্ভ্রমের দশরূপকধৃত লক্ষণটি প্রকৃতপক্ষে উদ্বেগ ও বিদ্রব নামক সন্ধ্যঙ্গদ্বয়ের মিশ্রণ। তাঁরা নামোল্লেখ না করে উক্ত অভিমতটির কেবল সমালোচনা করেছেন।

৯. আক্ষেপ – আক্ষেপ নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণকথিত লক্ষণটি হল– 'আক্ষেপো বীজপ্রকাশনম্'(না.দ. ১/৫৪)। সংক্ষিপ্ত এই লক্ষণটিকে ব্যাখ্যায় বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। উপায় এবং অপায় আশঙ্কার মাধ্যমে নাটকের মুখ্য ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে যখন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থার প্রয়োগ হয়। এই অবস্থাবিশেষে নাটকের মুখ্য ফলপ্রাপ্তির প্রধান হেতু অর্থাৎ বীজ যখন উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, তখন আক্ষেপ নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই অঙ্গে বীজের তথা নাটকীয় উদ্দেশ্যের স্পষ্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

আক্ষেপের উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর চতুর্থ অঙ্ক থেকে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উপন্যস্ত হয়েছে –

সূতঃ – " দত্ত্বা দ্রোণেন পার্থাদভয়মপি ন সংরক্ষিতঃ সিন্ধুরাজঃ
ক্রূরং দুঃশাসনে2স্মিন্ হরিণ ইব কৃতং ভীমসেনেন কর্ম।
দুঃসাধ্যামপ্যরীণাং লঘুমিব সমরে পূরয়িত্বা প্রতিজ্ঞাং
নাহং মন্যে সকামং কুরুকুলবিমুখং দৈবমেতাবতাপি ॥"

– উল্লিখিত অংশে পাণ্ডবগণের রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ ফলের উন্মুখতা প্রকাশিত হয়েছে; অতএব এটি আক্ষেপের উদাহরণরূপে যথার্থ।

নাট্যদর্পণে আক্ষেপের আরেকটি লক্ষণের কথা-ও বলা হয়েছে। তদনুসারে, নাটকীয় পাত্রপাত্রীর হৃদয়ে গুপ্তভাবে স্থিত কোনো বিশেষ ভাবনার বহিঃপ্রকাশকে আক্ষেপ বলা হচ্ছে। কেবলমাত্র হৃদ্‌গতভাবে আশ্রিত বিষয় যখন ঘটনাপরম্পরায় অন্যান্য ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তার নাম আক্ষেপ। অতএব হৃদিস্থিত ভাবের বাহ্যতঃ আকর্ষণ-ই হল আক্ষেপ।

এই লক্ষণানুসারে প্রদত্ত উদাহরণটি 'রত্নাবলী' নাটিকার তৃতীয় অঙ্ক থেকে গৃহীত –

রাজা – "প্রিয়ে সাগরিকে!

শীতাংশুর্মুখমুৎপলে তব দৃশৌ পদ্মানুকারৌ করৌ

রম্ভাগর্ভনিভং তবোরূযুগলং বাহূ মৃণালোপমৌ।

ইত্যাহ্লাদকরাখিলাঙ্গি! রভসা নিঃশঙ্কমালিঙ্গ্য মাম্

অঙ্গানি ত্বমনঙ্গতাপবিধুরাণ্যেহ্যেহি নির্বাপয় ॥"

– উদয়নের এই উক্তির দ্বারা সাগরিকাবেশধারিণী বাসবদত্তা সাগরিকার প্রতি রাজার গভীর প্রণয়ের কথা জানতে পেরেছেন। রাজার হৃদয়ে সাগরিকার প্রতি অনুরাগরূপ গোপন ব্যাপারের প্রকাশহেতু এটি আক্ষেপের যথার্থ উদাহরণ ।

আক্ষেপের এই দ্বিতীয় লক্ষণটি নাট্যশাস্ত্রানুসারী। তত্রোক্ত আক্ষেপলক্ষণটি হল –'গর্ভস্যোদ্ভেদনং যৎ সাক্ষিপ্তিরিত্যভিধীয়তে'(না.শা. ১৯/৮৬)। এর ব্যাখ্যায় অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে – 'হৃদয়ান্তঃস্থিতং (তস্য) পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিতস্যাপি যতঃ কুতশ্চিন্নিমিত্তাদুদ্ভেদনমনপহ্নবনীয়া যা স্ফুটনাপত্তিঃ সা আক্ষিপ্তিঃ, অভিপ্রায়স্য হি তত্রাক্ষেপো বহিঃকর্ষণম্'(না.শা. উনবিংশ অধ্যায়) । সাগরনন্দী এই সন্ধ্যঙ্গটিকে 'উৎক্ষিপ্ত' নামে আলোচনা করেছেন।তাঁর মতে এটির লক্ষণ হল– 'বীজোদ্ভেদনমুৎক্ষিপ্তম্' (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)। দশরূপককারের মতে, মুখসন্ধিতে উপ্ত নাট্যবীজ গর্ভসন্ধির যে অংশে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়, সেই অংশকে আক্ষেপ বলা হয়– 'গর্ভবীজসমুদ্ভেদাদাক্ষেপঃ পরিকীর্তিতঃ'(দশ.রূ. ১/৪২)। দর্পণকারের মতে সন্ধ্যঙ্গটির নাম ক্ষিপ্তি এবং তৎসম্মত লক্ষণটি হল– 'রহস্যার্থস্য তূদ্ভেদঃ ক্ষিপ্তিঃ স্যাৎ'(সা.দ. ৬/৯৯)– অর্থাৎ গুপ্তবিষয়ের প্রকাশ-ই হল ক্ষিপ্তি। নাটকচন্দ্রিকাকার রূপ গোস্বামী-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন– 'গর্ভবীজসমুৎক্ষেপমাক্ষেপং পরিচক্ষতে'(না.চ.শ্লোকসংখ্যা–২১২)। নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, কোনো-কোনো আচার্য এই অঙ্গটি স্বীকার করেন না; তবে গ্রন্থে তাঁদের নামোল্লেখ করা হয়নি।

১০. অধিছল – অধিছল নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল –'অধিছলং ছলাধিক্যম্' (না.দ. ১/৫৫)। যখন পরস্পর বঞ্চনাকারী ছলাভিসন্ধিযুক্ত দুই পক্ষের মধ্যে বুদ্ধিবলে বলীয়ান্ একতর পক্ষের জয় হয়, তখন অধিছল নামক অঙ্গের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষ-ই কোনো-না-কোনো প্রকার বঞ্চনার বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়। কিন্তু বুদ্ধিমত্তর পক্ষ যখন স্বীয়বুদ্ধিবলে অন্য পক্ষকে প্রতারিত করে মূল তত্ত্বজ্ঞানে সফল হয়, তখন অধিছল নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়।

অধিছলের উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার তৃতীয় অঙ্ক থেকে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উদাহৃত হয়েছে–

"কিং পদ্মস্য রুচং ন হন্তি নয়নানন্দং বিধত্তে ন বা?
বৃদ্ধিং বা ঝষকেতনস্য কুরুতে নালোকমাত্রেণ কিম্ ।
বক্ত্রেন্দৌ তব সত্যয়ং যদপরঃ শীতাংশুরভ্যুদ্‌গতঃ
দর্পঃ স্যাদমৃতেন চেদিহ তদপ্যস্ত্যেব বিম্বাধরে ॥"

– নাটকের এই অংশে সাগরিকাবেশধারিণী বাসবদত্তা রাজাকে প্রতারিত করে, সাগরিকার প্রতি রাজার প্রণয়ের বিষয়টি জ্ঞাত হচ্ছেন। অতএব এটি ছলনাপূর্বক তথ্যজ্ঞানের অর্থাৎ অধিছলের সার্থক উদাহরণ।

অধিছলের এই লক্ষণটি সর্বথা অভিনবভারতী-অনুসারী । উদাহরণটি-ও এখান থেকে-ই গৃহীত।

নাট্যদর্পণ ব্যতীত নাট্যতত্ত্বের অন্যান্য গ্রন্থে এই সন্ধ্যঙ্গটি 'অধিবল' নামে আলোচিত। নাট্যশাস্ত্রোক্ত অধিবললক্ষণটি হল– 'কপটেনাতিসন্ধানং জ্ঞেয়ং ত্বধিবলং বুধৈঃ' (না.শা. ১৯/৮৭)– কৌশলে গোপন তথ্য জানার নাম হল অধিবল। দর্পণকার-ও অনুরূপভাবে অধিবলের লক্ষণনির্ণয় করেছেন – 'অধিবলমভিসন্ধিচ্ছলেন যঃ' (সা.দ. ৬/৯৯)– কৌশলে বুদ্ধির সাহায্যে কারো অভিপ্রায় জ্ঞাত হলে, অধিবল নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়। নাটকচন্দ্রিকাকার-ও বলেছেন– 'বুধৈরধিবলং প্রোক্তং কপটেনাধিবঞ্চনম্'(না.চ.শ্লোকসংখ্যা–২০৩)।

নাট্যদর্পণে অধিছলের একটি সর্বথা বিপরীত লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে কপটের অন্যথাকরণের নাম অধিছল। এই মতটি সম্ভবতঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশ থেকে গৃহীত। কারণ তত্রস্থ অধিবললক্ষণটি হল– 'কপটস্যান্যথাকরণমধিবলম্' (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)।

অধিবলের এই লক্ষণের উদাহরণটি-ও 'রত্নাবলী' থেকে-ই গৃহীত–

রাজা– "এবমপি প্রত্যক্ষদৃষ্টব্যলীকঃ কিং বিজ্ঞাপয়ামি।
আতাম্রতামপনয়ামি বিলক্ষ এব
লাক্ষাকৃতাং চরণয়োস্তব দেবি মূর্ধা।
কোপোপরাগজনিতাং তু মুখেন্দুবিম্বে
হর্তুং ক্ষমো যদি পরং করুণা ময়ি স্যাৎ ॥"

–সাগরিকাবেশধারিণী বাসবদত্তার কাছে রাজা উদয়নের প্রণয়বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় রাজা কুপিতা মহিষীকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছেন। ছল বা কপটতার অনুপস্থিতির কারণে এটি অধিছলের উদাহরণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দশরূপকে বলা হয়েছে –

''সংরব্ধং তোটকং বচঃ ॥

তোটকস্যান্যথাভাবং ব্রুবতে2ধিবলং বুধাঃ।''(দশ.রূ. ১/৪০,৪১)

– দশরূপককারের মতে, ক্রোধান্বিত বাক্য হল তোটক এবং তার বিপরীত অর্থাৎ বিনীত বাক্যের নাম অধিবল। অধিবলের উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার পূর্বোক্ত শ্লোকটি উদ্ধার করা হয়েছে ।

নাট্যদর্পণোক্ত অধিছলের তৃতীয় লক্ষণটি অনুসারে বলা হচ্ছে, 'উপালম্ভ' অর্থাৎ রোষপূর্ণ তিরস্কারবাক্য প্রয়োগের নাম অধিছল। এর উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর পঞ্চমাঙ্ক থেকে ''কৃষ্টা কেশেষু কৃষ্ণা নৃপসদসি'' ইত্যাদি ভীমসেনের উক্তিটি উদাহৃত হয়েছে।এই অংশে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভীমসেনের রোষ প্রকাশিত হওয়ায়, এটি অধিছলের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে।

১১. মার্গ – মার্গ নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল– 'মার্গস্তত্ত্বার্থসংশনম্' (না.দ. ১/৫৫)। ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, সামান্যতঃ সত্য কোনো বিষয় যখন বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে সেই সত্যতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে, তখন মার্গ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়। বাক্যান্তরে, যথার্থ সত্যবাচনের নাম-ই মার্গ। 'মৃগ্যতে সত্যতয়া অন্বিষ্যতে'– এই ব্যুৎপত্তি থেকে-ই এই অঙ্গটির এইরূপ নামকরণ হয়েছে।

মার্গর উদাহরণরূপে 'মুদ্রারাক্ষস' এবং 'রঘুবিলাস' থেকে দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় উদাহরণটির আলোচনা করছি– রাবণঃ (সবিষাদম্)– ''লঙ্কেশ্বরে ত্রিদশদর্পহরে বিরাগঃ রাগস্তু কাননচরে জনকাত্মজায়াঃ।

সৌন্দর্য-বিক্রম-কলা-বিভবানপেক্ষঃ

প্রেম্নো বিচারবিমুখঃ খলু কো2পি পন্থাঃ॥''

– নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র-রচিত 'রঘুবিলাস' রূপকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে শ্লোকটি গৃহীত। প্রেমের গতি বিচিত্র – এই চিরন্তন সত্য রক্ষোরাজ রাবণের এই উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। দেববিজয়ী রাবণকে উপেক্ষা করে ভিখারী রাঘবের প্রতি জনকসুতার অকৃত্রিম প্রণয় রাবণকে দুঃখিত ও বিস্মিত করছে। অতএব এটি মার্গ নামক সন্ধ্যঙ্গের একটি যথার্থ উদাহরণ।

মার্গলক্ষণবিষয়ে নাট্যতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে বিশেষ বৈমত্য নেই। মুনিপ্রণীত শাস্ত্রে এর লক্ষণ হল– 'তত্ত্বার্থবচনঞ্চৈব মার্গ ইত্যভিধীয়তে' (না.শা.১৯/৮৩)। দশরূপককার ধনঞ্জয়-ও বলেছেন, কোনো বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বপ্রকাশের নাম মার্গ–'মার্গস্তত্ত্বার্থকীর্তনম্' (দশ.রূ. ১/৩৮)। সাগরনন্দী, দর্পণকার, রূপগোস্বামী প্রমুখ-ও, যা প্রকৃত সত্য, তা প্রকাশ করাকে মার্গ নামে অভিহিত করেছেন– 'তত্ত্বার্থকথনং মার্গঃ' (সা.দ. ৬/৯৬)।

১২. অসত্যাহরণ – অসত্যাহরণ নামক অঙ্গের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল–'অসত্যাহরণং ছদ্ম' (না.দ. ১/৫৫)– বৃত্তিতে লক্ষণটির কোনোরূপ ব্যাখ্যা করা হয়নি।তবে যে উদাহরণটি রয়েছে, তদ্দৃষ্টে বলা

যায় যে, ব্যাজাশ্রিত অর্থাৎ কপটতাপূর্ণ বাক্‌বিন্যাসের নাম অসত্যাহরণ। অসত্যাহরণের উদাহরণরূপে কালিদাসবিরচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে একটি অংশ উদ্ধার করা হয়েছে–

বিদূষকঃ (প্রবিশ্য সসম্ভ্রমমাহ)– " পরিত্তায়দু পরিত্তায়দু ভবং ।

রাজা – কিমেতৎ?

বিদূষকঃ – ভো! সপ্পেণ মৃহি দট্‌ঠো ।

(সর্বে বিদূষকং দৃষ্টা বিষণ্ণাঃ)

রাজা – কষ্টম্! ক্ব ভবান্ পরিভ্রান্তঃ ?

বিদূষকঃ – দেবং পেক্‌খিস্‌সং তি আচারপুপ্ফস্‌স কারণা পমদবণং গদু মৃহি। তহিং চ অসোয়ত্থবগস্‌স পসারিদে অগ্‌গহত্থে কোডরবিণিগ্‌গদেণ সপ্পরূপেণ কালেণ মৃহি লংঘিদো। ইমাণি দুবে দাডাবণাণি।"
– রাজা বিদূষকের প্রতি প্রীতিমান্ কিনা, তজ্জ্ঞানার্থে বিদূষক কেতকীকণ্টকের আঘাতকে সর্পদংশনের ক্ষত বলে দেখিয়ে রাজার সহানুভূতি আকর্ষণ করছে। এভাবে মিথ্যাশ্রয় বচনবিন্যাসের কারণে এটি অসত্যাহরণ নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ।

প্রায় সকল নাট্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থে এই অঙ্গটির নামান্তর হল 'অভূতাহরণ'। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, কপটাশ্রয়ী বাক্যের নাম অভূতাহরণ– 'কপটপাশ্রয়ং বাক্যমভূতাহরণং বিদুঃ'(না.শা. ১৯/৮২)। সাহিত্যদর্পণ এবং নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও কপটবাক্যকে অভূতাহরণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। দর্পণকার বিশ্বনাথ এর লক্ষণ করেছেন– 'তত্র ব্যাজাশ্রয়ং বাক্যমভূতাহরণং মতম্'(সা.দ.৬/৯৫) । দশরূপককার ধনঞ্জয়ের অভিমতটি সামান্য পৃথক। তাঁর মতে, রূপকের পাত্রপাত্রীর, বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার প্রণয়জনিত কোনো গোপন বৃত্তান্তের নাম অভূতাহরণ।

১৩. তোটক – তোটক নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'তোটকং গর্ভিতং বচঃ'(না.দ.১/৫৫)। বৃত্তিতে ব্যাখ্যাপূর্বক বলা হয়েছে, ক্রোধ-হর্ষ-দর্প ইত্যাদি মনোগত উত্তেজনাবশতঃ কথিত আবেগপূর্ণ বাক্যকে তোটক বলা হয়। তোটক শব্দটির নির্বচনে বলা হচ্ছে – 'তোটয়তি ভিনত্তি হৃদয়মিতি তোটকম্' [৮৭] – অর্থাৎ যে কোনো আবেগের তীব্রতাবশতঃ উচ্চারিত বাক্যের নাম তোটক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই ব্যাখ্যাটি একান্তভাবে অভিনবভারতী-অনুসারী। সেখানে বলা হচ্ছে –"আবেগগর্ভং যদ্বচনং তত্তোটকম্। স চাবেগো হর্ষাৎ ক্রোধাৎ অন্যতো2পি বা" (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়) ।

তোটকের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে দুটি গ্রন্থের অংশবিশেষ উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি 'রামাভ্যুদয়' নাটক থেকে এবং দ্বিতীয়টি 'রঘুবিলাস' থেকে । আমরা দ্বিতীয়টি আলোচনা করবো –

রাবণ– "বক্ত্রাণি হে! হসত গায়ত তারতারং
নেত্রাণি! চুম্বত বিহস্য চ কর্ণপালীঃ।
দৌর্বল্যয়ঃ! কুরুত তাণ্ডবডম্বরং চ
শ্রীরাবণং ননু বিদেহসুতা রিরংসুঃ ॥"

–এই অংশে রক্ষোরাজ রাবণ বৈদেহীর প্রণয়লাভের কল্পনায় আনন্দোন্মত্ত। তাঁর হর্ষোৎফুল্ল বচনবিন্যাসের কারণে এটি তোটকের যথার্থ উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রসম্মত তোটকলক্ষণটি হল – 'সংরম্ভবচনং চৈব তোটকং ত্বিতি সংজ্ঞিতম্' (না.শা. ১৯/৮৬)। ধনঞ্জয়ের-ও মতে– 'সংরব্ধং তোটকং বচঃ' (দশ.রূ. ১/৪০)। অর্থ এক-ই। নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণ দ্বারা প্রযুক্ত ক্রোধান্বিত বাক্যের নাম তোটক। সাগরনন্দী এবং দর্পণকার-ও যথাক্রমে 'সংরম্ভবচন' বা 'সংরব্ধবাক্'- কে তোটক নামে অভিহিত করেছেন। রূপগোস্বামীও-ও নাটকচন্দ্রিকা গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন।

তোটকবিষয়ক বিবিধ মতামতগুলির আলোচনাদৃষ্টে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অন্যান্য সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ তোটককে কেবলমাত্র ক্রোধজাত বচনবিন্যাস বলে অভিহিত করেছেন; তৎপরিবর্তে নাট্যদর্পণে কিন্তু ক্রোধ-হর্ষ-দর্পাদি বিভিন্নপ্রকার আবেগোত্থ বাক্প্রয়োগকে তোটক রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অবমর্শসন্ধ্যঙ্গ ঃ

অনন্তর আমর্শ (বা অবমর্শ বা বিমর্শ) সন্ধির অঙ্গগুলির আলোচনা করা হচ্ছে। এগুলি সংখ্যায় তেরোটি। এদের নাম – দ্রব, প্রসঙ্গ, সম্ফেট, অপবাদ, ছাদন, দ্যুতি, খেদ, বিরোধ, সংরম্ভ, শক্তি, প্ররোচনা, আদান এবং ব্যবসায়। এগুলির মধ্যে শেষোক্ত চারটি মুখ্য অর্থাৎ আমর্শসন্ধিতে অবশ্যপ্রযোজ্য; প্রথমোক্ত নয়টি গৌণ।

নাট্যতত্ত্ববিষয়ক প্রাচীন ও অর্বাচীন প্রায় সকল গ্রন্থে এই সন্ধির তেরোটি অঙ্গ স্বীকৃত হলে-ও, এদের নাম সম্পর্কে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণরূপে বলা যায়, নাট্যশাস্ত্রে নাট্যদর্পণধৃত 'সংরম্ভ' নামক অঙ্গটিকে 'প্রতিষেধ' (মতান্তরে 'নিষেধ') নামে আলোচনা করা হয়েছে। দশরূপকে 'ছাদন' এর নাম হয়েছে 'ছলন' । নাট্যদর্পণসম্মত 'খেদ' ও 'সংরম্ভ' নামক অঙ্গদুটিকে দশরূপককার স্বীকার করেননি। তৎপরিবর্তে 'বিদ্রব' ও 'বিচলন' নামক দুটি অঙ্গ এখানে স্বীকৃত হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশ এবং সাহিত্যদর্পণে দুয়েকটি নামান্তর ছাড়া অঙ্গসংখ্যা নাট্যশাস্ত্রের-ই অনুরূপ। আমর্শসন্ধির বিভিন্ন অঙ্গের নামকরণের বৈচিত্র্য নিয়ে এস. এন.শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন – "This

juncture has also, like others, a number of subdivisions; but no other juncture seems to present such diversity in their acceptance as is found in the case of Vimarsa Sandhi. "[৮৮]

১.দ্রব – দ্রব নামক আমর্শসন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'দ্রবঃ পূজ্যব্যতিক্রমঃ' (না.দ. ১/৫৭)– পূজ্য অর্থাৎ মানার্হ কোনো ব্যক্তির মর্যাদালঙ্ঘনকারী বাক্যের নাম দ্রব।

দ্রবর উদাহরণরূপে বৃত্তিতে 'রত্নাবলী' নাটিকার অংশবিশেষের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মহারাজ উদয়নের উপস্থিতিতে বাসবদত্তার আদেশে সাগরিকা ও বিদূষকের বন্ধন ঘটানো হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উদাহরণটি অভিনবভারতী থেকে গৃহীত।

নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে – 'গুরুব্যতিক্রমো যস্তু স দ্রবঃ পরিকীর্তিতঃ'(না.শা.১৯/৯০)। অভিনবগুপ্ত 'গুরুব্যতিক্রম' শব্দের অর্থ করেছেন গুরুজনের অবমাননা। দশরূপকে গুরুজনের প্রতি তিরস্কারমূলক বাক্যকে দ্রব নামে অভিহিত করা হয়েছে – 'দ্রবো গুরুতিরস্কৃতিঃ'(দশ.রূ. ১/৪৫)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে, অত্যন্ত অন্যায় এবং অমর্যাদাজনিত মানসিক ক্ষোভ-ই হল দ্রব – "গুরুব্যতিক্রমো দ্রবঃ। শঙ্কাদিভির্মনসঃ ক্ষোভো বিদ্রবঃ। স এব পরিভবকৃতো দ্রবঃ"(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়) । দর্পণকার শোক ও ক্রোধবশতঃ গুরুজনের মর্যাদালঙ্ঘনকে দ্রব রূপে আখ্যায়িত করেছেন – 'দ্রবো গুরুব্যতিক্রান্তিঃ শোকাবেগাদিসম্ভবা' (সা.দ. ৬/১০৩)। নাটকচন্দ্রিকা গ্রন্থে-ও দ্রবের এক-ই প্রকার লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে।

২.প্রসঙ্গ– 'প্রসঙ্গো মহতাং কীর্তিঃ'(না.দ. ১/৫৮)– এই হল প্রসঙ্গ নামক সন্ধ্যঙ্গটির নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণ। মহান্ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে আলোচিত কীর্তিখ্যাপনের নাম প্রসঙ্গ। মনস্বী ব্যক্তিবর্গের বংশ-শীল-অভ্যুদয়ের কথা স্মরণপূর্বক তাঁদের গরিমা কীর্তন করা হয় এই সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগের দ্বারা।

নাট্যদর্পণে প্রসঙ্গর উদাহরণটি 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে গৃহীত–

যুধিষ্ঠিরঃ (মুখং প্রক্ষাল্যোপস্পৃশ্য চ) – "এষ তাবজ্জলাঞ্জলির্গাঙ্গেয়ায় গুরবে প্রপিতামহায় শান্তনবে। অয়মপি পিতামহায় বিচিত্রবীর্যায় । (সাস্রুম্) তাতস্যাধুনাবসরঃ। অয়মপি তত্রভবতে স্বর্গস্থিতায় গুরবে সুগৃহীতনাম্নে পিত্রে দেবায় পাণ্ডবে।"

– উল্লিখিত অংশে যুধিষ্ঠির তাঁর পরাক্রান্ত পিতৃপুরুষদের মহত্ত্বের কথা স্মরণপূর্বক তর্পণ প্রদান করছেন; অতএব এটি প্রসঙ্গ নামক সন্ধ্যঙ্গের যথার্থ উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে বিহিত প্রসঙ্গলক্ষণটি অনুরূপ । সেখানে-ও বলা হচ্ছে, গুরুজনের গুণকীর্তনের নাম প্রসঙ্গ – 'প্রসঙ্গশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গুরূণাং পরিকীর্তনম্' (না.শা. ১৯/৯১)। পরভাবী দশরূপককার ও তৎপরবর্তী দর্পণকার-ও এই প্রসঙ্গে অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

নাট্যদর্পণে প্রসঙ্গের অপর একটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে – 'কেচিদপ্রস্তুতার্থবচনং প্রসঙ্গমিচ্ছন্তি'।[৮৭] এতদনুসারে অপ্রস্তুত অর্থাৎ অপ্রকৃত অর্থাৎ অঘটিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা আলোচনাকে প্রসঙ্গ বলা হয়েছে। এর উদাহরণটি-ও গৃহীত হয়েছে 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে–

যুধিষ্ঠিরঃ (দ্রৌপদীং প্রতি)–''স কীচকনিষূদনো বক-হিড়িম্ব-কির্মীরহা

মদান্ধমগধাধিপদ্বিরদসন্ধিরম্ভাশনিঃ।

গদাপরিঘশোভনা ভুজযুগেন তেনান্বিতঃ

প্রিয়স্তব মমানুজো2র্জুনগুরুর্গতো2স্তং কিল ॥''

–উল্লিখিত অংশে দেখা যাচ্ছে, তপস্বীরূপধারী রাক্ষসের মুখে ভীমবধের মিথ্যা সংবাদে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কাছে শোকপ্রকাশ করছেন। এই অংশে ভীমবধরূপ অপ্রকৃত বিষয়ের আলোচনার কারণে এটি প্রসঙ্গ নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

এই মতটির প্রবক্তা আচার্যের নাম গ্রন্থে উল্লেখ না করা হলে-ও, ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থে প্রসঙ্গের উল্লিখিত লক্ষণটি পাওয়া যায়। উক্ত উদাহরণটি-ও সম্ভবতঃ শৃঙ্গারপ্রকাশ থেকে-ই গৃহীত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আচার্য সাগরনন্দী-ও তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে প্রসঙ্গের অনুরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে– 'অপ্রস্তুতার্থখ্যাপনং প্রসঙ্গঃ'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়) – অসংঘটিত কোনো বিষয়ের খ্যাপন অর্থাৎ আলোচনার নাম প্রসঙ্গ।

৩.সম্ফেট – সম্ফেট নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'সম্ফেটঃ ক্রোধজং বচঃ' (না.দ.১/৫৮) – ক্রোধপূর্ণ বাদানুবাদের প্রয়োগ হয় যে সন্ধ্যঙ্গে, তার নাম সম্ফেট। এই অংশে পরস্পর প্রতিস্পর্ধী দুই নাটকীয় পাত্রের মধ্যে ক্রোধান্বিত উত্তপ্ত বাগ্‌বিনিময় পরিলক্ষিত হয়।

নাট্যদর্পণে সম্ফেটের দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।একটি 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে, অপরটি 'যাদবাভ্যুদয়'-এর সপ্তম অঙ্ক থেকে । আমরা প্রথমটি বিশদে আলোচনা করছি–

ভীমঃ – ''ভোঃ কৌরবরাজ! কৃতং বন্ধুনাশদর্শনমন্যুনা, মৈবং বিষাদং কৃথাঃ, পর্যাপ্তাঃ পাণ্ডবাঃ সমরায়া2হমসহায় ইতি।

পঞ্চানাং মন্যসে2স্মাকং যং সুযোধং সুযোধন ।

দংশিতস্যাত্তশস্ত্রস্য তেন তে2স্তু রণোৎসবঃ ॥

ইত্থং শ্রুত্বাসূয়াত্মিকাং নিক্ষিপ্য কুমারয়োর্দৃষ্টিমুক্তবান্ ধার্তরাষ্ট্রঃ –

কর্ণদুঃশাসনবধাত্তুল্যাবেব যুবাং মম।

অপ্রিয়ো2পি প্রিয়ো যোদ্ধুং ত্বমেব প্রিয়সাহসঃ ॥

ইত্যুত্থায় চ পরস্পরক্রোধাধিক্ষেপপরুষবাক্কলহপ্রস্তাবিতঘোরসংগ্রামৌ– ''

– উল্লিখিত অংশে পাঞ্চালকের সংলাপের মাধ্যমে ভীম ও দুর্যোধনের এই ক্রোধযুক্ত কথোপকথনটি উপস্থাপিত হয়েছে। রোষপূর্ণ বাগ্‌বিস্তারের কারণে এটি সম্ফেট নামক সন্ধ্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ।

এই সন্ধ্যঙ্গটির লক্ষণবিষয়ে পূর্বাপর নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের বৈমত্য নেই বললে-ই চলে। নাট্যশাস্ত্রে-ও ক্রোধসমন্বিত বাক্যকে সম্ফেট বলা হয়েছে – 'রোষগ্রথিতং বাক্যং তু সম্ফেটঃ পরিকীর্তিতঃ' (না.শা.১৯/৮৯) । দশরূপকধৃত সম্ফেটলক্ষণটি হল – 'সম্ফেটো রোষভাষণম্' (দশ.রূ. ১/৪৫)। সাহিত্যদর্পণে সম্ফেটের সংজ্ঞারূপে দশরূপকের লক্ষণটি-ই অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে। আচার্য সাগরনন্দী ভরতের অনুসরণে এই সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণনির্ণয় করেছেন।

অভিনবভারতীতে অভিনবগুপ্তাচার্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'স্ফোট্ অনাদরে' – অনুসারে স্ফোট্‌ধাতুনিষ্পন্ন পদ বলে, কোনো-কোনো আচার্য এই সন্ধ্যঙ্গটিকে 'সম্ফোট' নামে-ও অভিহিত করেছেন।

৪.অপবাদ – 'অপবাদঃ পরীবাদঃ' (না.দ. ১/৫৮)– রূপকের যে অংশে নাটকীয় কোনো চরিত্রের নিন্দাখ্যাপন করা হয়, সেটি অপবাদ নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ । 'অপকৃষ্টবিষয়কো বাদঃ' – এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই সন্ধ্যঙ্গটির নাম অপবাদ। নাট্যদর্পণে এই অপবাদকে আবার দুটি প্রকারে পৃথক করা হয়েছে– স্বদোষখ্যাপন এবং পরদোষখ্যাপন।

প্রথম প্রকারটির উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে 'পুষ্পদূষিতক'-এর পঞ্চম অঙ্ক থেকে –

ব্রাহ্মণঃ – ''মার্জিতা হি ব্রাহ্মণস্য মুখমধুরঃ কালপাশঃ। তথাহি–

হতঃ পুত্রো হতো ভ্রাতা হতো মার্জিতয়া পিতা।

তথাপ্যেতাং স্বগোত্রঘ্নীং নিন্দামিব পিবামি চ ॥''

–এই অংশে ব্রাহ্মণকর্তৃক নিজদোষ খ্যাপিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রকারটির উদাহরণটি গ্রহণ করা হয়েছে 'রঘুবিলাস'-এর সপ্তম অঙ্ক থেকে –

রাবণং প্রতি মারীচঃ –

''খণ্ডয় ন্যায়তেজোভিঃ শূর! কৌলীনদুর্দিনম্ ।

অনীতিধূমরী হন্তি যশশ্চূতাম্রমঞ্জরীঃ ॥''

– এই অংশে মারীচ রাবণের নিন্দা করার কারণে এটি পরদোষখ্যাপনের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও দোষকীর্তনকে অপবাদ বলা হয়েছে – 'দোষপ্রখ্যাপনং যত্তু সো2পবাদ ইতি স্মৃতঃ' (না.শা. ১৯/৮৯)।দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণাদি সকল গ্রন্থে অপবাদের অনুরূপ লক্ষণ-ই বিধৃত হয়েছে।

নাটকচন্দ্রিকা গ্রন্থে রূপগোস্বামী একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তদনুসারে দোষখ্যাপনের বিষয়টি এক-ই আছে; কেবলমাত্র তৎসংশ্লিষ্ট পাত্র সম্পর্কে একটু পৃথক অভিমত পোষণ করা হচ্ছে। তাঁর মতে, 'অক্রূরপাত্র' অর্থাৎ নায়ক-প্রতিনায়ক ব্যতীত রূপকের অপর কোনো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের দোষজ্ঞাপনের নাম-ই অপবাদ।

৫.ছাদন – 'ছাদনং মন্যুমার্জনম্' (না.দ. ১/৫৮) – 'মন্যু' পদটি এখানে অপমানার্থে প্রযুক্ত। অতএব অপমান বা অসম্মানের পরিমার্জন অর্থাৎ অপসারণ করা হয় যে সন্ধ্যঙ্গে, তার নাম ছাদন। এর সমর্থনে অভিনবভারতীর অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে, 'তদপমানকলঙ্কাপবারণাচ্ছাদনমিতি' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। অতএব বিমর্শ সন্ধির যে অঙ্গে নাটকীয় পাত্রাদির কলঙ্কাপমানাদির মোচনের প্রয়াস ঘটে, তার নাম ছাদন।

ছাদনের উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি গৃহীত হয়েছে–

সাগরিকা – 'দিট্ঠিয়া পজ্জলিদো ভয়বং হুয়াসনো অজ্জ করিস্সদি মে সয়লদুক্খাবসাণং হি।'

– এই অংশে অগ্নিপ্রবেশের দ্বারা সাগরিকার যাবতীয় অপমান-দুঃখাদির অপসারণের উল্লেখে, এটি ছাদন নামক সন্ধ্যঙ্গের যথার্থ উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই উদাহরণটি সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে গৃহীত।

এই সন্ধ্যঙ্গটির আলোচনাপ্রসঙ্গে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে পূর্বাচার্যদের অন্যান্য কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণগুলির কোনোটিতে-ই প্রবক্তা আচার্যদের নামোল্লেখ না হলে-ও, কয়েকটি স্থলে আমরা সেই আচার্যদের সঙ্গত অনুমান করতে পারি।

প্রথম মতটিতে বলা হচ্ছে – কার্যসিদ্ধির কারণে অপমান সহ্য করার নাম ছাদন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, গত্যন্তর না থাকায় নাটকীয় পাত্রপাত্রীকে অনেক সময় অবমাননার সম্মুখীন হতে হয়। এই অসম্মান সহ্য করাকে রূপায়িত করা হয় যে সন্ধ্যঙ্গে, তার নাম ছাদন। এর উদাহরণরূপে শ্রীশুক্তিবাসকুমার-বিরচিত 'অনঙ্গসেনাহরিনন্দিন্' প্রকরণের নবম অঙ্কের একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে – নায়ক হরিনন্দী পুষ্পলকনামা এক ব্রাহ্মণকে রাজবন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য নায়িকা মাধবী কর্তৃক প্রেরিত কর্ণভূষণ পুষ্পলকের মাতাকে প্রদান করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে পুষ্পলক ঐ অলঙ্কারগুলি চুরি করার মিথ্যা অপবাদে বধ্যভূমিতে আনীত হন। পুষ্পলকের মাতার অনুরোধে এবং

ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার দ্বারা যশোলাভের উদ্দেশ্যে হরিনন্দী স্বয়ং সেই চৌর্যের দায় স্বীকার করেন – অতএব এটি ছাদনের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণকারদ্বয় এই মতবাদের প্রবক্তা আচার্যর নাম উল্লেখ করেননি; কিন্তু নাট্যশাস্ত্রদৃষ্টে আমরা সহজে-ই বুঝতে পারি, এটি মহামুনি ভরতের অভিমত। তত্রধৃত ছাদনলক্ষণটি হল– 'অপমানকৃতং বাক্যং কার্যার্থে ছাদনং ভবেৎ' (না.শা. ১৯/৯৪)– অর্থ প্রাঞ্জল। পরিস্থিতিবিশেষে কার্যসিদ্ধির জন্য অপমানজনক বাক্যাদির সহন-ই হল ছাদন। পরভাবী দর্পণকার-ও ছাদনের অনুরূপ লক্ষণ স্বীকার করেছেন– 'কার্যার্থমপমানাদেঃ সহনং খলু যদ্ভবেৎ' (সা.দ. ৬/১০৭)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রধৃত লক্ষণটির একটি ব্যাখ্যান্তর-ও পাওয়া যায়, যদনুসারে কার্য সম্পাদনের জন্য অপমানসূচক বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা আত্মরক্ষাকে ছাদন বলা হয়েছে।

ছাদনের আরেকটি লক্ষণ অনুসারে অবমাননা অর্থাৎ অসম্মানপূর্বক বাক্যপ্রয়োগের নাম ছাদন। এর উদাহরণরূপে 'রামাভ্যুদয়' প্রকরণের সীতাপরিত্যাগরূপ অপমানকর ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই মতটি দশরূপককার ধনঞ্জয়ের । সেখানে ছাদনের পরিবর্তে 'ছলন' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষণে বলা হয়েছে– 'ছলনং চাবমাননম্'(দশ.রূ. ১/৪৬)– পাত্রবিশেষের দ্বারা অপর পাত্রের অপমান বা অবজ্ঞার নাম ছলন। নাটকলক্ষণরত্নকোশে এই অঙ্গটির নাম 'সাদন'। সেখানে-ও অবমাননাকর ব্যাপারের উল্লেখকে সাদন বলা হয়েছে – 'অপমানকৃতং বাক্যং সাদনম্'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)।

ছাদনের অপর লক্ষণটিতে 'সম্মোহ' অর্থাৎ ভ্রান্ত ধারণাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্কে ব্রাহ্মণের বেশধারী রাক্ষস কর্তৃক আনীত ভীমসেনের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর চিত্তে উদ্রিক্ত ব্যামোহের উল্লেখ করা হয়েছে।এই মতবাদের প্রবক্তা আচার্যের নাম বলা দুরূহ। সম্ভবতঃ অধুনালুপ্ত কোনো গ্রন্থে ছাদনের এই লক্ষণটি নির্ণীত হয়েছে।

৬.দ্যুতি – 'তিরস্কারো দ্যুতিঃ'(না.দ. ১/৫৯)– এই হল দ্যুতি নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। নাটকীয় কোনো পাত্রের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করাকে দ্যুতি বলা হয়।

দ্যুতির উদাহরণরূপে 'কৃত্যারাবণ' থেকে মন্দোদরীর প্রতি অঙ্গদের বক্তব্যের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে –

"মা গাস্তিষ্ঠ পুনর্ব্রজ ক্ষণমিতো গত্বা পুনঃ স্থীয়তাং

যত্রাস্তে ভুজবীর্যদর্পিতমদো বিদ্রাবণো রাবণঃ।

মদ্বাহুদ্বয়পঞ্জরান্তর্গতা মূঢ়ং! কিমাক্রন্দসি

সিংহস্যাঙ্কমুপাগতামিব মৃগীং কস্ত্বাং পরিত্রাস্যতে ॥"

–উল্লিখিত অংশে অঙ্গদের দ্বারা মন্দোদরী তিরস্কৃত হওয়ায়, এটি দ্যুতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে ন্যক্কারজনক বাক্যকে দ্যুতি বলা হয়েছে – 'বাক্যমাধর্ষসংযুক্তং দ্যুতিস্তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতা' (না.শা.১৯/৯২)। দশরূপককার ধনঞ্জয় সন্ত্রাসজনক বাক্য দ্বারা পাত্রবিশেষকে তর্জন করা এবং তার অন্তরে উদ্বেগ সঞ্চার করাকে দ্যুতি বলেছেন– 'তর্জনোদ্বেজনে দ্যুতিঃ' (দশ.রূ. ১/৪৬)। সাগরনন্দীর মতে, তর্জন, ন্যক্কার অথবা তিরস্কারযুক্ত বাক্য হল দ্যুতি– 'তর্জনাধর্ষণাধিক্ষেপং বাক্যং দ্যুতিঃ'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)। দর্পণকার বিশ্বনাথ এই সন্ধ্যঙ্গটির লক্ষণনির্ণয়ে দশরূপককারকে অনুসরণ করেছেন – 'তর্জনোদ্বেজনে প্রোক্তা দ্যুতিঃ' (সা.দ.৬/১০৪)।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, কোনো-কোনো আচার্যর মতে, তর্জন ও উদ্বেগসৃষ্টির নাম দ্যুতি (যেটি দশরূপককারের অভিমত); কোনো-কোনো আচার্যর মতে, 'আধর্ষ' অর্থাৎ ন্যক্কারপূর্ণ বাগ্‌বিস্তারের নাম দ্যুতি (যেটি নাট্যশাস্ত্রসম্মত অভিমত)– নাট্যদর্পণকারদ্বয়ের মতে, তাঁদের গ্রন্থে বিহিত দ্যুতিলক্ষণে ব্যবহৃত 'তিরস্কার' পদটির মধ্যে তর্জন, উদ্বেজন বা আধর্ষের সহজে-ই অন্তর্ভাব হতে পারে। এই কারণে পৃথকভাবে বিবিধ শব্দের পরিবর্তে কেবল 'তিরস্কার' পদটির প্রয়োগ তাঁরা অধিকতর যুক্তিসহ বলে মনে করেন।

৭. খেদ – নাট্যদর্পণধৃত খেদ নামক বিমর্শসন্ধ্যঙ্গলক্ষণটি হল – 'খেদঃ শ্রমঃ কায়মনোভবঃ'(না.দ.১/৫৯)। লক্ষণদৃষ্টে অর্থটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর শারীরিক অথবা মানসিক ক্লেশের নাম খেদ। অতএব খেদ দুই প্রকার – কায়িক ও মানস।

প্রথমপ্রকার খেদের উদাহরণরূপে 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' থেকে একটি অংশ গৃহীত হয়েছে–

পুরূরবা– "অহো শ্রান্তো2স্মি! ভবতু! অস্যাস্তাবদ্ গিরিনদ্যাস্তীরে স্থিতস্তরঙ্গবাতং সেবিষ্যে।"

– এই অংশে রাজা পুরূরবার শারীরিক ক্লেশ সূচিত হওয়ায়, এটি কায়িক খেদের উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই উদাহরণটি অভিনবভারতীতে-ও পাওয়া যায়।

মানস খেদের উদাহরণরূপে 'রঘুবিলাস'-এর সপ্তম অঙ্ক থেকে রাবণের উক্তিশ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে–

রাবণঃ (সখেদম্) –

"হুং শক্রঃ স জিতো জিতো ধৃতধৃতঃ কৈলাসশৈলো2প্যরে

ক্রান্তং ক্রান্তমিদং জগৎ প্রতিভটাসিকৈর্বাহুভিঃ।

যা2রম্ভং প্রতি বন্ধুবন্ধনকথা লঙ্কাপতের্জীবতঃ

কর্ণেষু প্রথমে কিমেকমনয়া নীতং ন বিস্ফূর্জিতম্ ॥"

– উল্লিখিত অংশে রামচন্দ্রের কাছে রাবণের পরাভবজনিত ক্লেশের উল্লেখে এটি মানস খেদের উদাহরণ।

উভয়জ খেদের উদাহরণরূপে ‘কৃত্যারাবণ’-এর অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে লক্ষ্মণ বন থেকে বনান্তরে, পর্বত থেকে পর্বতান্তরে বিচরণের ক্লেশ ব্যক্ত করছেন, যা এক-ই সঙ্গে কায়িক ও মানসিক।

দশরূপককার ধনঞ্জয় ব্যতীত অন্যান্য সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ এই অঙ্গটি স্বীকার করেছেন এবং এর লক্ষণ বিচারে তাঁদের মধ্যে বিশেষ বৈমত্য নেই। নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, এই সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণ হল – ‘মনশ্চেষ্টাবিনিষ্পন্নঃ শ্রমঃ খেদ উদাহৃতঃ’ (না.শা.১৯/৯২) । পরভাবী সাগরনন্দী, বিশ্বনাথ প্রমুখ খেদলক্ষণনির্ণয়ে নাট্যশাস্ত্রের মতটির পুনরুক্তি করেছেন মাত্র।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শ্রম-উদ্বেগ-বিতর্ক ইত্যাদি ব্যভিচারিভাবের তালিকার অন্ত-র্গত; কিন্তু প্রয়োজনে রসের পুষ্টিসাধনের কারণে সন্ধ্যঙ্গরূপে এদের প্রয়োগ দোষাবহ নয়। এই মতের সমর্থনে অভিনবভারতীর নিম্নোদ্ধৃত অংশটি উল্লেখ করা যেতে পারে – ‘যদ্যপি শ্রমোদ্বেগবিতর্কলজ্জাপ্রভৃতয়ো ব্যভিচারিবর্গে পূর্বমুক্তাস্ত থাপ্যেতে সত্যবসরে2বশ্যপ্রোজ্যাঃ প্রাগুক্তপ্রয়োজনার্থসিদ্ধয়ে, তে পৃথক্প্রয়োজনত্বাৎ সন্ধ্যঙ্গত্বেনোক্তা মন্তব্যাঃ’ (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

৮.বিরোধ – বিরোধ নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – ‘বিরোধঃ প্রস্ত্ততজ্যানিঃ’ (না.দ. ১/৫৯) – প্রস্তুত অর্থাৎ অভীষ্ট কার্যের ‘জ্যানি’ অর্থাৎ বিঘ্নের আশঙ্কায় বিরোধ নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়। নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণ যে বিশেষ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য নিজ-নিজ কার্যে ব্রতী হন, সেই অভীপ্সিত কার্যের ক্ষতি বা বিনাশের সম্ভাবনায় এই সন্ধ্যঙ্গটির প্রয়োগ হয়।

বিরোধের উদাহরণরূপে ‘কৃত্যারাবণ’ রূপকের সপ্তম অঙ্কের নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে–

কঞ্চুকী (লক্ষ্মণবিভীষণৌ প্রতি) –“ কুমার! এতৎ।

উভৌ–কিম্?

কঞ্চুকী–আঃ! ইদম্ ।

উভৌ–আর্য! কথয় কথয়।

কঞ্চুকী – কা গতিঃ! শ্রূয়তাম্ । আর্যা খলু সীতা রাবণাজ্ঞয়া কিঙ্করোপনীতং ভর্তুর্মায়াশিরো2বলোক্য সখীভিরাশ্বাস্যমানাপি নিবৃত্তপ্রযোজনা ‘নাহমাত্মানং ক্লেশয়ামি’ ইত্যুক্ত্বা –

সর্বে–কিং কৃতবতী?

কঞ্চুকী–যন্ন শক্যতে বক্তুম্।

শশিন ইব কলা দিনাবসানে কমলবনোদরমৃত্যুৎসুকেব হংসী।

পতিমরণরসেন রাজপুত্রী স্ফুরিতরালশিখং বিবেশ বহ্নিম্ ॥''

–উদাহৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, কঞ্চুকী লক্ষ্মণ-বিভীষণসহ উপস্থিত সকলকে একটি সংবাদ নিবেদন করছেন। তিনি বলছেন, রাবণকর্তৃক প্রদর্শিত শ্রীরামচন্দ্রের মায়াশির দর্শনের পর সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। এই ঘটনার পর লক্ষ্মণাদি পাত্রসকলের সীতা উদ্ধাররূপ প্রচেষ্টা নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হওয়ার কারণে, এটি বিরোধ নামক সন্ধ্যঙ্গের উত্তম উদাহরণ।

নাট্যদর্পণকারদ্বয় এখানে একটি বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করছেন। তাঁদের মতে, কোনো কোনো আচার্য নাট্যদর্পণসম্মত খেদ ও বিরোধ নামক সন্ধ্যঙ্গদুটির পরিবর্তে যথাক্রমে 'বিদ্রব' ও 'বিচলন' নামক দুটি অঙ্গ স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, বিদ্রব হল বন্ধন, হত্যার প্রচেষ্টা ইত্যাদি। এর উদাহরণরূপে মায়ুরাজ-প্রণীত অধুনালুপ্ত গ্রন্থ 'ছলিতরাম'-এর একটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে,যেখানে লবের বন্ধন কথিত হওয়ায় এটিকে বিদ্রবের উদাহরণ বলা হয়েছে। হত্যার প্রচেষ্টারূপ বিদ্রবের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে 'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্কের অংশবিশেষ, যেখানে বাসবদত্তা সাগরিকাকে যে অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখেছেন, সেখানে সহসা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় সাগরিকার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছে। এই বিদ্রব আবার 'সম্ভ্রমাত্মক' অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক-ও হতে পারে, যার উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার' থেকে যুধিষ্ঠিরের উক্তিবিশেষ উদ্ধার করা হচ্ছে, যেখানে যুধিষ্ঠিরের ভ্রান্তি ও ক্রোধ প্রকাশিত হচ্ছে।

এই অনামা আচার্যরা বিচলন নামক যে সন্ধ্যঙ্গটি স্বীকার করেছেন, তার লক্ষণে বলা হচ্ছে, শৌর্য-কুল-বিদ্যা-রূপ-সৌভাগ্যাদিবিষয়ক আত্মপ্রশংসার নাম বিচলন। এর উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ভীমসেনের আত্মশ্লাঘাসূচক উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যদি-ও নাট্যদর্পণকাররা 'কোনো কোনো আচার্যর অভিমত' বলে এই মতটির উল্লেখ করেছেন ('অন্যে তু খেদবিরোধৌ ন মন্যন্তে ...'), তবু স্পষ্টতঃ-ই প্রতীত হয়, এই মত দশরূপককার আচার্য ধনঞ্জয়ের। সন্ধ্যঙ্গদুটির কেবল লক্ষণ-ই নয়, উদাহরণগুলি-ও দশরূপক থেকে-ই গৃহীত।

নাট্যদর্পণে যদি-ও বলা হয়েছে, দশরূপকে বিরোধের পরিবর্তে 'বিচলন' নামক অঙ্গটি স্বীকৃত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দশরূপকে 'বিরোধন' নামক একটি সন্ধ্যঙ্গ-ও স্বীকার করা হয়েছে, যেখানে উত্তেজনাপূর্ণ উক্তিকে বিরোধন বলা হয়েছে – 'সংরব্ধোক্তিঃ বিরোধনম্' (দশ.রূ.১/৪৭)। তবে নাট্যদর্পণের বিরোধ এবং দশরূপকের এই বিরোধনের মধ্যে লক্ষণগত সাদৃশ্য বিন্দুমাত্র-ও নেই।

নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিরোধলক্ষণটি নাট্যদর্পণের-ই মতন। সেখানে বলা হয়েছে – 'কার্যাত্যয়োপগমনং বিরোধনমিতি স্মৃতম্' (না.শা. ১৯/৯৩)– অর্থাৎ কার্যনাশের সম্ভাবনা-ই বিরোধন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভরতোক্ত 'প্রতিষেধ' নামক সন্ধ্যঙ্গটির লক্ষণটি-ও কিন্তু বহুলাংশে বিরোধনের-ই মতন। প্রতিষেধলক্ষণে-ও বলা হচ্ছে,ঈপ্সিত বস্তুলাভের প্রতিবন্ধকতার নাম প্রতিষেধ – 'ঈপ্সিতার্থপ্রতীঘাতঃ প্রতিষেধঃ প্রকীর্তিতঃ'(না.শা.১৯/৯৩)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও অভীষ্ট কার্যে ক্ষতির আশঙ্কাকে বিরোধ বলা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণ এবং নাটকচন্দ্রিকাতে এই সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণরূপে নাট্যশাস্ত্রের লক্ষণটি অবিকল উদ্ধার করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রের কোনো-কোনো সংস্করণের অবশ্য 'বিরোধনং তু সংরম্ভাদুত্তরোত্তরভাষণম্' – এরূপ পাঠ-ও পাওয়া যায়; যার অর্থ, অপ্রীতিকর ক্রুদ্ধ বাগ্‌বিনিময়ের নাম বিরোধন। দশরূপককার এই পাঠটির-ই অনুসরণে স্বীয়গ্রন্থে বিরোধলক্ষণ নির্ণয় করেছেন।

৯.সংরম্ভঃ– 'সংরম্ভঃ শক্তিকীর্তনম্'(না.দ.১/৫৯) –এই হল সংরম্ভ নামক সন্ধ্যঙ্গটির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। ক্রোধাদির কারণে উত্তেজিত দুই নাটকীয় পাত্রের মধ্যে যখন নিজ-নিজ শক্তিজ্ঞাপক উত্তপ্ত বাদানুবাদ সংঘটিত হয়, তখন সংরম্ভ নামক সন্ধ্যঙ্গটির প্রয়োগ হয়।

সংরম্ভের উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর পঞ্চমাঙ্ক থেকে দুর্যোধন ও ভীমের শক্তিজ্ঞাপক ক্রোধপূর্ণ সংলাপের অংশবিশেষ উপন্যস্ত হয়েছে–

ভীমঃ (দুর্যোধনং প্রতি) –''অন্যচ্চ মূঢ়!

শোকং স্ত্রীবন্নয়নসলিলৈর্যৎ পরিত্যাজিতো2সি

ভ্রাতুর্বক্ষঃস্থলবিঘটনে যচ্চ সাক্ষীকৃতো2সি।

আসীদেতৎ তব কুনৃপতেঃ কারণং জীবিতস্য

ক্রুদ্ধে যুষ্মদ্‌কুলকমলিনীকুঞ্জরে ভীমসেনে ॥

রাজা – দুরাত্মন্! ভরতকুলাপসদ! পাণ্ডবপশো! নাহং ভবানিব বিকত্থনাপ্রগল্‌ভঃ। কিন্তু–

দ্রক্ষ্যন্তি ন চিরাৎ সুপ্তং বান্ধবাস্ত্বাং রণাঙ্গণে।

মদ্‌গদাভিন্নবক্ষো2স্থিবেণীকাভীমভূষণম্ ॥''

– এই অংশে ভীমসেন ও দুর্যোধন নিজ-নিজ শক্তিখ্যাপন দ্বারা পরস্পরকে বধ করতে প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন। এই উত্তেজিত বাগ্‌বিনিময়ের কারণে এটি সংরম্ভের যথার্থ উদাহরণ।

ক্রোধের ব্যঞ্জনা না থাকলে-ও এবং বাদানুবাদ না হলে-ও, এই সন্ধ্যঙ্গটির প্রয়োগ হতে পারে। এর উদাহরণরূপে 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্কের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হচ্ছে–

যুধিষ্ঠিরঃ –'' নূনং তেনাদ্য বীরেণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গভীরুণা।

বধ্যতাং কেশপাশস্তে স চাস্যাকর্ষণক্ষমঃ ॥"

– দ্রৌপদীর সঙ্গে আলাপ-অবসরে যুধিষ্ঠির বলছেন, ভীম আজ অবশ্য-ই দুঃশাসনকে বধ করবেন। এই অংশে ক্রোধ এবং বাগ্‌বিনিময় না থাকলে-ও, ভীমের বীরত্ববর্ণনহেতু এটি-ও সংরম্ভ নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

সম্ফেট ও সংরম্ভ – আমর্শসন্ধির এই দুইটি অঙ্গের লক্ষণদৃষ্টে এদেরকে অনুরূপ বলে মনে হয়। এই সংশয়ের অবসানকল্পে নাট্যদর্পণকাররা বলেছেন, সম্ফেট কেবল ক্রুদ্ধ ভাষণমাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু সংরম্ভে ক্রোধের সঙ্গে-সঙ্গে পৌরুষ এবং বীরত্বখ্যাপন-ও থাকবে – এই হল অঙ্গদুটির প্রভেদ।

নাট্যশাস্ত্রকার এই অঙ্গটিকে স্বীকার করেননি । সম্ভবতঃ সেই কারণে পরভাবী নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা-ও কেউ-ই অঙ্গটির উল্লেখ করেননি। অঙ্গটি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের একান্ত নিজস্ব অভিনব সংযোজন।

১০.শক্তি – 'ক্রুদ্ধপ্রসাদনং শক্তিঃ' (না.দ. ১/৬০) – এই হল আমর্শসন্ধির শক্তি নামক অঙ্গটির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। বৃত্তিতে প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রসাদন' পদটির দুপ্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে এবং তার ফলে শক্তি নামক সন্ধ্যঙ্গটির দুই প্রকার প্রয়োগের অবসর রয়েছে। প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, বুদ্ধি অথবা ধনরত্নাদি বিভবের দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিবলে বা অর্থবলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করার নাম শক্তি। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, শত্রুস্থানীয় কোনো ব্যক্তির সমূল বিনাশের নাম শক্তি। অতএব দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি পরিস্থিতিতে শক্তি নামক অঙ্গটি প্রয়োগ করা সম্ভব।

শক্তির প্রথম প্রকারটির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে 'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক থেকে –

রাজা –"সব্যাজৈঃ শপথৈঃ প্রিয়েণ বচসা চিত্তানুবৃত্ত্যা ভৃশং
বৈলক্ষ্যেণ পরেণ পাদপতনৈর্বাক্যৈঃ সখীনাং মুহুঃ।
প্রত্যাসত্তিমুপাগতা মম তথা দেবী রুদত্যা যথা
প্রক্ষাল্যৈব তয়ৈব বাষ্পসলিলৈঃ কোপো2পনীতঃ স্বয়ম্ ॥"

– রাজা উদয়নের সাগরিকালাভের পথে প্রধান অন্তরায় হলেন বাসবদত্তা। উল্লিখিত অংশে ছলনাময় শপথ, মিথ্যাবাক্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের দ্বারা বুদ্ধিপূর্বক বাসবদত্তার ক্রোধোপশমের চেষ্টার কারণে এটি শক্তির যথার্থ উদাহরণ।

শত্রুবিনাশরূপ শক্তির উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে 'কৃত্যারাবণ' রূপকের সপ্তম অঙ্ক থেকে –

"কষ্টং ভোঃ কষ্টম্ ।
রামেণ প্রলয়েনেব মহাসত্ত্বেন লীলয়া।

পাতিতো2য়ং দশশিরঃ শৃঙ্গবানিব পর্বতঃ ৷৷”

– এই অংশে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শত্রু রাবণের বিনাশ কথিত হওয়ায়, এটি শক্তির দ্বিতীয় প্রকারটির উদাহরণ।

এরপর বলা হচ্ছে, কোনো-কোনো আচার্যর মতে বিরোধ প্রশমনের নাম-ই শক্তি– 'অন্যে তু বিরোধপ্রশমনং শক্তিমামনন্তি'।[৯০] এখানে দ্রষ্টব্য যে, বুদ্ধি বা অর্থবলের উল্লেখ এখানে করা হয়নি, কেবলমাত্র বৈরিতার অবসানে-ই অঙ্গটি প্রযুক্ত হবে – এরকম বলা হচ্ছে।

নাট্যদর্পণকারদ্বয় এই মতের প্রবক্তা আচার্যদের নামোল্লেখ না করলে-ও, বস্তুতঃপক্ষে ভরত থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ বিরোধের উপশমকে-ই শক্তি নামে চিহ্নিত করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'বিরোধিপ্রশমো যশ্চ সা শক্তিঃ পরিকীর্তিতা' (না.শা. ১৯/৯০)। আচার্য অভিনবগুপ্ত অবশ্য এই সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যায় বুদ্ধিবিভবাদির উল্লেখ করেছেন। অভিনবভারতীটীকায় বলা হচ্ছে – 'বিরোধিনঃ কুপিতস্য প্রশমঃ প্রসাদনং শক্তিঃ বুদ্ধিবিভবাদিশক্তিকার্যত্বাৎ'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকাদি যাবতীয় গ্রন্থে ভরতের মতটি-ই অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্রুদ্ধব্যক্তিকে বুদ্ধ্যাদি দ্বারা প্রসন্ন করার নাম-ই শক্তি – এই হল সকলের অভিমত।

নাট্যদর্পণে এবার একটি ভিন্ন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে । বলা হচ্ছে, কোনো-কোনো আচার্য শক্তি নামক অঙ্গটির পরিবর্তে 'ভাবান্তর' নামক একটি অঙ্গটিকে স্বীকার করেন। যখন প্রকৃত মানসিক অবস্থা অনুসারে আচরণ না করে, তার বিপ্রতীপ কোনো কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখন এই অঙ্গটির প্রয়োগ হয়। এর উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে 'তাপসবৎসরাজ' রূপকের ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ মহিষী বাসবদত্তাকে আত্মবিসর্জন করা থেকে নিবৃত্ত করতে চান, এটি-ই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়।কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি 'বিনীতক' নামক পাত্রকে চিতারচনা করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন ('ভদ্র বিনীতক! রচয় চিতাম্...')। এভাবে মনোগত বাসনার বিপরীত কাজ করার কারণে, এটি ভাবান্তরের উদাহরণরূপে বিবেচিত হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই মতের প্রবক্তা আচার্যর নাম বলা হয়নি।

কোনো-কোনো আচার্য আবার শক্তির পরিবর্তে 'আজ্ঞা' নামক একটি অঙ্গকে স্বীকার করেন। তাঁদের মতানুসারে, যুক্ত-অযুক্ত বিচার না করে যে আদেশ জ্ঞাপন করা হয়, তার নাম আজ্ঞা । এর উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে 'কৃত্যারাবণ' নামক রূপক থেকে, যেখান ত্রিজটা ও দারুণিকা নাম্নী রাক্ষসীদ্বয়ের কথোপকথন থেকে রাবণকর্তৃক প্রদত্ত সীতাবধের আজ্ঞা বিষয়ে জানা যাচ্ছে। হিতাহিতবিচারশূন্য রাবণের এই আদেশের কারণে এটি আজ্ঞা নামক অঙ্গের উদাহরণ।

১১. প্ররোচনা – প্ররোচনা নামক সন্ধ্যঙ্গটির লক্ষণ বিধৃত করে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'ভাবিসিদ্ধিঃ প্ররোচনা' (না.দ. ১/৬০) । ভাবী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কার্যের সিদ্ধির কথা সূচিত হলে, এই সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়।ভাবী ঘটনা অর্থাৎ নাটকের মুখ্য প্রয়োজনের সমাপ্তি ঘটে নির্বহণসন্ধিতে । অতএব সমাসতঃ বলা যায় যে, নির্বহণসন্ধিতে যে কার্য সিদ্ধ হওয়ার কথা , আমর্শসন্ধির যে অঙ্গে সেই সাফল্যের কথা সূচিত হয়, তার নাম প্ররোচনা। রূপকের মুখ্য প্রয়োজনরূপ ফল প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হয় বলে এই অঙ্গের নাম প্ররোচনা । বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে – 'নির্বহণসন্ধৌ ভাবিনো2র্থস্য সিদ্ধিঃ সিদ্ধত্বেনোপক্রমণং প্রকর্ষেণ দীপ্যতে2নয়া রূপকার্থ ইতি প্ররোচনা।' [৯১]

নাট্যদর্পণে প্ররোচনার দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে, দ্বিতীয়টি 'রাঘবাভ্যুদয়' রূপকের সপ্তম অঙ্ক থেকে। আমরা প্রথমটির বিশদ আলোচনা করছি–

পাঞ্চালকঃ –"অহং চ দেবেন চক্রপাণিনা ইত্যুপক্রম্য কৃতং সন্দেহেন–

পূর্যন্তাং সলিলেন রত্নকলশা রাজ্যাভিষেকায় তে
কৃষ্ণান্যন্তচিরোজ্ঝিতে চ কবরীবন্ধে করোতু ক্ষণম্।
রামে শাতকুঠারভাসুরকরে ক্ষত্রদ্রুমোচ্ছেদিনি
ক্রোধান্ধে চ বৃকোদরে পরিপতত্যাজৌ কুতঃ সংশয়ঃ ॥"

–দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন ও যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হল বেণীসংহার নাটকটির মুখ্য ফল, যার প্রাপ্তি নাটকের নির্বহণসন্ধিতে। কিন্তু দূরদর্শী শ্রীকৃষ্ণ আগে-ই এই সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত। তাঁর এই নিশ্চিন্ততার কথা-ই ব্যক্ত হয়েছে পাঞ্চালকের উক্তিমুখে। এভাবে ভাবী ফললাভের কথা সূচিত হওয়ার কারণে, এটি প্ররোচনা নামক আমর্শসন্ধ্যঙ্গের যথাযথ উদাহরণ।

বৃত্তিতে এরপর প্ররোচনার অন্যান্য লক্ষণের কথা-ও বলা হয়েছে। কোনো-কোনো আচার্যর মতে 'সৎকারাদেশন'-কে প্ররোচনা বলা হয়। এর উদাহরণটি-ও বেণীসংহার থেকে-ই গৃহীত। সৎকারাদেশন পদের ব্যাখ্যায় ডঃ.ত্রিপাঠী যদি-ও বলেছেন– 'a direction to honour persons with gift etc.'; কিন্তু বৃত্তিতে প্রদত্ত উদাহরণদৃষ্টে এই ব্যাখ্যাটি সঙ্গত মনে হয় না। 'সৎকার' শব্দের 'সমাদর' অর্থটি গ্রহণ করলে উদাহরণসঙ্গতি ঘটে না। পরিবর্তে যদি 'বিশেষ, বিশদ আদেশ'– এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে উদাহরণটি যথাযথ হয়। 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্কে জনৈক পুরুষের প্রতি যুধিষ্ঠিরের "উচ্যতাং সহদেবঃ ক্রুদ্ধস্য বৃকোদরস্য ...দুর্যোধনপ্রতিলম্ভবার্তায়ৈ" – এই উক্তিটি প্ররোচনার উদাহরণ। এই অংশে পলাতক দুর্যোধনের অন্বেষণের জন্য বিশদে, বিস্তৃতভাবে আদেশ দেওয়া হচ্ছে; এটিকে প্ররোচনার উদাহরণ বলা যেতে পারে।

কোনো-কোনো আচার্য আবার প্ররোচনার পরিবর্তে 'যুক্তি' নামক একটি অঙ্গ স্বীকার করেছেন। বিচ্ছেদযুক্ত উক্তির নাম যুক্তি। এর উদাহরণটি 'পুষ্পদূষিতক' নামক প্রকরণ থেকে গৃহীত। এই মতের প্রবক্তা আচার্যর নামোল্লেখ না করলে-ও, ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কোনো-কোনো সংস্করণে এই অঙ্গটির উল্লেখ পাওয়া যায় – 'সবিচ্ছেদং বচো যত্র সা যুক্তিরিতি সংজ্ঞিতা'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য প্ররোচনা নামক অঙ্গটিকে-ও স্বীকার করা হয়েছে। তত্রোদ্ধৃত প্ররোচনালক্ষণটি হল – 'প্ররোচনা চ বিজ্ঞেয়া সংহারার্থপ্রদর্শিনী' (না.শা. ১৯/৯৪) – অর্থাৎ রূপকের উপসংহারের বিষয়ের সাফল্যজ্ঞাপক উক্তির নাম প্ররোচনা। পরভাবী নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। দশরূপককারের লক্ষণটি-ও এক-ই প্রকার। কেবলমাত্র তাঁর মতে, এই সাফল্যের কথা সূচিত হবে কোনো সিদ্ধ অর্থাৎ মহান্ দূরদর্শী ব্যক্তির দ্বারা – 'সিদ্ধমন্ত্রণতো ভাবিদর্শিকা স্যাৎ প্ররোচনা' (দশ.রূ. ১/৪৭)। নাটকচন্দ্রিকাকার রূপ গোস্বামী-ও দশরূপকের অনুসরণে বলেছেন – 'সিদ্ধবদ্ভাবিনো2র্থস্য সূচনা স্যাৎ প্ররোচনা' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ২৫৩) ।

১২. আদান – 'ফলসামীপ্যমাদানম্' (না.দ. ১/৬০) – আদান নামক আমর্শসন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ এটি। নাটকীয় বীজের যে ফল, তার সমীপবর্তী হওয়ার নাম আদান। নাটকের ফলপ্রাপ্তি ঘটে নির্বহণসন্ধিতে। তার পূর্বে-ই আমর্শসন্ধির এই অঙ্গটিতে নাটকীয় ফল সম্পর্কে দর্শক-পাঠকের মনে স্বচ্ছ একটি ধারণার সৃষ্টি হয়ে যায়।

আদানের উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে 'নাগানন্দ' থেকে– নায়কমুদ্দিশ্য গরুড়ঃ –

''নাগানাং রক্ষিতা ভীতি গুরুরেষ যথা মম।
তথা সর্পাশনকাঙ্ক্ষা ব্যক্তমদ্যাপনেষ্যতি ॥''

– উদ্ধৃত অংশে গরুড় জীমূতবাহনকে বলছেন যে, তিনি আর সর্পদের বিনাশ করবেন না। এভাবে জীমূতবাহন কর্তৃক সর্পকুলরক্ষারূপ মুখ্য ফলের সামীপ্য দ্যোতিত হওয়ায় এটি আদানের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও নাট্যবীজের ফলসমীপবর্তী হওয়ার নাম আদান – 'বীজকার্যোপগমনাদানমিতি সংজ্ঞিতম্' (না.শা. ১৯/৯৩)। দশরূপকে বলা হয়েছে, নাটকের উপসংহৃতি অংশকে অধিকতর গতিদানের জন্য রূপকের বস্তুর অন্তর্গত কার্যকে সংগৃহীত করার চেষ্টার নাম আদান – 'আদানং কার্যসংগ্রহঃ' (দশ.রূ. ১/৪৮) । সাহিত্যদর্পণে ও নাটকচন্দ্রিকায় ধনঞ্জয়ের মতটি-ই অনুসৃত হয়েছে।

১৩. ব্যবসায় – নাট্যদর্পণে ব্যবসায় নামক বিমর্শসন্ধ্যঙ্গের লক্ষণটি হল – 'ব্যবসায়ো2র্থ্যহেতুর্যুক্' (না.দ. ১/৬০)– অভীষ্ট ফল অর্থাৎ নাটকের মুখ্য ফলের প্রাপ্তির অনুকূল হেতুর সঙ্গে সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয় রূপকের যে অংশে, তার নাম ব্যবসায়। অল্পকথায়, মুখ্য ফলের নিষ্পাদনহেতু উপায়ের প্রদর্শনের নাম ব্যবসায়।

ব্যবসায়ের উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে 'রত্নাবলী' নাটিকার ঐন্দ্রজালিকের উক্তি থেকে। ঐন্দ্রজালিকের প্রবেশের পর তদুক্ত 'একো উণ খেডওা তএ অবস্‌সং পেক্‌খিদব্বো' ('একং পুনঃ খেলনমবশ্যং প্রেক্ষিতব্যম্') ইত্যাদি অংশে তিনি মন্ত্রপ্রভাবে মিথ্যা অগ্নি প্রজ্বলিত করার কথা বলছেন এবং এই ঘটনার দ্বারা মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের অঙ্গীকৃত কার্য সম্পাদনের উপায় প্রদর্শিত হয়েছে। অতএব এটি ব্যবসায় নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অভিনবভারতীটীকাতে-ও ব্যবসায়ের এই উদাহরণটি-ই প্রদত্ত হয়েছে।

এরপর ব্যবসায়ের অপর একটি লক্ষণ উল্লেখ করা হচ্ছে। কোনো- কোনো আচার্যর মতে, নিজ সামর্থ্যের কথা ব্যক্ত করা-ই হল ব্যবসায়। তাঁদের সম্মত লক্ষণটি হল– 'ব্যবসায়ঃ স্বশক্ত্যুক্তিঃ'।[৯২] এর উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে –

যুধিষ্ঠিরঃ –" নূনং তেনাদ্য বীরেন প্রতিজ্ঞাভঙ্গভীরুণা।

বধ্যতে কেশপাশস্তে স চাস্যাকর্ষণক্ষমঃ ॥"

– উল্লিখিত অংশে দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে ভীমসেনের বীরত্ববর্ণনা প্রসঙ্গে নিজশক্তির প্রভাব প্রকাশিত হওয়ায়, এটি ব্যবসায়ের উদাহরণরূপে গৃহীত হয়েছে। এই মতের প্রবক্তা আচার্যের নাম না বলা হলে-ও, এটি স্পষ্টতঃ-ই দশরূপককার ধনঞ্জয়ের অভিমত। উদাহরণটি-ও দশরূপক থেকে-ই গৃহীত । রূপ গোস্বামী-ও তাঁর নাটকচন্দ্রিকা গ্রন্থে এই মতটি-ই সমর্থন করেছেন – 'ব্যবসায়স্তু সামর্থ্যপ্রখ্যাপনমুদীর্যতে' (না.চ.শ্লোকসংখ্যা – ২৪৬)।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, অঙ্গীকৃত অর্থের হেতুসমূহকে লাভ করার নাম-ই ব্যবসায় – 'ব্যবসায়শ্চ বিজ্ঞেয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতুসম্ভবঃ' (না.শা.১৯/৯০)। সাহিত্যদর্পণে ও নাটকলক্ষণরত্নকোশে ব্যবসায়ের এক-ই প্রকার লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে।

নির্বহণসন্ধ্যঙ্গ ঃ

এবার নির্বহণসন্ধির অঙ্গগুলির বিষয়ে আলোচনা করা হবে। নির্বহণসন্ধির অঙ্গসংখ্যা চোদ্দটি। সেগুলি হল – সন্ধি, নিরোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, উপাস্তি, কৃতি, আনন্দ, সময়, পরিগূহন, ভাষণ, কাব্যসংহার, পূর্বভাব এবং প্রশস্তি।

পূর্বাপর সকল আচার্য-ই নির্বহণসন্ধির চৌদ্দটি অঙ্গ স্বীকার করেছেন। তবে নাট্যশাস্ত্রে 'কৃতি'র পরিবর্তে 'দ্যুতি' নামক অঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে, দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে 'নিরোধ'-এর পরিবর্তে 'বিবোধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'সন্ধি' ও 'নিরোধ'–এই দুই সন্ধ্যঙ্গ অনুপস্থিত; তৎপরিবর্তে এখানে অপর দুটি অঙ্গ সংযোজিত হয়েছে– 'অর্থ' এবং 'অনুযোগ'।

নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, নির্বহণসন্ধিতে প্রযোজ্য চৌদ্দটি অঙ্গ-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ, এদের সবকটি-ই প্রধান। অতএব কোনো অঙ্গকে প্রয়োজনবোধে বাদ দেওয়ার অবকাশ নেই।

১.সন্ধি – নির্বহণসন্ধির প্রথম অঙ্গটির নাম সন্ধি। নাট্যদর্পণে এর লক্ষণটি হল– 'সন্ধির্বীজফলাগমঃ'(না.দ.১/৬২) – মুখসন্ধিতে উপন্যস্ত, প্রারম্ভ নামক অবস্থা সমন্বিত বীজ যখন ফলপ্রাপ্তির অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সন্ধি নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। নাটকের সূচনায় উপ্ত নাটকীয় বীজের প্রয়োজনসমাপ্তি অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির সূচনা হয় এই সন্ধ্যঙ্গে । বৃত্তিতে বলা হয়েছে– 'অত্র মুখে যদুক্তং বীজং তন্নিকটীভূতমিতি'।[৯৩] অভিনবভারতীতে-ও বীজের ফলাগমের অবস্থার নিকটীভবন সন্ধি– এরূপ বলা হয়েছে –'মুখে যদুক্তং তদিহ নিকটীভূতং সন্ধানং সন্ধিঃ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে সন্ধির উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি উল্লিখিত হয়েছে –

বসুভূতিঃ(অগ্নিবিদ্রবানন্তরং সাগরিকাং নির্বর্ণ্য)– ''বাভ্রব্য! সুসদৃশীয়ং রাজপুত্র্যাঃ।

বাভ্রব্যঃ – মমাপ্যেবমেব মনসি।''

–বাসবদত্তার কাছে ন্যস্ত সাগরিকা-ই যে সিংহলরাজদুহিতা রত্নাবলী, তা দুই মন্ত্রী বসুভূতি ও বাভ্রব্যের কথোপকথন থেকে বোঝা যাচ্ছে। এভাবে নায়িকারূপ বীজের ফলাগমের সূচনায় এটি সন্ধি নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের যথাযথ উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই এক-ই উদাহরণ অভিনবভারতীতে এবং দশরূপকে-ও গৃহীত হয়েছে।

সন্ধির লক্ষণবিষয়ে পূর্বাপর আচার্যদের বৈমত্য নেই বললে-ই চলে। মহর্ষি ভরতের মতে, মুখসন্ধিতে কথিত বীজের ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সন্নিহিত হলে-ই সন্ধি নামক নির্বহণাঙ্গটি হয়ে থাকে –'মুখবীজোপগমনং সন্ধিরিত্যভিধীয়তে'(না.শা.১৯/৯৭)। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি গ্রন্থে নির্ণীত সন্ধিলক্ষণটি নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে বিহিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশ গ্রন্থে এই অঙ্গটি স্বীকার করেননি।

নাট্যদর্পণের নির্বহণসন্ধির অঙ্গসমূহের আলোচনার প্রারম্ভে চৌদ্দটি অঙ্গ-ই রূপকে অবশ্য প্রযোক্তব্য, এরূপ নির্দেশের পরে-ও পুনরায় বলা হচ্ছে, সন্ধি নামক অঙ্গটির প্রয়োগ অবশ্য-ই করতে হবে। এর দ্বারা সন্ধির বিশেষ প্রাধান্য দ্যোতিত হচ্ছে – এরূপ মনে করা যেতে পারে।

২.নিরোধ – 'নিরোধঃ কার্যমীমাংসা' (না.দ. ১/৬২) – এই হল নিরোধ নামক সন্ধ্যঙ্গটির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ । নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অন্তর্হিত বা বিনষ্ট কোনো কার্য বা বিষয়ের যুক্তিপূর্বক অন্বেষণের নাম নিরোধ। প্রয়োজনীয় কার্য বা বিষয় বলতে এখানে নাটকের মুখ্য ফলকে বোঝানো হচ্ছে। নানা কারণে বিনষ্ট বা রুদ্ধ এই নাট্যফলের যুক্তিপূর্ণ অন্বেষণের নাম নিরোধ। বৃত্তিতে নিরোধপদটির ব্যাখ্যাতে তাই বলা হচ্ছে – 'তন্নিরুদ্ধবস্তুবিষয়ত্বাৎ নিরোধঃ।' [৯৪]

নিরোধের উদাহরণরূপে মায়ুরাজ-বিরচিত 'ছলিতরাম' নামক রূপকটির অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে–

লক্ষ্মণেন বদ্ধ্বানীতো লবো যজ্ঞার্থে সীতাপ্রতিকৃতিমুপকল্পিতাং রামসদসি দৃষ্ট্বা স্বগতমাহ– "অয়ে! কথমিয়মম্বা রাজদ্বারমাগতা? (উত্থায় সহসোপগত্যাঞ্জলিং বদ্ধ্বা) অম্ব! অভিবাদয়ে।(নিরূপ্য) কথমিয়ং কাঞ্চনময়ী? (অপসৃত্যোপবিশতি, সর্বে পরস্পরমবলোকয়ন্তি)

রামঃ – (দৃষ্ট্বা) বৎস! কিমিয়ং তব মাতা?

লবঃ – রাজন্ ! জ্ঞায়তে সৈবেয়মস্মজ্জননী। কিন্ত্বেষা দেবী ভূষণোজ্জ্বলা।

(রামঃ সবাষ্পং হস্তে গৃহীত্বা সমীপে উপবেশয়তি)

লক্ষ্মণঃ(সাস্রুম্) – আয়ুষ্মন্ ! কিং নামধেয়া সা দেবানাং প্রিয়স্য জননী?

লবঃ – তাং খলু মাতামহো2স্মাকমভিধত্তে সীতেতি।

লক্ষ্মণঃ (সবাষ্পং রামস্য পাদয়োর্নিপত্য) – আর্য! দিষ্ট্যা বর্ধসে। সপুত্রা জীবত্যার্যা।"

– উদ্ধৃত অংশে লবের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের কথোপকথনদ্বারে সীতার জীবনরূপ কার্যের যুক্তিসহ অন্বেষণের কারণে এটি নিরোধ নাম সন্ধ্যঙ্গের যথার্থ উদাহরণ ।

নাট্যদর্পণোক্ত নিরোধলক্ষণটি নাট্যশাস্ত্রের অনুসারী। ভরত-ও এর লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন – 'কার্যস্যান্বেষণং যুক্ত্যা নিরোধ ইতি কীর্তিতঃ' (না.শা. ১৯/৯৮) – অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বিষয়ের যৌক্তিক অন্বেষণের নাম নিরোধ। দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে এই অঙ্গটি 'বিবোধ' নামে আখ্যাত হলে-ও, নির্ণীত লক্ষণটি এক-ই প্রকার। দশরূপকে বিবোধের লক্ষণটি হল –'বিবোধঃ কার্যমার্গণম্'(দশ.রূ.১/৫১)। সাহিত্যদর্পণে ও নাটকচন্দ্রিকায় এই লক্ষণটি-ই অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাটকলক্ষণরত্নকোশে এই অঙ্গটিকে স্বীকার করা হয়নি।

৩.গ্রথন – 'গ্রথনং কার্যদর্শনম্' (না.দ. ১/৬৩) – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত গ্রথনলক্ষণ। সকল প্রকার নাটকীয় কার্যের অভিপ্রায় হল মুখ্যফললাভ। যে ব্যাপারের দ্বারা এই মুখ্যফল গ্রথিত হয়, তা-ই হল গ্রথন নামক সন্ধ্যঙ্গ। টীকাতে তাই বলা হয়েছে – 'গ্রথ্যতে সম্বধ্যতে ব্যাপারেণ মুখ্যফলমনেনেতি গ্রথনম্।'[৯৫]অতএব রূপকের শেষ অংশে সমস্ত নাটকীয় কার্যের একত্র সমাহারের দ্বারা মুখ্য ফলের সঙ্গে যুক্ত করার নাম গ্রথন।

'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্কের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি গ্রথনের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য. এই এক-ই উদাহরণ দশরূপকে-ও গৃহীত হয়েছে।

ভীমসেনঃ – "পাঞ্চালি! ন খলু ময়ি জীবতি সংহর্তব্যা দুঃশাসনবিলুলিতা বেণিরাত্মপাণিনা। তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু স্বয়মেবাহং সংহরামি।"

– ভীমসেন এই উক্তির দ্বারা দ্রৌপদীর বেণীসংযমনরূপ কার্যের সমাহার করায়, এখানে গ্রথন নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে গ্রথনের লক্ষণটি হল – 'উপক্ষেপস্তু কার্যাণাং গ্রথনং পরিকীর্তিতম্' (না.শা. ১৯/৯৮) – কার্যের উপসংহারকে গ্রথন বলা হয়। ধনঞ্জয়-ও মহর্ষি ভরতকে অনুসরণ করে বলেছেন – 'গ্রথনং তদুপক্ষেপঃ' (দশ.রূ. ১/৫১)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বহুবিধ অভীষ্টের উল্লেখকে গ্রথন নামে অভিহিত করা হয়েছে – 'কার্যাণাং বহূনামুপক্ষেপো গ্রথনম্'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়) ।সাহিত্যদর্পণকার মূলতঃ নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে, কার্যের সঙ্গে বিবিধ বিষয়ের সম্বন্ধকে গ্রথন নামে অভিহিত করেছেন – 'উপন্যাসস্তু কার্যাণাং গ্রথনম্'(সা.দ. ৬/১১০)। নাটকচন্দ্রিকায় দর্পণকারোক্ত লক্ষণটির অবিকল পুনরুক্তি করা হয়েছে।

৪.নির্ণয় – নাট্যদর্পণধৃত নির্ণয়লক্ষণটি হল – 'নির্ণয়ো2নুভবখ্যাতিঃ' (না.দ. ১/৬৩) – অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের বর্ণনার নাম-ই নির্ণয়। যখন কোনো নাটকীয় পাত্র জ্ঞাতব্য কোনো বিষয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিবিশেষের নিকট স্বীয় অনুভূত জ্ঞানের বর্ণনা করেন, তখন নির্ণয় নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ ঘটে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ের কারণে-ই এই সন্ধ্যঙ্গটির এই নাম।

নাট্যদর্পণে এই সন্ধ্যঙ্গের দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; একটি 'যাদবাভ্যুদয়' থেকে, দ্বিতীয়টি 'পুষ্পদূষিত' নামক প্রকরণ থেকে। আমরা এখানে প্রথম উদাহরণটির আলোচনা করবো –

সমুদ্রবিজয়ং প্রতি বাসুদেবঃ (সপ্রমোদম্) – "দেব! ময়া কংসপ্রতিভয়েন কৃষ্ণং গোকুলে গোপয়তা যো মহান্ ক্লেশো2নুভূতস্তস্য ফলমিদানীমভূৎ। কিন্তু লোকপরিজ্ঞানভয়েন যথয়া দেবপাদানামপি ন বিজ্ঞপ্তং, তত্র দেবেন ক্ষন্তব্যম্ –"

– কংসের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য বাসুদেব যে গোপনে কৃষ্ণকে গোকুলে রেখে এসেছেন, এই সংবাদ বিষয়ে রাজা সমুদ্রবিজয় জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁর সম্মুখে কৃষ্ণকে গোপনে রেখে আসা ও তজ্জনিত ক্লেশের বর্ণনার কারণে এটি নির্ণয় নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও অনুভূত বিষয়ের বর্ণনাকে নির্ণয় বলা হয়েছে – 'অনুভূতার্থকথনং নির্ণয়ঃ সমুদাহৃতঃ' (না.শা.১৯/৯৯)। অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় বলছেন, প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর বর্ণন-ই নির্ণয়– 'প্রমাণসিদ্ধস্য বস্তুনঃ কথনমিত্যর্থঃ'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। দশরূপকে এই সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণটি হল – 'অনুভূতাখ্যা তু নির্ণয়ঃ' (দশ.রূ.১/৫১)। সাহিত্যদর্পণকারের মতে – 'নির্ণয়ঃ পুনঃ অনুভূতার্থকথনম্' (সা.দ. ৬/১১০)। নাটকচন্দ্রিকাকার রূপ গোস্বামীর মতে – 'নির্ণয়স্ত্বনুভূতোক্তিঃ' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ২৮৯)।

অতএব দেখা গেল, কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ বা অজ্ঞব্যক্তির উদ্দেশ্যে নাটকীয় পাত্রকর্তৃক অনুভূত জ্ঞানের কথনে-ই যে নির্ণয় নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়, এই বিষয়ে প্রায় সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্-ই সহমত পোষণ করেন।

৫.পরিভাষা – 'পরিভাষা স্বনিন্দনম্' (না.দ. ১/৬৩) – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত পরিভাষালক্ষণ । রূপকের পাত্রপাত্রীরা যখন স্বীয় অপরাধের উদ্‌ঘাটন করেন বা কৃত অন্যায় কার্যের জন্য নিজের নিন্দাখ্যাপন করেন, তখন পরিভাষা নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গটির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

'তাপসবৎসরাজ', 'নলবিলাস' ও 'রাঘবাভ্যুদয়' – এই তিনটি রূপক থেকে নাট্যদর্পণে পরিভাষার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আমরা নলবিলাসের উদাহরণটি উল্লেখ করছি –

দময়ন্তীং প্রতি নলঃ –

" ন প্রেম নিহিতং চিত্তে ন চাচারঃ সতাং স্মৃতঃ।
ত্যজতাং ত্বাং বনে দেবি ! ময়া দারুণমাহিতম্ ॥"

– উল্লিখিত অংশে নিষধরাজ নল দময়ন্তীকে বনে পরিত্যাগরূপ স্বকৃত অপরাধের স্বীকারোক্তি করছেন। অতএব এটি পরিভাষা নামক সন্ধ্যঙ্গের যথার্থ উদাহরণ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এবং সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশে অপমানসূচক বাক্যের উল্লেখকে পরিভাষণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'পরিবাদকৃতং যৎ স্যাত্তদাহুঃ পরিভাষণম্'(না.শা. ১৯/৯৯)। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় এই সন্ধ্যঙ্গের যে উদাহরণটি দিয়েছেন, 'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক থেকে গৃহীত সেই অংশে কিন্তু নাটকীয় পাত্র-পাত্রীরা কেউ কাউকে অপমান করছেন না। বরং এই অংশে সাগরিকা ও রত্নাবলী পরস্পরের কাছে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন।

পরভাবী সাহিত্যদর্পণকার-ও নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে নিন্দাযুক্ত বাক্যকে পরিভাষণ বলেছেন – ‘বদন্তি পরিভাষণং পরিবাদকৃতং বাক্যম্’(সা.দ. ৬/১১১)।

নাট্যদর্পণে পরিভাষার অপর একটি লক্ষণের কথা-ও বলা হয়েছে – ‘পরিভাষা মিথো জল্পঃ।’[৯৬] রূপকের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক মীমাংসাসূচক জল্পনা অর্থাৎ বাক্যালাপের নাম পরিভাষা – এই হল লক্ষণটির তাৎপর্য। উল্লেখ্য, এই অভিমতটি একান্তভাবে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। উদাহরণটি অবশ্য দশরূপক থেকে গৃহীত নয়। পরিভাষার নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণের যে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, বলা হচ্ছে, এই লক্ষণের-ও উদাহরণরূপে সেগুলি-ই গৃহীত হতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, রূপ গোস্বামী-নির্ণীত পরিভাষালক্ষণটি এই দুটি লক্ষণের সংমিশ্রণে নির্মিত – ‘পরিভাষা মিথো জল্পঃ পরিবাদদ্যোতকং ভবেৎ’ (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ২৯২)।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, দর্শক বা পাঠকচিত্তের অনুরঞ্জনহেতু নির্বহণসন্ধিতে এই অঙ্গটির প্রয়োগ অবশ্য-ই করতে হবে – ‘এতদঙ্গং রঞ্জকত্বাদত্রাবশ্যং নিবন্ধনীয়ম্।’ [৯৭] এই রঞ্জকত্বের হেতুরূপে তিনটি কারণ উপন্যস্ত করা যেতে পারে–

প্রথমতঃ – এই অঙ্গটি রূপকের সমাপ্তির সূচক,

দ্বিতীয়তঃ – সংস্কৃত রূপক যে সর্বদা মিলনান্তক হবে, এটি তার দ্যোতক এবং

তৃতীয়তঃ – কেবলমাত্র মুখ্যফলের প্রাপ্তিতে-ই নাটকীয় কার্যের সমাপ্তি যেন নাট্যকারের অভিপ্রেত নয়; নাটকীয় সকল পাত্রের মানসিক মিলনের শান্তিতে-ই তাঁর অভীষ্ট কার্যের সমাপন। তাই রূপকের অন্তিম অংশে পাত্র-পাত্রীরা নিজ-নিজ অপরাধ স্বীকার করে পাপস্খালন করছেন– এখানে-ই পরিভাষা নামক সন্ধ্যঙ্গটির বিশেষত্ব।

৬.উপাস্তি – ‘সেবোপাস্তিঃ’ (না.দ. ১/৬৩) –উপাস্তি অর্থাৎ উপাসনা। নাটকীয় পাত্রপাত্রীর দ্বারা যখন নায়ক-নায়িকা বা অপর কোনো মাননীয় ব্যক্তির পরিচর্যা বর্ণিত হয়, তখন উপাস্তি নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। পরিচর্যার দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের প্রসন্নতাবিধানের নাম সেবা। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – ‘সেবা পরপ্রসত্তিহেতুর্ব্যাপারঃ।’[৯৮] এই সেবার প্রয়াস বর্ণিত হয় উপাস্তি নামক সন্ধ্যঙ্গে।

উপাস্তির উদাহরণরূপে ‘বেণীসংহার’ এবং ‘রঘুবিলাস’ নামক রূপকদুটি থেকে দুটি অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা এখানে প্রথমটির আলোচনা করছি–

ভীমঃ (দ্রৌপদীমুদ্দিশ্য) –‘‘দেবি! পাঞ্চালরাজতনয়ে! দিষ্ট্যা বর্ধসে রিপুকুলক্ষয়েণ।’’

–'বেণীসংহার' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ভীমসেনের এই উক্তির মাধ্যমে পাঞ্চালরাজনন্দিনী দ্রৌপদীর প্রসন্নতাবিধানের কারণে ,এটি উপাস্তি নামক সন্ধ্যঙ্গের যথার্থ উদাহরণ।

নাট্যদর্পণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল গ্রন্থে এই সন্ধ্যঙ্গটি 'প্রসাদ' নামে অভিহিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শুশ্রূষাদিব্যাপারযুক্ত প্রিয়বিষয়ের দ্বারা প্রসন্নতাবিধানের নাম প্রসাদ– 'শুশ্রূষাদ্যুপসম্পন্নঃ প্রসাদঃ প্রতিরুচ্যতে' (না.শা. ১৯/১০১)। সাগরনন্দীর মতে-ও – 'শুশ্রূষাদ্যুপপন্নার্থঃ প্রসাদঃ'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)। সাহিত্যদর্পণে-ও প্রসাদ বলতে শুশ্রূষাকে-ই বোঝানো হয়েছে– 'শুশ্রূষাদিঃ প্রসাদঃ স্যাৎ' (সা.দ. ৬/১১২)। পরভাবী রূপ গোস্বামী-ও তাঁর 'নাটকচন্দ্রিকা' গ্রন্থে প্রসাদের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করেছেন।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, কোনো-কোনো পূর্বাচার্য প্রিয়ব্যক্তির হিতকর কার্যের আচরণের দ্বারা উৎপন্ন প্রীতিকে প্রসাদ নামে অভিহিত করেছেন। সম্ভবতঃ দশরূপককার ধনঞ্জয়ের অভিমতটি এখানে উল্লিখিত হয়েছে। এর উদাহরণরূপে 'তাপসবৎসরাজ' রূপকের রুমন্বান্ ও যৌগন্ধরায়ণের প্রতি রাজা উদয়নের "শ্লাঘ্যা ধীর্ধিষণস্য...." ইত্যাদি উক্তিটি গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত অংশে রাজা উদয়ন কর্তৃক মন্ত্রীদ্বয়ের আনুগত্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রীতিপূর্ণ প্রশংসার কারণে এটি প্রসাদের উদাহরণ।

৭.কৃতি – এই সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বহুপ্রকার মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আমরা প্রথমে নাট্যদর্পণ গ্রন্থের লক্ষণটি দিয়ে-ই শুরু করছি। তত্রোক্ত কৃতিলক্ষণটি এরূপ–'কৃতিঃ ক্ষেমম্' (না.দ.১/৬৪)। অর্থ স্পষ্ট। লব্ধ বস্তুর যথাযথ পরিপালনের প্রসঙ্গ আসে যে সন্ধ্যঙ্গে , তার নাম কৃতি।লভ্য বস্তু হল রূপকের মুখ্যফল; সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে-ই যা নায়কের নায়িকাপ্রাপ্তি; সেই অভীষ্ট ফল লাভের পর তাকে সুষ্ঠু পরিপালনের প্রসঙ্গে এই সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এর উদাহরণস্বরূপ 'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি উল্লিখিত হয়েছে–
বাসবদত্তা–"অজ্জউত্ত! দূরে সে ণাদিউলং। তা তধা করেসি, জধা বংধুঅণং ন সুমরেদি।"
–উল্লিখিত অংশে বাসবদত্তা কর্তৃক রত্নাবলীরূপ অভীষ্ট ও লব্ধফলের পরিপালনের কথা বলা হচ্ছে; অতএব এটির কৃতির যথার্থ উদাহরণ।

কোনো-কোনো পূর্বাচার্য এই সন্ধ্যঙ্গটিকে কৃতির পরিবর্তে 'দ্যুতি' নামে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতানুসারে, প্রাপ্ত বস্তুর প্রতিকূলতা প্রশমনের নাম দ্যুতি। রূপকে প্রাপ্ত বস্তু যে সর্বদা স্বেচ্ছায় লব্ধ হয়, তা নয়; এমতাবস্থায় প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাতিকূল্য উপশমের নাম-ই দ্যুতি। টীকায় বলা হচ্ছে –

'অন্যে পুনরস্য স্থানে প্রাপ্তস্য প্রাতিকূল্যশমনং দ্যুতিমাহুঃ।' [৯৯] এর উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে 'মুদ্রারাক্ষস'-এর সপ্তম অঙ্ক থেকে–

চাণক্যঃ –"অমাত্য রাক্ষস! অধীষ্যতে চন্দনদাসস্য জীবিতম্?

রাক্ষসঃ– ভো বিষ্ণুগুপ্ত! কুতঃ সন্দেহঃ?

চাণক্যঃ – অগৃহীতশস্ত্রেণ ভবতা নানুগৃহ্যতে বৃষলঃ ইত্যতঃ সন্দেহঃ। তদ্ যদি সত্যমেব চন্দনদাসস্য জীবিতমিষ্যতে, গৃহ্যতামিদং শস্ত্রম্ ।

রাক্ষসঃ – বিষ্ণুগুপ্ত ! মা মৈবমযোগ্যা বয়মস্য ,বিশেষতস্ত্বয়া গৃহীতস্য গ্রহণে।

পুনর্বাহূ প্রশস্য রাক্ষসং চাণক্য আহ – কিমনেন? ভবতঃ শস্ত্রগ্রহণমন্তরেণ ন চন্দনদাসস্য জীবিতমস্তি।

রাক্ষসঃ – নমঃ সর্বকার্যপ্রতিপত্তিহেতবে সুহৃৎস্নেহায়। কা গতিরেষ গৃহ্ণামি।"

–রাক্ষস চাণক্যের হাতে ধরা পড়লে-ও, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদে বৃত হতে তিনি অস্বীকার করছেন । এমতাবস্থায় রাক্ষসের মিত্র চন্দনদাসের প্রাণহানির ভয় দেখিয়ে চাণক্য তাঁকে মন্ত্রিত্বগ্রহণে বাধ্য করছেন।রাক্ষস ধৃত হওয়ার পর-ও, তাঁর বিরোধিতা প্রশমনের প্রয়াসের কারণে এটি দ্যুতির উদাহরণ।

আবার কোনো-কোনো আচার্য চিত্তে উদ্রিক্ত ক্রোধাদির প্রশমনকে দ্যুতি নামে অভিহিত করেছেন। এর দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে–একটি 'বেণীসংহার' থেকে, অপরটি 'রত্নাবলী' থেকে। আমরা এখানে প্রথমটির আলোচনা করছি–

ভীমসেনঃ – "রাজপুত্রি! অলং মামেবমবলোক্য ত্রাসেন।

কৃষ্টা যেনাসি রাজ্ঞাং সদসি নৃপশুনা তেন দুঃশাসনেন

স্ত্যানান্যেতানি তস্য স্পৃশ মম করয়োঃ পীতশেষাণ্যসৃঞ্জি।

কান্তে! রাজ্ঞঃ কুরূণামতিসরসমিদং মদ্গদাচূর্ণিতোরো-

রঙ্গে2ঙ্গেসৃগ্ নিষিক্তং তব পরিভবজস্যানলস্যাস্তু শান্ত্যৈ ॥"

– 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে উদ্ধৃত এই অংশে দুঃশাসনের রুধিরপানের পর ভীমসেনের হৃদয়ে উদ্রিক্ত প্রবল ক্রোধের প্রশমনের কারণে এটি দ্যুতির উদাহরণ।

এই অভিমতটি সম্ভবতঃ আচার্য অভিনবগুপ্তের। তাঁর টীকায় এই সন্ধ্যঙ্গের ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন– 'সামর্থ্যাৎ প্রশমনীয়স্য ক্রোধাদেরর্থস্য প্রাপ্তস্যাপি যৎ প্রশমনং সা দ্যুতিঃ'(না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। অর্থ স্পষ্ট । চিত্তে জাগ্রত ক্রোধের প্রশমনের নাম দ্যুতি। এই প্রসঙ্গে নাট্যদর্পণে উল্লিখিত 'রত্নাবলী' থেকে উপন্যস্ত দ্যুতির দ্বিতীয় উদাহরণটি-ও অভিনবভারতী থেকে গৃহীত । আচার্য

সাগরনন্দীর মতে-ও, ঈর্ষ্যা, ক্লেশ, দুঃখাদির উপশমের নাম দ্যুতি –'ঈর্ষ্যাক্লেশোপগমনং দ্যুতিঃ'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, লব্ধ অর্থের উপশম-ই কৃতি। অভীষ্ট অর্থের প্রাপ্তিতে দুঃখাদির অবসান ঘটে। এই দুঃখের উপশমের নাম-ই কৃতি– 'লব্ধস্যার্থস্য শমনং দ্যুতিমাচক্ষতে পুনঃ' (না.শা. ১৯/১০০)। পরভাবী দশরূপককার ও দর্পণকার দ্যুতির পরিবর্তে 'কৃতি' পদটির ব্যবহার করলে-ও, এর লক্ষণনির্ণয়াবসরে তাঁরা মহর্ষি ভরতকে-ই অনুসরণ করেছেন।

৮. আনন্দ – আনন্দ নামক সন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল– 'আনন্দো বাঞ্ছিতাগমঃ'(না.দ.১/৬৪) –বৃত্তি অনুসারে অর্থ হল, শতপ্রকার প্রয়াসের পর বাঞ্ছিত বস্তু বা ব্যক্তির প্রাপ্তিজনিত আনন্দাগমে আনন্দ নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ ঘটে। নাটকের ঈপ্সিত বস্তু হল মুখ্যফল। নানাপ্রকার প্রচেষ্টার পর মুখ্যফললাভজনিত প্রশান্তির নাম-ই আনন্দ।

'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক থেকে আনন্দর উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে–

বাসবদত্তা (রাজানমুপেত্য)–"অজ্জউত্ত! পডিচ্ছ এদং।

রাজা (হস্তৌপ্রসার্য)– কো দেব্যাঃ প্রসাদং ন বহুমন্যতে ?

বিদূষকঃ –হী হী ! ভো! জয়দু ভবং । ণং পুহবী ইদাণিং হত্থে ভূদ য্যেব পিয়বয়স্সস্স।"

–উল্লিখিত অংশে বাসবদত্তার সম্মতি পাওয়ার পর নায়ক উদয়নের সঙ্গে তাঁর ঈপ্সিত ব্যক্তি রত্নাবলীর মিলন ও তজ্জনিত আনন্দের ফলে এখানে আনন্দ নামক সন্ধ্যঙ্গ স্পষ্ট।

নাট্যশাস্ত্রে-ও ঈপ্সিতলাভজনিত আনন্দকে আনন্দ নামক সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণরূপে নির্ণয় করা হয়েছে– 'সমাগমস্তথার্থানামানন্দঃ পরিকীর্তিতঃ'(না.শা. ১৯/১০০)। প্রার্থিত বিষয়ের যে প্রাপ্তিতে পুনর্বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না, তাদৃশ প্রাপ্তিকে অভিনবগুপ্তাচার্য আনন্দ নামে অভিহিত করেছেন–'.... সম্যগপুনর্বিয়োগবদ্যদাগমনং তদানন্তহেতুত্বাদানন্দঃ'(না.শা.ঊনবিংশ অধ্যায়)। পরভাবী ধনঞ্জয়, সাগরনন্দী, বিশ্বনাথ কবিরাজ, রূপ গোস্বামী প্রমুখ সকলের মতে, বাঞ্ছিত বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ বা মিলনকে আনন্দ বলা হয়।

৯.সময় – 'সময়ো দুঃখনির্বাসঃ' (না.দ.১/৬৪)– এই হল সময় নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণ। নায়কাদির সাফল্যের পথে ক্রমে-ক্রমে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। এইভাবে সকল বাধাবিঘ্নের তথা দুঃখের অবসানে সময় নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়।টীকায় বলা হচ্ছে–'দুঃখনির্গমযুক্তঃ কালঃ সময়ঃ' ।[১০০]

'মৃচ্ছকটিকম্' প্রকরণের দশম অঙ্ক থেকে সময়ের উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে –

শর্বিলকঃ (চারুদত্তং প্রতি)–''অপযাত অপযাত জাল্মাঃ! (দৃষ্ট্বা সহর্ষম্) ধ্রিয়তে চারুদত্তঃ সহ বসন্ত সেনয়া! সম্পূর্ণাঃ খল্বস্মৎ স্বামিনো মনোরথাঃ।

দিষ্ট্যা ভো! ব্যসনমহার্ণবাদগাধাদ্

উত্তীর্ণ গুণবৃত্ত্যা সুশীলবত্যা।

ত্বামেব প্রিয়তময়া যুতং সমীক্ষে

জ্যোৎস্নাট্যং শশিনমিবোপরাগমুক্তম্ ॥''

– পালকের আদেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চারুদত্তকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হল, সেই মুহূর্তে রাজা আর্যক কর্তৃক রাজ্যার্ধপ্রাপ্তির নির্দেশ এসে উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় উক্ত এই শ্লোকে চারুদত্তের দুঃখের অবসান সূচিত হওয়ায়, এটি সময় নামক সন্ধ্যঙ্গের যথাযথ উদাহরণ ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও এক-ইভাবে সময়ের লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে –'দুঃখস্যাপগমো যস্তু সময়ঃ স নিগদ্যতে' (না.শা.১৯/১০১) । পরভাবী দশরূপককার, দর্পণকার, নাটকচন্দ্রিকাকার প্রমুখ সকলে-ই নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে দুঃখপ্রশমনের কালকে সময় নামে অভিহিত করেছেন। কেবলমাত্র সাগরনন্দী তাঁর গ্রন্থে বিরোধের উপশমকে সময় নামে অভিহিত করেছেন– 'বিরোধপ্রশমনং সময়ঃ' (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)।

১০.পরিগূহণ – 'অদ্ভুতাপ্তিঃ পরিগূহনম্' (না.দ. ১/৬৪)– এই হল পরিগূহণ নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গটির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। রূপকে অদ্ভুত কোনো বস্তুর প্রাপ্তি বা অদ্ভুত কোনো ঘটনার সমাবেশে পরিগূহণ নামক সন্ধ্যঙ্গটির প্রয়োগ ঘটে। অন্যভাবে বলা যায়, বিস্ময় নামক স্থায়িভাবাত্মক অদ্ভুত নামক রসের উদ্রেকে পরিগূহণের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

নাট্যদর্পণে তিনটি রূপক থেকে পরিগূহণের উদাহরণ উদ্ধার করা হয়েছে –'রামাভ্যুদয়', 'রঘুবিলাস' এবং 'পুষ্পদূষিতক'। আমরা এখানে প্রথম উদাহরণটি আলোচনা করছি–

শ্রীরামের আদেশের সীতা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করেছেন। তারপর– (নেপথ্যে কলকলঃ) –

''ধূমব্রাতং বিতানীকৃতমুপরি শিখাদোভিরভ্রংলিহাগ্রৈঃ

বিভ্রদ্ ভ্রাজিষ্ণু রত্নং ততমুরসি তথা চর্ম চামূরাং চ।

ভূয়স্তেজঃ প্রতানৈর্বিরহমলিনতাং ক্ষালয়ন্নঙ্কভাজঃ

দেব্যাঃ সপ্তার্চিরাবির্ভবতি বিফলয়ন্ বাঞ্ছিতান্যন্তকস্য ॥

(ততঃ প্রবিশতি পটাক্ষেপেণ সীতামাদায় বহ্নিঃ)

সর্বে দৃষ্ট্বা সসম্ভ্রমমুত্থায়– আশ্চর্যমাশ্চর্যম্ ! নমো ভগবতে হুতাশনায় ইতি প্রণমন্তি।''

–উল্লিখিত অংশে বহ্নিগতা সীতাকে স্বয়ং অগ্নিদেব অক্ষতদেহে বাইরে নিয়ে আসছেন– এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার বর্ণনার কারণে এটি পরিগূহণের যথার্থ উদাহরণ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'পুষ্পদূষিতক' থেকে গৃহীত পরিগূহণের তৃতীয় উদাহরণটিতে নাট্যদর্পণকারদ্বয় কেবলমাত্র এই সন্ধ্যঙ্গটির-ই নয়, বরং নির্বহণসন্ধির মোট নয়টি অঙ্গের একত্র সমাবেশের উদাহরণ দিয়েছেন।

নাট্যদর্পণ ব্যতীত অপরাপর প্রায় সমস্ত গ্রন্থে এই অঙ্গটি 'উপগূহণ' নামে আলোচিত । নাট্যশাস্ত্রে এর লক্ষণহল – 'অদ্ভুতস্য তু সম্প্রাপ্তিরুপ গূহণমিষ্যতে'(না.শা. ১৯/১০২)– অর্থাৎ অদ্ভুত রসের উদ্রেকে উপগূহণের প্রয়োগ ঘটে থাকে। পরভাবী দশরূপককার, দর্পণকার, নাটকলক্ষণরত্নকোশরচয়িতা প্রমুখ সকলে-ই এই অঙ্গটির লক্ষণনির্ণয়ে নাট্যশাস্ত্রকারকে-ই অনুসরণ করেছেন; তাঁদের মতগুলি তাই পৃথক উল্লেখের অবকাশ রাখে না।

১১.ভাষণ – 'ভাষণ' নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গটির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল –'ভাষণং সামদানোক্তিঃ'(না.দ.১/৬৫)। 'সাম' অর্থাৎ মিষ্টবচন, 'দান' অর্থাৎ বিবিধ মূল্যবান বস্তু পারিতোষিকরূপে প্রদান – এই দুই প্রকার বিষয় বর্ণিত হয় যে সন্ধ্যঙ্গে, তার নাম ভাষণ। রূপকের অন্তিম অংশে যখন পাত্রপাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রিয় ও হিতকর বাক্যপ্রয়োগ এবং অর্থদানাদি সম্পাদন করা হয়, তখন ভাষণ নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়।

নাট্যদর্পণে 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর দশম অঙ্ক থেকে ভাষণের উদাহরণটি গৃহীত হয়েছে–

আর্যকরাজাজ্ঞয়া শার্বলিকশ্চারুদত্তমাহ –

"ত্বদ্‌যানং সমারুহ্য গতস্তে শরণং পুরা।

পশুবদ্ বিততে যজ্ঞে হতস্তেনাদ্য পালকঃ ॥

চারুদত্তঃ – শার্বলিক! কিং যো2সৌ রাজ্ঞা পালকেন ঘোষাদানীয় নিষ্কারণং কূটাগারে বন্ধনেন বদ্ধ আর্যকনামা ত্বয়া মোচিতঃ?

শার্বলিকঃ – সত্যম্। সিংহাসনাধিরোহে অনুষ্ঠিতমাত্রে চ তেন তব সুহৃদা রাজ্ঞা আর্যকেণোজ্জয়িন্যাং চ বেণাতটে তুভ্যং রাজ্যমতিসৃষ্টম্।তৎ প্রতিমান্যতাং প্রথমঃ সুহৃৎপ্রণয়ঃ। (পুনর্বসন্তসেনামাহ)–আর্যে বসন্তসেনে! রাজা তবোপরি তুষ্টো ভবতীং বধূশব্দেনানুগৃহ্নাতি।

বসন্তসেনা – অজ্জ সব্বলিয়! কয়ত্থ ম্হি ?(পুনশ্চারুদত্তমাহ)–আর্য! কিমস্য ভিক্ষোঃ ক্রিয়তাম্?

চারুদত্তঃ – ভিক্ষো! কিং তব বহুমতম্?

ভিক্ষুঃ – অণিচ্চত্তনং পেকিখ্য পব্বজ্জা – বহুমাণে সংবুত্তে।

চারুদত্তঃ – সখে! দৃঢ়ো2স্য নিশ্চয়ঃ, তৎ পৃথিব্যাং সর্ববিহারেষু কুলপতিঃ ক্রিয়তাম্ ।

শার্বলিকঃ – এবমেতৎ।

চারুদত্তঃ – প্রিয়ং নঃ।

বসন্তসেনা– সংপদং জীবিদ ম্হি ।

শার্বলিকঃ – স্থাবরকস্য কিং ক্রিয়তাম্?

চারুদত্তঃ – সুভৃত্যো2য়মদাসো2স্তু।

শার্বলিকঃ– এবং যথাহার্যঃ।

– উল্লিখিত সংলাপের মধ্যে চারুদত্তের বন্ধনমুক্তি, রাজা আর্যক কর্তৃক বেণানদীর তীরে তাঁকে রাজ্যপ্রদান, বসন্তসেনার বধূপদলাভ, জনৈক ভিক্ষুর বৌদ্ধবিহারসমূহের কুলপতিপদলাভ, স্থাবরক নামক ভৃত্যের দাসত্বমুক্তি – ইত্যাদি বিবিধ প্রকার হিতকার্যের অনুষ্ঠানের কারণে এটি ভাষণ নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের যথার্থ উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও সামদানাদির লাভকে ভাষণ নামে অভিহিত করা হয়েছে –'সামদানাদিসম্পন্নং ভাষণং সমুদাহৃতম্'(না.শা.১৯/১০২)। দর্পণকার-ও এবিষয়ে এক-ই মত পোষণ করেছেন। সাগরনন্দী শিষ্টবাক্যপ্রয়োগকে ভাষণ নাম অভিহিত করেছেন– 'সামবাদাদিসম্পন্নং ভাষণম্'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)। আবার দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতে, নায়কাদির মান, সমৃদ্ধি, অর্থ , কাম ইত্যাদির প্রাপ্তিকে ভাষণ বলা হয়– 'মানাদ্যাপ্তিশ্চ ভাষণম্' (দশ.রূ. ১/৫৩)। নাটকচন্দ্রিকাকার রূপ গোস্বামী-ও এ বিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

ভাষণের আলোচনার শেষে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে, এই অঙ্গটি রূপকে অবশ্যযোজনীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গর্ভসন্ধির 'সংগ্রহ' নামক অঙ্গটি-ও অনুরূপ লক্ষণান্বিত। কিন্তু সংগ্রহের প্রয়োগ সত্ত্বে-ও, ভাষণ নামক এই সন্ধ্যঙ্গটির প্রয়োগ অবশ্য-ই করতে হবে। উল্লেখ্য , অভিনবভারতীতে আমরা এই মতটির উল্লেখ পাই– 'যদ্যপি তদার্থে2পি সংগ্রহাখ্যমিদমঙ্গমুক্তং তথাপ্যত্র স্থানে2বশ্যং প্রযোক্তব্যতা খ্যাপয়িতুং পুনরুৎপাদনং শব্দান্তরেণ চ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

১২.পূর্বভাব – পূর্বভাব নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল– 'প্রাগ্‌ভাবঃ কৃত্যদর্শনম্' (না.দ. ১/৬৫)। অভীষ্ট কার্য পূর্বে দৃষ্ট বা সম্পাদিত হলে পূর্বভাব নামক সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগাবসর ঘটে। নাটকীয় কার্যের সম্পাদন অর্থাৎ নাটকীয় ফলের প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হবার নিশ্চিত কোনো সূচনা পাওয়া যায় পূর্বভাব নামক এই সন্ধ্যঙ্গটির মধ্যে।

পূর্বভাবের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'রত্নাবলী' ও 'যাদবাভ্যুদয়' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা রত্নাবলীর উদাহরণটি-ই এখানে আলোচনা করছি–

যৌগন্ধরায়ণঃ – "এবং বিজ্ঞায় ভগিন্যাং সম্প্রতি করণীয়ে দেবী প্রমাণম্ ।

বাসবদত্তা – ফুডং জ্জেব কিন্ন ভণাসি পড়িবাহেদি সে রয়ণমালং তি।"

–'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্কে যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তার এই কথোপকথনের দ্বারা একথা-ই সূচিত হয়েছে যে, রাজা উদয়নের হস্তে রত্নাবলীকে সমর্পিত করা হোক্। যৌগন্ধরায়ণের অভিপ্রায়রূপ এই নাটকীয় কার্য সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে-ই বাসবদত্তার তির্যক উক্তিতে তার নিশ্চিত সম্পাদনের ইঙ্গিত থাকার কারণে এটি পূর্বভাব নামক সন্ধ্যঙ্গের যথার্থ উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে পূর্বভাবের অপর একটি লক্ষণের কথা-ও বলা হয়েছে। তদনুসারে, মুখসন্ধ্যাদি পূর্বতন সন্ধিতে উক্ত বাক্যসমূহের পুনরুক্তির নাম পূর্বভাব। এই আচার্যগণ পূর্বভাবের পরিবর্তে 'পূর্ববাক্য' পদটির ব্যবহার করেছেন। এঁদের মতে, মুখসন্ধিতে উপ্ত নাটকের মুখ্য ফল অর্থাৎ বীজ, রূপকের অন্তিমে যার পরিণতি নিকটবর্তী, পুনর্বার উচ্চারণের মাধ্যমে পাঠক ও দর্শকবৃন্দকে তা মনে করিয়ে দেওয়া এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে সেই নাট্যবীজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত দেওয়া হয় পূর্ববাক্য নামক এই সন্ধ্যঙ্গটির দ্বারা।

পূর্ববাক্যর উদাহরণরূপে 'মুদ্রারাক্ষস'-এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে – চাণক্যঃ –(পুরুষং প্রতি)"ইদং চ বক্তব্যো বিজয়ো দুর্গপালঃ।অমাত্যরাক্ষসদর্শনপ্রীতো দেবচন্দ্রগুপ্তঃ সমাজ্ঞাপয়তি– 'বিনা হস্তিভ্যঃ ক্রিয়তাং সর্ববন্ধনমোক্ষঃ' ইতি অথবা অমাত্যরাক্ষসে নেতরি কিং হস্তি ভিঃ প্রয়োজনম্?

বিনাবাহনপোতাভ্যাং মুচ্যতাং সর্ববন্ধনম্ ।

পূর্ণপ্রতিজ্ঞেন ময়া কেবলং বধ্যতে শিখা ॥"

–বিপক্ষের অমাত্য রাক্ষসকে স্বপক্ষে এনে, চন্দ্রগুপ্তের বিজয় সুনিশ্চিত করে, নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন মহামতি চাণক্য। স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে এবার তিনি তাঁর মুক্ত শিখা বন্ধন করবেন। 'মুদ্রারাক্ষস'-এর প্রথম অঙ্কে প্রশ্নচ্ছলে উচ্চারিত তাঁর প্রতিজ্ঞাবাক্য– 'বধ্যঃ কো নেচ্ছতি শিখাং মে' এই অন্তিম অংশে পুনরুচ্চারিত (এবং সম্পন্ন) হওয়ায়, এটি পূর্ববাক্যের যথাযথ উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে এই মতবাদের প্রবক্তা আচার্যর নামোল্লেখ করা না হলে-ও, লক্ষণদৃষ্টে স্পষ্ট-ই প্রতীত হয়, এই অভিমত মহর্ষি ভরতের । তিনি-ও এই সন্ধ্যঙ্গটিকে পূর্ববাক্য নামে অভিহিত করেছেন এবং তৎসম্মত পূর্ববাক্যলক্ষণটি হল– 'পূর্ববাক্যং তু বিজ্ঞেয়ং যথোক্তার্থপ্রদর্শনম্' (না.শা. ১৯/১০৩)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও বীজাদিতে উপ্ত ঘটনার পুনরুচ্চারণকে পূর্ববাক্য বলা হয়েছে –'বীজোদ্ঘাটনং পূর্ববাক্যম্'(না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়)। দশরূপককার ধনঞ্জয় আবার প্রার্থিত কার্যের

পূর্বে সম্পাদনকে-ই পূর্বভাব নামে অভিহিত করেছেন।দর্পণকার এই সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণনির্ণয়ে নাট্যশাস্ত্রকারের মতটি অবিকল উল্লেখ করেছেন।

নাট্যদর্পণে এই সন্ধ্যঙ্গের 'পূর্বভাব' নামটি গৃহীত হলে-ও লক্ষণনির্ণায়ক কারিকায় এই অঙ্গটিকে 'প্রাগ্‌ভাব' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থকারদ্বয় বলে দিচ্ছেন, কেবলমাত্র ছন্দোসাম্যের কারণে-ই এই বৈষম্য –'উদ্দেশেনোক্তসংজ্ঞাতঃ সংজ্ঞান্তরেণ যল্লক্ষণবিধানং সর্বত্র তৎ ছন্দানুরোধাদিতি'।[১০১]

১৩.কাব্যসংহার – কাব্যসংহারের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল–'বরেচ্ছা কাব্যসংহারঃ'(না.দ. ১/৬৫)– অর্থাৎ ঈপ্সিত বরপ্রদানের ইচ্ছার নাম কাব্যসংহার। প্রায় সকল সংস্কৃত নাটকের অন্তিমে 'ভূয়ঃ কিং তে প্রিয়মুপকরোমি?' অর্থাৎ 'আমি তোমার আর কি উপকার(বা প্রিয়কার্য) সাধন করতে পারি?'–এরূপ একটি বাক্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ –'বেণীসংহার'-এ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি– 'কিমস্মাৎ পরং সমীহিতং সম্পাদয়ামি?' অথবা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ মারীচের উক্তি– 'বৎস! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি?' অথবা 'রত্নাবলী'-তে যৌগন্ধরায়ণের উক্তি – 'তদুচ্যতাং কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি?' –ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।। এইসকল ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কোনো দেবতা অথবা অতুল ক্ষমতাশালী কোনো মনুষ্য ব্যক্তিবিশেষকে বরপ্রদান করতে চাইছেন। এই জাতীয় বাক্যের প্রয়োগ হয় নির্বহণসন্ধির যে অঙ্গে, তার-ই নাম কাব্যসংহার। নাটকীয় ফলের প্রাপ্তিতে,যাবতীয় ঈপ্সিতলাভের দ্বারা কাব্যের শুভ সমাপ্তির কারণে-ই এই অঙ্গটির নাম কাব্যসংহার।ব্যাখ্যায় তাই বলা হয়েছে –'..........সর্বস্মিন্নেবেপ্সিতে সম্পন্নে প্রস্তুতং কাব্যমেব সংহ্রিয়ত ইতি কাব্যসংহারঃ।'[১০২]

কাব্যসংহারের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'কৃত্যারাবণ', 'যাদবাভ্যুদয়' ও 'ইন্দুলেখা'– এই তিনটি রূপক থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে প্রথমটি আলোচনা করছি–

সীতারক্ষণে রামস্য প্রিয়ে হিতে চ মহতি কর্মণি কৃতে2স্য সন্তুষ্যন্নগ্নিরাহ –''বৎস! উচ্যতাং কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মনুকরোমি?

রামঃ – ভগবন্ততঃ পরমপি প্রিয়মস্তি ?''

–উল্লিখিত অংশে অগ্নিদেবের শ্রীরামচন্দ্রকে বরপ্রদানের ইচ্ছার কারণে এটি কাব্যসংহারের উদাহরণ।

কাব্যসংহারের লক্ষণবিষয়ে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা সকলে-ই সহমত। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে – 'বরপ্রদানসম্প্রাপ্তিঃ কাব্যসংহার ইষ্যতে'(না.শা. ১৯/১০৩)। দশরূপককার-ও বলেছেন– 'বরাপ্তিঃ কাব্যসংহারঃ' (দশ.রূ.১/৫৪)। সাগরনন্দী ও বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁদের গ্রন্থে এই সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণরূপে নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাটি অবিকল উদ্ধৃত করেছেন। রূপ গোস্বামী এই সন্ধ্যঙ্গটিকে 'উপসংহার' নামে

অভিহিত করেছেন। তাঁর গ্রন্থে নির্ণীত লক্ষণটি হল – ‘কৃতার্থোপসংহারঃ সর্বাভীষ্টোপলব্ধিতঃ’ (না.চ. শ্লোকসংখ্যা–৩২৯)।

১৪.প্রশস্তি –‘প্রশস্তিঃ শুভশংসনা’ (না.দ. ১/৬৫)– এই হল প্রশস্তি নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। রূপকের শেষে প্রধান নাটকীয় পাত্র অর্থাৎ নায়ক অথবা ক্ষেত্রান্তরে অপর কোনো নাটকীয় পাত্রের দ্বারা শুভ কামনা বা কল্যাণ আশংসা করা হয়ে থাকে; একে-ই প্রশস্তি নামে অভিহিত করা হয়। প্রশস্তি হল রূপকের অন্তিম অঙ্গ। এই অঙ্গটিকে নির্বহণসন্ধিতে অবশ্য-ই সন্নিবিষ্ট করতে হবে। এই প্রশস্তিকে সাধারণ ভাবে ‘ভরতবাক্য’ বলে উল্লেখ করা হলে-ও, নাট্যশাস্ত্র অথবা নাট্যতত্ত্ববিষয়ক পরবর্তী কোনো গ্রন্থে এই ‘ভরতবাক্য’ কথাটি পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ রূপকের পরিসমাপ্তিতে নট বা ভরতের উক্তিরূপে সন্নিবিষ্ট হওয়ার কারণে এই প্রশস্তির নাম দেওয়া হয়েছে ভরতবাক্য।

নাট্যদর্পণে ‘কৃত্যারাবণ’ ও ‘যাদবাভ্যুদয়’– এই দুটি রূপক থেকে প্রশস্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে প্রথমটির আলোচনা করছি–

রামঃ –“ তথাপীদমস্তু–

যথায়ং মম সম্পূর্ণঃ চিন্তিতার্থো মনোরথঃ।

এবমভ্যাগতো রঙ্গঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতাম্ ॥

অপিচ

নিরীতয়ঃ প্রজাঃ সন্তু সন্তঃ সন্তু চিরায়ুষঃ।

প্রথন্তাং কবয়ঃ কাব্যৈঃ সম্যগ্ নন্দন্তু মাতরঃ ॥”

–উল্লিখিত অংশে জগতে সকলের মনোরথ পূরণ, সকলের পাপমুক্তি, সকলের আরোগ্য, সকল কবির সৎকাব্য রচনার সাফল্য ইত্যাদি সার্বিক কল্যাণকামনার কারণে এটি প্রশস্তি নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, নৃপ, দেশ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কল্যাণকামনা করে রূপকের সমাপ্তি ঘটানো হয়; এই সমাপ্তিবাক্যের নাম-ই প্রশস্তি। নাট্যশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে – ‘নৃপদেশপ্রশান্তিশ্চ প্রশস্তি রভিধীয়তে’ (না.শা. ১৯/১০৪)। দশরূপকে অবশ্য সাধারণভাবে হিতকামনাকে প্রশস্তি বলা হয়েছে– ‘প্রশস্তিঃ শুভশংসনম্’ (দশ.রূ. ১/৫৪)। পরভাবী রূপ গোস্বামী কর্তৃক নির্ণীত প্রশস্তিলক্ষণটির অর্থ-ও এক-ই – ‘মঙ্গলশংসনং সম্যক্ প্রশস্তিরভিধীয়তে’ (না.চ. শ্লোকসংখ্যা – ৩৩৩) । সাহিত্যদর্পণের প্রশস্তিলক্ষণটি নাট্যশাস্ত্রের অবিকল অনুরূপ। সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে নাট্যশাস্ত্রের

লক্ষণটি-ই একটু বিশদে সমর্থন করেছেন – 'নৃপদ্বিজাতিগবাদীনাং শিবাবধারণপূর্বং কাব্যস্যাবধারণং প্রশস্তিঃ' (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়) ।

নির্বহণসন্ধিতে এই অঙ্গটির প্রয়োগ অবশ্য-ই করতে হবে বলে নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে। তবে নাটকীয় ইতিবৃত্তের অন্তর্গত না হওয়ার কারণে কোনো-কোনো নাট্যতত্ত্ববিদ্ এটিকে স্বতন্ত্র অঙ্গরূপে গণ্য করেন না। সেক্ষেত্রে, তাঁদের মতানুসারে,সন্ধ্যঙ্গের সংখ্যা হবে পঁয়ষট্টি নয়, চৌষট্টি।

সন্ধ্যঙ্গসমূহের প্রতিটির লক্ষণনির্দেশের পর নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র পুনরায় এদের প্রয়োগের প্রয়োজন সংক্ষেপে বিবৃত করছেন ।

সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগের প্রাথমিক ও প্রধানতম প্রয়োজন নাটকীয় ইতিবৃত্তের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা, যা না থাকলে রূপকে সংশ্লিষ্ট রসের পুষ্টিসাধন অসম্ভব । বিবরণে বলা হয়েছে– 'সর্বসন্ধীনাং চাঙ্গানীতিবৃত্তাবিচ্ছেদার্থমুপাদীয়ন্তে ইতিবৃত্তস্যাবিচ্ছেদশ্চ রসপুষ্ট্যর্থঃ'[১০৩] –কাহিনীসূত্র যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে. তা হলে রসের অগ্রগতি সম্ভব হয় না এবং সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে সেই রূপক কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। সন্ধ্যঙ্গসমূহের যথাযথ প্রয়োগ-ই হল এই রসস্ফুরণ ও রসপরিপোষণের মাধ্যম।

অতএব দেখা গেল, দর্শকচিত্তে কাঙ্খিত রসের উদ্রেক কবি বা নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য এবং সেই কারণে-ই মুখাদি পঞ্চসন্ধিতে উপক্ষেপাদি পঁয়ষট্টি প্রকার সন্ধ্যঙ্গ সন্নিবিষ্ট করা হয়ে থাকে। তবে এই সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগ করতে হবে কৃত্রিমতারহিত ভাবে, স্বাভাবিকরূপে। সর্বপ্রকার সন্ধ্যঙ্গপ্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা অথবা কবি-নাট্যকারের স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের অভিপ্রায় দ্বারা এই প্রয়োগকে ক্লিষ্ট করা চলবে না। অন্যথায় কাব্য বা নাটক রসোত্তীর্ণ হতে পারবে না। আচার্য আনন্দবর্ধনের এই উক্তিটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য –

"সন্ধিসন্ধ্যঙ্গসংঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া।
ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥"(ধ্বন্যালোক ৩/১২)

– কেবল শাস্ত্রনির্দেশ মান্য করার জন্য নয়, রসাভিব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গসমূহের সন্নিবেশ বাঞ্ছনীয় ।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের মতে, এই সন্ধ্যঙ্গগুলির প্রকৃতি স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের অনুরূপ। যেমনভাবে বিভাবাদির দ্বারা রসের উদ্বোধ ঘটে, সন্ধ্যঙ্গসমূহপ্রয়োগের উদ্দেশ্য-ও এক-ই। নাট্যদর্পণকারদ্বয় আরো বলছেন, সন্ধ্যঙ্গগুলির প্রয়োগ করতে হবে ঔচিত্য অনুসারে। প্রয়োজন অনুসারে, যথাস্থানে, রসের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে এগুলির প্রয়োগ হবে।

এবং নাট্যদর্পণকারদ্বয়ের মতে, এই প্রয়োগে সমর্থ হলেন কেবলমাত্র 'প্রবন্ধকবি' অর্থাৎ মহাকাব্যরচয়িতাগণ। মুক্তকাদির রচয়িতা কবিগণ সন্ধ্যঙ্গসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষমতা রাখেন না বলে-ই তাঁদের অভিমত। কাব্যের স্বচ্ছন্দ, মুক্ত গতিকে কোনো নিয়মে আবদ্ধ করা উচিত নয়, সম্ভব-ও নয়। তাই কোনোরকম শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা সন্ধ্যঙ্গগুলির প্রয়োগ না করে, ঔচিত্য অনুসারে মহাকবিরা এগুলির প্রয়োগ করে থাকেন। প্রয়োজনবোধে কোনো একটি সন্ধির অন্তর্গত কোনো অঙ্গবিশেষকে সন্ধ্যন্তরে প্রয়োগ করেন, প্রয়োজনে কোনো সন্ধ্যঙ্গ বর্জন করেন, প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো সন্ধ্যঙ্গের একাধিক বার প্রয়োগ-ও করে থাকেন। সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগক্ষেত্রে এই অবাধিত ও অনায়াস বিচরণ কেবলমাত্র মহাকবিদের দ্বারা-ই সম্ভব, কোনো ক্ষুদ্র কবির রচনায় এই যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া শক্ত। আচার্য অভিনবগুপ্ত-ও বলেছেন – 'যোগ্যতাং চ কবিরেব জানাতি, ন চ মুক্তককবিঃ, কিন্তু প্রবন্ধযোজনাসমর্থঃ' (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)। সন্ধ্যঙ্গ ইত্যাদির পরিমিত ও স্থানানুসারী প্রয়োগে-ই কোনো রচনা রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র শব্দভাণ্ডারের বিশালতা, ছন্দোবৈচিত্র্য বা অলঙ্কারচমৎকৃতির উপর নির্ভরশীল মুক্তকাদি রচনায় এজাতীয় রসস্ফুরণ একান্ত-ই বিরল।

এর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যদর্পণে আরো একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। রসাভিব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে নিপুণ কোনো নাট্যকার প্রয়োজনে এক-ই সন্ধ্যঙ্গের একাধিকবার প্রয়োগ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ 'বেণীসংহার'-এর নামোল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বীররস এবং রৌদ্ররসের যথাযথ স্ফুরণের জন্য এই দুই রসের উপযোগী বিমর্শসন্ধ্যঙ্গ সম্ফেট এবং গর্ভসন্ধ্যঙ্গ বিদ্রবের বারংবার প্রয়োগ করা হয়েছে। অনুরূপে শৃঙ্গারপ্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য রত্নাবলীতে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে বিলাস নামক প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গটি। আবার বিপরীতভাবে যেস্থলে একটি সন্ধ্যঙ্গের দ্বারা একাধিক সন্ধ্যঙ্গের কার্য সাধিত হতে পারে, সেখানে একাধিকের পরিবর্তে একটির প্রয়োগ-ই বাঞ্ছনীয় । এর উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে শ্রীভীমদেবের পুত্র বসুনাগ কর্তৃক বিরচিত 'প্রতিমা2নিরুদ্ধ' নামক রূপকের উল্লেখ করা হচ্ছে, যেখানে নাট্যকার তাঁর কুশলতাবলে উপক্ষেপের দ্বারা পরিকর (দুটি-ই মুখসন্ধির অঙ্গ) নামক সন্ধ্যঙ্গের কার্য সম্পাদিত করেছেন। আবার ভেজ্জলবিরচিত 'রাধাবিপ্রলম্ভ' নামক রূপকে পরিকর ও পরিন্যাস প্রয়োগের পরিবর্তে কেবলমাত্র উপক্ষেপ প্রয়োগের দ্বারা কার্য সম্পাদিত করা হয়েছে। সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগে এরূপ অনায়াস দক্ষতা কোনো সাধারণ মানের কবির পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল মহাকবিদের দ্বারা-ই এটি সম্ভব। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য করে এ-ও বলা হচ্ছে, তাঁরা যেন কখনো-ই রসবিশেষের পরিপুষ্টির জন্য সন্ধ্যঙ্গবিশেষের অগণিত প্রয়োগ না করেন অথবা বিপরীতক্ষেত্রে স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একাধিক সন্ধ্যঙ্গকে একটির

দ্বারা প্রকাশের চেষ্টা না করেন। সন্ধ্যঙ্গপ্রয়োগবিষয়ে কবিদের হতে হবে পরিমিত ও সংযত; অন্যথায় রচনার রসহানি অবশ্যম্ভাবী।

সন্ধ্যন্তর ঃ

সন্ধ্যঙ্গবিষয়ক আলোচনার সমাপ্তির পূর্বে নাট্যদর্পণকাররা এই পঁয়ষট্টি প্রকার সন্ধ্যঙ্গের অতিরিক্ত একুশটি সন্ধ্যন্তরের নাম উল্লেখ করছেন। সেগুলি হল– সাম, ভেদ, দণ্ড, দান, বধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গোত্রস্খলিত, সাহস, ভয়, হ্রীঃ, মায়া, ক্রোধ, ওজঃ, সংবরণ, ভ্রান্তি, হেত্ববধারণ, দূত, লেখ, স্বপ্ন, চিত্র এবং মদ। নাট্যদর্পণে এইসকল সন্ধ্যন্তরের প্রবক্তা আচার্যর নামোল্লেখ করা না হলে-ও, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই একুশটি সন্ধ্যন্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। নাট্যদর্পণকাররা নাট্যশাস্ত্র থেকে সেই অংশটি অবিকৃতভাবে স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে এই সন্ধ্যন্তরগুলির লক্ষণ নির্ণয় করা হয় নি। নাট্যদর্পণকাররা-ও এবিষয়ে নীরব। নাটকলক্ষণরত্নকোশের নবম অধ্যায়ে সাগরনন্দী এই তত্ত্বটিকে 'প্রদেশ' আখ্যায় অভিহিত করে এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর আলোচনা করেছেন।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র অবশ্য এইগুলিকে সন্ধ্যন্তররূপে স্বীকৃতি দেননি। উল্লিখিত সন্ধ্যন্তরগুলির মধ্যে সামদানাদি সংগ্রহ নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের অন্তর্গত হতে পারে; প্রত্যুপন্নমতিত্ব ইত্যাদি ব্যভিচারিভাবের প্রকৃতিযুক্ত; দূত, লেখ, স্বপ্ন ইত্যাদি নাটকীয় ইতিবৃত্তের চরিত্রলক্ষণবিশিষ্ট; অবশিষ্টগুলি স্বীকৃত সন্ধ্যঙ্গগুলির কোনো না কোনোটির লক্ষণাক্রান্ত। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে – 'উদাত্তরাঘব'-এ উপক্ষেপ সন্ধ্যঙ্গটি হেত্ববধারণের অর্থে প্রযুক্ত; এই উপক্ষেপ 'প্রতিমা2নিরুদ্ধ'-এ স্বপ্নের প্রকৃতিযুক্ত; এক-ই উপক্ষেপ 'রামাভ্যুদয়'-এ ভয়ের লক্ষণাক্রান্ত এবং 'বেণীসংহার'-এ ক্রোধের লক্ষণান্বিত। তাই নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের মতে, স্বীকৃত পঁয়ষট্টিটি সন্ধ্যঙ্গের অতিরিক্ত আরো কোনো সন্ধ্যন্তর স্বীকারের কোনো আবশ্যকতা নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আচার্য অভিনবগুপ্ত-ও এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করেছেন– "এতে তু বিভাবানুভাবব্যভিচারিরূপা এব। ন তু তদতিরিক্তং জগতি কিঞ্চিদস্তি .... " (না.শা. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. History of Sanskrit Poeties, P.V. Kane, পৃঃ-৪০১
২. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ-১৭১
৩. তত্রৈব
৪. তত্রৈব
৫. তত্রৈব

৬. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-১৬৬ থেকে গৃহীত।
৭. Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts, S.H. Butcher, পৃঃ- ২২১
৮. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ১৭১
৯. তদেব, পৃঃ - ১৭২
১০. তদেব, পৃঃ - ১৭১
১১. নাট্যদর্পণ, কে.এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ- ১৩
১২. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ-১৭১
১৩. তত্রৈব
১৪. তত্রৈব
১৫. নাট্যদর্পণ, কে.এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ- ১৫
১৬. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ-১৭২
১৭. তত্রৈব
১৮. তত্রৈব
১৯. তদেব, পৃঃ - ১৭৩
২০. তদেব, পৃঃ - ১৭৪
২১. তত্রৈব
২২. তদেব, পৃঃ - ১৭৩
২৩. তদেব, পৃঃ - ১৭৪
২৪. তত্রৈব
২৫. তত্রৈব
২৬. তদেব, পৃঃ - ১৭৫
২৭. তত্রৈব
২৮. তদেব, পৃঃ - ১৭৬
২৯. তত্রৈব
৩০. An Introduction to the study of literature, Hudson, পৃঃ - ১৯১
৩১. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ১৭৫
৩২. তত্রৈব
৩৩. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-২৭৪।
৩৪. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ১৭৫
৩৫. তদেব, পৃঃ -১৭৬
৩৬. তত্রৈব
৩৭. তত্রৈব
৩৮. তত্রৈব
৩৯. তত্রৈব
৪০. তত্রৈব
৪১. তদেব, পৃঃ -১৭৭
৪২. তত্রৈব
৪৩. তদেব, পৃঃ -১৮০

৪৪. তত্রৈব
৪৫. তত্রৈব
৪৬. তত্রৈব
৪৭. Drama in Sanskrit Literature, R.V. Jagirdar, পৃঃ -৫৪
৪৮. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ১৮১
৪৯. তদেব, পৃঃ -১৮২
৫০. তদেব, পৃঃ -১৮৩
৫১. তত্রৈব
৫২. তত্রৈব
৫৩. তত্রৈব
৫৪. তদেব, পৃঃ -১৮৫
৫৫. তত্রৈব
৫৬. তদেব, পৃঃ -১৮৬
৫৭. তত্রৈব
৫৮. তদেব, পৃঃ -১৮৭
৫৯. তত্রৈব
৬০. তত্রৈব
৬১. তত্রৈব
৬২. তত্রৈব
৬৩. তদেব, পৃঃ -১৮৮
৬৪. তদেব, পৃঃ -১৮৯
৬৫. তদেব, পৃঃ -১৯০
৬৬. তত্রৈব
৬৭. তত্রৈব
৬৮. তদেব, পৃঃ -১৯১
৬৯. তত্রৈব
৭০. তত্রৈব
৭১. তদেব, পৃঃ -১৯৩
৭২. তত্রৈব
৭৩. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-১১৬
৭৪. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ১৯৩
৭৫. তদেব, পৃঃ -১৯৪
৭৬. সাহিত্যদর্পণ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), কুমুদরঞ্জন রায় সম্পাদিত, পৃঃ- ১৬৭
৭৭. তদেব, পৃঃ -১৬৯
৭৮. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ১৯৫
৭৯. তদেব, পৃঃ -১৯৬
৮০. নাট্যদর্পণ, কে.এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ- ৬০
৮১. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ-২০০

৮২. তদেব, পৃঃ -২০৮
৮৩. তদেব, পৃঃ -২০৯
৮৪. তত্রৈব
৮৫. তদেব, পৃঃ -২১০
৮৬. তদেব, পৃঃ -২১১
৮৭. তদেব, পৃঃ -২১৪
৮৮. The law and Practice of Sanskrit Drama, S.N. Shastri, পৃঃ -১৩০
৮৯. নাট্যদর্পণ, তত্রৈব
৯০. তদেব, পৃঃ -২১৯
৯১. তদেব, পৃঃ -২২০
৯২. তদেব, পৃঃ -২২১
৯৩. তত্রৈব
৯৪. তত্রৈব
৯৫. তদেব, পৃঃ -২২২
৯৬. তদেব, পৃঃ -২২৩
৯৭. তত্রৈব
৯৮. তত্রৈব
৯৯. তদেব, পৃঃ -২২৪
১০০. তদেব, পৃঃ -২২৫
১০১. তদেব, পৃঃ -২২৭
১০২. তত্রৈব
১০৩. তদেব, পৃঃ -২২৯

দ্বিতীয় বিবেক

'প্রকরণাদ্যেকাদশরূপনির্ণয়' নামক নাট্যদর্পণের দ্বিতীয় বিবেকটি অন্বর্থসংজ্ঞক। প্রথম বিবেকে নাটকসম্বন্ধীয় সুবিস্তৃত আলোচনার পর এই অধ্যায়ে অবশিষ্ট একাদশ প্রকার রূপকের বিস্তারিত সোদাহরণ আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা এবার একে-একে এই রূপকগুলির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হব।

প্রকরণ ঃ

দ্বাদশ প্রকার রূপকের মধ্যে নাটকের পরে-ই প্রকরণের স্থান। 'প্র' পূর্বক 'কৃ' ধাতুর যোগে প্রকরণ পদটি নিষ্পন্ন, যার অর্থ প্রকৃষ্টভাবে কোনো কিছু নির্মাণ বা রচনা করা। এজাতীয় রূপকে রচয়িতা নেতা-ফল-বস্তু এই ত্রিবিধ বিষয়ের এক বা একাধিক বিষয় স্বীয় কল্পনা দ্বারা রচনা করেন, তাই এর এই নাম । নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে – 'প্রকর্ষেণ ক্রিয়তে কল্প্যতে নেতা ফলং বস্তু বা ব্যস্তসমস্ততয়াত্রেতি প্রকরণম্'।[১] এবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের অভিমতটি প্রাঞ্জলতার কারণে উল্লেখ করা উচিৎ–

"যত্র কবিরাত্মশক্ত্যা বস্তু শরীরং চ নায়কং চৈব।
ঔৎপত্তিকং প্রকুরুতে প্রকরণমিতি তদ্ বুধৈর্জ্ঞেয়ম্॥" (না.শা. ১৮/৪৫)

ব্যুৎপত্ত্যনুসারে-ই বোঝা যাচ্ছে প্রকরণের কাহিনী হবে কল্পিত; অতএব লৌকিক। এ বিষয়ে নাট্যতত্ত্ববিষয়ক সমস্ত গ্রন্থে এক-ই অভিমত পোষণ করা হয়েছে। প্রকরণে কোনো অংশ যদি অকল্পিত হয়, তবে তা পূর্বকবিগণের রচনা থেকে উদ্ধৃত কোনো ঘটনা বা গল্পাংশ হতে পারে; একে নাট্যশাস্ত্রে প্রকরণের 'আহার্য' অংশ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অথবা সামগ্রিক ভাবে-ই প্রকরণের কাহিনীবস্তু (ঋষিগণ প্রণীত মহাকাব্যাদি ব্যতিরিক্ত) বৃহৎকথা ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হতে পারে; নাট্যশাস্ত্রে একে প্রকরণের 'অনার্ষ' অংশ বলে অভিহিত করা হচ্ছে। নাট্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, যদি পূর্বতন গ্রন্থের ঘটনা বা বিষয়বস্তুর ছায়াপাত প্রকরণে ঘটে, সেক্ষেত্রে প্রকরণকার কখনো-ই সে সব অংশের রসের উৎকর্ষসাধন করবেন না। কারণ তথাকৃতে প্রাক্তন রচয়িতাদের অবমাননা হতে পারে। নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে – ...'হ্যভূতগুণাবাপে শ্রাদ্ধলোকস্য জুগুপ্সা স্যাদিতি'।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিষয়টি অবিকলভাবে অভিনবভারতী টীকা অনুসরণে উপস্থাপিত ।[৩]

প্রকরণের নায়ক হবেন ক্রয়বিক্রয়াদিতে নিযুক্ত বণিক্, যজন-যাজনাদি ষট্প্রকার কার্যকারী বিপ্র অথবা রাজসহায়ক সচিব। এঁদের প্রকৃতি হবে ধীরোদাত্ত অথবা ধীরপ্রশান্ত। যেসব

নাট্যতত্ত্ববিদের মতে প্রকরণের নায়ক কেবলমাত্র ধীরপ্রশান্ত প্রকৃতির হবেন, এমনকি তিনি সচিব বা অমাত্য হলে-ও, নাট্যদর্পণে তাঁদের মত খণ্ডন করা হয়েছে। টীকায় বলা হচ্ছে, এই মত প্রাক্তন আচার্যদের মতের পরিপন্থী – 'বৃদ্ধসম্প্রদায়বন্ধ্যঃ'।[৪] এর সমর্থনে নাট্যদর্পণে নাট্যশাস্ত্রের চব্বিশতম অধ্যায়ের একটি শ্লোকের অংশ উদ্ধার করা হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে সেনাপতি ও অমাত্যরা হবেন ধীরোদাত্ত প্রকৃতির – 'সেনাপতিরমাত্যশ্চ ধীরোদাত্তৌ প্রকীর্তিতৌ' (না.শা. ২৪/১৮)। নাট্যদর্পণে পুনরায় স্পষ্ট করে বলে হচ্ছে, যদি-ও কোনো অমাত্য, বণিক্ বা বিপ্রের জীবিকাধারী হতে পারেন, তা-ও প্রকরণের নায়ক যে ধীরোদাত্ত প্রকৃতির-ও হতে পারেন, সেটি বিশেষভাবে নির্দেশ করার জন্য-ই তালিকায় অমাত্যর পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকরণের নায়ক উত্তম বা অধম প্রকৃতির হবেন না। তিনি হবেন মধ্যম প্রকৃতির। অতএব মধ্যম প্রকৃতির নায়কোচিত কার্যকলাপ-আহার-বিহার-বেশভূষা-সম্ভোগাদি ব্যাপার প্রকরণে বর্ণিত হবে। নাট্যদর্পণে আরো বলা হয়েছে, প্রকরণের নায়িকা মন্দগোত্রজাতা হলে নায়ক-ও সমান গোত্রের হবেন। বণিগাদি ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে নায়ক হবেন কেবল একজন; সমবকারের মত একাধিক নায়ক প্রকরণে থাকেন না। এই নায়ক ধর্ম, অর্থ ও কামে আসক্ত হবেন। তাঁর কার্যসিদ্ধির পথে থাকবে নানান প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু পরিশেষে তিনি সব প্রতিকূলতাকে জয় করে ত্রিবর্গসাধনে সক্ষম হবেন। প্রকরণের নায়ক কখনো-ই দিব্য হবেন না। শুধু নায়ক নয়, প্রকরণে কোনো চরিত্র-ই দিব্য হতে পারে না। নাট্যশাস্ত্রে-ও এ বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ হল, প্রকরণের নায়ককে অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈপ্সিত ফললাভ করতে হয়। অন্যদিকে দেবতাদের জীবনচর্যায় কেবল সুখবাহুল্য-ই থাকে, দুঃখের লেশমাত্র সেখানে পাওয়া যায় না। এই বিশেষ শ্রেণীচরিত্রের কারণে দেবতাদের কখনো প্রকরণের নায়ক পদে চিত্রিত করা হয় না।

প্রকরণের নায়িকা বিষয়ে বলা হচ্ছে, গৃহস্থ কোনো পুরুষের ত্রিবর্গসাধন বর্ণিত হলে নায়িকা হবেন কুলজা। এর বিপরীত ক্ষেত্রে অ-গৃহস্থ ব্যক্তির জীবনবর্ণনায় নায়িকা হবেন মন্দগোত্রা বারাঙ্গনা। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'কুলস্ত্রী গৃহবার্তায়াং পণ্যস্ত্রী তু বিপর্যয়ে'(না.দ.২/৩)। উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে-ও গৃহস্থজীবনে বেশ্যা নায়িকার প্রয়োগ নিষেধ করা হয়েছে – 'গৃহবার্তা যত্র ভবেন্ন তত্র বেশ্যাঙ্গনা কার্যা' (না.শা. ১৮/৫১) ।

নায়িকাভেদে এই দুইপ্রকার প্রকরণের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে যথাক্রমে পুষ্পদূষিতক ও তরঙ্গদত্তের নাম করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য উভয় প্রকার নায়িকার উপস্থিতি-ও দেখা যায়। সে সকল স্থলে কখনো উভয়ের সাক্ষাৎকার প্রদর্শন করা যাবে না। নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্ট ভাবে বলা

হয়েছে – ‘যদি বা কারণযুক্ত্যা বেশ্যাকুলস্ত্রীসঙ্গমো ন স্যাত্’ (না.শা. ১৮/৫৩)। সেই কারণে-ই মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার সঙ্গে চারুদত্তের পত্নী ধূতার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, উভয় প্রকার নায়িকার প্রয়োগ থাকলে নায়ক হবেন কোনো বিট, যদি-ও প্রকরণের নায়কের তালিকায় বিটের উল্লেখ নেই। সেক্ষেত্রে কুলজা নায়িকার স্থান হবে গৌণ, বারাঙ্গনা-ই হবেন প্রধানা।

তবে সামগ্রিক বিচারে একথা বলা যেতে-ই পারে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকরণের নায়িকা হবেন কোনো বারাঙ্গনা বা গণিকা। এ বিষয়ের সমর্থনে নাট্যদর্পণের টীকায় কিছু উদাহরণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গণিকা নায়িকা বলে-ই ‘পুষ্পদূষিতক’ নামক প্রকরণের অশোকদত্ত নামটি শুনে নায়ক সমুদ্রদত্ত নায়িকা নন্দয়ন্তীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন, কারণ এজাতীয় নারীরা প্রায়শঃ-ই অধিক অর্থলোভে শঠতাপরায়ণ হয়ে থাকে। অপর একটি গ্রন্থের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, যেখানে পুত্রের অনুপস্থিতিতে শ্বশুর তাঁর পুত্রবধূকে বিতাড়িত করছেন ও বিতাড়িতা বধূ এক শবর সেনাপতির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। এ জাতীয় ঘটনা নিম্নজাতীয় পুরুষ-স্ত্রীদের মধ্যে-ই সম্ভব। নাট্যদর্পণে এ-ও পর্যন্ত বলা হচ্ছে,গণিকা নায়িকার প্রতি বিনয়রহিত কটূক্তি-ও করা যেতে পারে, যার উদাহরণরূপে বিশাখদেববিরচিত ‘দেবীচন্দ্রগুপ্ত’ নামক প্রকরণে কুমার চন্দ্রগুপ্তের “আনন্দাশ্রুজলং......” ইত্যাদি উক্তির উল্লেখ করা হচ্ছে।

অনন্তর প্রকরণের প্রকারভেদ। নাট্যদর্পণ অনুসারে কল্পিত ও অকল্পিত নেতা-ফল-বস্তু ভেদে প্রথমতঃ প্রকরণের ভেদ সাতপ্রকার। কোনো একটি বিষয় কল্পিত ও বাকি দুটি অকল্পিত– এভাবে তিনটি ভেদ; কোনো দুটি বিষয় কল্পিত ও বাকি একটি অকল্পিত –এ ভাবে আরো তিনটি ভেদ; এবং তিনটি-ই কল্পিত –এই হল সপ্তম প্রকার ভেদ। সারণীর সাহায্যে বিষয়টি অধিকতর প্রাঞ্জল হতে পারে –

	নেতা	**ফল**	**বস্তু**
১.	কল্পিত	অকল্পিত	অকল্পিত
২.	অকল্পিত	কল্পিত	অকল্পিত
৩.	অকল্পিত	অকল্পিত	কল্পিত
৪.	কল্পিত	কল্পিত	অকল্পিত
৫.	কল্পিত	অকল্পিত	কল্পিত
৬.	অকল্পিত	কল্পিত	কল্পিত
৭.	কল্পিত	কল্পিত	কল্পিত

যে প্রকরণে কুলজা ও গণিকা দুই প্রকার নায়িকা থাকে, সেটি হল সঙ্কীর্ণ প্রকরণ। যে প্রকরণে এদের উভয়ের যেকোনো একজন নায়িকা, সেটি হল শুদ্ধ প্রকরণ। অর্থাৎ শুদ্ধ প্রকরণ দুই প্রকার – ১. কেবল কুলজা নায়িকাযুক্ত এবং ২. কেবল গণিকা নায়িকাযুক্ত। অতএব প্রাগুক্ত নেতা-ফল-বস্তুর কল্পিত-অকল্পিত ভেদযোগে শুদ্ধ প্রকরণ মোট চৌদ্দ প্রকারের। অন্যদিকে সঙ্কীর্ণ প্রকরণ সাতপ্রকারের। এইভাবে নাট্যদর্পণে প্রকরণের একুশটি ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। টীকায় আরো বলা হয়েছে যে, কল্পিত-অকল্পিত ভেদে নায়িকার-ও আরো বহুপ্রকার ভেদ সম্ভব, তবে উদাহরণযোগ্য কোনো গ্রন্থ না থাকার কারণে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, সাহিত্যদর্পণ, দশরূপক ইত্যাদি পরবর্তী গ্রন্থে কেবলমাত্র নায়িকাভেদে প্রকরণভেদের কথা বলা হয়েছে। তদনুসারে কোনো ক্ষেত্রে কুলজা, কোনো ক্ষেত্রে গণিকা, কোনো ক্ষেত্রে উভয়ে-ই – এইভাবে প্রকরণের ত্রৈবিধ্য স্বীকৃত হয়েছে।

প্রকরণের বর্ণনীয় বিষয়বস্তুতে রাজাদি উত্তমপ্রকৃতির ব্যক্তিদের চরিত্রচিত্রণ নেই। পূর্বে-ই বলা হয়েছে, প্রকরণের নায়ক হবেন মধ্যম প্রকৃতির। তাই মধ্যমপ্রকৃতির নায়কোচিত যাবতীয় কার্যলাপের বিবরণ-ই প্রকরণে থাকে। রাজকীয় আভিজাত্য বা আড়ম্বরের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের জীবনজগৎ-ই প্রকরণের প্রতিপাদ্য। তাই এই জাতীয় রূপকে কঞ্চুকীর পরিবর্তে দাস, অমাত্যের পরিবর্তে শ্রেষ্ঠী, বিদূষকের পরিবর্তে বিট প্রমুখের চরিত্রচিত্রণ পাওয়া যায়। এইসব সাধারণ প্রকৃতির মানুষেরা,তাদের দুঃখদীর্ণ জীবন,অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা,অন্তিমে সব প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে তাদের ঈপ্সিত লাভ – এই হল প্রকরণজাতীয় রূপকের মূল বর্ণনীয় বিষয়। টীকায় প্রকরণে বর্ণনীয় বিষয়সমূহের একটি তালিকা-ও দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, বণিক্-অমাত্য-বিপ্রাদ্যুচিত-ত্রিবর্গফলসাধক বিবিধ কার্য, তাদের স্থৈর্য-ধৈর্য, আবার বিপদে বুদ্ধিনাশ, কুলজা স্ত্রীর বৃত্তান্ত, বেশ্যাসুখসম্ভোগচিত্র, বিট-দূতাদির স্বরূপ, নায়িকার অনুরাগ-বিরাগের বিবিধ লক্ষণ, মনোহরণের বিভিন্ন কৌশল, বিভিন্ন প্রকার নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, সামাদি উপায়চতুষ্টয়ের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা প্রকরণের মধ্যে থাকবে। এ জাতীয় রূপকে বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে দুর্জন ব্যক্তিদের সৎপন্থায় প্রত্যাবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয় – এটি-ই হল প্রকরণ রচনার সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয়তা – ‘দুর্মেধসাং হি ন্যায়ে বর্ত্মনি বৃত্ত্যর্থং কবয়ো2ভিনেয়প্রবন্ধান্ গ্রথ্নন্তীতি’।[৫]

প্রকরণের সন্ধি-অবস্থা-অর্থোপক্ষেপকাদির ব্যবস্থা নাটকের অনুরূপ। বণিগাদি চরিত্রোচিত অভিনয়প্রকার, নাটকীয় ফল, অঙ্কসংখ্যা, আরম্ভাদি অবস্থা, মুখাদি সন্ধি, সন্ধ্যঙ্গসমূহ, প্রবেশকাদি অর্থোপক্ষেপক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের প্রয়োগ হবে ঠিক নাটকের নিয়ম অনুসারে। নাট্যশাস্ত্রে এবং পরভাবী নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে, ভাষাব্যবহারের নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করে প্রকরণে

পাঠ্যবিষয়ের রচনা করতে হবে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'অবিকৃতভাষাচারং তত্র তু পাঠ্যং প্রযোক্তব্যম্' (না.শা. ১৮/৫৩)। সাগরনন্দী বলেছেন, গণিকার ক্ষেত্রে-ও শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করতে হবে।

প্রকরণে প্রযোক্তব্য রসবিষয়ে সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে, নাটকের মত প্রকরণে-ও শৃঙ্গার বা বীর অঙ্গীরস হবে। নাট্যদর্পণে কিন্তু বলা হয়েছে, নায়কাদি চরিত্রের ক্লেশবাহুল্য বর্ণনার কারণে শৃঙ্গার ও হাস্যরসের স্বল্পপরিমাণ প্রয়োগ করা যাবে।

শৃঙ্গার-হাস্যের স্বল্পতার কারণে প্রকরণে বৃত্তিচতুষ্টয়ের ব্যবহার থাকলে-ও কৈশিকীবৃত্তির অধিক প্রয়োগ করা চলবে না। ভবভূতি যে তাঁর মালতীমাধবে কৈশিকীবৃত্তির অধিক প্রয়োগ করেছেন – নাট্যদর্পণে সেটিকে সমর্থন করা হয়নি, কারণ তা পূর্বাচার্যদের অভিমতের পরিপন্থী।

প্রকরণের উদাহরণরূপে মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব, তরঙ্গদত্ত, পুষ্পদূষিতক ইত্যাদির নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

নাটিকা ঃ

নাট্যদর্পণসম্মত দ্বাদশপ্রকার রূপকের অন্যতম হল নাটিকা। এর লক্ষণ আলোচনার পূর্বে দৃশ্যকাব্যসমূহের মধ্যে নাটিকার স্থানবিষয়ক আলোচনা করে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দশপ্রকার রূপকের কথা বলা হলে-ও, এখানে নাটিকার লক্ষণনির্দেশ করা হয়েছে। তবে ভরত নাটিকাকে স্বতন্ত্র রূপকের মর্যাদা দেননি। তিনি নাটিকাকে নাটক ও প্রকরণের মিশ্ররূপ বলে উল্লেখ করেছেন – 'অন্তর্ভাবগতা হ্যেষা ভাবয়োরুভয়োরপি' (না.শা. ১৮/৬১)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নাটক ও প্রকরণের সংযোগবশতঃ দৃশ্যকাব্যের যে দুটি ভেদ সৃষ্টি হয় (নাটিকা ও প্রকরণিকা), ভরত সেগুলিকে নাটী নামে অভিহিত করেছেন। দশরূপককার ধনঞ্জয় সম্ভবতঃ মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসরণে-ই নাটিকার-ও লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। অন্যথায় দশরূপক গ্রন্থটি একান্ত ভাবে দশটি রূপকের লক্ষণ আলোচক গ্রন্থ। অথবা ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর অনুসরণে বলা যেতে পারে, হয়তো নাটকের মত নাটিকার-ও এতখানি জনপ্রিয়তা ছিল যে, দশরূপকের মত প্রামাণ্য গ্রন্থে তার লক্ষণ উত্থাপিত না হয়ে পারেনি। দশরূপকে নাটিকা 'সংকীর্ণ' অর্থাৎ মিশ্রিত আখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে। ভাবপ্রকাশন রচয়িতা শারদাতনয়, সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এবং অপরাপর অধিকাংশ নাট্যতত্ত্ববিদ্ নাটিকাকে অষ্টাদশপ্রকার উপরূপকের অন্যতম রূপে স্বীকার করেছেন।

নাট্যদর্পণে 'নাটিকা' পদটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে। নৃত্যার্থক 'নট্' বা 'নাট্' ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় যুক্ত করে, তদনন্তর 'ঙী' এই স্ত্রীপ্রত্যয়টি যোগে নিষ্পন্ন হয় নাটী পদটি; সহৃদয়দের

চিত্তকে যা নৃত্যময় আনন্দে পূর্ণ করে তোলে। নাটী পদটির উত্তর ক্ষুদ্রার্থে 'কপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। স্ত্রীপ্রাধান্যের কারণে শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

নাটিকার কাহিনী প্রকরণের মত কবিকল্পিত। সাহিত্যদর্পণে বলা হচ্ছে –'নাটিকা ক্‌ৢপ্তবৃত্তা স্যাত্' (সা.দ. ৬/২৬৯)। এ জাতীয় রূপকের কাহিনী সাধারণতঃ বৃহদায়তন হয় না।

নাটিকা চতুরঙ্ক। নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে, নাটিকা পঞ্চ অবস্থা সমন্বিত। অবস্থা পঞ্চকের সন্নিবেশ বিষয়ে এখানে বলা হচ্ছে যে, এজাতীয় রূপকে তিনটি অবস্থা পরিচ্ছিন্ন তিনটি অঙ্ক থাকবে, চতুর্থ অঙ্কটি দুটি অবস্থার সমন্বয়ে গঠিত হবে। এ জাতীয় রূপকে সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গ- বীজাদি অর্থপ্রকৃতি-পতাকাস্থান-বিষ্কম্ভকাদি অর্থোপক্ষেপক প্রভৃতি বিষয়গুলির সন্নিবেশ, নাটক অথবা প্রকরণের উক্ত বিষয়গুলির বিন্যাসের অনুরূপ। নাট্যতত্ত্বের অন্যান্য গ্রন্থে এ বিষয়ে অধিক আলোকপাত করা হয়নি। কেবলমাত্র নাটকলক্ষণরত্নকোশে নাটিকার সন্ধিসংখ্যা বিষয়ে বলা হচ্ছে, এ জাতীয় রূপকে মুখ,প্রতিমুখ, গর্ভ ও উপসংহৃতি কেবল এই চারটি সন্ধি থাকবে; বিমর্শসন্ধি থাকবে না।

কৈশিকীপ্রধান এজাতীয় রূপকে নায়ক হবেন ধীরললিত প্রকৃতির। তিনি হবেন প্রখ্যাত কোনো বংশের সন্তান। প্রসঙ্গক্রমে ধীরললিত নায়কের লক্ষণটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে – 'নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ' (সা.দ. ৩/৪০) – অর্থাৎ মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর রাজ্যশাসন ভার অর্পণ করে যিনি স্বয়ং নিশ্চিন্ত, যাঁর স্বভাব কোমল এবং যিনি সর্বদা নৃত্যগীতাদি সুকুমারকলার মধ্যে মগ্ন থাকেন, তাঁকে ধীরললিত প্রকৃতির নায়ক বলা হয়ে থাকে।

ললিতাভিনয়াত্মক নাটিকা জাতীয় রূপকে স্ত্রীচরিত্রের-ই প্রাধান্য। তাই এখানে দেবী-দূতী- সখী-চেটী-রাজকন্যা ইত্যাদি চরিত্রের বহুল সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। নাটিকার প্রধান নায়িকার সংখ্যা দুই। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা নায়িকা হলেন দেবী বা প্রধানা রাজমহিষী। তিনি রাজকুলসম্ভূতা, প্রগল্ভা, গম্ভীরা এবং মানিনী। প্রসঙ্গতঃ নাট্যশাস্ত্রধৃত দেবী লক্ষণটি উল্লেখ করা যেতে পারে –

"এভিরেব গুণৈর্যুক্তাস্তত্সংস্কারবিবর্জিতাঃ।

গর্বিতাশ্চাতিসৌভাগ্যাঃ পতিসম্ভোগতৎপরাঃ ॥

শুচিনিত্যোজ্জ্বলাকারাঃ প্রতিপক্ষাভ্যসূয়কাঃ।

বয়োরূপগুণাঢ্যাঃ যাস্তা দেব্য ইতি ভাষিতাঃ ॥" (না.শা. ২৪/৩৬,৩৭)

অপরদিকে কনিষ্ঠা নায়িকা হবেন রাজবংশজা, মুগ্ধা, দিব্যা, সুন্দরী ও অপরিণীতা কোনো রাজকন্যা।

উক্ত দুই প্রকার নায়িকার প্রসিদ্ধা ও অপ্রসিদ্ধা এই দুপ্রকার ভেদ হতে পারে। নাট্যদর্পণে এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নাটিকার চারটি প্রকার নির্ণয় করা হয়েছে –

প্রথমপ্রকার – দেবী অপ্রসিদ্ধা, কন্যা প্রসিদ্ধা

দ্বিতীয় প্রকার – দেবী প্রসিদ্ধা, কন্যা অপ্রসিদ্ধা

তৃতীয় প্রকার – উভয়ে প্রসিদ্ধা

চতুর্থ প্রকার – উভয়ে অপ্রসিদ্ধা।

নাট্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, এই প্রসিদ্ধি-অপ্রসিদ্ধির উপর ভিত্তি করে নাটিকার আরো বহু প্রকার ভেদ অন্যত্র স্বীকৃত হয়েছে। আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর অভিনবভারতী টীকায় এরকম কয়েকটি মতের উল্লেখ করেছেন। যেমন – আচার্য ভট্টলোল্লটের মতে নাটিকার ছয়টি প্রকার, আচার্য শঙ্কুকের মতে আটপ্রকার ইত্যাদি।[৮] বলা বাহুল্য, নাটিকার এ জাতীয় ভেদকরণ খুব বেশি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নাটিকার কাহিনী সর্বান্তঃকরণে শৃঙ্গাররসাত্মক, প্রেমমূলক। নায়ক জ্যেষ্ঠা নায়িকার সঙ্গে দিনযাপন করবেন। এই অবস্থায় রাজান্তঃপুরের সঙ্গে কনিষ্ঠা নায়িকার কোনো-না-কোনো সম্বন্ধবশতঃ তিনি নায়কের অন্তঃপুরে স্থানলাভ করবেন। সঙ্গীত বা নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নায়কের শ্রুতিগোচর ও দৃষ্টিগোচর হবেন। প্রথম দর্শনে-ই উভয়ের মধ্যে অনুরাগ উন্মেষিত হলে-ও, তাঁদের অনুরাগের প্রধান অন্তরায় হবেন জ্যেষ্ঠা নায়িকা অর্থাৎ প্রধানা রাজমহিষী। তৎসত্ত্বে-ও তাঁর অগোচরে উভয়ের প্রণয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হবে। কনিষ্ঠার প্রতি নায়কের অনুরাগবিষয়ে অবগতির পর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন ও প্রণয়ীযুগলের মিলনের পথে নানাভাবে বিঘ্নোৎপাদন করবেন। তৎসত্ত্বে-ও নায়ক-নায়িকা গোপনে সংকেতস্থানে মিলিত হবেন। পরিশেষে নায়কের দ্বারা প্রসন্নীকৃতা জ্যেষ্ঠা নায়িকার আনুকূল্যে নায়ক-নায়িকার ঈপ্সিত মিলন ঘটবে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে আরো নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে, কাহিনীর অন্তিম অংশে, নায়কের প্রতি জ্যেষ্ঠা নায়িকার 'আমি আপনার কি উপকার করতে পারি'– এজাতীয় বাক্যের দ্বারা নাটিকার পরিসমাপ্তি ঘটবে –'নায়িকয়ৈব ভর্তুরভ্যুদয়িনঃ অতঃপরং কিং তে করোমীত্যভিধায় সংহারঃ কর্তব্যঃ' (না. ল. র. একবিংশ অধ্যায়)।

শৃঙ্গারমূলক নাটিকাজাতীয় রূপকে নৃত্য-গীত-বাদ্য-হাস্য ইত্যাদি শৃঙ্গারাঙ্গের প্রচুর প্রয়োগ থাকে। নাটিকা হল 'স্ত্রীমহীফলা'– স্ত্রীলাভ অর্থাৎ ঈপ্সিত নারীকে লাভ করা-ই এ জাতীয় রূপকের প্রধান ফল। এর সঙ্গে রাজ্যলাভরূপ ফলটি-ও থাকে, তবে প্রথমটি-ই প্রধান।

নাটিকার কাহিনীদৃষ্টে স্পষ্ট-ই প্রতীত হয়, এর অঙ্গীরস হল শৃঙ্গার। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে নাটিকা হবে – 'শৃঙ্গারদ্বয়মুজ্জ্বলম্' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)। শৃঙ্গারের দুটি প্রকার অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ দুই-ই এখানে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হবে।

শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটিকায় বৃত্তি স্বাভাবিক ভাবে-ই কৈশিকী। কেবল তাই নয়, আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় বলছেন – 'সুষ্ঠু পূর্ণতয়া বিহিতানি চত্বার্যপি কৈশিক্যাঙ্গানি যত্র' (না. শা. অষ্টাদশ অধ্যায়) – অর্থাৎ নাটিকাতে কৈশিকী বৃত্তির চারটি অঙ্গ অর্থাৎ নর্ম-নর্মস্ফূর্জ-নর্মস্ফোট-নর্মগর্ভ – এদের সুবিহিত সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। পরবর্তী দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে এই মতের সমর্থন মেলে।

নাটিকার উদাহরণরূপে শ্রীহর্ষকৃত 'রত্নাবলী', রাজশেখরকৃত 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রকরণী ঃ

অনন্তর প্রকরণীলক্ষণ। নাট্যদর্পণসম্মত দ্বাদশ প্রকার রূপকের অন্যতম এটি। নাটিকা আলোচনার সময় বলা হয়েছে, মহর্ষি ভরত নাটক ও প্রকরণ থেকে উদ্ভূত দুটি রূপভেদ স্বীকার করেছেন, যাদের তিনি নাটী আখ্যায় অভিহিত করেছেন; তাদের একটি নাটিকা ও অপরটি প্রকরণী বা প্রকরণিকা । এদের মধ্যে প্রথমটি বিখ্যাত, দ্বিতীয়টি অল্পখ্যাত। সম্ভবতঃ সেই কারণে-ই নামোল্লেখ থাকলে-ও নাট্যশাস্ত্রে প্রকরণীর লক্ষণ নির্ণয় করা হয়নি। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে, নাটক ও প্রকরণের সংমিশ্রণে নির্মিত আরো কতকগুলি রূপ রয়েছে; কিন্তু সেইসব গ্রন্থের অপ্রাপ্তির কারণে এবং তাদের রঞ্জকত্বের অভাবের কারণে এদের পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন – 'এবমন্যে2পি সঙ্করভেদা রূপকদ্বয়ত্রয়াদিসাঙ্কর্যেন সম্ভবন্তি, পরমদৃষ্টত্বাদরঞ্জকত্বাচ্চ ন তে লক্ষ্যন্ত ইতি'।[৭] ধনঞ্জয় রচিত দশরূপকে নাটিকার লক্ষণ নির্ধারিত হলে-ও প্রকরণীর লক্ষণ নির্ণীত হয়নি। কারণ, টীকাকার ধনিকের মতে, প্রকরণীর বস্তু-রস-নায়ক প্রকরণের থেকে অভিন্ন। পরভাবী দর্পণকার অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের মধ্যে প্রকরণীকে স্থান দিয়েছেন। অন্যদিকে নাটকলক্ষণরত্নকোশে প্রকরণীর উল্লেখ মাত্র নেই।

প্রকরণী শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – "প্রকর্ষেণ ক্রিয়তে কল্প্যতে অস্যামর্থ ইতি প্রকরণী।অল্পার্থে কপি প্রকরণিকা" [৮]– প্রকৃষ্টরূপে কাহিনী নির্মাণ করা হয় বলে এজাতীয় রূপকের এই নাম। ক্ষুদ্রায়তন বোঝাতে 'কপ্' প্রত্যয়যোগে প্রকরণিকা শব্দটি নিষ্পন্ন। ব্যুৎপত্তিটি অনুধাবন করলে-ই বোঝা যায় প্রকরণীর কাহিনী হল কল্পিত। এটি এর প্রকরণধর্ম; কারণ নাটকের কাহিনী হয় খ্যাতবৃত্ত।

প্রকরণীর লক্ষণনির্ণয়ে নাট্যদর্পণে একটি মাত্র কারিকা রচনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, প্রকরণীর অন্যান্য সমস্ত বিষয় নাটিকার অনুরূপ, কেবলমাত্র নায়ক ব্যতিরেকে। অতএব প্রকরণী

নাটিকার সমসংখ্যক অবস্থাযুক্ত, চতুরঙ্কবিশিষ্ট, স্ত্রীপাত্রবহুল ইত্যাদি চরিত্রবিশিষ্ট হবে; কেবল এর পাত্র হবেন অন্যপ্রকার। ধীরোদাত্ত প্রখ্যাতবংশ রাজার পরিবর্তে এখানে নায়ক হবেন বণিক্ প্রমুখ। সাহিত্যদর্পণে প্রকরণীর লক্ষণে বলা হয়েছে – 'সার্থবাহাদিনায়কা' (সা.দ. ৬/৩০৬)। 'আদি' পদের ব্যাখ্যায় মিতভাষিণী টীকায় বলা হচ্ছে –'আদিপদেন বিপ্রঃ অমাত্যঃ বা নায়কো ভবেৎ' ।[৯] অতএব বোঝা গেল, প্রকরণীর নায়ক হবেন বণিক্, বিপ্র, অমাত্য ইত্যাদি। এটি হল এ জাতীয় রূপকের প্রকরণ ধর্ম।

বণিগাদি নায়কবিশিষ্ট হওয়ার কারণে নায়কচরিত্রের বেশভূষা-আচার-আচরণ তদনুসারী হবে। এদের বিলাসবহুল, ধর্মার্থের অবিরোধী কার্যকলাপের বর্ণনা থাকবে এখানে। এজাতীয় রূপকে নায়িকা হবেন নায়কের সমানবংশজা। অতএব রাণী বা রাজকন্যা প্রকরণীর নায়িকা হবেন না। প্রকরণীতে নায়কের-ই প্রাধান্য; কারণ এখানে যাবতীয় কার্যনির্বাহ নায়ক চরিত্রানুসারী।

প্রকরণীর বৃত্তি হবে প্রধানতঃ কৈশিকী; কারণ এটি শৃঙ্গাররসাত্মক রূপক। এটি এর নাটকধর্ম, প্রকরণে কৈশিকীবাহুল্য থাকে না।

যেহেতু বণিগাদি নায়কের ক্ষেত্রে রাজ্যলাভরূপ ফলপ্রাপ্তির অবকাশ নেই, তাই প্রকরণীতে স্ত্রীরত্নলাভ ও বিবিধ দ্রব্যাদি লাভ-ই এর মুখ্য ফল।

প্রকরণীর কোনো উদাহরণ প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে নেই। দর্পণকার-ও বলেছেন– 'মৃগ্যমুদাহরণম্' (সা.দ. ষষ্ঠ অধ্যায়)– উদাহরণ অন্বেষণ করে নিতে হবে।

ব্যায়োগ ঃ

সর্বপ্রকার অবস্থা ও সন্ধি দ্বারা ভূষিত প্রকরণ, নাটিকা ও প্রকরণীর আলোচনার পর নাট্যদর্পণকাররা এবার ব্যায়োগের আলোচনা করছেন। ব্যায়োগাদি অবশিষ্ট সবকটি রূপকে সন্ধি এবং অবস্থা সমূহ এক বা একাধিক সংখ্যায় কম। এগুলির মধ্যে ব্যায়োগের আলোচনা সর্বপ্রথম কেন করা হচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তরে নাট্যদর্পণকাররা বলছেন, ব্যায়োগ মনুষ্যনায়কযুক্ত হওয়ার কারণে প্রথম অবতারণা এটির– 'মনুষ্যনায়কপ্রত্যাসত্ত্যা প্রথমং ব্যায়োগং লক্ষয়তি' ।[১০]

উল্লেখ করা যেতে পারে, নাট্যতত্ত্ববিষয়ক অন্য কোনো গ্রন্থে কিন্তু নাটক-প্রকরণাদি আলোচনার অব্যবহিত পরে ব্যায়োগের আলোচনা করা হয়নি। এবং এর স্বপক্ষে নাট্যদর্পণে যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, সেটি-ও যথেষ্ট অদ্ভুত। কেবলমাত্র মনুষ্যনায়কত্ব ব্যায়োগ আলোচনার প্রাথম্যের কারণ হতে পারে না। কারণ অবশিষ্ট অন্যান্য ভেদগুলির-ও সবকটিতে-ই নায়ক মনুষ্য।... যাই হোক, আমরা নাট্যদর্পণসম্মত ক্রমে-ই রূপকসমূহের আলোচনা করবো।

ব্যায়োগ শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে – 'বিশেষেণ আ সমন্তাদ্ যুজ্যন্তে কার্যার্থং সংরভন্তে2ত্রেতি ব্যায়োগঃ'[১১] – এ জাতীয় রূপকে নায়ক নিজ কার্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকার রুদ্রদীপ্ত প্রযত্ন করে থাকেন, তাই এই রূপকের এই প্রকার নামকরণ।

ব্যায়োগের অভিনয়কাল একদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এটি একটি মাত্র অঙ্ক বিশিষ্ট রূপক।

ব্যায়োগের নায়কচরিত্র দীপ্তরসাশ্রিত। তাই কোনো বিষয়ে অকারণ কালক্ষেপ তাঁর চরিত্রের পরিপন্থী। এই নায়ককে তাঁর কার্যসাধনের পথে বহুপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সেসব বাধাকে জয় করে তিনি নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন। এই কারণসমূহের জন্য-ই ব্যায়োগে প্রারম্ভ, তদনন্তর প্রযত্ন ও তারপরে-ই ফলাগমের প্রয়োগ; প্রাপ্ত্যাশা ও নিয়তাপ্তি প্রয়োগের অবকাশ ব্যায়োগে নেই।

নাট্যদর্পণের টীকায় ন্যূনসন্ধি-ন্যূনাবস্থা অন্যান্য রূপকগুলির ব্যবস্থা-ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ঈহামৃগ নামক রূপকে তিনটি অবস্থা প্রযুক্ত হয়; এটি ব্যায়োগের মতন-ই প্রাপ্ত্যাশা ও নিয়তাপ্তির প্রয়োগবিহীন। ডিম ও সমবকারে নায়ক কর্তৃক বহুপ্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষার কারণে এদুটি প্রাপ্ত্যাশাযুক্ত; কিন্তু আশাভঙ্গের আশঙ্কা না থাকার কারণে এদুটি রূপকে নিয়তাপ্তির প্রয়োগ নেই। ভাণ ও প্রহসনে নায়কের অধমত্বের কারণে, উৎসৃষ্টিকাঙ্কে শোকের কারণে, বীথীতে সহায়হীনতার কারণে এবং সামগ্রিকভাবে এগুলির প্রতিটিতে ইতিবৃত্তের স্বল্পতার কারণে এগুলিতে প্রারম্ভের পরে-ই ফলাগমের প্রয়োগ; অন্যান্য তিনটি অবস্থা প্রয়োগের কোনো অবকাশ এগুলিতে নেই।

অবস্থাসংখ্যার অনুরূপে রূপকে সন্ধিসংখ্যা নির্ণীত হয়। নাটকাদিতে নায়কের বহুবিধ কার্যপ্রচেষ্টা, কর্মনাশের আশঙ্কা ইত্যাদি সর্বপ্রকার নাটকীয় অবস্থার প্রয়োগের কারণে এগুলি পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। অনুরূপে ব্যায়োগে প্রারম্ভ-প্রযত্ন-ফলাগম তিন অবস্থায় প্রযুক্ত মুখ, প্রতিমুখ ও নির্বহণ সন্ধির প্রয়োগ হয়, গর্ভসন্ধি ও বিমর্শসন্ধি প্রয়োগের এখানে অবকাশ নেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাটকলক্ষণরত্নকোশে ব্যায়োগলক্ষণ আলোচনাবসরে আচার্য সাগরনন্দী এই রূপকে কেবলমাত্র মুখ ও নির্বহণ সন্ধির প্রয়োগ স্বীকার করেছেন।

ব্যায়োগে যুদ্ধের বৃত্তান্ত অবশ্য-ই থাকবে। তবে স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কোনো কারণে সেই যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এর উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'জামদগ্ন্যজয়' নামক ব্যায়োগের উল্লেখ করা হচ্ছে, যেখানে পরশুরাম কর্তৃক সহস্রার্জুন বধের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ব্যায়োগে 'নিযুদ্ধ' অর্থাৎ বাহুযুদ্ধ, শৌর্য-বিদ্যা-কুল-ধনাদির কারণে স্পর্ধিত যুদ্ধ এবং এগুলি থেকে উদ্ভূত দীপ্তরসের ব্যাপক প্রয়োগ থাকে।

ব্যায়োগে স্বল্পসংখ্যক স্ত্রীচরিত্র থাকবে। এতে পুরুষচরিত্রের-ই বাহুল্য থাকবে। দশরূপকের টীকাকার ধনিক 'ব্যায়োগ' পদের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে বলেছেন – 'ব্যাযুজ্যন্তে অস্মিন্ বহবঃ পুরুষাঃ'– অর্থাৎ এই রূপকে অনেক পুরুষচরিত্র যুক্ত থাকে– এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ব্যায়োগ পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

ব্যায়োগের কাহিনী হবে প্রখ্যাত। অর্থাৎ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ইতিহাসাদি খ্যাত কোনো প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তকে অবলম্বন করে নাট্যকাররা ব্যায়োগ রচনা করেন। নাট্যদর্পণোক্ত লক্ষণে 'খ্যাতবস্তু' পদের প্রয়োগ দ্বারা ব্যায়োগে কবিকল্পিত বৃত্তান্তকে নিষেধ করা হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে, ব্যায়োগে ঋষিকন্যার বিবাহের বিবরণ থাকবে।

যুদ্ধপ্রধান ব্যায়োগের অঙ্গীরস হবে রৌদ্র ও বীর। এ বিষয়ে নাট্যতত্ত্বের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের অভিমতগুলি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। দশরূপকে বলা হয়েছে ব্যায়োগে 'ডিমবদ্ রসাঃ'– ব্যায়োগের রসসন্নিবেশ হবে ডিম নামক রূপকের মত। অর্থাৎ হাস্য ও শৃঙ্গার ব্যতীত অপরাপর রসগুলির এখানে প্রয়োজনানুসারে প্রয়োগ হবে। সাহিত্যদর্পণে ব্যায়োগে হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্ত এই তিনটি রস বাদে অন্য রসগুলির প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। আবার নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে ব্যায়োগে করুণ ও শৃঙ্গার রসের আধিক্য থাকবে না –'নাতিকরুণশৃঙ্গারো' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

রসের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে আসে বৃত্তিসমূহের আলোচনা। কারণ, বলা হয়ে থাকে সর্ববিধ রূপকের মাতৃস্থানীয় চারপ্রকার বৃত্তি-ই সর্বপ্রকার রসের উদ্বোধের প্রধান সহায়ক। ব্যায়োগে হাস্য ও শৃঙ্গাররস অনুপস্থিত বলে কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগের অবকাশ এখানে নেই; কৈশিকী ব্যতীত সাত্ত্বতী, ভারতী ও আরভটী বৃত্তির এখানে প্রয়োজনানুগ প্রয়োগ হবে। এই তিনপ্রকার বৃত্তিসন্নিবেশের কারণে ব্যায়োগের গদ্য ও পদ্য উভয় অংশের-ই ভাষা হবে ওজোগুণসমন্বিত।

ব্যায়োগের নায়ক হবেন 'অদিব্য' অর্থাৎ মনুষ্য। ধীরোদাত্ত প্রকৃতির ও দীপ্তরসাশ্রিত রাজা, সেনাপতি, অমাত্য এরা হবেন ব্যায়োগের নায়ক। নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশাদি প্রায় সকল গ্রন্থে ব্যায়োগের এরূপ নায়কের কথা-ই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অভিনবভারতী থেকে এই অংশটি উল্লেখ করা যেতে পারে–'দিব্যনায়কাভাবাত্ কেবলমত্রোদাত্তস্য রাজাদেঃ নায়কতা, অপি ত্বমাত্যসেনাপতিপ্রভৃতের্দীপ্তরসস্য' (না.শা.অষ্টাদশ অধ্যায়)। তবে পরভাবী বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণে ব্যায়োগের নায়করূপে বিখ্যাত রাজর্ষির সঙ্গে-সঙ্গে ধীরোদ্ধত ব্যক্তিবিশেষ অথবা দিব্যপুরুষবিশেষের উল্লেখ করেছেন–'রাজর্ষিরথ দিব্যো বা ভবেদ্ ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ' (সা.দ. ৬/২৩৩)।

নাট্যদর্পণের টীকায় আরো বলা হয়েছে, কোনো-কোনো আচার্যর মতে ব্যায়োগ দ্বাদশসংখ্যক নায়কযুক্ত হবে। তবে এই মতের প্রবক্তা আচার্য কে, তা বোঝা দুষ্কর।

নায়িকাবিষয়ে বলা হয়েছে, সর্বতো নায়কপ্রধান ব্যায়োগ জাতীয় রূপকে নায়িকা ও তাঁদের অনুচরী ইত্যাদির উল্লেখ অনুপস্থিত।

পরিশেষে কয়েকটি ব্যায়োগের নাম করা যেতে পারে – 'জামদগ্ন্যজয়ম্', 'সৌগন্ধিকাহরণম্', কাঞ্চনাচার্যবিরচিত 'ধনঞ্জয়বিজয়', ভাসবিরচিত 'মধ্যমব্যায়োগ' ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ডঃ. মানকড় শেষোক্তটিকে ব্যায়োগ শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, একটি দৃশ্যে নায়িকার সঙ্গে সাক্ষাৎ বর্ণনার কারণে এটি যথাযথ ব্যায়োগ নয়।

সমবকার ঃ

যুদ্ধপ্রধান রূপকগুলির মধ্যে অন্যতম হল সমবকার। সমবকার পদের ব্যুৎপত্তিনির্দেশ করে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'সঙ্গতৈরবকীর্ণৈশ্চার্থৈঃ ত্রিবর্গোপায়ৈঃ পূর্বপ্রসিদ্ধৈরেব ক্রিয়তে নিবধ্যতে ইতি সমবকারঃ'[১২] – 'সঙ্গত' অর্থাৎ একত্র এবং 'অবকীর্ণ' অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত, প্রসিদ্ধ, ত্রিবর্গলাভসম্বদ্ধ বিষয়াদির বর্ণনার দ্বারা নির্মিত রূপকের নাম সমবকার। এই মতটি অনেকাংশে অভিনবভারতী অনুসারী। সেখানে-ও সমবকারের ব্যুৎপত্তিতে বলা হচ্ছে– 'সংবদ্ধো2বকীর্ণশ্চ যত্রার্থঃ সমবকারস্তদাহ' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)। অন্যদিকে দশরূপকের অবলোকটীকায় বলা হয়েছে –'সমবকীর্যন্তে অস্মিন্নর্থাঃ' (দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ) – যে রূপকে কাব্যের অর্থ বা প্রয়োজনগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাকে-ই বলা হয় সমবকার। সাহিত্যদর্পণের মিতভাষিণীটীকায় এই বিষয়টি-ই বিশদে ব্যাখ্যাত হয়েছে – 'সমবকীর্যন্তে সম্যক্ উল্লিখ্যন্তে বহবঃ অর্থাঃ বিষয়াঃ যস্মিন্ রূপকে ইতি সমবকারনামকং রূপকম্'। [১৩]

সমকারের কাহিনী হবে প্রখ্যাত। দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে, এই কাহিনী দেবতা ও অসুরদের আশ্রয় করে নির্মিত হবে। নাট্যশাস্ত্রধৃত সমবকারলক্ষণে-ও এটিকে 'দেবাসুরবীজকৃতঃ' (না.শা. ১৮/৬২) বলা হয়েছে,যার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন – 'দেবাসুরস্য যদ্বীজং ফলসংপাদনোপায়স্তেন কৃতো বিরচিতঃ' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

সমবকার তিন অঙ্কবিশিষ্ট রূপক। পাঁচ প্রকার সন্ধির মধ্যে বিমর্শ ভিন্ন অপর চারটি সন্ধি অর্থাৎ মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-নির্বহণ এখানে সন্নিবিষ্ট হবে। প্রথম অঙ্কে মুখ ও প্রতিমুখ, দ্বিতীয় অঙ্কে গর্ভ ও তৃতীয় অঙ্কে নির্বহণ – এভাবে সমবকারে সন্ধিসজ্জা হবে।

অনন্তর সমবকারের অভিনয়কাল। নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, প্রথম অঙ্ক ছয় মুহূর্ত, দ্বিতীয় অঙ্ক দুই মুহূর্ত এবং তৃতীয় অঙ্ক এক মুহূর্ত যাবৎ বিস্তৃত হবে। 'মুহূর্ত' হল দুই ঘটিকা যাবৎ সময়কাল।

অতএব প্রথম অঙ্ক দ্বাদশ ঘটিকা, দ্বিতীয় অঙ্ক চার ঘটিকা ও তৃতীয় অঙ্ক দুই ঘটিকা – এভাবে সাকুল্যে অষ্টাদশ ঘটিকা যাবৎ সমবকারের অভিনয়কাল বিস্তৃত হবে।

নাট্যশাস্ত্রে এই কালমান আরো সমাসতঃ বলা হচ্ছে। সেখানে 'মুহূর্ত' পদটির উল্লেখ নেই এবং ঘটিকা-র পরিবর্তে 'নাড়ী' (কোথাও বা 'নাড়িকা') শব্দটি প্রযুক্ত হচ্ছে। নাড়ীর কালমান নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, নাড়ী হল অর্ধমুহূর্তপরিমাণ সময় – 'নাড়ীসংজ্ঞা জ্ঞেয়া মানং কালস্য যন্মুহূর্তার্ধম্' (না.শা. ১৮/৬৭)। সুস্পষ্ট নির্দেশে বলা হচ্ছে, প্রথম অঙ্ক দ্বাদশ নাড়ী – 'দ্বাদশনাড়ীবিহিতঃ প্রথমঃ কার্যঃ' (না.শা. ১৮/৬৫), দ্বিতীয় অঙ্ক চতুঃনাড়ী – 'দ্বিতীয়ঃ সমাশ্রিতো নাড়িকাশ্চতস্রস্তু' (না.শা. ১৮/৬৬) এবং তৃতীয় অঙ্ক দ্বিনাড়ী – 'দ্বিনাড়িকঃ স্যাত্তৃতীয়স্তু' (না.শা. ১৮/৬৬) যাবৎ বিস্তৃত হবে। অতএব এই বিধান অনুসারে-ও সর্বমোট অষ্টাদশ নাড়ী যাবৎ সমবকারের অভিনয়কাল নির্ধারিত হলো।

অধ্যাপক ভি. এস. আপটে-র অভিধান অনুসারে নালিকার (বা নাড়িকা বা নাড়ী বা ঘটিকা) পরিমাণ হল চব্বিশ মিনিট। এই মান অনুসারে হিসাব করলে দেখা যাবে, অষ্টাদশ নাড়ী যাবৎ বিস্তৃত সমবকারের অভিনয়কাল বর্তমান সময়ের নিরিখে সাত ঘণ্টা বারো মিনিট।

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে-ও বলা হয়েছে, সমবকারের প্রথম অঙ্ক দ্বাদশনালিক, দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্নালিক ও তৃতীয় অঙ্ক দ্বিনালিক হবে। মতপার্থক্য কেবল নালিকার কালমান বিষয়ে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে – 'নালিকা ঘটিকাদ্বয়ম্' (সা.দ.ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) – অর্থাৎ নালিকা হল দুই ঘটিকা পরিমাণ সময়। নাট্যশাস্ত্রাদিতে যেখানে নালিকা ও ঘটিকাকে সমমান বলে ধরা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে দশরূপকাদিতে নালিকাকে দুই ঘটিকার সমন্বয় রূপে স্বীকার করায় সামগ্রিকভাবে সমবকারের অভিনয়কাল-ও দ্বিগুণিত অর্থাৎ ষট্ত্রিংশ নালিকা হয়ে বর্তমান নিরিখে চৌদ্দ ঘণ্টা চব্বিশ মিনিটে পরিণত হয়ে যায়। নাট্যদর্পণের টীকায় দশরূপকের নামোল্লেখ না করে-ই এই মতটি উল্লিখিত হয়েছে– 'একে তু প্রত্যঙ্কং যথোদিতদ্বিগুণং কালমানমাহুঃ'।[১৪]

বলা বাহুল্য, প্রয়োগযোগ্যতার দিক থেকে বিচার করলে নাট্যশাস্ত্র-নাট্যদর্পণ সমর্থিত কালমানটি অনেক বেশি বাস্তবোচিত। আজ-ও গ্রামাঞ্চলে রাত্রিব্যাপী যাত্রানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রচলন আমরা দেখে থাকি। সেদিক থেকে দেখলে সাত ঘণ্টা বারো মিনিটের একটি মঞ্চপরিবেশনা দীর্ঘ হলে-ও, অসম্ভব নয়। কিন্তু এর দ্বিগুণ পরিমাণ সময় নিয়ে কোনো অভিনয় চললে তা দর্শকদের মনোরঞ্জনের পরিবর্তে কেবল ক্লান্তির-ই উৎপাদন করবে। উপরন্তু নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে মহর্ষি ভরত বলছেন, রূপকাদির অভিনয়ের দ্বারা যেন আবশ্যক কার্যসমূহের ব্যাঘাত না ঘটে। কিন্তু চৌদ্দ ঘণ্টা চব্বিশ

মিনিট ধরে কোনো অভিনয় চললে দর্শকদের কার্যব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। অতএব সর্বথা বিচারে আমরা প্রথমোক্ত অভিনয়কালটিকে-ই সমর্থন করবো, দ্বিতীয়টি নয়।

এবার আসা যাক্ সমবকারের নায়ক প্রসঙ্গে। নাট্যতত্ত্ববিষয়ক প্রায় সমস্ত গ্রন্থে বলা হচ্ছে, এ জাতীয় রূপকে নায়ক হবে প্রখ্যাত ও ধীরোদাত্ত প্রকৃতির দ্বাদশসংখ্যক দেবতা ও অসুর। কেবলমাত্র সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে, অসুর নয়, দেবতা ও মানবগণ হবেন সমবকারের নায়ক। এদের সকলকে হতে হবে বিখ্যাত। নাট্যশাস্ত্রের 'প্রখ্যাতোদাত্তনায়কশ্চৈব' (না.শা.১৮/৬৩) পদের ব্যাখ্যায় এই খ্যাতির বিষয়টিতে বিশেষভাবে আলোকপাত করে অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে – 'দেবাসুরা অপি চাপ্রখ্যাতা বৃহৎকথাদৌ শ্রূয়ন্তে স্বয়ং বা কেনচিদুহ্যন্ত ইতি তন্নিরাসার্থং প্রখ্যাতপদম্' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়) – বৃহৎকথাদিতে উক্ত কোনো অপ্রখ্যাত বা অল্প গুরুত্বপূর্ণ দেবাসুর সমবকার জাতীয় রূপকের নায়ক হতে পারবেন না।

প্রবলবিক্রমী এইসকল দেবতা ও অসুররা মর্ত্য মানব অপেক্ষা ধীরোদ্ধত হলে-ও, স্বজাত্যপেক্ষা অর্থাৎ দেবাসুর জাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এঁদের প্রকৃতি ধীরোদাত্ত-ই হবে। অভিনবভারতীতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে – 'যদ্যপি দেবা পুরুষাপেক্ষয়োদ্ধতাস্তথাপি স্বাপেক্ষয়া গাম্ভীর্যপ্রধানতয়োদাত্তাঃ' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

দ্বাদশসংখ্যক নায়কের সকলে-ই প্রতি অঙ্কে উপস্থিত থাকতে পারেন। অথবা একেকটি অঙ্কে নায়ক-প্রতিনায়ক এবং উভয়ের সহায়ক নায়ক –এভাবে মোট চারজন করে উপস্থিত থাকতে পারেন। এই মতটি-ও অভিনবভারতীকে অনুসরণ করে বিহিত হয়েছে।[১৫]

এই দ্বাদশসংখ্যক নায়কের প্রত্যেকের পৃথক-পৃথক ফলপ্রাপ্তির বর্ণনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ নাট্যদর্পণে 'পয়োধিমথন' নামক সমবকারের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে অমৃতলাভরূপ সামগ্রিক ফলের সঙ্গে-সঙ্গে হরি প্রভৃতির লক্ষ্মীলাভাদি পৃথক-পৃথক ফলের প্রাপ্তির বর্ণনা-ও করা হচ্ছে। এভাবে পৃথক ফলাবাপ্তির কারণে রামচরিতমূলক সমবকারে সুগ্রীবাদি সহায়ক চরিত্রগুলি-ও নায়ক পদে উন্নীত হয়ে যায়।

সমবকারের প্রতিটি অঙ্ক হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি অঙ্কে সংশ্লিষ্ট নায়কদের উদ্দেশ্য, ফলপ্রাপ্তি, ফলসাধনের উপায় ইত্যাদি বিষয়গুলির সঙ্গে অন্য অঙ্কগুলির কোনো সংযোগ থাকবে না, অর্থাৎ সমবকারের অঙ্কগুলি হবে পরস্পর অসম্বদ্ধ।কেবলমাত্র অভিনয়ের শেষ অংশে অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের অন্তিম ভাগে রূপকের মুখ্য ফলের সঙ্গে অন্যান্য ফলগুলির সংযোগ সাধিত হয়; অন্যথায় সমবকারের প্রতিটি অঙ্ক হবে একক, বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অসম্বদ্ধ। নাট্যশাস্ত্রে-ও সমবকারলক্ষণ আলোচনার

এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে– 'অর্থং হি সমবকারে হ্যপ্রতিসংবন্ধমিচ্ছতি' (না.শা. ১৮/৬৯)।

এজাতীয় রূপকে আমুখ বা প্রস্তাবনার অব্যবহিত পরে-ই মুখ্যফল-নির্দেশক বীজের সন্নিবেশ ঘটে। অনন্তর পরস্পর অসম্বদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি অঙ্কের অভিনয় পরিবেশিত হয়। এরপর অন্তিম অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের প্রয়োগ, যেখানে প্রথম অঙ্কদুটির ফলসমূহের সঙ্গে রূপকের মুখ্যফলের সমন্বয় সাধন করা হয়। অঙ্কত্রয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের অভাবহেতু সমবকারে বিন্দু নামক অর্থপ্রকৃতির সন্নিবেশ করা যায় না। সাহিত্যদর্পণ, দশরূপক ইত্যাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে সমবকারে প্রবেশক নামক অর্থোপক্ষেপকের প্রয়োগ-ও করা যাবে না। সমবকারে ব্যাহারাদি ত্রয়োদশপ্রকার বীথ্যঙ্গের যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে হবে।

সমবকারের আশ্রয়ণীয় রসবিষয়ে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, সমবকার হবে বীর ও রৌদ্ররসপ্রধান। যদি-ও সমবকারে ত্রিবিধ শৃঙ্গারের প্রয়োগ হয়, তবু শৃঙ্গার কখনো সমবকারের প্রধান বা অঙ্গীরস রূপ প্রযুক্ত হয় না। এর কারণরূপে বলা হচ্ছে, উদ্ধত প্রকৃতির দেবাসুরগণের চরিত্রে শৃঙ্গারাধিক্য প্রদর্শন যথাযথ হয় না– 'দেবদৈত্যানামুদ্ধতত্বেন শৃঙ্গারস্য ছায়ামাত্রত্বেন নিবন্ধাদিতি'।[১৬] সাহিত্যদর্পণ, দশরূপকাদি গ্রন্থে বলা হচ্ছে, সমবকার জাতীয় রূপকের মুখ্যরস হবে বীররস, অপরাপর রসসমূহ অঙ্গরস রূপে সন্নিবিষ্ট হয়ে মৌলরসের পরিপুষ্টির সহায়ক হয়।

নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, সমবকারের পদ্যাংশ স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত ইত্যাদি বহ্বক্ষর ছন্দে নির্মিত হবে। কারণ স্পষ্ট। বীর ও রৌদ্ররস প্রধান সমবকারে ওজোগুণসম্পন্ন, দীর্ঘসমাসবহুল, উগ্রদীপ্ত ভাষার-ই প্রাধান্য। তাই স্বাভাবিকভাবে-ই শ্লোকগুলি বহু অক্ষর সমন্বিত দীর্ঘ ছন্দে রচিত হবে। অভিনবভারতী টীকার উল্লেখ থেকে আমরা জানতে পারি, আচার্য উদ্ভট-ও সমবকারে দীর্ঘ ছন্দ ব্যবহারের পক্ষে অভিমত পোষণ করেছেন।

নাট্যদর্পণে এ বিষয়ে অন্য একটি মতের-ও উল্লেখ করা হচ্ছে। সেই মতানুসারে সমবকারে গায়ত্রী, উষ্ণিক্ ইত্যাদি স্বল্পাক্ষর বৃত্ত এবং বিভিন্ন প্রকার বিষম ও অর্ধসম বৃত্তের ব্যবহার হবে। এই মতটির প্রবক্তা আচার্য প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি ভরত। নাট্যশাস্ত্রে সমবকারলক্ষণ আলোচনায় বলা হয়েছে –

"উষ্ণিগ্গায়ত্র্যাদীন্যন্যানি যানি বন্ধকুটিলানি।
বৃত্তানি সমবকারে কবিভিস্তানি প্রযোজ্যানি ॥" (না.শা. ১৮/৭৬)

পরবর্তী আচার্যদের মধ্যে ভোজদেব,দর্পণকার প্রমুখ এই মতের-ই সমর্থন করেছেন।

সমবকারে আশ্রয়ণীয় বৃত্তি সম্পর্কে নাট্যদর্পণে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু অপরাপর সমস্ত গ্রন্থে বলা হচ্ছে, এ জাতীয় রূপকে কৈশিকী বাদে অপর তিনটি বৃত্তি প্রযুক্ত হবে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, সমবকারে

যেখানে ত্রিবিধ শৃঙ্গারের সন্নিবেশ ঘটে সেখানে কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ হয় না – এ কিভাবে সম্ভব? এর সমাধান কল্পে অভিনবভারতী, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে, সমবকারে শুদ্ধা কৈশিকীর প্রয়োগ হবে। নর্ম-নর্মস্ফূর্জ-নর্মস্ফোট-নর্মগর্ভ – কৈশিকীর এই চারটি অঙ্গের প্রয়োগ এখানে হবে না, কেবলমাত্র সংযোগবিহিত নর্মের প্রয়োগ হবে। এর কারণস্বরূপ অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে, সমবকারের রুদ্রদীপ্ত উগ্র নায়কদের চরিত্রে সর্বাঙ্গসমন্বিত কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ একান্ত-ই অযৌক্তিক – '...ন কামসদ্ভাবমাত্রাদেব কৈশিকীসংভবঃ, রৌদ্রপ্রকৃতীনাং তদভাবাৎ' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

সমবকারে ত্রিবিধ বিদ্রব, ত্রিবিধ কপট এবং ত্রিবিধ শৃঙ্গারের বর্ণনা থাকবে। ক্রমানুসারে এগুলির আলোচনা করা হচ্ছে –

ত্রিবিধ বিদ্রব – বিদ্রবপদের ব্যুৎপত্তিতে নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে– 'বিদ্রবন্তি ত্রস্যন্তি জনা অস্মাদিতি বিদ্রবো2নর্থঃ'[১৭]– বিদ্রব অর্থাৎ অনর্থ বা উপদ্রব, যা থেকে লোকেদের মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটে। নাট্যদর্পণে নাট্যশাস্ত্রসম্মত বিদ্রবত্রৈবিধ্য স্বীকৃত হয়েছে। প্রথম প্রকার বিদ্রব হল চেতন বস্তু হস্ত্যাদির দ্বারা, দ্বিতীয় প্রকার বিদ্রব অচেতন শস্ত্রাদির দ্বারা এবং তৃতীয় প্রকার বিদ্রব চেতন ও চেতন উভয়ের দ্বারা, যখন পুর-অবরোধ ইত্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে হস্তী-শস্ত্র ইত্যাদি উভয় জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বর্ণিত হয়। নাট্যশাস্ত্রে দ্বিতীয় প্রকার বিদ্রবের উদাহরণরূপে জল-বায়ু-অগ্নি ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে সাহিত্যদর্পণ, দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশাদি গ্রন্থে একটু অন্যভাবে বিদ্রবের আলোচনা করা হয়েছে। তদনুসারে ভীতিবশতঃ পলায়নের নাম হল বিদ্রব। এই বিদ্রব অগ্নি-বায়ুকৃত, যুদ্ধজনিত এবং নগরাবরোধজনিত ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাই সাগরনন্দী বলেছেন–''তস্মিন্ ত্রয়ো বিদ্রবাঃ। অগ্নিসমীরকৃতঃ, যুদ্ধকৃতঃ, পুরোপরোধশ্চ'' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

ত্রিবিধ কপট – নাট্যদর্পণমতে আপাতসত্য ছলনার নাম কপট – 'মিথ্যাপ্রকল্পিতঃ সত্যানুকারা প্রপঞ্চঃ কপটঃ'। [১৮]এই কপট তিন প্রকার। প্রথমতঃ, বঞ্চনীয় ব্যক্তি যখন কোনো অপরাধ করে, সেই ক্ষেত্রে তার সঙ্গে বঞ্চনা করা; নাট্যদর্পণে এই প্রকারটির নাম বলা হচ্ছে 'বঞ্চকাবিনাভাবী'। দ্বিতীয়তঃ, যখন ব্যক্তিবিশেষের কোনো অপরাধ থাকে না, কেবলমাত্র প্রতারণার উদ্দেশ্যে প্রতারণা করা হয়ে থাকে; নাট্যদর্পণে এই প্রকারটির নাম বলা হচ্ছে 'বঞ্চকসম্ভবী'। তৃতীয়তঃ, যখন বঞ্চিত ব্যক্তির কোনো অপরাধ থাকে না এবং বঞ্চক ব্যক্তির-ও কোনো বঞ্চনাভিলাষ থাকে না, কাকতালীয়ভাবে যে বঞ্চনা সংঘটিত হয়ে থাকে; নাট্যদর্পণে এর নাম বলা হচ্ছে 'দৈবসম্ভবী'।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, অভিনবভারতীতে-ও ঠিক একই ভাবে কপটের ত্রৈবিধ্যের বর্ণনা করা হয়েছে।[১৯]

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে ত্রিবিধ কপট বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়নি। ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে, মোহাত্মক ভ্রমকে বলা হয় কপট– 'কপটস্য স্বরূপং তু ভ্রমো মোহাত্মকঃ স্মৃতঃ' (ভাব.প্র. ৮/১৮৬)। নাট্যশাস্ত্র, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে ঘটনাক্রমে জাত, দৈবকৃত ও সুখ-দুঃখ থেকে সম্ভূত –কপটের এই ত্রিবিধ প্রকার স্বীকৃত হয়েছে, যা স্পষ্টতঃ-ই নাট্যদর্পণ থেকে সর্বাংশে পৃথক।

ত্রিবিধ শৃঙ্গার – সমবকারে তিন প্রকারের শৃঙ্গারের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে– ধর্মশৃঙ্গার, কামশৃঙ্গার এবং অর্থশৃঙ্গার। ধর্ম, কাম ও অর্থ এই তিনটি যখন রূপকের মুখ্যফলরূপে অথবা ফলপ্রাপ্তির মুখ্যসাধনরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তখন যথাক্রমে উক্ত তিনপ্রকার শৃঙ্গারের প্রয়োগাবসর ঘটে। সংক্ষেপে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে–

ক. ধর্মশৃঙ্গার – ধর্ম এখানে সাধ্য অথবা সাধন। স্বীয় পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ রূপ কার্যের দ্বারা পরদারবর্জনরূপ ধর্মলাভ ঘটে। আবার, দানাদিরূপ ধর্মাচরণের দ্বারা বরস্ত্রীলাভরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে– এমনভাবে-ও এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

খ. কামশৃঙ্গার – কাম এখানে মুখ্যফল অথবা ফলসাধনের মুখ্য উপায়। 'কাম' ও 'শৃঙ্গার' দুটি শব্দ-ই প্রণয় বা রতিকে বোঝায়। এবিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে, স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক সম্বন্ধরূপ রতিকার্য হল এজাতীয় শৃঙ্গারের ফল এবং রতিরূপ কার্যের প্রতি স্ত্রী-পুরুষের প্রচেষ্টা হল এজাতীয় শৃঙ্গারের হেতু বা সাধন। সাধারণতঃ কামশৃঙ্গারের নায়িকা হবেন পরস্ত্রী; যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অহল্যার কামশৃঙ্গার। কোনো অবিবাহিতা কুমারী-ও এই প্রকার নায়িকা হতে পারেন। কিন্তু নিজের স্ত্রী বা কোনো গণিকা কামশৃঙ্গারের নায়িকা হতে পারবেন না। যদি নিজের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে কামশৃঙ্গারের বর্ণনা করা হয়, তবে সেই শৃঙ্গারের মধ্যে রতিকর্মের অতিরিক্ত বৈধকর্তব্যতার অংশ-ও সন্নিবিষ্ট থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সাহিত্যদর্পণে প্রহসনের নিমিত্ত নিষ্পন্ন শৃঙ্গারকে কামশৃঙ্গারের আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।

গ. অর্থশৃঙ্গার – অর্থ এখানে রূপকের মুখ্যফল অথবা ফল সাধনের মুখ্য উপায়। 'অর্থ' পদের দ্বারা বিবিধ আর্থিক প্রাপ্তিকে বোঝানো হচ্ছে। এই প্রাপ্তির তালিকায় থাকতে পারে রাজ্য-সুবর্ণ-ধনসম্পদ-শস্য-বস্ত্র ইত্যাদি। বারাঙ্গনাদের সঙ্গে পুরুষের প্রণয়কে-ও অর্থশৃঙ্গারের অন্তর্গত করা যায়। কারণ এ জাতীয় প্রণয়ের সাধ্য ও সাধন দুটি-ই হল অর্থ বা ধনসম্পদ। পুরুষরা অর্থদ্বারা গণিকাদের প্রণয় ক্রয় করেন, অন্যদিকে গণিকারা এই শৃঙ্গারের দ্বারা অর্থাদি লাভ করেন।

নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে, কোনো বিশেষ বস্তু (সাধারণতঃ রাজ্যাদি) লাভের জন্য দেবতারা-ও তাঁদের অধস্তন গন্ধর্ব-যক্ষ প্রমুখের কাছে অর্থিরূপে আসেন। এইভাবে দেবতাদের অর্থশৃঙ্গারের বিষয়টি নির্দেশ করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দেবতাদের গন্ধর্বাদির কাছে অর্থিত্বের এই বিষয়টি সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে গৃহীত। এই গ্রন্থে গিরিরাজসুতা পার্বতীর সঙ্গে পরিণয়কারণে মহাদেবের অন্যান্য দেবগণের নিকট অর্থিত্ব, তারকাসুরের দ্বারা অধিকৃত নিজরাজ্য পুনরুদ্ধারের কারণে অন্যান্যদের কাছে দেবরাজ ইন্দ্রের অর্থিত্ব ইত্যাদি দেবতাদের অর্থিত্বের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে।[২০]

নাট্যশাস্ত্রে এবং তদনুসরণে পরবর্তী নাটকলক্ষণরত্নকোশে একটু অন্যভাবে শৃঙ্গারত্রৈবিধ্য বর্ণিত হয়েছে। নিজের কল্যাণের জন্য ব্রতাদি ধর্মাচরণকে বলা হয়েছে ধর্মশৃঙ্গার, স্বেচ্ছায় বিবিধ উপায় অবলম্বনের নাম অর্থশৃঙ্গার এবং স্ত্রীসংযোগজনিত মত্ততার নাম কামশৃঙ্গার। নাটকলক্ষণ রত্নকোশের উদ্ধৃতি অনুসরণে– 'তত্র ব্রতাদিবিহিত আত্মহিতহেতুধর্মহেতুপ্রাপকো ধর্মশৃঙ্গারঃ, স্বেচ্ছয়া বহুবিধোপায়সংযুতো2র্থশৃঙ্গারঃ, স্ত্রীসংযোগভূতঃ সোন্মাদঃ কামশৃঙ্গারঃ' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

সমবকারের উদাহরণরূপে দশরূপকের বৃত্তিতে 'সমুদ্রমন্থনম্', সাহিত্যদর্পণে 'সমুদ্রমথনম্', নাট্যদর্পণে 'পয়োধিমন্থনম্', নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'শক্রানন্দ', 'লামকায়নাঙ্ক' ইত্যাদি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

ভাণ ঃ

নাট্যদর্পণসম্মত বারোপ্রকার রূপকের মধ্যে ভাণ অন্যতম। এই একাঙ্ক রূপকে একজন ধূর্ত বা বিট আকাশভাষিতের দ্বারা সম্বোধন ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে একক অভিনয়ের দ্বারা নিজের বা অপরের অনুভূতির কথা বর্ণনা করেন। নাট্যদর্পণে তাই ভাণ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে বলা হচ্ছে – 'ভণ্যতে ব্যোমোক্ত্যা নায়কেন স্বপরবৃত্তং প্রকাশ্যতে2ত্রেতি ভাণঃ'।[২১] অভিনবগুপ্তাচার্যের সংজ্ঞা অনুসারে, একক চরিত্রের মুখে অনাগত বা অনুপস্থিত চরিত্রগুলি সংলাপমুখর হয়, তাই এর নাম ভাণ – 'একমুখেনৈব ভণ্যন্তে উক্তিমন্তঃ ক্রিয়ন্তে অপ্রবিষ্টা অপি পাত্রবিশেষা যত্রেতি ভাণঃ' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

ভাণের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, এজাতীয় রূপকে বিট-ধূর্ত-বেশ্যা-ব্যভিচারী রাজপুত্রাদির বিবরণ থাকবে। কোনো একটি মাত্র ধূর্ত বা বিটচরিত্র স্বানুভূত অথবা পরানুভূত রূপে এই বিষয়গুলি বিবৃত করবে। স্বাভাবিকভাবে-ই বুঝতে পারা যাচ্ছে, ভাণের বস্তু হবে কবিকল্পিত। অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাস অথবা প্রসিদ্ধ কোনো লোকগাথা ভাণের উৎস হবে না।

একেবারে-ই সাধারণ, বা বলা যেতে পারে, সমাজে কিছুটা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবন ও কার্যকলাপ-ই হল ভাণের উপজীব্য । অতএব এজাতীয় কাহিনীতে রামায়ণাদি গ্রন্থের অভিজাত প্রাচীনত্বের ছায়াপাতের প্রশ্ন-ই ওঠে না।

বিষয়বস্তুর নিরিখে বিচার করলে ভাণগুলিকে উপনাট্য-ও বলা চলা না; এগুলি যেন নিতান্ত-ই অপনাট্য। তবে ভারতীয় নাট্যতত্ত্ববিদ্গণের অভিমত এ বিষয়ে একটু অন্যপ্রকার। তাঁদের মতে, ভাণের স্বরূপদৃষ্টে এগুলিকে আদর্শহীন অপসাহিত্য বলে মনে হলে-ও, বস্ততঃপক্ষে এগুলি নীতিহীন বা আদর্শভ্রষ্ট নয়। বরং মানুষের শঠতা, নীতিহীনতা ,স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি বিষয়গুলি নিন্দনীয় চরিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করে এগুলির সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা-ই এরূপ সাহিত্যকৃতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। নাট্যদর্পণে তাই বলা হচ্ছে –'অত্র বিটাদীনাং পরবঞ্চনাত্মকং বৃত্তং প্রেক্ষকাণামবঞ্চনীয়ত্বাপাদনার্থং ব্যুৎপাদ্যত ইতি'।[২২] জীবন বিষয়ে কোনো গভীরতর চেতনা বা সংবেদনশীলতার কোনো মৌল আবেদন না থাকার কারণে লঘু প্রকৃতির এই রচনাগুলি সাধারণ পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় বলে অভিমত পোষণ করেছেন আচার্য অভিনবগুপ্ত –" উৎসৃষ্টিকাঙ্ক-প্রহসন-ভাণাস্ত করুণহাস্যবিস্ময়প্রধানত্বাদ্ রঞ্জকরসপ্রধানাঃ। তত এবাত্র স্ত্রীবালমূর্খাদিঃ অধিকারী" (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

ভাণ হল 'একহার্য'– অর্থাৎ একটি মাত্র চরিত্রের দ্বারা অভিনীত। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, এই চরিত্রটি হবে কোনো ধূর্ত বা বিট। প্রসঙ্গতঃ বিটের লক্ষণটির সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। এই বিট হবেন পণ্ডিত ও ধূর্ত । সাহিত্যদপর্ণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে নির্ণীত বিটলক্ষণটি হল–

"সম্ভোগহীনসম্পদ্বিটস্তু ধূর্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।

বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরো2থ বহুমতো গৌষ্ঠ্যাম্ ॥" (সা.দ. ৩/৫০)

– অর্থাৎ অতিরিক্ত সম্ভোগের কারণে হীনসম্পদ, ধূর্ত, নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় আংশিক অভিজ্ঞ, বেশরচনায় দক্ষ, বাগ্মী, লোকপ্রিয় ও সভাস্থলে সমাদৃত – এরূপ ব্যক্তি হলেন বিট। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, শৃঙ্গারতিলক, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র, দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমত ইত্যাদি অন্যান্য গ্রন্থে-ও বিটের লক্ষণ অল্পবিস্তর এক-ই রকম।

ভাণে এই বিটের মুখে স্বকৃত বা পরকৃত বিভিন্ন কর্মের বিবরণ থাকে। আকাশভাষিতের মাধ্যমে অনুপস্থিত চরিত্রের সঙ্গে কথোপকথনের ছলে এজাতীয় রূপকে ঘটনার অগ্রগতি সাধিত হয়। আকাশভাষিত হল এক বিশেষ অভিনয়কৌশল। রঙ্গমঞ্চে অন্য কোনো পাত্র না থাকা সত্ত্বে-ও একজন মাত্র নাটকীয় পাত্র যেন কোনো অনুক্ত বিষয় শ্রবণ করছেন, এরূপ ছল করে 'কিং ব্রবীষি' ইত্যাকার

বাক্যালাপের মাধ্যমে উক্তি ও প্রত্যুক্তি করে। অভিনয়ের এজাতীয় কৌশলকে-ই আকাশভাষিত বলা হয়। সাহিত্যদপর্ণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে –

"কিং ব্রবীষীতি যন্নাট্যে বিনা পাত্রং প্রযুজ্যতে।

শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যর্থং তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্ ॥"(সা.দ. ৬/১৪০)

এই আকাশভাষিতের মাধ্যমে ধূর্ত বা বিট চরিত্রটি নিজের অথবা বেশ্যা-তস্কর-দ্যূতকর প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ব্যক্তির অনুভূতির কথা ব্যক্ত করতে থাকেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বলা হচ্ছে, ভাণের নায়ক হবেন কেবলমাত্র একজন বিট –'যত্রোপবর্ণয়েদেকো নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ'(দশ.রূ ৩/৪৯) – ধূর্তচরিত্রের কোনো উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে না।

ভাণে অভিনয়কারী চরিত্র বিষয়ে নাটকলক্ষণরত্নকোশে সাগরনন্দী একটি অভিনব অভিমত পোষণ করেছেন।তাঁর মতে, ভাণ একজন নৃত্যনিপুণা নারীর দ্বারা সম্পাদিত হবে, কোনো পুরুষের দ্বারা নয়–"একয়া নায়িকয়া হার্যো ভাণঃ। ইহৈকাকিন্যা নার্যা হার্যো2ঙ্গহারিণ্যেতি" (না.ল.র একবিংশ অধ্যায়) –অর্থাৎ সাগরনন্দীর মত অনুসরণ করলে ভাণে ধূর্ত বা বিট –কোনো চরিত্রের-ই প্রসক্তি নেই।

অতএব দেখা গেল, ভাণে একটিমাত্র চরিত্রের দ্বারা বিবিধ অঙ্গভঙ্গিতে অদৃশ্যজনের সঙ্গে কথোপকথন চলে এবং এভাবে-ই এজাতীয় রূপকের বিষয়টি দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত হয়। ইংরাজী সাহিত্যে ' Dramatic Monologue' বলতে যা বোঝায়, ভাণের স্বরূপ ঠিক তাই।

ভাণ একটিমাত্র অঙ্কবিশিষ্ট এবং মুখ ও নির্বহণ – মাত্র এই দুটি সন্ধিসমন্বিত।একাঙ্ক, একহার্য এই ভাণের বৈশিষ্ট্যদৃষ্টে ডঃ. মানকড় ভাণকে সংস্কৃত রূপকের আদিমতম রূপ অর্থাৎ 'prototype' বলে মনে করেছেন।[২৩]

একাঙ্ক ভাণ ক্ষুদ্রায়তন হলে-ও, এতে দশপ্রকার লাস্যাঙ্গের সন্নিবেশ থাকবে। মধুর বা সুকুমার নৃত্যকে বলা হয় লাস্য। এই লাস্য মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে সঙ্গীতসহযোগে। লাস্যের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য সৃষ্টি করে বলে-ই নৃত্যের সহযোগী সঙ্গীতকে বলা হয় লাস্যাঙ্গ। সুতরাং লাস্য হল সঙ্গীতের ভেদ – 'লাস্যং হি নৃত্যগীতাদিব্যাপারবিশেষঃ'। নাট্যদর্পণে দশবিধ লাস্যাঙ্গের নামোল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল – গেয়পদ, স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিগূঢ়, সৈন্ধব, দ্বিগূঢ়ক, উত্তমোত্তমক এবং উক্তপ্রত্যুক্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণসম্মত লাস্যাঙ্গের তালিকাটি দশরূপকের অনুরূপ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিচিত্রপদ ও ভাবিত নামক অতিরিক্ত দু'প্রকার লাস্যাঙ্গ স্বীকার করে মোট বারো প্রকার লাস্যাঙ্গের লক্ষণ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

একটি আশ্চর্য বিষয় এখানে লক্ষণীয়। লাস্যাঙ্গকে বলা হচ্ছে ভাণের অপরিহার্য অঙ্গ। তাহলে এটি-ও স্বীকার করে নিতে হবে, একহার্য ভাণে একজন ধূর্ত বা বিট-কে একাকী-ই নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি যাবতীয় ব্যাপার সাফল্যপূর্বক অভিনয় করতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। এই অসঙ্গতির সমাধানকল্পে এরূপ চিন্তা করা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ গীত ও বাদ্য এই দুটি বিষয় মঞ্চের নেপথ্যে সাধিত হত; বিট বা ধূর্ত মঞ্চে কেবলমাত্র অঙ্গবিক্ষেপাদিরূপ নৃত্য প্রদর্শন করতেন, যা একা সম্পাদন করা সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, নাটকলক্ষণরত্নকোশে যে ভাণকে নারীপ্রযোক্তব্য বলা হয়েছে, তার কারণ-ও সম্ভবতঃ এই লাস্যাঙ্গপ্রয়োগের বিষয়টি । কারণ লাস্যাঙ্গগুলির বর্ণনায় দেখা যায়, এগুলি প্রধানতঃ নর্তকীর কর্ম। তাই হয়তো সাগরনন্দী এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, ভাণে একজন নারী-ই যাবতীয় রূপকীয় কার্য সম্পাদন করবেন।

ভাণে প্রযোক্তব্য রসবিষয়ে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, শৌর্যসৌভাগ্যাদির বর্ণনার কারণে বীর ও শৃঙ্গার-ই হল ভাণের প্রধান রস –'শৌর্যসৌভাগ্যবর্ণনাবাহুল্যেনাত্র বীরশৃঙ্গারয়োঃ প্রাধান্যম্'।[২৪] নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে কোনো বিশেষ নির্দেশ নেই। তবে অভিনবভারতী টীকায় বলা হয়েছে, ভাণের রস হবে অদ্ভুত। দশরূপক এবং সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বীর ও শৃঙ্গারকে-ই ভাণে প্রযোজ্য রস রূপে স্বীকার করা হয়েছে। উভয়ত্র-ই বলা হচ্ছে–'সূচয়েদ্বীরশৃঙ্গারৌ'। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, শৃঙ্গারাত্মক ও যথেষ্ট বিদ্রূপাত্মক হলে-ও, অন্যান্য নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ভাণে হাস্যরসের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র নাট্যদর্পণ গ্রন্থে ভাণে হাস্যকে-ও অঙ্গরসরূপে স্বীকার করা হয়েছে। টীকায় বলা হচ্ছে–'শৃঙ্গারাঙ্গত্বাৎ হাস্যো2প্যত্রাঙ্গতয়া বর্ণনীয়ঃ'।[২৫]

ভাণে কৈশিক্যাদি তিনপ্রকার বৃত্তির বিশেষ প্রয়োগ হবে না; ভাণ হবে প্রধানতঃ ভারতীবৃত্ত্যাশ্রিত। নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে –'ভারতী চাত্র বৃত্তিঃ প্রভূততয়া প্রধানম্'।[২৬] দশরূপকাদি গ্রন্থে এক-ই অভিমত পোষণ করা হয়েছে।সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হচ্ছে–'প্রায়েণ ভারতী, ক্বাপি কৌশিক্যপি বৃত্তির্ভবতি' (সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

এবার ভাণের আরেকটি অদ্ভুত চরিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হচ্ছে, ভাণে প্রধানতঃ বাক্‌প্রধান ভারতীবৃত্তি-ই থাকবে, কৌশিকী বৃত্তি থাকবে না, বা থাকলে-ও তার প্রয়োগপরিসর স্বল্প। অথচ ভাণে বিটের দ্বারা বর্ণিত বিষয় হল শৃঙ্গারাত্মক। নাট্যশাস্ত্রকার স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের বিংশ অধ্যায়ে রসানুসারে বৃত্তিভেদ করতে গিয়ে বলছেন –'শৃঙ্গারে চৈব হাস্যে চ বৃত্তিঃ স্যাৎ কৌশিকীতি সা' (না.শা. ২০/৭৩)– শৃঙ্গার ও হাস্যরসের ক্ষেত্রে বৃত্তি হবে কৌশিকী। সেই নিয়ম ভঙ্গ করে ভাণে কৌশিকীবিহীন শৃঙ্গার ও হাস্যের অবতারণা করা হচ্ছে। এটি বাস্তবিক-ই এক অদ্ভুত বিষয়।

এর সমাধানকল্পে একটি চিন্তা করা যেতে পারে। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে বলা হচ্ছে, কৌশিকী বৃত্তি নারী ব্যতিরেকে পুরুষ (যথাযথভাবে) প্রয়োগ করতে পারে না–'ন শক্যা পুরুষৈঃ সাধু প্রযোক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে' (না.শা. ১/৪৬) – এবং এই প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা অপ্সরাদের সৃষ্টি করলেন। বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রে ভাণের অভিনয়বিষয়ে যেহেতু একটি-ই মাত্র চরিত্র এবং সেটি পুরুষের, সেই কারণে শৃঙ্গাররসাত্মক হলে-ও নারীপ্রযোক্তব্য কৌশিকী বৃত্তি প্রয়োগ এখানে সম্ভবপর নয়।

এই বিষয়ে নাট্যদর্পণে একটি সুন্দর যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভাণে যেহেতু আকাশভাষিতের দ্বারা উক্তি-প্রত্যুক্তি মাধ্যমে সমগ্র অভিনয় ঘটানো হয়,মূলতঃ বাচিক প্রকারের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেই কারণে ভাণে বাক্প্রধান ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ-ই প্রয়োজন, কৌশিক্যাদির নয় – 'বীরশৃঙ্গারয়োঃ প্রধানত্বে2পি ব্যোমোক্ত্যা বাচিক এবাত্রাভিনয়ো ন সাত্ত্বিকাঙ্গিকাবিতি, ন সাত্ত্বতী কৌশিকী বা প্রধানম্'।[২৭] উল্লেখ করা যেতে পারে, আচার্য অভিনবগুপ্ত-ও তাঁর অভিনবভারতীতে ঠিক এই কারণটির-ই উল্লেখ করছেন – 'প্রহসনভাণয়োরপি বাগ্ব্যাপারপ্রাধান্যাদেব ভারতীবৃত্তিঃ' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

পরিশেষে কয়েকটি বিখ্যাত ভাণের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। 'পত্রলেখা', 'ললিতনাগর','লীলামধুকর','ধূর্তবিটসংবাদ'-'পদ্মপ্রাভৃতক'-'পাদতাড়িতক'-'উভয়াভিসারিকা' এই বিখ্যাত চর্তুভাণী, অর্বাচীন কালে বামন ভট্টবাণের 'শৃঙ্গারভূষণ',কাশীপতি কবিরাজের 'মুকুন্দানন্দ' ইত্যাদি।

প্রহসন ঃ

রূপকের অপর একটি ভেদ হল প্রহসন। প্রহসনের সঙ্গে ভাণের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অনেকখানি সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রথমে আসা যাক্ প্রহসনের বিষয়বস্তু আলোচনায়। প্রহসনে নানা নিন্দনীয় ব্যক্তির চরিত্র ও কার্যাবলী বিবৃত হবে এবং স্বাভাবিকভাবে-ই তা হবে কবিকল্পিত। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে– 'ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্' (সা.দ. ৬/২৬৪)। এজাতীয় রূপকে ভণ্ড তপস্বী, স্বধর্মচ্যুত ব্রাহ্মণ,চেট,বন্ধকী,স্বৈরিণী প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের অনর্থক দম্ভ ও অন্যান্য নিন্দনীয় দিকগুলি নিয়ে ঘটনার অগ্রগতি সাধিত হয়। বিশেষ এই যে , এই নিন্দার্হ বিষয়গুলি প্রচলিত অর্থাৎ লোকমুখে প্রচারিত সর্বজনজ্ঞাত কোনো বিষয় হয়ে থাকে। উদাহরণযোগে এই বিষয়টি নাট্যদর্পণে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন – বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ষে 'চৌর্য' অর্থাৎ পরধনহরণ অপেক্ষা স্ত্রীসম্পর্ক অধিকতর

গর্হণীয় । অতএব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চরিত্রের অন্ধকার দিকটির চিত্রণে লাম্পট্যের -ই উল্লেখ আসবে,চৌর্যের নয়। উল্লেখ্য, এই উদাহরণটি সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে গৃহীত।[২৮]

প্রহসনের বস্তু আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে–

"লোকোপচারযুক্তা যা বার্তা যশ্চ দম্ভসংযোগঃ।

স প্রহসনে প্রযোজ্যঃ .... ॥" (না.শা. ১৮/১০৬)

অতএব দেখা গেল, যে শ্রেণীর মানুষের যে দোষটি কুখ্যাত, প্রহসনে সেই সর্বজ্ঞাত নিন্দনীয় বিষয়টি এবং অন্যান্য দম্ভপ্রসূত কার্যাবলী নিয়ে ঘটনাপ্রবাহ চলতে থাকবে। বলা যেতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে শ্রেণীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'Class-character'এর স্খলন-ই প্রহসনের প্রধান উপজীব্য।

স্বাভাবিকভাবে-ই প্রশ্ন ওঠে, এরূপ নিম্নরুচির কাহিনী-আশ্রিত রূপকের রচনা ও অভিনয়ের প্রয়োজন কি? টীকায় বলা হচ্ছে, হীনপ্রকৃতির ব্যক্তিদের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ বিষয়ে জেনে তা থেকে সাবধান থাকা এবং এদের প্রতি মানসিক বিমুখতার ভাব উৎপাদন-ই প্রহসন রচনার উদ্দেশ্য –" বৈমুখ্যং বহুমানাভাবঃ কার্যং প্রয়োজনং যস্য। প্রহসনেন হি পাখণ্ডিপ্রভৃতীনাং চরিতং বিজ্ঞায় বিমুখঃ পুরুষো ন ভূয়স্তান্ বঞ্চকাননুসর্পতি"।[২৯]

প্রহসন সাধারণতঃ একাঙ্ক। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে, সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির প্রহসন দুটি অঙ্কে-ও রচিত হতে পারে। সন্ধিসংখ্যা ভাণের মত-ই মাত্র দুটি – মুখ ও নির্বহণ; সন্ধ্যঙ্গসমূহের প্রয়োগ-ও তদনুসারী।

হাস্যাত্মক হলে-ও, বাক্‌প্রধান প্রহসনে ভারতীবৃত্তি-ই অবলম্বনীয়, কৌশিকী নয়। সাহিত্যদর্পণে আরভটীবৃত্তি-ও যে প্রহসনে নিষিদ্ধ, তা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। লাস্যাঙ্গপ্রয়োগবিষয়ে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, প্রহসনে লাস্যাঙ্গসমূহের সামান্য প্রয়োগ হতে পারে।

প্রহসনের অঙ্গীরস হল হাস্য। পূর্বাপর সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ এ বিষয়ে সহমত। দশরূপকে এ-ও বলা হচ্ছে, মূলতঃ হাস্যরসাত্মক প্রহসনে হসিত-অপহসিত-উপহসিত-বিহসিত-অতিহসিত-অবহসিত – হাস্যের এই ষড়্‌বিধ রূপ-ই পূর্ণমাত্রায় সন্নিবিষ্ট হবে – 'রসস্ত ভূয়সা কার্যঃ ষড়্‌বিধো হাস্য এব তু'(দশ.রূ. ৩/৫৬)।নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে, নিন্দনীয় ব্যক্তিদের চরিত্রচিত্রণের কারণে শৃঙ্গারের মত উচ্চকোটিক, পরিশুদ্ধ, সহৃদয়-আস্বাদ্য রসের প্রয়োগ এখানে নিতান্ত অনুচিত; তাই হাস্য-ই প্রহসনের একমাত্র অঙ্গীরস–'নিন্দ্যপাখণ্ডিপ্রভৃতীনাং শৃঙ্গারস্যৌনৌচিত্যেনাভাবাৎ কেবলহাস্যবিষয়ত্বমেব'।[৩০]

প্রহসনে বীথ্যঙ্গপ্রয়োগের নির্দেশ রয়েছে। নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, এখানে ব্যাহারাদি ত্রয়োদশ প্রকার বীথ্যঙ্গের প্রয়োজনানুগ প্রয়োগ করা যেতে পারে। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে–'বীথ্যঙ্গৈঃ সংযুক্তং কর্তব্যং প্রহসনং যথাযথম্' (না.শা. ১৮/১০৭)। পরভাবী ধনঞ্জয়-ও এবিষয়ে সহমত। তবে দর্পণকারের মতে প্রহসনে বীথ্যঙ্গের সমাবেশ বাধ্যতামূলক নয়।

প্রহসনের নায়কের উপর ভিত্তি করে এর ভেদগুলির আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রমতে প্রহসন দুপ্রকার– শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। নাট্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে এই দুটি ভেদের কথা-ই আলোচিত হয়েছে। দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে আবার প্রহসনের ত্রৈবিধ্য স্বীকৃত হয়েছে।

আচার-আচরণের দিক থেকে নিন্দনীয় 'শাক্য' (অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী), 'ভগবত্তাপস' (অর্থাৎ শৈব সন্ন্যাসী), 'ব্রাহ্মণব্রুব' অথবা অন্যান্য এক-ই প্রকার গর্হণীয়, দুষ্ট ও ভণ্ড কোনো চরিত্র যে প্রহসনের নায়ক, তার নাম শুদ্ধ প্রহসন। ভগবত্তাপস পদটি নাট্যশাস্ত্রে-ও ব্যবহৃত। অভিনবভারতীতে এই পদের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে – 'যতিবাণপ্রস্থগৃহস্থাঃ' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)– অর্থাৎ সন্ন্যাসী এবং বাণপ্রস্থী গৃহস্থ। নাট্যদর্পণে এই পদটির কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি জন্মমাত্রে ব্রাহ্মণ,জাতিগতকর্মাশ্রয়ী নয়, এরূপ নিন্দিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণব্রুব-ও এইপ্রকার প্রহসনের নায়ক হতে পারেন। এই তালিকায় দশরূপকে ভণ্ড নির্গ্রন্থ অর্থাৎ জৈনদের উল্লেখ রয়েছে। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, এগুলি ব্যতীত অপরাপর কোনো দুষ্ট চরিত্র-ও শুদ্ধপ্রহসনের নায়ক হতে পারে। পরভাবী দর্পণকারের মতে, তপস্বী-সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে কোনো একজন ধৃষ্ট নায়ক যে প্রহসনের প্রধান চরিত্র, তার-ই নাম শুদ্ধ প্রহসন।

শুদ্ধ প্রহসনের চরিত্রগুলির বর্ণনায় বা সংলাপে অশ্লীলতা, গ্রাম্যতা, কোনো প্রকার বিকৃতি বা ব্রীড়াজনক কোনো বিবরণ থাকে না। অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে–'ভাষাচারৌ যত্র ন বিকৃতাবসত্যাশ্লীলরূপৌ' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)। কেবলমাত্র হাস্যকর উক্তি-প্রত্যুক্তি মাধ্যমে এইসব চরিত্রের নিন্দনীয় দিকগুলি উপহাসমুখে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়। অতএব হাস্যপ্রধান সংলাপ-ই হল শুদ্ধ প্রহসনের প্রাণ। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও বলা হয়েছে–'হাস্যকুশলৈরারব্ধম্'(না.ল.র.একবিংশ অধ্যায়)। এজাতীয় প্রহসনে বেশ্যাদি চরিত্রের উল্লেখ বা বিবরণ না থাকার কারণে নাট্যদর্পণে এগুলিকে 'শুদ্ধ' প্রহসন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দশরূপকসম্মত শুদ্ধপ্রহসনলক্ষণটি সামান্য অন্যরকম। তদনুসারে কোনো ভণ্ড তপস্বী, ব্রাহ্মণ, বিট কিংবা চেট যদি বিকৃত বেশভূষা ও হাস্যকর ভাষা ব্যবহার করে অভিনয় করে, তবে সেই প্রহসনকে বলা হয় শুদ্ধ।

অতঃপর সঙ্কীর্ণ প্রহসনের লক্ষণ। যে প্রহসনে বন্ধকী, স্বৈরিণী, চেট, বেশ্যা, পরস্ত্রী, ধূর্ত, বৃদ্ধ, 'ষণ্ঢ' অর্থাৎ নপুংসক, ভণ্ড ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চরিত্র নায়কের ভূমিকায় থাকে, তার নাম সঙ্কীর্ণ প্রহসন। এই চরিত্রগুলির অতি উগ্র বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারের বর্ণনা-ই এই জাতীয় প্রহসনের উপজীব্য। তবে এই বর্ণনা অবশ্য-ই হবে হাস্যোদ্দীপক উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ উল্লিখিত চরিত্রগুলির কোনো একটির বর্ণনা দিয়ে শুরু করে, প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রের স্বভাব ও কার্যাবলী বর্ণিত হতে থাকে।

সঙ্কীর্ণ প্রহসনের লক্ষণ বিষয়ে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে বৈমত্য পরিলক্ষিত হয়। মহর্ষি ভরতের মতে, যে প্রকার প্রহসনে বেশ্যা, চেট, নপুংসক, বিট, ধূর্ত ও বন্ধকীদের কাহিনী উপস্থাপিত হয় এবং অবিকৃত বেশভূষা ও আচার-আচরণ বর্ণিত হয়, তাকে সঙ্কীর্ণ প্রহসন বলে–

"বেশ্যাচেটনপুংসকবিটধূর্তা বন্ধকী চ যত্র স্যুঃ।

অবিকৃতবেশপরিচ্ছদচেষ্টিতকরণং তু সংকীর্ণম্ ॥"(না.শা. ১৮/১০৫)

আবার দশরূপককারের মতে, বীথ্যঙ্গের দ্বারা মিশ্রিত ও ধূর্তচরিত্রসংকুল প্রহসনকে সঙ্কীর্ণ প্রহসন বলা হয়ে থাকে –'...সঙ্করাদ্ বীথ্যা সঙ্কীর্ণং ধূর্তসংকুলম্' (দশ.রূ. ৩/৫৫)। অন্যদিকে দর্পণকার আবার ধৃষ্টনায়ক ব্যতীত অন্য কোনো নায়কসমন্বিত প্রহসনকে-ই সঙ্কীর্ণ প্রহসন রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

নাট্যদর্পণের টীকায় শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ প্রহসনের ভেদটি এইভাবে নির্ণীত হচ্ছে– সঙ্কীর্ণ প্রকারের প্রহসনে বন্ধকী প্রভৃতি কোনো একটি চরিত্রের দ্বারা কাহিনীর সূত্রপাত ঘটিয়ে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অনেক চরিত্রগুলির বর্ণনা করা হতে থাকে। বহু সংখ্যক চরিত্রের উপস্থাপনার কারণে-ই এটি সঙ্কীর্ণ প্রহসন–'বহূনাং চরিতৈঃ সঙ্কীর্ণত্বাৎ সঙ্কীর্ণম্'।[৩১] পক্ষান্তরে শুদ্ধ প্রহসনে ভণ্ড সন্ন্যাসী , অধার্মিক ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চরিত্রগুলির কোনো একটিমাত্রর বর্ণনা করা হতে থাকে, একাধিকের নয়, এই কারণে-ই এর নাম শুদ্ধ প্রহসন– 'শুদ্ধে তু পাখণ্ড্যাদেরেকস্যৈব চরিতং প্রহস্যত ইতি'।[৩২]

টীকায় প্রহসনের ভেদবিষয়ে অন্য দুটি অভিমতের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনোটির-ই প্রবক্তা আচার্যের নাম উল্লেখ করা হয়নি। একটি মতানুসারে স্বভাব-নিন্দনীয় নয়, এমন বৌদ্ধ বা শৈব সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের চরিত্রভ্রষ্টতা ও সাময়িক স্খলন যেখানে বর্ণনা করা হয়, সেটি হল শুদ্ধ প্রহসন। অন্যদিকে স্বভাব-বিগর্হিত বেশ্যা-চেট-বিট-নপুংসকাদি চরিত্রগুলির বিকৃত আচার-আচরণ যেখানে উপজীব্য বিষয়, তার নাম সঙ্কীর্ণ প্রহসন। দ্বিতীয় মতটি অনুসারে, শুদ্ধ প্রহসন হবে একাঙ্ক, কিন্তু সঙ্কীর্ণ প্রহসন একাধিক অঙ্কের দ্বারা নির্মিত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উক্ত দুটি মত-ই অভিনবভারতী টীকায় প্রহসন আলোচনার মধ্যে পাওয়া যায়।[৩৩]

দশরূপককার ধনঞ্জয় ও সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ 'বিকৃত' নামে আরেকটি ভেদের উল্লেখ করে প্রহসনের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থানুসারে নপুংসক, কঞ্চুকী অথবা তপস্বীরা কামুক ব্যক্তির বেশভূষা ও বাক্য ব্যবহার করলে বিকৃত প্রহসন হয়। অন্যদিকে সাহিত্যদর্পণে বলা হচ্ছে, যে রূপকে ক্লীব,কঞ্চুকী অথবা তপস্বীরা বিট, চারণ বা যোদ্ধার বেশ ও ভাষা অবলম্বনপূর্বক অভিনয় করে, তাকে বিকৃত প্রহসন বলা হয়। লক্ষণদৃষ্টে স্পষ্ট-ই বুঝতে পারা যাচ্ছে, বিকৃত প্রহসনকে অনায়াসে-ই সঙ্কীর্ণ প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। এই কারণে নাট্যশাস্ত্রাদি গ্রন্থে বিকৃত প্রহসন নামক তৃতীয় ভেদটি স্বীকার করা হয়নি। সাহিত্যদর্পণে তাই বিকৃত প্রহসনের লক্ষণ নির্দেশ করে-ও তারপর বলা হচ্ছে – 'ইদং তু সংকীর্ণেনৈব গতার্থমিতি মুনিনা পৃথঙ্নোক্তম্' (সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

নাট্যদর্পণের টীকায় প্রহসনের উপভোক্তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, হাস্যরসাত্মক লঘু প্রকৃতির রচনারীতির কারণে স্ত্রী-অল্পবয়স্ক-মূর্খ ইত্যাদি প্রকারের ব্যক্তিদের কাছে-ই এজাতীয় রচনার আবেদন। কারণ, ধর্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ-আশ্রয়ী নাটকাদি রূপকের রসাস্বাদনের যোগ্যতা এইসব অল্পধী ব্যক্তির থাকে না।

পরিশেষে কয়েকটি প্রহসনের নাম –(সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত) 'কন্দর্পকেলি', 'ধূর্তচরিত', 'লটকমেলক',(নাটকলক্ষণরত্নকোশে উল্লিখিত) 'শশিবিলাস', 'ভগবদজ্জুক' ইত্যাদি।

ডিম ঃ

নায়কের সংঘাতব্যাপারনিষ্ঠ রূপকের প্রকারের নাম ডিম। 'ডিম' শব্দটি সংঘাতার্থক। দশরূপকের অবলোকটীকায় বলা হচ্ছে–' 'ডিমঃ সঙ্ঘাতে' ইতি নায়কসংঘাতব্যাপারাত্মকত্বাড্ডিমঃ' (দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ)। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে–'ডিমো ডিম্বো বিপ্লব ইত্যর্থঃ, তদ্যোগাদয়ং ডিমঃ, ডিমেঃ সঙ্ঘাতার্থত্বাদিতি'।[৩৪] অভিনবভারতীতে এই পদটির অপর একপ্রকার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে –'অন্যে তু ড্যন্ত ইতি ডিমঃ উদ্ধতনায়কাস্তেষামাত্মনাং বৃত্তির্যত্রেতি' (না.শা.অষ্টাদশ অধ্যায়) – এজাতীয় রূপকে উদ্ধত স্বভাবের নায়কদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বৃত্তি অর্থাৎ আচরণের কারণে এই রূপকের এই নাম।

ডিমের কাহিনী হবে প্রসিদ্ধ কোনো ঘটনা। প্রসিদ্ধ বলতে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাসাদি প্রখ্যাত ইতিবৃত্তের কথা বলা হচ্ছে।

ডিমে মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-উপসংহৃতি – এই চারটি সন্ধি থাকবে, বিমর্শ সন্ধি থাকবে না। স্বাভাবিকভাবে-ই ডিম হবে চারটি অবস্থা সমন্বিত; বীজ-বিন্দু-পতাকা ও কার্য, প্রকরী থাকবে না।

ডিমের অঙ্কসংখ্যা হবে চারটি এবং এজাতীয় রূপকের ঘটনা চারদিনের মধ্যে সমাপ্ত হতে হবে–‘চতুর্দিননিবর্তনীয়....’।[৩৫]

নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, যুদ্ধাদির বর্ণনাযুক্ত এজাতীয় রূপকে অঙ্কাবতার-চূলিকা-অঙ্কমুখ–এই তিনপ্রকার অর্থোপক্ষেপকের নিবন্ধন কর্তব্য। অবশিষ্ট দু’প্রকার অর্থোপক্ষেপকের প্রয়োগবিষয়ে এখানে কিছু বলা হয়নি। পরভাবী বিশ্বনাথ অবশ্য তাঁর গ্রন্থে ডিমের আলোচনাবসরে বলেছেন, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের প্রয়োগ এখানে নিষিদ্ধ – ‘নেহ বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ’(সা.দ. ৬/২৪২)। একমাত্র শারদাতনয়রচিত ‘ভাবপ্রকাশন’ গ্রন্থে এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। তদনুসারে ডিম হবে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক সমন্বিত–‘সপ্রবেশকবিষ্কম্ভকশ্চতুরঙ্কো ডিমঃ স্মৃতঃ’(ভাব.প্র.অষ্টম অধিকার)।

ডিমে আশ্রয়ণীয় বৃত্তি বিষয়ে নাট্যদর্পণে কিছু বলা হয়নি । নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, যুদ্ধবহুল ডিমে সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তির প্রয়োগ হবে, ভারতী ও কৈশিকীর নয়। কিন্তু পরভাবী দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশাদি যাবতীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, ডিমে কৈশিকী ব্যতীত অপর তিনটি বৃত্তির-ই প্রয়োজনানুগ প্রয়োগ করা যাবে। এই বিশেষ প্রকারের রূপকটির মধ্যে মায়া-ইন্দ্রজাল-ক্রোধ-প্রচণ্ড সংগ্রাম-বাহুযুদ্ধ-চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ-উল্কাপাত প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার অদ্ভুত ও উত্তেজক ঘটনার উল্লেখ করা হবে।

দেবতা, অসুর ইত্যাদি হবে ডিমের নায়কচরিত্র। এর সঙ্গে-সঙ্গে টীকায় যক্ষ-রাক্ষস-মহানাগ ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়,ভূত-প্রেত-পিশাচাদি মনুষ্যেতর জাতির নায়কত্ব-ও স্বীকার করা হয়েছে। ডিমে বিবিধ কার্যে নিযুক্ত এই নায়কদের সংখ্যা সাধারণতঃ ষোলো প্রকার–‘প্রায়ঃ ষোড়শনায়কাঃ’ (না.শা. ২/২২)। ‘প্রায়’ পদটির প্রয়োগের দ্বারা নায়কসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য-ও দোষাবহ নয়–একথা সূচিত হচ্ছে। নাট্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, যেহেতু দিব্য বা অদিব্য উভয়প্রকার নায়কের ঔদ্ধত্যপূর্ণ রুদ্র আচরণ এজাতীয় রূপকের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, অতএব নায়করা হবেন ধীরোদ্ধত প্রকৃতির। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নায়কের ধীরোদাত্ততা-ও পরিলক্ষিত হয়। এ সকল নায়কদের বিভিন্ন অদ্ভুত ও উত্তেজনাপূর্ণ আচার-আচরণ ব্যভিচারিভাব-বিভাব-অনুভাবের দ্বারা পরিস্ফুট করা হয়ে থাকে।

নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে ডিমে শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গার ব্যতীত অপর ছয়টি রস অর্থাৎ বীর, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত, করুণ ও ভয়ানক রসের যথাযথ সন্নিবেশ করতে হবে।তবে রৌদ্ররস-ই হবে অঙ্গী বা প্রধানরস; অন্যগুলি অঙ্গ অর্থাৎ গৌণ। পূর্বাপর অন্যান্য আচার্যেরা সকলে-ই এ বিষয়ে সহমত।

নাট্যদর্পণের টীকায় ডিমে প্রযোক্তব্য রস বিষয়ে যে আলোচনা রয়েছে, তা এখানে যথাসম্ভব উপস্থাপিত করা হচ্ছে।....... প্রথমে-ই রসকে দু’ভাগে ভাগ করা হচ্ছে–সুখাত্মক ও দুঃখাত্মক।

করুণ-রৌদ্র-ভয়ানক-বীভৎস এই চার প্রকার হল দুঃখাত্মক। অবশিষ্ট শৃঙ্গার-হাস্য-বীর-শান্ত-অদ্ভুত এই পাঁচটি রস হল সুখাত্মক । দুঃখাত্মক রসগুলির স্বরূপ ব্যাখ্যাপূর্বক বলা হচ্ছে–মর্ত্য মানুষের প্রতি অবজ্ঞা থেকে রৌদ্ররসের, অত্যধিক ক্রোধ থেকে ভয়ানকরসের, মর্ত্য মানুষদের অশুচি শরীরাদি অবলোকনে বীভৎসরসের এবং অভীষ্ট বস্তুর বিয়োগ বা বিরহ থেকে করুণরসের উৎপত্তি।এগুলির কোনোটিই সুখাবহ নয়, অতএব এগুলি দুঃখাত্মক। যেহেতু ডিম হল দিব্যনায়কবহুল রূপক, তাই সেই দিব্য নায়কদের চরিত্রচিত্রণে অথবা তাঁদের ভক্তদের চরিত্রবর্ণনায় দুঃখাত্মক রসগুলির প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। কারণ সুখবাহুল্য-ই হল দিব্যনায়কের প্রধান লক্ষণ; এজাতীয় দুঃখাত্মক রসের প্রয়োগে সেই লক্ষণ দোষযুক্ত হয়। টীকায় বলা হচ্ছে – 'দিব্যানাং চ সুখবাহুল্যেনাল্পদুঃখত্বাদন্যথা দিব্যত্বমেব ন স্যাদিত্যেষাং তৎপ্রভাবানুগৃহীতানামন্যেষাং দুঃখাত্মানো রসা অপ্রযোজ্যা এব' ।[৩৬]

স্পষ্ট-ই প্রতীত হচ্ছে এই অংশটি যথেষ্ট স্ববিরোধী। প্রথমে-ই বলা হয়েছে, ডিমে বীর-রৌদ্র-বীভৎস-অদ্ভুত-করুণ ও ভয়ানক রসের প্রয়োগ করতে হবে। আবার এই অংশে বলা হচ্ছে, দিব্যনায়কের ক্ষেত্রে দুঃখাত্মক রসের প্রয়োগ করা যাবে না। অথচ দেখা যাচ্ছে, নাট্যদর্পণসম্মত ডিমে প্রযোজ্য ছয়টি রসের মধ্যে চারটি-ই দুঃখাত্মক। এই বিস্তৃত ও জটিল বিবরণটি এজাতীয় স্ববিরোধিতার কারণে প্রায় অর্থহীন রূপে প্রতিভাত হয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ডিমের উদাহরণরূপে 'ত্রিপুরদাহ', 'বৃত্রোদ্ধরণ','নরকোদ্ধরণ' (বা 'তারকোদ্ধরণ') এগুলির নাম করা যেতে পারে।

উৎসৃষ্টিকাঙ্ক ঃ

উৎসৃষ্টিকাঙ্ক (কোথাও কোথাও অঙ্ক নামে অভিহিত) হল রূপকের অন্যতম একটি ভেদ। এইপ্রকার রূপকের কাহিনীর সিংহভাগ নিয়ে থাকে দুঃখার্ত স্ত্রীজনদের বিলাপ। তাই নাট্যদর্পণে উৎসৃষ্টিকাঙ্ক পদটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে বলা হচ্ছে – 'উৎক্রমণোন্মুখা সৃষ্টির্জীবিতং যাসাং তা উৎসৃষ্টিকাঃ শোচন্ত্যঃ স্ত্রিয়স্তাভিরঙ্কিতত্বাদুৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ'[৩৭] – নিজ-নিজ স্বামীপুত্রগণের যুদ্ধাদিতে পরাজয় অথবা মৃত্যুর কারণে শোকবশতঃ যাদের প্রাণ প্রায় নির্গত হওয়ার উপক্রম, এজাতীয় স্ত্রীদের করুণ বিলাপ দ্বারা নির্মিত হওয়ার কারণে এই রূপকটির এই নাম। উল্লেখ্য, এই ব্যুৎপত্তিটি অবিকলরূপে অভিনবভারতীতে উপলব্ধ।

দশরূপকে বলা হয়েছে যে, নাটকের দৃশ্যাত্মক অঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ার কারণে এই রূপককে বলে উৎসৃষ্টিকাঙ্ক। অবলোকটীকায় ধনিক বলছেন – 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক ইতি নাটকান্তর্গতব্যবচ্ছেদার্থম্'(দশ.রূ.৩/৭২)। অন্যদিকে দর্পণকার প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের মতের উল্লেখ করে

বলেছেন, বিলোমরূপা সৃষ্টিকে উল্লঙ্ঘন করে বলে এই রূপককে বলা হয় উৎসৃষ্টিকাঙ্ক –‘উৎক্রান্তা বিলোমরূপা সৃষ্টির্যত্রেত্যুৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ’ (সা.দ.ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। মিতভাষিণী টীকায় আরো বিস্তৃতভাবে পদটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটি এখানে উল্লেখ করা হল –“ উৎক্রান্তা উদ্‌গতা বিলোমরূপা নাটকাদীনাম্ অঙ্কাৎ পৃথক্‌রূপা সৃষ্টিরাবির্ভূতির্যত্র স উৎসৃষ্টিকঃ। ‘প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপশ্চেতি’ বহুব্রীহিসমাসঃ। ‘শেষাদ্ বিভাষা’ ইতি কপ্। উৎসৃষ্টিকশ্চাসৌ অঙ্কশ্চেতি উৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ”।[৩৮]

উৎসৃষ্টিকাঙ্কের কাহিনী হবে প্রসিদ্ধ; রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদি থেকে এর উপাদান সংগৃহীত হবে। নাট্যকার স্বীয় প্রতিভাবলে সেই কাহিনীকে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করবেন। তবে নাট্যশাস্ত্রে এবং নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে, উৎসৃষ্টিকাঙ্কের কাহিনী একান্তভাবে কবিকল্পিত-ও হতে পারে। অর্থাৎ এজাতীয় রূপকের কাহিনী প্রখ্যাত অথবা কল্পিত দুপ্রকারের-ই হতে পারে–এ বিষয়ে কোনো বিশেষ নিয়ম নেই। অভিনবভারতীতে তাই বলা হচ্ছে– ‘তেনোভয়োপাদানস্য পরস্পরবিরুদ্ধার্থত্বাদকিঞ্চিৎকরত্বং নাশঙ্কনীয়ম্’ (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

করুণরসপ্রধান উৎসৃষ্টিকাঙ্কে নায়ক হবেন মর্ত্য মানুষ।দেবতাদের সুখবহুল জীবনে করুণরসের স্থান নেই,তাই এজাতীয় রূপকে কোনো দিব্যচরিত্র নায়ক হতে পারবেন না। নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে–“পুমাংসো মর্ত্যা অত্র স্বামিনো ন দিব্যা দুঃখাত্মকস্য করুণরসস্যাত্র প্রাধান্যাৎ। দিব্যানাং চ সুখবাহুল্যেন তৎসম্বন্ধাযোগাৎ”।[৩৯]

উৎসৃষ্টিকাঙ্কে সন্ধির সংখ্যা দুটি –মুখ ও নির্বহণ। ঘটনা একদিনের মধ্যে সমাপ্য এবং সেই কারণে এটি একটিমাত্র অঙ্কবিশিষ্ট।

উৎসৃষ্টিকাঙ্কের অঙ্কসংখ্যা বিষয়ে প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আচার্য ভরতের মতে এই রূপকে একটি-ই মাত্র অঙ্ক, আচার্য কোহলের মতে দু’টি, আবার ব্যাস, আঞ্জনেয় প্রমুখ প্রাচীনেরা এটিকে তিন অঙ্কের রূপক বলে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন আচার্যদের এই অভিমত শারদাতনয়ের ‘ভাবপ্রকাশনে’ উল্লিখিত হয়েছে–

“অস্যাঙ্কমেকং ভরতো দ্বাবঙ্কাবিতি কোহলঃ।
ব্যাসাঞ্জনেয়গুরবঃ প্রাহুরঙ্কত্রয়ং যদা ॥”(ভাব.প্র.৮/১৯৩)

উৎসৃষ্টিকাঙ্কের অঙ্গীরস হল করুণ। এজাতীয় রূপকে স্ত্রীদের বিলাপের বহুল বর্ণনা থাকে। যুদ্ধাশ্রয়ী ইতিবৃত্তের বিবিধপ্রকার দুঃখদায়ী ঘটনা, যথা – বধ-বন্ধন-ইষ্টজনের মৃত্যু-অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। যদি-ও এজাতীয় রূপকে বাগ্‌যুদ্ধ এবং পারস্পরিক দোষোদ্ঘাটনমূলক তুমুল তর্কাতর্কির সন্নিবেশ থাকে, তবু এই বাগ্‌যুদ্ধের মধ্যে-ও অনেকখানি অনুশোচনার অংশ মিশ্রিত

থাকার কারণে এই অংশে রৌদ্ররসের প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। তাই উৎসৃষ্টিকাঙ্ক নামক রূপকটি একান্তভাবে করুণরসাশ্রয়ী।

উৎসৃষ্টিকাঙ্কে বর্ণনীয় বিষয়গুলির বিশদ আলোচনা করা হয়েছে নাট্যদর্পণের টীকায়। এজাতীয় রূপকে প্রচুর পরিমাণে নির্বেদ অর্থাৎ খেদোক্তি থাকবে। তার সঙ্গে দেবতাদের প্রতি ক্রোধ তথা অভিশম্পাত, স্বকৃত কার্যের নিন্দা ইত্যাদি নানাপ্রকার অনুশোচনামূলক বাক্য এবং বহুল পরিমাণে স্ত্রীজনদের বিলাপ থাকে। এর সঙ্গে থাকে বিভিন্ন পুরুষচরিত্রের বধ-বন্ধন-তাড়ন-প্রচণ্ড প্রহার ইত্যাদির বর্ণনা। স্ত্রীসমূহের ভূমিতে পতন, অবলুণ্ঠন, মস্তক আবর্তন, কপালে আঘাত করা, কেশ-উৎপাটন ইত্যাদি প্রচণ্ড উত্তেজনাব্যাকুল নানাবিধ কার্যের বর্ণনা থাকে।

উৎসৃষ্টিকাঙ্কের বিলাপ ও নানারকম বিশৃঙ্খল-বিপর্যস্ত কার্যকলাপ কেবলমাত্র স্ত্রীচরিত্রগুলির দ্বারা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এখানে নায়ক ও অন্যান্য পুরুষ চরিত্রগুলি মর্ত্য হলে-ও মহনীয়। কারণ, চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে-ও অথবা শত্রুর কাছে পর্যুদস্ত হয়ে-ও এরা কখনো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন না এবং পুনরায় বিজয় প্রাপ্ত হন। অতএব এই মহান চরিত্রগুলির চিত্তস্থৈর্য্য-ই এজাতীয় রূপকের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়।

উৎসৃষ্টিকাঙ্কের বৃত্তি হবে ভারতী। কারণ স্পষ্ট। এজাতীয় রূপকের মূল বর্ণনীয় বিষয় হল স্ত্রীজনদের বিলাপ, অন্যথায় পরস্পরকে দোষারোপ করে প্রবল বাগ্‌যুদ্ধ। এখানে যুদ্ধ বর্ণিত হয় বাক্যের সাহায্যে, এমনকি যুদ্ধের জয়-পরাজয়-ও বর্ণিত হয় বাক্‌চাতুর্যের মাধ্যমে।অতএব বাক্‌প্রধান উৎসৃষ্টিকাঙ্কের আশ্রয়ণীয় বৃত্তি অবশ্য-ই হবে ভারতী। নাট্যশাস্ত্রে তাই বলা হচ্ছে – '...... সাত্ত্বত্যারভটীকৈশিকীহীনঃ'(না.শা. ১৮/৯৬)। পরভাবী দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে-ও এক-ই কথা বলা হয়েছে। কেবলমাত্র নাটকলক্ষণরত্নকোশে একটু পৃথক অভিমত ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, উৎসৃষ্টিকাঙ্কে ভারতীর সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বতী বৃত্তির-ও প্রয়োগ করা যাবে, আরভটী ও কৈশিকী এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ – 'আরভটীকৈশিকীবিহীনঃ'(না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

উল্লেখযোগ্য একটি উৎসৃষ্টিকাঙ্কের নাম হল –'শর্মিষ্ঠা-যযাতি'।

ঈহামৃগ ঃ

এবার ঈহামৃগ নামক রূপকভেদের আলোচনা করা হচ্ছে । এজাতীয় রূপকের এই নামকরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকায় বলা হচ্ছে, এই রূপকে মৃগীর ন্যায় অলভ্যা নায়িকাকে নায়ক অন্বেষণ করেন বলে রূপকটি ঈহামৃগ নামে অভিহিত–'ঈহা চেষ্টা মৃগস্যেব স্ত্রীমাত্রার্থাত্রেতীহামৃগঃ'।[৪০] ব্যাখ্যাটি অভিনবভারতী টীকা থেকে অবিকলভাবে গৃহীত। পরভাবী সাহিত্যদর্পণে ও দশরূপকের

অবলোকাখ্য টীকায় বিশদে বলা হচ্ছে–‘মৃগবদলভ্যাং নায়িকাং নায়কো2স্মিন্নীহতে ইতীহামৃগঃ’(দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ)।

ঈহামৃগ জাতীয় রূপকে কাহিনী হবে মিশ্রিত। নাট্যকার প্রখ্যাত ইতিবৃত্তের সঙ্গে কল্পিত বৃত্তান্তের সংযোজনের দ্বারা এই জাতীয় কাহিনী রচনা করবেন।

ঈহামৃগে সন্ধির সংখ্যা তিনটি– মুখ, প্রতিমুখ ও নির্বহণ; গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধির এখানে প্রয়োগাবসর নেই। এ বিষয়ে পূর্বাপর সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ সহমত।

ঈহামৃগের অঙ্কসংখ্যা বিষয়ে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে,এতে এক থেকে চারটি পর্যন্ত অঙ্ক থাকতে পারে।অঙ্কসংখ্যা সম্পূর্ণরূপে নাট্যকারের কাহিনীবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।কাহিনীর বিস্তার ক্ষুদ্র হলে একাঙ্ক; বৃহৎ হলে চতুরঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। একাঙ্ক হলে নাটকের ঘটনা একদিনের মধ্যে সমাপ্য হতে হবে, চতুরঙ্ক পর্যন্ত হলে ঘটনাকাল চারদিন পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। পরভাবী দশরূপককার, দর্পণকারদের মতে ঈহামৃগে অঙ্কসংখ্যা চার । সাহিত্যদর্পণে প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববিদ্দের একটি মত উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কারো-কারো মতে ঈহামৃগের অঙ্কসংখ্যা হবে মাত্র একটি । উল্লেখ্য,আচার্য অভিনবগুপ্ত-ও তাঁর টীকাতে ঈহামৃগকে একাঙ্ক বলে স্বীকার করেছেন।

অতঃপর ঈহামৃগের নায়ক। এবিষয়ে নাট্যদর্পণে মহর্ষি ভরতের মত-ই অনুসৃত হয়েছে। তদনুসারে ঈহামৃগ হবে ‘দিব্যপুরুষাশ্রয়কৃতো....’ (না.শা. ১৮/৭৪)।নাট্যদর্পণে-ও বলা হচ্ছে, দিব্য কোনো পুরুষ হবেন ঈহামৃগের প্রধান নায়ক। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে উদ্ধত, তেজোদীপ্ত মর্ত্যপুরুষরা থাকতে পারেন। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে বলা হচ্ছে, কোনো মানুষ অথবা দেবতা ঈহামৃগের নায়ক ও প্রতিনায়করূপে উপস্থাপিত হবেন; তবে এ বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নায়ক ও প্রতিনায়ককে প্রখ্যাত এবং ধীরোদ্ধত গুণসম্পন্ন হতে হবে। শারদাতনয় তাঁর ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে এক-ই অভিমত পোষণ করে বলেছেন –‘ধীরোদ্ধতশ্চ প্রখ্যাতো দিব্যো মর্ত্যো2থ নায়কঃ’ (ভাব.প্র.অষ্টম অধিকার)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও বলা হচ্ছে, ঈহামৃগের নায়ককে হতে হবে প্রসিদ্ধ কোনো পুরুষ ; তিনি দিব্য বা মর্ত্য যেকোনো প্রকারের হতে পারেন।

নাট্যদর্পণে ঈহামৃগের নায়কসংখ্যাবিষয়ে অভিনবভারতী অনুসরণে বলা হচ্ছে, এজাতীয় রূপকে সাধারণতঃ বারোজন নায়ক থাকেন–‘প্রায়ো দ্বাদশনায়কঃ’ (না.দ.২/২৬)। ‘প্রায়’ পদটি গ্রহণের দ্বারা এই সংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য দূষণীয় নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। দশরূপক বা সাহিত্যদর্পণে ঈহামৃগের প্রধান নায়কের সংখ্যা বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে, এজাতীয় রূপকে নায়কপক্ষীয়-প্রতিনায়কপক্ষীয় মিলে মোট দশজন উদ্ধতলক্ষণযুক্ত দেবতা বা মানব পতাকানায়ক থাকবেন । সাহিত্যদর্পণে প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববিদ্দের একটি মত উল্লেখপূর্বক

বলা হচ্ছে, কোনো কোনো পূর্বাচার্যের মতে এজাতীয় রূপকে নায়কসংখ্যা হবে ছয়জন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য সাগরনন্দী-ও ঈহামৃগকে 'ষণ্নায়কঃ'(না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়) বলে অভিহিত করেছেন।

ঈহামৃগের নায়করা যেহেতু সকলে-ই উদ্ধত ও তেজস্বী পুরুষ, অতএব তাদের কার্যকলাপ বর্ণনাবসরে প্রধানতঃ রৌদ্র,বীর ইত্যাদি দীপ্তরসের প্রয়োগ হবে।এ বিষয়ে অপরাপর গ্রন্থগুলিতে বিশেষ কোনো নির্দেশ নেই। কেবলমাত্র নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হচ্ছে, ঈহামৃগ হবে ছয়টি রসসমন্বিত; তবে এই ছয়টি রস কি কি তা বলা হয়নি। এজাতীয় রূপকে প্রতিনায়ক তাঁর প্রতি অনাসক্ত কোনো দিব্যাঙ্গনাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক অপহরণ করে নিজের কামলালসা চরিতার্থ করেন। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে এখানে শৃঙ্গাররসাভাস বর্ণিত হয়। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রসাভাসের লক্ষণ নির্ণয় করে বলা হচ্ছে–'অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্ব আভাসো রসভাবয়োঃ'(সা.দ. ৩/২১৯)– অর্থাৎ অনৌচিত্য সত্ত্বে-ও রস ও ভাব বর্তমান থাকলে রস ও ভাবের আভাস হয় । অতএব ঈহামৃগে অনাসক্ত নায়িকাকে বলপূর্বক আকৃষ্ট করার চেষ্টায় শৃঙ্গাররসাভাস বর্ণিত হয়। নাট্যদর্পণের টীকায় সমাসতঃ বলা হয়েছে– 'অনুচিতা রতিঃ রত্যাভাসঃ স চ প্রতিনায়কস্য নিষ্প্রেমস্ত্রীবিষয়ত্বাদিতি'।[৪১]

ঈহামৃগজাতীয় রূপকের কাহিনীতে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই। প্রতিনায়ক তার প্রতি অনাসক্ত কোনো দিব্যস্ত্রীকে অপহরণ করে এবং তার-ই ফলশ্রুতিতে নায়ক ও প্রতিনায়কের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। দিব্যস্ত্রীর কারণে-ই এখানে অপহরণ, সাম-দানাদির দ্বারা বন্ধুস্থানীয় দুই পক্ষের মধ্যে ভেদস্থাপন, বন্ধনাদি দণ্ডপ্রদান ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পর্ধা- আবেগ-উত্তেজনাদির বর্ণনা করা হয়ে থাকে। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে বলা হচ্ছে, প্রতিপক্ষের ক্রোধ উৎপাদন বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধ পূর্ণমাত্রায় সংঘটিত হলে-ও কোনো না কোনো প্রকারে যুদ্ধ নিবৃত্ত হবে।নাট্যদর্পণে যুদ্ধনিবারণের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে যুদ্ধের শেষে বধযোগ্য অন্যায়কারী ব্যক্তিকে-ও বধ করা যাবে না– এমন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে সেই ব্যক্তি ছলনার দ্বারা পলায়ন করতে পারেন; কিন্তু বধ কখনো-ই প্রদর্শিত হবে না। মঞ্চে তো নয়-ই, এমনকি নেপথ্যে-ও ব্যক্তির বধের বর্ণনা করা যাবে না। দশরূপকে বলা হচ্ছে, কোনো মহাত্মা ব্যক্তি বধযোগ্য হলে-ও কিংবা পুরাণাদিতে হত বলে বর্ণিত হলে-ও, এজাতীয় রূপকে সেই ঘটনা প্রদর্শিত হবে না– 'বধপ্রাপ্তস্য কুর্বীত বধং নৈব মহাত্মানঃ' (দশ. রূ.৩/৭৫)।

ঈহামৃগের কাহিনী একাধিক অঙ্কে বিন্যস্ত হলে অঙ্কগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বদ্ধতা থাকবে, সমবকারের মত অসম্বদ্ধ হবে না। অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে – 'দিব্যানুপ্রবেশাৎ সমবকারবৎ

অসংবদ্ধার্থতা মা প্রসাংজ্ঞীদিত্যাহ সুবিহিতেন সংশ্লিষ্টেন বস্তুনা নিবদ্ধঃ’ (না.শা.অষ্টাদশ অধ্যায়)। কাহিনীর সুসম্বদ্ধতা নির্মাণ করা সহজ হয় বীথ্যঙ্গপ্রয়োগের দ্বারা। তাই নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, ঈহামৃগে ব্যাহারাদি বীথ্যঙ্গসমূহের যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে হবে।

ঈহামৃগে কৈশিকী ব্যতীত অপর তিনটি বৃত্তি ব্যবহৃত হবে। এ বিষয়ে সকলে-ই সহমত।

ঈহামৃগের উদাহরণ– ‘কুসুমশেখরবিজয়’ (সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত)‘ঊর্বশীমদন’ (নাটকলক্ষণরত্নকোশে উল্লিখিত) ইত্যাদি।

বীথী ঃ

নাটকাদি একাদশপ্রকার রূপক লক্ষণ আলোচনার শেষে দ্বাদশতম রূপভেদ বীথী বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, বক্রোক্তি অর্থাৎ শব্দার্থের বক্রতাকে (যেন) মার্গরূপে ব্যবহার করে সন্নিবেশের কারণে এই রূপকের এই নাম – ‘বক্রোক্তিমার্গেন গমনাদ্ বীথীব বীথী’।[৪২] আবার দশরূপকে বলা হচ্ছে, রূপকের এই ভেদটি নানা রস ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা যুক্ত থাকার কারণে মার্গসাদৃশ্যবশতঃ বীথী নামে অভিহিত। পরভাবী দর্পণকার-ও বলেছেন– ‘বীথীব নানারসানাং চাত্র মালারূপতয়া স্থিতত্বাদ্ বীথীয়ম্’ (সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। ডঃ.কীথ-ও মন্তব্য করেছেন – ‘It is suggested that the several sentiments are gathered into it as into a garland.’[৪৩]

বীথীর আলোচনা রূপকসমূহের সবার শেষে কেন করা হচ্ছে? বলা হচ্ছে, সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে বক্রোক্তির অসাধারণ ও অসংখ্য সমাবেশ,তার সাথে ত্রয়োদশ প্রকার বীথ্যঙ্গের প্রয়োগ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য বীথী নাটকাদি রূপকসমূহের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মর্যাদায় উজ্জ্বল। এই কারণে-ই বীথীর আলোচনা সবার শেষে, বিশেষ গুরুত্ব আরোপপূর্বক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অভিনবভারতী টীকায় এক-ই ভাবে নাট্যশাস্ত্রে সর্বান্তে বীথীর আলোচনাকে সমর্থন করা হয়েছে।[৪৪]

বীথী একাঙ্ক। এর ইতিবৃত্তের আকার ক্ষুদ্র ও একদিনের মধ্যে সমাপনীয়।এটি মুখ ও নির্বহণ – কেবলমাত্র এই দুটি সন্ধিবিশিষ্ট। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে, বীথীতে বীজ-বিন্দু-কার্য –এই তিনপ্রকার অর্থপ্রকৃতির প্রয়োগ হবে। দশরূপকে বলা হয়েছে, এটি প্রস্তাবনার দ্বারা যুক্ত হবে এবং প্রস্তাবনার উদ্‌ঘাত্যক প্রভৃতি ভেদের যে কোনো একটি সন্নিবিষ্ট হবে–‘যুক্তা প্রস্তাবনাখ্যাতৈরঙ্গৈরুদ্‌ঘাত্যকাদিভিঃ’ (দশ.রূ. ৩/৬৯)।

বীথীর নায়ক বিষয়ে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, বীথীতে উত্তম-মধ্যম-অধম তিন প্রকার নায়ক-ই থাকতে পারবেন। এই বিষয়ে আচার্য কোহলের মতটি নাট্যদর্পণের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কোহলাচার্যের মতে–

“উত্তমাধমমধ্যাভির্যুক্তা প্রকৃতিভিস্ত্রিধা।

একহার্যা দ্বিহার্যা বা সা বীথীত্যভিসংজ্ঞিতা ॥”

উল্লেখ্য ,নাট্যশাস্ত্রে-ও আচার্য কোহলের এই মতটি প্রায় অবিকলভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ নাট্যদর্পণে আচার্য শঙ্কুকের অভিমতের-ও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মতে, কোনো অধমপ্রকৃতির পাত্র বীথীর নায়ক হতে পারবেন না। কিন্তু নাট্যদর্পণকাররা তাঁর এই মতের বিরোধিতাপূর্বক বলছেন, ভাণ-প্রহসনের মতন হাস্যরসপ্রধান রূপকে বিটাদি নীচচরিত্রের নায়কত্ব স্বীকার করার পর, বীথীতে এজাতীয় চরিত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা একেবারে-ই যুক্তিসহ নয়– ‘শঙ্কুকস্ত্বধমপ্রকৃতের্নায়কত্বমনিচ্ছন্ প্রহসনভাণাদৌ হাস্যরসপ্রধানে বিটাদের্নায়কত্বং প্রতিপাদয়ন্ কথমুপাদেয়ঃ স্যাৎ।’ [৪৫]

বীথী একহার্য অথবা দ্বিহার্য। নাট্যশাস্ত্র থেকে শুরু করে অর্বাচীন কালের সাহিত্যদর্পণাদি পর্যন্ত প্রায় যাবতীয় গ্রন্থে বীথীর এই বৈশিষ্ট্যটি স্বীকার করা হয়েছে। দুজন পাত্র থাকলে বক্রোক্তিবহুল বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তিদ্বারে ঘটনার অগ্রগতি হবে আর একজন পাত্র থাকলে আকাশভাষিতের দ্বারা ঘটনানির্বাহ হবে। বীথীতে পাত্রসংখ্যা কত হবে,একজন না দুজন, সেটি একান্ত ভাবে নাট্যকারের ইচ্ছাধীন।

এবিষয়ে সাগরনন্দীর মতটি পার্থক্যের কারণে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর মতে বীথীর প্রয়োগ হয় তিনজন পাত্রের দ্বারা– ‘সা চ ত্রিভিঃ পাত্রৈঃ প্রযোক্তব্যা’(না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)। এখানে আরো বলা হচ্ছে, বীথীতে উত্তম, মধ্যম ও অধম – এই তিন প্রকার নায়িকা-ও থাকবেন।

বীথীতে প্রযোক্তব্য রসবিষয়ে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, এজাতীয় রূপকে সর্বপ্রকার রসের অল্পবিস্তর প্রয়োগ থাকে । নাট্যশাস্ত্রে-ও বীথীর লক্ষণ আলোচনায় এটিকে ‘সর্বরসলক্ষণাঢ্যা’ (না.শা. ১৮/১১২) বলা হয়েছে। দশরূপকে বলা হয়েছে, বীথীর অঙ্গীরস শৃঙ্গার হলে-ও, অন্যান্য রসের-ও স্পর্শ থাকবে। আবার অবলোকটীকায় ধনিক বলেছেন, শৃঙ্গাররস পূর্ণমাত্রায় না থাকায় এটি সূচ্য, তাই অপরাপর রসগুলিকে-ও অল্পমাত্রায় সন্নিবেশিত করতে হবে–‘বিশেষতস্তু রসঃ শৃঙ্গারো2পরিপূর্ণত্বাদ্ ভূয়সা সূচ্যঃ, রসান্তরাণ্যপি স্তোকং স্পর্শনীয়ানি’(দশ.রূ.তৃতীয় প্রকাশ)। টীকায় উক্ত ‘শৃঙ্গাররস পূর্ণমাত্রায় না থাকা’-র বিষয়টি এখানে খুব স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে দর্পণকারের মতে,

বীথীতে প্রচুর ভাবে শৃঙ্গাররসের এবং অল্পভাবে অন্যান্য রসের সূচনা থাকবে– 'সূচয়েদ্ ভূরি শৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসান্ প্রতি' (সা.দ. ৬/২৫৪)।

নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, বীথীতে খুব অল্প পরিমাণে কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ থাকবে। যদি-ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধান অনুসারে শৃঙ্গার ও হাস্যরসে কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ-ই উচিৎ; কিন্তু বীথীতে শৃঙ্গার ও হাস্যের সামান্য প্রয়োগ সূচিত হওয়ার কারণে কৈশিকীবৃত্তিকে প্রধানভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যেটুকু প্রণিধেয়, তা হল, বক্রোক্তিবহুল বীথীতে ভাষাচারুত্বের কারণে ভারতীবৃত্তির অধিক প্রয়োগ হবে। বিষয়টি যথেষ্ট-ই যুক্তিসহ। লক্ষণে বলা হয়েছে, বীথীতে সর্বপ্রকার রসের প্রয়োগ হয় এবং এই সবকটি রসের প্রয়োগ হবে একটি-ই মাত্র অঙ্কের পরিসরে। অতএব বলা বাহুল্য, যে এজাতীয় রূপকে শৃঙ্গাররস এতখানি প্রধান ভাবে থাকতে পারে না, যার দ্বারা কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ প্রধানভাবে হতে পারে। বরং তৎপরিবর্তে বক্রোক্তিপ্রধান, চারুবাক্ বীথীতে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ-ই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে শৃঙ্গারবহুল হওয়ার কারণে বীথীকে কৈশিকীবহুল বলা হয়েছে। অন্যদিকে দশরূপককার স্বয়ং বীথ্যঙ্গগুলিতে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ স্বীকার করেছেন। অতএব সর্বথা বিচারে বীথীতে কৈশিকীবৃত্তির স্বল্পতার অভিমতটি-ই বেশি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।

ডঃ. মানকড় ভাণ ও বীথীর মধ্যে নানাপ্রকার সাদৃশ্যের অবতারণা করে, ভাণ থেকে বীথীর উৎপত্তি এইরূপ মত পোষণ করেছেন। উক্ত দুটি রূপক-ই একাঙ্ক, একহার্য, দুটিতে-ই আকাশভাষিতের প্রয়োগ হয়। পার্থক্য কেবল এই বিষয়ে যে, বীথী ভাণের মত স্থূল চরিত্রের নয়। বরং বীথীতে অনেক বেশি মাত্রায় পরিশীলিত হাস্যাদি রসের প্রয়োগ পাওযা যায়। তাই ডঃ. মানকড়ের এই ধারণা হয়তো অমূলক নয়। হয়তো নাট্যচর্চার ইতিহাসে নিম্নবর্গীয় ভাণজাতীয় রূপক থেকেই পরবর্তীকালে পরিশীলিত-পরিমার্জিত বীথীর উদ্ভব। ডঃ. মানকড়ের ভাষায় – "Thus the nature of Vithi, as described in our extant dramaturgical works is transparent enough to show how it has developed from a type like Bhana. Take out two characters and Uttamadi heros and you have Bhana and add to Bhana these two features and you have Vithi." [৪৬]

বীথীর উদাহরণরূপে শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশনে 'বকুলবীথী' এবং 'ইন্দুলেখা' নামক রূপকদ্বয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে – 'যথা বকুলবীথী স্যাদিন্দুলেখাদয়ো যথা' (ভাব.প্র.অষ্টম অধিকার) ।

বীথীর তেরোপ্রকার অঙ্গ রয়েছে। সেগুলি হল – ব্যাহার, অধিবল, গণ্ড, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, অসৎপ্রলাপ, বাক্‌কেলী, নালিকা, মৃদব, উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত এবং অবস্যন্দিত।এবার একে-একে এই তেরোটি বীথ্যঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে –

১. ব্যাহার – ব্যাহার নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'অন্যার্থা ভাবিদৃষ্টির্বা ব্যাহারো হাস্যলেশগীঃ' (না.দ.২/৩১) – প্রস্তুত বিষয়ের অতিরিক্ত অন্য কোনো প্রয়োজন সাধনে অথবা ভবিষ্যৎ কোনো ঘটনার সূচনায় হাস্যরসাত্মক যে বীথ্যঙ্গের প্রয়োগ হয়, তার নাম ব্যাহার। বিবিধ প্রকার অর্থ বহনের কারণে এই বীথ্যঙ্গটির এরূপ নাম। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে – 'বিবিধো2র্থ আহ্রিয়তে2নয়েতি ব্যাহারঃ'।[৪৭]

দশরূপকে ব্যাহারের (নাট্যদর্পণোক্ত) ভাবী বিষয়ের ইঙ্গিতের ব্যাপারটির উল্লেখ নেই। দশরূপককারের মতে, অন্যার্থযুক্ত এবং হাস্য ও লোভ উদ্রেককারী বাক্যের নাম ব্যাহার। শৃঙ্গারপ্রকাশ এবং ভাবপ্রকাশনে-ও এক-ই ভাবে ব্যাহারের লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। দর্পণকারের মতে, অন্যার্থবিশিষ্ট এবং হাস্য ও ক্ষোভ উদ্রেককারী বাক্যের নাম ব্যাহার – 'ব্যাহারো যৎ পরস্যার্থে হাস্যক্ষোভকরং বচঃ'(সা.দ.৬/২৬৩)।

অন্যার্থবিশিষ্ট ব্যাহারের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' রূপকের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে বিদূষক, গণদাস প্রমুখের কথোপকথনটি সুবিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে –

বিদূষকঃ – ''ভোদী! চিট্ঠ দাব, বিসুমরিদং খু বো কিংচিতং তাব পুচ্ছিস্‌সং। গণদাসঃ – বৎসে! তিষ্ঠ তাবদুপদেশবিশুদ্ধৌ গমিষ্যসি।

(মালবিকা স্থিতা)

ধারণী – গোদমবয়ণং পি অজ্জো হিয়এ প্রমাণীকরেদি!

গণদাসঃ – দেবি! মা মৈবম্। দেবপ্রত্যয়াৎ সম্ভাব্যতে সূক্ষ্মদর্শী গৌতমঃ। পশ্য – মন্দো2প্যমন্দতাং যাতি সংসর্গেণ বিপশ্চিতঃ।

পঙ্কচ্ছিদঃ ফলস্যেব নিকর্ষেণাবিলং পয়ঃ ॥

(বিদূষকং বিলোক্য) – কিং বিবক্ষিতমার্যস্য ?

বিদূষকঃ – পঢমং দাব পেক্‌খগে পুচ্ছ। পচ্ছা জো মএ কমভেদো লক্‌খিদো, তং ভণিস্‌সং।

গণদাসঃ – ভগবতি! গুণো বা দোষো বা যথাদৃষ্টমভিধীয়তাম্ ।

পরিব্রাজিকা – যথা মে দর্শনং, তথা সর্বমনবদ্যম্ ।

গণদাসঃ – দেবঃ কথং মন্যতে?

রাজা – বয়মপি স্বপক্ষং প্রতি শিথিলাভিমানাঃ সংবৃত্তাঃ।

গণদাসঃ – দেব! অদ্য নর্তয়িতা2স্মি।

ধারণী – দিট্‌ঠিয়া পেক্‌খগারাধণেন।(গণদাসমবলোক্য) অজ্জো বড়ঢদি।

গণদাসঃ – দেবীপরিগ্রহো মে বৃদ্ধিহেতুঃ। (বিদূষকং বিলোক্য) বদেদানীং , যৎ তে মনঃ কর্ষতি।

বিদূষকঃ – পঢমোবদেসদংসণে পঢমংবংভণস্‌স পূযা ইচ্ছিদব্বা, সা তএ লংঘিদা।

পরিব্রাজিকা – অহো! প্রয়োগাভ্যন্তরঃ প্রশ্নঃ। ''

(সর্বে প্রহসন্তি, মালবিকা স্মিতং করোতি চ)

– লাস্যাবসানে মালবিকার নৃত্যশিক্ষা যে বিশুদ্ধ, তা প্রমাণ না করে তিনি যেতে পারবেন না – বিদূষকের এই উক্তিতে নৃত্যাচার্য গণদাস শঙ্কিত হয়ে নৃত্যের ত্রুটি জানতে চাইলেন।বিদূষকের বক্তব্য হল, প্রথমে-ই বিধেয় ব্রাহ্মণপূজা না করে মালবিকা নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। এভাবে নায়িকা মালবিকার গমনে বাধা দিয়ে বিদূষক নায়ক অগ্নিমিত্রের পক্ষে নায়িকাকে অধিক সময় দর্শনের সুযোগ করে দিচ্ছেন। বিদূষকের এই হাস্যোদ্রেককারী এবং অন্য প্রয়োজনের সাধনরূপ এই উক্তি ব্যাহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নাট্যদর্পণধৃত ব্যাহারের ভবিষ্যৎ ঘটনা সূচনার বিষয়টি নাট্যশাস্ত্রে-ও উক্ত হয়েছে। কারিকায় যদি-ও বলা হচ্ছে – 'প্রত্যক্ষবৃত্তিরুক্তো ব্যাহারো হাস্যলেশার্থঃ'(না.শা. ১৮/১২৫), কিন্তু অভিনবগুপ্তাচার্যের মতে, এই প্রত্যক্ষ হল ভাবী প্রত্যক্ষ – 'প্রত্যক্ষবৃত্তিরিতি প্রত্যক্ষশব্দেন ভাবী প্রত্যক্ষ উচ্যতে '(না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)। এই প্রকারের ব্যাহারের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'রত্নাবলী' নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি উপন্যস্ত হয়েছে –

''উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচিং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণাদ্
আয়াসং শ্বসনোদ্‌গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাং ধ্রুবং
পশ্যন্ কোপবিপাটলদ্যুতিং মুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্ ॥''

– উল্লিখিত শ্লোকে সহাস্য বচনদ্বারে রাজা উদয়ন কর্তৃক বাসবদত্তাদর্শনরূপ ভাবী ঘটনার সূচনা থাকায় এটি ব্যাহারের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে অন্য একটি অভিমতের উল্লেখপূর্বক বলা হচ্ছে, কোনো-কোনো আচার্যর মতে, বর্তমানপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত কোনো বস্তু বা ঘটনার হাস্যরসাত্মক বর্ণনার নাম ব্যাহার। উল্লেখ্য, এই মতটি সম্ভবতঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশপ্রণেতা আচার্য সাগরনন্দীর। তত্রধৃত ব্যাহারলক্ষণে বলা হচ্ছে, প্রত্যক্ষানুভবজনিত এমন কিছুর ভাষণ-ই ব্যাহার, যাতে স্বল্প হাস্যের উদ্রেক হয় – 'প্রত্যক্ষানুভবরূঢ়ো ব্যাহারো হাস্যলেশকৃৎ'(না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে এই প্রকার ব্যাহারের দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি 'মৃচ্ছকটিকম্' থেকে–

(বসন্তসেনায়াঃ মাতরং দৃষ্টা) বিদূষকঃ – " কা এসা বংধুলা?

চেটী – এসা অজ্জুআএ জণণী অত্তিয়া।

বিদূষকঃ – জদি মরে তা সীয়ালসহস্সস্স পজ্জত্তিকা। অথ কিং এদং পবেসিয় দুবারসোহা নিম্মবিদা? আদু উক্খংদাব ণ পবেসিদা?

চেটী – অয্য! মা এত্তিয়ং অন্নেক্খসু, অত্তিকা চাউত্থিএণ বাধীয়দি।

বিদূষকঃ – ভয়বং চাউত্থিয়! মং পি বংভণং অণুকংপেহি।"

দ্বিতীয়টি 'নলবিলাস' থেকে –

লম্বস্তনীকাপালিকীং প্রতি বিদূষকঃ – "একং দাব মে সংসয়ং ভংজেহি। মহ বংভণীএ মায়া থুলকুট্টণী, জা পাডলিপুত্তে বসদি, সা কিং তুমং? আদু অন্না কা বি?"

– উল্লিখিত দুটি উদাহরণে-ই প্রত্যক্ষানুভূত বিষয়বিশেষের হাস্যাত্মক বিবরণের কারণে এগুলি ব্যাহারের উদাহরণ।

২. অধিবল – নাট্যদর্পণধৃত অধিবললক্ষণটি হল – 'মিথো জল্পে স্বপক্ষস্য স্থাপনা2ধিবলং বলাৎ' (না.দ. ২/৩১) – উক্তি-প্রত্যুক্তিদ্বারে বিহিত দুই ব্যক্তির কথোপকথনাবসরে একজন ব্যক্তি যখন প্রজ্ঞাদিবলে তাঁর অভিমতটিকে-ই বিশেষভাবে ও সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তা অধিবল নামক বীথ্যঙ্গের বিষয় হয়। 'অধিবল' পদটির ব্যুৎপত্তিতে নাট্যদর্পণে তাই বলা হচ্ছে– 'অধিকবলসম্বন্ধাদধিবলম্' [8b] ।অভিনবভারতীতে এই পদটির বিস্তৃততর ব্যাখ্যায় এই এক-ই কথা বলা হয়েছে – 'যত্রোক্তিপ্রত্যুক্তিক্রমে ক্রিয়মাণে পরস্পরপ্রজ্ঞানোপজীবনবলাৎ স্বপক্ষসুঘটিতাদধিকবলসংবন্ধাদধিবলম্' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে 'কৃত্যারাবণ' এবং 'রঘুবিলাস' থেকে অধিবলের দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রথমটির উল্লেখ করছি –

সীতাবেশধারিণ্যা শূর্পণখয়া সহ সংবাদে (নেপথ্যে) – "হা ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! পরিত্রায়স্ব মাং পরিত্রায়স্ব।

(ইতি শ্রুত্বা শূর্পণখা মোহমুপগতা)

তস্যাং চ মূঢ়ায়াং লক্ষ্মণঃ – আর্যে! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

শূর্পণখা (অক্ষিণী উন্মীল্য সক্রোধং সহসা চ) – আ! অণজ্জ! অজ্জ বি তুমং চিট্ঠসি য্যেব । অহো! দাণি সি তুমং নিস্সংসো নিগ্ঘিণো য! চিট্ঠদু দাব ভাদুয়-সিণেহো, কধ ণাম ইক্খাউকুলসংভবেণ

মহাখত্তিএণ ভবিয় এবং তএ ববসিয়ং? ণং ভণামি, এবমক্কংদংতো সত্তু বি ন উবেক্খীয়দি, কিং পুণ অজ্জউত্তো?

লক্ষ্মণঃ – আর্যে! ননু ত্বদর্থম্ এবার্যেণ স্থাপিতো2স্মি।

শূর্পণখা – কুমার! এবং মম অত্থো কদো হোদি। এবং চ অহং পরিরকিখদা হোমি। তা সব্বধা অন্নং য্যেব দে অণিট্ঠং অভিপ্পায়ং লক্খেমি।''

– উল্লিখিত অংশে লক্ষ্মণ ও শূর্পণখার কথোপকথনে শূর্পণখা স্বীয় যুক্তিজালে লক্ষ্মণের মতামত খণ্ডন করে নিজ অভিমত স্থাপন করছেন। এটি অধিবলের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে, দুজন নাটকীয় পাত্রের সংলাপকালে যখন একজনের উক্তি অপরজনের উক্তিকে অতিক্রম করে যায়, তখন অধিবল নামক বীথ্যঙ্গ হয় –

''পরবচনমাত্মনশ্চোত্তরোত্তরসমুদ্ভবং দ্বয়োর্যত্র।

অন্যোন্যার্থবিশেষকমধিবলমিতি তদ্ বুধৈর্জ্ঞেয়ম্ ॥''(না.শা. ১৮/১২২)

আচার্য সাগরনন্দী-ও এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করেন । তাঁর মতে, যেখানে এক-ই বস্তুর বিশেষণরূপে কথিত নিজের এবং অন্যের উক্তির একটি অপরটিকে অতিক্রম করে যায়, তাকে অধিবল বলা হয়–

''উত্তরোত্তরসম্ভূতমাত্মনশ্চ পরস্য চ।

বিদ্যাদধিবলং বাক্যমেকবস্তুবিশেষণম্ ॥'' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে অধিবলের লক্ষণ বিষয়ে অপর একটি অভিমতের উল্লেখ করা হয়েছে, যদনুসারে স্পর্ধাপূর্বক পরস্পরের আতিশয্যপূর্ণ বাগ্ব্যবহারের নাম অধিবল– 'কেচিত্তু 'অন্যোন্যবাক্যাধিক্যোক্তিঃ স্পর্ধয়াধিবলং ভবেত্' ইতি পঠন্তি।'[৪৯]এই মতটি সন্দেহাতীতভাবে দশরূপক থেকে উল্লিখিত । নাট্যদর্পণকাররা তত্রধৃত অধিবললক্ষণটি আক্ষরিকভাবে উদ্ধার করেছেন। পরভাবী ভাবপ্রকাশনকার, দর্পণকার প্রমুখ-ও পারস্পরিক স্পর্ধিত বাগ্ব্যবহারকে অধিবল নামে অভিহিত করেছেন।

অধিবল নামক এই বীথ্যঙ্গটিতে চমৎকৃতিপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি দেখা যায়। বীররসের ব্যঞ্জনায় এবং বিবরণে এই বীথ্যঙ্গটি উপযোগী।

৩. গণ্ড – গণ্ড নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'গণ্ডো2কস্মাদ্ যদন্যার্থ প্রস্তুতানুগতং বচঃ' (না.দ. ২/৩২) – প্রস্তুত বা বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অথচ ভিন্নার্থবোধক, সহসা উপস্থাপিত বিষয় হল গণ্ড ।

'গণ্ড' পদটির ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে– 'দুষ্টার্থগর্ভত্বাৎ দুষ্টশোণিতগর্ভগণ্ড ইব গণ্ডঃ'[৫০] – 'দুষ্ট' অর্থাৎ কষ্টকর বা পীড়াদায়ক কোনো বস্তু বা ঘটনার সূচনার

কারণে এই বীথ্যঙ্গের এরূপ নাম। যেমনভাবে দুষ্ট শোণিতপূর্ণ কোনো 'গণ্ড' অর্থাৎ ব্রণ পীড়াপ্রদ হয়, তেমনি ভাবে কোনো কষ্টদায়ক ভাবী ঘটনার পূর্বাভাসের কারণে এই বীথ্যঙ্গটিকে গণ্ড নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এই ব্যুৎপত্তিটির নির্ধারণকালে নাট্যদর্পণকাররা অভিনবভারতীর অনুসরণ করেছেন।

নাট্যদর্পণে 'উত্তররামচরিত', 'সত্যহরিশচন্দ্র' এবং 'বালিকাবঞ্চিতক' – এই তিনটি রূপক থেকে গণ্ডের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথম উদাহরণটি হল–

রামঃ (সীতামালোক্য)–

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং বাহুঃ কণ্ঠে শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ ॥

প্রতীহারী – দেব! উঅত্থিদো।

রামঃ – অয়ি! কঃ?

প্রতীহারী – দেবস্‌স আসন্নপরিচারও দুম্মুহো।"

– 'উত্তররামচরিত' নাটকে সীতাপতি রামচন্দ্রের পক্ষে অসীম প্রেমাস্পদ প্রিয়তমা সীতার বিরহ অতি অসহনীয় । রামচন্দ্রের এই প্রেমবিহ্বলতার সময় প্রতীহারী এসে দুর্মুখ নামক গুপ্তচরের আগমনবার্তা নিবেদন করল। এই দুর্মুখের উপস্থিতি সীতাপরিত্যাগের পূর্বাভাস। এভাবে শ্রীরামের প্রেমাতিশয্য বর্ণনাকালে সহসা সীতাবিসর্জনরূপ ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণার কারণে এটি গণ্ড নামক বীথ্যঙ্গের উদাহরণ।

'বালিকাবঞ্চিতক' নামক রূপক থেকে গৃহীত উদাহরণটি একটি বিশেষ কারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন–

কংসঃ –

"রিষ্টস্তাবদুদগ্রশৃঙ্গবিকটঃ শৈলেন্দ্রকল্পো বৃষঃ
সপ্তদ্বীপসমুদ্রজস্য পয়সঃ শোষক্ষমা পূতনা।
কেশী বাজিতনুঃ খুরৈর্বিঘটয়েতাপন্নগান্মেদিনীং
সার্ধং বন্ধুভিরেবমূর্জিতবলং কঃ কংসমাস্কন্দতি ॥"

(নেপথ্যে)

জো অন্নও পসূও অন্নেণ য বড্‌ঢিও মহুপ্পহবো।

কণ্হো সো পরউট্‌ঠো মারেই ন কোই ধারেই ॥''

– উল্লিখিত উদাহরণটিতে রঙ্গমঞ্চে প্রবিষ্ট পাত্র কংসের কথার উত্তরে নেপথ্য অর্থাৎ যবনিকার অন্তরাল থেকে জনৈক পাত্রের দ্বারা অনিষ্টার্থসূচনার কারণে নাট্যদর্পণে এটিকে 'চূলিকা গণ্ড' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

গণ্ডলক্ষণনির্ণয়ে নাট্যদর্পণকাররা সম্ভবতঃ দশরূপকের অনুসরণ করেছেন। দশরূপকধৃত গণ্ডলক্ষণটি হল – 'গণ্ডঃ প্রস্তুতসম্বন্ধিভিন্নার্থং সহসোদিতম্' (দশ.রূ. ৩/১৮) – অর্থাৎ একটি বিষয় বর্ণিত হচ্ছে, এমতাবস্থায় তৎসম্বদ্ধ অথচ ভিন্নার্থবোধক বিষয়ান্তরের আকস্মিক উপস্থিতির নাম গণ্ড। উল্লেখ্য, ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে-ও গণ্ডের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে গণ্ডের কয়েকটি প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে, এক অর্থে কথিত একজনের বাক্যের অন্যার্থকরণের নাম গণ্ড । দুজনের আলাপের সময় পরস্পরের বাক্য মিলে যে ইষ্ট বা অনিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তার-ও নাম গণ্ড। কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশের প্রয়োজনে বাক্যকৌশলের দ্বারা দ্ব্যর্থক বাক্যে ঐ বিষয়টিকে গোপন করে অন্য কোনো বিষয়ের নির্দেশকে বলা হয় দ্ব্যর্থগণ্ড। শব্দকে ভেঙে অন্বয় করার ফলে যে সকল ক্ষেত্রে বাক্যের দ্ব্যর্থতা ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়, তার নাম লেশগণ্ড ।[৫১]

গণ্ড আলোচনায় একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। নাট্যদর্পণসম্মত চতুর্থ প্রকার পতাকাস্থান (বা নাট্যশাস্ত্রাদিপ্রোক্ত তৃতীয় প্রকার পতাকাস্থান) এবং গণ্ড নামক বীথ্যঙ্গ – এই দুটি নাট্যকৌশলের মধ্যে চরিত্রগত যথেষ্ট সাদৃশ্য অনায়াসলক্ষ্য । এদের পার্থক্য মাত্র দুইটি –

প্রথমতঃ, গণ্ডে সর্বদা একটি আকস্মিকতার উপাদান থাকে,চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানে যা অনুপস্থিত এবং

দ্বিতীয়তঃ, পতাকাস্থানের দ্বারা রূপকাদির সাধ্যবস্তুর অগ্রগতিতে কোনো-না-কোনো প্রকার উপকার সাধিত হয়। গণ্ডে তা তো হয়-ই না , উপরন্তু গণ্ডের মধ্যে কোনো ভাবী বিঘ্ন বা দুর্দৈবের ইঙ্গিত লুক্কায়িত থাকে। শৃঙ্গারপ্রকাশে আচার্য ভোজদেব পতাকাস্থান ও গণ্ডের এই প্রভেদটি প্রাঞ্জলরূপে বিবৃত করেছেন – ''তচ্চ পতাকাস্থানকস্যাপি আগামিবস্তুসূচনাত্মকত্বাৎ ততো2স্য কো ভেদঃ ? উচ্যতে। পতাকাস্থানকেন ধর্মাদের্নাটকশরীরভূতস্য সাধ্যস্য বস্তুনঃ সাধনভূতানামুপক্ষেপঃ ক্রিয়তে। অতএব তদ্‌বিঘ্নভূতানামিতি বিশেষঃ'' (শৃ. প্র. একাদশ অধ্যায়)।

৪. প্রপঞ্চ – প্রপঞ্চ নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল– 'প্রপঞ্চঃ সস্তবং হাস্যং মিথো মিথ্যালাভকৃত্' (না.দ. ২/৩২)– দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন স্তুতিযুক্ত হাস্যপরিহাসমূলক এবং অসত্য

কথোপকথন চলে এবং পরিণামে তা যেকোনো একজনের পক্ষে লাভকারী হয়, সেইরূপ বচনকে প্রপঞ্চ নামক বীথ্যঙ্গরূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

প্রপঞ্চের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'রত্নাবলী' থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উপন্যস্ত করা হয়েছে–

রাজা কদলীগৃহে চিত্রগতাং সাগরিকাং পশ্যন্ সুসঙ্গতায়া দর্শনে ফলকং প্রচ্ছাদ্য তামাহ – ''সুসঙ্গতে! কথমিহস্থো ভবত্যা জ্ঞাতঃ?

সুসঙ্গতা – ভট্টা! ন কেবলং তুবং, সমং চিত্তফলএণ সব্বো বৃত্তংতো মএ জাণিদো; তা গড়ুয় দেবীএ নিবেদয়িস্সং।

বসন্তকঃ (অপবার্য)– ভো! সব্বং সংভবীয়দি। মুহরা খু এসা গব্ভদাসী, তা কিংচি দইয় পরিদোসেহি ণং।

রাজা – (সুসঙ্গতায়া অলকান্ প্রমার্জয়ন্) সুসঙ্গতে! ক্রীড়ামাত্রমেবৈতত্, তথাপি নাকারণেন ত্বয়া দেবী খেদয়িতব্যা। ইদং চ তে পারিতোষিকম্ ।(ইতি কর্ণাভরণং দদাতি)

সুসঙ্গতা – (প্রণম্য সস্মিতম্) ভট্টা! পসাদো মে কণ্ণাভরণেন।''

– উল্লিখিত উদাহরণে 'দেবীএ নিবেদয়িস্সং' ইত্যাদি অংশে হাস্য, 'ভট্টা! পসাদো' ইত্যাদি অংশে স্তুতিসহিত বচন এবং সামগ্রিকভাবে রাজার পক্ষে চিত্রে সাগরিকাসঙ্গমরূপ লাভের কারণে এটি প্রপঞ্চের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উল্লেখ্য, সুসঙ্গতার কর্ণাভরণপ্রাপ্তি এই রূপকের প্রধান সাধ্যের অংশভূত নয় বলে তা লাভরূপে পরিগণিত হবে না।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে প্রপঞ্চের আরেকটি লক্ষণের উল্লেখ করা হচ্ছে– 'কেচিত্তু 'অসদ্ভূতেন পারদার্যাদিনৈপুণ্যাদিনা যো2ন্যোন্যস্তবো হাস্যহেতুঃ' তং প্রপঞ্চমাহুঃ'[৫২] – অর্থাৎ কোনো কোনো আচার্যের মতে, পরস্ত্রীলোলুপতাদি অসত্যজাত যে পারস্পরিক প্রশংসা, তার নাম প্রপঞ্চ। উল্লেখ্য, এই প্রপঞ্চলক্ষণটি দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। প্রপঞ্চের দশরূপকধৃত লক্ষণটি হল – 'অসদ্ভূতং মিথঃ স্তোত্রং প্রপঞ্চো হাস্যকৃন্মতঃ' (দশ.রূ. ৩/১৫)। কারিকাস্থ 'অসদ্ভূত' কথাটির অর্থ নির্ণয়ে অবলোককার ধনিক বলছেন – পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপতাদি অসৎ আচরণকে-ই 'অসদ্ভূত' পদের দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে – 'অসদ্ভূতেনার্থেন পারদার্যাদিনৈপুণ্যাদিনা...' (দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ)।

দশরূপকের এই প্রপঞ্চলক্ষণটি অনেকাংশে নাট্যশাস্ত্রানুসারী। বিশেষ এই যে, নাট্যশাস্ত্রে (প্রপঞ্চে) কোনো এক পক্ষের লাভের বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে, দশরূপকে যা করা হয়নি –

''যদসদ্ভূতং বচনং সংস্তবযুক্তং দ্বয়োঃ পরস্পরং যত্তু ॥

একস্য চার্থহেতোঃ স হাস্যজননঃ প্রপঞ্চঃ স্যাৎ ।'' (না.শা. ১৮/১২০,১২১)

পরবর্তীকালে ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে প্রপঞ্চলক্ষণনির্ণয়াবসরে দশরূপকের-ই অনুসরণ করা হয়েছে।

এজাতীয় প্রপঞ্চের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে রাজশেখর বিরচিত 'কর্পূরমঞ্জরী' নামক সট্টক জাতীয় উপরূপকের একটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে–

"রংডা চংডা দিক্‌খিদা ধম্মদারা মজ্জং মংসং খজ্জএ পিজ্জএ বা।

ভিক্‌খা ভোজ্জং চম্মখংডং চ সেজ্জা কোলো ধম্মো কস্‌স নো ভাদি রম্মো ॥"

– উল্লিখিত উদাহরণে কাপালিক ভৈরবানন্দ তাঁর উক্তির মাধ্যমে কলিকালের ধর্মের যে প্রশংসা করেছেন, তা বস্তুতঃ অসদাচরণ; এই অসদ্‌ভূত প্রশংসা সকলের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে, অতএব এটি প্রপঞ্চ নামক বীথ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে প্রপঞ্চের আরো একটি লক্ষণের কথা বলা হচ্ছে – 'অন্যে তু 'দ্বয়োর্লাভং বিনা মিথ্যারূপং হাস্যং সংস্তবযুক্তং' প্রপঞ্চত্বেন মন্যন্তে' [৫৩]– অর্থাৎ কোনো-কোনো আচার্যের মতে, স্তুতিবচনযুক্ত, হাস্যরসাত্মক অসত্য আলাপ, যাতে কোনো পক্ষের-ই কোনো লাভ বা প্রাপ্তি নেই, তাকে প্রপঞ্চ বলা হয়। এই মতের প্রবক্তা আচার্য কে, তা অনুমান করা দুষ্কর।

নাট্যদর্পণে এজাতীয় প্রপঞ্চের উদাহরণরূপে 'প্রয়োগাভ্যুদয়' রূপকের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে–

তরঙ্গদত্তকচেটী– "অম্মো! অয়ং খু এসো সংচারিমং উবহাসপট্টণং অয্যভংডীরবো ইদো য্যেবাগচ্ছদি।'

বিদূষকঃ (উপসৃত্য)–ভোদী! সাগদং তে।

চেটী (স্বগতম্) – পরিহাসইস্‌সং দাধ ণং। (প্রকাশম্) কো দাণি এসো অম্হ ণং পেসণয়ারও চেটউ ত্তি।

বিদূষকঃ – অহং ঘডদাসীণং সামিগো।

চেটী – কিং চেটউ ত্তি ভণিদে কুবিদো তুমং?

বিদূষকঃ – কো দাণিং বিসেসো ঘডদাসীণং কুংভদাসীণং চ?

চেটী – মাং কুপ্প, ভট্টউত্তো ত্তি ভণিস্‌সং।

বিদূষকঃ – ভোদী! তুবং পি মা কুপ্প, অজ্জা ইতি ভণিস্‌সং ।

চেটী – অহো! ভট্টউত্তস্‌স মদী।

বিদূষকঃ – অহো ! অদিরুআ আজ্জয়া।"

– উল্লিখিত উদাহরণটি 'ভট্টপুত্র', 'আর্যা' ইত্যাদি স্তুতিবচনযুক্ত। এটি হাস্যরসাত্মক অসত্য একটি আলাপচারিতা এবং এতে বিদূষক বা চেটীর কারুর-ই কোনো প্রাপ্তি নেই; অতএব এটি-ও প্রপঞ্চের উদাহরণ।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে প্রপঞ্চের পরিবর্তে 'অঞ্চিত' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। আচার্য সাগরনন্দীর মতে, অনেক অর্থের সূচনা-ই অঞ্চিত অথবা শিষ্টপদের ব্যবহার-অন্বিত স্থল-ই হল অঞ্চিত – 'নানার্থানামুপক্ষেপো2ঞ্চিতং, শিষ্টানি যত্র পদানি তদ্বাঞ্চিতম্' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)। এই গ্রন্থে অপর একটি অভিমতের উল্লেখপূর্বক বলা হচ্ছে, কোনো-কোনো আচার্যের মতে, পরস্পরের নিকট এক-ই কার্যের জন্য অস্তিত্ববিহীন কোনো বিষয় সম্পর্কে দুজন ব্যক্তির প্রশংসাবহুল হাস্যকর আলাপর নাম প্রপঞ্চ।[58] সাগরনন্দী এই অভিমতের প্রবক্তা আচার্যর নামোলেখ করেননি।

৫. ত্রিগত – 'ত্রিগতং শব্দসাম্যেন ভিন্নস্যার্থস্য যোজনম্' (না.দ. ২/৩৩) – এই হল ত্রিগত নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। শ্লেষাদি অলঙ্কারের দ্বারা এক-ই শব্দের প্রস্তুত অর্থ ব্যতিরিক্ত অন্যার্থকল্পনের নাম ত্রিগত।

ত্রিগতের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' রূপকের একটি বিস্তৃত অংশ উপন্যস্ত হয়েছে–

রাজা –"প্রতিষ্ঠোক্তিষু ন খল্বহং ত্বাং পরিত্যক্তুমুৎসহে।

প্রত্যগ্রযৌবনবিভূষণসঙ্গমেতদ্

রূপশ্রিয়ং চ তব যৌবনযোগ্যরূপাম্।

সক্তিং চ ময়ি অনুপমামনুরুধ্যমানঃ

দেবীং ত্যজামি বলবাংস্ত্বয়ি নে2নুরাগঃ ॥

অন্যস্ত্রীশঙ্কয়া ধ্রুবদেবী – যদি ভত্তিং অবেক্খসি,তদো মং মংদভাইণিং পরিচ্চয়সি।

রাজা – অপি চ, ত্যজামি দেবীং তৃণবৎ তদন্তরে।

ধ্রুবদেবী – অহং পি জীবিদং পরিচ্চয়ংতী অজ্জউত্তং পঢ়ময়ং য্যেব পরিচ্চইস্সং।

রাজা – ত্বয়া বিনা রাজ্যমিদং হি নিষ্ফলম্।

ধ্রুবাদেবী – মমাপি সংপদং নিষ্ফলো জীবলোও সুহপরিচ্চয়ণীও ভবিস্সদি।

রাজা – উদেতি দেবীং প্রতি মে দয়ালুতা।

ধ্রুবাদেবী – ইয়ং অজ্জউত্ত! ইদিসী দয়ালুতা! জং অণবরদ্ধো জণো অণুগদো এবং পরিচ্চইয়দি।

রাজা – ত্বয়ি স্থিতং স্নেহনিবন্ধনং মনঃ।

ধ্রুবদেবী – অদো য্যেব মংদভাগা পরিচ্চয়ামি।

রাজা – ত্বয্যুপারোপিতপ্রেম্ণা ত্বদর্থে যশসা সহ।

পরিত্যক্তা ময়া দেবী জনো2য়ং জন এব মে ॥

ধ্রুবদেবী – হজে! ইয়ং সা অজ্জউত্তস্য করুণদা।

সূত্রধারী – দেবি! পডংতি চংদমংডলাউ চুডুলীও, কিং এথ করিয়দী?

রাজা – দেবীবিয়োগদুঃখার্তাস্ত্বমস্মান্ রময়িষ্যসি।

ধ্রুবদেবী – বিয়োগদুক্খং পি দে অকরুণস্স অত্থি য্যেব।

রাজা – ত্বদ্দুঃখস্যাপনেতুং সা শতাংশেনাপি ন ক্ষমা।"

– প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষার জন্য রাজা কুমারগুপ্ত স্বীয় পত্নী ধ্রুবদেবীকে শকরাজের হাতে দান করতে মনস্থ করেছেন। এমতাবস্থায় স্ত্রীবেশধারী চন্দ্রগুপ্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ধ্রুবদেবীর সঙ্গে উল্লিখিত বাক্যালাপ করছেন। চন্দ্রগুপ্তকথিত বাক্যগুলি দ্ব্যর্থক হওয়ার কারণে ধ্রুবদেবী সেগুলিকে অন্য অর্থে গ্রহণ করছেন। অতএব এটি ত্রিগত নামক বীথ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে ত্রিগতর দ্বিতীয় একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে, শ্রুতিসাম্যবশতঃ এক-ই উক্তি একবার প্রশ্নরূপে, আবার উত্তররূপে যুগপৎ কল্পিত হলে তাকে ত্রিগত বলা হয় – 'অথবা শ্রুতিসারূপ্যেণৈকস্যৈব প্রশ্নরূপতয়া সতঃ প্রতিবচনতয়া ভিন্নার্থস্য যোজনম্'।[৫৫] এই প্রকার ত্রিগতর উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর একটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে –

" সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ! দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।

রামা রম্যে বনান্তে2স্মিন্ ত্বয়া বিরহিতা ময়া ॥'

– উল্লিখিত শ্লোকটি রাজা পুরূরবার প্রশ্ন। পার্বত্য প্রদেশে অনুরণনের ফলে এই প্রশ্ন আবার উত্তররূপে পরিজ্ঞাত। অতএব এটি ত্রিগত নামক বীথ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে ত্রিগতর আরো একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হচ্ছে। তদনুসারে, অস্পষ্টার্থ কোনো শব্দ বা ধ্বনি থেকে শ্রুতিসাম্যের ফলে একাধিক অর্থের কল্পনা হলে ত্রিগত নামক বীথ্যঙ্গ হয়। এই মতটি সন্দেহাতীতভাবে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। তত্রধৃত ত্রিগতলক্ষণটি হল – 'শ্রতিসাম্যাদনেকার্থযোজনং ত্রিগতং ত্বিহ' (দশ.রূ. ৩/১৬)। ধনঞ্জয় আরো বলছেন, নট প্রভৃতি তিনজন ব্যক্তির কথোপকথন আকারে এই ত্রিগত পূর্বরঙ্গে প্রযুক্ত হয় – 'নটাদিত্রিতয়ালাপঃ পূর্বরঙ্গে তদিষ্যতে' (দশ.রূ. ৩/১৬)। নাট্যশাস্ত্রে মহর্ষি ভরত-ও প্রায় অনুরূপভাবে ত্রিগতের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তবে তিনি এই বীথ্যঙ্গে হাস্যরসের পাক্ষিকী যোজনার কথা উল্লেখ করেছেন –

"শ্রুতিসারূপ্যাদ্যস্মিন্ বহবো2র্থা যুক্তিভির্নিযুজ্যন্তে।

যদ্ধাস্যমহাস্যং বা তৎ ত্রিগতং নাম বিজ্ঞেয়ম্ ॥" (না. শা. ১৮/১২৪)

পরভাবী ভাবপ্রকাশনকার, দর্পণকার প্রমুখ দশরূপকের অনুসরণে-ই ত্রিগতলক্ষণ নির্ণয় করেছেন।

নাট্যদর্পণে এই প্রকার ত্রিগতর উদাহরণরূপে 'ইন্দুলেখা' নামক বীথী থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে –

''কিং নু কলহংসনাদো মধুরো মধুপায়িনাং তু ঝঙ্কারঃ।

হৃদয়গৃহদেবতায়াস্তস্যা নু সনূপুরশ্চরণ ইতি ॥''

– উল্লিখিত অংশে মধুর ধ্বনিবিশেষের অস্পষ্টতার কারণে রাজার নিকট সেটি কলহংসনাদ, ভ্রমরগুঞ্জন, প্রিয়ার চরণের নূপুরশিঞ্জন – এরকম একাধিক ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। অতএব এটি ত্রিগতের উদাহরণ। উল্লেখ্য, এইপ্রকার ত্রিগতর সঙ্গে সন্দেহ অলঙ্কারের সাদৃশ্য অনায়াসলক্ষ্য।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে ত্রিগতর লক্ষণটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। তদনুসারে, যা ঘটতে পারে, স্পষ্টরূপে তা ব্যক্ত করার নাম ত্রিগত – 'স্ফুটভাব্যর্থকথনং ত্রিগতম্' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

৬. ছল – ছল নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'বচো2ন্যার্থং ছলং হাস্যবঞ্চনারোষকারণম্' (না.দ.২/৩৩)– হাস্য, বঞ্চনা অথবা ক্রোধের কারণে প্রযুক্ত ভিন্নার্থবোধক বাক্যকে ছল নামক বীথ্যঙ্গরূপে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ–

''কস্স ব নহোই রোসো দট্ঠুণ পিয়াএ সব্বণং অহরং!

সভমরপউমগ্ঘাইরি বারিয়বামে! সহসু ইণহিং ॥''

– উল্লিখিত শ্লোকে পত্নীর অপকর্ম আচ্ছাদনের চেষ্টায় ও ভর্তৃপ্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত কথিত সখীর বাক্যে বিদগ্ধজনের হাস্য, শ্বশ্রূমাতা প্রমুখের প্রতি বঞ্চনা এবং সৌভাগ্যাতিশয় খ্যাপনের দ্বারা সপত্নীদের রোষ – এই সবকটি বিষয় প্রতীয়মান হওয়ায় এটি ছল নামক বীথ্যঙ্গের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে অনুরূপভাবে ছলের লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে – 'অন্যার্থমেব বাক্যং ছলমভিসন্ধানহাস্যরোষকরম্'(না.শা.১৮/১২৩)।নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য সাগরনন্দী-ও এক-ই মত পোষণ করেছেন। দশরূপককারের মতে, আপাতপ্রিয় অথচ নিন্দাসূচক বাক্য দ্বারা বিহিত প্রবঞ্চনার নাম ছল – 'প্রিয়াভৈরপ্রিয়ৈর্বাক্যৈর্বিলোভ্য ছলনা ছলম্'(দশ.রূ. ৩/১৭)।এটি মূলতঃ একপ্রকার ব্যাজস্তুতি। ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে দশরূপকের অনুসরণে ছললক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

৭. অসৎপ্রলাপ – অসৎপ্রলাপ নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল– 'অসৎপ্রলাপস্তত্ত্বেন হিতং যন্নাবগম্যতে' (না.দ.২/৩৪)– মূর্খতা অথবা অবিবেচকতার কারণে পরম হিতকর ও উপকারক কোনো বাক্যকে গুরুত্ব না দেওয়ার নাম অসৎপ্রলাপ। হিতবাক্য মূর্খ ও অবিবেচক ব্যক্তিদের নিকট অসাধুভূত অসত্য প্রলাপরূপে প্রতিভাত হয় বলে এই বীথ্যঙ্গটির এই নাম – 'তৌ

প্রত্যসতো2সাধুভূতস্য প্রলপনম্ অসৎপ্রলাপঃ'।[৫৬] উল্লেখ্য, এই ব্যুৎপত্তিটি সর্বথা অভিনবভারতী-অনুসারী।

অবিবেচকত্বরূপ অসৎপ্রলাপের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে 'রামাভ্যুদয়' নামক রূপকের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে –

রাবণঃ – "প্রায়শঃ শ্রুতিমেব ভবদ্ভির্যথা কলত্রমাত্রসাধনো2সৌ তাপসস্তদপহার এব তাবন্নিরূপ্যতাম্। ন চ কলত্রাপহরণাদৃতে পুরুষস্যাপরং পরিভবস্থানমস্তি। তত্র মারীচেন সাহায়কং ক্রিয়মাণমিচ্ছামি।

মারীচঃ – স্বামিন্! জীবতো রামস্য পরিভব ইত্যশক্যমেতৎ। ন খলু তাপস ইতি তমবজ্ঞাতুমর্হতি দেবঃ। অন্যদেব বস্ত্বন্তরং কিমপি তৎ।

রাবণঃ (সক্রোধম্) – আঃ! কিং নাম বস্ত্বন্তরং তৎ? মূঢ়!

যুবত্যেব ক্ষত্রবন্ধোঃ পরিভবমসমং জীবতঃ কর্তুমিচ্ছন্

মায়াসাহায়কে ত্বং নিপুণতর ইতি প্রার্থয়ে নাসমর্থঃ।

যচ্চান্যৎ তত্র বজ্রপ্রহতিমসৃণিতস্ফারকেয়ূরভাজঃ

সজ্জাস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীহঠহরণসহা বাহবো রাবণস্য ॥"

– অবিবেচক রাবণ মারীচের হিতবাক্যে কর্ণপাত করছেন না। অতএব এটি অসৎপ্রলাপের উদাহরণ।

মৌর্খ্যবশতঃ অসৎপ্রলাপের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ভীমটবিরচিত 'মনোরমাবৎসরাজ' নামক রূপক থেকে–

রুমণ্বান্ – "কৌশাম্বী মম হস্ত এব পরয়া শক্ত্যা ময়া স্বীকৃতঃ

পঞ্চালাধিপতিঃ প্রভুঃ স ভবতাং ন জ্ঞায়তে ক্বাধুনা।

নন্বাদীপিত এষ মোহিতপরানীকেন লাবাণকঃ

দেবী সম্প্রতি রক্ষ্যতাময়মহং প্রাপ্তো রুমণ্বান্ স্বয়ম্ ॥ "

– পাঞ্চালরাজের উচ্ছেদবিষয়ক রুমণ্বানের এই বাক্য যৌগন্ধরায়ণের দ্বারা অবগত হলে-ও, বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণের ভৃত্য সম্ভ্রমক মূর্খতাবশতঃ তা অনুধাবন করতে পারলেন না। অতএব এটি-ও অসৎপ্রলাপের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে যে, মূর্খের নিকট হিতবাক্য বললে, তা গৃহীত বা সমাদৃত না হওয়ার নাম অসৎপ্রলাপ–

"মূর্খজনসন্নিকর্ষে হিতমপি যৎ প্রভাষতে বিদ্বান্।

ন চ গৃহ্যতে2স্য বচনং বিজ্ঞেয়ো2সৎপ্রলাপো2সৌ ॥" (না.শা. ১৮/১১৯)

নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও অনুরূপভাবে অসৎপ্রলাপের লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

নাট্যদর্পণে অসৎপ্রলাপের অপর একটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। তদনুসারে বালক, উদ্বিগ্ন ইত্যাদি ব্যক্তির অসংলগ্ন, অসম্বদ্ধ কথার নাম অসৎপ্রলাপ – 'অন্যে তু 'বালোৎকণ্ঠিতাদীনামসম্বদ্ধকথাপ্রায়মসৎপ্রলাপম্' ইচ্ছন্তি'।[৫৭] ...এই অভিমতটি নিঃসংশয়ে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। দশরূপকধৃত অসৎপ্রলাপলক্ষণটি হল – 'অসম্বদ্ধকথাপ্রায়ো2সৎপ্রলাপো যথোত্তরঃ' (দশ.রূ.৩/২০)।এজাতীয় অসৎপ্রলাপের উদাহরণ –

"একং ত্রীণি নবাষ্ট সপ্ত ষড়িতি প্রধ্বস্তসংখ্যাক্রমা।

বাচঃ ক্রৌঞ্চরিপোঃ শিশুত্ববিকলাঃ শ্রেয়াংসি পুষ্ণন্তু বঃ ॥"

– উল্লিখিত উদাহরণে বালক কার্তিকেয়র অসম্বন্ধ সংখ্যাগণন অসৎপ্রলাপের সুন্দর উদাহরণ।

সাহিত্যদর্পণকার নাট্যশাস্ত্র এবং দশরূপক – এই দুই গ্রন্থধৃত অসৎপ্রলাপলক্ষণকে সম্মিলিত করে এই বীথ্যঙ্গের লক্ষণটি নির্মাণ করেছেন। তাঁর মতে, যে বাক্য ও তার উত্তর অসম্বদ্ধ এবং যে হিতকর বাক্য মূর্খের কাছে বলা হলে তা গৃহীত হয় না, এরূপ বাক্যকে বলা হয় অসৎপ্রলাপ –

"অসৎপ্রলাপো যদ্বাক্যমসংবদ্ধং তথোত্তরম্ ।

অগৃহ্যতো2পি মূর্খস্য পুরো যচ্চ হিতং বচঃ ॥" (সা.দ. ৬/২৬২)

৮. বাক্‌কেলী – বাক্‌কেলী নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'প্রশ্নোত্তরং তু বাক্‌কেলী হাস্যা বাক্ প্রতিবাগপি'(না.দ. ২/৩৪)– একটি, দুটি বা ততোধিক প্রশ্ন ও উত্তরের সমাবেশে বাক্‌কেলী নামক বীথ্যঙ্গ হয়। উক্তি-প্রত্যুক্তিদ্বারে নির্মিত বুদ্ধিদীপ্ত ও হাস্যরসাত্মক কথোপকথনকে-ও বাক্‌কেলী বলা হয়। 'কেলি' শব্দের অর্থ কৌতুকপূর্ণ ক্রীড়া। অতএব চাতুর্যপূর্ণ কথার খেলা-ই হল বাক্‌কেলী। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে – 'বচনক্রীড়ারূপত্বাদ্ বাক্‌কেলী'।[৫৮]

প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে বাক্‌কেলীর উদাহরণ–

" নদীনাং মেঘবিগমে কা শোভা প্রতিভাসতে।

বাহ্যান্তরা বিজেতব্যাঃ কে নাম কৃতিনারয়ঃ ॥"

– শ্লোকোক্ত 'অরয়ঃ' পদটি দুটি প্রশ্নের উত্তর । মেঘ অপগমে নদীর অবস্থা 'অরয়ঃ' অর্থাৎ গতিহীন এবং কৃতী ব্যক্তির দ্বারা বিজেতব্য 'অরয়ঃ' অর্থাৎ অরিসমূহ। এই উদাহরণে দুটি প্রশ্ন ও একটি উত্তরের দ্বারা বাক্‌কেলী নির্মিত হয়েছে। এতদধিক প্রশ্নোত্তরের দ্বারা-ও বাক্‌কেলী রচিত হতে পারে। উল্লেখ্য, উদাহরণটি সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে গৃহীত।

বিদগ্ধ উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিত্তিতে বাক্‌কেলীর উদাহরণ –

" কো2য়ং দ্বারি হরিঃ প্রয়াহ্যুপবনং শাখামৃগস্যাত্র কিং

কৃষ্ণো2হং দয়িতে! বিভেসি সুতরাং কৃষ্ণাৎ পুনর্বানরাৎ।

মুগ্ধে2হং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব তন্বীমলং
মিথ্যা সূচয়সীত্যুপেক্ষ্য ধনিকাং হ্রীতো হরিঃ পাতু বঃ ॥''

– উল্লিখিত উদাহরণে অনেকার্থবিশিষ্ট 'কৃষ্ণ' পদটির ব্যবহারের দ্বারা বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনের মাধ্যমে বাক্‌কেলী রচিত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে একটি বা দুটি উক্তি-প্রত্যুক্তিকে বাক্‌কেলী নামে অভিহিত করা হয়েছে – 'একদ্বিপ্রতিবচনা বাক্‌কেলী স্যাৎ প্রয়োগে2স্মিন্' (না.শা. ১৮/১২০)। দর্পণকার এজাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি থেকে উদ্ভূত হাস্যসম্বন্ধকে বাক্‌কেলীরূপে উল্লেখ করেছেন – 'বাককেলির্হাস্যসম্বন্ধো দ্বিত্রিপ্রত্যুক্তিতো ভবেৎ'(সা.দ.৬/২৫৯)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বাক্‌কেলীর পরিবর্তে 'বাগ্‌বেণী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে-ও দু-তিনটি প্রতিবচনকে বাগ্‌বেণী বলা হয়েছে – 'বাগ্‌বেণী দ্বিত্রিপ্রতিবচনা' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণে বাক্‌কেলীর অপর একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে, সাকাঙ্ক্ষ কোনো বাক্যকে সম্পূর্ণ না করে-ও যদি আরব্ধ বাক্যের অবশিষ্টার্থ বোঝা যায়, তবে তাকে বাক্‌কেলী নামে অভিহিত করা হয় – 'কেচিত্তু 'সাকাঙ্ক্ষস্য বাক্যস্য বিনিবর্তনং বাক্‌কেলীম্' অধীয়তে'।[৫৯] এই প্রকার বাক্‌কেলীর উদাহরণস্বরূপ 'উত্তররামচরিত' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক থেকে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বনদেবতা বাসন্তীর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে –

''ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমতঃপরেণ ॥''

– শ্লোকটির অর্থ সম্পূর্ণ নয়, তথাপি অবশিষ্টার্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়তমা সীতাকে পূর্বে প্রীতিপূর্ণ কথায় প্রলুব্ধ করে পরে লোকাপবাদের কারণে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন – এই হল তাৎপর্যার্থ। এভাবে আরব্ধ বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধ হওয়ার কারণে এটি বাক্‌কেলীর উদাহরণ।

উল্লেখ্য, এই অভিমতটি দশরূপকসম্মত। তত্রধৃত বাক্‌কেলীলক্ষণটি হল – 'বিনিবৃত্তস্য বাক্‌কেলী দ্বিস্ত্রিঃপ্রত্যুক্তিতো2পি বা'(দশ.রূ. ৩/১৭)। কারিকার ব্যাখ্যায় টীকাকার ধনিক বলছেন – 'অস্যেতি বাক্যস্য প্রক্রান্তস্য সাকাঙ্ক্ষস্য বিনিবর্তনং ... ' (দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ)। উপন্যস্ত উদাহরণটি-ও দশরূপক থেকে-ই গৃহীত।

এই প্রকার বাক্‌কেলীর সঙ্গে 'আক্ষেপ' নামক অলঙ্কারের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৯. নালিকা – 'হাস্যায় বঞ্চনা নালী' (না.দ.২/৩৫) – এই হল নালিকা নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। পরিহাসাত্মক, নিগূঢ়ার্থবিশিষ্ট, পরবঞ্চনাকারী বাক্যের নাম নালিকা।

নাট্যদর্পণে নালিকার উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী'-র অংশবিশেষ উপন্যস্ত হয়েছে–

সুসঙ্গতা – ''সহি! জস্স কএ তুবং এথ্থ আগদা, সো এথ্থ য্যেব চিট্‌ঠদি।

সাগরিকা (সকোপমিব) – সহি! কস্‌স।

সুসঙ্গতা – (সহাসম্) অয়ি অণ্নসংকিদে ! ণং পউত্তমহূসবে চিত্তফলয়স্স।''

– উদয়নের প্রতি আকৃষ্টা সাগরিকা রাজাকে দর্শনের অভিলাষে কদলীগৃহে উপস্থিত হয়েছেন। সখী সুসঙ্গতার পরিহাসমূলক ব্যাজরূপ উক্তির মাধ্যমে রাজার প্রতি সাগরিকার আকর্ষণরূপ এই নিগূঢ় অর্থটি সহৃদয়সমক্ষে স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে। অতএব এটি নালিকা নামক বীথ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে নালিকার আরেকটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। তদনুসারে, উপহাসযুক্ত নিগূঢ় অর্থবোধক প্রহেলিকার নাম নালিকা– 'কেচিত্তু 'হাস্যহেতুনোপেতাং নিগূঢ়ার্থরূপা প্রহেলিকাং নালী' মন্যন্তে'।[৬০] এই অভিমতটি-ও দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। দশরূপকোক্ত নালিকালক্ষণটি হল –'সোপহাসা নিগূঢ়ার্থা নালিকৈব প্রহেলিকা' (দশ.রূ. ৩/১৯)। উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে-ও এক-ই ভাবে নালিকার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে – 'হাস্যেনোপগতার্থপ্রহেলিকা নালিকেতি বিজ্ঞেয়া' (না.শা. ১৮/১১৮)। নাটকলক্ষণরত্নকোশ, ভাবপ্রকাশন সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি পরবর্তী গ্রন্থে-ও নালিকার অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

প্রহেলিকার সংজ্ঞায় দর্পণকার বলেছেন – 'সংবরণকার্যুত্তরং প্রহেলিকা' (সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)– অভিপ্রেত অর্থের গোপনকারী উত্তরের নাম প্রহেলিকা। অভিনবভারতীতে কিন্তু প্রহেলিকা শব্দটির অন্যরকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তদনুসারে, প্রভূত পরিমাণ নর্মাদি ক্রীড়াযুক্ত বাক্যের নাম প্রহেলিকা – 'প্রকর্ষেণ হেলিকা নর্মাদিক্রীড়ারূপং যস্যাঃ সা প্রহেলিকা' (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

১০. মৃদব – মৃদব নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'ব্যত্যয়ো গুণদোষয়োঃ মৃদবম্' (না.দ. ২/৩৫) – কোনো নাটকীয় পাত্র যদি ব্যক্তিবিশেষের গুণগুলিকে দোষরূপে এবং দোষগুলিকে গুণরূপে উপস্থাপিত করেন, তখন মৃদব নামক বীথ্যঙ্গের প্রয়োগাবসর ঘটে। মৃদব পদটি 'মৃদ্' ও 'অব্' এই দুটি ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। 'মৃদ্' ধাতুর অর্থ বিনাশ বা খণ্ডন, 'অব্' ধাতুর অর্থ রক্ষা বা সমর্থন। পরস্পরের মতকে খণ্ডনপূর্বক আত্মপক্ষপ্রতিষ্ঠার কারণে এই বীথ্যঙ্গটির এরূপ নামকরণ। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে – 'মৃদা পরপক্ষমর্দনেন স্বপক্ষমবতি রক্ষতীতি মৃদবম্'। [৬১]

নাট্যশাস্ত্রে-ও এক-ই ভাবে মৃদবের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে –

''যৎকারণাৎ গুণানাং দোষীকরণং ভবেদ্বিবাদকৃতম্ ॥

দোষগুণীকরণং বা তন্মৃদবং নাম বিজ্ঞেয়ম্ ।" (না.শা. ১৮/১২১,১২২)

পরভাবী সাগরনন্দী, শারদাতনয়, ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ সকলে মৃদবলক্ষণনির্ণয়াবসরে মহর্ষি ভরতকে-ই অনুসরণ করেছেন।

গুণের দোষীকরণের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'বেণীসংহার' থেকে দুটি এবং 'নলবিলাস' থেকে একটি – সাকুল্যে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে বেণীসংহার থেকে গৃহীত একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল –

জয়দ্রথমাতা – "জাদ! তে খু বংধুবধামরিসুহীবিদকোবা সমরে অণবেক্খিয়সরীরা পরিকমিস্সতি।

রাজা (সোপহাসম্) – এবমেতৎ। সর্বজনপ্রসিদ্ধমেবামর্ষিত্বং পাণ্ডবানাম্ । পশ্য –

হস্তাকৃষ্টবিলোলকেশবসনা দুঃশাসনেনাজ্ঞয়া

পাঞ্চালী মম রাজচক্রপুরতো গৌ গৌরিতি ব্যাহৃতা।

তস্মিন্নম্ব! স কিং ন গাণ্ডীবধরো নাসীৎ পৃথানন্দনঃ

যূনঃ ক্ষত্রিয়বংশজস্য কৃতিনঃ ক্রোধাস্পদং কিং ন তৎ ॥"

– উক্ত উদাহরণটিতে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের ধনুর্ধরত্ব গুণটিকে দোষরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

দোষের গুণীকরণের উদাহরণরূপে 'নলবিলাস' ও 'সুধাকলশ' থেকে দুটি উদাহরণ উপন্যস্ত হয়েছে। আমরা প্রথমটির উল্লেখ করছি –

"সর্বেষামপি সন্তি বেশ্মসু কুতঃ কান্তাঃ কুরঙ্গীদৃশঃ

ন্যায়ার্থী পরদারবিপবকরং রাজা জনং বাধতে ।

আজ্ঞাং কারিতবান্ প্রজাপতিমপি স্বাং পঞ্চবাণস্ততঃ

কামার্তঃ ক্ব জনো ব্রজেৎ পরহিতাঃ পণ্যাঙ্গনাঃ স্যুর্ন চেৎ ॥"

– উক্ত উদাহরণে গণিকাসংসর্গের ন্যায় দুষ্ট বিষয়ের গুণবর্ণনা করা হয়েছে।

যুগপদ্ দোষের গুণীকরণ এবং গুণের দোষীকরণের উদাহরণস্বরূপ –

"সন্তঃ সচ্চরিতোদয়ব্যসনিনঃ প্রাদুর্ভবদ্‌যন্ত্রণাঃ

সর্বত্রৈব জনাপবাদচকিতা জীবন্তি দুঃখং সদা ।

অব্যুৎপন্নমতিঃ কৃতেন ন সতা নৈবাসতা ব্যাকুলো

যুক্তাযুক্তবিবেকশূন্যহৃদয়ো ধন্যো জনঃ প্রাকৃতঃ ॥"

– উল্লিখিত উদাহরণে সজ্জনদের দুঃখক্লিষ্ট জীবনযাত্রা এবং অজ্ঞানীদের নিরাসক্ত জীবনযাত্রার বর্ণনার মাধ্যমে দোষসমূহকে সচ্চরিতের গুণরূপে এবং গুণসমূহকে অজ্ঞানীদের দোষরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

১১.উদ্‌ঘাত্যক – 'পরস্পরং স্যাদ্ উদ্‌ঘাত্যং গূঢ়ভাষণম্' (না.দ. ২/৩৫) – এই হল উদ্‌ঘাত্যক নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা দুজন নাটকীয় পাত্র যখন গূঢ়ার্থব্যঞ্জক শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা বা উক্তি-প্রত্যুক্তি করে, তখন তাকে উদ্‌ঘাত্যক নামক বীথ্যঙ্গরূপে অভিহিত করা হয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে, এজাতীয় বীথ্যঙ্গে প্রশ্নকর্তা নিজে-ই উত্তরদানে সমর্থ, কিন্তু তৎসত্ত্বে-ও উত্তরদাতার পক্ষ থেকে সেই উত্তরটির সাধুতা বা অসাধুতার বিষয়ে জানতে চায় এবং প্রতিবক্তা প্রশ্নকর্তার অভিপ্রেত মতটিকে সমর্থন করে। উদ্ভূত প্রশ্নের সাধুত্ব সমর্থনের কারণে-ই এই বীথ্যঙ্গটির এরূপ নাম –'উদ্‌ঘাতে প্রশ্নাত্মকে সাধূদ্‌ঘাত্যম্'।[৬২] উল্লেখ্য, উদ্‌ঘাত্যকের এই ব্যুৎপত্তিটি সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে গৃহীত।

নাট্যদর্পণে 'পাণ্ডবানন্দ' নামক রূপকের প্রস্তাবনা অংশ থেকে উদ্‌ঘাত্যকের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে –

''কা ভূষা বলিনাং ক্ষমা পরিভবঃ কো যঃ স্বকুল্যৈঃ কৃতঃ
কিং দুঃখং পরসংশ্রয়ো জগতি কঃ শ্লাঘ্যো য আশ্রীয়তে।
কো মৃত্যুর্ব্যসনং শুচং জহতি কে যৈর্নির্জিতাঃ শত্রবঃ
কৈর্বিজ্ঞানমিদং বিরাটনগরচ্ছন্নস্থিতৈঃ পাণ্ডবৈঃ ॥''

– প্রশ্নোত্তরের আকারে রচিত এই শোকটিতে গূঢ়ার্থক শব্দপ্রয়োগের দ্বারা পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের বিষয়টিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অতএব এটি উদ্‌ঘাত্যক নামক বীথ্যঙ্গের উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, এক অর্থযুক্ত পদসমূহকে অর্থান্তরে সংক্রমিত করার জন্য অন্য পদের সঙ্গে যুক্ত করে মঞ্চে পাত্রপ্রবেশ করলে উদ্‌ঘাত্যক প্রকারের বীথ্যঙ্গ হয় –

''পদানি ত্বগতার্থানি যে নরাঃ পুনরাদরাৎ ॥
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈস্তদুদ্‌ঘাত্যকমুচ্যতে।'' (না.শা. ১৮/১১৫,১১৬)

সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে উদ্‌ঘাত্যকলক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। অন্যদিকে দশরূপককারের মতানুসারে, গূঢ়ার্থব্যঞ্জক পদপর্যায় বা পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেখানে সংলাপ হয়, তাকে উদ্‌ঘাত্যক বলা হয়–

''গূঢ়ার্থপদপর্যায়মালা প্রশ্নোত্তরস্য বা ॥
যত্রান্যোন্যং সমালাপোদ্‌ঘাতং তদুচ্যতে।'' (দশ.রূ.৩/ ১৩,১৪)

ভাবপ্রকাশনে দশরূপকের অনুসরণে উদ্‌ঘাত্যকলক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে অতিরিক্ত একটি মতের উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, কোনো-কোনো আচার্যর মতে, যা প্রতীত হয়নি

অথবা যা বিস্মৃত হয়েছে , এমন ঘটনার প্রতিপাদনের নাম উদ্ঘাত্যক– 'এবমন্যে ত্বাহুঃ – ন প্রতীতং বিস্মৃতং বা যৎ প্রতিপাদ্যতে তদুদ্ঘাতকমিতি'(না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

১২. অবলগিত – অবলগিত নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'তচ্চাবলগিতং সিদ্ধিঃ কার্যস্যান্যমিষেণ যা' (না.দ.২/৩৬) – এক বিষয়ের সমাবেশ থেকে যখন অন্য কোনো কার্যের অবতারণা করা হয়, তখন তাকে অবলগিত শ্রেণীর বীথ্যঙ্গরূপে অভিহিত করা হয়।

অবলগিতর উদাহরণরূপে 'উত্তররামচরিতম্'-এর প্রথম অঙ্কের উল্লেখ করা হয়েছে। সীতার আরণ্যপ্রকৃতি দর্শনের গর্ভকালীন ইচ্ছাপূরণের প্রসঙ্গ থেকে লোকাপবাদহেতু সীতা পরিত্যাগরূপ কার্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় এটি অবলগিতর উদাহরণ।

নাট্যশাস্ত্রে-ও একটি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের অবতারণাকে অবলগিত নামে অভিহিত করা হয়েছে –

''যত্রান্যস্মিন্ সমাবেশ্য কার্যমন্যৎ প্রসাধ্যতে ॥

তচ্চাবলগিতং নাম বিজ্ঞেয়ং নাট্যযোক্তৃভিঃ ।''(না.শা. ১৮/১১৬,১১৭)

সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি গ্রন্থে-ও এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করা হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশরচয়িতা আচার্য সাগরনন্দী অবলগিত প্রসঙ্গে একটি অভিমতের উল্লেখ করেছেন। কোনো-কোনো আচার্যর মতে, রূপকে পাত্রপ্রবেশের অন্য সূচনা না থাকলে অবলগিতর ব্যবহার করা উচিৎ – 'অন্যস্ত্বাহ – রূপকেষু যস্য পাত্রস্য সূচনা নাস্তি তত্রাবলগিতকেন কর্তব্যা'(না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে অবলগিতর লক্ষণপ্রসঙ্গে অন্য একটি মতের উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে, অন্য কোনো ব্যক্তির উপর নিজকার্যের দায়িত্বভার অর্পণ করে স্বয়ং কার্যান্তরে ব্যাপৃত হওয়ার নাম অবলগিত – 'কেচিত্তু 'পাত্রান্তরে স্বব্যাপারং নিক্ষিপ্য যৎ কার্যান্তরকরণং তদবলগিতম্' ইত্যাহুঃ'। [৬৩]

এই প্রকার অবলগিতর উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'কৃত্যারাবণ' রূপকের আমুখের অংশবিশেষ উপন্যস্ত হয়েছে –

সূত্রধারঃ – (নিঃশ্বস্য) ''আর্যে! ননু ব্রবীমি।

বাক্প্রপঞ্চৈকসারেণ নির্বিশেষাল্পবৃত্তিনা।

স্বামিনেব নটত্বেন নির্বিণ্ণাঃ সর্বথা বয়ম্ ॥

তদ্ গচ্ছতু ভবতী পুত্রং মিত্রং বা কমপি পুরস্কৃত্য ক্রমাগতামিমাং কুজীবিকামনুবর্তয়িতুম্ । ততঃ ক্রমাদাহ –

পরিগ্রহোরুগ্রাহৌষাদ্ গৃহসংসারসাগরাৎ।

বন্ধুস্নেহমহাবর্তাদ্ ইদমুত্তীর্য গম্যতে ॥ ''

– উল্লিখিত অংশে সূত্রধার রঙ্গোপজীবীরূপে তাঁর কর্তব্যসমূহ স্বীয় পত্নীর উপর অর্পণ করে, স্বয়ং পরলোকের উপযোগী কার্যকলাপে নিরত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। অতএব এটি দ্বিতীয় প্রকার অবলগিতর উদাহরণ।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে অবলগিতর তৃতীয় একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হচ্ছে। তদনুসারে, প্রস্তুত বিষয় যখন অন্যত্র অন্য আকার পরিগ্রহ করে, তাকে অবলগিত বলা হয় – 'অপরে তু – 'প্রস্তুতে2ন্যস্মিন্ কার্যে যদন্যৎ স্বয়মেব সিধ্যতি', তদবলগিতম্'।[৬৪] এই প্রকার অবলগিতর উদাহরণরূপে 'ছলিতরাম' নামক রূপকের প্রস্তাবনার অংশবিশেষ উপন্যস্ত হয়েছে –

রামঃ – ''লক্ষ্মণ! তাতবিযুক্তায়ামযোধ্যায়াং বিমানস্থো নাহং প্রবেষ্টুং শক্নোমি, তদবতীর্য গচ্ছামি।

কো2পি সিংহাসনস্যাধঃ স্থিতঃ পাদুকয়োঃ পুরা।

জটাবানক্ষবলয়ী চামরীব বিরাজতে ॥ ''

– উল্লিখিত অংশে প্রস্তুত বিষয় হল শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ। সেই প্রস্তুত বিষয় থেকে রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে তাঁর-ই পাদুকাযুগলকে সিংহাসনে স্থাপন করে ভরতের রাজ্যশাসনরূপ বিষয়ান্তরের সূচনা হওয়ায় এটি তৃতীয় প্রকার অবলগিতের উদাহরণ।

উল্লেখ্য, এই অভিমতটি দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। দশরূপকধৃত অবলগিতলক্ষণের প্রাসঙ্গিক অংশটি হল – 'প্রস্তুতে2ন্যত্র বা2ন্যৎ স্যাচ্চাবলগিতম্' (দশ.রূ.৩/১৫)। উপন্যস্ত উদাহরণটি-ও দশরূপক থেকে গৃহীত । পরভাবী আচার্য শারদাতনয়-ও দশরূপকের অনুসরণে অবলগিতলক্ষণ নিরূপণ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাট্যশাস্ত্রে উদ্‌ঘাত্যক এবং অবলগিত – এই দুই প্রকার বীথ্যঙ্গকে প্রস্তাবনার দুটি প্রকারভেদ রূপে পরিগণিত করা হয়েছে। দশরূপকে বলা হচ্ছে, এদুটি বীথ্যঙ্গ প্রস্তাবনায় অবশ্যযোজ্য। উদাহরণগুলির সবকটি-ই সংশিষ্ট রূপকসমূহের প্রস্তাবনা অংশ থেকে গৃহীত।

১৩. অবস্পন্দিত – 'স্বেচ্ছোক্তস্যান্যথাখ্যানং যদবস্পন্দিতং তু তৎ' (না.দ. ২/৩৬)– এই হল অবস্পন্দিত নামক বীথ্যঙ্গের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণ। ভাবাবেগাদিবশতঃ কোনো বাক্যপ্রয়োগ করে বক্তা যদি নিজের অভিপ্রায় গোপন করার জন্য সেই বাক্যের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন, তবে স্বীয় অভিপ্রায়বোধক উক্তির এইরূপ প্রকারান্তরে ব্যাখ্যানকে অবস্পন্দিত বলা হয়ে থাকে।

চক্ষুঃস্পন্দনাদির দ্বারা যেমন কোনো গূঢ় অর্থের ইঙ্গিত করা হয়, অনুরূপভাবে অন্তর্গূঢ় কোনো অর্থ বহন করার কারণে এই বীথ্যঙ্গটির এই নাম – 'চক্ষুঃস্পন্দনাদিবদন্তর্গতসূচনীয়সম্ভবাৎ'। [৬৫]

নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হচ্ছে যে, সহসা কথিত শুভ বা অশুভ বাক্যের কৌশল দ্বারা অন্যরূপ অর্থ করার নাম অবস্পন্দিত –

"আক্ষিপ্তে2র্থে তু কস্মিংশ্চিচ্ছুভাশুভসমুত্থিতে ॥

কৌশলাদুচ্যতে2ন্যো2র্থস্তদবস্পন্দিতং ভবেৎ।" (না.শা.১৮/১১৭,১১৮)

ভাবপ্রকাশন, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে অবস্পন্দিতর অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। দশরূপককার অবশ্য রসাদির (আবেগাদির) দ্বারা প্রযুক্ত উক্তির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যানকে অবলগিতরূপে অভিহিত করেছেন – 'রসোক্তস্যান্যথা ব্যাখ্যা যত্রাবস্যন্দিতং হি তৎ' (দশ.রূ. ৩/১৯) । দর্পণকার-ও এ বিষয়ে দশরূপকের অভিমতের-ই অনুসরণ করেছেন।

অবস্পন্দিতর উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'বেণীসংহার' এবং 'ছলিতরাম' – এই দুটি রূপকের অংশবিশেষ উপন্যস্ত করা হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় উদাহরণটি উল্লেখ করছি –

সীতা – "জাদ! পব্ভাএ তুব্ভেহিং অউজ্জাএ গংতব্বং। সো অ রায়া বিণএণ পণয়িদব্বো।

লবঃ – অম্ব! কিমাবাভ্যাং রাজোপজীবকাভ্যাং ভাব্যম্ ।

সীতা – সো খু তুম্হাণং পিদা।

লবঃ – কিমাবয়োঃ রঘুপতিঃ পিতা?

সীতা – (সাশঙ্কম্) ন খু তুম্হাণং, সয়লাই য্যেব পুহবীএ।"

– উল্লিখিত অংশটি সীতা ও লবের কথোপকথন। ভাবাবেগবশতঃ সীতা লবের কাছে বলে ফেলেছেন যে, রামচন্দ্র-ই লব-কুশের পিতা। পরে স্বীয় অভিপ্রায় গোপন করার জন্য পিতা শব্দের অন্য প্রকার অর্থ করেছেন; সে অর্থান্তরটি হল পালক। এভাবে স্বাভিপ্রায়বোধক বাক্যের অন্যরূপ ব্যাখ্যার কারণে এটি অবস্পন্দিতর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আলোচনার পরিশিষ্টে বলা হয়েছে, এই বীথ্যঙ্গগুলির প্রতিটি-ই নাটকাদি সর্বপ্রকার রূপকে সর্ববিধ সন্ধিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে – 'এতানি চ ত্রয়োদশ বীথ্যঙ্গানি সর্বরূপকাণাং সর্বসন্ধিষু নিবন্ধনীয়ানি'।[৬৬] তবে বীথীতে এদের প্রয়োগ ব্যাপক ও বহুল হওয়ার কারণে এগুলিকে বীথ্যঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

বীথ্যঙ্গ সম্বন্ধে আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। পূর্বে-ই বলা হয়েছে, সুন্দর, মনোহারী, চারুত্ববিশিষ্ট বাগ্‌বিন্যাস বীথ্যঙ্গসমূহের আন্তর ধর্ম। অন্যদিকে,অলঙ্কারসমূহের-ও

প্রাণভূত ধর্ম হল বক্রোক্তিময় চমৎকারী শব্দার্থসজ্জা। অতএব এই বিচারে বীথ্যঙ্গসমূহ এবং অলঙ্কারসমূহের মধ্যে কোথায় যেন একটি মূলগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মৃদব নামক বীথ্যঙ্গের সঙ্গে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের, বাক্‌কেলীর সঙ্গে আক্ষেপ অলঙ্কারের, ত্রিগতর সঙ্গে সন্দেহ অলঙ্কারের, উদ্‌ঘাত্যকের সঙ্গে উত্তর অলঙ্কারের, অবলগিতের সঙ্গে সমাধি অলঙ্কারের, অবস্পন্দিতর সঙ্গে বক্রোক্তি ও ছেকাপহ্নুতি অলঙ্কারের পারস্পরিক সাদৃশ্য উদাহৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ–২৩০
২. তদেব, পৃঃ – ২৩২
৩. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, আর. এস. নাগর সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ– ৩১৬.
৪. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩০
৫. তদেব, পৃঃ – ২৩২
৬. নাট্যশাস্ত্র, ঐ, পৃঃ– ৩২০
৭. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৩
৮. তত্রৈব
৯. সাহিত্যদর্পণ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), কুমুদরঞ্জন রায় সম্পাদিত, পৃঃ- ৪৭৬
১০. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৩
১১. তদেব, পৃঃ – ২৩৪
১২. তত্রৈব
১৩. সাহিত্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ– ৩৬৫
১৪. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৫
১৫. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র,ঐ, পৃঃ– ৩২২
১৬. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৪
১৭. তদেব, পৃঃ – ২৩৬
১৮. তদেব, পৃঃ – ২৩৫
১৯. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র,ঐ, পৃঃ– ৩২৩-৩২৪
২০. দ্রষ্টব্য ঃ তদেব, পৃঃ –৩২৪
২১. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৬
২২. তদেব, পৃঃ – ২৩৭
২৩. দ্রষ্টব্য ঃ Types of Sanskrit Drama, Mankad, পৃঃ – ৭৭
২৪. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৬
২৫. তত্রৈব
২৬. তত্রৈব
২৭. তদেব, পৃঃ – ২৩৭
২৮. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, তদেব, পৃঃ – ৩৩১
২৯. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৩
৩০. তত্রৈব

৩১. তত্রৈব
৩২. তত্রৈব
৩৩. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, ঐ, পৃঃ – ৩৩১
৩৪. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৮
৩৫. তত্রৈব
৩৬. তত্রৈব
৩৭. তত্রৈব
৩৮. সাহিত্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ– ২৭৩
৩৯. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ– ২৩৮
৪০. তত্রৈব
৪১. তদেব, পৃঃ – ২৩৯
৪২. তত্রৈব
৪৩. The Sanskrit Drama, Keith, পৃঃ – ৩৪৯
৪৪. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, ঐ, পৃঃ – ৩৩৪
৪৫. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ– ২৪০
৪৬. Types of Sanskrit Drama, Mankad, পৃঃ – ৭৮-৭৯
৪৭. নাট্যদর্পণ, তত্রৈব
৪৮. তদেব, পৃঃ – ২৪১
৪৯. তদেব, পৃঃ – ২৪২
৫০. তদেব, পৃঃ – ২৪৩
৫১. দ্রষ্টব্য ঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশ,সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ– ২৯৯
৫২. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ– ২৪৪
৫৩. তত্রৈব
৫৪. দ্রষ্টব্য ঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশ,ঐ, পৃঃ– ৩০০
৫৫. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ– ২৪৬
৫৬. তত্রৈব
৫৭. তদেব, পৃঃ – ২৪৭
৫৮. তদেব, পৃঃ – ২৪৭
৫৯. তদেব, পৃঃ – ২৪৮
৬০. তদেব, পৃঃ – ২৪৮
৬১. তদেব, পৃঃ – ২৪৮
৬২. তদেব, পৃঃ – ২৫০
৬৩. তদেব, পৃঃ – ২৫০
৬৪. তদেব, পৃঃ – ২৫০
৬৫. তদেব, পৃঃ – ২৫১
৬৬. তদেব, পৃঃ – ২৫১

['নাট্যদর্পণ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

তৃতীয় বিবেক

'বৃত্তিরসভাবাভিনয়বিচার' নামক নাট্যদর্পণের তৃতীয় বিবেকের প্রথম আলোচ্য বিষয় হল বৃত্তি।

বৃত্তি ঃ

বৃত্-ধাতুনিষ্পন্ন 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ ব্যাপার বা ক্রিয়া। যেহেতু আমরা এখন নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় রত, অতএব সেই পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে সার্বিক অভিনয়ব্যাপারের যে সামগ্রিক ও সাবলীল প্রকাশ, তাকে-ই আমরা বৃত্তি নামে অভিহিত করব। ব্যাকরণশাস্ত্রের কৃৎ-তদ্ধিত-সমাসাদি-রূপ বৃত্তি অথবা অলঙ্কারশাস্ত্রের অভিধা-ব্যঞ্জনা-লক্ষণাদি বৃত্তির থেকে নাট্যতত্ত্বের বৃত্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ পৃথক।

নাটকীয় বৃত্তির স্বরূপনির্ণয়াবসরে আচার্য সাগরনন্দী বলেছেন – বেশভূষা, গীতবাদ্য, রস ও ভাবের অভিনয় এবং নৃত্য–এই সবকটির কোনো বিশেষ প্রকারে ব্যবহারকে-ই বৃত্তি বলা হয় – 'নেপথ্য-গীত-বাদিত-রস-ভাবাভিনয়-নৃত্য-জাতীনাং ক্বাপি বিশেষে বর্তনমিতি বৃত্তিঃ কথিতা' (না.ল.র. একাদশ অধ্যায়)। বৃত্তির অপরবিধ সংজ্ঞা নির্ণয় করে তিনি আরো বলছেন, বিলাস-বিন্যাসের ক্রমকে-ও বৃত্তি বলা যেতে পারে –'অথবা বিলাসবিন্যাসক্রমো বৃত্তিরিতি' (না.ল.র.একাদশ অধ্যায়)। আচার্য সাগরনন্দী বৃত্তির এই যে দ্বিতীয় লক্ষণটি দিলেন, এতে বিলাস শব্দটি কোনো পারিভাষিক অর্থে, অর্থাৎ প্রতিমুখ সন্ধির অঙ্গ, নায়কের গুণ, নায়িকার চেষ্টালঙ্কার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 'বিলাস' শব্দটি এক্ষেত্রে সামান্যতঃ চেষ্টা অর্থে-ই ব্যবহৃত হয়েছে। ভোজদেব তাঁর 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' গ্রন্থে আরো সহজভাবে বলেছেন, চেষ্টাবিশেষের নাম-ই বৃত্তি – 'চেষ্টাবিশেষবিন্যাসক্রমো বৃত্তিঃ' (শৃ.প্র.সপ্তদশ প্রকাশ)।

নাট্যদর্পণমতে, 'পুরুষার্থসাধকো বিচিত্রো ব্যাপারো বৃত্তিঃ'[১]– বিবিধ পুরুষার্থ লাভের উপায়স্বরূপ বিচিত্র ক্রিয়াসমূহের নাম বৃত্তি। লক্ষণে ব্যবহৃত পুরুষার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদি শব্দগুলিকে নাট্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে অর্থনিষ্পাদন করতে হবে। নাট্যপরিবেশনাকালে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকীয় ঘটনাটিকে আমরা ঘটতে দেখি, অভিনয়ের মাধ্যমে মুখ্য নাটকীয় ফললাভের জন্য পাত্র-পাত্রীর প্রযত্ন-ও প্রত্যক্ষ করি। এই প্রযত্নের মধ্যে থাকে পাত্র-পাত্রীদের বেশভূষা, হাবভাব, বিলাস-বিন্যাস, বিবিধ-বিচিত্র সংলাপ ইত্যাদি। সমগ্র অভিনয়ব্যাপারের এই যে সামগ্রিক বহিরঙ্গ প্রকাশ, এর-ই নাম বৃত্তি।[২] ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় – ''ইহাই নাটকের 'স্টাইল'। ইহাই নাটককে শক্তি, সুষমা ও

সম্পূর্ণতা দান করে। নাটকের বিষয়বস্তু, নায়ক-নায়িকা, রস ও ভাব যতই উন্নত, উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট হউক না কেন, যদি রংগমঞ্চে নাটকের উপস্থাপন-পদ্ধতি, উপস্থাপনের উপাদান-উপকরণ নাটকোচিত, রীতি ও রুচিসম্মত না হয়, তবে নাটক নিষ্প্রভ, নিস্তেজ ও নিরানন্দ হইয়া পড়ে"।[৩] প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ব-সমালোচক কীথ-ও মন্তব্য করেছেন – "The style adds to the play the indefinable element of perfection which is present in the highest beauty of feature or dress."[৪]

নাট্যজননী, নাট্যপ্রাণ এই বৃত্তি চতুর্বিধ – ভারতী, সাত্ত্বতী, আরভটী এবং কৈশিকী ।প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আচার্য উদ্ভটের অনুগামীরা পঞ্চম একটি বৃত্তির কথা স্বীকার করেন বলে দশরূপককার ধনঞ্জয় মন্তব্য করেছেন – 'পঠন্তঃ পঞ্চমীং বৃত্তিমৌদ্ভটাঃ প্রতিজানতে' (দশ.রূ.২/৬১)। হরিপালদেবের 'সঙ্গীতসুধাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত ব্রাহ্মীবৃত্তি সম্ভবতঃ এই পঞ্চমপ্রকার বৃত্তি।[৫]

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, যেমন চতুর্বেদ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে নাট্যবেদের সৃষ্টি, এক-ইভাবে সেই চতুর্বেদ থেকে-ই এই বৃত্তিসমূহের-ও সৃষ্টি–

"ঋগ্বেদাদ্ ভারতীবৃত্তির্যজুর্বেদাত্তু সাত্ত্বতী।
কৈশিকী সামবেদাচ্চ শেষা চাথর্বণাত্তথা ॥" (না.শা.২০/২৫)

–অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চতুর্বেদ থেকে-ই যথাক্রমে বাক্প্রধান ভারতী, উৎসাহচঞ্চল সাত্ত্বতী, গীতিপ্রধান কৈশিকী এবং মায়া-যুদ্ধ-ইন্দ্রজালাদিপ্রধান আরভটী বৃত্তির উৎপত্তি।

চতুর্বিধ বৃত্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে, বাক্প্রধান ভারতীবৃত্তি, অভিনয়প্রধান সাত্ত্বতীবৃত্তি, কায়িকচেষ্টাপ্রধান আরভটীবৃত্তি এবং গীতবাদ্যাদি প্রয়োগ, সুন্দর বেশভূষা ইত্যাদির দ্বারা নাট্যের যা কিছু মনোহর, তাই কৈশিকীবৃত্তি– 'পাঠ্যপ্রধানা ভারতী, অভিনয়প্রধানা সাত্ত্বতী, অনুভাবাদ্যাবেশময়রসপ্রধানারভটী, গীতবাদ্যোপরঞ্জকপ্রধানা কৈশিকীতি' (না.শা. বিংশ অধ্যায়)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও বৃত্তিচতুষ্টয়ের আশ্রয়ণীয় বিষয়চতুষ্টয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে– 'বাচিকং ভারত্যাম্, সাত্ত্বিকং সাত্ত্বত্যাম্, আহার্যং কৈশিক্যাম্, আঙ্গিকমারভট্যাং নৃত্যং ভবতি'(না.ল.র. একাদশ অধ্যায়)।

অতএব দেখা গেল, ভারত্যাদি চতুর্বিধ বৃত্তির দ্বারা নট-নটীরা নাট্যচেষ্টা বা নাট্যব্যাপার দর্শকসমক্ষে মঞ্চে উপস্থাপিত করেন। লক্ষণীয় এই যে, আঙ্গিকাদি অভিনয়চতুষ্টয়ের মত, বৃত্তিচতুষ্টয়ের-ও নাট্যে একক অবস্থিতি সম্ভব নয়, পরস্পর মিলিত হয়ে-ই এগুলি উপস্থাপিত হয়। নট-নটীর দিক থেকে নাট্যচেষ্টা তিনপ্রকার – বাক্চেষ্টা, কায়চেষ্টা এবং এই দুয়ের নিয়ামক মনশ্চেষ্টা। বাক্চেষ্টা বা বাচিক অভিনয় ভারতীবৃত্তির বিষয় । কায়চেষ্টাকে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দু'ভাগে

বিভক্ত করা যায়। সূক্ষ্ম কায়চেষ্টাকে বলা হয় সাত্ত্বিক অভিনয় এবং এর বৃত্তির নাম সাত্ত্বতী। স্থূল কায়চেষ্টাকে বলা হয় আঙ্গিক অভিনয়, যার বৃত্তি আরভটী। কায়চেষ্টাকে আবার ললিত ও উদ্ধত ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। ললিত-মৃদু কায়চেষ্টা কৈশিকীবৃত্তির অন্তর্গত এবং উদ্ধত-স্থূল কায়চেষ্টা আরভটীবৃত্তির অন্তর্গত।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সমগ্র নাট্য ব্যাপারটি-ই বৃত্তিচতুষ্টয়ের বিষয়। বাক্‌চেষ্টা অতি গুরুত্বপূর্ণ; এটি বাদ দিলে নাট্য নিছক মূকাভিনয়ে পর্যবসিত হয়। আবার কায়চেষ্টা ও মনশ্চেষ্টা ব্যতিরেকে বাক্‌চেষ্টা সম্পন্ন হতে পারেনা। কারণ সংলাপ উচ্চারণকালে তাল্বাদি উচ্চারক অঙ্গের অবৈকল্য, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের যথাযথ ও নিয়ত ব্যবহার – এসব-ই কায়চেষ্টার অন্তর্গত। অন্যদিকে মনের অসহযোগিতায় সংলাপকথনের মত স্মৃতিভিত্তিক কাজ যে একান্ত অসম্ভব, তা বলা-ই বাহুল্য। আবার মনে উদ্রিক্ত এবং শব্দদ্বারা প্রকাশিত ভাবগুলি কায়চেষ্টা ব্যতিরেকে যথাযথভাবে কখনো-ই পরিবেশিত হতে পারে না। কায়চেষ্টাবিহীন বাক্‌চেষ্টা ও মনশ্চেষ্টার যোগফল অভিনয় নয়, তা আবৃত্তিমাত্র। অন্যদিকে মনের সাহায্য এবং বাক্য তথা শব্দের সাহচর্য ব্যতীত কায়চেষ্টা নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব। এবং আন্তরিক ও সার্থক মনশ্চেষ্টা-বিরহিত কায়চেষ্টা ও বাক্‌চেষ্টা যে কখনো-ই রসজ্ঞব্যক্তির মনোরঞ্জন করতে পারে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অভিমতের সমর্থনে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, বিদূষকের মত অগভীর ও স্থূল মানের নাট্যচরিত্র-ও হাস্যোদ্দীপনের প্রয়োজনে যে সকল কায়িক চেষ্টা করেন এবং যে সমস্ত সংলাপ উচ্চারণ করেন, অতিস্থূল সেইসকল কায় ও বাক্‌চেষ্টা-ও মনচেষ্টা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়– 'বিদূষকো2পি চ হাস্যার্থং বুদ্ধিপূর্বকমেব বিসংস্থূলং বিচেষ্টতে'[৬],উন্নত ও পরিশীলিত নায়কাদি চরিত্রের কথা তো বলা-ই বাহুল্য।

অতএব স্পষ্ট বোঝা গেল, ভারত্যাদি বৃত্তিচতুষ্টয়ের মাধ্যমে বিধৃত কায়চেষ্টাদি ব্যাপারত্রয়ের দ্বারা-ই সমগ্র নাট্যপরিবেশনাটি উপস্থাপিত হয়। প্রয়োজনানুসারে কোনো অংশে স্বল্প, আবার কোনো অংশে অধিক প্রয়োগ ঘটলে-ও, চতুর্বিধ বৃত্তির প্রতিটি-ই প্রত্যেকটি রূপকে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকে। এই অবশ্যম্ভাবিতার কারণে-ই নাট্যদর্পণে বৃত্তিচতুষ্টয়কে যাবতীয় নাট্যব্যাপারের মাতারূপে অভিহিত করা হয়েছে–'চতস্রো নাট্যমাতরঃ' (না.দ.৩/১)। বৃত্তিতে আরো বলা হচ্ছে, কেবল নাট্য অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যের নয়, এই বৃত্তিচতুষ্টয় সর্বপ্রকার শ্রব্যকাব্যের-ও জননীস্বরূপা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু সর্ববিধ রূপকে সর্ববিধ বৃত্তির অবস্থিতির বিষয়টি স্বীকার করা হয়নি। মহর্ষি ভরতের মতে, দশবিধ রূপকের মধ্যে কেবলমাত্র নাটক ও প্রকরণ-ই হবে সর্ববৃত্তিসমন্বিত,অবশিষ্ট বীথ্যাদি অষ্টবিধ রূপকে কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ করা যাবে না–

"জ্ঞেয়ং প্রকরণং চৈব তথা নাটকমেব চ।

সর্ববৃত্তিবিনিষ্পন্নং নানাবন্ধসমাশ্রয়ম্ ॥

বীথী সমবকারশ্চ তথেহামৃগ এব চ।

উৎসৃষ্টিকাঙ্কো ব্যায়োগো ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ ॥

কৈশিকীবৃত্তিহীনানি রূপাণ্যেতানি কারয়েৎ।"(না.শা.১৮/৭-৯)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অভিনবগুপ্তাচার্য কিন্তু কৈশিকীবিহীন নাটকরূপে মুদ্রারাক্ষস ও কৃত্যারাবণের নামোল্লেখ করেছেন (না.শা. অষ্টাদশ অধ্যায়)।

সর্বপ্রকার রূপকে সর্ববিধ বৃত্তির উপস্থিতি আবশ্যিক রূপে গণ্য না করা সত্ত্বে-ও, নাট্যশাস্ত্রে-ও কিন্তু এই বৃত্তিচতুষ্টয়কে সর্বকাব্যের মাতৃকাস্বরূপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ব্যাখ্যাটি একটু অন্যরকম। আচার্য ভরতের মতে, 'প্রবৃত্তি' থেকে বৃত্তি এবং বৃত্তি থেকে যাবতীয় রচনার উদ্ভব। প্রবৃত্তি বিষয়ে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে এটুকু বললে-ই যথেষ্ট যে, পৃথিবীর নানা দেশের নানা রকম বেশভূষা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা ইত্যাদির বিভিন্নতার নাম-ই প্রবৃত্তি। ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে– 'দেশভাষাক্রিয়াভেদলক্ষণাঃ স্যুঃ প্রবৃত্তয়ঃ' (ভাব.প্র.প্রথম অধিকার)। কাব্যরচনার সময় সংশ্লিষ্ট দেশ, কাল ও অঞ্চলের প্রবৃত্তিকে গ্রন্থকার উপেক্ষা করতে পারেন না। রচনায় তত্তৎ দেশের প্রবৃত্তির প্রতিফলন ও প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রবৃত্তির এই অভিব্যক্তির নাম-ই বৃত্তি। দশরূপকের টীকাকার ধনিক তাই বলেছেন– 'প্রবৃত্তিরূপো নেতৃব্যাপারস্বভাবো বৃত্তিঃ' (দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ)। এই বৃত্তি-ই সর্ববিধ কাব্যের, বিশেষতঃ দৃশ্যকাব্যসমূহের জননীরূপা। নাট্যশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে–

"সর্বেষামেব কাব্যানাং মাতৃকা বৃত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।

আভ্যো বিনিঃসৃতং হ্যেতদ্দশরূপং প্রয়োগতঃ ॥" (না.শা. ১৮/৪)

নাট্যদর্পণের টীকায় বৃত্তিসমূহের অবিষয় সম্পর্কে-ও নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বাঙ্-মনস-কায়চেষ্টাবিহীন কোনো অভিনয়ব্যাপার যদি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপন করা হয়, তবে সেখানে বৃত্তির প্রয়োগ না করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মোহ, মূর্ছা ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে, যে সকল স্থলে প্রত্যক্ষ কোনো চেষ্টার অভাবের কারণে বৃত্তির প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়। এরকম কোনো অংশে বৃত্তির প্রয়োগ দৃষ্ট না হলে সমগ্র নাট্যটি বৃত্তিদোষে দুষ্ট–এমন কথা বলা যাবে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অভিনবভারতীতে কিন্তু এই মতটি সমর্থন করা হয়নি। আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে, মোহমূর্ছাদিতে তো বটে-ই, এমনকি মৃত্যুর মধ্যে-ও সূক্ষ্মপ্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান। অতএব ব্যাপারশূন্য কোনো ক্রিয়া মঞ্চে উপস্থাপিত হতে পারে না এবং সেই কারণে-ই

নাট্যের সামান্যতম অংশ-ও বৃত্তির অবিষয়রূপে চিহ্নিত হতে পারে না – 'মূর্ছামোহমরণাদাবপি সূক্ষ্মপ্রাণ পরিস্পন্দাদ্যনুমেয়সঞ্চিতপরিস্পন্দসম্ভাবনা' (না.শা. বিংশঅধ্যায়)।

এই মতদ্বৈধটি একটু বিমর্শের অপেক্ষা রাখে। একথা সত্য যে, মোহ-মূর্ছা-মরণাদির অভিনয়কালে মনশ্চেষ্টার প্রয়োজন হয়। মানস চেষ্টা ব্যতিরেকে মোহাদির অভিনয়-ও সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। মোহাদির অভিনয়কালে চরম নির্জীবতার প্রতিফলন মনশ্চেষ্টা বাদে সম্ভব নয়। কিন্তু এক-ই সঙ্গে একথা-ও অনস্বীকার্য যে, মনশ্চেষ্টা বাক্ ও কায়চেষ্টার সর্বাঙ্গীণ নিয়ামক, অতএব ভারত্যাদি চতুর্বিধ বৃত্তির যথাযথ প্রয়োগের নিয়ামক, কিন্তু স্বয়ং মনশ্চেষ্টাকে কোনো প্রকার বৃত্তির অন্তর্গত করা যেতে পারে না। অতএব মোহমরণাদির সুষ্ঠু অভিনয়ের সময় মনশ্চেষ্টার ব্যাপার থাকলে-ও কোনো বৃত্তির প্রয়োগ ঘটে না– নাট্যদর্পণের এই অভিমতটি যথেষ্ট-ই যুক্তিসহ।

এবার আমরা একে-একে বৃত্তিচতুষ্টয়ের আলোচনায় প্রবেশ করবো।

১.ভারতীবৃত্তি ঃ

'ভারতী' শব্দের অর্থ বাণী বা বাক্। নাট্যাভিনয়ে বচন বা বাক্য-ই প্রধান। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'বাক্ হি সর্বস্য কারণম্'(না.শা.১৪/৩)। এই বাগ্ব্যাপার প্রধান যে বৃত্তিতে, তার-ই নাম ভারতীবৃত্তি। পরভাবী আচার্য রূপগোস্বামী-ও তাঁর নাটকচন্দ্রিকা গ্রন্থে বলেছেন– 'এষা বাণীপ্রধানত্বাদ্ ভারতীতি নিগদ্যতে' (না.চ. শ্লোকসংখ্যা ৬০১) ।

'ভারতী' পদটির আরেকটি ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্রধৃত ভারতীলক্ষণের মধ্যে। তত্রস্থ লক্ষণে 'স্বনামধেয়ৈর্ভরতৈঃ প্রযুক্তা' (না.শা.২০/২৬)–এই অংশের মধ্যে এই ব্যুৎপত্তিটি প্রণিধেয়। এর দুইপ্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ, ভারতীবৃত্তি একান্তভাবে আচার্য ভরতের নিজস্ব সৃষ্টি, তাই 'ভরতনির্মিত বৃত্তি' বলে এর নাম ভারতী। দ্বিতীয়তঃ, 'ভরত' বা নটদের দ্বারা প্রযুক্ত হওয়ার কারণে এই বৃত্তির নাম ভারতী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সাত্ত্বতী ইত্যাদি অন্যান্য তিনটি বৃত্তি-ও ভরত-প্রযুক্ত;তৎসত্ত্বে-ও সম্ভবতঃ নাট্যব্যাপারে প্রাধান্যের কারণে কেবলমাত্র এই বৃত্তিটিকে-ই 'ভারতী' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

নাট্যশাস্ত্রে ভারতীবৃত্তির উদ্ভব বিষয়ে একটি পৌরাণিক বার্তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সুপ্রাচীনকালে শ্রীহরি এবং মধু-কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের মধ্যে যখন প্রবল সংগ্রাম হয়েছিল, তখন হরির প্রচণ্ড পাদবিক্ষেপের ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিপুল ভারের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে-ই ভারতীবৃত্তির জন্ম–

"ভূমিসংযোগসংস্থানৈঃ পদন্যাসৈর্হরেস্তদা।

অতিভারো2ভবদ্‌ভূমের্ভারতী তত্র নির্মিতা ॥”(না.শা.২০/১১)

বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনার সত্যতা প্রশ্নাতীত নয়। তাই এই শ্লোকটিকে যুক্তিসম্মত আঙ্গিকে ব্যাখ্যার মানসে আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন, ভারতীবৃত্তির ব্যুৎপত্তির সঙ্গে এই কাহিনীর বাস্তব কোনো যোগ নেই। ‘ভার’ পদ থেকে ভারতীবৃত্তির উদ্ভব– এই ব্যাখ্যা কেবল শব্দসাদৃশ্যে নির্মিত। শ্রীহরি যেমন সংগ্রামকালে পৃথিবীপৃষ্ঠে অত্যধিক ভারের সৃষ্টি করেছিলেন, অনুরূপভাবে সামগ্রিক নাট্যব্যাপারে অন্যান্য বৃত্তিগুলির তুলনায় ভারতীবৃত্তি অত্যধিক প্রাধান্যে বিরাজমানা– এই হল এই পৌরাণিক বার্তার প্রকৃত তাৎপর্য। অভিনবভারতীর সংশ্লিষ্ট অংশটি প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধার করা হল – ‘অতিভার ইত্যক্ষরসাম্যাদপি নির্বচনং দর্শয়ন্ নটব্যাপারযোগে2পি আন্তরবিকল্পাত্মকাভিঃ(বাগ্‌ভিঃ) সংজুল্পবাহুল্যে ভারত্যেব বৃত্তিরিতি দর্শয়তি’ (না.শা. বিংশ অধ্যায়)।

ব্যুৎপত্তি যাই হোক্ না কেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভারতীবৃত্তি হল বাক্‌প্রধান। এই বাক্‌প্রাধান্য-ই এই বৃত্তির একান্ত প্রাতিস্বিক ও ব্যবচ্ছেদক ধর্ম। সাত্ত্বত্যাদি অন্যান্য বৃত্তিসমূহে-ও কিছু বাচিক অংশ থাকে, কিন্তু এই বৃত্তিগুলিতে মূলতঃ অভিনয়ের অংশ-ই পূর্ণমাত্রায় ও পূর্ণপ্রাধান্যে বর্তমান থাকে। বাগ্‌ব্যাপারাত্মিকা ভারতীবৃত্তি বাক্‌প্রাধান্যের কারণে-ই অপরাপর বৃত্তিসমূহের থেকে পৃথক। সম্পূর্ণতঃ বাক্‌প্রধান হওয়ার কারণে দশরূপকে ভারতীবৃত্তিকে ‘শব্দবৃত্তি’ এবং অন্য বৃত্তিত্রয়কে ‘অর্থবৃত্তি’রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে– “ তিস্র এবৈতা অর্থবৃত্তয়ঃ। ভারতী তু শব্দবৃত্তিঃ.... ” (দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ)।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে ভারতীবৃত্তি ‘সংস্কৃতবাক্যযুক্তা’ (না.শা.২০/২৬)। অর্থ – ভারতীবৃত্তির ভাষা হবে সংস্কৃতবহুল। তবে তা সর্বথা প্রাকৃতবর্জিত হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

নাট্যশাস্ত্রের ভারতীলক্ষণে বলা হয়েছে,এই বৃত্তি ‘পুরুষপ্রযোজ্যা স্ত্রীবর্জিতা’ (না.শা.২০/২৬) – অর্থাৎ ভারতীবৃত্তি কেবলমাত্র পুরুষচরিত্রের দ্বারা প্রযোক্তব্য, এই বৃত্তির প্রয়োগে স্ত্রীদের কোনো ভূমিকা নেই। পরভাবী ভাবপ্রকাশনকার-ও তাঁর গ্রন্থের ভারতীলক্ষণে এই মতটি অবিকল উদ্ধার করেছেন। এই মতটি কিন্তু মোটে-ই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। নাটকাদির প্রারম্ভে যে প্রস্তাবনা বা আমুখ অংশটি থাকে, তার বৃত্তি ভারতী। দশরূপকে বলা হয়েছে–

“রঙ্গং প্রসাদ্য মধুরৈঃ শ্লোকৈঃ কাব্যার্থসূচকৈঃ।

ঋতুং কঞ্চিদুপাদায় ভারতীং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ ॥”(দশ.রূ. ৩/৪)

–এই প্রস্তাবনা কিন্তু কখনো-ই স্ত্রীচরিত্রবর্জিত নয়। সর্বত্র প্রস্তাবনার লক্ষণে বলা হয়েছে, সূত্রধারের সঙ্গে নটীর আলাপের মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবনা সম্পন্ন হবে। আর তাছাড়া-ও সর্ববিধ রূপকে, সর্ববিধ রসে ভারতী বৃত্তির প্রয়োগ হয়। যেকোনো সুকুমার প্রয়োগে স্ত্রীচরিত্র উপস্থিত থাকে। অতএব ভারতীবৃত্তি

স্ত্রীবর্জিত – নাট্যশাস্ত্রের এই মতটি অসঙ্গত ও অযথার্থ। বরং দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে এই বৃত্তিকে যে 'নটাশ্রয়' রূপে বিশেষিত করা হয়েছে, সেটি অধিকতর যুক্তিসম্মত। 'নটাশ্রয়' বলতে আমরা নট ও নটী উভয়ের আশ্রিত বৃত্তিকে বুঝবো ; ফলতঃ ভারতীবৃত্তির লক্ষণটি সুসঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ হবে। এই মতবৈষম্যের বিষয়টি অনুমান করে-ই হয়তো নাট্যদর্পণে ভারতীবৃত্তি কাদের দ্বারা প্রযোক্তব্য, পুরুষ না নারী, এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করা হয়নি।

অভিনবগুপ্তাচার্য অবশ্য নাট্যশাস্ত্রের এই মতটির একটি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে 'স্ত্রীবর্জিতা' এবং 'সংস্কৃতবাক্যযুক্তা' এই দুটি বিশেষণের দ্বারা মহর্ষি ভারতীবৃত্তির বিষয় থেকে নটী এবং প্রাকৃতপাঠকে বর্জনের নির্দেশ দেননি, কৈশিকীবৃত্তির অবকাশ বোঝানোর জন্য-ই এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। অভিনবভারতীতে তাই বলা হয়েছে– "স্ত্রীবর্জিতেতি কৈশিকীপ্রাধান্যাবকাশং গময়তি। সংস্কৃতেতি বচসা প্রাকৃতপাঠ্যলালিত্যাৎ কৈশিকীমবশ্যমাক্ষিপেদিতি সূচয়তি" (না.শা. বিংশ অধ্যায়)।

অনন্তর ভারতীবৃত্তির ভেদ। নাট্যশাস্ত্র অনুসারে দশরূপকাদি যাবতীয় পরবর্তী গ্রন্থে ভারতীবৃত্তির চারটি ভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি হল আমুখ, প্ররোচনা, বীথী এবং প্রহসন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে–

"ভেদাস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো2ঙ্গত্বমাগতাঃ।
প্ররোচনামুখং চৈব বীথী প্রহসনং তথা ॥" (না.শা. ২০/২৭)

নাট্যদর্পণে কিন্তু ভারতীবৃত্তির দুটি মাত্র ভেদ স্বীকার করা হয়েছে– আমুখ ও প্ররোচনা। তাই কারিকায় এই বৃত্তিকে 'আমুখপ্ররোচনোত্থিতা'(না.দ.৩/২) এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে।

এবার আসছে ভারতীবৃত্তিতে রসপ্রসঙ্গ। আমরা জানি, রূপকমাত্র-ই রসাশ্রয়ী এবং বাগ্‌ব্যাপার ব্যতিরেকে নাট্যে কোনো প্রকার রসের সুষ্ঠু পরিস্ফুটন সম্ভবপর নয়। বাগ্‌ব্যাপার অর্থাৎ ভারতীবৃত্তি। অতএব নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, সর্ববিধ রূপকে সর্বপ্রকার রসের আশ্রয়ণীয় হল ভারতীবৃত্তি। নাট্যদর্পণের কারিকায় এই বৃত্তিকে তাই যথার্থ-ই 'নিঃশেষরসাঢ্যা' রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

এই বিষয়টি কেন্দ্র করে-ই নাট্যদর্পণকাররা মহর্ষি ভরতের মতবিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আচার্য ভরত অষ্টবিধ রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং ভারত্যাদি চতুর্বিধ বৃত্তির প্রতিটিতে দুটি করে রসের অন্তর্ভুক্তি করেছেন। সেই বর্গীকরণ অনুসারে নাট্যশাস্ত্রে এই অভিমতটি পাওয়া যাচ্ছে– 'বীভৎসে করুণে চৈব ভারতী সংপ্রকীর্তিতা'(না.শা.২০/৭৪) – অর্থাৎ কেবলমাত্র বীভৎস ও করুণ রসের ক্ষেত্রে বৃত্তি হবে ভারতী, অন্যান্য রসের ক্ষেত্রে নয়।

নাট্যদর্পণে এই অভিমতের যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁদের মতে, বাক্‌প্রধান ভারতীবৃত্তি যেকোনো রসে প্রযুক্ত হতে পারে; কেবলমাত্র বীভৎস ও করুণরসে এর বিধান সম্পূর্ণ অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অনুচিত। সমস্ত রূপক ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রকার রস প্রাথমিক ভাবে বাক্যের সঙ্গে-ই সম্পৃক্ত। বাগ্‌ব্যবহার বাদে যেহেতু নাট্যের অস্তিত্ব নেই, অতএব ভারতীবৃত্তির ব্যবহার ব্যতীত কোনোরূপ নাট্যের সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ পরিবেশন একটি অসম্ভব কল্প। ভারতীবৃত্তির প্রয়োগকে মাত্র দুটি রসের পরিসরে সীমাবদ্ধ করার নির্দেশক মহর্ষি ভরতের এই অভিমতটি কোনোমতে-ই গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, একান্তভাবে নাট্যশাস্ত্রের অনুসারী হওয়া সত্ত্বে-ও দশরূপককার ধনঞ্জয় কিন্তু এই সমস্যাটি অনুভব করেছিলেন এবং সেই কারণে-ই স্বীয় গ্রন্থে তিনি সকলরসের ক্ষেত্রে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগকে স্বীকার করেছেন – 'বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী' (দশ.রূ. ২/৬২)।

নাট্যশাস্ত্রে ভারতীবৃত্তির সঙ্গে কেবলমাত্র বীভৎস ও করুণরসকে-ই কেন সম্পৃক্ত করা হল, কেন অন্য রসগুলির কোনোটিকে নয় –এর-ও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। করুণরসে ভারতীবৃত্তি প্রয়োগের তা-ও কিছু যৌক্তিকতা অনুমান করা যেতে পারে। করুণরসে দীর্ঘ অংশ জুড়ে বিলাপ ও খেদোক্তি থাকে, যা বাক্‌প্রধানত্বের কারণে ভারতীবৃত্তির-ই বিষয়। কিন্তু বীভৎসরসে কেন ভারতীবৃত্তির বিধান দেওয়া হল, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যদর্পণে আরেকটি যুক্তি-ও খুব সঙ্গতভাবে উত্থাপিত করা হয়েছে। মহর্ষি ভরত বীথীতে ভারতীবৃত্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন, যে বীথী সর্বপ্রকার রসসমন্বিত। মহর্ষি ভাণে ভারতীবৃত্তি ব্যবহারের বিধান দিয়েছে, যে ভাণ শৃঙ্গার অথবা বীররসপ্রধান। আবার মহর্ষি ভরত প্রহসনে-ও ভারতীবৃত্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন, যা কিনা হাস্যরসপ্রধান। অতএব দেখা যাচ্ছে, শ্লোকবদ্ধ নির্দেশে ভারতীবৃত্তির বিষয়রূপে কেবল বীভৎস ও করুণ রসকে গ্রহণ করলে-ও বস্তুতঃ পক্ষে কিন্তু মহর্ষি ভরত স্বয়ং শৃঙ্গার, বীর, হাস্য এবং বীথীর প্রেক্ষিতে সর্বপ্রকার রসে-ই ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ স্বীকার করছেন, যা অত্যন্তভাবে স্ববিরোধী। এবং এই অভিমতের যে সমালোচনা নাট্যদর্পণে করা হয়েছে, তা-ও যথার্থ। সর্বথা বিচারে বাগ্‌ব্যাপারাত্মিকা ভারতীবৃত্তির সর্বরসে প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়টি-ই যুক্তিসহরূপে প্রতিভাত হয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই ভারতীবৃত্তির সর্বরসাত্মকতার প্রতি নির্দেশ করে সঙ্গতভাবে-ই বলা হয়েছে – 'সর্বরূপকভাবিত্বাদ্ রসানাং চ বাগ্‌জন্যত্বাৎ সর্বরসাত্মকত্বম্'।[৭] এই এক-ই কারণে নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে, ভারতী বৃত্তি বৈদর্ভী-গৌড়ীয়া-পাঞ্চালী তিনপ্রকার রীতিতে-ই প্রযুক্ত হতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ আরেকটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নাট্যশাস্ত্রের বিংশ অধ্যায়ের অপর একটি মাতৃকায় এই মতটি একটু ভিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয় –'ভারতী চাপি বিজ্ঞেয়া

করুণাদ্ভুতরূপয়োঃ'[৮]– অর্থাৎ করুণ ও অদ্ভুত রসে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ হবে। কিন্তু এই পাঠটি গ্রহণের দ্বারা-ও উল্লিখিত বিতর্কের কোনো সুষ্ঠু সুরাহা হয় না।

অতঃপর ভারতীবৃত্তির ভেদ।পূর্বে-ই বলা হয়েছে, অপরাপর গ্রন্থে এই বৃত্তির চারপ্রকার ভেদের কথা বলা হলে-ও, নাট্যদর্পণে কেবলমাত্র আমুখ ও প্ররোচনাকে ভারতীবৃত্তির অঙ্গরূপে স্বীকার করা হয়েছে। অন্যত্র-স্বীকৃত বীথী ও প্রহসনকে নাট্যদর্পণে কেবলমাত্র রূপকভেদ রূপে স্বীকার করা হয়েছে, ভারতীবৃত্তির ভেদরূপে নয়।

আমুখ ঃ

আমুখের লক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণে যে কারিকাটি রচনা করা হয়েছে, সেটি হল–

''বিদূষকনটীমার্ষৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপি ভাষণম্।

সূত্রধারস্য বক্রোক্তস্পষ্টোক্তৈর্যত্তদামুখম্ ॥''(না.দ.৩/৩)

– নাটকের যে অংশে বিদূষক, নটী এবং 'মার্ষ' অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকগণ একাকী অথবা সূত্রধারের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্যবিষয় অবলম্বনপূর্বক বিচিত্র বাক্যের দ্বারা নাটক সূচনা বিষয়ে পরস্পর আলাপ করেন, তাকে-ই আমুখ বলা হয়। এই আমুখ কোথাও নাটকের বস্তু অর্থাৎ 'plot', কোথাও বীজ, কোথাও মুখ, কোথাও বা পাত্রপ্রবেশ সূচনা করে। নাটকীয় পাত্রের প্রবেশ-ই আমুখের প্রধান উদ্দেশ্য এবং বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য হলে-ও, প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকসমূহের স্তুতি ও নট-নটী-নাট্যকার-নাটকের প্রশংসা ইত্যাদি-ও এর অংশভূত। এই অংশে প্রায়শঃ-ই কোনো ঋতুবিশেষের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। এই আমুখকে ভাষান্তরে 'প্রস্তাবনা' ও 'স্থাপনা' নামে-ও অভিহিত করা হয়।

আমুখের প্রয়োগ হবে বক্রোক্তি বা স্পষ্টোক্তি – যে কোনোটির দ্বারা। বক্রোক্তির প্রয়োগে তা হবে বিশিষ্ট গর্ভিতার্থপ্রকাশক, স্পষ্টোক্তির প্রয়োগে তা হবে কেবলমাত্র বিবক্ষিতার্থের প্রতিপাদক। বক্রোক্তিসমন্বিত আমুখে বীথ্যঙ্গসমূহের প্রয়োজনানুগ প্রয়োগ অবশ্যকরণীয়। স্পষ্টোক্তির মধ্যে বীথ্যঙ্গপ্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। নাট্যশাস্ত্রের আমুখলক্ষণে-ও বলা হয়েছে – 'বীথ্যঙ্গৈরন্যথাপি বা' (না.শা. ২০/৩১)। বক্রোক্তির উদাহরণরূপে অভিনবভারতীতে ''পীতাম্বরগুরুশক্ত্যা হরত্বুষাং প্রসভমনিরুদ্ধঃ'' ইত্যাদি অংশ উপন্যস্ত হয়েছে। স্পষ্টোক্তির উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'নাগানন্দ' নাটিকার ''নাটয়িতব্যে কিমিত্যকারণমেব রুদ্যতে'' ইত্যাদি অংশ উদাহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই উদাহরণটি-ও সম্ভবতঃ অভিনবভারতী থেকে-ই গৃহীত।

এবার আমুখ অংশে সূত্রধারের ভূমিকা বিষয়ে আসা যাক্ । সামান্যতঃ সর্বত্র বলা হয়ে থাকে যে, আমুখ সূত্রধারের করণীয়। কিন্তু বিভিন্ন রূপকে 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' এই প্রয়োগদৃষ্টে একটি প্রশ্ন

উত্থাপিত হতে পারে। 'নান্দ্যন্তে' এই পদটির অর্থ হল পূর্বরঙ্গের প্রত্যাহার, গীতবিধি, প্ররোচনা, নান্দী ইত্যাদি ঊনিশটি (বা কুড়িটি) অঙ্গের সামগ্রিক প্রয়োগের পর সূত্রধারের প্রবেশ। এখন প্রশ্ন হল, এই সকল প্রয়োগের পরে কিভাবে সূত্রধারের প্রবেশ ঘটে? তিনি-ই তো এই অঙ্গগুলির প্রয়োগকর্তা, তিনি কিভাবে এসবের অন্তে প্রবেশ করেন? এই সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্রতে-ই। সেখানে বলা হয়েছে, সাঙ্গ পূর্বরঙ্গের প্রয়োগের পর সূত্রধার তাঁর অনুগামিদের সঙ্গে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করবেন এবং এরপর প্রবেশ করবেন সূত্রধারের তুল্য রূপবান্ ও গুণবান্ এক ব্যক্তি, যাঁর পারিভাষিক নাম স্থাপক–

"প্রযুজ্য রঙ্গান্নিষ্ক্রামেৎ সূত্রধারঃ সহানুগঃ।

স্থাপকঃ প্রবিশেত্তত্র সূত্রধারগুণাকৃতিঃ ॥" (না. শা. ৫/১৬১,১৬২)

এই স্থাপক নির্দোষ ও মধুর বাক্যে রচিত, নানাপ্রকার রস ও ভাব সম্বলিত শ্লোকের দ্বারা নিয়মানুসারে রঙ্গস্থ দর্শকবৃন্দকে প্রসাদিত করবেন এবং তারপর কবির নামকীর্তন করবেন। তদনন্তর তিনি (প্রস্তুত) কাব্যের আরম্ভসম্পর্কিত প্রস্তাবনার অনুষ্ঠান করবেন–

"সুবাক্যমধুরৈঃ শ্লোকৈর্নানাভাবরসান্বিতৈঃ ।

প্রসাদ্য রঙ্গং বিধিবৎ কবের্নামানুকীর্তয়েৎ ॥

প্রস্তাবনাং ততঃ কুর্যাৎ কাব্যপ্রস্তাবনাশ্রয়াম্ ।" (না.শা. ৫/১৬৫,১৬৬)

এই স্থাপক দিব্যবেশে দিব্যবস্তু, মর্ত্যবেশে মর্ত্যবস্তু এবং দিব্য ও মর্ত্যবেশের যে কোনে একটির দ্বারা মিশ্রবস্তুর সূচনা করবেন–

"দিব্যে দিব্যাশ্রয়ো ভূত্বা মানুষে মানুষাশ্রয়ঃ।

দিব্যমানুষসংযোগে দিব্যো বা মানুষো2পি বা ॥"(না.শা. ৫/১৬৭)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নাট্যশাস্ত্রের মতানুসারে সূত্রধার নন, স্থাপক হলেন আমুখের কর্তা। সূত্রধারের অনুরূপ আকৃতি ও গুণসম্পন্ন হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে স্থাপক-ও সূত্রধার শব্দের দ্বারা-ই অভিহিত হতেন। পরভাবী দর্পণকার-ও তাই বলেছেন–

"পূর্বরঙ্গং বিধায়ৈব সূত্রধারো নিবর্ততে।

প্রবিশ্য স্থাপকস্তদ্বৎ কাব্যমাস্থাপয়েত্ততঃ ॥" (সা.দ. ৬/২৬)

ভরতোত্তর কালে সুদীর্ঘ পূর্বরঙ্গের সম্যক্ প্রয়োগ হত না। নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য সাগরনন্দী-ও বলছেন, ভরতের উপদিষ্ট ক্রম মনুষ্যসভায় রক্ষা করে চলা কঠিন – 'যস্তু ভরতোপদিষ্টঃ ক্রমঃ স খলু মানুষ্যাং সভায়াং সঙ্কটতয়া নোপন্যস্তঃ' (না.ল.র. একাদশ অধ্যায়)।সেই কারণে-ই ঊনবিংশ অঙ্গবিশিষ্ট পূর্বরঙ্গের প্রয়োগ ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং তার ফলে পরবর্তী

রূপকসমূহে সূত্রধার একাকী-ই পূর্বরঙ্গ ও প্রস্তাবনা – উভয় প্রকার কার্য সম্পাদন করতে থাকেন, স্থাপকচরিত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ অবলুপ্ত হতে থাকে।

আমুখ রূপকের মূল অংশের থেকে পৃথক, এটি রূপকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, আমুখের রচনা কে করেন– নাট্যকার না সূত্রধার? নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে এর উত্তরে বলা হচ্ছে, যখন 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ'– এরূপ নির্দেশ থাকে, তখন আমুখ সূত্রধারের কর্তব্য। 'নান্দী'পদের দ্বারা এখানে সমুদায়ার্থে পূর্বরঙ্গকে বোঝানো হচ্ছে– " নান্দ্যন্ত ইত্যবয়বে সমুদায়োপচারাৎ। পূর্বরঙ্গান্তে ইতি দ্রষ্টব্যম্ । নান্দী হি পূর্বরঙ্গস্যাঙ্গম্"।[৯] এরূপ ক্ষেত্রে নাট্যকার মুখসন্ধি থেকে রচনা আরম্ভ করবেন, আমুখের রচনা করবেন সূত্রধার স্বয়ং। অন্যদিকে যদি 'পূর্বরঙ্গান্তে স্থাপকঃ' – এরূপ নির্দেশ থাকে (উদাহরণ – 'অনঙ্গবতী' নাটিকা) , তাহলে সেক্ষেত্রে আমুখের রচনা করবেন নাট্যকার। কারণ, যেমনভাবে রামাদি নাট্যচরিত্রের অনুকারী নট-নটীগণের প্রবেশাবসর ঘটে নাট্যকারের রচিত সংলাপ ও নাট্যনির্দেশের মাধ্যমে, তেমনি ভাবে এই ক্ষেত্রে সূত্রধারের চরিত্রানুকারী স্থাপকের প্রবেশ-ও ঘটে নাট্যকারের দ্বারা। তাই এরূপ ক্ষেত্রে আমুখ অংশটি-ও নাট্যকার-ই রচনা করবেন, সূত্রধার নন। উল্লেখ্য, অভিনবভারতীতে-ও এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করা হয়েছে – 'এবং চ যদা স্থাপকো2পি সূত্রধারতুল্যগুণাকারো রামাদিবদেব প্রযুজ্যতে তদেদং কবিকৃতমামুখং ভবতি' (না.শা. বিংশ অধ্যায়)।

অনন্তর আমুখ পদটির ব্যুৎপত্তি। নাট্যদর্পণে দু'প্রকারে এই পদটির নিষ্পত্তি প্রদর্শিত হয়েছে–

১. 'আঙ্ মর্যাদায়াম্'– এই সূত্রানুসারে 'মর্যাদা' অর্থাৎ অবধি অর্থে প্রযুক্ত 'আ' প্রত্যয়ের সঙ্গে 'মুখ' শব্দের যোগে 'আমুখ' পদটির সৃষ্টি, যার অর্থ হল মুখ(সন্ধি) পর্যন্ত। রূপকে মুখসন্ধির অব্যবহিত পূর্ব অবধি আমুখের অবস্থিতি–সেইহেতু আমুখ শব্দটির এরূপ ব্যুৎপত্তি।

২. দ্বিতীয় প্রকার ব্যুৎপত্তিতে 'আ' প্রত্যয়টি ঈষদর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। ঈষদর্থক 'আ' প্রত্যয়ের সঙ্গে 'মুখ' পদের যোগে আমুখ পদটির সৃষ্টি, যার অর্থ হল ঈষৎ-মুখ অর্থাৎ মুখসন্ধির সূচক। মুখসন্ধির তথা সমগ্র রূপকের প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক ঘটনার ইঙ্গিতদানের কারণে আমুখ পদটির এরূপ ব্যুৎপত্তি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আমুখ পদের এই দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি অভিনবভারতীতে-ও স্বীকার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশটি প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধার করা হল– 'আমুখমিতি মুখসন্ধের্নির্বর্ততে যতঃ, আঙ্ মর্যাদায়াম্, যদি বাত্রামুখং প্রারম্ভমীষন্মুখং বা প্রস্তাব্যতে2নয়েতি(প্রস্তাবনা)……………… ' (না.শা. বিংশ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রে আমুখের পঞ্চবিধত্ব স্বীকার করা হয়েছে–

"উদ্‌ঘাত্যকঃ কথোদ্‌ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা।

প্রবৃত্তকাবলগিতে পঞ্চাঙ্গান্যামুখস্য তু ॥"(না.শা. ২০/৩৩)

পরভাবী দর্পণকার-ও এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। অন্যদিকে ধনঞ্জয়, সাগরনন্দী, রূপগোস্বামী প্রমুখ আচার্যগণ আমুখকে প্রথমে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন – কথোদ্‌ঘাত, প্রবৃত্তক এবং প্রয়োগাতিশয়। এতদ্ব্যতীত উদ্‌ঘাত্যক এবং অবলগিত– এই দুটি বীথ্যঙ্গকে-ও এঁরা আমুখের অঙ্গরূপে স্বীকার করেছেন। তবে এঁরা আমুখের পাঁচটি অঙ্গ স্বীকার করলে-ও শেষোক্ত দুটিকে বীথ্যঙ্গরূপে এবং কথোদ্‌ঘাতাদি পূর্বোক্ত তিনটিকে আমুখের নিজের অঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। আচার্য সাগরনন্দীর মতটি এপ্রসঙ্গে প্রণিধেয়– 'উদ্‌ঘাত্যকাবলগিতে দ্বে বীথ্যাঃ, কথোদ্‌ঘাত-প্রয়োগাতিশয়-প্রবর্তকা অস্যৈবাঙ্গানি ত্রীণি এবং পঞ্চাঙ্গানি' (না.ল.র.একাদশ অধ্যায়)। ভাবপ্রকাশনকার শারদাতনয়ের অভিমতটি অভিনব। তাঁর মতে প্রবৃত্তক, কথোদ্‌ঘাত এবং প্রয়োগাতিশয়ের সঙ্গে ত্রয়োদশ প্রকার বীথ্যঙ্গের সবকটি, অর্থাৎ সাকুল্যে ষোড়শপ্রকার আমুখাঙ্গ স্বীকার করা যেতে পারে–

"প্রবৃত্তককথোদ্‌ঘাতপ্রয়োগাতিশয়ৈস্তথা।

বীথ্যঙ্গৈঃ ষোড়শৈতেষাং যোগঃ প্রস্তাবনোচ্যতে॥"(ভাব. প্র.অষ্টম অধিকার)

নাট্যদর্পণে কিন্তু এইভাবে নামকরণপূর্বক আমুখভেদ স্বীকার করা হয়নি। তাঁদের মতে, এগুলিকে আমুখের ভেদরূপে স্বীকার করা যায় না। এগুলি মঞ্চে পাত্রপ্রবেশের বিভিন্ন প্রকার উপায়মাত্র। এগুলিকে আমুখের ভেদ বলা যেতে পারে না,কারণ এগুলি আমুখের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ – 'আমুখাঙ্গভূতম্ '।[১০]

নাট্যদর্পণ অনুসারে আমুখের দ্বারা পাত্রপ্রবেশের বিষয়টি চতুর্বিধ উপায়ে সম্পাদিত হতে পারে – 'বাক্যার্থ-সময়াহ্বানৈঃ ভাবোক্তৈঃ পাত্রসঙ্ক্রমঃ'(না.দ.৩/৪) –

১. সূত্রধার বা স্থাপকের বাক্য গ্রহণের দ্বারা,

২. সূত্রধার বা স্থাপকের উক্তির অর্থ গ্রহণের দ্বারা,

৩. সময় অর্থাৎ ঋতু বিশেষের সূচনা দ্বারা এবং

৪. নামবিশেষের সূচনা দ্বারা ।

আমরা এবার নাট্যদর্পণে প্রদত্ত এই উপায়সমূহের উদাহরণগুলি উপন্যস্ত করবো–

১. বাক্যের দ্বারা – এক্ষেত্রে সূত্রধার বা স্থাপকের দ্বারা উচ্চারিত শব্দবিশেষ, শব্দবন্ধ বা বাক্যবন্ধকে আক্ষরিকভাবে উচ্চারণপূর্বক পাত্রপ্রবেশ ঘটে। যথা– 'সত্যহরিশচন্দ্র' রূপকে সূত্রধারোক্ত–

"সত্ত্বৈকতানবৃত্তীনাং প্রতিজ্ঞাতার্থকারিণাম্ ।

প্রভবিষ্ণুর্ন দেবো2পি কিং পুনঃ প্রাকৃতো জনঃ ॥"

–এই অংশটির আক্ষরিক উচ্চারণপূর্বক নাটকীয় পাত্র হরিশচন্দ্রের প্রবেশ ঘটছে।

২. অর্থের দ্বারা – এক্ষেত্রে সূত্রধারাদির উক্তির অর্থ উপলব্ধি পূর্বক পাত্রপ্রবেশ ঘটে। যথা – 'বেণীসংহার'-এ সূত্রধারোক্তি–

"নির্বাণবৈরদহনাঃ প্রশমাদরীণাং

নন্দন্তু পাণ্ডুতনয়াঃ সহ মাধবেন।

রক্তপ্রসাধিতভুবঃ ক্ষতবিগ্রহাশ্চ

স্বস্থা ভবন্তু কুরুরাজসুতা সভৃত্যাঃ ॥"

– এই শ্লোকের অন্তিম চরণের 'কৌরবরা সপরিজন সুস্থ থাকুন'– সূত্রধারের এই মঙ্গলকামনার অর্থগ্রহণপূর্বক 'কথং স্বস্থা ভবন্তু ময়ি জীবতি ধার্তরাষ্ট্রাঃ' ইত্যাদি বাক্যোচ্চারণপূর্বক নাট্যচরিত্র ভীমসেনের প্রবেশ ঘটছে।

৩. সময়ের দ্বারা – এক্ষেত্রে বসন্তাদি প্রারব্ধ কোনো একটি ঋতুকে আশ্রয় করে, সেই ঋতুর সূত্রধারকৃত বর্ণনাবসরে শ্লেষাদির দ্বারা নাটকীয় পাত্রের প্রবেশ ঘটে। যথা– মায়ুরাজবিরচিত 'ছলিতরাম' নামক রূপকে–

"আসাদিতপ্রকটনির্মলচন্দ্রহাসঃ

প্রাপ্তঃ শরৎসময় এষ বিশুদ্ধকান্তিঃ।

উৎখায় গাঢ়তমসং ঘনকালমুগ্রং

রামো দশাস্যমিব সম্ভৃতবন্ধুজীবঃ ॥"

–সূত্রধারোক্ত এই শরদ্বর্ণনার অব্যবহিত পরে-ই উক্ত শ্লেষাত্মক শ্লোকের উপমানরূপে বর্ণিত নাট্যচরিত্র রামচন্দ্রের প্রবেশ ঘটছে।

৪. সংজ্ঞা বা নামের দ্বারা – এক্ষেত্রে সূত্রধার বা স্থাপক অব্যবহিত পরে প্রবেশকারী নাটকীয় চরিত্রের নামটি শব্দতঃ উল্লেখ করেন। যথা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ–

"তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ ।

এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥"

–উক্ত শ্লোকে সূত্রধার নাট্যচরিত্র দুষ্যন্তের নামটি শব্দতঃ উল্লেখ করছেন এবং এর অব্যবহিত পরে উল্লিখিত পাত্রের মঞ্চে প্রবেশ ঘটছে।

এবার নাট্যশাস্ত্রাদিসম্মত আমুখের ভেদ এবং নাট্যদর্পণসম্মত আমুখাঙ্গের তুলনা করা প্রয়োজন। আগে-ই বলা হয়েছে,নাট্যশাস্ত্রে (এবং পরভাবী সাহিত্যদর্পণে) স্পষ্ট ভাষায় আমুখের পাঁচপ্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই পাঁচটি ভেদের মধ্যে উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিত নামক বীথ্যঙ্গদ্বয়কে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হল, তা বোঝা দুষ্কর। আরো একটি বিষয় এক্ষেত্রে প্রণিধেয়। মহর্ষি ভরত স্বয়ং বলছেন, চারুত্ববিধানের প্রয়োজনে আমুখ হবে বীথ্যঙ্গসমূহের দ্বারা সমন্বিত। একবার এই নির্দেশ দেওয়ার পর পুনরায় উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিতের পৃথক উল্লেখ অর্থহীন দ্বিরুক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। এবং এটি-ও একটি সঙ্গত প্রশ্নরূপে এক্ষেত্রে উত্থাপিত হতে পারে যে,ত্রয়োদশপ্রকার বীথ্যঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিতকে-ই কেন আমুখভেদ রূপে নির্বাচন করা হল, কেন অবশিষ্ট একাদশ প্রকারের কোনোটিকে নয়, এ দুটি বীথ্যঙ্গের কি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য– এর-ও কিন্তু কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। দশরূপককার ধনঞ্জয়, আচার্য সাগরনন্দী প্রমুখ কথোদ্‌ঘাতাদিকে আমুখের নিজস্ব অঙ্গ এবং উদ্‌ঘাত্যকাদিকে বীথ্যঙ্গরূপে চিহ্নিত করে পৃথক্করণের একটি চেষ্টা করেছেন, তবে এই ব্যাখ্যাটি-ও যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়।

নাট্যশাস্ত্র এবং তদনুসারী অন্যান্য গ্রন্থের এই জটিল ও স্ববিরোধী অভিমতের পরিবর্তে নাট্যদর্পণের অভিমতটি অনেক স্বচ্ছ, সরল ও যুক্তিগ্রাহ্য। নাট্যদর্পণে আমুখের কোনোরূপ ভেদনির্ধারণ করা-ই হয়নি। অন্যান্য গ্রন্থে নির্ণীত আমুখের ভেদগুলিকে এঁরা পাত্রপ্রবেশের বিভিন্ন রীতিমাত্র বলে মনে করেছেন।পাত্রপ্রবেশ সংস্কৃত রূপকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। 'নাসূচিতঃ প্রবিশেৎ পাত্রম্'–অসূচিত অবস্থায় পাত্র প্রবেশ নাট্যে নিষিদ্ধ। এবং প্রাচীন ভারতীয় রূপকসমূহে মঞ্চে প্রথম নাটকীয় পাত্রের প্রবেশ ঘটত বেশ চমকপ্রদভাবে। এই চমৎকারি ভঙ্গিতে প্রথম পাত্রপ্রবেশ ঘটানোর মত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সাধিত হত রূপকের আমুখ অংশে। আগে-ও বলা হয়েছে, সভাপূজা, নট-নাটক-নাট্যকারের প্রশস্তি ইত্যাদি আমুখের অংশ হলে-ও পাত্রপ্রবেশ-ই আমুখের প্রথম বৈশিষ্ট্য ও প্রধানতম প্রয়োজনীয়তা। সেই কারণে একমাত্র এই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে-ই নাট্যদর্পণে আমুখের ভেদ নির্ণয় করা হয়েছে, যা যথেষ্ট-ই যুক্তিসঙ্গত।

আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত কথোদ্‌ঘাতাদি আমুখের নিজস্ব অঙ্গত্রয় এবং নাট্যদর্পণের চতুর্বিধ পাত্রপ্রবেশরীতি – উভয়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ এক। নাট্যদর্পণোক্ত প্রথম দুটি রীতি, অর্থাৎ সূত্রধারাদির বাক্যের দ্বারা এবং অর্থের দ্বারা পাত্রপ্রবেশ প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য গ্রন্থে স্বীকৃত কথোদ্‌ঘাত নামক আমুখভেদের অনুরূপ, কালের বর্ণনার দ্বারা পাত্রপ্রবেশ অন্যান্য গ্রন্থের প্রবর্তক নামক আমুখভেদ এবং সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক পাত্রপ্রবেশ দশরূপকাদিগ্রন্থের প্রয়োগাতিশয় নামক আমুখভেদের অনুরূপ। অর্থাৎ

নাট্যদর্পণসম্মত বর্গীকরণের দ্বারা প্রচলিত আমুখভেদগুলির কোনোটি-ই বাদ পড়েনি এবং অকারণ জটিলতা পরিহারপূর্বক যথেষ্ট সরলভাবে এই কার্যটি সাধিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে এইভাবে বৈমত্য পোষণের মধ্যে দিয়ে নাট্যদর্পণকারদের চিন্তার স্বকীয়তা এবং মানসিক বলিষ্ঠতা-ও সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

প্ররোচনা ঃ

ভারতীবৃত্তির অন্যতম অঙ্গ হল প্ররোচনা। নাট্যদর্পণধৃত প্ররোচনালক্ষণটি হল –‘পূর্বরঙ্গে গুণস্তুত্যা সভ্যোন্মুখ্যে প্ররোচনা’ (না.দ. ৩/৪) – অভিনয়ব্যাপারে দর্শক বা শ্রোতৃবর্গের যদি আগ্রহ না থাকে, তবে সমগ্র অভিনয়ব্যাপারটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই নাট্যপরিবেশনার প্রারম্ভেই-ই অভিনেয় বিষয়বস্তুর প্রতি সহৃদয় সামাজিকের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মূল নাট্যাংশ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নট-নটী-নাটক-নাট্যকার-সভ্যের প্রশংসার দ্বারা দর্শকমণ্ডলীর প্রবৃত্তির উন্মুখীকরণ অর্থাৎ উপস্থাপিত অভিনয়দর্শনে তাঁদের কৌতুহলবর্ধনের নাম-ই প্ররোচনা। নাট্যবস্তুর প্রতি রুচি বা আগ্রহ উৎপাদন করে বলে, নাট্যদর্পণে প্ররোচনা পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হচ্ছে এভাবে – ‘প্রকৃতো2র্থঃ প্রকর্ষেণ রোচ্যতে উপাদেয়তয়া ধ্রিয়তে2নয়েতি প্ররোচনা’।[১১] উল্লেখ্য, অভিনবভারতীতে-ও এক-ইভাবে প্ররোচনা পদের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে – ‘প্ররোচনা প্রকৃষ্টরুচিহেতুভূতত্বাৎ’ (না.শা. পঞ্চম অধ্যায়)। রূপকের পূর্বরঙ্গ অংশে এই প্ররোচনার অনুষ্ঠান করণীয়।

নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে ও বিংশ অধ্যায়ে প্ররোচনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে প্ররোচনার সংজ্ঞা ও বিংশ অধ্যায়ে প্ররোচনার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রসম্মত প্ররোচনালক্ষণটি হল–

“উপক্ষেপেণ কার্যস্য হেতুযুক্তিসমাশ্রয়া।
সিদ্ধেনামন্ত্রণা যা তু বিজ্ঞেয়া সা প্ররোচনা ॥”(না.শা. ৫/২৯)

– নাট্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে কার্যসিদ্ধি পদের অর্থ হল, সামাজিকবর্গসমক্ষে প্রস্তুত অভিনয়বিষয়ের সফল পরিবেশনা। এতদুদ্দেশ্যে যুক্তিতর্ক দ্বারা (দর্শকবর্গের প্রতি) যে আমন্ত্রণ নাট্যক্রিয়ার সূচনা করে, তাকে-ই প্ররোচনা নামে অভিহিত করা হয়। নাট্যশাস্ত্রের বিংশ অধ্যায়ে আরো বলা হচ্ছে, পূর্বরঙ্গে বিধেয় এই প্ররোচনা জয় ও অভ্যুদয়সম্পন্ন, মঙ্গলজনক, বিজয়সূচক এবং সর্বপাপবিনাশক–

“জয়াভ্যুদয়মাপন্না মঙ্গল্যা বিজয়াবহা।
সর্বপাপপ্রশমনী পূর্বরঙ্গে প্ররোচনা ॥” (না.শা. ২০/২৮)

পরভাবী দশরূপক, ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণ, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি গ্রন্থে-ও প্রস্তুত অর্থের প্রশংসাপূর্বক শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তির উন্মুখীকরণকে প্ররোচনা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্ররোচনার সংজ্ঞানির্ণয়াবসরে নাটকলক্ষণরত্নকোশে একটু ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। আচার্য সাগরনন্দীর মতে, প্রসিদ্ধ অর্থকে যে উপস্থাপিত করে, তাকে-ই প্ররোচনা বলা হয় –'প্রসিদ্ধার্থপ্রদর্শিনী প্ররোচনাভিধীয়তে' (না.ল.র.একাদশ অধ্যায়)। উদাহরণরূপে সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীহরির অলৌকিক সাত্ত্বিক বিভাবের বর্ণনায় রচিত একটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে। সমুদ্রমন্থন, শ্রীহরির উদ্দীপ্ত বিভাব ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বস্তুর উপস্থাপনার কারণে এটি প্ররোচনার উদাহরণ। এই গ্রন্থে প্ররোচনার আরেকটি লক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে, তবে তার প্রবক্তা আচার্যের নামটি বলা হয়নি। তদনুসারে, সংঘটিত কাহিনীর উল্লেখের দ্বারা প্রস্তুত কাব্যকে উপস্থাপিত করার প্রক্রিয়ার নাম প্ররোচনা – "অন্যে ত্বাহুঃ –

প্রস্তুতস্যৈব কাব্যস্য যন্নিষ্পন্নেন বস্তুনা।

কথনং সা প্ররোচনা......॥" (না.ল.র. একাদশ অধ্যায়)

নাট্যশাস্ত্রাদিতে প্রাপ্ত লক্ষণ থেকে উল্লিখিত লক্ষণদুটি সর্বাংশে পৃথক এবং ব্যাখ্যা দুটি-ও প্রাঞ্জল নয়।

পূর্বে-ই বলা হয়েছে যে, প্ররোচনার অনুষ্ঠান হয় রূপকের পূর্বরঙ্গ অংশে। নাট্যাভিনয়ের পূর্বে রঙ্গের বিঘ্নশান্তির জন্য কুশীলবগণ যে মঙ্গলাচরণ করেন, তাকে-ই পূর্বরঙ্গ বলা হয়। অভিনয় আরম্ভের পূর্বে বাদ্যযন্ত্রবিন্যাস,যন্ত্রে সুরবিন্যাস ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ থেকে শুরু করে মূল রূপকের পাত্রপ্রবেশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নৃত্য-গীতাদি, দেবদ্বিজস্তুতি ইত্যাদি সমস্ত-ই পূর্বরঙ্গের অঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রমতে পূর্বরঙ্গের এই অঙ্গগুলি সংখ্যায় ঊনিশটি (মতান্তরে কুড়ি)। নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের নয় থেকে ষোলো সংখ্যক শ্লোকে এগুলির তালিকা এবং পঁয়তাল্লিশ থেকে চুয়ান্ন সংখ্যক শ্লোকে এগুলির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[১২] এগুলির মধ্যে প্রত্যাহারাদি প্রথম নয়টির অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে যবনিকার অন্তরালে, অন্যগুলির অনুষ্ঠান দর্শকসমক্ষে। নাট্যদর্পণকাররা কিন্তু এই জটিল, নানা ভেদে বিভক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী পূর্বরঙ্গের সর্বাঙ্গীন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন স্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে তাঁরা তিনটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন – প্রথমতঃ, এই অঙ্গগুলি স্বতোপ্রসিদ্ধ। অতএব এদের পৃথক বিবরণের প্রয়োজন নেই; দ্বিতীয়তঃ, পূর্বরঙ্গের এই সুদীর্ঘ ব্যাপারের ক্রমিক অনুষ্ঠান একান্ত নিষ্ফল এবং তৃতীয়তঃ, পূর্বরঙ্গের অন্তর্গত দেবস্তুতির অংশটি দেবভক্তিপরায়ণ ও প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ ভক্তদের প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছু-ই নয়। বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে– 'অস্মাভিস্তু স্বতো লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ তন্ন্যাসক্রমস্য নিষ্ফলত্বাদ্ বিবিধদেবতাপরিতোষরূপস্য তৎফলস্য চ শ্রদ্ধালুপ্রতারণমাত্রত্বাদুপেক্ষিতানি'।[১৩] প্রথম দুটি অভিমত যুক্তিসঙ্গত হলে-ও, তৃতীয় মতটির

যৌক্তিকতা একান্তরূপে ব্যক্তিগত বিচারাধীন। জৈনাচার্য রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য-আচারবিরোধিতার প্রতিফলন এখানে স্পষ্ট।

যাই হোক্, প্ররোচনাকে কিন্তু নাট্যদর্পণে পূর্বরঙ্গের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে স্বীকার করা হয়েছে। গ্রন্থকারদের মতে, প্ররোচনা কেবল পূর্বরঙ্গের অঙ্গ নয়, নাট্যবস্তুর প্রতি আগ্রহ উৎপাদনের কারণে এটি যেন মূল অভিনয়ের-ই অংশভূত অবিচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ – ‘প্ররোচনা তু পূর্বরঙ্গাঙ্গভূতা2পি নাট্যে প্রবৃত্তৌ প্রধানমঙ্গমিতি লক্ষ্যতে’।[১৪] এই গুরুত্বের কারণে-ই পূর্বরঙ্গের অন্যান্য অঙ্গগুলির আলোচনা না থাকলে-ও, প্ররোচনার (এবং পরবর্তী অধ্যায়ে নান্দী ও ধ্রুবার) সম্পর্কে নাট্যদর্পণে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যদর্পণে এ-ও বলা হচ্ছে যে, প্ররোচনা পূর্বরঙ্গের প্রথমে বা পরে– যেকোনো অংশে অনুষ্ঠিত হতে পারে; এবিষয়ে কোনো বিশেষ ক্রম অনুসরণের বাধ্যবাধকতা নেই।

প্ররোচনার উদাহরণরূপে ক্ষীরস্বামীরচিত ‘অভিনবরাঘব’ এবং রামচন্দ্রের স্বকৃত ‘রঘুবিলাস’ ও ‘নলবিলাস’ – এই তিনটি রূপকের অংশবিশেষ উপন্যস্ত হয়েছে। আমরা কেবল তৃতীয় উদাহরণটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করবো–

“কবিঃ কাব্যে রামঃ সরসবচসামেকবসতিঃ
নলস্যেদং হৃদ্যং কিমপি চরিতং ধীরললিতম্।
সমাদিষ্টো নাট্যে নিখিলনটমুদ্রাপটুরহং
প্রসন্নঃ সভ্যানাং কটরি! ভগবানদ্য স বিধিঃ ৷৷”

–উল্লিখিত শ্লোকের প্রথম চরণে নাট্যকার রামচন্দ্রের, দ্বিতীয় চরণে অভিনেয় বস্তু নিষধাধিপতি নলের পুণ্যচরিতের, তৃতীয় চরণে নট-নটী ও নাট্যকৌশল প্রয়োগের এবং চতুর্থ চরণে আগত সামাজিকবর্গের স্তুতির দ্বারা প্রস্তুত অভিনয় নলবিলাসের প্ররোচনা সুসম্পন্ন হয়েছে।

২. সাত্ত্বতীবৃত্তি ঃ

সাত্ত্বতীবৃত্তির নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – ‘সাত্ত্বতী সত্ত্ববাগঙ্গাভিনেয়ং কর্মমানসম্’ (না.দ. ৩/৪)– ‘সত্ত্ব’ অর্থাৎ মন, ‘সাত্ত্বত’ অর্থাৎ মানসব্যাপার। অতএব মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহের অভিনয় ঘটে যে বৃত্তির মাধ্যমে, তার-ই নাম সাত্ত্বতীবৃত্তি। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে বৃত্তিচতুষ্টয়ের উদ্ভববিষয়ক আলোচনায় অভিনবগুপ্তাচার্য তাই বলছেন– “মনোব্যাপাররূপা সাত্ত্বিকী সাত্ত্বতী। সদিতি প্রখ্যারূপং সংবেদনম্। তদ্যত্রাস্তি তৎসত্ত্বং মনঃ। তস্যেয়মিতি”(না.শা.প্রথম অধ্যায়)।এই বৃত্তিতে আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক–ত্রিবিধ অভিনয় থাকলে-ও, মনোব্যাপারের সত্ত্বপ্রধানত্বের কারণে এই বৃত্তিটির

নাম সাত্ত্বতী। অভিনবভারতীতে তাই বলা হচ্ছে – 'তেষু বাগঙ্গাভিনয়যুক্তা সতী, সত্ত্বস্য সাত্ত্বিকাভিনয়স্যাধিকারে আধিক্যক্রিয়য়া সাত্ত্বতীবৃত্তির্যুক্তা ভবতীতি সম্বন্ধঃ' (না.শা. বিংশ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রে শ্রীহরি ও দৈত্যদ্বয়ের সংগ্রামের পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে এই বৃত্তির উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। তদনুসারে, এই সংগ্রামকালে 'শার্ঙ্গ' নামক ধনুর 'বল্গিত' অর্থাৎ জ্যা আরোপ, দীপ্ত স্তোত্রসমূহের উচ্চারণ এবং অসংভ্রান্ত সত্ত্ববাহুল্য থেকে সাত্ত্বতীবৃত্তির উদ্ভব –

"বল্গিতৈঃ শার্ঙ্গধনুষস্তোত্রৈর্দীপ্তিকৈরথ।
সত্ত্বাধিকৈরসংভ্রান্তৈঃ সাত্ত্বতী তত্র নির্মিতা ॥ " (না.শা. ২০/১২)

সাত্ত্বতীবৃত্তির অভিনয় হবে – 'সার্জবাধর্ষমুদ্‌ধৈর্যম্' (না.দ.৩/৪)–'আর্জব' অর্থাৎ অকপটতা, 'আধর্ষ' অর্থাৎ ন্যক্কারপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগ, 'মুদ্' অর্থাৎ হর্ষ, 'ধৈর্য' অর্থাৎ বিপদে-ও চিত্তস্থৈর্য্য। আর্জবপদের দ্বারা কুটিলতার অভাব, আধর্ষপদের দ্বারা বহুসংখ্যক উদ্ধত পুরুষের অবস্থিতি, মুদ্‌পদের দ্বারা শোক-কারুণ্য ও নির্বেদের অভাব এবং ধৈর্যপদের দ্বারা স্ত্রীসম্ভোগাদিতে অনাসক্তি দ্যোতিত হয়েছে। এই সকল বিষয়ে অবধানপূর্বক, বিচিত্র-গম্ভীর উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা প্রারব্ধ কার্যের নিষ্পাদন,নূতন কার্য পরিগ্রহ, অন্য ব্যক্তির উৎসাহবৃদ্ধি, সামাদি লৌকিক উপায়চতুষ্টয়ের দ্বারা বা কোনো দৈব উপায়ের দ্বারা শত্রুসমূহের মধ্যে ভেদস্থাপন ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মানসকর্মের অভিনয় সম্পাদিত হয় সাত্ত্বতীবৃত্তির মাধ্যমে।

নাট্যদর্পণমতে এই সাত্ত্বতীবৃত্তি রৌদ্র, বীর,শান্ত ও অদ্ভুতরসে আশ্রয়ণীয়া– 'রৌদ্রবীরশমাদ্ভুতম্'(না.দ.৩/৪)।রৌদ্ররসে উত্তেজনা, আক্রমণ, তর্জন, নিজকীর্তিকথন ইত্যাদি; বীররসে যুদ্ধ, দান, দয়া, বীরত্বাদি; অদ্ভুতরসে বিস্ময়াবহ কোনো বস্তু বা ঘটনাপ্রত্যক্ষে আবেগ, রোমাঞ্চ, হর্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মানসব্যাপারের অনুষ্ঠান হয় সাত্ত্বতীবৃত্তির দ্বারা। শান্তরসের ক্ষেত্রে বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, অরিষড়্‌বর্গ অর্থাৎ আন্তর রিপুসমূহকে জয় করে, সুখ-দুঃখ-ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-চিন্তা-ইচ্ছাদিরহিত শান্ত মানসিক অবস্থায়, নির্বেদ-হর্ষ-সর্বভূতে দয়া ইত্যাদি যে সকল মনোব্যাপারের উৎপত্তি হয়, সেসব-ও অভিনীত হয় এই সাত্ত্বতীবৃত্তির মাধ্যমে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রৌদ্ররস ব্যতীত অপর তিনটি রসে সাত্ত্বতীবৃত্তির প্রয়োগ নাট্যশাস্ত্রে-ও স্বীকার করা হয়েছে – 'সাত্ত্বতী চাপি বিজ্ঞেয়া বীরাদ্ভুতশমাশ্রয়া' (না.শা. ২০/৭৪)। লক্ষণীয়, রসবিমর্শে মহর্ষি ভরত শান্তরসের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার না করলে-ও, বৃত্তিবিকল্পে কিন্তু তিনি শান্তরসকে স্বীকার করছেন। অভিনবগুপ্তাচার্য টীকায় মন্তব্য করেছেন– 'অত্র শমশব্দঃ শান্তরসপরিগ্রহ ইতি তদ্বাদিনো মন্যন্তে' (না.শা. বিংশ অধ্যায়)।

সাত্ত্বতীবৃত্তির নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণটি হল–

"যা সাত্ত্বতেনেহ গুণেন যুক্তা ন্যায়েন বৃত্তেন সমন্বিতা চ।

হর্ষোৎকটা সংহৃতশোকভাবা সা সাত্ত্বতী নাম ভবেত্তু বৃত্তিঃ ॥'' (না.শা. ২০/৪১)

– অর্থাৎ সাত্ত্বতগুণযুক্ত, ন্যায়বৃত্তসমন্বিত, প্রভূত হর্ষযুক্ত এবং সংহৃতশোক বৃত্তির নাম সাত্ত্বতী।এই বৃত্তির আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রের অপর একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে–

''বীরাদ্ভুতরৌদ্ররসা বিজ্ঞেয়া স্বল্পকরুণশৃঙ্গারা।

উদ্ধতপুরুষপ্রায়া পরস্পরাধর্ষণকৃতা চেতি ॥''(না.শা. ২০/৪৩)

– অর্থাৎ সাত্ত্বতীবৃত্তিতে বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসের প্রয়োগ হয়। এতে স্বল্প পরিমাণ করুণ ও শৃঙ্গার রস-ও থাকতে পারে। উদ্ধত পুরুষের প্রাচুর্য এবং পারস্পরিক অবমাননা এই বৃত্তির বৈশিষ্ট্য।প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য, উল্লিখিত লক্ষণের 'সংহৃতশোকভাব' এবং দশরূপকের সাত্ত্বতীলক্ষণের 'বিশোকা' পদদ্বয়ের দ্বারা এই বৃত্তিতে অল্প শোক তথা করুণরস থাকতে পারে– এমন অর্থের অনুমান অসঙ্গত হয় না।

ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ কবিরাজ, রূপ গোস্বামী প্রমুখ পরভাবী আচার্যদের মতে, 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ অধ্যবসায়, এই সত্ত্ব থেকে-ই সাত্ত্বতীবৃত্তির উদ্ভব। এঁদের মতে, অধ্যবসায়-শৌর্য-ত্যাগ-দয়া-ঋজুতাদি গুণের প্রাচুর্যে পূর্ণ, হর্ষপ্রধান, শোকশূন্য, অদ্ভুতরস-সমন্বিত, উৎসাহ-উত্তেজনায় সমুজ্জ্বল বৃত্তি-ই হল সাত্ত্বতীবৃত্তি। দর্পণকারের মতে, এই বৃত্তি অল্প শৃঙ্গারসংযুক্ত– 'ক্ষুদ্রশৃঙ্গারা' (সা.দ.৬/১২৮)। আচার্য সাগরনন্দীর মতে, এই বৃত্তি পাঞ্চালী রীতির অঙ্গ।

ভরতাদি সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ সাত্ত্বতীবৃত্তির চারটি ভেদ স্বীকার করেছেন। এই ভেদচতুষ্টয় হল– সংলাপ বা সংলাপক, উত্থাপক, সাজ্ঘাত্য ও পরিবর্তক । নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে–

''উত্থাপকশ্চ পরিবর্তকশ্চ সংলাপকশ্চ সংঘাত্যঃ।

চত্বারো2স্যা ভেদা বিজ্ঞেয়া নাট্যতত্ত্বজ্ঞৈঃ ॥'' (না.শা. ২০/৪৪)

কিন্তু যেহেতু নাট্যদর্পণে সাত্ত্বতীবৃত্তির কোনোরূপ ভেদ স্বীকার করা হয়নি,তাই উক্ত ভেদচতুষ্টয়ের পৃথক আলোচনা এখানে করা হল না।

নাট্যদর্পণে ভারত্যাদি অন্য তিনটি বৃত্তির একাধিক উদাহরণ দেওয়া হলে-ও, আশ্চর্যজনকভাবে, সাত্ত্বতীবৃত্তির কোনো উদাহরণ দেওয়া হয়নি। অভিনবভারতীতে বেণীসংহার থেকে গৃহীত ''স্পৃষ্টা যেন শিরোরুহেষু.....'' ইত্যাদি শ্লোকটি সাত্ত্বতীবৃত্তির উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে।

৩.কৈশিকীবৃত্তি ঃ

নাট্যদর্পণমতে 'কৈশিকী' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'কেশিকা' পদ থেকে। 'কেশিকা' – অর্থাৎ কেশপ্রাচুর্য যাদের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ নারী।[১৫] নারীদের বহুল উপস্থিতির কারণে-ই এই বৃত্তির এই নাম। বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'অতিশায়িনঃ সন্ত্যাসামিতি কেশিকাঃ স্ত্রিয়ঃ....তৎপ্রধানত্বাদ্ তাসামিয়ং

কৈশিকী'।[১৬] অভিনবগুপ্তাচার্যের মতে, কেশ যেমন মানবদেহের সৌন্দর্যবর্ধক, এই কৈশিকীবৃত্তি-ও অনুরূপভাবে নাট্যদেহের শোভাসম্পাদক; এই কারণে-ই এই বৃত্তির এই নাম – ''কেশাঃ কিঞ্চিদপ্যর্থক্রিয়াজাতমুপকুর্বন্তো দেহশোভোপযোগিনঃ। তৎসৌন্দর্য্যোপযোগী ব্যাপারঃ কৈশিকীবৃত্তিরিতি।'' (না.শা. প্রথম অধ্যায়)

নাট্যশাস্ত্রে কৈশিকীবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কে একটি পৌরাণিক বার্তার উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে, মধুকৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত শ্রীহরি লীলাজাত বিচিত্র অঙ্গহারসমূহের দ্বারা যে শিখাবন্ধন করেছিলেন, তা থেকে-ই কৈশিকীবৃত্তির উদ্ভব–

''বিচিত্রৈরঙ্গহারৈস্তু দেবো লীলাসমুদ্ভবৈঃ ।

ববন্ধ যচ্ছিখাপাশং কৈশিকী তত্র নির্মিতা ॥'' (না.শা. ২০/১৩)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'নাটকচন্দ্রিকা' গ্রন্থে এই পৌরাণিক কাহিনীটির ইঙ্গিত দিয়েছেন – 'হরেঃ কেশাভিসম্বন্ধাৎ কৈশিকীতি প্রথাং গতা।' (না.চ. শ্লোক সংখ্যা ৬২২)।ডঃ. রাঘবন এই কাহিনীটির প্রতি একেবারে-ই আস্থাশীল নন। তাঁর মতে, বিদর্ভের রাজধানী 'ক্রথকৈশিক' বা 'কৈশিক'-এর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এই বৃত্তিটির এই নাম।[১৭]

নৃত্য-গীত-বাদ্যে সমৃদ্ধ এবং স্ত্রীচরিত্রবহুল এই কৈশিকীবৃত্তির প্রধান লক্ষণ হল কামসম্ভোগ। নর্মযুক্ত এই বৃত্তিতে থাকে শৃঙ্গাররসের অভিনয়োপযোগী চমৎকার সংলাপ এবং মাল্যাদি বিবিধ প্রকার বিভূষণ। সুকুমার কাব্যবন্ধ, উজ্জ্বল বেশবাস ও আভরণ, কামোপকরণের বাহুল্য এই বৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর প্রেমপ্রণয়োচ্ছল, কান্তকোমল, সর্বজনবোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্য এই বৃত্তি যথার্থ-ই সর্বমনোহারিণী। অভিনবগুপ্তাচার্যের মতে–'যৎকিঞ্চিৎ লালিত্যং তৎ সর্বং কৈশিকীবিজৃম্ভিতম্' (না.শা.প্রথম অধ্যায়)।

অন্যান্য বৃত্তিসমূহের ন্যায় এই বৃত্তিটি-ও কায়মনোবাক্যজ ব্যাপারত্রয়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়। শৃঙ্গাররসের রত্যাখ্য ভাবে মানসব্যাপার, হাস্য ও বিভিন্ন নর্মভেদে বাচিক ব্যাপার এবং এইসব কিছুর অভিনয়কালে কায়িক ব্যাপারের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। এই বৃত্তি বৈদর্ভী রীতির অঙ্গ বলে আচার্য সাগরনন্দীর অভিমত।

নাট্যশাস্ত্রে-ও স্ত্রীবহুল, নৃত্তগীতসমন্বিত, সূক্ষ্ম বিলাসবসনে চিত্রিত, রতিকর্মোপযোগী উপাদানে পূর্ণ বৃত্তিকে কৈশিকীবৃত্তি রূপে অভিহিত করা হয়েছে–

'' যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষচিত্রা স্ত্রীসংযুতা যা বহুনৃত্তগীতা।

কামোপভোগপ্রভবোপচারা তাং কৈশিকীং বৃত্তিমুদাহরন্তি ॥''(না.শা.২০/৫৩)

দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ, ভাবপ্রকাশন ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে অনুরূপ ভাবে-ই কৈশিকীবৃত্তির লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

কৈশিকীবৃত্তিতে স্ত্রীজনের এই প্রাধান্যের বিষয়টি নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে-ই উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, নারী ব্যতিরেকে কেবল পুরুষগণ যথাযথভাবে এই বৃত্তির প্রয়োগ করতে পারে না। তাই প্রভু ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে নাট্যশোভাপ্রয়োগে নিপুণ অপ্সরাদের সৃষ্টি করলেন–

''ন শক্যা পুরুষৈঃ সাধু প্রযোক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে।

ততো2সৃজন্ মহাতেজা মনসো2প্সরসো বিভুঃ॥

নাট্যালঙ্কারচতুরাঃ... ।" (না.শা.১/৪৬,৪৭)

নাট্যশাস্ত্রে এই বৃত্তির চারটি অঙ্গ স্বীকার করা হয়েছে– নর্ম, নর্মস্ফূর্জ, নর্মস্ফোট এবং নর্মগর্ভ–

''নর্ম চ নর্মস্ফূর্জো নর্মস্ফোটো2থ নর্মগর্ভশ্চ।

কৈশিক্যাশ্চত্বারো ভেদা হ্যেতা সমাখ্যাতাঃ ॥''(না.শা. ২০/৫৬)

'নর্মস্ফূর্জ' অঙ্গটির নাম গ্রন্থভেদে সামান্য পরিবর্তিত হলে-ও, এই ভেদচতুষ্টয় পূর্বাপর প্রায় সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ স্বীকার করেছেন এবং মহর্ষি ভরতের অনুসরণে এগুলির লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম নাট্যদর্পণ। এই গ্রন্থে কৈশিকীবৃত্তির কোনো ভেদ স্বীকার করা হয়নি। এঁরা কেবলমাত্র নর্ম-কে স্বীকার করেছেন; তবে কৈশিকীবৃত্তির ভেদরূপে নয়, নৃত্যগীতবাদ্যাদির মত একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে।

এবার নর্মবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক্। নাট্যদর্পণমতে, প্রিয়জনের প্রসন্নতাবিধায়ক অগ্রাম্য পরিহাসকে নর্ম বলা হয় – 'অগ্রাম্য ইষ্টজনাবর্জনরূপো বাগ্‌বেষচেষ্টাভিঃ পরিহাসো নর্ম'।[১৮] উল্লেখ্য, এই লক্ষণটি দশরূপককারনির্ণীত নর্মলক্ষণটির অবিকল অনুরূপ। পরভাবী দর্পণকার-ও প্রিয়জনের সন্তোষবিধায়ক বৈদগ্ধ্যক্রীড়াকে নর্মরূপে অভিহিত করেছেন–

''বৈদগ্ধ্যক্রীড়িতং নর্ম ॥

ইষ্টজনাবর্জনকৃৎ ..... । '' (সা.দ. ৬/১২৫,১২৬)

আচার্য রূপগোস্বামী-ও নর্মের এক-ই প্রকার লক্ষণ নির্ণয় করেছেন।

নাট্যশাস্ত্রমতে, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, প্রয়াস ও প্রসন্নতাবিধায়ক এবং স্বীয় অনুরাগনিবেদক বাক্যের নাম নর্ম–

''ঈর্ষ্যাক্রোধপ্রয়াসোপলম্ভবচনানুবিদ্ধং চ।

আত্মোপক্ষেপকৃতং সবিপ্রলম্ভং স্মৃতং নর্ম ॥''(না.শা. ২০/৫৮)

আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে, ঈর্ষ্যাপ্রকাশক,তিরস্কারমূলক এবং চিত্তাকর্ষক হাস্যপ্রায় বাক্যের নাম নর্ম। অন্যদিকে আচার্য সাগরনন্দী পরনিন্দা, রূঢ়তা ও অশ্লীলতাবর্জিত শুদ্ধ বা ছলগর্ভ বাক্যে হৃদ্‌গত আকুল বাসনার প্রকাশকে নর্ম আখ্যায় অভিহিত করেছেন। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হচ্ছে–

"পরাপবাদৈঃ পরুষৈরশ্লীলৈশ্চ বিবর্জিতম্।

শুদ্ধমন্তর্গতাকূতং নর্ম স্যাচ্ছদ্মগর্ভকম্ ॥" (না.ল.র. একাদশ অধ্যায়)

এই গ্রন্থে জনৈক পূর্বাচার্যসম্মত আরেকটি নর্মলক্ষণের উল্লেখ করা হচ্ছে–

"শৃঙ্গারোদ্দীপনো যঃ স্যাৎ পরিহাসঃ সবিভ্রমঃ।

স্ত্রীপুংসয়োস্তু নর্মৈতদ্ধাস্যভেদব্যবস্থিতম্ ॥"(না.ল.র. একাদশ অধ্যায়)

–অর্থাৎ শৃঙ্গারের উদ্দীপক নারী-পুরুষের সবিভ্রম যে হাস্য-পরিহাস, তাই হাস্যাশ্রয় নর্ম নামে অভিহিত।

নর্ম প্রথমতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত – সহাস্য নর্ম, শৃঙ্গারাত্মক নর্ম ও ভয়যুক্ত নর্ম। এই প্রত্যেক প্রকার নর্ম আবার বাক্য, বেশভূষা ও চেষ্টার দ্বারা প্রকাশমানতা হেতু ত্রিবিধ। নাট্যদর্পণে যেহেতু কেবলমাত্র সহাস্য নর্মের সোদাহরণ আলোচনা করা হয়েছে, তাই আমরা-ও কেবলমাত্র এই প্রকার নর্মের আলোচনা-ই করব, অন্য দুটি প্রকারের নয়।

সহাস্য বাক্যযুক্ত নর্মের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের অন্তর্গত এই শ্লোকটি উপন্যস্ত হয়েছে–

"পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্বম্।

সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥"

– জনৈকা সখী পার্বতীর পদদ্বয় অলক্তরাগে রঞ্জিত করে একথা বলছেন। তা শুনে পার্বতীর সলজ্জ ক্রোধের প্রকাশ সহাস্য বাক্যনর্মের উদাহরণ।

বেষনর্মের প্রকাশ দেখা যায় 'নাগানন্দ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বিদূষক এবং বিট শেখরকের বেশভূষায়।

চেষ্টানর্মের উদাহরণরূপে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে স্বপ্নাচ্ছন্ন বিদূষককে দণ্ডের দ্বারা আঘাত করে নিপুণিকার দ্বারা বিদূষকের মধ্যে সর্পভীতি সঞ্চারের ঘটনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সহাস্য নর্মের নাট্যদর্পণোক্ত উদাহরণগুলি সম্ভবতঃ দশরূপক থেকে গৃহীত।

নাট্যদর্পণে সহাস্য নর্ম ব্যতীত অপর কোনো নর্মভেদ বিষয়ে আলোচনা না করা হলে-ও, পরিশেষে বলা হচ্ছে যে, এই নর্মের মান, হাস্য, শৃঙ্গারহাস্য, ভয়হাস্য, নায়িকার মানভঞ্জনের জন্য অপরাধী নায়কের পুনঃ-পুনঃ প্রচেষ্টা, পূর্বনায়িকার থেকে ভীতি ইত্যাদি আরো বিভিন্ন প্রকার ভেদ কল্পনা করা যেতে পারে।

৪.আরভটীবৃত্তি ঃ

'আরভটী' পদের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'আরেণ প্রতোদকেন তুল্যা ভটা উদ্ধতাঃ পুরুষা আরভটাস্তে সন্ত্যস্যামিতি'[১৯] – 'আর' অর্থাৎ 'প্রতোদ' অর্থাৎ অঙ্কুশের ন্যায় খরতেজা, দীপ্ত, উদ্ধত পুরুষগণের প্রাচুর্য এবং তাদের নানা প্রকার রৌদ্রদীপ্ত আচরণের বর্ণনা থাকে যে বৃত্তিতে, তার নাম আরভটীবৃত্তি। অভিনবভারতীতে-ও বলা হচ্ছে – 'আরভটানাং যে গুণাঃ ক্রোধাবেগাদ্যাস্তে (প্রায়েণ) বাহুল্যেন যত্র' (না.শা. বিংশ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণু ও দৈত্যদ্বয়ের সংগ্রামের পূর্বোক্ত পৌরাণিক বৃত্ত থেকে আরভটীবৃত্তির উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। তদনুসারে, এই যুদ্ধ থেকে-ই সংরম্ভ (অর্থাৎ ক্রোধ) ও আবেগবহুল, বিচিত্র নিযুদ্ধসমন্বিত এবং বিবিধ প্রকার চারী (পদ, জঙ্ঘা, উরু ও কটিদেশের যুগপৎ সঞ্চালনরূপ শারীরিক ব্যায়াম) থেকে উদ্ভূত আরভটীবৃত্তির সৃষ্টি হল –

''সংরম্ভাবেগবহুলৈর্নানাচারীসমুত্থিতৈঃ ।
নিযুদ্ধকরণৈশ্চিত্রৈরুৎপন্নারভটী ততঃ ॥'' (না.শা.২০/১৪)

নাট্যদর্পণমতে, এই বৃত্তি হল – 'অনৃতদ্বন্দ্বছদ্মদীপ্তরসান্বিতা' (না.দ.৩/৬)– 'অনৃত' অর্থাৎ অসত্য, 'দ্বন্দ্ব' অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধ, 'ছদ্ম' অর্থাৎ বঞ্চনা বা ছলনা; এর দ্বারা ইন্দ্রজাল-মায়া-'পুস্ত প্রয়োগ' অর্থাৎ দারু বা চর্মনির্মিত দ্রব্য ব্যবহার, ছেদন, ভেদন ইত্যাদির গ্রহণ করা হচ্ছে। এই বৃত্তি রৌদ্র, বীর ইত্যাদি দীপ্তরসের দ্বারা অন্বিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণকাররা ইতিপূর্বে সাত্ত্বতীবৃত্তির আশ্রয়ণীয় রসরূপে-ও রৌদ্র ও বীররসকে স্বীকার করেছেন। অতএব এই লক্ষণটিকে নির্দোষ বলা যায় না, কারণ অভিনয়কালে উক্ত রসদ্বয়ের প্রয়োগে ঠিক কোন্ বৃত্তিটি প্রযুক্ত হচ্ছে, সাত্ত্বতী না আরভটী, তার স্থিরীকরণে সমস্যা রয়ে যায়।

এবার আমরা আরভটীবৃত্তির বিষয়সমূহের সোদাহরণ আলোচনা করবো। অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাচার নানাভাবে সংঘটিত হতে পারে – নেপথ্যে সংঘটিত কোনো ঘটনার মিথ্যা বিবরণ, যথা – বেণীসংহারে দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে অশ্বত্থামা নামক হস্তীর পরিবর্তে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিধনের বার্তা; পুস্তপ্রয়োগ, যথা - রত্নাবলীতে কাষ্ঠ- নির্মিত হস্তীর ব্যবহার; ইন্দ্রজালের দ্বারা কোনো অলীক

বস্তুর প্রদর্শন, যথা– রামাভ্যুদয়ে মায়াশিরোদর্শন ইত্যাদি। অনৃতপদের দ্বারা কপটের-ও গ্রহণ হবে। ‘কপট’ অর্থাৎ আপাতসত্য ছলনা। এই কপট ত্রিবিধ – বঞ্চকাবিনাভাবী, বঞ্চকসম্ভবী এবং দৈবসম্ভবী।[২০] এই কপটের কারণে-ই আরভটী বৃত্তিতে দম্ভ ও অসত্যবচনের প্রাধান্য বলে অভিনবগুপ্তাচার্যের অভিমত– ‘যত এবাস্যাং কপটযোগো2তএব দম্ভপ্রাধান্যমসত্যবচনসম্ভবশ্চ’ (না.শা. বিংশ অধ্যায়)। এই বৃত্তিতে ভয়, আনন্দ ইত্যাদির কারণে পাত্র-পাত্রীর দ্রুত প্রবেশ ও প্রস্থান অভিনীত হয়। যথা– রত্নাবলীতে বলীমুখের ভয়ে পাত্রপ্রবেশ, সত্যহরিশ্চন্দ্রে ভৃত্য ও চেটীর সানন্দ প্রবেশ ইত্যাদি। পূর্বনায়ক অপসৃত হয়ে অন্যনায়ক পরিগ্রহণ অথবা পূর্ব কোনো মনোভাবের পরিবর্তে নাটকীয় পাত্রের অন্য মনোভাব আশ্রয়-ও এই বৃত্তির বিষয়। যথা – বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীবের নেতৃত্ব, “পুণ্যা ব্রাহ্মণজাতিঃ ....” ইত্যাদি শ্লোকে পরশুরামের ঔদ্ধত্যনিবৃত্তির পর শান্তভাবপ্রাপ্তি ইত্যাদি। এই বৃত্তিতে অচেতন বস্তু, চেতন বস্তু ও মিশ্র বস্তু থেকে জাত ত্রিবিধ বিদ্রবের বর্ণনা থাকে। এই বৃত্তিতে এক-ই সঙ্গে একাধিক সংখ্যায় রস, স্থায়িভাব ও ব্যভিচারভাবসমূহের সন্নিবেশ ঘটতে পারে। যথা– ‘কৃত্যারাবণ’ নামক রূপকে অঙ্গদ-কর্তৃক কেশাকৃষ্টা মন্দোদরীর ভয়, অঙ্গদের উৎসাহ, রাবণকে দেখে “এতেনাপি সুরা জিতাঃ....” ইত্যাদি অংশে অঙ্গদের হাস্য, “যস্তাতেন নিগৃহ্য বালক ইব প্রক্ষিপ্য কক্ষান্তরে.....” ইত্যাদি অংশে এক-ই সঙ্গে জুগুপ্সা, হাস ও বিস্ময়– এই ত্রিবিধ স্থায়িভাব, রাবণের রতি ও ক্রোধ–এই দ্বিবিধ স্থায়িভাব ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। ক্রুদ্ধ দুই ব্যক্তির পারস্পরিক সংঘাত এই বৃত্তির অন্যতম বর্ণনীয় বিষয়। যথা – রামায়ণমূলক নাটকে ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের পারস্পরিক সংগ্রাম ইত্যাদি। উত্তেজনা-প্রবঞ্চনা-ঔদ্ধত্যপ্রধান আরভটীবৃত্তির চরিত্রদৃষ্টে অভিচার-প্রতিশোধ-ইন্দ্রজাল-মারণাদিযুক্ত অথর্ববেদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বাস্তবিক-ই লক্ষণীয়। ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়– “উদারতার অপঘাত ও উত্তেজনার অপগতি, প্রবঞ্চনা ও ঔদ্ধত্য– ‘আরভটী’ বৃত্তিরও প্রধান পরিচয় ইহাই। অথর্ববেদের যে বৈশিষ্ট্য, ইহাও সেই বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই হয়ত বলা হইয়াছে, অথর্বই আরভটী-জননী।”[২১]

নাট্যশাস্ত্রধৃত আরভটীবৃত্তির লক্ষণটি হল–

“আরভটপ্রায়গুণা তথৈব বহুকপটবঞ্চনোপেতা।
দম্ভানৃতবচনবতী ত্বারভটী নাম বিজ্ঞেয়া ॥” (না.শা.২০/৬৪)

– আরভট অর্থাৎ উদ্ধত পুরুষদের গুণে সমৃদ্ধ, বহুবিধ বঞ্চনা ও কপটতার দ্বারা যুক্ত, দম্ভ ও অনৃতবাক্যযুক্ত বৃত্তিকে আরভটী বলা হয়। আরো বলা হয়েছে,এতে পুস্তব্যবহার, লম্ফ, লঙ্ঘন, ছেদন, মায়া, ইন্দ্রজাল, বিচিত্রপ্রকার যুদ্ধ ইত্যাদির সমাবেশ থাকে। এই বৃত্তিতে ষাড়্গুণ্যের ব্যবহার থাকে।

এটি হঠকারিতাপূর্ণ নানাবিধ কার্যকলাপের দ্বারা অন্বিত। এতে ত্রিবিধ বিদ্রবের প্রয়োগ থাকে এবং একপক্ষের লাভ ও অপরপক্ষের ক্ষতি ইত্যাদির বর্ণনা থাকে।

মহর্ষি ভরতকে অনুসরণ করে আচার্য সাগরনন্দী এই বৃত্তির স্বরূপ নির্দেশ করেছেন –

"সমুদ্ধতপ্রায়গুণা বীররৌদ্রাদ্ভুতাত্মিকা।

কপটানৃতদম্ভেষু বঞ্চনাস্কন্দয়োঃ স্থিতা ॥

যুদ্ধনিযুদ্ধেন্দ্রজালমায়াছেদনপ্লুতাভিরারভটী জ্ঞেয়া।"(না.ল.র. একাদশ অধ্যায়)

–ঔদ্ধত্যের প্রাচুর্য এই বৃত্তির বৈশিষ্ট্য; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস এর আত্মা। এই বৃত্তি কপট, মিথ্যা, দম্ভ, বঞ্চনা, আক্রমণ, যুদ্ধ, নিযুদ্ধ, ইন্দ্রজাল, মায়া, ছেদন, প্লুত প্রভৃতির দ্বারা সমন্বিত। গৌড়ীয়া রীতিতে এই বৃত্তির প্রয়োগ হয় বলে আচার্য সাগরনন্দীর অভিমত। আচার্য ধনঞ্জয় ও পরভাবী রূপ গোস্বামী তাঁদের সংক্ষিপ্ত লক্ষণে মায়া-ইন্দ্রজাল-সংগ্রাম-ক্রোধ-উদ্‌ভ্রান্তি প্রভৃতির দ্বারা অন্বিত বৃত্তিকে আরভটীবৃত্তিরূপে অভিহিত করেছেন। দর্পণকার এই তালিকায় যুক্ত করেছেন বধ-বন্ধনাদি কার্যকে। তাঁর মতে, মায়া-ইন্দ্রজাল-সংগ্রাম-ক্রোধ-উদ্‌ভ্রান্তি থেকে উদ্ভূত, বধ-বন্ধনাদি দ্বারা যুক্ত উদ্ধত বৃত্তির নাম আরভটী – "মায়েন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোদ্‌ভ্রান্ত্যাদিচেষ্টিতৈঃ।

সংযুক্তা বধবন্ধাদ্যৈরুদ্ধতারভটী মতা ॥" (সা.দ.৬/১৩২)

নাট্যশাস্ত্রে আরভটীবৃত্তির চারটি ভেদ স্বীকৃত হয়েছে – সংক্ষিপ্তক, অবপাত, বস্তূত্থাপন এবং সংফেট –

"সংক্ষিপ্তকাবপাতৌ বস্তূত্থাপনমথাপি সংফেটঃ।

এতে হ্যস্যা ভেদাঃ........॥"(না.শা. ২০/৬৭)

গ্রন্থবিশেষে এই নামগুলির সামান্য পরিবর্তন ঘটলে-ও, এই ভেদচতুষ্টয় অপরাপর প্রায় সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্ স্বীকার করেছেন। নাট্যদর্পণে অবশ্য যথারীতি আরভটীবৃত্তির-ও কোনোরূপ ভেদ স্বীকৃত হয়নি।

রসভেদে বৃত্তিভেদ ঃ

অনন্তর রসভেদে বৃত্তিভেদের বিচার। রসভেদে অভিনয়ভেদ, অভিনয়ভেদে বৃত্তিভেদ। অতএব রস ও বৃত্তির মধ্যে ওতোপ্রোতঃ সম্পর্ক বিদ্যমান।কোন্ রসে কোন্ বৃত্তির প্রয়োগ হবে, এবিষয়ে মহর্ষি ভরতের অভিমতটি হল –

"হাস্যশৃঙ্গারবহুলা কৈশিকী পরিচক্ষিতা।

সাত্ত্বতী চাপি বিজ্ঞেয়া বীরাদ্ভুতশমাশ্রয়া ॥

রৌদ্রে ভয়ানকে চৈব বিজ্ঞেয়ারভটী বুধৈঃ।

বীভৎসে করুণে চৈব ভারতী সংপ্রকীর্তিতা ॥''(না.শা. ২০/৭৩,৭৪)

– শৃঙ্গার ও হাস্যে কৈশিকী, বীর-অদ্ভুত ও শান্তরসে সাত্ত্বতী, রৌদ্র ও ভয়ানক রসে আরভটী এবং বীভৎস ও করুণ রসে ভারতী বৃত্তির প্রয়োগ হবে।

মহর্ষি ভরতের এই নির্দেশটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কেন, তা অনুধাবন করার জন্য নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের রসবিমর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ের আলোচনায় মহর্ষি তৎসম্মত অষ্টবিধ রসকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন– উৎপাদ্য এবং উৎপাদক । শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রস হল উৎপাদকবর্গ এবং এগুলি থেকে (যথাক্রমে) জাত হাস্য, করুণ, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসচতুষ্টয় হল উৎপাদ্যবর্গ–

''শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ হাস্যো রৌদ্রাচ্চ করুণো রসঃ ।

বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তির্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ ॥''(না.শা.৬/৩৯)

এই নির্দেশ অনুসারে এটি-ই অভিপ্রেত যে, উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধযুক্ত দুটি করে রস সর্বদা একটি বৃত্তির দ্বারা আশ্রিত হবে। অতএব শৃঙ্গার ও হাস্য কৈশিকীবৃত্তির, বীর ও অদ্ভুত সাত্ত্বতীবৃত্তির, রৌদ্র ও করুণ আরভটী বৃত্তির এবং বীভৎস ও ভয়ানক ভারতীবৃত্তির আশ্রয়ণীয় হওয়া উচিৎ। ভরতোক্ত প্রথম দুটি বৃত্তি, অর্থাৎ কৈশিকী ও সাত্ত্বতীর রসব্যবস্থা এই নিয়মানুযায়ী হলে-ও, অবশিষ্ট বৃত্তিদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি মান্য হয়নি; নাট্যশাস্ত্রের বিংশ অধ্যায়ে কিন্তু রৌদ্র ও ভয়ানকরসের জন্য আরভটী এবং বীভৎস ও করুণরসের জন্য ভারতীবৃত্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।অতএব দেখা গেল, রসভেদে বৃত্তিব্যবস্থা সম্পর্কে মহর্ষি ভরতের মতের মধ্যে যথেষ্ট স্ববিরোধিতা বিদ্যমান।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ভারতীবৃত্তির প্রয়োগব্যবস্থাবিষয়ক। নাট্যশাস্ত্রমতে কেবলমাত্র বীভৎস ও করুণরসে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ হবে, অন্যত্র নয়। কিন্তু এই নিয়ম মানলে শৃঙ্গারমূলক নাটক-প্রকরণে, হাস্যপ্রধান প্রহসনে, বীর বা শৃঙ্গারমূলক ভাণে, সর্বরসসমন্বিত বীথীতে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ ব্যাহত হয়ে যায় ; অথচ মহর্ষি স্বয়ং এগুলিতে ভারতীবৃত্তি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

এপ্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণের সংশ্লিষ্ট অংশের একটি টীকার আলোচনা প্রয়োজন। সাহিত্যদর্পণের বৃত্তিব্যবস্থায় বলা হয়েছে, শৃঙ্গাররসে কৈশিকী, বীরে সাত্ত্বতী, রৌদ্র ও বীভৎস রসে আরভটী এবং সর্বপ্রকার রসে সামান্যতঃ ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ হয়–

''শৃঙ্গারে কৈশিকী বীরে সাত্ত্বত্যারভটী পুনঃ।

রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী ॥''(সা.দ. ৬/১২২)

– এই 'বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী' অংশটির ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা শ্রী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁর 'কুসুমপ্রতিমা' টীকায় বলেছেন– শৃঙ্গার-বীর-রৌদ্র-বীভৎস– শ্লোকোক্ত এই রসচতুষ্টয় ব্যতীত অন্যত্র

সকল রসে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ হবে– 'সর্বত্র অপরেষু সর্বেষু রসেষু ভারতী নাম বৃত্তিঃ স্যাৎ।'[২২] এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নয়। নাট্যশাস্ত্রোক্ত মত এবং এই মত– যে কোনোটি-ই মেনে নিলে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র অযৌক্তিকভাবে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে। নাট্যশাস্ত্র থেকে-ই এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে যে, শৃঙ্গারের সঙ্গে হাস্যের , রৌদ্রের সঙ্গে করুণের, বীরের সঙ্গে অদ্ভুতের এবং বীভৎসের সঙ্গে ভয়ানক রসের সম্পর্ক অতি-ঘনিষ্ঠ। অতএব হাস্য, করুণ, অদ্ভুত ও ভয়ানকরসে ভারতীবৃত্তি স্বীকার করলে শৃঙ্গারাদি রসের সঙ্গে-ও এর সম্পর্ককে স্বীকার করতে-ই হয়।

আরো একটি বিষয় এখানে বক্তব্য। প্রতিটি রূপকে প্রস্তাবনার সন্নিবেশ অবশ্যকরণীয়। প্রস্তাবনা মাত্রে-ই বাক্‌প্রধান ভারতীবৃত্তির প্রয়োগাবসর। অর্থাৎ ভারতীবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলে কোনোপ্রকার রূপকের সর্বাঙ্গীণ মঞ্চ পরিবেশনা সফল হতে পারে না। অতএব ভারতীবৃত্তির গতি সর্বত্র, তাকে রসবিশেষে গণ্ডীবদ্ধ করা একান্ত অযৌক্তিক, অনুচিত এবং সর্বথা অসম্ভব। এই কারণে-ই অপরাপর প্রায় সকল নাট্যতাত্ত্বিক সর্বপ্রকার রসে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগকে স্বীকার করেছেন । এই কারণে-ই আচার্য সাগরনন্দী প্রথমে করুণ, অদ্ভুত, বীর ও হাস্যরসের ক্ষেত্রে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগের বিধান দিলে-ও, পরে বলছেন যে, আকাশের মহত্ত্ব যেমন সকল পদার্থকে ব্যাপ্ত করে থাকে, তেমনিভাবে ভারতীবৃত্তি সমস্ত রস পরিব্যাপ্ত করে বর্তমান। নামেমাত্র চারটি বৃত্তির কথা বলা হয়, এদের সবগুলির একীভবন ভারতীতে-ই দেখা যায়–

''রসান্ সর্বানিয়ং বৃত্তির্ভারতী ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
বিভূতির্ব্যোমভূতস্য পদার্থান্ সকলানিব ॥
নামমাত্রসমুদ্দিষ্টাশ্চতস্রো বৃত্তয়ো ময়া
একীভাবস্তু সর্বাসাং ভারত্যামেব দৃশ্যতে ॥''(না.ল.র. একাদশ অধ্যায়)

ভারতীবৃত্তির এই অপরিসীম প্রাধান্যের প্রতি নির্দেশপূর্বক ডঃ. মুখোপাধ্যায় যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন – ''ঋগ্বেদ যেমন আদি ও অগ্রগণ্য বেদ, 'ভারতী'-ও তদ্রূপ প্রথম ও প্রধান বৃত্তি; অন্যবেদত্রয়ে ঋগ্বেদের প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য, অন্য বৃত্তিত্রয়ের বিকাশে 'ভারতী'র অবদানও তদ্রূপ অপরিহার্য।''[২৩]

অদ্ভুতরসের বৃত্তিবিষয়ে-ও কিছু কথা বলা যেতে পারে। অদ্ভুত এমন একটি রস, যা রসমাত্রের-ই সারস্বরূপ। দর্পণকার এই মতের সমর্থনে স্বীয় গ্রন্থে আলঙ্কারিক ধর্মদত্তের গ্রন্থ থেকে এই বিষয়ে তদ্‌গুরু (অর্থাৎ ধর্মদত্তের গুরু) নারায়ণ পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করেছেন–

''তদাহ ধর্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে–
রসে সারশ্চমৎকারো সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।

তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।

তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্ ॥" (সা.দ.ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ আচার্য ধর্মদত্ত বলছেন – 'সর্বপ্রকার রসের সার হল বিস্ময় বা চমৎকার। সুতরাং রসে 'চমৎকার' সারাংশ হওয়ার কারণে সর্বত্র একটি-ই রস–অদ্ভুতরস। সেকারণে পণ্ডিত নারায়ণ অদ্ভুত রসকে-ই (একমাত্র) রস বলে মনে করেন।' এর সঙ্গে সহমত পোষণ করে যদি অদ্ভুতরসকে-ই সর্বরসের সাররূপ বলে স্বীকার করা হয়, তবে অদ্ভুতরসে ভারত্যাদি চতুর্বিধ বৃত্তির ব্যবহার-ও স্বীকার করতে হয়, কেবল সাত্ত্বতীবৃত্তির প্রয়োগ স্বীকার করলে চলে না।

ভাবপ্রকাশনে রস ও বৃত্তিসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে একটি পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে ভরতের (নট?) দ্বারা 'ত্রিপুরদাহ' নামক রূপকের অভিনয়কালে ব্রহ্মার মুখ থেকে চারটি বৃত্তির সঙ্গে চারটি রসের উৎপত্তি হয়। শিব-পার্বতীর সম্ভোগের অভিনয়দর্শনে ব্রহ্মার পূর্বমুখ থেকে উৎপন্ন কৈশিকীবৃত্তি থেকে শৃঙ্গাররসের উদ্ভব, ত্রিপুরমর্দনের অভিনয়কালে ব্রহ্মার দক্ষিণমুখ থেকে উৎপন্ন সাত্ত্বতীবৃত্তি থেকে বীররসের উদ্ভব, দক্ষযজ্ঞধ্বংসের অভিনয়দর্শনে ব্রহ্মার পশ্চিমমুখ থেকে উৎপন্ন আরভটীবৃত্তি থেকে রৌদ্ররস এবং প্রলয়কর্তা মহাদেবের কল্পান্তকর্মের অভিনয়দর্শনে ব্রহ্মার উত্তরমুখ থেকে উৎপন্ন ভারতীবৃত্তি থেকে বীভৎসরসের উদ্ভব হয়। দ্রষ্টব্য, এই কাহিনীতে-ও ভরতোক্ত উৎপাদক রসচতুষ্টয়ের-ই প্রাধান্য। এই রসচতুষ্টয় থেকে-ই পরবর্তীকালে (যথাক্রমে) হাস্য, অদ্ভুত, করুণ ও ভয়ানক রসের উৎপত্তি হল।[২৪]

পূর্বে-ই বলা হয়েছে, আচার্য সাগরনন্দী সর্বব্যাপারাত্মিকা ভারতীবৃত্তিকে সর্বরসে স্বীকার করেছেন। অন্য তিনটি বৃত্তিব্যবস্থায় তিনি মূলতঃ ভরত-অনুসারী। তবে তিনি অতিরিক্তরূপে করুণরসকে কৈশিকীবৃত্তিতে ও রৌদ্ররসকে সাত্ত্বতীবৃত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিক শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিমতটি এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তিনি প্রচলিত আটটি (বা নয়টি) রসের অতিরিক্ত আরো কতগুলি রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং সেই রসগুলির-ও বৃত্তিব্যবস্থা করেছেন। বৃত্তিভেদবিষয়ে তিনি মূলতঃ দশরূপক-অনুসারী। তবে তিনি অতিরিক্তরূপে 'প্রেয়ঃ' (সখ্য) নামক রসটিকে কৈশিকীবৃত্তিতে, 'প্রীত' (দাস্য) ও 'বাৎসল্য' নামক রসদ্বয়কে সাত্ত্বতীবৃত্তিতে এবং বীর ও করুণ রসদ্বয়কে আরভটীবৃত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিব্যবস্থায় বলা হয়েছে, সর্বব্যাপিনী ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ হবে সর্বপ্রকার রসে। হাস্য ও শৃঙ্গাররসে প্রয়োগ হবে কৈশিকীবৃত্তির। রৌদ্র ও বীর এই দুটি রসকে তাঁরা সাত্ত্বতী ও আরভটী–উভয় বৃত্তির-ই বিষয়রূপে স্বীকার করেছেন, যা যথেষ্ট বিভ্রান্তিমূলক। ভয়ানক, করুণ, বীভৎস ও অদ্ভুত রসের বৃত্তিব্যবস্থা সম্পর্কে নাট্যদর্পণে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

পরিশেষে এই কথা-ই বলা যায় যে, আলোচিত প্রতিটি বৃত্তির প্রধান বা স্থায়িরস একটি হলে-ও, প্রতি বৃত্তিতে একাধিক সঞ্চারী রস থাকার বাধা নেই। স্থায়িরসের পরিপুষ্টির জন্য-ই একাধিক সঞ্চারী রসের প্রয়োগ করা হয়। কারণ একটি মাত্র ভাব, রস বা প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে কাব্য সৃষ্টি অসম্ভব। নাট্যশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে–

“ন হ্যেকরসজং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি প্রয়োগতঃ।
ভাবো বাপি রসো বাপি প্রবৃত্তিরেব বা ॥
সর্বেষাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণঃ স্মৃতাঃ ॥ ” (না.শা. ২০/৭৫,৭৬)

এর প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে নাট্যশাস্ত্র থেকে-ই । সাত্ত্বতীবৃত্তির আলোচনায় মহর্ষি বলছেন – ‘বীরাদ্ভুতরৌদ্ররসা বিজ্ঞেয়া স্বল্পকরুণশৃঙ্গারা’(না.শা.২০/৪৩) – অর্থাৎ সাত্ত্বতীবৃত্তি মূলতঃ বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসের বৃত্তি হলে-ও, এতে স্বল্প পরিমাণ করুণ ও শৃঙ্গাররসের প্রয়োগ-ও থাকতে পারে।

অতএব বোঝা গেল, প্রতিটি রূপকে একটি রস মুখ্য হলে-ও সেই অঙ্গীরসের পরিপুষ্টির জন্য যেহেতু একাধিক অঙ্গরস থাকে, সেহেতু রূপকে একটি বৃত্তি প্রধান হলে-ও, তার সঙ্গে অপরাপর রসপর অন্যান্য বৃত্তি-ও স্বীকার্য। নাটকের বৃত্তি নাটকের মুখ্যরস অনুসারে নির্ণীত ও অভিহিত হলে-ও, অন্যরস এবং তদনুসারী অন্য বৃত্তির ব্যবহার কখনো-ই নিষিদ্ধ নয়।

রসবিমর্শ ঃ

বৃত্তিসমূহের আলোচনার পর নাট্যদর্পণে রসবিমর্শের অবতারণা।‘রস’ পদটির অর্থ বহুবিধ। অমরকোশে বলা হচ্ছে – ‘শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্যে গুণে রাগে দ্রবে রসঃ’। বৈশেষিক দর্শনমতে ‘রস’ পদের অর্থ রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ্য বিষয়সমূহ, কটু-মধুরাদি ভেদে যার সংখ্যা ছয়টি। এটি-ই রস পদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অর্থ। অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে – ‘আস্বাদনং হি রসনেন্দ্রিয়জজ্ঞানং প্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ’ (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়) । আয়ুর্বেদানুসারে মানবশরীরের জলীয় অংশের নাম রস। এগুলি ছাড়া-ও পারদ, গন্ধরস(essence), জল, ইচ্ছা, স্পৃহা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ‘রস’ পদের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল লোকব্যবহারানুসারী অর্থ। কাব্যতত্ত্বে ‘রস’ পদের অর্থ হল বিবিধপ্রকার অনুভূতির উদ্রেকে জাত নান্দনিক আনন্দবিশেষ।

রজঃ ও তমঃ গুণের স্পর্শশূন্য মনোধর্মকে সত্ত্বগুণ বলা হয়। ভোজদেব তাঁর সরস্বতীকণ্ঠাভরণে বলেছেন – ‘রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বম্’। দর্পণকারের মতে,লৌকিক জ্ঞেয়বস্তুসমূহ হতে বিমুখতাজনক একপ্রকার আন্তরধর্মের নাম সত্ত্ব – ‘বাহ্যমেয়বিমুখতাপাদকঃ

কশ্চনান্তরো ধর্মঃ সত্ত্বম্' (সা.দ. তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। রজঃ ও তমঃ গুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণের আবির্ভাবের ফলে-ই রসাস্বাদন ঘটে। কিন্তু এই রসচর্বণা তো নিরালম্ব হতে পারে না। এর হেতু হল অলৌকিক কাব্যার্থপরিশীলন– ''তস্যোদ্রেকঃ রজস্তমসী অভিভূয়াবির্ভাবঃ । অত্র চ হেতুস্ত থাবিধালৌকিককাব্যার্থপরিশীলনম্'' (সা.দ. তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। জীবন ও জগৎকে অবলম্বন করে-ই কাব্যসৃষ্টি হয়। এটি-ই কাব্যার্থ, একে বাদ দিয়ে রসসৃষ্টি হয় না। কবির প্রতিভাস্পর্শে লৌকিক জগতের ঘটনাগুলি অলৌকিকতায় উত্তীর্ণ হয়, এই অলৌকিকতা-ই শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিঃস্বার্থ-নির্মল কাব্যিক আনন্দের অর্থাৎ রসের হেতু। রসোৎপত্তিবিষয়ে দশরূপককারের মতটি-ও এক-ই রকম–'স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ'(দশ.রূ.৪/৪৩)। এ এক অসামান্য ঐশ্বরিক চমৎকৃতি, যে, শব্দার্থময় কাব্যশরীরের দর্শনশ্রবণাদি অনুশীলনের দ্বারা মানবচিত্তে রসোদ্রেক ঘটে। অভিনবগুপ্তাচার্যের মতে – 'তত্র চ পদার্থবাক্যার্থৌ রসেষ্বেবপর্যবস্যত ইত্যসাধারণ্যাৎ প্রাধান্যাচ্চ কাব্যস্যার্থাঃ রসাঃ' (না.শা. সপ্তম অধ্যায়)।

সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে আস্বাদ্যমানতার কারণে রসের এই নামকরণ। নাট্যশাস্ত্রের রসবিমর্শে বলা হচ্ছে – 'রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। নাট্যদর্পণে-ও বলা হচ্ছে– 'রস্যতে আস্বাদ্যত ইতি রসঃ'।[২৫] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'রস্' ধাতুটির অর্থ-ই হল আস্বাদন করা। যখন আমরা 'রসাস্বাদন' পদটি ব্যবহার করি, তখন রস ও আস্বাদনের মধ্যে একটি কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করে থাকি।

দর্পণকারের মতে, সত্ত্বগুণের উদ্রেকহেতু এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, অন্যান্য জ্ঞেয়বিষয়ের স্পর্শলেশশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদতুল্য এক অলৌকিক বিস্ময়–

''সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।

বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ ॥'' (সা.দ.৩/২)

ভাবপ্রকাশনকার-ও বলেছেন, চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদনকারী স্বাদকে-ই রস বলা হয় – 'মনসো হ্লাদজননঃ স্বাদো রস ইতি স্মৃতঃ' (ভাব.প্র.২/৪০)।

ভাবের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ ঃ

রসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের নাম ভাব। অতএব ভাবের সংজ্ঞা ও বৈবিধ্য বিষয়ক আলোচনা-ও এখানে প্রাসঙ্গিক। নাট্যশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে ভাবলক্ষণে বলা হয়েছে – ''ভাবা ইতি কস্মাৎ।........ উচ্যতে – বাগঙ্গসত্ত্বোপেতাৎ কাব্যার্থাৎ ভাবয়ন্তীতি ভাবা ইতি'' (না.শা.সপ্তম অধ্যায়)। 'ভাবয়ন্তি' পদের ব্যাখ্যায় অভিনবভারতীতে বলা হচ্ছে– 'ভাবয়ন্তি আস্বাদনং কুর্বন্তি হৃদয়ং

ব্যাপ্লুবন্তীতি'(না.শা.সপ্তম অধ্যায়)। অতএব মহর্ষিপ্রোক্ত ভাবলক্ষণের নিষ্কৃষ্টার্থ হল –বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা কাব্যের বিষয়কে আস্বাদন করায় বলে 'ভাব' নামকরণ।

এ তো হল ভাবের কার্য, ভাবের স্বরূপ কি? ভাব হল চিত্তবৃত্তির বিবিধ প্রকার। অভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন – 'ভাবশব্দেন তাবচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষা এব বিবক্ষিতাঃ' (না.শা.সপ্তম অধ্যায়)। বাচিকাদি বিভিন্নপ্রকার অভিনয়ের মাধ্যমে পরিস্ফুট এই ভাবগুলি সামাজিকের চিত্তে রসের উদ্বোধ ঘটায়।

নাট্যশাস্ত্রে ভাবপদের অপর একটি ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে করণবাচ্যে প্রযুক্ত ণিজন্ত ভূ-ধাতুর উত্তর 'করণাধিকরণয়োশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঘঞ্-প্রত্যয়যোগে ভাবপদের নিষ্পত্তি, যার অর্থ ভাবনা– 'ভূ ইতি করণে ধাতুস্তথা চ ভাবিতং কৃতমিত্যর্থান্তরম্'(না.শা.সপ্তম অধ্যায়)। অর্থ এক-ই। বাচিকাদি নানাপ্রকার অভিনয়ের মাধ্যমে ভাব নামক এই শারীর বা মানস অবস্থাগুলি শৃঙ্গারাদি বিভিন্ন প্রকার চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ রসগুলিকে সামাজিকের বুদ্ধিগোচরীভূত ও আস্বাদনযোগ্য করে তোলে, তাই এদের ভাবনা বা ভাব নামে অভিহিত করা হয়। অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে – 'রসনযোগ্যান্ চিত্তবৃত্তিবিশেষান্ ভাবয়ন্তি গময়ন্তি বোধয়ন্তি বুদ্ধিবিশেষান্ প্রাপয়ন্তি' (না.শা. সপ্তম অধ্যায়)।

ভাবের সংজ্ঞানির্ণয়াবসরে নাট্যশাস্ত্রে দুটি আনুবংশ্য শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে–

''বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।
কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে ॥''(না.শা. সপ্তম অধ্যায়)

– বাক্য, অঙ্গভঙ্গি ও মুখরাগ এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা কবির (অর্থাৎ নাট্যকারের) মনোগত ভাবগুলি দর্শকবৃন্দকে আস্বাদন করায় বলে ভাবের এরূপ নামকরণ।

''নানাভিনয়সংবন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসানিমান্ ।
যস্মাত্তস্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাট্যযোক্তৃভিঃ ॥'' (না.শা. সপ্তম অধ্যায়)

– নানা অভিনয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ নাট্যরসগুলিকে সামাজিকের বুদ্ধিগোচর করায় বলে, নাট্যপ্রযোক্তৃগণ এই অবস্থাগুলিকে ভাব নামে আখ্যাত করেন। উল্লেখ্য, ভাবলক্ষণনির্ণয়কালে বিশ্বনাথ কবিরাজ এই শ্লোকটির-ই অনুসরণ করেছেন –

''নানাভিনয়সংবন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসান্ যতঃ।
তস্মাদ্ ভাবা অমী প্রোক্তাঃ.... ॥'' (সা.দ. ৩/১৮১)

দশরূপককার ধনঞ্জয় সহজভাবে ও সংক্ষিপ্ত আকারে ভাবের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, সুখদুঃখাদি ভাবের দ্বারা সেইভাবে ভাবিত করায় বলে ভাবের এরূপ নাম –

'সুখদুঃখাদিভির্ভাবৈর্ভাবস্তদ্ভাবভাবনম্' (দশ.রূ.৪/৪)। 'রসতরঙ্গিনী'- রচয়িতা আচার্য ভানুদত্তের মতে, রসসৃষ্টির সহায়ক দৈহিক ও মানসিক চিত্তবৃত্তির নাম-ই ভাব– "রসানুকূলো বিকারো ভাবঃ। বিকারো2ন্যথাভাবঃ" (রসতরঙ্গিনী, প্রথম তরঙ্গ)।

আচার্য শারদাতনয় যুক্তিসহকারে ভাবের পঞ্চবিধত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে পদার্থ, ক্রিয়া, সত্তা, বিকার এবং মানস ভিত্তিতে যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, ব্যভিচারিভাব এবং সাত্ত্বিকভাব– এই পাঁচপ্রকার ভাব স্বীকার করা যায়–

"পদার্থো বা ক্রিয়া সত্তা বিকারো মানসো2থবা।
বিভাবাশ্চানুভাবাশ্চ স্থায়িনো ব্যভিচারিণঃ ৷৷
সাত্ত্বিকাশ্চেতি কথ্যন্তে ভাবভেদাশ্চ পঞ্চধা।" (ভাব.প্র.২/১৩)

এই ভাবগুলি মুখ্যতঃ দ্বিবিধ – 'আভ্যন্তর' অর্থাৎ মানস এবং 'বাহ্য' অর্থাৎ শারীর। স্থায়িভাবমাত্র-ই আভ্যন্তর ; বিভাব, অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবগুলি বাহ্য ; ব্যভিচারিভাবসমূহের কয়েকটি আভ্যন্তর ও কয়েকটি বাহ্য।

এবার বিভাবাদি পারিভাষিক শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা যাক্–

১.স্থায়িভাব – ভাবসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম আলোচ্য স্থায়িভাব। প্রথমে-ই উল্লেখ্য যে, মহর্ষি ভরত তাঁর রসসূত্রে ('বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ' –না.শা. ৬/৩১)'স্থায়িভাব' পদটির উল্লেখ করেননি বা কোথাও এর লক্ষণ-ও নির্ণয় করেননি। কিন্তু রসচর্বণার আন্তর উপাদান হল এই স্থায়িভাব; বিভাবাদি অন্য ভাবগুলির সহায়তায় এই স্থায়িভাব-ই রসে পরিণত হয়। অতএব ভাবসমূহের মধ্যে স্থায়িভাব-ই প্রধানতম।

স্থায়িভাবগুলি মানবচিত্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে বলে এগুলির এরূপ নামকরণ। এগুলি সর্বমানবের সহজাত; জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অর্জিত দৃঢ় কতগুলি সংস্কারবিশেষ। নাট্যদর্পণমতে, প্রতি মুহূর্তে উদ্রিক্ত ও বিনষ্ট বহুবিধ (ব্যভিচারি) ভাবের মধ্যে-ও যে ভাবগুলি মানবচিত্তে স্থায়িরূপে বিরাজমান থাকে, তাদের নাম স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাবগুলি অন্যান্য ভাবের উদ্রেক-নিরপেক্ষ। অন্য ভাবের আর্বিভাব হোক্ বা না হোক্– এগুলি মানবের অন্তর্লোকে সর্বদা উপস্থিত থাকে। বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে–"প্রতিক্ষণমুদয়ব্যয়ধর্মকেষু বহুষ্বপি ব্যভিচারিষ্বনুযায়িতয়াবশ্যং তিষ্ঠতীতি স্থায়ী। যদ্বা তদ্ভাব এব ভাবাৎ, অভাবে বা ভাবাদ্ রত্যাদির্ব্যভিচারিণং গ্লান্যাদিকং প্রত্যবশ্যং স্থায়ী"।[২৬] ভাষান্তরে বলা যেতে পারে, অন্য কোনো প্রকার ভাবের দ্বারা যে ভাবগুলি কদাপি মর্দিত বা বিধ্বস্ত হয় না, সেগুলি-ই স্থায়িভাব– 'ভাবান্তরেণ অনুপমর্দনীয়ো ভাবঃ স্থায়িভাবঃ'।[২৭] দশরূপকে বলা হয়েছে, বিরুদ্ধ

বা অবিরুদ্ধ কোনো প্রকার ভাবের দ্বারা-ই যে ভাবগুলি বিচ্ছিন্ন হয় না এবং অন্য ভাবগুলিকে পরিণামে নিজভাবে মণ্ডিত করে তোলে, তাদের স্থায়িভাব বলে–

"বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ।

আত্মভাবং নয়ত্যন্যান্ স স্থায়ী....... ॥" (দশ.রূ.৪/৩৪)

সাহিত্যদর্পণে-ও অনুরূপভাবে স্থায়িভাবের লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে –

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।

আস্বাদাঙ্কুরো2সৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সংমতঃ ॥ "(সা.দ. ৩/১৭৮)

– অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ– যে কোনো প্রকার ভাব যার তিরোধান ঘটাতে পারে না, আস্বাদনরূপ অঙ্কুরের সেই মূল-ই স্থায়িভাবরূপে অভিহিত। এপ্রসঙ্গে দর্পণকার প্রাচীন একটি মতের উল্লেখ করেছেন–

"স্রক্সূত্রবৃত্ত্যা ভাবানামন্যেষামনুগামুকঃ।

ন তিরোধীয়তে স্থায়ী তৈরসৌ পুষ্যতে পরম্ ॥" (সা.দ. তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

–অর্থাৎ অন্যান্য ভাবগুলিকে অনুগমন করালে-ও, যে ভাবগুলি স্বয়ং মাল্যান্তর্গত সূত্রের ন্যায় অ-তিরোহিত থাকে, অন্য ভাবগুলি দ্বারা লুপ্ত হয় না, বরং তাদের দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়, তাদের-ই নাম স্থায়িভাব।

শ্রব্যকাব্যে শব্দার্থময় বর্ণনা এবং দৃশ্যকাব্যে বাচিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা পরিবেশনার মাধ্যমে স্থায়িভাবগুলি সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসোদ্রেক ঘটায়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে– 'উপচয়ং প্রাপ্য রসরূপেণ রত্যাদির্ভবতীতি ভাবঃ' ।[২৮] এপ্রসঙ্গে ভাবপ্রকাশনের একটি শ্লোক উল্লেখ করা যেতে পারে–

"স্থিতাঃ কাব্যাদিষু নটৈরভিনীতা যথার্হতঃ।

রসাত্মনাবতিষ্ঠন্তে সৎসু যে স্থায়িনো2ত্র তে ॥"(ভাব.প্র.২/৩৫)

স্থায়িভাবের 'স্থায়িত্ব'বিষয়ে ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাব-ই মানবচিত্তে স্থায়ী নয়। তবে দৃশ্যকাব্যে কোনো একটি ভাবকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করতে হয়, না হলে নাটকীয় ঘটনাবলীর সংহতি থাকে না। ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে যে কোনো মুখ্যভাব-ই স্থায়িভাব।[২৯]

মহর্ষি ভরত তৎসম্মত শৃঙ্গারাদি অষ্টবিধ রসের জন্য রত্যাদি অষ্টবিধ স্থায়িভাব স্বীকার করেছেন। এই আটটি স্থায়িভাব হল – রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়–

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥" (না.শা.৬/১৭)

এতদ্ব্যতীত যে সব আলঙ্কারিক শান্তরসকে নাট্যরসরূপে স্বীকার করেন, তাঁদের মতে শম বা নির্বেদ বা তৃষ্ণাক্ষয়সুখ শান্তরসের স্থায়িভাব।

২. বিভাব – বিভাবলক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে– 'বিভাব্যন্তে2নেন বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়া ইত্যতো বিভাবঃ' (না.শা.সপ্তম অধ্যায়)– বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়সমূহ যে ভাবগুলির দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রেক্ষকবর্গের অধিগত হয়, সেগুলির নাম বিভাব। অভিনবভারতীতে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে– 'বাগাদয়ো2ভিনয়া যেষাং স্থায়িব্যভিচারিণাং তে বাগাদ্যভিনয়সহিতা বিভাব্যন্তে বিশিষ্টতয়া জ্ঞায়ন্তে যৈস্তে বিভাবাঃ' (না.শা.সপ্তম অধ্যায়)। নাট্যশাস্ত্রে আরো বলা হচ্ছে, সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসোদ্বোধের প্ররোচক হেতু হল এই বিভাবগুলি ; রসোৎপত্তিবিষয়ে এগুলিকে তাই কারণ, নিমিত্ত, হেতু ইত্যাদি পদের দ্বারা অভিহিত করা হয়ে থাকে– 'বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্যায়াঃ' (না.শা.সপ্তম অধ্যায়)।

দশরূপকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে, ভাবগুলি যার দ্বারা পরিপোষিত হয়ে পরিচিতি লাভ করে, তাকে-ই বিভাব বলে– 'জ্ঞায়মানতয়া তত্র বিভাবো ভাবপোষকৃৎ'(দশ.রূ.৪/২)। দর্পণকারের মতে, লৌকিকজগতে যে ভাবগুলি রত্যাদি স্থায়িভাবের উদ্বোধক, কাব্যে ও নাটকে নিবেশিত হলে সেগুলি-ই বিভাব নামে পরিচিত হয় – 'রত্যাদ্যুদ্‌বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ' (সা.দ.৩/৩৩)। তিনি আরো বলেছেন, যে পদার্থের সম্বন্ধ দ্বারা সামাজিকগণের রতি প্রভৃতি ভাব অঙ্কুরের মত অতি সূক্ষ্মরূপে রসোৎপত্তির যোগ্য হয়, তাই বিভাবরূপে পরিগণিত।

বিভাব দ্বিবিধ– আলম্বনবিভাব এবং উদ্দীপনবিভাব। নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক ইত্যাদি যে চরিত্রগুলিকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে দর্শকচিত্তে রসসঞ্চার হয়, সেগুলি-ই হল আলম্বন বিভাব। দর্পণকারের ভাষায়– 'আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্‌গমাৎ' (সা.দ.৩/৩৫)। যেমন– রামায়ণে রাম, সীতা, রাবণ প্রমুখ; অভিজ্ঞানশকুন্তলমে দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, কণ্ব প্রমুখ আলম্বন বিভাব। যে সকল বস্তু বা অবস্থা রসকে উদ্দীপিত করে অর্থাৎ রসসৃষ্টির আনুকূল্য করে, সেগুলিকে উদ্দীপনবিভাব বলা হয়। দর্পণকারের ভাষায়– 'উদ্দীপনবিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে' (সা.দ.৩/১৩৪)। সাহিত্যদর্পণে বিশদে বলা হচ্ছে – 'আলম্বনস্য চেষ্টাদ্যা দেশকালাদয়স্তথা' (সা.দ.৩/১৩৫)– আলম্বনবিভাবের অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাদির চেষ্টাদি তথা দেশকালাদির নাম-ই উদ্দীপনবিভাব। আলম্বনবিভাবের 'চেষ্টা' অর্থাৎ রূপ, ভাষণ ইত্যাদি এবং 'কাল' অর্থাৎ মনোরম সময়, চন্দ্রালোকিত রজনী, বসন্তকাল ইত্যাদি। 'আদি' পদের দ্বারা চন্দন, কোকিলের কূজন, ভ্রমরঝঙ্কার ইত্যাদির-ও গ্রহণ হবে। এই সকল বস্তু ও পরিবেশের বিশিষ্ট আবেষ্টনীতে রস উদ্দীপিত হয়, তাই এগুলিকে উদ্দীপনবিভাব বলা হয়।

৩. অনুভাব – নাট্যশাস্ত্রে অনুভাবলক্ষণনির্ণয়াবসরে বলা হচ্ছে – 'অনুভাব্যতে2নেন বাগঙ্গসত্ত্বৈঃ কৃতো2ভিনয় ইতি' (না.শা. সপ্তম অধ্যায়) – বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়সমূহ যে ভাবগুলির দ্বারা স্পষ্টতররূপে দর্শকসমক্ষে প্রতিভাত হয়, সেগুলির নাম অনুভাব। নাট্যশাস্ত্রে এই প্রসঙ্গে একটি আনুবংশ্য শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে–

"বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যতস্ত্বর্থো2নুভাব্যতে।

বাগঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্ত্বনুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥"(না.শা.৭/৫)

– অর্থ স্পষ্ট। বাচিকাদি অভিনয়ের দ্বারা উপস্থাপিত নাট্যবিষয়টি যে ভাবগুলির দ্বারা স্পষ্টরূপে অবগত হয়, সমস্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত সেই ভাবগুলিকে-ই অনুভাব বলা হয়।

দশরূপককারের মতে, ভাবপ্রকাশক বিকারের নাম অনুভাব– 'অনুভাবো বিকারস্তু ভাবসংসূচনাত্মকঃ' (দশ.রূ.৪/৩)। দর্পণকারের মতে, যে ভাবগুলি নিজ-নিজ কারণ দ্বারা (অর্থাৎ বিভাবাদির দ্বারা) উদ্বুদ্ধ রত্যাদি স্থায়িভাবকে সামাজিকগণের বোধগম্য করায়, লৌকিক অবস্থায় যেগুলি রত্যাদি স্থায়িভাবের কার্য, কাব্য বা নাট্যে নিবেশিত হলে সেই ভাবগুলিকে-ই অনুভাব নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে–

"উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্ ।

লোকে যঃ কার্যরূপঃ সো2নুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥"(সা.দ.৩/১৩৬)

অনুভাবসমূহের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, এগুলি অজস্র প্রকারের হতে পারে।

৪. সাত্ত্বিকভাব – সাত্ত্বিকভাবগুলি বস্তুতঃপক্ষে অনুভাব-ই। তথাপি সত্ত্ব থেকে সমুৎপন্ন বলে, এগুলিকে সাত্ত্বিকভাব বলা হয়ে থাকে। দশরূপকে বলা হয়েছে–

"পৃথগ্‌ভাবা ভবন্ত্যন্যে2নুভাবত্বে2পি সাত্ত্বিকাঃ।

সত্ত্বাদেব সমুৎপত্তেস্তচ্চ তদ্ভাবভাবনম্ ॥" (দশ.রূ.৪/৪,৫)

সমাহিতচিত্তের সত্ত্বগুণসঞ্জাত বিকার এগুলি; অতএব এরা শ্রেষ্ঠ অনুভাব। এগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট, আটটি।

৫. ব্যভিচারিভাব – 'ব্যভিচারিণ্' পদটির ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে – "ব্যভিচারিণ ইতি উচ্যতে– বি অভি ইত্যেতাবুপসর্গৌ। চর ইতি গত্যর্থো ধাতুঃ। বিবিধমাভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ" (না.শা.সপ্তম অধ্যায়)– গতিবোধক 'চর্' ধাতুর পূর্বে বি ও অভি – এই উপসর্গদ্বয়ের যোগে 'ব্যভিচারিণ্' পদটির সৃষ্টি। রসসমূহের অভিমুখে চলে বলে, এই ভাবগুলিকে ব্যভিচারিভাব বলা হয়।

দশরূপককারের মতে, বিশেষভাবে (স্থায়িভাবের আস্বাদব্যঞ্জক) আভিমুখ্য অর্থাৎ সহায়তার কারণে এই ভাবগুলিকে ব্যভিচারিভাব নামে অভিহিত করা হয়–'বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ' (দশ.রূ.৪/৭)। দর্পণকার-ও ব্যভিচারিভাবের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবগুলি সামাজিকচিত্তে স্থির ভাবে বর্তমান থাকে এবং যে ভাবগুলি ক্রমাগত প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবের দ্বারা স্থায়িভাবসমূহের রসপরিণতিব্যাপারে সহায়করূপে বিচরণ করে, সেগুলিকে-ই ব্যভিচারিভাব বলা হয় – 'স্থিরতয়া বর্তমানে হি রত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবাভ্যামাভিমুখ্যেন চরণাদ্ ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে' (সা.দ.তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। স্থায়ীসমুদ্রের উত্থান-পতনশীল কল্লোলের মত অস্থায়ী এই ব্যভিচারিভাবের নাট্যশাস্ত্রসম্মত সংখ্যা তেত্রিশ; তবে নাট্যতত্ত্বের অন্যান্য গ্রন্থে এই সংখ্যার অল্পবিস্তর পরিবর্তন-ও পরিলক্ষিত হয়।

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবসমূহের সংযোগে মানবচিত্তের রত্যাদি স্থায়িভাবগুলি শৃঙ্গারাদি রসে পরিণত হয়। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে–

''সর্বেষাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী .... ॥'' (না.শা.৭/১২০)

অতএব ভাবপঞ্চকের সম্মেলনে-ই সৃষ্টি হয় রসের, যা ব্যতীত কাব্যার্থের স্ফুরণ অসম্ভব– 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে(না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়)। দৃশ্যকাব্যে বিভাবাদি ভাবগুলির দ্বারা প্রকাশিত নাট্যচরিত্রসমূহের রত্যাদি স্থায়িভাবগুলি সহৃদয় প্রেক্ষকের অবচেতন মানসলোকের তত্তৎ বাসনাকে অভিব্যক্ত করে তোলে ; এই ব্যক্তবাসনার নাম-ই রস। আচার্য অভিনবগুপ্তের সুললিত বর্ণনায়– 'শব্দসমর্প্যমাণ-হৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিতপ্রাঙ্‌নিবিষ্ট-রত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ'(ধ্বন্যালোকলোচন ১/৪)। কাব্যপ্রকাশকার আচার্য মম্মট-ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন– 'সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো.... গোচরীকৃতঃ.... অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ ' (কা.প্র.চতুর্থ উল্লাস)। কেবল রসের উদ্বোধে-ই ভাবপঞ্চকের কাজ শেষ নয়, এদের মূল প্রয়োজন সেই উদ্বুদ্ধ রসকে স্ফুটতর করে তুলে তাকে এক চরম আনন্দময় পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া, সামাজিকের মানসলোককে তত্তৎ রসের দ্বারা সিঞ্চিত ও অভিষিক্ত করা, তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করা। এই প্রাণস্পর্শ-ই দৃশ্যকাব্যের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজনবোধে ও ক্ষেত্রবিশেষে পুরাণ এমনকি ইতিহাসের-ও বস্তুপরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বলে অভিনবগুপ্তাচার্যের অভিমত–''কবিনা প্রবন্ধম্ উপনিবধ্নতা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্রেণ ভবিতব্যম্। ইতিবৃত্তে যদি রসানুগুণাং স্থিতিং ন পশ্যেৎ, তৎ ভঙ্‌ক্ত্বাপি স্বতন্ত্রতয়া

রসানুগুণং কথান্তরম্ উৎপাদয়েৎ । ন হি কবেঃ ইতিবৃত্তিমাত্রনির্বহণেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ ।ইতিহাসাদ্ এব তৎসিদ্ধেঃ" (ধ্বন্যালোক, তৃতীয় অধ্যায়) ।

নাট্যদর্পণধৃত রসের উভয়াত্মকত্ববাদের পর্যালোচনা ঃ

রস এবং ভাবসমূহের সামান্যলক্ষণ নির্ণয়ের পর এবার নাট্যদর্পণধৃত রসবিমর্শের অবতারণা করা যেতে পারে।

প্রথমে-ই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সহৃদয়চিত্তে রসনিষ্পত্তির পদ্ধতি বিষয়ে মহর্ষি ভরতের অভিমতের সঙ্গে নাট্যদর্পণকারদের কোনো বৈমত্য নেই। অর্থাৎ এঁরা-ও স্বীকার করেন যে, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের সংযোগে চিত্তস্থ স্থায়িভাবগুলি রসে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে মহর্ষি ভরতের প্রামাণ্য-ই তাঁরা স্বীকার করেছেন। মহর্ষিপ্রণীত রসসূত্রের আধারে উদ্ভূত উৎপত্তিবাদাদি মতচতুষ্কের মধ্যে আচার্য ভট্টলোল্লট এবং আচার্য অভিনবগুপ্তের অভিমতের প্রতি তাঁদের সমর্থন-ও বহু স্থলে অনুমিত হয় । আলোচনার আয়তি অংশে যথাযথস্থলে এ প্রসঙ্গে নির্দেশ করা হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সূক্ষ্ম বিচারে অনুধাবন করা যায় যে, রস ও স্থায়িভাবের চরিত্র প্রকৃতপক্ষে এক। অন্তরে সুপ্তাবস্থায় যার নাম স্থায়িভাব, বিভাবাদির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুভূয়মান হলে তার-ই নাম রস। নাট্যশাস্ত্রে-ও রস ও স্থায়িভাবের এই মূলগত ঐক্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে – 'স্থায়িভাবাংশ্চ রসত্বমুপনেষ্যামঃ' (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়)। আচার্য অভিনবগুপ্ত সংশ্লিষ্ট অংশের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আচার্য দণ্ডী-ও তাঁর কাব্যাদর্শের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রসবৎ অলঙ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে রস ও স্থায়িভাবের এই আন্তর একত্ববিষয়ে নির্দেশ করেছেন।

যাই হোক্, নাট্যদর্পণগ্রন্থের রসবিমর্শের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটি–

প্রথমতঃ, রস কেবলমাত্র সুখাত্মক নয়, তা দুঃখাত্মক-ও হতে পারে এবং

দ্বিতীয়তঃ, রস নটগত নয়, তা প্রেক্ষকগত।

দ্বিতীয় মতটি নিয়ে পূর্বাপর সকল আলঙ্কারিক অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু নাট্যদর্পণে আলোচিত প্রথম অভিমতটি সর্বথা অনন্য । প্রাগ্ভাবী এবং পরভাবী অন্য কোনো অলঙ্কারগ্রন্থে রসের এই দ্বৈত স্বরূপ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট আলোচনা করা হয়নি। শুধু অনন্য-ই নয়, মহর্ষি ভরত প্রমুখ মূর্ধণ্যভূত আলঙ্কারিকদের দ্বারা সম্মত রসের কেবলসুখাত্মকতাবাদকে পরিহার করে রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র তাঁদের চিন্তার দৃঢ়তা ও মানসিক বলিষ্ঠতার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা-ও অতুলনীয়। ..... এবার আমরা একে-একে এই দুটি অভিমতের পর্যালোচনা করব।

নাট্যশাস্ত্রসম্মত শৃঙ্গারাদি রসাষ্টকের সঙ্গে শান্তরসকে যুক্ত করে নাট্যদর্পণকাররা সাকুল্যে নয়প্রকার রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে এই রসগুলিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়–

১. সুখাত্মক – যে রসগুলির আস্বাদনে প্রেক্ষকচিত্তে সুখ ও আনন্দের উদ্রেক ঘটে।এগুলি সংখ্যায় পাঁচটি – শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, অদ্ভুত এবং শান্ত।

২. দুঃখাত্মক – যে রসগুলির আস্বাদনে কষ্ট,ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি দুঃখাত্মক অনুভূতির উদ্রেক ঘটে। এগুলি সংখ্যায় চারটি – করুণ, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয়ানক।

নাট্যদর্পণধৃত রসের এই সুখদুঃখাত্মক দ্বৈত চরিত্র বিষয়ক আলোচনাটি সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসের অসাধারণ ও অনন্য একটি মতবাদ। পূর্বাপর অন্য কোনো আলঙ্কারিক এপ্রসঙ্গে কোনো স্পষ্ট ইতিবাচক মত পোষণ করেননি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের প্রায় সকলের মতে রস সর্বদা ও সর্বথা কেবল আনন্দাত্মক এবং সেহেতু সদা আস্বাদনীয়। রসপদটির ব্যুৎপত্তির মধ্যে-ই তার আস্বাদ্যমানতার পরিচয় আছে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে – 'রস ইতি কঃ পদার্থঃ। উচ্যতে – আস্বাদ্যত্বাৎ' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। আচার্য মম্মট তাঁর কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে রসাস্বাদনের আনন্দকে পার্থিব সকল আনন্দ অপেক্ষা স্বতন্ত্র, অলৌকিক, চমৎকারী ও ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য রূপে ব্যাখ্যা করেছেন – 'অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ' (কা.প্র.চতুর্থ উল্লাস)। হেমচন্দ্রাচার্য-ও তাঁর কাব্যানুশাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রসোদ্ভূত আনন্দকে 'পরব্রহ্মাস্বাদসোদর' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। দর্পণকার-ও রসাস্বাদনের আনন্দকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' রূপে বর্ণনা করেছেন।যাঁরা কাব্যপাঠের আনন্দকে ব্রহ্মাস্বাদসমতুল্য বলে মনে করেন না, কারণ তাঁদের মতে লৌকিক বস্তু থেকে উৎপন্ন কোনো আনন্দ-ই ব্রহ্মানন্দতুল্য হতে পারে না, সেইসব আচার্যরা-ও (যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শারদাতনয়)কিন্তু কাব্যরসজনিত এই আনন্দকে সর্বথা স্বতন্ত্র, অসীম মহিমামণ্ডিত এক সুখানুভূতি রূপে অভিহিত করেছেন। এই অনির্বচনীয় আনন্দ কেবল যে শৃঙ্গারাদি রসের জন্য নির্দিষ্ট, তা নয়। আলঙ্কারিকদের মতে, লৌকিক জগতে আমাদের নিত্যকার জীবনে করুণ, রৌদ্রাদি যে রসগুলি আমাদের পীড়া দেয়, সেগুলি-ও কাব্যনাটকাদিতে পরিবেশিত হলে সামাজিকচিত্তে অসাধারণ ও অলৌকিক এক নান্দনিক সুখ উৎপন্ন করে। অভিনগুপ্তাচার্য বলেছেন – "সামাজিকানাং হি হর্ষৈকফলং নাট্যং ন শোকাদিফলম্। তথাত্বে নিমিত্তাভাবাত্" (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়) – অর্থাৎ তাঁর মতে, কাব্য থেকে কোনোমতে-ই শোকাদিফল লাভ হওয়া উচিৎ নয়, হতে পারে না। কারণ কাব্য যদি সম্পূর্ণ ও কেবল আনন্দদায়ক না হয়, তবে তার রচনা, নির্মাণ ও পরিবেশন – সব-ই ব্যর্থ। দশরূপকের অবলোকাখ্য টীকায় আচার্য ধনিক বলেছেন, (শৃঙ্গারাদি) অন্যান্য রসের ন্যায় করুণ রস-ও পরিণামসুখাত্মক – 'রসান্তরবৎ

করুণস্যাপ্যানন্দাত্মকত্বমেব'।[৩০] দর্পণকার-ও বলেছেন, করুণাদি রসে-ও যে পরম সুখ হয়, তার একমাত্র প্রমাণ হল সহৃদয়গণের অনুভব। 'আদি' পদের দ্বারা তিনি বীভৎস ও ভয়ানক রসের-ও গ্রহণ করেছেন–

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরমং সুখম্।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥

আদিশব্দাদ্ বীভৎসভয়ানকাদয়ঃ।" (সা.দ. তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র এইসকল মূর্ধণ্যভূত আলঙ্কারিকদের অভিমতের বিরোধপূর্বক রসের দ্বৈতস্বরূপের উদ্‌ঘোষণা করেছেন। তাঁদের এই অভিমতের সমর্থনে তাঁরা যে যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ–

১.সুখাত্মক রসের উদ্বোধবিষয়ে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারভাবগুলি-ও সুখাত্মক। যেমন – শৃঙ্গারের উদ্বোধে রূপবতী নারী, দিব্যাঙ্গনা ইত্যাদি আলম্বনবিভাব; চন্দ্রালোকিত রাত্রি, নির্জন স্থান, উদ্যান, পদ্মসরোবর ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব; উৎসাহ, নয়নচাতুর্যাদি অনুভাব; স্মৃতি, ধৃতি ইত্যাদি ব্যভিচারিভাব –এগুলির সবকটি-ই সুখকর। অনুরূপে বীররসের উদ্বোধে ইন্দ্রিয়জয়, ধনসম্পদ, যশঃখ্যাতি ইত্যাদি বিভাব; চিত্তস্থৈর্য, ধৈর্য, অকাতরতাদি অনুভাব; আবেগ, গর্ব ইত্যাদি ব্যভিচারিভাব– এগুলি-ও সবকটি-ই সুখকর। অর্থাৎ একথা প্রমাণিত যে, সুখাত্মক রসের ক্ষেত্রে তাদের বিভাবাদি ভাবগুলি-ও সুখাত্মক-ই হয়। বিপরীতে করুণাদি দুঃখাত্মক রসের বিভাবাদি-ও পীড়াদায়ক। যেমন করুণরসের উদ্বোধে প্রিয়বিয়োগ, ইষ্টবিনাশাদি বিভাব; বাষ্প, অশ্রু, বৈবর্ণ্যাদি অনুভাব; গ্লানি, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য ইত্যাদি ব্যভিচারিভাব – এগুলির কোনোটি-ই সুখপ্রদ নয়। অনুরূপে ভয়ানকরসের উদ্বোধের ক্ষেত্রে বধ, বন্ধন, পিশাচাদি সত্ত্বদর্শন ইত্যাদি বিভাব; স্তম্ভ, হস্ত পদাদির কম্পন, মূর্ছা ইত্যাদি অনুভাব ; শঙ্কা, চপলতা, ত্রাস, অপস্মার, ইত্যাদি ব্যভিচারিভাব – এগুলির প্রতিটি-ই পীড়াদায়ক। অতএব অন্বয়ব্যতিরেকী উদাহরণদ্বারে স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে, সুখাত্মক রসের ক্ষেত্রে বিভাবাদি ভাবগুলি সুখকর ও প্রীতিপ্রদ এবং দুঃখাত্মক রসের ভাবগুলি মানসিক যন্ত্রণাকর ও পীড়াপ্রদ। অতঃপর একথা-ও স্বতঃসিদ্ধ যে, সুখকর বিভাবাদি থেকে যেমন সুখাত্মক রসসমূহের-ই উদ্রেক ঘটে, অনুরূপে দুঃখদায়ক বিভাবাদি থেকে দুঃখাত্মক রসের-ই উদ্বোধ ঘটবে, সুখাত্মক রসের নয়।বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'তত্রেষ্টবিভাবাদিপ্রথিতস্বরূপসম্পত্তয়ঃ শৃঙ্গার-হাস্য-বীরাদ্‌ভুত-শান্তাঃ পঞ্চ সুখাত্মানো2পরে পুনরনিষ্টবিভাবাদ্যুপনীতাত্মানঃ করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়ানকাশ্চত্বারো দুঃখাত্মানঃ'।[৩১]

২. সর্ববিধ রস সুখপ্রদ – একথা তত্ত্বগতভাবে বলা হলে-ও, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরূপ। বস্তুজগতে অনুভূত ভয়ানকাদি রসচতুষ্টয়, কাব্যবিভাবাদি বা লৌকিকবিভাবাদি যার দ্বারা-ই উৎপন্ন হোক্ না কেন, যথেষ্ট মানসিক পীড়ার উদ্রেক করে।সেই কারণে-ই দেখা যায়, উল্লিখিত রসচতুষ্টয়ের অভিনয়দর্শনে সহৃদয়, সংবেদনশীল প্রেক্ষক শিহরিত হয়ে ওঠেন, অভিনয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এইসব আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট-ই প্রতীত হয় যে, ভয়ানকাদি রসগুলি কখনো-ই সুখপ্রদ নয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে – ''যৎ পুনঃ সর্বরসানাং সুখাত্মকত্বমুচ্যতে, তৎ প্রতীতবাধিতম্। আস্তাং নাম মুখ্যবিভাবোপচিতঃ কাব্যাভিনয়োপনীতবিভাবোপচিতো2পি ভয়ানকো বীভৎসঃ করুণো রৌদ্রো বা রসাস্বাদবতামনাখ্যেয়াং কামপি ক্লেশদশামুপনয়তি। অতএব ভয়ানকাদিভিরুদ্বিজতে সমাজঃ । ন নাম সুখাস্বাদাদুদ্বেগো ঘটতে''।[৩২]

৩. নাট্যদর্পণকারদের মতে, ভয়ানকাদি রসগুলি থেকে কোনো প্রেক্ষক যদি আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দ রসাস্বাদনজনিত নয়; তা হল নাট্যকার , নট-নটী প্রমুখের কলাকৌশলদর্শনে উদ্ভূত একপ্রকার চমৎকৃতি। উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে, প্রবলপরাক্রমী কোনো চরিত্রের অভিনেতারূপে নট যখন অস্ত্রের এক আঘাতে শিরচ্ছেদের অভিনয় করেন, তদ্দর্শনে দর্শকের চিত্তে এক সপ্রশংস বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়; ভ্রমবশতঃ একে-ই তাঁরা রসাস্বাদনজনিত আনন্দ বলে মনে করেন। অর্থাৎ নাট্যদর্পণকারদের মতানুসারে, ভয়ানকাদি রস থেকে জাত সুখানুভূতি ভ্রমাত্মক, তা প্রকৃত রসাস্বাদজ আনন্দ নয়; প্রকৃতপক্ষে তা নাট্যকারের সুপ্রযুক্ত নাট্যকৌশল এবং অভিনেতৃবর্গের অসাধারণ বাস্তবোচিত অভিনয় দর্শনে জাত একপ্রকার বিস্মিত চমৎকৃতিমাত্র। সেই চমৎকৃতির প্রতি আকর্ষণবশতঃ-ই দর্শকগণ ভয়ানকাদি রসের অভিনয়দর্শনে আকৃষ্ট বোধ করেন। বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে–''তৎ পুনরেভিরপি চমৎকারো দৃশ্যতে , স রসাস্বাদবিরামে সতি যথাবস্থিতবস্তুপ্রদর্শকেন কবি-নট-শক্তি-কৌশলেন। বিস্ময়ন্তে হি শিরচ্ছেদকারিণাপি প্রহারকুশলেন বৈরিণা শৌণ্ডীরমানিনঃ। অনেনৈব চ সর্বাঙ্গাহ্লাদকেন কবি-নট-শক্তিজন্মনা চমৎকারেণ বিপ্রলব্ধাঃ পরমানন্দরূপতাং দুঃখাত্মকেষ্বপি করুণাদিষু সুমেধসঃ প্রতিজানতে। এতদাস্বাদলৌল্যেন প্রেক্ষকা অপি এতেষু প্রবর্তন্তে'' ।[৩৩]

৪. একথা সর্বজনবিদিত এবং সর্বসম্মত যে, কাব্যনাটকাদি সাহিত্য হল জীবনের প্রতিফলন। জীবন সুখদুঃখময়। ক্রমাগত পরিবর্ত্যমান কালচক্রে কোনো ব্যক্তির ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ভোগ থাকে না– 'কালক্রমেণ জগতঃ পরিবর্তমানা চক্রারপংক্তিরিব গচ্ছন্তি ভাগ্যপংক্তিঃ' (স্বপ্নবাসবদত্তম্, ১/৪)। অতএব সাহিত্যে জীবনের সত্য প্রতিফলন ঘটাতে গেলে তাকে-ও হতে হবে সুখদুঃখময়। যেমন ভাবে পার্থিব জগতে মর্ত্য মানুষ সুখে দিনাতিপাত করে, কালবিশেষে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে দুঃখ ভোগ করে, আবার দৈব, পুরুষকার ইত্যাদির সহায়তায় বিপন্মুক্ত হয়ে সুখী

হয়, সেই এক-ই ভাবে সাহিত্যে-ও নায়কাদি চরিত্রের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি – সবকিছুর বর্ণনা-ই প্রয়োজন। করুণাদি ব্যতিরেকে এবং কেবলমাত্র সুখাত্মক রসসমূহের সন্নিবেশে নির্মিত নাটকাদি রূপক দর্শকসমক্ষে অসত্য, অবাস্তব, অসম্ভবরূপে প্রতিভাত হয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে – 'কবয়স্তু সুখদুঃখাত্মকসংসারানুরূপেণ রামাদিচরিতং নিবধ্নন্তঃ সুখদুঃখাত্মকরসানুবিদ্ধমেব গ্রথ্নন্তি' ।[৩৪]

৫. নাট্যদর্পণের পরবর্তী যুক্তিতে বলা হচ্ছে, যেমন কটু কোনো দ্রব্য আস্বাদনের পর মিষ্ট দ্রব্য আস্বাদন করলে মিষ্টদ্রব্যের স্বাদুতা অধিকতর রূপে অনুভূত হয়, অনুরূপভাবে সুখাত্মক ঘটনাবলীর পর ভয়ানকাদি দুঃখাত্মক কোনো ঘটনার সন্নিবেশ ঘটলে সুখাত্মক ঘটনাগুলি অধিকতর সুখদায়ক রূপে প্রতিভাত হয়। একথা সত্য যে, নাটক হবে নানারসনিরন্তর। শৃঙ্গারাদি সুখাত্মক ঘটনাসমূহের ক্রমাগত সন্নিবেশের কারণে নাটকে যে বৈচিত্র্যহীনতা ও ক্লান্তিময় গতানুগতিকতার সৃষ্টি হয়, ভয়ানকাদি রসের সুপ্রয়োগে মুহূর্তমধ্যে নাট্যে সেই বৈচিত্র্য পুনরায় উপস্থাপিত করা যায়। যার ফলে নাটকের আগত ও অনাগত সুখপ্রদ ঘটনাগুলি অধিকতর মাধুর্য ও আনন্দে মণ্ডিতরূপে প্রতীয়মান হয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'পানকমাধুর্যমিব চ তীক্ষ্ণাস্বাদেন সুতরাং সুখানি স্বদন্তে ইতি'।[৩৫]

৬. নাট্যদর্পণের পরবর্তী যুক্তিতে বলা হচ্ছে , যদি কোনো সামাজিক প্রকৃত-ই 'সহৃদয়' হয়ে থাকেন, তবে বিভিন্ন মহত্ত্বমণ্ডিত আদর্শ চরিত্রগুলির ভাগ্যবিপর্যয় ও দুর্দৈব দর্শনে তিনি কখনো-ই আনন্দলাভ করতে পারেন না। রাবণকর্তৃক সীতার অপহরণ, দ্রৌপদীর কেশ ও বস্ত্র আকর্ষণ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালের নিকট দাস্য, রোহিতাশ্বর মৃত্যু, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, মালতীর নিধন ইত্যাদি ঘটনার দৃশ্যায়নে কোনো সংবেদনশীল চিত্ত কখনো আনন্দ অনুভব করতে পারে না। আর এই সকল ঘটনার অভিনয়ে কোনো দর্শক যদি বাস্তবিক-ই আনন্দময় রসাস্বাদন করেন, তবে নাট্যদর্পণকারদের মতে, সেই অভিনয় অবশ্য-ই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, সর্বথা নেতিমূলক উল্লিখিত ঘটনাবলী যদি আনন্দের কারণরূপে গণ্য হয়, তবে একথা সিদ্ধ হয় যে, ঐ ঘটনাসমূহের যথাযথ বাস্তবানুগ অনুকরণ মঞ্চায়িত হয়নি, যে-কারণে প্রেক্ষকের কাছে প্রকৃতিকরুণ এই ঘটনাগুলি আনন্দময়রূপে প্রতিভাত হয়েছে। বৃত্তিতে বলা হয়েছে – "অপি চ সীতায়া হরণম্, দ্রৌপদ্যাঃ কচাম্বরাকর্ষণম্, হরিশ্চন্দ্রস্য চাণ্ডালদাস্যম্, রোহিতাশ্বস্য মরণম্, লক্ষ্মণস্য শক্তিভেদনম্, মালত্যা ব্যাপাদনারম্ভণমিত্যাদ্যভিনীয়মানং পশ্যতাং সহৃদয়ানাং কো নাম সুখাস্বাদঃ? তথানুকার্যগতাশ্চ করুণাদয়ঃ পরিদেবিতানুকার্যত্বাৎ তাবদ্ দুঃখাত্মকা এব। যদি চানুকরণে সুখাত্মানঃ স্যুর্ন সম্যগনুকরণং স্যাৎ, বিপরীতত্বেন ভাসনাদিতি" ।[৩৬]

৭.অন্তিম যুক্তিতে নাট্যদর্পণকাররা বলছেন, যদি কোনো ব্যক্তি মনে করেন যে অভিনেয় চরিত্রগুলির ভাগ্যবিড়ম্বনাদর্শনে তার চিত্তে আনন্দ অনুভূত হচ্ছে, সেই প্রতীতি সর্বথা মিথ্যা । কারণ, বাস্তবিক পক্ষে দুঃখাত্মক ঘটনাসন্দর্শনে কোনো সহৃদয় প্রেক্ষক কখনো আনন্দ অনুভব করতে পারেন না। তা-ও যদি সত্য-সত্য-ই কোনো ব্যক্তি পীড়াদায়ক এইসকল ঘটনায় আনন্দ লাভ করেন, সেক্ষেত্রে সন্দেহাতীতরূপে বলা যেতে পারে যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ ও অসুখী। কারণ, একমাত্র একজন অসুখী ব্যক্তি-ই এক অদ্ভুত সাদনসুখ অর্থাৎ 'sadism' -এর বশবর্ত্তী হয়ে অন্য ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণায় আনন্দ পায়, অন্যের দুর্দৈব ও বিপর্যয় দর্শন-শ্রবণাদির দ্বারা সুখানুভব করে। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে– ''যো2পীষ্টাদিবিনাশদুঃখবতাং করুণে বর্ণ্যমানে2ভিনীয়মানে বা সুখাস্বাদঃ, সো2পি পরমার্থতো দুঃখাস্বাদ এব। দুঃখী হি দুঃখিতবার্তয়া সুখমভিমন্যতে, প্রমোদবার্তয়া তু তাম্যতীতি করুণাদয়ো দুঃখাত্মান এবেতি'' ।[৩৭]

অতএব উপর্যুক্ত যুক্তিবিচারের দ্বারা নাট্যদর্পণকাররা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শৃঙ্গারাদি রসপঞ্চক আনন্দাত্মক এবং করুণাদি রসচতুষ্টয় দুঃখাত্মক।

পূর্বে-ই বলা হয়েছে যে, রসের দ্বৈতস্বরূপ বিষয়ক প্রথম যৌক্তিক আলোচনার গৌরবের অধিকার আচার্য রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের । কিন্তু রস যে কেবল সুখাত্মক নয়, তা যে দুঃখাত্মক-ও হতে পারে, এই চিন্তা সূক্ষ্মভাবে নাট্যদর্পণের প্রাগ্‌ভাবী ও পরভাবী কিছু আলঙ্কারিকের তত্ত্বচিন্তায় বিদ্যমান ছিল। এই চিন্তার আরম্ভ অনুমান করা যেতে পারে নাট্যশাস্ত্র থেকে-ই। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের রসবিমর্শে মহর্ষি ভরত বলছেন – '..... সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়) । এই 'হর্ষাদি' পদের প্রয়োগে কোনো-কোনো নাট্যতাত্ত্বিক অনুমান করেছেন, রসাস্বাদনে হর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখাদি-ও উৎপন্ন হতে পারে– এই হল মহর্ষি ভরতের অভিমত। অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় এই মতের উল্লেখ করেছেন, যদি-ও তিনি এটিকে স্বীকার করেননি – ''অন্যে ত্বাদিশব্দেন শোকাদীনামত্র সংগ্রহঃ। স চ ন যুক্তঃ'' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। রুদ্রভট্টরচিত 'রসকলিকা' গ্রন্থে-ও রসের এই উভয়াত্মকত্বের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে – ''করুণময়ানামপ্যুপাদেয়ত্বং সামাজিকানাম্, রসস্য সুখদুঃখাত্মকতয়া তদুভয়লক্ষণত্বেন উপপদ্যতে । অতএব তদুভয়জনকত্বম্'' ।[৩৮] আচার্য বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'-র তৃতীয় অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ধৃত একটি শ্লোকে রসের উভয়াত্মকতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পরস্পরবিরোধী ওজঃ ও প্রসাদগুণের সংমিশ্রণ কিভাবে সম্ভব – এর ব্যাখ্যাবসরে তিনি বলছেন, করুণরসপ্রধান দৃশ্যকাব্যে পরস্পরবিরোধী সুখ ও দুঃখ যেমন অনুভূত হয়, সেভাবে পরস্পরবিরোধী ওজঃ ও প্রসাদগুণের সংমিশ্রণ-ও অনুভবের দ্বারা জানতে পারা যায়–

''করুণপ্রেক্ষণীয়েষু সংপ্লবঃ সুখদুঃখয়োঃ।
যথানুভবতঃ সিদ্ধস্তথৈবোজঃপ্রসাদয়োঃ ॥'' (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, তৃতীয় অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা-৯)

এই শ্লোকের কামধেনু টীকায় বিশদে বলা হচ্ছে – 'যানি করুণানি কারুণ্যবহানি যানি মনোজ্ঞানি চ বস্তূনি তেষু যুগপদনুভূয়মানেষু সমসময়সমুপন্নয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ সংপ্লবঃ যথানুভবতঃ স্বসংবেদনাৎ সিদ্ধঃ .....'। অতএব স্পষ্টতঃ-ই প্রতীত হচ্ছে যে, বামনাচার্য-ও রসের সুখদুঃখাত্মকত্ববিষয়ে অবহিত ছিলেন। কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি আচার্য হেমচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থের রসবিমর্শে উল্লেখ করেছেন।[৩৯] ভোজদেব-ও তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশে বলেছেন – 'রসা হি সুখদুঃখাবস্থারূপাঃ'।[৪০] ডঃ. ভি. রাঘবন উল্লেখ করেছেন রাজা হরিপালদেব রচিত 'সঙ্গীতসুধাকর' নামক গ্রন্থের কথা, যেখানে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকে দুঃখাত্মকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪১] ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁর 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থে রসভেদে সুখানুভূতির তারতম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সাংখ্যদর্শনানুসারী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – ত্রিবিধ গুণের মধ্যে একমাত্র সত্ত্বগুণের উদ্রেকে-ই স্থায়িভাব রসে পরিণত হতে পারে। সত্ত্বগুণের কারণে-ই চিত্তের দ্রবীভবন ঘটে এবং সেই দ্রবীভূত চিত্তে স্থায়িভাবসমূহ রসে পরিণত হয়। অতএব সত্ত্বোদ্রেক ব্যতীত শৃঙ্গার বা বীর, করুণ বা ভয়ানক – কোনো প্রকার রসের স্ফুরণ-ই সম্ভবপর নয়। যেহেতু সত্ত্বগুণ স্বভাবতঃ সুখাত্মক, অতএব স্বীকার করতে হবে তন্মূলক যাবতীয় রসগুলি-ও সুখময়। কিন্তু করুণ, ভয়ানক, বীভৎসাদি রসে সত্ত্বের সঙ্গে-সঙ্গে রজঃ ও তমোগুণ যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। তাই উক্ত ভাবগুলির রসপর্যবসান হয় বটে, তবে শৃঙ্গারাদির ন্যায় অবিমিশ্র সত্ত্বোদ্ভূত না হওয়ার কারণে ভয়ানকাদি রসের আস্বাদনজাত আনন্দের ইতরবিশেষ বা তারতম্য ঘটে থাকে। 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থের প্রথম উল্লাসের অষ্টাদশসংখ্যক শ্লোকের টীকায় তাই বলা হচ্ছে – '' দ্রবীভাবস্য সত্ত্বধর্মত্বাৎ তং বিনা চ স্থায়িভাবাসম্ভবাৎ, সত্ত্বগুণস্য চ সুখরূপত্বাৎ। সর্বেষাং ভাবানাং সুখময়ত্বে2পি রজস্তমো2ংশমিশ্রণাৎ তারতম্যমবগন্তব্যম্; অতো ন সর্বেষু রসেষু তুল্যসুখানুভবঃ '' (ভক্তিরসায়ন, প্রথম উল্লাস)। তবে এক-ই সঙ্গে একথা-ও উল্লেখ্য যে, আচার্য মধুসূদন সরস্বতী রসভেদে আনন্দের তারতম্যের কথা স্বীকার করেছেন; কোনো রস-ই সর্বথা দুঃখাত্মক – এমন কথা তিনি বলেননি। অর্থাৎ তাঁর মতে রসচর্বণায় আনন্দ অবধারিত, তবে রসভেদে সে আনন্দের পরিমাণ ও গুণগত মানের পরিবর্তন হয়।

উল্লিখিত আলোচনাদৃষ্টে প্রমাণ হয় যে, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বে রসের উভয়াত্মকতাবিষয়ক একটি মতবাদ 'অস্ফুটস্ফুরিত' ভাবে হলে-ও, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় বর্তমান ছিল। ডঃ. এইচ. কে. ত্রিবেদী তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দেশপাণ্ডে-র একটি অভিমত উল্লেখ করেছেন।[৪২] স্বীয় গ্রন্থে

অধ্যাপক দেশপাণ্ডে এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, ভারতীয় রসতত্ত্বের ইতিহাসে রসের স্বরূপ সম্পর্কে দুটি সাম্প্রদায়িক মতের প্রচলন ছিল। প্রথমটি হল 'পরিপুষ্টিবাদ'– যে মত অনুসারে 'স্থায়ী এব রসঃ' – অর্থাৎ স্থায়িভাব ও রস বস্তুতঃপক্ষে এক ও অভিন্ন। এই মতবাদের সমর্থক হলেন দণ্ডী, বামন, লোল্লট, শঙ্কুক, সাংখ্য আচার্যগণ, রামচন্দ্র -গুণচন্দ্র এবং ভোজদেব। দ্বিতীয় মতটি হল 'অভিব্যক্তিবাদ' বা 'চর্বণাবাদ' বা 'কেবলানন্দবাদ' – যদনুসারে 'স্থায়িবিলক্ষণো রসঃ' – অর্থাৎ স্থায়িভাব ও রস বস্তুতঃপক্ষে ভিন্ন, এদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সর্বথা পৃথক । এই মতবাদের সমর্থক হলেন ভট্টতৌত ও তচ্ছিষ্য অভিনবগুপ্ত,আনন্দবর্ধন, মম্মট, হেমচন্দ্র, বিশ্বনাথ, মধুসূদন সরস্বতী এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ।[৪৩] প্রথম মত অনুসারে, বিভাবাদি ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাবের যা স্বরূপ, উদ্রিক্ত রসের স্বরূপ-ও অনুরূপ। অতএব তাঁদের মতে, সুখকর বিভাবাদির দ্বারা উদ্বুদ্ধ সুখপ্রদ স্থায়িভাব সুখাত্মক রসের উদ্বোধ ঘটায়। বিপরীতে দুঃখকর বা ভয়ঙ্কর বিভাবাদির দ্বারা উদ্বুদ্ধ দুঃখাত্মক স্থায়িভাব দুঃখাত্মক রসের উদ্বোধ ঘটায়। দ্বিতীয় মত অনুসারে,রস স্থায়িভাব থেকে ভিন্ন। অতএব সুখ বা দুঃখাত্মক – যে কোনো প্রকার বিভাবাদির দ্বারা উদ্বুদ্ধ যে কোনো প্রকার স্থায়িভাব সর্বদা ও সর্বথা পরিণামসুখাত্মক রসের-ই উৎপত্তি ঘটায়; ভাবাদির যাবতীয় প্রক্রিয়ার পর নিষ্পন্ন কোনো রস-ই দুঃখাত্মক হতে পারে না।

যাই হোক্, আগে-ও বলা হয়েছে, রসের দ্বৈতস্বরূপবিষয়ক তত্ত্ব কিছু আলঙ্কারিকের চিন্তায় থাকলে-ও, সেই তত্ত্ব তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় আচার্য রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের লেখনীতে । যেমন ধ্বনির ধারণা প্রাক্তন আচার্যদের অনেকের মধ্যে থাকলে-ও, ধ্বনিপ্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতারূপে আনন্দবর্ধনাচার্যকে-ই স্বীকার করা হয়, অনুরূপে রসের সুখদুঃখময় উভয়াত্মক স্বরূপের প্রতিষ্ঠাতারূপে জৈনাচার্য রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের নাম সংস্কৃত রসতত্ত্বের ইতিহাসে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করা হয়। কেবল একটি নতুন মতবাদের প্রতিষ্ঠামাত্র নয়, মহর্ষি ভরত থেকে আরম্ভ করে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের তাবৎ আচার্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সমর্থিত ও স্বীকৃত রসের কেবলসুখাত্মকতাবাদকে খণ্ডন করার যে বলিষ্ঠতা ও সাহস এই দুই জৈনাচার্য প্রদর্শন করেছেন, তা নির্দ্বিধায় প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। ডঃ. রাকেশ গুপ্তা তাঁর 'Psychological Studies in Rasas' গ্রন্থে যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন– " In the whole range of Sanskrit Poetics there is, however, one work , viz, Natyadarpana, the authours of which had the courage to maintain, even against the tradition, that the end of all poetry is not to please……" [৪৪]

নাট্যদর্পণ-পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকদের মধ্যে আচার্য সিদ্ধিচন্দ্রগণি কর্তৃক বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশখণ্ডন' গ্রন্থে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের মতবাদের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। সিদ্ধিচন্দ্রগণি একটি নব্যমতের উল্লেখ করেছেন,যে মতের অনুসারীরা শৃঙ্গার, বীর, হাস্য ও অদ্ভুত – এই চারটি মাত্র রস স্বীকার করেছেন;করুণ, বীভৎস, ভয়ানক ও রৌদ্রকে এঁরা রসপদবাচ্যরূপে স্বীকার-ই করেননি– ''নবীনাস্তু শৃঙ্গার-বীর-হাস্যাদ্ভুতসংজ্ঞাশ্চত্বার এব রসাঃ। করুণাদীনাং যথা ন রসত্বং তথা বক্ষ্যতে'' ।[৪৫] তাঁরা আরো মনে করেন যে, করুণাদি রসচতুষ্টয়কে যাঁরা শৃঙ্গারাদির ন্যায় আনন্দাত্মকরূপে গণ্য করেন, তাঁদের বক্তব্য উন্মাদের প্রলাপের ন্যায় অর্থহীন– 'যত্তু শোকাদ্যো2পি রত্যাদিবৎ স্বপ্রকাশজ্ঞানসুখাত্মকা ইতি তদুন্মত্তপ্রলপিতম্' ।[৪৬] এই নবীন আলঙ্কারিকদের মতে, কারুণ্যপূর্ণ বিলাপাদির বর্ণনা করা হয় তদন্তর্নিহিত শৃঙ্গারের আধিক্য ও তীব্রতা বর্ণনার প্রয়োজনে। উদাহরণস্বরূপ রঘুবংশমের অজবিলাপের উল্লেখ করা হচ্ছে, যার মধ্যে করুণরসের বর্ণনাচ্ছলে প্রকৃতপক্ষে অজ ও ইন্দুমতীর প্রণয়ের গাঢ়তা-ই প্রতিপাদিত হয়েছে। অনুরূপে শান্তরসের বর্ণনা করা হয় মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তির সংসারবিরাগ প্রতিপাদনের জন্য , ভয়ের বর্ণনা করা হয় ব্যক্তিবিশেষের চিত্তের কোমলতা বর্ণনার জন্য। এই নব্য আলঙ্কারিকদের মতে, কাব্যে শৃঙ্গারাদি রসচতুষ্টয় ব্যতীত অন্য কোনো রসের প্রয়োজন নেই। কবি কেবলমাত্র তাঁর রচনাকৌশল ও নির্মাণচাতুর্য প্রমাণের জন্য অন্যান্য রসগুলির অবতারণা করে থাকেন।[৪৭] এই নব্যমতের উপর নাট্যদর্পণধৃত রসের উভয়াত্মকত্বের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সংস্কৃত রসতত্ত্বের ইতিহাসে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র কর্তৃক উপস্থাপিত রসের উভয়াত্মকতাবাদ স্বতন্ত্র ও অনন্য একটি মতবাদ হলে-ও, পরবর্তী আলঙ্কারিক প্রধানদের কাছে এই অভিমত একেবারে-ই আদৃত হয়নি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে, এই মতবাদটির দোষ-ত্রুটিগুলির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমরা এবার একে-একে এই মতবাদের পক্ষে স্থাপিত যুক্তিগুলির আলোচনা করবো –

নাট্যদর্পণের প্রথম যুক্তিতে বলা হয়েছে, বিভাবাদির স্বরূপ ও রসের স্বরূপ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ বিভাবাদি সুখকর হলে রস সুখাত্মক, বিভাবাদি পীড়াদায়ক হলে রস দুঃখাত্মক। এই যুক্তির অবতারণায় গ্রন্থকাররা লৌকিক বিভাব ও নাট্যবিভাবকে অভিন্ন রূপে গণ্য করেছেন, যা সঠিক নয়। লৌকিক বস্তুসমূহ কবির ভাবদৃষ্টি, কবির রচনাকৌশল, সঙ্গীতাদি মাধুর্য ইত্যাদির দ্বারা নাট্যের বিভাবে পরিণত হয়। এগুলি তখন আর বস্তু নয়, তখন এরা বিভাব; এগুলি তখন 'বিশেষ' নয়, 'নির্বিশেষ';অতএব রসোদ্বোধের হেতু – 'তা এব পরিত্যক্তবিশেষা রসহেতবঃ' (দশ.রূ.৪/৪১)। দশরূপকের অবলোকটীকার সাহায্যে এই বিষয়টি বিশদে বোঝানো যেতে পারে। আচার্য ধনিকের

মতে – ‘‘যদি চানুকার্যস্য রামাদেঃ শৃঙ্গারঃ স্যাত্ততো নাটকাদৌ তদ্দর্শনে লৌকিক ইব নায়কে শৃঙ্গারিণি স্বকান্তাযুক্তে দৃশ্যমানে শৃঙ্গারবানয়মিতি প্রেক্ষকাণাং প্রতীতিমাত্রং ভবেন্ন রসানাং স্বাদঃ। সৎপুরুষাণাং চ লজ্জেতরেষাং ত্বসূয়ানুরাগাপহারেচ্ছাদয়ঃ প্রসজ্যেরন্’’[৪৮] – অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে অনুকার্য শৃঙ্গারবান্ রামাদি চরিত্রকে যদি লৌকিক জগতের সস্ত্রীক শৃঙ্গারবান্ রাম বলে মনে হয়, তবে প্রেক্ষকের রসাস্বাদন হবে না। ‘নায়ক শৃঙ্গারবান্’ – এই বোধ হলে যাঁরা সজ্জন, তাঁরা লজ্জা বোধ করবেন; অন্যরা ঈর্ষা, অনুরাগ, অপহরণের ইচ্ছাদির বশবর্তী হয়ে পড়বেন। অতএব লৌকিক বিভাব ও কাব্যবিভাবের চরিত্র ও স্বরূপ কখনো-ই এক নয়। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে-ও এর সমর্থনে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বাস্তব জগতে আমরা যখন কোনো সুন্দর পুষ্প দর্শন করি, আমরা সেটিকে গ্রহণ করতে চাই ,তার ঘ্রাণ নিতে চাই, তাকে চয়ন করতে চাই। যখন ভয়ানক কোনো ঘটনা ঘটে, আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ি, রোদন করি, অকুস্থল থেকে দ্রুত পলায়ন করি। কিন্তু নাটকাদিতে না পুষ্পদর্শনে আমরা তাকে চয়নের চেষ্টা করি, না ভয়ানক ঘটনার প্রত্যক্ষে প্রেক্ষাগৃহ থেকে পলায়ন করি। অতএব অতি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে-ও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, লৌকিক বিভাব ও নাট্যবিভাব এক নয়। ইন্দ্রিয়জ লৌকিক অনুভূতি যখন কবির বিভাবনায় সামাজিকের চিত্তে অলৌকিকরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তা নাট্যবিভাবরূপে পরিগণিত হয়। আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে – ‘চিত্তবৃত্তয় এবালৌকিকাঃ বাচিকাদ্যভিনয়প্রক্রিয়ারূঢ়তয়া স্বাত্মানং লৌকিকদশায়ামনাস্বাদ্যং কুর্বন্ত ীত্যতস্তা এব ভাবাঃ’ (না.শা.সপ্তম অধ্যায়)।

আরেকটি বিষয়-ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। দর্শক কিন্তু কখনো-ই লৌকিক বিভাব ও নাট্যবিভাবকে এক বলে মনে করেন না। কারণ, তিনি অভিনয়ের সঙ্গে যত-ই একাত্মতা অনুভব করুন না কেন, তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে এই বোধটি অনুক্ষণ জাগরূক থাকে যে, তিনি যা প্রত্যক্ষ করছেন, তা নাটকাদি রূপক মাত্র; এটি তাঁর নিত্যপরিচিত বাস্তব, লৌকিক জগত নয়। সেই সদাজাগ্রত বোধ থেকে-ই তিনি লৌকিক বিভাব ও নাট্যবিভাবের পার্থক্য বিষয়ে সচেতন থাকেন। অতএব বলা যেতে পারে যে, সামাজিকচিত্তে লৌকিকবিভাব ও নাট্যবিভাবের প্রভাব একরূপ –এই অনুমানের ভিত্তিতে অবতারিত নাট্যদর্পণের প্রথম যুক্তিটি বিচারের অপেক্ষা রাখে।

নাট্যদর্পণধৃত পরবর্তী যুক্তিটি-ও একই ধারায় খণ্ডিত হতে পারে। দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে, সব রস সুখাত্মক বলে প্রচলিত হলে-ও, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু করুণাদি রসের আস্বাদনে সুখ নেই,আছে দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণা। এর খণ্ডনমানসে অবতারিত প্রতিযুক্তিটি প্রথমটির অনুরূপ। লৌকিক বিভাব ও নাট্যবিভাবের স্বরূপ এক নয়। বাস্তব জগতে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্বদ্ধ অবস্থায় যে বস্তুগুলি আমাদের পীড়ার কারণ হয়, নাটকাদিতে পরিবেশিত হলে নাট্যবিভাবরূপে সেগুলি-ই

আমাদের আনন্দময় রসাস্বাদন করায়। এর কারণ, তখন এই বস্তু বা ঘটনাগুলি আর ব্যক্তিগত থাকে না, তা হয়ে ওঠে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক । যে কারণে রঙ্গমঞ্চে পুষ্পদর্শনে আমরা তার প্রতি ধাবিত হই না , সেই এক-ই কারণে মঞ্চে করুণদৃশ্যাদির প্রত্যক্ষে আমরা বাস্তবিক শোকবিহ্বল হয়ে পড়ি না। মানসিক সাযুজ্যবশতঃ তাৎক্ষণিক দুঃখবোধ করি সত্য, কিন্তু তার মধ্যে-ও এক বিমল আনন্দের অনুভূতি ক্রিয়মান থাকে। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁর 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থে বলেছেন–

''ক্রোধশোকভয়াদীনাং সাক্ষাৎসুখবিরোধিনাম্ ।

রসত্বমভ্যুপগতং তথানুভবমাত্রতঃ ॥'' (ভক্তিরসায়ন,২/৭৯)

–ক্রোধ, শোক, ভয় ইত্যাদি ভাবগুলি যদি-ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে-ই আনন্দলাভের বাধক, তথাপি কেবল অনুভূতির বলে, অর্থাৎ শোকাদিস্থলে-ও যে একটি আনন্দানুভূতি থাকে, কেবলমাত্র এই কারণে এগুলির রসত্ব স্বীকার করা উচিৎ। কাব্যজগতের সঙ্গে সংশ্লেষহেতু লৌকিক জগতের শোকাদির কারণগুলি অলৌকিক বিভাবে পরিণত হয় ও রসাস্বাদনজনিত সুখোৎপত্তি ঘটায়, এটি দর্পণকারের-ও অভিমত –

''অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।

সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ ..... ॥''(সা.দ.৩/৬)

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী-ও এই অভিমত পোষণ করেন যে, যেহেতু লৌকিক শোকাদির কারণগুলি প্রেক্ষকসমক্ষে অলৌকিক বিভাবরূপে প্রতিভাত হয়, সেই কারণে ঐসকল শোকাদির ভাব কখনো দুঃখ উৎপাদন করতে পারে না, অতএব এদের রসরূপতাপ্রাপ্তিতে-ও বাধা হয় না –

''অতো ন করুণাদীনাং রসত্বং প্রতিহন্যতে ।

ভাবানাং বোদ্ধৃনিষ্ঠানাং দুঃখাহেতুত্বনিশ্চয়াৎ ॥''(ভক্তিরসায়ন, ৩/৬)

একথা সত্য যে, করুণরসাত্মক দৃশ্যের প্রত্যক্ষে সহৃদয় সামাজিকগণ দরবিগলিতচিত্তে অশ্রুবিসর্জন করে থাকেন। কিন্তু সামাজিকরূপে এ-ও আমাদের প্রত্যেকের উপলব্ধ যে, অশ্রুমাত্র-ই দুঃখের জ্ঞাপক নয়, তা আনন্দজাত-ও হতে পারে। অভিনয়দর্শনে জাত নয়নাসার সেই আনন্দাশ্রু। দর্পণকারের মতে, চিত্তের দ্রবতার কারণে সামাজিকগণের এই সুখাশ্রুপাত ঘটে থাকে – 'অশ্রুপাতাদয়স্ত দ্বদ্রুতত্বাচ্চেতসো মতঃ' (সা.দ.৩/৭)। অভিনয়দর্শনকালে আনন্দ ও বেদনার এই যুগপৎ সহাবস্থানকে দশরূপকের টীকাকার ধনিক একটি উদাহরণযোগে স্পষ্ট করেছেন। তাঁর মতে, দন্তাঘাতাদি অন্য সময় বেদনার কারণ হলে-ও , সুরতকালে তা যেমন আনন্দের কারণ হয়ে থাকে অনুরূপভাবে লৌকিক জগতে যে ঘটনাবলী দুঃখের কারণ, অলৌকিক কাব্যজগতে তা-ই আনন্দের ও

সুখের কারণ হয়ে ওঠে – 'অসাবানন্দঃ সুখদুঃখাত্মকো যথা প্রহরণাদিষু সম্ভোগাবস্থায়াং কুট্টমিতে স্ত্রীণামন্যশ্চ লৌকিকাৎ করুণাৎ কাব্যকরুণঃ '।[৪৯]

একথা-ও চিন্তনীয় যে, যদি করুণরসাত্মক নাটকাদি থেকে দুঃখোৎপত্তি হয়, তবে প্রেক্ষক সেই নাটক দেখতে আসেন কেন? কোনো ব্যক্তি-ই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দুঃখাস্বাদন করতে চান না– "যদা দুঃখং ন কো2পি স্যাত্তদুন্মুখঃ। ন হি কশ্চিৎ সচেতা আত্মনো দুঃখায় প্রবর্ততে" (সা.দ.তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। অতএব যুক্তিসঙ্গতভাবে-ই প্রমাণিত হয় যে, প্রেক্ষকবর্গ মানসিক শান্তির আশায় যে 'বিশ্রান্তিজনন' নাটকাদি দর্শন করেন, তা থেকে তাঁদের সুখলাভ-ই হয়। এবং বাস্তব জগতের চিত্র এই যে, সামাজিকচিত্তে সুখাত্মক নাটকগুলি অপেক্ষা করুণরসাত্মক ও দুঃখমূলক নাটকগুলির আবেদন অনেক বেশি। ব্রিটিশ কবি Shelly বিরচিত 'Skylark'কবিতার সেই অতিপ্রসিদ্ধ পংক্তিটি স্মরণীয় - " Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts. "

নাট্যদর্পণের পরবর্তী যুক্তিটিতে বলা হচ্ছে, করুণ-ভয়ানকাদি রস থেকে আনন্দ আস্বাদিত হয় না, তা নাট্যকার ও নটনটীবর্গের কলাকৌশলজাত এক চমৎকৃতিমাত্র। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য এই যে, বাস্তবে কিন্তু আমরা তত্তৎ রসের উদ্বোধের দ্বারা-ই আনন্দ অনুভব করে থাকি। নাট্যকার ও কুশীলবদের অসাধারণ অভিনয়ক্ষমতার প্রশংসা-ও আমরা করি বটে, তবে তার ক্রম অনেক পরে।

নাট্যদর্পণের চতুর্থ যুক্তিতে বলা হচ্ছে, সুখদুঃখময় জীবনের প্রতিফলনরূপে নির্মিত নাটক-ও হবে সুখদুঃখাত্মক। তাই যেমনভাবে লৌকিক জগতে বহু দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটে থাকে, অনুরূপে নাটকাদিতে-ও সুখের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণাদির-ও চিত্রায়ন হয়। একথা সত্য। কিন্তু পূবে-র্ই প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, লৌকিক জগতের ঐসকল শোকাদিহেতু বস্তু বা ঘটনা নাট্যের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে অলৌকিক বিভাবে পরিণত হয় এবং দর্শকচিত্তে অবিমিশ্র সুখের উৎপত্তি ঘটায়। দুঃখাত্মক ঘটনার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে-ই শুধু নয়, তজ্জাতীয় ঘটনার স্মৃতিচারণে -ও যে একপ্রকার সুখানুভূতি হয়, তা সকল সহৃদয় সামাজিকের দ্বারা অনুভূত ও উপলব্ধ। 'স্মৃতি সতত-ই সুখের', 'প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকায়াং সংচিন্ত্যমানানি সুখান্যভুবন্' ইত্যাদি উক্তি তার প্রমাণ। দুঃখাত্মক ঘটনাসমূহের এই সুখাত্মকতার কারণটি উপলব্ধি করেছেন বলে-ই,ভারতীয় আলঙ্কারিকরা সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলম্ভের এবং বিপ্রলম্ভ অপেক্ষা-ও করুণের মাধুর্য স্বীকার করেন –'সম্ভোগশৃঙ্গারাৎ মধুরতরো বিপ্রলম্ভঃ, ততো2পি মধুরতমঃ করুণ ইতি' (ধ্বন্যালোকলোচন ২/৯)। 'রসেষু করুণো মতঃ' – এই ছিল একদা সাহিত্যজগতের জনশ্রুতি। আনন্দবর্ধনাচার্যের মতে, করুণরসের মাধুর্য-ই সর্বাধিক – 'মাধুর্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ' (ধ্বন্যালোক ২/৮)। দুঃখময় সংসারে দুঃখশোকাদির সংস্কার রাগী-বিরাগী সকলের মধ্যে সমধিক মাত্রায় বর্তমান, ভারতীয় আলঙ্কারিকরা তা অনুভব করেছিলেন

বলে-ই, করুণরসকে তাঁরা প্রধানরস বলে মনে করতেন। তাই ভবভূতির উত্তররামচরিতের 'একো রসঃ করুণ এব' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার বীররাঘব কবির আশয় ব্যক্ত করেছেন এইভাবে – "ইদমত্র কবের্মতম্– যদ্যপি শৃঙ্গার এক এব রস ইতি শৃঙ্গারপ্রকাশকারাদিমতম্, তথাপি প্রাচুর্যাদ্রাগিবিরাগিসাধারণ্যাৎ করুণ এক এব রসঃ । অন্যে তু তদ্বিকৃতয়ঃ"(উত্তররামচরিত,তৃতীয় অঙ্ক)। অন্যরসের তুলনায় করুণ রসের চিত্তসংবাদ অনেক বেশি, তাই সংবেদনশীল সাহিত্যিক করুণরসের আবেদনকে কখনো-ই উপেক্ষা করতে পারেন না। মহামতি শেক্সপীয়রের tragedy, মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমে শকুন্তলার বিদায়দৃশ্য,নাট্যকার ভবভূতির উত্তররামচরিতে শ্রীরামের বিলাপ – এই সকল কালজয়ী, যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যকৃতির মূলে রয়েছে করুণরসের অসামান্য প্রয়োগকৌশল, যা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মর্মস্থলকে স্পর্শ করে যায়। অতএব যে করুণরস পৃথিবীর সকল সহৃদয় সামাজিকের আনন্দহেতু, তাকে কোনোভাবে-ই দুঃখের কারণরূপে গণ্য করা তো সঙ্গত নয়-ই, উপরন্তু উল্লিখিত আলোচনাদৃষ্টে বরং শৃঙ্গারাদি তথাকথিত সুখাত্মক রসের তুলনায় করুণরসের আস্বাদ্যমানতা যে সর্বাংশে অধিক – এই বিপ্রতীপ মতটি-ই প্রমাণিত হয়। কেবল ভারতীয় আলঙ্কারিকরা নন. পাশ্চাত্যের রসবেত্তারা-ও এবিষয়ে সহমত। ব্রিটিশ কবি Shelly-র এই উক্তিটি এপ্রসঙ্গে প্রণিধেয় – "The pleasure of sorrow is more pleasant than the pleasure of pleasure itself."

নাট্যদর্পণের পঞ্চম যুক্তিটিতে বলা হয়েছে, সুখাত্মক ঘটনাসমূহের নিরবচ্ছিন্ন সন্নিবেশের পরিবর্তে রচনার মধ্যে-মধ্যে দুঃখাত্মক ঘটনার বিনিবেশনে সুখাত্মক রসগুলির স্বাদুতা বৃদ্ধি পায়। একথা সত্য। বহুরসভূয়িষ্ঠ নাটকে নানাবিধ রসের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত ও করণীয়। শৃঙ্গারাদি সুখদায়ক রসের ক্রমাগত পরিবেশনে নাটকে বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতার সৃষ্টি হয়, তা পরিহারের জন্য নাট্যকাররা করুণাদি রসের ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ অভিজ্ঞানশকুন্তলমের প্রথম অঙ্কের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার শৃঙ্গারোত্থ দীর্ঘ আলাপচারিতার কারণে সম্ভাবিত বৈচিত্র্যহীনতার পরিহারমানসে মহাকবি কালিদাস ভয়ানকরসাত্মক হস্তীবৃত্তান্তের উপস্থাপনা করলেন। অতএব একথা সত্য যে, দুঃখাত্মক ঘটনার সন্নিবেশে সুখপ্রদ ঘটনাজাত আনন্দ অধিকতর রূপে আস্বাদিত হয়।

তবে এই যুক্তিটির অবতারণে-ও নাট্যদর্পণকারদের চিন্তাপদ্ধতিতে সেই এক-ই ত্রুটি রয়ে গেছে। শৃঙ্গারাদি রসের ক্রমান্বিত পরিবেশনে নাটকে গতানুগতিকতা ও সময়বিশেষে স্বাদহীনতার সৃষ্টি হয়, সত্য ; করুণাদি রসের প্রয়োগদ্বারে ঝটিতি নাটকীয় বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা যায়, সত্য; কিন্তু এই করুণমূলক ঘটনাদিতে প্রেক্ষকচিত্তে দুঃখের উদ্ভব হয়, একথা সত্য নয়। পূর্বে-ই প্রতিপাদন করা

হয়েছে যে, করুণাদি রস থেকে-ও সহৃদয় সামাজিক শুদ্ধ-নিষ্কলুষ-নির্মল আনন্দের অনুভব করেন। অতএব করুণাদি রসে অনুভূত দুঃখের দ্বারা শৃঙ্গারাদিজাত সুখানুভব বর্দ্ধিত হয় – নাট্যদপণধৃত এই যুক্তিটি অসার। বিভিন্ন রসাত্মক বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণায় নাটকের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় এবং নাটকীয় ঘটনার অগ্রগতি সাধিত হয় – এই মাত্র; তার দ্বারা রসাস্বাদনের মূল স্বরূপের কোনো ব্যত্যয় হয় না। কারণ রস কেবলানন্দস্বরূপ, তাই সর্বপ্রকার রসের আস্বাদনে-ই সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে কেবলমাত্র আনন্দ অনুভূত হয়, দুঃখের উদ্রেক হয় না।

নাট্যদর্পণের পরবর্তী মতটিকে স্বতন্ত্র যুক্তির পরিবর্তে উদাহরণাত্মক যুক্তিরূপে গণ্য করা অধিকতর সঙ্গত হবে। এখানে বলা হচ্ছে, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি দৃশ্যগুলি সহৃদয় চিত্তে কখনো আনন্দের উদ্রেক করতে পারে না, কারণ এগুলি সর্বথা দুঃখাত্মক। কিন্তু নিবিষ্ট বিচারে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, এইসকল ঘটনার দৃশ্যায়নে আমাদের চিত্তে দুঃখ বা যন্ত্রণার উদ্রেক হয় না, উদ্রেক হয় সহানুভূতি ও সহমর্মিতার। পুত্রহারা মাতার বিলাপ, প্রণয়িনী-বিরহিত প্রণয়ীর আক্ষেপ ইত্যাদির প্রত্যক্ষে আমরা তাদের যন্ত্রণাময় অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হয়ে এক সহমর্মিতার অনুভব করে থাকি। যে দুঃখ আমাদের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ আত্মগত, তার দ্বারা আমরা কষ্ট পাই। যে দুঃখ অপরের সঙ্গে সম্বদ্ধ অর্থাৎ পরগত, তাতে আমরা সহানুভূতি অনুভব করি। কবি বা নাট্যকার করুণাত্মক দৃশ্যের অবতারণার দ্বারা প্রেক্ষককে দুঃখিত ও পীড়িত করতে চান না, তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলির ভাগ্যবিপর্যয়ে প্রেক্ষককে তাঁদের সহমর্মী করে তুলতে চান।

করুণরসের এই ব্যাপক অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অভিনবভারতীতে উদ্ধৃত শ্রীশঙ্কুকের ব্যাখ্যায়–"সহৃদয়তা হি করুণেতি লোকে প্রসিদ্ধা। সা চ লিঙ্গৈরনুকর্তরি শোকং প্রতিপাদয়তাং সামাজিকানামিতি তত্র করুণব্যপদেশ ইতি শ্রীশঙ্কুকঃ" (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়) – অর্থাৎ সহৃদয়তা-ই করুণা নামে লোকসমাজে প্রসিদ্ধ। তা দৃশ্যমান রোদন-বিলেপনাদি লিঙ্গের দ্বারা অনুকর্তা নটে এবং করুণের অনুভবকর্তা সামাজিকগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

দুঃখময় জীবনে শোকার্ত মানুষ অপরের সহানুভূতি আশা করে, কারণ অন্যের কাছে তার কষ্টের কথা ব্যক্ত করে সে স্বীয় যন্ত্রণাভার লাঘব করতে পারে– 'স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি' (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, তৃতীয় অঙ্ক)। কিন্তু কেবল সহানুভূতি লাভে-ই নয়, সহানুভূতি দানে-ও এক বিমল আনন্দের অনুভূতি হয়। কাব্যনাটকাদিতে ভাগ্যবিপর্যস্ত মহান্ চরিত্রগুলির প্রতি সহমর্মিতায় সামাজিক সেই সুখানুভবের আস্বাদ পান। ডঃ.কে.এইচ. ত্রিবেদী যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন – ".......... man not only requires sympathizers, he is also

anxious to extend sympathy to others. There is a joy in giving sympathy as well."[৫০] শেক্‌সপীয়রের 'হ্যামলেট', 'কিং লীয়র', 'ওথেলো' ইত্যাদি tragedy, অভিজ্ঞানশকুন্তলমে তপোবন থেকে শকুন্তলার বিদায়দৃশ্য, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানদৃশ্য, রঘুবংশমের অজবিলাপ ইত্যাদি রচনায় এই সহানুভূতি পোষণের চূড়ান্ত অবকাশ উপলব্ধ হয়, সেই কারণে-ই বিশ্বের তাবৎ রসিকচিত্তে এই রচনাগুলির আবেদন এতখানি প্রগাঢ়, এতখানি প্রবল।

এই সহানুভূতিপোষণজনিত আনন্দের একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অন্যের প্রতি সহানুভূতি পোষণের সময় অন্তরের অন্তঃস্থলে অতি সূক্ষ্মভাবে যেন একটি আত্মপ্রসাদের ভাব অনুভূত হয়। 'আমি অন্যের কষ্টে আনন্দিত হই না, অন্যের দুঃখে সমব্যথী হতে পারি'– এই জাতীয় এক অতি-প্রচ্ছন্ন আত্মশ্লাঘা যেন এর মধ্যে সক্রিয় থাকে। সহানুভূতির অশ্রুবিধৌত মনোভূমিতে সামাজিকগণ যেন নিজচিত্তের ঔদার্য ও নিজসত্তার মানবিকতাকে পুনর্বার আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভবের আকর্ষণে-ই তাঁরা বারংবার করুণরসাত্মক নাটকাদির প্রত্যক্ষে প্রবৃত্ত হন।

নাট্যদর্পণের সপ্তম তথা অন্তিম যুক্তিতে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র একজন অসুখী ব্যক্তি-ই নাট্যে প্রদর্শিত করুণাত্মক ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষে আনন্দলাভ করেন, কোনো সুখী ব্যক্তি এতে আনন্দ পেতে পারেন না। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বাস্তবে দুঃখাত্মক ঘটনাসমূহ উপভোগের জন্য স্বয়ং দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বিভিন্ন নাট্যচরিত্রের ব্যথা-যন্ত্রণার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে গেলে, আমাদের-ও ব্যথাতুর হতে হয় না। আর এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে, নাট্যস্থ মহান্ চরিত্রগুলির ভাগ্যবিড়ম্বনা ও দুর্দৈবে প্রেক্ষক যে শুধু সমবেদনা পোষণ করেন, তাই নয়, এর সঙ্গে মিশে থাকে এক স্বস্তির অনুভব। দুঃখদীর্ণ, যুদ্ধজীর্ণ প্রেক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল ব্যর্থতা, নিষ্ফলতা ও হতাশা প্রতিনিয়ত তাকে পীড়িত করে, নাটকীয় চরিত্রে সেই ব্যর্থতাদির দৃশ্য তাকে স্বস্তি দেয়। জীবনে দুঃখ যে কেবল তার একার নয়, সমগ্র সংসার-ই দুঃখময়, নাটকাদিতে পরিবেশিত সমুন্নত ও মহিমান্বিত চরিত্রগুলির ভাগ্যবিপর্যয়দর্শনে, আপনার অজ্ঞাতসারে উদ্বুদ্ধ এই বোধ প্রেক্ষককে স্বস্তিদান করে। চিত্তের আত্মপর ভেদ বিলুপ্ত হতে থাকে। দর্পণকারের ভাষায় সে অবস্থা –'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ' (সা.দ.৩/১৩)। শুধু তাই নয়, নাটকাদিতে মহাশক্তিমান্ চরিত্রগুলির ভাগ্যবিড়ম্বনায় প্রেক্ষকের চিত্তে কেবল সমবেদনা ও স্বস্তি-ই নয় , তদতিরিক্ত এক বৃহত্তর চেতনা, এক গভীর তত্ত্ববোধের উন্মেষ ঘটে। এই চেতনা সাময়িকভাবে হলে-ও প্রেক্ষককে এক গাম্ভীর্যময় বৈরাগ্যসুখের অনুভব করায়। এই সকল অনুভূতির জন্য প্রেক্ষককে অসুখী হতে হয় না, সুখী-অসুখী নির্বিশেষে সহৃদয় সামাজিকমাত্রের এই উপলব্ধি ঘটে। অতএব

নাট্যদর্পণকাররা যে বলেছেন, কেবলমাত্র জনৈক অসুখী ব্যক্তি-ই করুণ দৃশ্যের প্রত্যক্ষে আনন্দলাভ করেন, এই মত সর্বথা অসার, অযৌক্তিক এবং অবাস্তব।

কেবল সংস্কৃত তথা ভারতীয় রসতত্ত্বে নয়, পাশ্চাত্যের নন্দনতত্ত্বে-ও করুণরসের আনন্দাত্মকতা বিষয়ে বহু চর্চা হয়েছে । বেদনাঘন করুণরসে মানুষের আনন্দ হয় কিভাবে? একি সাদন সুখ অর্থাৎ 'sadism' নাকি আত্মনির্যাতনসুখ অর্থাৎ 'masochism'? কিন্তু অভিনিবেশসহকারে বিচার করলে দেখা যাবে, উৎপীড়ন বা আত্মপীড়নের আনন্দ বাস্তবে সম্ভব হলে-ও, সাহিত্যে তা কখনো-ই সম্ভব নয়। কারণ –"পরপীড়ন বা আত্মনির্যাতন, উভয়ত্রই থাকে এক রাজসিক অথবা তামসিক অহংবোধ, এক আত্মপর ভেদবুদ্ধি। কিন্তু যেখানে ভেদবুদ্ধি, অহংমন্যতা সেখানে রস নাই, যেখানে রস সেখানে অহং অস্তমিত।......... সুখ, দুঃখ, মমতা-ক্ষমতা সব কিছুরই বিলুপ্তি ঘটে এই আনন্দে"।[৫১]

অন্যদিকে সোপেনহাওয়ার প্রমুখ দুঃখবাদী দার্শনিকদের মতে, করুণরসের আনন্দ প্রকৃতপক্ষে এক বিশিষ্ট প্রকারের চিন্তা ও জ্ঞানের আনন্দ। দুঃখময় এই পৃথিবীতে দুঃখের কবল থেকে কোনোমতে-ই নিস্তার নেই, এই চিন্তায় ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ ভাগ্যদেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে স্বস্তিলাভ করে। অপ্রতিকার্য বিপর্যয় এবং অনিবার্য প্রতিকূল অবস্থাকে সহিষ্ণুতার সঙ্গে স্বীকার করার এই নির্দ্বন্দ্ব মানসিকতাতে-ই করুণরসের আনন্দ।

আবার অ্যারিষ্টটলের মতে, দুঃখপ্রতিকারে অসমর্থ মানুষের মনে দুটি অবস্থা অতি-প্রবল হয় – একটি তার অসহায়তা, দ্বিতীয়টি তার ভয়। এই দুইয়ের সম্মেলনে লৌকিক করুণরসের উদ্ভব। কিন্তু বাস্তবের এই বেদনাদায়ক ও উৎপীড়ক করুণরস কবির প্রতিভাস্পর্শে অলৌকিক বিভাবে পরিণত হয়ে বেদনাকে শান্ত করে। এই বিচিত্র উত্তেজনা-উপশম ব্যাপারকে অ্যারিষ্টটল 'মোক্ষণ' বা 'Cathersis' নামে অভিহিত করেছেন – " Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not the narrative; through pity and fear effecting the proper 'Kathersis' or purgation of these emotions."[৫২] তিনি দুঃখের প্রতি মানুষের আকর্ষণের আরো একটি কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, অনুকরণের প্রতি মানবমনের একটি সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। অনুকরণের দ্বারা মানুষ শিক্ষার্জন করে, অনুকরণের দ্বারা বিবিধ প্রকার কার্যনির্বাহ করে। সেই একই-ভাবে কোনো ব্যক্তি

যদি, এমনকি দুঃখাত্মক ঘটনাবিশেষের-ও সার্থক অনুকরণ করে, মানুষ তার স্বভাববশতঃ তদ্দর্শনে আনন্দবোধ করে।[৫৩]

উপর্যুক্ত সমগ্র আলোচনায় রসচর্বণার একটি নির্যাস পাওয়া গেল। জানা গেল, কবির পদলালিত্যে লৌকিক বস্তু অলৌকিক বিভাবে পরিণত হয়। কবির শব্দশক্তিবলে লৌকিক ভাবগুলি অলৌকিক মহিমা অর্জন করে। কবির এই অনবদ্য বাচনভঙ্গি ও কলাকৌশলে এমন এক অলৌকিক ভাবজগৎ সৃষ্টি হয়, যেখানে নাটকীয় চরিত্রগুলির সঙ্গে দর্শকচিত্তের এক অভিনব ও অনবদ্য সংযোগ স্থাপিত হয়। এমতাবস্থায় নাটকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে দর্শকের সুখদুঃখ একাত্ম হয়ে যায়– 'সাধারণ্যেন রত্যাদিরপি তদ্বৎ প্রতীয়তে' (সা.দ.৩/১২)। এই সাধারণীকরণের দ্বারা আত্মপরভেদ লুপ্ত হয়, অপরের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্যবোধ জন্মায় এবং লোকোত্তরচমৎকারী এক শুদ্ধ ও নিষ্কলুষ আনন্দ আস্বাদিত হয়, যার নাম রস।

নাট্যদর্পণকার আচার্য রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রসের দ্বৈতস্বরূপবিষয়ক মতবাদে একথা-ই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সব রসের আস্বাদ সুখাত্মক নয়, করুণ-ভয়ানকাদি চতুষ্প্রকার রসের আস্বাদ পীড়াদায়ক ও দুঃখাত্মক। এই মতবাদের সমালোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র একটি অত্যন্ত প্রাথমিক বিষয়ে একান্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছেন; তাঁরা লৌকিক বিভাব ও নাট্যবিভাবকে সজাতীয়,সগোত্র ও সমান রূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা জানি যে, কবির প্রতিভাস্পর্শে লৌকিক বিভাবের রূপান্তর ঘটে অলৌকিক নাট্যবিভাবে এবং তারপর এই দ্বিবিধ বিভাবের বৈশিষ্ট্য, চরিত্র,স্বরূপ ইত্যাদির কোনোরূপ সাদৃশ্য থাকে না। এই অত্যন্ত প্রাথমিক একটি প্রমাদের কারণে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র প্রবর্তিত এই মতবাদটি যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবু পরিশেষে একথা বলা যেতে-ই পারে যে, কীটানুবিদ্ধতার কারণে যেমন রত্নের রত্নত্ব বিনষ্ট হয় না, অনুরূপে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে-ও নাট্যদর্পণধৃত এই মতবাদটি উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রথম যৌক্তিক আলোচনারূপে সংস্কৃত রসতত্ত্বের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে।

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণের পার্থক্য ঃ

প্রাসঙ্গিকবোধে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণ–এই দ্বিবিধ রসের পার্থক্য নির্দেশ করা হচ্ছে।

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণ – দুটি রসের উদ্বোধব্যাপারে অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবগুলি অনুরূপ। বাষ্প, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দীর্ঘনিশ্বাস, শরীরের বিস্রস্ত অবস্থা ইত্যাদি অনুভাব এবং নির্বেদ, গ্লানি, ঔৎসুক্য, চিন্তা, দৈন্য, বিষাদ ইত্যাদি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা এই দুটি রসের-ই অভিনয় করা হয়ে থাকে। তবে উভয়ের প্রধান পার্থক্য হল এই যে, করুণরসে শুধু ইষ্টবিনাশের বর্ণনা থাকে না, তার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ইষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অবধি চিরতরে বিলুপ্ত হয়। বিপরীতে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে সাময়িক ভাবে ইষ্টবিয়োগ ঘটলে-ও, কালান্তরে পুনর্মিলনের আশা বর্তমান থাকে। এই আশার উপস্থিতিহেতু বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে কারুণ্যের গাঢ়তা কম, তুলনায় আশালতার সর্বথা উন্মূলনে করুণরসে কারুণ্যের পরিমাণ অত্যধিক ও অতি-তীব্র। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের আত্যন্তিক সুখাত্মকতার প্রতি নির্দেশপূর্বক বলা হচ্ছে– 'বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারস্তু দাহাদিকার্যত্বাৎ দুঃখরূপো2পি সম্ভোগসম্ভাবনাগর্ভত্বাৎ সুখাত্মকঃ'।[৫৪]

নাট্যশাস্ত্রে-ও অনুরূপভাবে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার এবং করুণের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে – "করুণস্তু শাপক্লেশবিনিপতিতেষ্টজনবিভবনাশবধবন্ধনসমুত্থো নিরপেক্ষভাবঃ। ঔৎসুক্যচিন্তাসমুত্থঃ সাপেক্ষভাবো বিপ্রলম্ভকৃতঃ। এবমন্যঃ করুণো2ন্যশ্চ বিপ্রলম্ভ ইতি" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়) – অর্থাৎ করুণরস শাপ, ক্লেশ, বিনিপাত, প্রিয়বিরহ, বিত্তনাশ, বধ, বন্ধনাদি বিভাব থেকে উদ্ভূত। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ঔৎসুক্য, চিন্ত াদি বিভাব থেকে উৎপন্ন। বিভাবের পার্থক্য থাকলে-ও, বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণরসের ব্যভিচারিভাব ও অনুভাবের সাম্য দেখা যায়। তথাপি করুণরস হল 'নিরপেক্ষ' অর্থাৎ এতে ইষ্টপ্রাপ্তির কোনো অপেক্ষা অর্থাৎ সম্ভাবনা থাকে না । কিন্তু বিপ্রলম্ভ 'সাপেক্ষ' অর্থাৎ এতে ইষ্টবস্তুর পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল । এইভাবে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণ পরস্পর অপেক্ষা বিভিন্ন । পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ বিপ্রলম্ভের নানা ভেদ স্বীকার করেছেন,তন্মধ্যে অন্যতম হল করুণবিপ্রলম্ভ। তাই তাঁরা বিপ্রলম্ভ ও করুণের মধ্যে নয়, আরো নির্দিষ্টভাবে করুণবিপ্রলম্ভ ও করুণের পার্থক্যবিচার করেছেন।

দর্পণকার নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে করুণবিপ্রলম্ভ ও করুণের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতানুসারে, প্রণয়ীযুগলের মধ্যে একজন পুনরাগমনের সম্ভাবনা নিয়ে স্থানান্তরে গমন করলে অপরজনের বিষণ্ণতায় করুণবিপ্রলম্ভ হয়। কিন্তু পুনরায় মিলনের আশা না থাকলে বা মিলন জন্মান্ত রীয় হলে করুণরস হয়।

ভোজদেব তাঁর 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' গ্রন্থে করুণবিপ্রলম্ভ ও শোক (অর্থাৎ শোকস্থায়িভাব করুণের) পার্থক্যনির্দেশাবসরে বলেছেন – বিপ্রলম্ভের একমাত্র হেতু রতি, করুণের হেতু প্রীতিদয়াদি অনেক। বিপ্রলম্ভের ফল পুনরায় সমাগম, করুণের ফল সমাগমের আত্যন্তিক অভাব। বিপ্রলম্ভের বিষয় কেবল স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা, করুণের ক্ষেত্রে এজাতীয় কোনা নিয়ম নেই। বিপ্রলম্ভের স্বরূপে থাকে মিলনের প্রত্যাশা, করুণে সে প্রত্যাশা একেবারে-ই নির্মূল – 'রত্যৈকহেতুঃ করুণঃ,

প্রীতিদয়াদ্যনেকহেতুঃ শোকঃ, পুনঃসঙ্গমফলঃ করুণঃ, অপুনঃসঙ্গমফলঃ শোকঃ, স্ত্রীপুংসবিষয়ঃ করুণঃ, অস্ত্রীপুংসবিষয়ঃ শোকঃ, সপ্রত্যাশারূপঃ করুণঃ, নিষ্প্রত্যাশারূপঃ শোকঃ'।[৫৫]

স্থায়িভাবের ভিত্তিতে-ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে পারে। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে করুণের স্পর্শ থাকলে-ও, এর মুখ্যভাব হল স্ত্রী-পুরুষের অন্যোন্য রতি। বস্তুতঃ, রতিজ দুঃখ-ই বিপ্রলম্ভের বিষয়। অন্যদিকে করুণরসের স্থায়িভাব হল শোক। ভাষান্তরে বলা যেতে পারে, করুণরসের ক্ষেত্রে শোক হল স্থায়িভাব, বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে শোক একটি ব্যভিচারিভাব।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, করুণ ও করুণবিপ্রলম্ভের সাদৃশ্য এত বেশি যে, এদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদনির্দেশব্যাপারে অনেক আলঙ্কারিকের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা যায়। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁর কাব্যানুশাসনে স্পষ্টভাবে-ই বলেছেন – 'করুণবিপ্রলম্ভস্তু করুণ এব' (কা.অনু. দ্বিতীয় অধ্যায়)। শোক স্থায়িভাব বা ব্যভিচারিভাব – কিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তদনুসারে করুণ ও করুণবিপ্রলম্ভের পার্থক্য নির্দেশ্য।

রস নটনিষ্ঠ না প্রেক্ষকনিষ্ঠ ঃ

নাট্যদর্পণের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় রসের অবস্থান সম্পর্কিত। প্রশ্ন এই যে, রস কি নটগত নাকি দর্শকগত? এবিষয়ে নাট্যদর্পণের অভিমত হল, রস প্রথমতঃ অনুকার্য রামাদিচরিত্রগত এবং দ্বিতীয়তঃ দৃশ্যকাব্যক্ষেত্রে প্রেক্ষকের এবং শ্রব্যকাব্যক্ষেত্রে শ্রোতা ও সমালোচকগত; অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে সামাজিকগত। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে–'রসশ্চ মুখ্যলোকগতঃ প্রেক্ষকগতঃ কাব্যস্য শ্রোত্রনুসন্ধায় কদ্বয়গতো বা'।[৫৬] প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা উচিৎ যে, বর্ণনীয় বস্তুর রসাস্বাদে প্রথম সামাজিক হলেন কবি বা নাট্যকার। অভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন–'কবির্হি সামাজিকতুল্য এব' (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়)। রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের নমিসাধুকৃত বৃত্তিতে বলা হয়েছে –'নায়কমুখেন কবিরেব মন্ত্রয়তে নিশ্চিনোতি চেতি কেচিৎ' (কাব্যালঙ্কার ১৬/১৩)। কারণ কবির রসাস্বাদ না হলে নায়ক-নায়িকার সংবাদ-সংলাপে রসসৃষ্টি অসম্ভব। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় বলা হয়েছে – 'স যৎস্বভাবঃ কবিস্তদনুরূপং কাব্যম্' (কাব্যমীমাংসা, দশম অধ্যায়)।

যাই হোক্, এরপর রসাস্বাদনবিষয়ে অনুভাবের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। মনোগত ভাবের বাহ্য বিক্রিয়ার নাম অনুভাব। পরচিত্তগত মানসব্যাপারকে বিভাবিত করার কারণে অনুভাবের এই নামকরণ – 'অনুভাবয়ন্তি পরস্থানপি রসানববোধয়ন্তীত্যনুভাবাঃ'।[৫৭] কটাক্ষ,নয়নচাতুর্য, রোমাঞ্চ, উচ্ছ্বাস, দীর্ঘনিঃশ্বাস, হাস্য, মুখরাগ, স্তম্ভ, বেপথু ইত্যাদি অজস্র অনুভাবের দ্বারা পরস্থ রসসমূহের অনুমান সম্ভবপর হয়।

নাট্যদর্পণমতে পরন্তু এই রস প্রথমতঃ অনুকার্য নায়ক-নায়িকাদি অর্থাৎ রাম-সীতাদিনিষ্ঠ। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'ইহ তাবৎ সর্বলোকসিদ্ধা পরস্থস্য রসস্য প্রতিপত্তিঃ'।[৫৮] অনুকার্য চরিত্রস্থিত এই রস অনুভাবসমূহের দ্বারা প্রেক্ষকসমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। যে নটনটী অনুকার্য রামসীতাদির অভিনয় করেন, তাঁরা অনুরূপ বেশভূষা, সংলাপ ইত্যাদির দ্বারা অতি নিপুণভাবে উদ্দিষ্ট চরিত্রগুলির অনুকরণ করেন। নটনটীদের অভিনয়নৈপুণ্যবলে এবং অনুভাবের প্রয়োগের মাধ্যমে সুবিহিত এই অনুকরণগত সাদৃশ্যের দ্বারা-ই সভাস্থ প্রেক্ষকের চিত্তে রসের উদ্বোধ ঘটে। এই রসাস্বাদন কোনো সাধারণ প্রত্যক্ষ অনুভূতি নয়, মানস ধর্মসমূহের অতীন্দ্রিয়তার কারণে পরোক্ষ এই অনুভূতিকে অলৌকিক প্রত্যক্ষরূপে আখ্যায়িত করা হয় – 'সা চ ন প্রত্যক্ষা চেতোধর্মাণামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ, তস্মাৎ পরোক্ষেব'।[৫৯] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণধৃত এই অভিমতটির সঙ্গে ভট্টলোল্লটের রসনিষ্পত্তিবিষয়ক মতের সবিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

রস কেন নটনিষ্ঠ নয় – নাট্যদর্পণে এবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে। অভিনয়কালে সংশ্লিষ্ট রসের আস্বাদন নটের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। নটের কাজ হল অভিনেয় বিষয়ের অর্থাৎ রামাদি অনুকার্য চরিত্রের আচরণ ও কার্যকলাপের যথাযথ ও বাস্তব উপস্থাপন। এই উপস্থাপনা সম্ভব হয় বাচিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের প্রয়োগকৌশলের দ্বারা ; নটচিত্তে রসোদ্বোধ না ঘটলে-ও এটি সম্ভব। তাই দেখা যায়, নট স্বয়ং দুঃখিত না হলে-ও, বিরহী নায়কের ভূমিকায় তিনি মানসিক যন্ত্রণার অভিনয় করেন। বিপরীতে স্বয়ং সুখী না হলে-ও, শৃঙ্গারবান্ নায়কের ভূমিকায় তিনি হাস্য এবং নানাবিধ রতিপূর্ণ আচরণের অভিনয় করেন। কেবল তাই নয়, সুদক্ষ এই কুশীলবেরা স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, বৈবর্ণ্যাদি অনুভাবগুলিকে-ও সংশ্লিষ্ট রসের উদ্বোধ ব্যতিরেকে-ই দর্শকসমক্ষে বিভাবিত করতে পারেন– এমন-ই আশ্চর্য তাঁদের অভিনয়ক্ষমতা। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে –'পররঞ্জনার্থং প্রবৃত্তস্য নটস্য রসাভাবে2পি স্তম্ভস্বেদাদয়ো ভবন্তীতি'।[৬০] বাচিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত অনুভাবাদির দ্বারা প্রেক্ষকচিত্তের স্থায়িভাবগুলির রসপর্যবসান ঘটে এবং অনুকার্য চরিত্রগুলির সঙ্গে এক অদ্ভুত রসগত একাত্মতায় সহৃদয় সামাজিকের অশ্রুপতনাদি বাহ্য বিকারসমূহ পরিলক্ষিত হয় – 'তেষাং পরগতরসজনকত্বেনাকার্যত্বাৎ, নটগতা হি স্তম্ভাদয়ঃ প্রেক্ষকগতরসানাং কারণম্, প্রেক্ষকগতাস্তু কার্যানি '।[৬১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীত হল যে, নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের মতানুসারে, রস প্রথমতঃ অনুকার্য রামাদিচরিত্রে স্থিত এবং তদনন্তর অনুভাবাদির দ্বারা সেই রস সহৃদয় হৃদয়ে উদ্রিক্ত; অতঃপর রস কোনোভাবে-ই নটনিষ্ঠ নয়। নাট্যদর্পণের এই অভিমতের সঙ্গে অধিকাংশ নাট্যতাত্ত্বিকের সহমত পরিলক্ষিত হয়। দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতে,আস্বাদ্য এই রস রসিকচিত্তে-ই

বর্তমান থাকে। কারণ, রামাদি চরিত্রের অনুকর্তা নটাদির চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে কাব্যনাটকাদির রচনা করা হয় না, তা রচিত হয় সহৃদয় সামাজিকের জন্য–

"রসঃ স এব স্বাদ্যত্বাৎ রসিকস্যৈব বর্তনাৎ।

নানুকার্যস্য বৃত্তত্বাৎ কাব্যস্যাতৎপরত্বতঃ ॥" (দশ.রূ. ৪/৩৮)

এই শ্লোকটি ব্যাখ্যানাবসরে আচার্য ধনিক বিশদে বলেছেন – "স চ স্বাদ্যতাং নির্ভরানন্দসংবিদাত্মতামাপাদ্যমানো রসো রসিকবর্তীতি বর্তমানত্বাৎ নানুকার্যরামাদিবর্তী বৃত্তত্বাৎ তস্য । .... ন কাব্যং রামাদীনাং রসোপজননায় কবিভিঃ প্রবর্ত্যতে। অপি তু সহৃদয়ানানন্দয়িতুম্" ।[৬২] অনুকর্তা নট যদি বাস্তবিক রামাদির ন্যায় শৃঙ্গারবান্ হয়ে ওঠেন, তবে তদ্দর্শনে (লৌকিক জগতের রামাদির ন্যায়) সস্ত্রীক নায়ক রামাদি-ও শৃঙ্গারবানরূপে প্রতীত হবেন এবং তার ফলে প্রেক্ষকের রসাস্বাদন অপাস্ত হবে।

দর্পণকার তাঁর গ্রন্থের রসবিমর্শবিষয়ক তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে-ই স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সহৃদয় সামাজিকের হৃদ্গত রত্যাদি স্থায়িভাব বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ব্যক্ত হয়ে রসত্বপ্রাপ্ত হয়–

"বিভাবানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।

রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্ ॥" (সা.দ. ৩/১)

তিনি আরো বলছেন, রসাস্বাদকালে প্রমাতা অর্থাৎ সামাজিক এবং অনুকার্য অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাদির মধ্যে তাৎকালিক অভিন্নত্ব জন্মায় বলে, উভয়ের মধ্যে এক রসগত ঐক্যের সৃষ্টি হয় এবং সামাজিকগণ সেই রসকে নিজশরীরবৎ অভিন্নরূপে আস্বাদন করেন–

"লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।

স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ ॥" (সা.দ. ৩/২)

দর্পণকারের এই উক্তির ব্যাখ্যানাবসরে পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেছেন –'যথা দেহাত্মানৌ বস্তুতো ভিন্নাবপি অহং গচ্ছামীত্যভিন্নত্বেন প্রতীয়তে, তথা নায়কাদীনাং নায়িকাগতরত্যাদিতঃ স্বস্বরত্যাদিরাশ্রয়াদিভেদেন ভিন্নো2পি তথাবিধবাগ্ভঙ্গ্যাদিব্যাপারসামর্থ্যাদভিন্নত্বেন সামাজিকৈঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ' ।[৬৩]

রসের সহৃদয়গতত্ব বিষয়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁর ভক্তিরসায়নে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, কাব্যে বর্ণিত নায়কাদিগত রত্যাদিভাব অনুকর্তার রসোদয়ের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কারণ , নায়কাদিগত এই লৌকিক ভাবগুলি পরিমিত, লোকপ্রসিদ্ধ (অতএব বৈচিত্র্যহীন) এবং লজ্জাভয়াদি বিঘ্নসঙ্কুল; অতএব এই ভাবগুলি রসের উপযোগী হয় না। কারণ, রসের ধর্ম এই সকল

ধর্ম হতে সর্বথা পৃথক। সম্ভাব্য একটি পূর্বপক্ষের খণ্ডনমানসে বৃত্তিতে আচার্য সরস্বতী তাই বলছেন –"তৎ কথমুচ্যতে রত্যাদীনাং তদ্বোদ্ধৃনিষ্ঠত্বমলৌকিকত্বঞ্চেতি? মৈবং সংস্থাঃ। পরিমিততয়া লোকসিদ্ধতয়া বিঘ্নবত্তয়া চ তেষাং রসপরিপন্থিত্বাৎ" (ভক্তিরসায়ন, তৃতীয় উল্লাস) । প্রসঙ্গতঃ তিনি দর্পণকারের সমর্থন উদ্ধার করেছেন–

"পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।

অনুকার্যস্য রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসো ভবেৎ॥" (সা.দ. ৩/১৮)

সুতরাং কাব্যার্থবেত্তা সহৃদয় সামাজিকের রত্যাদিভাব-ই যে রসাকারে পরিণত হয়, একথা অনস্বীকার্য। সামাজিকগণ কাব্যবিষয়টির ভাবনা করতে-করতে সেইসকল বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে অভিন্নরূপে ভাবিত হয়ে, এক অপূর্বভাবে স্বীয় রত্যাদিভাবসকল থেকে উদ্রিক্ত চিত্তচমৎকারী রসের আস্বাদন করেন– 'সামাজিকা হি ভাবনাবিশেষবশাৎ স্বাত্মানং তদভিন্নতয়া মন্যমানাঃ স্বগতং রত্যাদিকমপি লোকবিলক্ষণতয়ানুভবন্তশ্চমৎকারশরীরং রসং প্রতিযন্তি' (ভক্তিরসায়ন, তৃতীয় উল্লাস)।

আচার্য সরস্বতী আরো বলছেন, অনুকর্তা নট প্রমুখের মধ্যে রত্যাদিভাব রসরূপে প্রকাশ পেতে পারে না। কারণ বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে অনুরূপ ভাবপ্রদর্শন করলে-ও, রত্যাদিভাব যে প্রকৃত-ই তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তদ্বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই–'অভিনেতারো হি শিক্ষাভ্যাসাদিপাটববশাৎ তত্তদ্ভাবং দর্শয়ন্তো2পি বস্তুগত্যা রত্যাদিমন্ত এবত্যেত্র মানাভাবাৎ' (ভক্তিরসায়ন, তৃতীয় উল্লাস)। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে যে, শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা রাঘবাদির স্বরূপ প্রদর্শন করলে-ও, বস্তুতঃপক্ষে নট কখনো রসাস্বাদক হতে পারেন না –

"শিক্ষাভ্যাসাদিমাত্রেণ রাঘবাদেঃ স্বরূপতাম্ ।

দর্শয়ন্ নর্তকো নৈব রসস্যাস্বাদকো ভবেৎ ॥"(সা.দ. ৩/১৯)

রসের সহৃদয়গতত্ব সমর্থনে ভক্তিরসায়নে আরো একটি যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। আচার্য সরস্বতীর মতে, বোধ্যগত অর্থাৎ অনুকার্য নায়ক-নায়িকাদিগত রত্যাদি ভাবসমূহ যথাসম্ভব সুখদুঃখাদির কারণ হয়ে থাকে;অর্থাৎ এই ভাবগুলি কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো বা মোহের সৃষ্টি করে। কিন্তু রস যেহেতু সর্বদা সুখাত্মক এবং একমাত্র বোদ্ধৃগত হলে-ই তত্তৎ ভাবসমূহ সুখপ্রদ রসরূপে পরিণতি অর্জন করে,অতএব সহৃদয় রসবেত্তা সামাজিক-ই রসের প্রকৃত আশ্রয়–

"বোধ্যনিষ্ঠা যথাস্বং তে সুখদুঃখাদিহেতবঃ।

বোদ্ধৃনিষ্ঠাস্তু সর্বে2পি সুখমাত্রৈকহেতবঃ ॥"(ভক্তিরসায়ন, তৃতীয় উল্লাস)

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ-ও রসের নটনিষ্ঠতাকে সমর্থন করেন না। শান্তরসের অভিনয়প্রসঙ্গে 'নটের দ্বারা শান্তরসের আস্বাদন সম্ভব নয়' এই কল্পের খণ্ডনমানসে তিনি বলেছেন, কেবল শান্ত নয়,নট কোনো রস-ই আস্বাদন করেন না। তাঁর কাজ অভিনেয় বিষয়ের যথার্থ অনুকরণমাত্র–'কঞ্চিন্ন রসং স্বদতে নটঃ' (রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অনুকর্তা নট কি কোনো সময়, কোনো পরিস্থিতিতে রসের আস্বাদন করতে পারেন না? নাট্যদর্পণকারদের উদার মানসিকতায় বলা হচ্ছে যে, প্রবিরলবিষয় হলে-ও,ক্ষেত্রবিশেষে নট তাঁর আপন পরিমিত সত্তা ভুলে, রসানুভুতির বাহ্য সীমারেখা বিস্মৃত হয়ে, অনুকার্য রামাদির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠে রসাস্বাদন করতে পারেন। বৃত্তিতে উদাহরণদ্বারে বিষয়টি বিশদীকৃত করা হচ্ছে– লৌকিক জগতে বারাঙ্গনারা অর্থের প্রয়োজনে পুরুষগণের সঙ্গে রতিকার্যে প্রবৃত্ত হয়, একথা সত্য। কিন্তু একথা-ও সত্য যে, সময়বিশেষে তারা সেই সুরতকার্য উপভোগ করে থাকে। অন্যের মনোরঞ্জনার্থে গায়ক যখন সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তখন শ্রোতাদের চিত্তে তো বটে-ই, তার সঙ্গে-সঙ্গে স্বয়ং গায়কের চিত্তে-ও এক পরম আনন্দের উদ্ভব ঘটে। অনুরূপভাবে, অনুকর্তা নট-ও সময়বিশেষে অনুকার্য রামাদি চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণতঃ একাত্ম হয়ে গিয়ে রসাস্বাদন করতে পারেন। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – ''ন চ নটস্য রসো ন ভবতীত্যেকান্তঃ। পণ্যস্ত্রিয়ো হি ধনলোভেন পররত্যর্থং রতাদি বিপঞ্চয়ন্তঃ কদাচিৎ স্বয়মপি পরাং রতিমনুভবন্তি। গায়নাশ্চ পরং রঞ্জয়ন্তঃ কদাচিৎ স্বয়মপি রজ্যন্তে । এবং নটো2পি রামাদিগতং বিপ্রলম্ভাদ্যনুকুর্বাণঃ কদাচিৎ স্বয়মপি তন্ময়ীভাবমুপযাত্যেবেতি''।[৬৪]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দশরূপক এবং সাহিত্যদর্পণে-ও ক্ষেত্রবিশেষে রসের নটনিষ্ঠতার সমর্থন পাওয়া যায়। দশরূপককার আচার্য ধনঞ্জয়ের মতে, কাব্যার্থভাবে ভাবিত হলে অর্থাৎ অভিনেয় বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লে,নটের দ্বারা-ও কাব্যের রসাস্বাদন সম্ভব–'কাব্যার্থভাবনাস্বাদো নর্তকস্য ন বার্যতে'(দশ.রূ. ৪/৪২)। এই উক্তির ব্যাখ্যাবসরে আচার্য ধনিক তাঁর অবলোক টীকায় বলেছেন– ''নর্তকো2পি ন লৌকিকরসেন রসবান্ ভবতি। তদানীং ভোগ্যত্বেন স্বমহিলাদেরগ্রহণাৎ কাব্যার্থভাবনয়া ত্বস্মদাদিবৎ কাব্যরসাস্বাদো2স্যাপি ন বার্যতে।''[৬৫] দর্পণকার-ও প্রায় অনুরূপ ভাষায় এপ্রসঙ্গে সহমত জ্ঞাপন করেছেন।

অনুকর্তা নট রসাস্বাদন করতে পারেন কিনা, এবিষয়ে নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে বৈমত্য রয়েছে। কোনো কোনো আচার্যর মতে, নটকে যেহেতু অনুকার্য চরিত্রের যথাযথ ও বাস্তব অনুকরণ পরিবেশন করতে হয় , সেই কারণে, স্বীয় পরিমিত সত্তা বিস্মৃত হয়ে অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব এবং অতঃপর অনুকার্য চরিত্রের তত্তৎ সুখদুঃখাদি বিবিধ মানস অবস্থার অনুভব নটের পক্ষে

অবশ্যপ্রয়োজন। অতএব এই প্রবক্তাদের মতানুসারে, অনুকার্য বিষয়ের যথাযথ ও বাস্তব অভিনয়ের প্রয়োজনে অভিনেয় বিষয়ের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ এবং তদনন্তর সংশ্লিষ্ট রসের আস্বাদন অনুকর্তা নটের পক্ষে আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী।

তবে অধিকাংশ নাট্যতাত্ত্বিক উল্লিখিত অভিমতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, নটের কাজ অভিনেয় চরিত্রের মানস, বাচিক ও আঙ্গিক ব্যাপারাদির অভিনয়মাত্র। উপযুক্ত শিক্ষা ও অবিরত অভ্যাসের দ্বারা-ই নট এই কার্যে পারদর্শিতা অর্জন করেন, এর জন্য তাঁর চিত্তে সংশ্লিষ্ট রসোদ্বোধের প্রয়োজন হয় না। ইদানীন্তন নাট্যতাত্ত্বিকরা বরং এই অভিমত পোষণ করেন যে, অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে নটের তন্ময়ীভবন বা সংশ্লিষ্ট রসের আস্বাদন, দর্শকমণ্ডলীর সুষ্ঠু রসাস্বাদনের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ,সেক্ষেত্রে অনুকর্তা নট যদি বিরহী নায়কাদির ভূমিকায় অভিনয়কালে নিজ সত্তার বিস্মৃতিপূর্বক অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার মানস অবস্থানুসারে, অনুভাব নয় , অনুভবরূপে রোদন, ক্রন্দন, বিলাপাদি আরম্ভ করেন, তবে তাঁর পক্ষে অভিনয়ের পরবর্তী অংশের সংলাপাদির উপস্থাপন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব অধিকাংশ আলঙ্কারিক ও নাট্যতাত্ত্বিকের অভিমত এই যে, অভিনয়প্রদর্শনকালে অনুকর্তা নট অনুকার্য রামাদি চরিত্রের সঙ্গে একটি দূরগত ঐক্য অনুভব করতে পারেন ; কিন্তু স্বীয় সত্তার বিস্মরণপূর্বক অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে নটের সম্পূর্ণ রূপে একাত্ম হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় । ডঃ. ত্রিবেদী তাই মন্তব্য করেছেন–"In fact, he has not to identify himself completely with the character but he has to make a show of complete identity with the character."[৬৬] নটের সঙ্গে অভিনেয় চরিত্রের একাত্মতায় অভিনয় ও প্রেক্ষকের রসাস্বাদন – দুটি ব্যাপারের-ই সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধার অনুপাত অধিক। তাই অনুকার্য চরিত্রের সঙ্গে তাদাত্ম্য নয়, সেই চরিত্রের যথার্থ অনুকরণে-ই নটের সার্থকতা। তা-ও যদি ক্ষেত্রবিশেষে অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতার ফলে অনুকর্তা নটের চিত্তে রসোদ্বোধ ঘটে, তবে তিনি আর 'নট' থাকেন না;তিনি হয়ে ওঠেন 'প্রেক্ষক' বা 'ভাবক'। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে যে, নট যদি কাব্যার্থচিন্তনের দ্বারা নিজের রামাদিস্বরূপতা প্রদর্শন করেন, তবে তিনি-ও সভ্যপদবাচ্য হয়ে পড়েন–"কাব্যার্থভাবনেনায়মপি সভ্যপদাস্পদম্।যদি পুনর্নটো2পি কাব্যার্থভাবনয়া রামাদিস্বরূপতামাত্মনো দর্শয়েৎ তদা সো2পি সভ্যমধ্য এব গণ্যতে" (সা.দ. তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আরো প্রতীত হল যে, নটের দ্বারা বিভাবিত অনুভাবগুলি দর্শকের পক্ষে বিভাবের ন্যায় কাজ করে। কারণ, নটে বিশেষ-বিশেষ অনুভাবদর্শনে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে তৎসংশ্লিষ্ট রসবিশেষের উদ্বোধ ঘটে। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে –"রোমাঞ্চাদয়শ্চ যে স্ত্রী-

পুংস-নট-কাব্যস্থাস্তে পরেষাং রসজনকত্বাৎ বিভাবমধ্যবর্তিনঃ। প্রেক্ষকশ্রোত্রনুসন্ধাত্রাদিস্থিতাস্তু রসস্য কার্যাণি সন্তো ব্যবস্থাপকাঃ"।[৬৭]

লৌকিক বিভাব ও নাট্যবিভাবের পার্থক্য ঃ

অনন্তর নাট্যদর্পণকাররা লৌকিক বিভাব ও নাট্যবিভাবের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। বস্তুজগতের লৌকিক বিভাবগুলি বাস্তব এবং তাদের কারণে-ই মানবচিত্তে স্থিত স্থায়িভাবগুলির রসপর্যবসান ঘটে। লৌকিক জগতে এই রসোৎপত্তি ঘটে বিশেষ কোনো একটি বিষয়কে আশ্রয় করে। বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে লৌকিক বিভাবাদির দ্বারা মনুষ্যচিত্তে স্থিত রত্যাদি স্থায়িভাবগুলি শৃঙ্গারাদি রসে পরিণত হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে– বস্তুজগতে জনৈক প্রণয়ী যুবকের চিত্তে তার প্রণয়িনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত রত্যাদি স্থায়িভাব থেকে-ই শৃঙ্গাররসের উদ্বোধ ঘটে; অন্য কোনো নারী সন্দর্শনে সেই রসোদ্রেক ঘটে না। অর্থাৎ লৌকিক বিভাবগুলি থেকে উদ্বুদ্ধ রসাস্বাদন বিশেষ ও নিয়ত। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – "তত্র বিভাবাঃ পরমার্থেন সন্তঃ প্রতিনিয়তবিষয়মেব স্থায়িনং রসত্বমাপাদয়ন্তি। তত্র নিয়তবিষয়োল্লেখী রসাস্বাদপ্রত্যয়ঃ"।[৬৮]

বিপরীতে নাট্যবিভাব থেকে উদ্ভুত রসাস্বাদন অনিয়ত ও সর্বসাধারণ। নাটকদর্শনকালে সস্ত্রীক শৃঙ্গারবান্ রামাদি চরিত্রদর্শনে সামাজিকের শৃঙ্গাররসের যে আস্বাদন ঘটে,তা বিশেষ নয়,তা সাধারণ। অর্থাৎ রামসীতার প্রণয়দৃশ্যের অবলোকনে দর্শকচিত্তে যে শৃঙ্গারের অনুভূতি হয়, তার উৎস জনকদুহিতা শ্রীরামদয়িতা সীতা নন, তার উৎস স্ত্রীসামান্য। দশকরূপকের অবলোক টীকায় বলা হয়েছে, সস্ত্রীক রামচন্দ্রকে শৃঙ্গারবান্‌রূপে বোধ করলে সৎব্যক্তিদের মনে লজ্জার অনুভূতি এবং অন্যান্যদের মনে ঈর্ষ্যা, অনুরাগ বা অপহরণের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হবে এবং ফলতঃ প্রকৃত রসাস্বাদন সর্বথা অপাস্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে অভিনয়প্রত্যক্ষকালে এমনটি হয় না। তার কারণ হল, দর্শক যখন শৃঙ্গারাদিমূলক দৃশ্যের অভিনয় প্রত্যক্ষ করেন, তখন তত্তৎ দৃশ্যের নায়ক-নায়িকাদিকে বিশেষরূপে নয়, পুংসামান্য বা স্ত্রীসামান্য রূপে বোধ করেন। অনুরূপভাবে শোকার্তা নারীর বিলাপে দর্শকের চিত্তে যে করুণরসের উদ্রেক হয়, তার প্রকৃতি-ও বিশেষ নয়, সাধারণ। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'যে পুনরপরমার্থসন্তো2পি কাব্যাভিনয়াভ্যাং সন্ত ইবোপনীতা বিভাবাস্তে শ্রোত্রনুসন্ধাতৃপ্রেক্ষকাণাং সামান্যবিষয়মেব স্থায়িনং রসত্বমাপাদয়ন্তি'।[৬৯] নায়ক-নায়িকাদির সঙ্গে তাদের বিভাবাদি-ও আপন-আপন বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগপূর্বক দেশকালানিয়ন্ত্রিত সাধারণীকৃতরূপে সামাজিকের চোখে প্রতিভাত হয়। শুধু তাই নয়, নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতীত এই সমস্ত বিভাবাদির দ্বারা

সামাজিকের চিত্তে বাসনাকারে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান রত্যাদি স্থায়িভাবসমূহ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তবে এই রসোদ্বোধ প্রেক্ষকের আত্মনিষ্ঠ আকারে সাধিত হয় না, রসাস্বাদন হয় সাধারণ আকারে। অভিনবগুপ্তাচার্য-প্রবর্তিত রসের অভিব্যক্তিবাদে একে-ই 'পরিমিতপ্রমাতৃত্ববোধের বিলোপ' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। বিপরীতে লৌকিক বিভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ রস সর্বদা বিশেষ কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অবস্থাকে আশ্রয় করে উদ্রিক্ত হয়; অতএব তা ব্যক্তিনির্বিশেষ ও সাধারণ হতে পারে না, তা বিশেষ ও নিয়ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণধৃত রসের এই সাধারণীকরণতত্ত্বের উপর অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব অতি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

ব্যভিচারিভাবের স্থান ঃ

অনন্তর রসোৎপত্তিব্যাপারে ব্যভিচারিভাবসমূহের স্থান ও কার্যকারিতা বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপনবিভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ রত্যাদি স্থায়িভাবসমূহের শৃঙ্গারাদি রসে পর্যবসানব্যাপারে এই ব্যভিচারিভাববর্গের সবিশেষ উপযোগিতা বিদ্যমান। স্থায়িভাববর্গের আস্বাদ্যমানতাবিষয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করা-ই ব্যভিচারিভাবের কাজ। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে –'রত্যাদের্বিভাবৈরাবির্ভূতস্য পোষকারিণো ব্যভিচারিণো রসিকগতা এব গ্রাহ্যাঃ'।[৭০] বিভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাবগুলি যখন রসে পরিণতির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকে, সেই মুহূর্তে-ই উপযুক্ত ব্যভিচারিভাবসমূহের সন্নিবেশ প্রয়োজন। তাই স্ত্রীচিন্তাদি বিনা শৃঙ্গার, ধৃতি বিহনে হাস্য, বিষাদ ব্যতীত করুণ, অমর্ষ বিনা রৌদ্র, হর্ষ বিহনে বীর, ত্রাস ব্যতিরেকে ভয়ানক, শঙ্কা ব্যতীত বীভৎস, ঔৎসুক্য বিনা অদ্ভুত অথবা নির্বেদ ব্যতিরেকে শান্ত – এদের মঞ্চপরিবেশন অর্থাৎ অভিনয় অসম্ভব। নাট্যদর্পণকারদের মতে, ব্যভিচারিভাবের প্রয়োগের দ্বারা বিরক্তমনা এবং অন্যমনা প্রেক্ষকদের, বনিতাদিবিভাবদর্শনে যাঁদের স্থায়িভাবের বিকাশ ঘটেনি, তাঁদের-ও অভিনয়ব্যাপারের প্রতি আকৃষ্ট করা যেতে পারে– 'অন্যগতচেতসো বিরক্তচেতসো বা বাক্যার্থাববোধে বনিতাদিদর্শনে2পি বা চিন্তাদ্যভাবে রসাভাবাৎ'।[৭১] নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, অতিসূক্ষ্মতা বা অতিদ্রুততার কারণে সময়বিশেষে ব্যভিচারিভাবগুলি পরিলক্ষিত না-ও হতে পারে, তৎসত্ত্বে-ও সংশ্লিষ্ট রসোদ্রেকে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না– 'সৌক্ষ্মাদাশুভাবাচ্চ ক্বচিদনুপলক্ষণে2পি ন দোষঃ'।[৭২] এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, এমন কয়েকটি ব্যভিচারিভাব রয়েছে,উদাহরণস্বরূপ মোহ, দৈন্য, ধৃতি, অসূয়া ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে, অতিসূক্ষ্মতা বা অতিদ্রুততার কারণে যেগুলি অভিনয়কালে প্রেক্ষকবিশেষের অনুভবগোচর না-ও হতে পারে; তা দোষাবহ নয়। কারণ, কতিপয় সামাজিকের দ্বারা অনুভূত না হলে-ও,এইসকল ব্যভিচারিভাবগুলির রসোপকর্ষকরূপে কার্যকারিতা কোনো অংশে

ক্ষুণ্ন হয় না। এর সঙ্গে-সঙ্গে নাট্যদর্পণে আরো একটি অভিমত পোষণ করা হয়েছে। গ্রন্থকারদের মতে, নটের দ্বারা বিভাবিত ব্যভিচারিভাব এবং অনুভাবগুলি দর্শকের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাবরূপে-ই কাজ করে; কারণ প্রথমোক্ত ভাবদ্বয়-ও সহৃদয় সামাজিকের রসোদ্বোধে সবিশেষ সহায়তা করে। বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'যে পুনঃ স্ত্র্যাদিগতাঃ কাব্যাভিনয়োপদর্শিতাশ্চ ব্যভিচারিণো2নুভাবা বা তে পরস্মিন্ রসোন্মুখত্বেন স্থায়িনমুন্মীলয়ন্তি তে বিভাবা এব জনকত্বাৎ'।[৭৩] মহর্ষি ভরতের রসসূত্রে যদি-ও বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের স্থায়িভাবের সঙ্গে সংযোগবশতঃ রসোৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, তবু বাস্তবিক-ই একথা সত্য যে, বিভাব অনুসারে-ই ব্যভিচারিভাব ও অনুভাবগুলির প্রয়োগ হতে থাকে। তাই দেখা যায়, উত্তম-মধ্যম-অধমাদি পাত্রভেদে হাস্যরসের বিভিন্ন প্রকার ব্যভিচারিভাব ও অনুভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য রসবিষয়ে-ও এই এক-ই কথা প্রযোজ্য। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে – 'যদ্যপ্যুচ্যতে বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ ইতি, তত্রাপ্যনুভাবা ব্যভিচারিণশ্চ স্ত্র্যাদিবর্ণনীয়ানুকার্যাপেক্ষয়ৈব দ্রষ্টব্যাঃ'।[৭৪]

বস্তুজগতে লৌকিক বিভাবের দ্বারা রসোদ্বোধব্যাপারে কোন্ কোন্ ব্যভিচারিভাব ও অনুভাবের ব্যবহার হয়েছে, সেই তালিকা ও ক্রম সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন থাকি; কারণ লৌকিক বিভাবজাত রসাস্বাদন বিশেষ ও নিয়ত। কিন্তু নাট্যবিভাবের ক্ষেত্রে সর্বদা তা সম্ভব হয় না।ক্ষেত্রবিশেষে ব্যভিচারিভাব ও অনুভাবগুলির অতিসূক্ষ্মতা ও অতিদ্রুততার কারণে এগুলির প্রয়োগ সর্বদা না-ও পরিলক্ষিত হতে পারে । অপর কারণটি হল ব্যভিচারিভাব ও অনুভাবগুলির সর্বরসনির্বিশেষতা। অর্থাৎ বিশেষ একটি রসের জন্য বিশেষ কতগুলি ব্যভিচারিভাব ও অনুভাবের প্রয়োগ হবে– এমন কোনো বিশেষ নিয়মের অনুপস্থিতি। তা-ও যে উল্লিখিত দ্বিবিধ ভাবের প্রয়োগে সহৃদয় সামাজিক সংশ্লিষ্ট রসের-ই আস্বাদগ্রহণ করেন, ভ্রমবশতঃ-ও অন্য রসের আস্বাদন করেন না, এই কারণে-ই প্রেক্ষকগত রসাস্বাদনকে লোকোত্তর রসচর্বণারূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে – 'প্রেক্ষকাদিগতো রসো লোকোত্তর ইত্যুচ্যতে।'[৭৫]

কাব্য ও রসের সম্পর্ক ঃ

নাট্যদর্পণের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় কাব্য ও রসের সম্পর্ক, ভাষান্তরে রসের কাব্যাশ্রয়ত্ব । প্রথমে-ই উল্লেখ্য এই যে, আমরা কাব্যকে-ই 'সরস' এই বিশেষণে বিশেষিত করে থাকলে-ও, এই অভিধান সমীচীন নয়। কারণ, শব্দার্থময় অচেতন কাব্যশরীর চিত্তবৃত্তিরূপ রসের আশ্রয় হতে পারে না। বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে– ''শ্রিতোৎকর্ষো হি চেতোবৃত্তিরূপঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ। স চাচেতনস্য কাব্যস্যাত্মাধেয়ো বা কথং স্যাৎ''।[৭৬] সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে , তাহলে কাব্যাদির প্রত্যক্ষে রসাস্বাদন

হয় কিভাবে? উত্তরে বলা হচ্ছে, অচেতন কাব্যশরীর সরস না হলে-ও, তার রস উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ উদ্দিষ্ট কাব্যাদিতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসোদ্বোধ ঘটাতে সক্ষম। যদি কাব্য স্বয়ং সরস হত, তাহলে তৎপ্রত্যক্ষকারী সর্বস্তরের ব্যক্তির, তিনি বিদ্বান্ বিপশ্চিত হোন্ অথবা অল্পধী সাধারণ মানুষ-ই হোন্, চিত্তে রসোদ্রেক ঘটত। বাস্তবে কিন্তু তা ঘটে না। কাব্যপ্রত্যক্ষে বিভাবানুভাবাদির মাধ্যমে রসোদ্রেক একমাত্র সহৃদয় কাব্যার্থবেত্তার চিত্তে-ই সম্ভব হয়, অন্যত্র নয়। অর্থাৎ রসোৎপত্তির জন্য প্রথম প্রয়োজন কাব্যার্থের যথার্থ ও যথাযথ অববোধ। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে – 'কাব্যার্থপ্রতিপত্তেরনন্তরং প্রতিপত্তৄণাং রসাবির্ভাবঃ '।[৭৭]

কাব্যস্থ রসের আস্বাদন মিষ্টান্নাদি দ্রব্যের আস্বাদনের মত নয়। রসচর্বণাজাত আনন্দ যাবতীয় লৌকিক আনন্দ অপেক্ষা পৃথক, স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। এই আস্বাদনের ভিত্তিভূমি হল রজঃ ও তমোগুণের বিলোপে সত্ত্বোদ্রিক্ত চিত্ত। এই রস সত্ত্বময় মনে আস্বাদ্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, নির্মল ও নিঃস্বার্থ আনন্দস্বরূপ; লৌকিক ইন্দ্রিয়জ আনন্দের সঙ্গে কাব্যপ্রত্যক্ষাদি জাত আনন্দের কোনো তুলনা-ই করা চলে না – 'প্রতিপত্তারশ্চাত্মস্থং সুখমিব রসমাস্বাদয়ন্তি, ন পুনর্বহিস্থং রসং মোদকমিব প্রতিযন্তি'।[৭৮]

রস প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনে স্থিত সংস্কারবিশেষ। যথাযথ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের অবদানে সামাজিকের হৃদয়ে সূক্ষ্ম বাসনাকারে স্থিত রত্যাদি স্থায়িভাবসমূহ আত্মচেতনা ও আত্মানন্দের অনুপম সংমিশ্রণরূপ রসে পরিণতি লাভ করে। এভাবে-ই উপযুক্ত বিভাবাদির প্রয়োগে রতি, হাস্য, শোকাদি স্থায়িভাব সহৃদয় সামাজিক চিত্তে (যথাক্রমে) শৃঙ্গার, হাস্য, করুণাদি রসে পর্যবসিত হয। রসোদ্বোধব্যাপারে তাই প্রথম প্রয়োজন হল সামাজিকচিত্তে নির্দিষ্ট স্থায়িভাবের উপস্থিতি, কারণ তা না থাকলে রসোৎপত্তিব্যাপারটি নিরালম্ব হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশুর চিত্তে রতি নামক স্থায়িভাবের উপস্থিতি ও বোধ নেই, তাই শিশুর পক্ষে শৃঙ্গাররসের আস্বাদন সম্ভব নয় – 'যদি চ প্রতিপত্তুঃ স্থায্যেব ন রসতয়া ভবতি, তদা বহিঃস্থস্য রসস্য প্রত্যয়ো2পি ন প্রাপ্নোতি' ।[৭৯] স্থায়িভাবের উদ্ভব যখন সামাজিক চিত্তে, তখন বলা বাহুল্য, রসের-ও উদ্ভব সেই এক-ই স্থলে। অতএব সঙ্গতভাবে-ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কাব্যাদির শব্দার্থময় শরীর রসের আবাস মাত্র, উৎপত্তিস্থল নয়। রসের উৎপত্তিস্থল হল সহৃদয় সামাজিকের সত্ত্বগুণমণ্ডিত চিত্ত – 'ততো বিভাবপ্রতিপাদক কাব্যপ্রতিপত্তেরনন্তরং প্রতিপত্তুরেব স্থায়ী রসো ভবতি'।[৮০]

ভাবসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ

নাট্যদর্পণের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হল রসোদ্বোধব্যাপারে স্থায়িভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাববর্গের পারস্পরিক সম্বন্ধ। এ প্রসঙ্গে নাট্যদর্পণধৃত কারিকটি হল –

''কার্যহেতুঃ সহচারী স্থায্যাদেঃ কাব্যবর্ত্মনি।

অনুভাবো বিভাবশ্চ ব্যভিচারী চ কীর্ত্যতে ॥ ''(না.দ. ৩/৮)

– অভিনেয় ও অনভিনেয় ভেদে অর্থাৎ দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দ্বিবিধ কাব্যের প্রত্যক্ষকালে স্থায়িভাবের রসতাপ্রাপ্তিব্যাপারে অনুভাব, বিভাব এবং ব্যভিচারিভাবগুলিকে যথাক্রমে কার্য, হেতু ও সহচারী রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

স্থায়িভাবের রসপরিণতিতে অনুভাবগুলি কার্যস্বরূপ। রসোদ্বোধ যদি কারণ হয়, অনুভাব তার বহিঃপ্রকাশক কার্য। অর্থাৎ রসোদ্বোধের বাহ্য বিক্রিয়ার নাম অনুভাব, যদ্দর্শনে রস বিভাবিত হয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'তত্রানু লিঙ্গনিশ্চয়াৎ পশ্চাদ্ ভাবয়ন্তি গময়ন্তি লিঙ্গিনং রসমিত্যনুভাবাঃ'।[৮১] স্তম্ভ,স্বেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্যাদি ভেদে অনুভাবের সংখ্যা অজস্র।

সহৃদয়চিত্তে রসোদ্রেকের হেতু বা কারণ বা নিমিত্ত হল বিভাব। কাব্যবোদ্ধার চিত্তে সূক্ষ্মভাবে বাসনাকারে বিদ্যমান রত্যাদি স্থায়িভাবসমূহ যে প্ররোচনায় প্রথমবার উদ্বুদ্ধ হয়, তাকে বলা হয় বিভাব। এই বিভাব দ্বিবিধ – আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপনবিভাব। নায়কাদি যে চরিত্রগুলিকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে সহৃদয়চিত্তে রসোদ্রেক ঘটে, তার নাম আলম্বনবিভাব । এই আলম্বনবিভাব অর্থাৎ নায়কাদির চেষ্টা, দেশ, কাল ইত্যাদি যা কিছু রসকে উদ্দীপিত করে, তার নাম উদ্দীপন বিভাব।

স্থায়িভাবসমূহের আস্বাদব্যঞ্জনায় বিশেষভাবে সহায়তা করে ব্যভিচারিভাববর্গ। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'রসোন্মুখং স্থায়িনং প্রতি বিশিষ্টেনাভিমুখ্যেন চরন্তি বর্তন্ত ইতি ব্যভিচারিণঃ'।[৮২] আচার্য শারদাতনয় তাঁর ভাবপ্রকাশনগ্রন্থে স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাবের সম্বন্ধ বিষয়ে সোদাহরণ বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, কল্লোলগুলি যে প্রকারে সমুদ্রে একবার উত্থিত হয়, আবার বিলীন হয় এবং এইরূপে বিস্তার লাভ করে সমুদ্রের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, ব্যভিচারিভাবগুলি-ও সেই এক-ই ভাবে স্থায়িভাবে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হয়ে স্থায়িভাবকে পোষণ করে এবং রসরূপতা প্রাপ্ত হয় –

''উন্মজ্জন্তো নিমজ্জন্তঃ কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে।

তস্যোৎকর্ষং বিতন্বন্তি যান্তি তদ্রূপতামপি ॥

স্থায়িন্যুন্মগ্ননিমগ্নাস্তথৈব ব্যভিচারিণঃ ।

পুষ্ণন্তি স্থায়িনং স্বাংশ্চ যান্তি রসাত্মতাম্ ॥'' (ভাব.প্র. ১/১৬৪)

অতএব দেখা গেল, স্থায়িভাবসমূহ বাসনালোক থেকে প্রবুদ্ধ হয়ে চিত্তে অবস্থান করে এবং বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবসমূহের সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ রসত্বপ্রাপ্ত হয় – এই হল রস ও ভাবের সম্বন্ধ বিষয়ে নাট্যদর্পণের অভিমত। এপ্রসঙ্গে আচার্য ভোজদেবের মন্তব্যটি স্মরণীয় –

"চিরং চিত্তে2বতিষ্ঠন্তে সংবধ্যন্তে2নুবন্ধিভিঃ ।

রসত্বং প্রতিপদ্যন্তে প্রবুদ্ধাঃ স্থায়িনো2ত্র তে ॥"(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫/১৯)

আচার্য সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে জনৈক আচার্যের মত উল্লেখ করেছেন, যদনুসারে রসের উপাদান কারণ বিভাব, রসের অভিব্যঞ্জক অনুভাব, রসের উপকারক হল ব্যভিচারিভাব এবং সাত্ত্বিকভাব– "অন্যস্ত্বাহ – রসোপাদানহেতুর্বিভাবঃ। রসাভিব্যঞ্জকো2নুভাবঃ। রসোপকারিণশ্চরাঃ সাত্ত্বিকাশ্চ ভাবা ভবেয়ুরিতি" (না.ল.র. সপ্তদশ অধ্যায়)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু রস ও ভাবসমূহের সম্বন্ধটি খুব স্পষ্টভাবে বিবৃত নয়। ভাব থেকে রসের উৎপত্তি না কি রস থেকে ভাবের – এবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের অভিমত যথেষ্ট স্ববিরোধী ; অতএব বিভ্রান্তিকর। এই গ্রন্থের রসসূত্রে স্পষ্টতঃ উক্ত হয়েছে যে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিবর্গের (সঙ্গে স্থায়িভাবের) সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। কেমন করে সহৃদয় সামাজিকচিত্তে রত্যাদি স্থায়িভাব বিভাবিত বা রসাস্বাদনযোগ্য হয়, উদাহরণযোগে সে বিষয়ে আলোচনাবসরে বলা হয়েছে – নীরোগ ও সুস্থচিত্ত জনৈক ব্যক্তি যেমন নানাব্যঞ্জনমণ্ডিত অন্নভোজনকালে ষড়্‌বিধ রসের আস্বাদন করে আনন্দিত হন, অনুরূপে সহৃদয় প্রেক্ষকমণ্ডলী বাচিকাদি নানা ভাবের অভিনয়ে উদ্বোধিত এবং অভিব্যক্ত স্থায়িভাবসমূহ আস্বাদন করেন – "যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি। তস্মান্নাট্যরসা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। কেবল তাই নয়, এই মতের সমর্থনে নাট্যশাস্ত্রকার একটি সম্ভাব্য পূর্বপক্ষ উত্থাপন করে তার খণ্ডন করেছেন। যদি কোনো আচার্য এই অভিমত পোষণ করেন যে, রস ও ভাবসমূহ পারস্পরিক সম্বন্ধ থেকে উদ্ভূত হয়, তবে তা যুক্তিসহ নয়। কারণ, ভাবসমূহ থেকে রসসমূহের উদ্ভব দেখা যায়, এর বিপরীতক্রমে রসসমূহ থেকে ভাবসমূহের উদ্ভব দেখা যায় না – "কিং রসেভ্যো ভাবানামভিনির্বৃত্তিরুতাহো ভাবেভ্যো রসানামিতি। কেষাঞ্চিন্মতং পরস্পরসম্বন্ধাদেষামভিনির্বৃত্তিরিতি। তন্ন। কস্মাৎ? দৃশ্যতে হি ভাবেভ্যো রসানামভিনির্বৃত্তির্ন তু রসেভ্যো ভাবানামভিনির্বৃত্তিরিতি" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)।

আবার এই এক-ই অধ্যায়ে মহর্ষি ভরত রস ও ভাবসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করছেন–

“ন ভাবহীনো2স্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ।

পরস্পরকৃতা সিদ্ধিস্তয়োরভিনয়ে ভবেৎ ॥” (না.শা. ৬/৩৬)

– অর্থাৎ ভাবশূন্য রস এবং রসশূন্য ভাব হয় না। এই দুয়ের অভিনয়ে পারস্পরিক সিদ্ধি সম্পাদিত হয়। এই বিষয়টি-ও তিনি একটি উদাহরণদ্বারে স্পষ্ট করেছেন। তাঁর মতে, ব্যঞ্জন ও ওষধির সংমিশ্রণ যেমন অন্নকে সুস্বাদু করে, তেমন-ই ভাব এবং রসসমূহ পরস্পরকে বিভাবিত অর্থাৎ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে –

“ব্যঞ্জনৌষধিসংযোগো যথান্নং স্বাদুতাং নয়েৎ।

এবং ভাবা রসাশ্চৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্ ॥” (না.শা. ৬/৩৭)

আবার উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে নাট্যশাস্ত্রকার রস থেকে ভাবসমূহের উৎপত্তি স্বীকার করছেন –

“যথা বীজাদ্ ভবেদ্বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা ।

তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥” (না.শা. ৬/৩৮)

–অর্থাৎ যেমনভাবে বীজ থেকে বৃক্ষ এবং তদনন্তর বৃক্ষ থেকে পুষ্পফলাদির উদ্ভব হয়, তেমনভাবে মূলস্বরূপ রস থেকে ভাবসমূহের উৎপত্তি । এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্য বলছেন – “বীজং যথা বৃক্ষমূলত্বেন স্থিতং তথা রসাঃ। ... ততো বৃক্ষস্থানীয়ং কাব্যম্ । তত্র পুষ্পাদিস্থানীয়ো2ভিনয়াদিনটব্যাপারঃ।তত্র ফলস্থানীয়ঃ সামাজিকরসাস্বাদঃ ”(না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। শুধু তাই নয়, যে আচার্যরা এই শ্লোকটির ‘বীজস্বরূপ ভাবসমূহ থেকে রসস্বরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি’– এরূপ অর্থ করেছেন, গুপ্তপাদ স্পষ্টভাষায় তাঁদের সেই অভিমতকে ভ্রান্ত বলে মত পোষণ করেছেন – “অন্যে তু বীজাদিব ভাবাদ্রসবৃক্ষস্ততো2প্যভিনয়কুসুমসুন্দরাৎ ফলমিব ভাবঃ প্রতীত্যা ভুজ্যত ইতি ব্যাচক্ষতে । তৈঃ প্রকৃতবিরুদ্ধং সর্বং ব্যাখ্যাতম্” (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)।

অতএব দেখা গেল, রস ও ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রকার ত্রিবিধ মত পোষণ করেছেন। প্রথমতঃ, ভাব থেকে রসসমূহের উৎপত্তি; দ্বিতীয়তঃ, রস ও ভাবের উৎপত্তি পারস্পরিক এবং তৃতীয়তঃ, রস থেকে ভাবসমূহের উৎপত্তি। এই তিনটি মতের মধ্যে কোন্‌টি যে তাঁর প্রকৃত অভিপ্রেত, তা নির্ণয় করা দুষ্কর।

অধিকাংশ সংস্কৃত আলঙ্কারিক অবশ্য রস ও ভাবসমূহের কার্যকারণ সম্বন্ধটি স্বীকার করেছেন। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন যে, লৌকিক নিয়ম অনুসারে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবগুলি কারণ, কার্য ও সহকারীরূপে পরিগণিত হলে-ও, রসোদ্বোধব্যাপারে প্রতিটি ভাব-ই কারণরূপে অঙ্গীকৃত হয়ে থাকে –

"কারণং কার্যসঞ্চারিরূপাঃ অপি হি লোকতঃ।
রসোদ্বোধে বিভাবাদ্যাঃ কারণান্যেব তে মতাঃ ॥"(সা.দ. ৩/১৫)

ভাবপ্রকাশনকার আচার্য শারদাতনয়-ও এপ্রসঙ্গে অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, বিভাবগুলি অনুভাব, অনুভাবগুলি-ই বিভাব। আবার বিভাব ও অনুভাব – উভয়-ই ব্যভিচারিভাব। বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, স্বরূপগতভাবে এই ভাবগুলির কোনো পার্থক্য নেই; রসোদ্বোধব্যাপারে উপকারকত্ব-ই হল এই প্রতিটি ভাবের আন্তরিক বৈশিষ্ট্য –

"বিভাবো2প্যনুভাবঃ স্যাদনুভাবো বিভাববৎ।
তৌ পুনশ্চারিণঃ স্যাতাং তে চ তৌ স্যুঃ পরস্পরম্ ॥
রসভেদবশাদেবমুপকার্যোপকারিতা।" (ভাব.প্র. ১/১৬৭)।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য সাগরনন্দী সৎকার্যবাদী দর্শন অর্থাৎ সাংখ্যদর্শন অনুসারে রস ও ভাবসমূহের কার্যকারণসম্বন্ধসংক্রান্ত একটি অভিমতের উল্লেখ করেছেন। সৎকার্যবাদের বক্তব্য হল, কার্যমাত্র-ই কারণস্বভাব, তদ্ভিন্ন কিছু নয়; অনুকূল অবস্থায় তা অভিব্যক্ত হয়। এই মতানুসারে ভাব কার্য, রস কারণ। সমকালীন উপস্থিতির দ্বারা এরা পরস্পরের আনুকূল্য সাধনপূর্বক পারস্পরিক সিদ্ধি সম্পাদন করে – "অন্যে তু কার্যকারণত্বমনয়োঃ সৎকার্যবাদাদিদর্শনেনাঙ্গীকুর্বন্তি। যত্র ভাবাঃ কার্যং রসাঃ কারণং দ্বয়মপ্যেতৎ তুল্যকালাবস্থিত্যা অন্যোন্যোপকারাৎ পরস্পরকৃতাং সিদ্ধিং সাধয়তি" (না.ল.র. ষোড়শ অধ্যায়) ।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিভাবাদির প্রতিটিকে কারণরূপে স্বীকার করলে রসচর্বণায় ভিন্ন-ভিন্ন কারণের ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীতি না হয়ে অখণ্ড প্রতীতি হয় কিভাবে? এই সন্দেহের যথার্থ উত্তর দিয়ে দর্পণকার বলেছেন, রসাস্বাদের পূর্বে প্রতিটি কারণ পৃথকরূপে প্রতীয়মান হলে-ও, রসাস্বাদ আরম্ভ হলে 'প্রপাণক রস'-এর ন্যায় একটিমাত্র, অখণ্ড ও অপূর্ব আস্বাদ ঘটে থাকে। ইক্ষুশর্করা , মরিচ, কর্পূর ইত্যাদি বিবিধদ্রব্যের সম্মেলনে প্রস্তুত হয় প্রপাণকরস। কিন্তু প্রস্তুত হওয়ার পর উপাদানগুলির পৃথক স্বাদ থাকে না; অখণ্ড ও অনন্য একটি স্বাদ অনুভূত হয়। অনুরূপে, এক-ই নিয়ম অনুসরণপূর্বক কাব্যে বিভাবাদি বিভিন্ন কারণের সন্নিবেশ ঘটলে-ও, প্রতিটির পৃথক প্রতীতি না হয়ে একটি অখণ্ড ও অপূর্ব রসাস্বাদ অনুভূত হয়। দর্পণকারের ভাষায়–

"প্রতীয়মানঃ প্রথমং প্রত্যেকং হেতুরুচ্যতে।
ততঃ সম্বলিতঃ সর্বো বিভাবাদিঃ সচেতসাম্ ।
প্রপাণকরসন্যায়াচ্চর্ব্যমাণো রসো ভবেৎ॥"

যথা খণ্ডমরিচাদীনাং সম্মেলনাদপূর্ব ইব কশ্চিদাস্বাদঃ প্রপাণকরসে সঞ্জায়তে, বিভাবাদিসম্মেলনাদিহাপি তথেত্যর্থঃ" (সা.দ. তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

ভাবসমূহের মধ্যে প্রধান হল স্থায়িভাববর্গ, অন্যগুলি অপ্রধান। কারণ, বিভাবাদির সহায়তায় স্থায়িভাব-ই রসে পরিণত হয়। অতএব স্থায়িভাবব্যতিরেকে রসোদ্বোধ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। নাট্যদর্পণকারদের ভাষায় – "এতে চানুভাবাদয়ঃ স্থায়িনং প্রতি কার্যকারণসহচারিরূপত্বাদেবাপ্রধানম্ । স্থায়ী তু প্রকর্ষপ্রাপ্ত্যেষাং প্রচ্ছাদকত্বাৎ প্রধানম্"।[৮৩]

নাট্যশাস্ত্রে স্থায়িভাবের প্রাধান্য বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার স্পষ্ট বলেছেন, বিভাব ও অনুভাবযুক্ত, প্রধানবস্তুসমাশ্রিত, সঞ্চারিভাবসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত স্থায়িভাব-ই রস–

"বিভাবানুভাবযুতো হ্যঙ্গবস্তুসমাশ্রয়ঃ।
সঞ্চারিভিস্তু সংযুক্তঃ স্থায্যেব তু রসো ভবেৎ ॥" (না.শা. সপ্তম অধ্যায়)

নাট্যশাস্ত্রে উদাহরণযোগে অতি প্রাঞ্জলভাবে ভাবসমূহের মধ্যে স্থায়িভাবের প্রাধান্যের বিষয়টি জ্ঞাপিত হয়েছে। যেমনভাবে সমানলক্ষণ হস্তপদাদিযুক্ত শরীরসম্পন্ন এবং সমান প্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে কুল, শীল, বিদ্যা, কর্ম, শিল্প ও বিচক্ষণতার তারতম্য অনুসারে কেউ রাজত্বপ্রাপ্ত হন এবং অল্পধী ব্যক্তিগণ তাঁদের অনুচর হয়, অনুরূপভাবে স্থায়িভাবসমূহের গুণবত্তার কারণে অন্যান্য ভাবগুলি গৌণতা প্রাপ্ত হয় এবং স্থায়িভাবগুলিকে আশ্রয় করে। আশ্রয়হেতু স্থায়িভাবগুলি প্রভুসদৃশ, বিভাবাদি অন্যান্য ভাবগুলি স্থায়িভাবসমূহের পরিজনসদৃশ। যেমনভাবে রাজা বহু লোকের দ্বারা পরিবৃত হলে-ও , একমাত্র তিনি-ই 'রাজা' রূপে অভিহিত হন, অতি-মহান্ হলে-ও অন্য ব্যক্তি তদ্রূপে পরিগণিত হন না, তেমনভাবে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পোষিত হলে-ও রসত্বপ্রাপ্তির কারণে স্থায়িভাব-ই প্রধান, অন্য ভাবগুলি গৌণ। নাট্যশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক অংশটি সুখবোধ্যতার প্রয়োজনে উদ্ধার করা হল – "যথা হি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদোদরশরীরাঃ সমানাঙ্গপ্রত্যঙ্গা অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্পবিচক্ষণত্বাদ্রাজত্বমাপ্নুবন্তি তত্রৈব চান্যে2ল্পবুদ্ধয়স্তেষামেবানুচরা ভবন্তি তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবানুপাশ্রিতা ভবন্তি। বহ্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বামিভূতাঃ স্থায়িনো ভাবাঃ। তদ্বৎ স্থানীয়পুরুষগুণভূতা অন্যে ভাবাস্তান্ গুণতয়া শ্রয়ন্তে। স্থায়িভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি। পরিজনভূতা ব্যভিচারিণো ভাবাঃ। অত্রাহ কো দৃষ্টান্ত ইতি। যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারো2পি স এব নাম লভতে নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রসনাম লভতে" (না.শা. সপ্তম অধ্যায়)। শুধু এই নয়, নাট্যশাস্ত্রকার একটি আনুবংশ্য শ্লোকের উদ্ধারপূর্বক বলছেন,

মনুষ্যগণের সঙ্গে রাজার এবং শিষ্যগণের সঙ্গে গুরুর যে প্রাধান্যসম্বন্ধ, বিভাবাদি অন্যান্য ভাবের সঙ্গে স্থায়িভাবের সম্পর্ক-ও তদনুরূপ– ''যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ যথা গুরুঃ।
এবং হি সর্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ ॥'' (না.শা. ৭/৮)

দশরূপককার আচার্য ধনঞ্জয়ের মতে, কোনো ক্রিয়াপদ বুদ্ধিগত বা ব্যক্ত, যাই হোক্ না কেন, কারকের সঙ্গে যুক্ত না হলে যেমন বাক্যার্থাববোধ সম্ভব হয় না, তেমনি বিভাবাদি অন্যান্য ভাবসমূহের সঙ্গে মিলনে স্থায়িভাব সামাজিকের বুদ্ধিগম্য এবং একই-সঙ্গে নাট্যের সারবস্তুস্বরূপ হয়ে ওঠে –

''বাচ্যা প্রকরণাদিভ্যো বুদ্ধিস্থা বা যথা ক্রিয়া।
বাক্যার্থঃ কারকৈর্যুক্তা স্থায়ী ভাবস্তথেতরৈঃ ॥'' (দশ.রূ. ৪/৩৭)

ব্যভিচারিভাবসমূহের সহায়তায় স্থায়িভাব পরিপুষ্টি লাভ করে রসে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তথা প্রয়োজনবোধে বিশেষ একটি স্থায়িভাব-ও অন্য স্থায়িভাবের ব্যভিচারিভাবরূপে প্রযুক্ত হতে পারে বলে দর্পণকারের অভিমত– 'রত্যাদয়ো2প্যনিয়তে রসে স্যুর্ব্যভিচারিণঃ' (সা.দ.৩/১৭৬) । কোন্ রসে কোন্ স্থায়িভাবের ব্যভিচারিত্বপ্রাপ্তি হতে পারে, এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – শৃঙ্গার ও বীররসের ক্ষেত্রে হাস, বীররসে ক্রোধ এবং শান্তরসে জুগুপ্সার ব্যভিচারিতা বলা হয়ে থাকে। তবে কাব্যার্থবেত্তা, পরিপক্কবুদ্ধি সামাজিকগণ এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে-ও স্থায়িভাববিশেষের ব্যভিচারিভাবরূপে প্রয়োগের সম্যক্ অনুধাবন করতে পারেন–

''শৃঙ্গারবীরয়োর্হাসো বীরে ক্রোধস্তথা মতঃ।
শান্তে জুগুপ্সা কথিতা ব্যভিচারিতয়া পুনঃ।
ইত্যাদ্যন্যৎ সমুন্নেয়ং তথা ভাবিতবুদ্ধিভিঃ ॥''(সা.দ. ৩/১৭৭)

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে কাব্য বা নাটকের মধ্যে যে ভাবটি প্রধান, যার প্রয়োগ ও উপলব্ধির ক্ষেত্র সর্বাধিক ব্যাপক, যা সর্বাপেক্ষা আস্বাদনযোগ্য, সমাসতঃ সমগ্র রচনার যেটি প্রাণভূত প্রধান সুর তা-ই স্থায়িভাব ; অবশিষ্ট সব ভাবগুলি-ই সহায়ক, 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী'। এপ্রসঙ্গে ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায় আচার্য অভিনবগুপ্তের অভিমতটি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে – ''বহূণাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ীভাবঃ। স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ, শেষাস্তু সঞ্চারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ন তু রসানাং স্থায়িসঞ্চারিভাবেন অঙ্গাঙ্গিতা উক্তা'' (ধ্বন্যালোকলোচন টীকা, তৃতীয় উদ্দ্যোত)।

নাট্যদর্পণে স্থায্যাদি ভাবগুলিকে আবার জড় এবং অজড় – এই দ্বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। চৈতন্যরূপ সংবিৎময়তার কারণে স্থায়িভাবগুলির প্রতিটি-ই অজড়াত্মক। ধৈর্যাদি অনুভাব, বনিতাদি বিভাব এবং নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবগুলি-ও সংবিৎময়তার কারণে অজড়াত্মক। বিপরীতে স্বেদাদি অনুভাব, পর্বতাদি বিভাব এবং ব্যাধ্যাদি ব্যভিচারিভাবগুলি কেবলমাত্র শরীরধর্মত্বের কারণে জড়াত্মক। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – "তত্র স্থায়িনো রত্যাদয়ঃ সংবিদাত্মকত্বাদজড়া এব। ধৈর্যাদীনাং স্বেদাদীনাং চানুভাবানাং বনিতাদীনাং পর্বতাদীনাং চ বিভাবানাং নির্বেদাদীনাং ব্যাধ্যাদীনাং চ ব্যভিচারিণাং যথাসংখ্যং সংবিন্ময়ত্বশরীরধর্মত্বাদিনা জড়াজড়াত্মকত্বম্" ।[৮৪]

রসের সংখ্যা এবং তাদের আন্তর সম্পর্ক ঃ

নাট্যদর্পণ অনুসারে প্রধান রসের সংখ্যা নয়টি – শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত –

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণাঃ রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীরাদ্ভুতশান্তাশ্চ রসাঃ সদ্ভির্নব স্মৃতাঃ ॥ " (না.দ.৩/৯)

নাট্যদর্পণকাররা এই নববিধ রসের মধ্যে একটি আন্তর সম্পর্কসূত্রের অন্বেষণ করেছেন। তালিকায় সর্বপ্রথম শৃঙ্গাররসের নাম। কারণ এই রস পৃথিবীর সকল স্তরের মানুষের চিত্তে উপলব্ধ, সকলের কাছে পরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয়। শৃঙ্গারের অনুগামী হল হাস্য। হাস্যের বিরোধীরস হল করুণ। শৃঙ্গার তথা কামের চরিতার্থতার জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন, তা অর্জিত হয় মূলতঃ রৌদ্ররসের মাধ্যমে । কাম ও অর্থ দুই-ই আসা উচিৎ ধর্মসম্মত পথে। সেই থেকে উদ্ভব ধর্মপ্রধান বীররসের। ভীত ব্যক্তিকে অভয়দানের হেতুতে বীর থেকে-ই উৎপত্তি ভয়ানকরসের। বীরপুঙ্গবদের চিত্তে ভীতব্যক্তিদের প্রতি উদ্রিক্ত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব থেকে বীভৎসরসের উৎপত্তি।... রসগুলির সম্বন্ধবিষয়ক নাট্যদর্পণধৃত আলোচনার এই অবধি অংশ অবিকল অভিনবভারতীর অনুসরণে বিহিত। প্রাসঙ্গিকবোধে উক্ত গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশটির উদ্ধার করা হল – "তত্র কামস্য সকলজাতিসুলভতয়া2ত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ । তদনুগামী চ হাস্যঃ নিরপেক্ষভাবত্বাৎ । তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্ত রৌদ্রঃ । স চামর্ষপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্মমূলত্বাদ্বীরঃ। স হি ধর্মপ্রধানঃ। তস্য চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাৎ তদনন্তরং ভয়ানকঃ।.... ততো বীভৎস ইতি যদ্বিপরীতেণাক্ষিপ্তম্" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)।

এরপর অদ্ভুত রসের উদ্ভব সম্পর্কে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, জুগুপ্সার অপসারণে এবং বিস্ময়ের উদ্রেকে এই বীভৎস রস-ই অদ্ভুত রসের উৎপত্তির হেতু। নাট্যদর্পণধৃত এই মতটি সর্বথা

অযৌক্তিক এবং অবাস্তবরূপে প্রতিভাত হয়। বীভৎস থেকে অদ্ভুত রসের উৎপত্তির এই 'অদ্ভুত' ব্যাখ্যাটি বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। অভিনবভারতীমতে, বীর রস থেকে অদ্ভুত রসের উৎপত্তি – 'বীরস্য পর্যন্তে2দ্ভুতঃ ফলম্..... ' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। স্বয়ং নাট্যদর্পণকাররা-ই আবার ব্যভিচারিভাবসমূহের আলোচনার অন্তে রসসমূহের কার্যকারণতাসম্বন্ধ আলোচনাবসরে বীর থেকে অদ্ভুত রসের উৎপত্তি স্বীকার করছেন। তদনুসারে, মহান্ ব্যক্তিত্বদের উৎসাহব্যঞ্জক ও বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীদর্শনে সকল মানুষের চিত্তে বিস্ময়োদ্রেক ঘটে, সৃষ্টি হয় অদ্ভুত রসের – ''যথা বীরাদদ্ভুতঃ। মহাপুরুষোৎসাহো হি জগদ্বিস্ময়ং ফলং সাক্ষাদনুসন্ধত্তে'' ।[৮৫]

সর্বরসের অন্তিমে শান্তরসপ্রসঙ্গ । নাট্যদর্পণমতে, ধর্মাচরণের দ্বারা সংযত, সমাহিত ও প্রশান্তচিত্তে শমাত্মক শান্তরসের উৎপত্তি – 'ধর্মস্য চ শমমূলত্বাদন্তে শম ইতি' ।[৮৬]

নাট্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, উক্ত সম্পর্ক ছাড়া-ও, যে কোনো প্রকার রস থেকে-ই সজাতীয় রসের উৎপত্তি হতে পারে। সেই কারণে-ই শৃঙ্গারের অভিনয় দেখে সহৃদয়ের চিত্তে শৃঙ্গারের উদ্ভব হয়, হাস্যরত নটকে দেখে হাস্যের উদ্রেক ঘটে।

এবার রসসমূহের সম্বন্ধবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের অভিমতটি উল্লেখ করা যাক্ । মহর্ষি ভরত তৎসম্মত অষ্টবিধ রসকে উৎপাদ্য ও উৎপাদক ভেদে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র ও বীভৎস হল উৎপাদকবর্গ এবং এগুলি থেকে (যথাক্রমে) জাত হাস্য, করুণ, অদ্ভুত এবং ভয়ানক রসচতুষ্ক হল উৎপাদ্যবর্গ–

''শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ হাস্যো রৌদ্রাচ্চ করুণো রসঃ ।
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তির্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ ॥''(না.শা. ৬/৩৯)

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বলা হচ্ছে, শৃঙ্গারের অনুকৃতি হল হাস্য – 'শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্যস্তু প্রকীর্তিতঃ'(না.শা. ৬/৪০)। শৃঙ্গার যখন নিম্নমানের ও অনুচিত, তখন তা হাস্যের উদ্রেক করে। অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যায় বলছেন – 'তদাভাসত্বেন তদনুকাররূপতয়া হেতুত্বং শৃঙ্গারেণ সূচিতম্' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। অনুরূপে, উদ্ধত-উগ্র রৌদ্ররসাত্মক আচরণের দ্বারা সন্তপ্ত ব্যক্তির চিত্তে করুণরসের উদ্রেক ঘটে – 'রৌদ্রস্যৈব চ যৎকর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ' (না.শা. ৬/৪০)। অভিনবভারতীতে প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে – ''রৌদ্রস্য হি ফলং বধবন্ধনাদি। তদ্বিভাবকেনাবশ্যং করুণেন ভাব্যম্'' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। অসাধারণ প্রতাপশালী ব্যক্তিদের অসামান্য বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীদর্শনে সাধারণজনের চিত্তে উদ্রিক্ত হয় অদ্ভুত রস – 'বীরস্যাপি চ যৎকর্ম সো2দ্ভুতঃ পরিকীর্তিতঃ' (না.শা. ৬/৪১)। অভিনবভারতীতে বিশদে বলা হচ্ছে – 'বীরস্য সম্যঙনিকটং যৎফলং সো2দ্ভুতঃ পরিতঃ সমন্তাদাদ্যা কীর্তিঃ যশঃপ্রতাপরূপা ততো হেতোঃ' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)।

অনুরূপে, বীভৎসরসাত্মক বস্তুর দর্শনশ্রবণাদির দ্বারা চিত্তে ভয়ানক রসের উদ্রেক হয় – 'বীভৎসদর্শনং যচ্চ জ্ঞেয়ঃ স তু ভয়ানকঃ' (না.শা. ৬/৪০)। অভিনবগুপ্তাচার্যের মতে – ''যদেব বীভৎসস্য দর্শনং বিভাবাদিরূপং স এব ভয়ানকঃ । তদ্বিভাবত্বাদুপচারস্য'' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)।

উৎপাদ্য-উৎপাদকভেদে রসসমূহের নাট্যশাস্ত্রোক্ত এই মুখ্যামুখ্য বিচারটি বিশেষ বিচারের অপেক্ষা রাখে। প্রথমে-ই প্রশ্ন ওঠে শৃঙ্গারানুকারাত্মক হাস্যবিষয়ে। হাস্য কি এক ও একমাত্র শৃঙ্গারের অনৌচিত্য থেকে-ই উৎপন্ন হয়, অন্য কোনো কারণে নয়? বাস্তবজগতে কিন্তু আমরা সর্বপ্রকার বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবসমূহের এবং করুণাদি যাবতীয় রসের অনৌচিত্যে হাস্যরসের অনুভব করে থাকি। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলছেন – ''তেন করুণাদ্যাভাসেষ্বপি হাস্যত্বং সর্বেষু মন্তব্যম্। অনৌচিত্যপ্রবৃত্তিকৃতমেব হি হাস্যবিভাবত্বম্। তচ্চানৌচিত্যং সর্বরসানাং বিভাবানুভাবাদৌ সম্ভাব্যতে'' (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়)। অন্যান্য রস তো বটে-ই, এমনকি হাস্যরসের অনৌচিত্যে-ও হাস্যরসের উদ্রেক হয় বলে নাট্যদর্পণকারদের অভিমত – 'হাস্যাভাসাদপি হাস্যো ভবতি'।[৮৭] এপ্রসঙ্গে আচার্য বামনগুপ্তবিরচিত ''লোকোত্তরাণি চরিতানি ন লোক এষঃ......''– এই শ্লোকটি উপন্যস্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে হাস্যরসাভাসের দ্বারা হাস্যোদ্রেকের উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে বীর ও অদ্ভুত রসের আন্তরসম্বন্ধ বিষয়ে-ও । অদ্ভুত কি একমাত্র বীররসের দ্বারা-ই উদ্রিক্ত হতে পারে, অন্য কোনো রসের দ্বারা নয়? সহৃদয় সামাজিক তো যে কোনো রসের-ই অসাধারণ পরিবেশনে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে অদ্ভুত রসের অনুভব করতে পারেন। বীর ও অদ্ভুত রসের সম্বন্ধ বিষয়ে একটি বিপরীতমুখী প্রশ্ন-ও উত্থাপিত হতে পারে যে, বীররসের একমাত্র ফল কি অদ্ভুত ? বীরের সঙ্গে অন্য কোনো রসের অন্তঃসম্পর্ক নেই? স্বয়ং অভিনবগুপ্তাচার্য কিন্তু এ বিষয়ে অন্যমত পোষণ করছেন। নাট্যশাস্ত্রোক্ত 'বীরস্যাপি' (না.শা. ৩/৪১) পদের ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন, 'অপি'পদের দ্বারা শৃঙ্গাররস-ও বীররসের ফলরূপে পরিগণিত হবে এবং এর উদাহরণরূপে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের উল্লেখ করা হচ্ছে, যেখানে অর্জুনের বীরত্বদর্শনে মুগ্ধা দ্রৌপদীর চিত্তে শৃঙ্গারের উদ্রেক হচ্ছে– 'অপিশব্দাচ্ছৃঙ্গারো2পি বীরস্যানন্তরং ফলং দ্রৌপদীস্বয়ম্বরাদৌ' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। উল্লেখ্য, এক-ই উদাহরণযোগে এই বিষয়টি নাট্যদর্পণে-ও উল্লিখিত হয়েছে।

একমাত্র রৌদ্ররস থেকে-ই করুণরসের উৎপত্তি – এই মতটি-ও যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়। স্বয়ং অভিনবগুপ্তাচার্যের মতে, শৃঙ্গারোদ্রেকের পর প্রণয়ীযুগলের বিচ্ছেদে করুণরসের নিয়ত উদ্ভব পরিলক্ষিত হয় – 'শৃঙ্গারানন্তরং নিয়মেন করুণঃ' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। এর সমর্থনে তিনি 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের রতিবিলাপ অংশের ''হৃদয়ে বসতীতি মৎপ্রিয়ম্ ....'' ইত্যাদি শ্লোকটি উদাহরণরূপে উপন্যস্ত করছেন, যেখানে শৃঙ্গার-ই করুণরসের উদ্রেকের একমাত্র কারণ ।

অনুরূপে, একমাত্র বীভৎস রস থেকে ভয়ানক রসের উৎপত্তি – একথা-ও বলা যায় না। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, রৌদ্ররসাত্মক বধ-বন্ধনাদি কার্য থেকে করুণের সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ানক রসের-ও উদ্ভব ঘটে – 'রৌদ্রাচ্চ বধবন্ধাদিফলান্তরং করুণভয়ানকৌ'।[৮৮] আচার্য অভিনবগুপ্ত তো রৌদ্ররসের পর ভয়ানকরসের উৎপত্তিকে নিয়তোপস্থিতিক রূপে গণ্য করেছেন – 'রৌদ্রানন্তরং নিয়মেন ভয়ানকঃ' (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়)। বরং বীভৎসের সঙ্গে ভয়ানকরসের সম্বন্ধটি-ই আমরা খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করি না।

রসভেদে বৃত্তির প্রয়োগবিষয়ে মহর্ষি ভরতের বিধান-ও স্বচ্ছ নয়। অভিপ্রেত এই যে, উৎপাদক ও উৎপাদ্য রসযুগলের ক্ষেত্রে এক বৃত্তির প্রয়োগ হবে। তদনুসারে, শৃঙ্গার ও হাস্যের জন্য কৈশিকী, বীর ও অদ্ভুতের জন্য সাত্ত্বতী , রৌদ্র ও করুণের জন্য আরভটী এবং বীভৎস ও ভয়ানকের জন্য ভারতী বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। প্রথম দুটি রসযুগলের ক্ষেত্রে নিয়মটি পালিত হলে-ও, অবশিষ্ট রসযুগলের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়। কারণ, নাট্যশাস্ত্রের বিংশ অধ্যায়ে রসভেদে বৃত্তিভেদের আলোচনায় মহর্ষি ভরত রৌদ্র ও ভয়ানকরসের জন্য আরভটী এবং বীভৎস ও করুণরসের জন্য ভারতী বৃত্তির বিধান দিয়েছেন।[৮৯] বৃত্তিসংক্রান্ত আলোচনার এই স্ববিরোধিতার কারণে রসসমূহের উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধটির প্রতিষ্ঠা-ও ব্যাহত হয়।

ডঃ.কে.এইচ.ত্রিবেদী বলছেন যে, কোনো-কোনো তাত্ত্বিক একথা বলতে পারেন যে, মহর্ষি ভরত উৎপাদক রসবর্গটি নির্মাণ করেছেন তদন্তর্গত রসচতুষ্টয়ের প্রয়োগাধিক্যের ভিত্তিতে। অর্থাৎ নাটকাদি রূপকে শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র এবং বীভৎসরসের প্রয়োগ অন্য চারটি রসের তুলনায় অধিক পরিমাণে, অতএব অধিক গুরুত্বে বিহিত হয়ে থাকে । এই বিষয়টি-ও কিন্তু বিশেষ বিচারের অপেক্ষা রাখে। অদ্ভুত এবং ভয়ানক রসের ক্ষেত্রে হলে-ও, করুণ এবং হাস্যের ক্ষেত্রে এই অভিমতটি একেবারে-ই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ করুণ ও হাস্য – এই দুটি উৎপাদ্য রস বহু গ্রন্থের প্রধান অর্থাৎ অঙ্গীরসরূপে স্বীকৃত। ভারতীয় সংস্কৃতির স্তম্ভরূপ 'রামায়ণ',তদনুসরণে রচিত ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'– সর্বত্র করুণ-ই অঙ্গীরস। আচার্য ভবভূতির দৃষ্টিতে করুণরসের প্রাধান্য এতখানি-ই যে, তাঁর মতে, যেমন সমস্ত জল এক হলে-ও তা আবর্ত, বুদ্বুদ ও তরঙ্গরূপ বিকারপ্রাপ্ত হয়, অনুরূপে এক-ই করুণরস কারণভেদবশতঃ পৃথক পৃথক রূপ গ্রহণ করে –

"একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্ ।
আবর্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব হি তৎ সমস্তম্ ॥ " (উত্তররামচরিত ৩/৪৭)

অনুরূপে যে কোনো প্রকার প্রহসনের প্রধানরস হল হাস্য। সংস্কৃত সাহিত্যে যে অজস্র প্রহসন রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন রূপকে বিদূষকচরিত্রের কার্যকলাপবর্ণনায় হাস্যের বাধ্যতামূলক প্রয়োগাবসর ঘটে। অতএব উৎপাদ্য বলে রূপকাদিতে এদের স্থান গৌণ – এই মতটি একেবারে-ই সমর্থনযোগ্য নয়।

রসসমূহের সংখ্যা ও তাদের সম্বন্ধ বিষয়ে দশরূপককারের মত অবিকল নাট্যশাস্ত্রানুসারী –

"শৃঙ্গারবীরবীভৎসরৌদ্রেষু মনসঃ ক্রমাৎ ।

হাস্যাদ্ভুতভয়োৎকর্ষকরুণানাং ত এব হি ॥

অতস্তজ্জন্যতা তেষামত এবাবধারণম্ ।" (দশ. রূ. ৪/৪৪,৪৫)

বিকাশ, বিস্তার, ক্ষোভ এবং বিক্ষেপরূপ চিত্তভূমির চতুর্ধা অবস্থার দ্বারা এই সকল রসের ব্রহ্মানন্দসহোদর আস্বাদন হয়ে থাকে –

"স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ ।

বিকাশবিস্তরক্ষোভবিক্ষেপৈঃ স চতুর্বিধঃ ॥"(দশ.রূ. ৪/৪৩)

রসসংখ্যাবিষয়ক পর্যালোচনার অন্তিম অংশে নাট্যদর্পণকাররা বলছেন, শৃঙ্গারাদি নববিধ রস আস্বাদ্যমানতা ও হৃদ্যতার কারণে নাট্যতাত্ত্বিকদের অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মত হলে-ও, এগুলি ছাড়া-ও আরো কয়েকটি রসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা 'লৌল্য' (স্থায়িভাব লোভ), 'স্নেহ' (স্থায়িভাব মানস আর্দ্রতা), 'ব্যসন' (স্থায়িভাব আসক্তি), 'দুঃখ' (স্থায়িভাব অরতি), 'সুখ' (স্থায়িভাব সন্তোষ) ইত্যাদি রসের উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য এ-ও বলেছেন যে, অধিকাংশ আচার্য উক্ত রসগুলিকে প্রসিদ্ধ নববিধ রসের মধ্যে-ই গণনা করেছেন, এদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।

প্রসঙ্গক্রমে প্রসিদ্ধ নয়প্রকার রসের অতিরিক্ত (কতিপয় আলঙ্কারিকসম্মত) অন্য কয়েকটি রসের আলোচনা করা যেতে পারে। এইসব রসের মধ্যে প্রধান হল চারটি – প্রেয়স্, বাৎসল্য, প্রীতি ও ভক্তি।[৯০] এই রসচতুষ্কের মূলে রয়েছে রতি অর্থাৎ পারস্পরিক অনুরাগ। আমরা জানি, শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব হল রতি। যাঁরা প্রেয়সাদি চতুষ্টয়ের রসত্ব স্বীকার করেন, তাঁরা রতিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন– যৌন বা শৃঙ্গাররতি এবং অযৌন রতি। এই অযৌন রতি-ই উল্লিখিত চারটি রসের স্থায়িভাব। ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনন্য বর্ণনায় – "বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অনুরাগে 'প্রেয়ঃ', বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠের অনুরাগে 'বাৎসল্য', নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি অনুগতের অনুরাগে 'প্রীতি' এবং পূজ্যের প্রতি যে অনুরাগ অথবা ভগবদ্বিষয়ক যে রতি তাহাই 'ভক্তি'।"[৯১]

উল্লেখ্য, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের আচার্য আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র কিন্তু স্নেহ, বাৎসল্য ইত্যাদিকে রসরূপে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, স্নেহাদি অযৌন রতিগুলি ভাবমাত্র, এদের রসত্বের উৎকর্ষ নেই – "স্নেহো ভক্তির্বাৎসল্যমিতি হি রতেরেব বিশেষাঃ। তুল্যয়োঃ যা পরস্পরং রতিঃ স স্নেহঃ। অনুত্তমস্য উত্তমে রতিঃ প্রসক্তিঃ,সৈব ভক্তিপদবাচ্যা। উত্তমস্য অনুত্তমে রতিঃ বাৎসল্যম্ । এবমাদৌ চ বিষয়ে ভাবস্যৈব আস্বাদ্যত্বম্ " (কা. অনু. দ্বিতীয় অধ্যায়) । আচার্য অভিনবগুপ্ত-ও এগুলিকে পৃথক রস বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, এগুলির স্থায়িভাব রতি, উৎসাহ ইত্যাদির অন্তর্গত; অতএব এরা শৃঙ্গার, বীরাদি রসের ভেদমাত্র – "আর্দ্রতাস্থায়িকঃ স্নেহো রস ইতি ত্বসৎ। স্নেহো হ্যভিষঙ্গঃ। স চ সর্বো রত্যুৎসাহাদেব পর্যবস্যতি। তথা হি – বালস্য মাতাপিত্রাদৌ স্নেহো ভয়ে বিশ্রান্তঃ । যূনোর্মিত্রজনে রতৌ। লক্ষ্মণাদৌ ভ্রাতরি স্নেহ ধর্মময় এব। এবং বৃদ্ধস্য পুত্রাদাবিতি দ্রষ্টব্যম্" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। ভক্তিরস-ও, গুপ্তপাদের মতে, শান্তরসের-ই অঙ্গ –'অত এবেশ্বরপ্রণিধানবিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধে স্মৃতিমতিধৃত্যুৎসাহাদ্যনুপ্রবিষ্টেভ্যো2ন্যথৈবাঙ্গমিতি ন তয়োঃ পৃথগ্রসত্বেন গণনম্' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)।

প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব জগতের অনুভবরীতি অনুসরণ করলে উক্ত রসচতুষ্টয়ের পৃথক রসত্ব বিষয়ে কোনো সংশয় থাকা উচিৎ নয়। অন্ততঃ 'বাৎসল্য' ও 'ভক্তি' বিষয়ে তো নয়-ই। কারণ, এই দুটি রসের এমন বিশিষ্ট আস্বাদ রয়েছে, যা শৃঙ্গারাদির আস্বাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। স্বয়ং মহর্ষি ভরত-ও পরোক্ষভাবে বাৎসল্যকে স্বীকার করেছেন। 'পাঠ্যগুণ'প্রকরণে বর্ণ ও রসের প্রসঙ্গে তিনি 'বাৎসল্য' রসের উল্লেখ করেছেন – "তত্র হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ স্বরিতোদাত্তৈঃ, বীররৌদ্রাদ্ভুতেষু উদাত্তকম্পিতৈঃ, করুণবাৎসল্যভয়ানকেষু অনুদাত্তস্বরিতকম্পিতবর্ণৈঃ পাঠ্যমুপপাদয়তি" (না.শা.সপ্তদশ অধ্যায়)। দর্পণকার-ও সম্ভবতঃ এই কারণে-ই 'বাৎসল্য'-কে 'মুনীন্দ্রসম্মত'রূপে উল্লেখপূর্বক এর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন।

আচার্য অভিনবগুপ্ত যে ভক্তিকে শান্তরসের অঙ্গরূপে গণ্য করেছেন , তার যৌক্তিকতাটি-ও বিচার্য। শান্তরস হল যাবতীয় জাগতিক কামনা-বাসনার নিবৃত্তিতে উদ্ভূত তৃষ্ণাক্ষয়সুখের আস্বাদ; অন্যদিকে ভক্তিরস তৃষ্ণাক্ষয়সুখের বিষয় নয়, তা তৃষ্ণাসুখ-ই ,তবে সে তৃষ্ণার বিষয় পার্থিব জগতের ভোগ্যসমূহ নয়, তা অপার্থিব ও ঐশ্বরিক। সাধারণ রতি নয়, দেববিষয়ক রতি হল ভক্তিরসের স্থায়িভাব। অতএব ভক্তি শান্ত-ও নয়, শৃঙ্গার-ও নয়। ডঃ. মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ সুললিত বর্ণনায়– "দুঃখ-কাতর মানুষ দুঃখময় সংসারে যে দৃশ্য দেখিয়া অনাসক্তি বোধ করে, সেই দৃশ্যই শান্তরসের বিষয়। যে দৃশ্য দেখিয়া ক্ষুদ্র সুন্দরকে ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর-সুন্দরকে পাওয়ার জন্য অদম্য উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়, তাহাই ভক্তিরসের বিষয়।" [৯২]

ভারতবর্ষের মত ধর্মপ্রাণ দেশ, ভগবৎপ্রীতি ও বৈরাগ্য যে দেশের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সেই দেশের আলঙ্কারিকগণ ভক্তিকে পৃথক রসরূপে স্বীকার করতে এত দ্বিধাগ্রস্ত কেন, তা বাস্তবিক চিন্তনীয় বিষয়। এর সমাধানকল্পে এরকম চিন্তা করা যেতে পারে যে, শৃঙ্গারাদি প্রসিদ্ধ রসগুলি সর্বস্তরের সর্বপ্রকার মানুষের উপভোগ্য; কিন্তু ভক্তি, শান্ত ইত্যাদি রসকে ঠিক সর্বজনভোগ্য রস বলা চলে না। বিশেষ ধর্মপ্রবণতা না থাকলে সহৃদয় সামাজিকের দ্বারা-ও এগুলির উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। সম্ভবতঃ এই কারণে-ই সার্ববর্ণিক, সার্বজনিক দৃশ্যকাব্যে ভক্তির ন্যায় সূক্ষ্ম, মার্মিক এবং একান্ত ব্যক্তিগত মনোস্থিতিনির্ভর চিত্তবৃত্তিকে রসরূপে স্বীকার করতে আলঙ্কারিকরা কুণ্ঠাবোধ করেছেন।

প্রেয়স্, প্রীত্যাদি চতুর্বিধ রস ছাড়া-ও, দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতে মৃগয়া ও অক্ষকে-ও রস বলা যায়। তবে এদের স্বরূপ তিনি ব্যাখ্যা করছেন না; কারণ হর্ষ, উৎসাহাদির দ্বারা এদের অর্থ সহজে-ই নির্ণয় করা সম্ভব –

"…. মৃগয়াক্ষাদয়ো রসাঃ।

হর্ষোৎসাহাদিষু স্পষ্টমন্তর্ভাবান্ন কীর্তিতাঃ ॥" (দশ.রূ. ৪/৮৩)

– মৃগয়া ও অক্ষকে কেন রস বলা হল, ধনঞ্জয় সে বিষয়ে নীরব। টীকাকার ধনিক-ও এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেননি । রসচন্দ্রিকাকার আচার্য বিশ্বেশ্বর 'মিথ্যাজ্ঞান' নামক স্থায়িভাবযুক্ত 'মায়া'কে-ও পৃথক রসরূপে অঙ্গীকার করেছেন।

পরিশেষে একথা-ই বলা যায় যে , মানবমনের চিত্তবৃত্তি দুর্গম, দুর্বোধ্য, অভাবনীয় এবং অসংখ্য। মাত্র আট-নয়টি রসের দ্বারা তাকে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করার চেষ্টা বৃথা ও নিষ্ফল। যে ভাবটি-ই মনুষ্যচিত্তে বিশেষভাবে আবেদন রাখে, যে ভাবটি-ই অনুভব ও আস্বাদনের যোগ্য, তার-ই রসত্ব সম্ভব। সম্ভবতঃ এই কারণে-ই 'শৃঙ্গারপ্রকাশ'রচয়িতা আচার্য ভোজদেব আটটি স্থায়িভাব-আটটি সাত্ত্বিকভাব-তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাবের যোগফলে সর্বসাকুল্যে ঊনপঞ্চাশটি ভাবের-ই রসত্ব স্বীকার করেছেন – "এতেন রূঢ়াহংকারতা রসস্য পূর্বা কোটিঃ। রত্যাদীনামেকোনপঞ্চাশতো2পি বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ পরপ্রকর্ষাধিগমো রসব্যপদেশার্হতা রসস্যৈব মধ্যমাবস্থা" (শৃ.প্র. একাদশ অধ্যায়)।

শান্তরসের রসত্ববিচার ঃ

মহর্ষি ভরতপ্রোক্ত অষ্টবিধ রসের অতিরিক্ত যে সকল রস পরবর্তী কালের বিভিন্ন আলঙ্কারিক স্বীকার করেছেন, সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিতর্ক ও বৈমত্যের সৃষ্টি হয়েছে শান্তরসের অস্তিত্ব বিষয়ে। আমাদের গবেষ্য গ্রন্থ নাট্যদর্পণে যদি-ও শান্তরস নিঃসন্দিগ্ধভাবে একটি স্বতন্ত্র রসরূপে পরিগণিত

হয়েছে, তবু এই অবকাশে শান্তরসসংক্রান্ত বিতর্ক বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শান্তরসপ্রসঙ্গে এই বৈমত্যের প্রধানতম কারণ হল এই যে, মহর্ষি ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যরস আলোচনায় শান্তরসের উল্লেখ নেই। নাট্যশাস্ত্রের কোনো-কোনো সংস্করণে শান্তরসের উল্লেখ পাওয়া গেলে-ও, অধিকাংশ সমালোচকের মতে সে উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত। স্বয়ং অভিনবগুপ্তাচার্য-ও যে নাট্যশাস্ত্রে শান্তরসের উল্লেখকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন , তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই উক্তিটির মাধ্যমে – 'যে পুনর্নব রসা ইতি পঠন্তি তন্মতে শান্তস্বরূপমভিধীয়তে' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)।

নাট্যশাস্ত্রানুসারী আচার্য ধনঞ্জয়ের-ও শান্তকে নাট্যরসরূপে স্বীকার করতে অনীহা। দশরূপকের স্থায়িভাবনির্ণয়প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে – 'শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য'(দশ.রূ. ৪/৩৫) – অর্থাৎ কোনো-কোনো আচার্য শমকে-ও স্থায়িভাবরূপে গণ্য করে থাকেন, তবে নাট্যের পুষ্টিতে এর প্রয়োগ নেই। এই উক্তিটির ব্যাখ্যাবসরে টীকাকার ধনিক শান্তরসের বিরুদ্ধে চারটি যুক্তি উত্থাপিত করেছেন –

প্রথমতঃ, 'আচার্য' অর্থাৎ মহর্ষি ভরত বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাবসমূহের প্রতিপাদনদ্বারে এই রসের লক্ষণ নির্ণয় করেননি – "তত্র কেচিদাহুঃ – নাস্ত্যেব শান্তরসঃ । তস্যাচার্যেণ বিভাবাদ্যপ্রতিপাদনাল্লক্ষণাকরণাৎ" ।[৯৩]

দ্বিতীয়তঃ, বস্তুতঃ পক্ষে শান্তরস থাকতে-ই পারে না । যে রাগদ্বেষের অভাবে শমাখ্য স্থায়িভাবের উদ্বোধ হয়, অনাদিকাল ধরে মানবচিত্তে স্থিত সেই রাগদ্বেষকে মন থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব – "অন্যে তু বস্তুতস্তস্যাভাবং বর্ণয়ন্তি। অনাদিকালপ্রবাহায়াতরাগদ্বেষয়োরুচ্ছেত্তুমশক্যত্বাৎ" ।[৯৪]

তৃতীয়তঃ, শান্তরস কোনো পৃথক রসরূপে পরিগণিত হতে পারে না, এটি বীর-বীভৎসাদি রসের-ই অন্তর্গত – 'অন্যে তু বীরবীভৎসাদাবন্তর্ভাবং বর্ণয়ন্তি' ।[৯৫]

চতুর্থতঃ, অভিনয়াত্মক নাটকে শান্তরসের অভিনয় হতে পারে না। নির্বিকার চিত্ত-ই শান্তচিত্ত, এই চিত্তে অনুভাব বা বাহ্য কোনোরূপ ব্যাপার অসম্ভব; অতএব এটি অভিনয়যোগ্য নয় – "সর্বথা নাটকাদাবভিনয়াত্মনি স্থায়িত্বমস্মাভিঃ শমস্য নিষিধ্যতে। তস্য সমস্ত ব্যাপারপ্রবিলয়রূপস্যাভিনয়াযোগাৎ" । [৯৬]

শঙ্করের 'সৌন্দর্যলহরী' গ্রন্থের একান্নতম শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার লক্ষ্মীধর এই চতুর্থ যুক্তিটিকে-ই উপস্থাপিত করেছেন – "বিক্রিয়াজনকা এব রসা ইতি অষ্টৌ রসা ভরতমতে । 'শান্তস্য নির্বিকারত্বাৎ ন শান্তং মেনিরে রসম্' ইতি শান্তরসস্য রসত্বাভাবাৎ অষ্টাবেব রসাঃ সংগৃহীতাঃ" ।[৯৭]

কিন্তু এই গ্রন্থের-ই একচল্লিশতম শ্লোকে নাট্যরসরূপে শান্তরসের উল্লেখ দেখা যায় এবং লক্ষ্মীধর যে সর্বথা শান্তরসবিরোধী নন, তা অনুমান করা যায়।[৭৮]

শান্তরসকে নাট্যরসরূপে প্রথম স্বীকার করেন 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রণেতা আলঙ্কারিক ভট্ট উদ্ভট। নাট্যশাস্ত্রের (প্রক্ষিপ্ত?) অংশে শান্তরসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে অবস্থায় দুঃখ নেই, সুখ নেই, হিংসা নেই, মাৎসর্য নেই, যে অবস্থায় সর্বভূতে সমদর্শিতা আসে, সেই অবস্থা-ই হল শান্তরস আস্বাদনের অনুকূল অবস্থা–

"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ ॥" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)

আরো বলা হচ্ছে, মোক্ষ ও অধ্যাত্মর অন্বেষণজাত তত্ত্বজ্ঞানলাভ শান্তরসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে এই রস নিঃশ্রেয়সের উপদেষ্টা ও উপকারক; অতএব এটি সর্বভূতের মঙ্গলাত্মক। তবে নাট্যশাস্ত্রের এই অংশে শান্তরসের প্রাধান্যপ্রতিপাদক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক দুটি হল –

"ভাবাঃ বিকারা রত্যাদ্যাঃ শান্তস্তু প্রকৃতির্মতঃ।
বিকারঃ প্রকৃতের্জাতঃ পুনস্তত্রৈব লীয়তে ॥
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ভাবঃ প্রবর্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে চ শান্ত এবোপলীয়তে ॥" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)

– অর্থাৎ রত্যাদি যাবতীয় ভাবের মূল অর্থাৎ প্রকৃতি হল শান্ত। নাট্যে নিজ-নিজ প্রয়োজনাবসরে শান্ত রস থেকে-ই এগুলি উদ্ভূত হয়, স্বীয় প্রয়োজনসমাপনে শান্তরসে-ই পুনরায় লীন হয়ে যায়। আচার্য অভিনবগুপ্ত এই অংশটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,শান্তরসের আত্মারূপ তত্ত্বজ্ঞান সর্ববিধ ভাবের ভিত্তিভূমিস্বরূপ। অতএব তা সকল স্থায়িভাবের-ও স্থায়িভাব – 'তত্ত্বজ্ঞানং তু সকলভাবান্ত রভিত্তিস্থানীয়ং সর্বস্থায়িভ্যঃ স্থায়িতমং সর্বাঃ রত্যাদিকাস্স্থায়িচিত্তবৃত্তীর্ব্যভিচারীভাবয়ৎ নিসর্গত এব সিদ্ধস্থায়িভাবমিতি তন্ত্রবচনেন' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। আলঙ্কারিকপ্রবর এই আচার্য শান্তরসকে কেবলমাত্র স্বীকার-ই করেননি, উপরন্তু এটিকে শ্রেষ্ঠ রসরূপে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে, বিষয়বিমুখতার কারণে সমস্ত রসের-ই আস্বাদ শান্তপ্রায় – 'সর্বরসানাং শান্তপ্রায় এব আস্বাদঃ, বিষয়েভ্যো বিপরাবৃত্ত্যা' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। বাস্তবিক-ই, বাহ্যজগতের যাবতীয় বিষয় থেকে চিত্তকে যথার্থতঃ বিযুক্ত না করলে শৃঙ্গারাদি কোনোপ্রকার রসের আস্বাদন-ই সম্ভবপর নয়। আর চিত্তের এই বিষয়বিবিক্ততা-ই হল শান্তরসের মূল কথা। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, সর্ববিধ রসের মূল ভাব হল বিষয়াদিপরাবৃত্ত শান্তরস। শান্তরসের প্রাধান্যজ্ঞাপক এই অসাধারণ

মার্মিক ব্যাখ্যার সমর্থনে অভিনবগুপ্তাচার্য ইতিহাস-পুরাণাদির সহমতের উল্লেখ করেছেন – ''ইতিহাসপুরাণাভিধানকোশাদৌ চ নবরসাঃ শ্রূয়ন্তে শ্রীমৎসিদ্ধান্তশাস্ত্রেষ্বপি। তথা চোক্তম্–
'অষ্টানামিহ দেবানাং শৃঙ্গারাদীন্ প্রদর্শয়েৎ।
মধ্যে চ দেবদেবস্য শান্তং রূপং প্রকল্পয়েৎ ॥''(না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)

আচার্য শারদাতনয় তাঁর 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে শান্তকে নাট্যরস রূপে স্বীকার না করলে-ও, কাব্যরসরূপে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধিকারে বলা হয়েছে – 'ততো2ষ্টৌ স্থায়িনো ভাবা নাট্যস্যৈবোপযোগিনঃ' (ভাব.প্র. ১/১৬৪)।ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরো বলা হচ্ছে, অনুভাবাদি অঙ্গের অনুপস্থিতির কারণে নাট্যরসরূপে শান্ত 'বিকলাঙ্গ' –'তস্মাচ্ছান্তরসস্যৈবং বিকলাঙ্গত্বমুচ্যতে' (ভাব.প্র. ৬/৩৬)। কিন্তু আবার এর মাত্র কয়েকটি শ্লোক পর, এই এক-ই অধিকারে, শান্তরসকে রসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে অভিহিত করা হচ্ছে। কারণস্বরূপ বলা হচ্ছে, একমাত্র এই রসটি শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষের সহায়ক –
''অতো2য়ং বিকলাঙ্গস্তথাপি শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
প্রকৃষ্টস্যোপযোগিত্বাৎ পুরুষার্থস্য দেহিনাম্ ॥'' (ভাব.প্র.৬/৩৭)

আচার্য ধনঞ্জয়-ও নাট্যরসরূপ শান্তকে অস্বীকার করলে-ও, এই রসের কাব্যবিষয়ত্বে তাঁর আপত্তি নেই। টীকাকার ধনিকের ভাষায় – ''ননু শান্তরসস্যানভিনেয়ত্বাদ্ যদ্যপি নাট্যে2নুপ্রবেশো নাস্তি তথাপি সূক্ষ্মাতীতাদি বস্তূনাং সর্বেষামপি শব্দপ্রতিপাদ্যতায়া বিদ্যমানত্বাৎ কাব্যবিষয়ং ন নিবার্যতে। অতস্তদুচ্যতে – 'শমপ্রকর্ষো নির্বাচ্যো মুদিতাদেস্তদাত্মতা'' ।[৯৯]

পরভাবী দর্পণকার নির্দ্বিধায় শান্তরসকে স্বীকার করেছেন এবং তৎকৃতগ্রন্থের রসবিমর্শাত্মক তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই রসের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-ও করেছেন। শান্তরসবিষয়ে অতি-সম্ভাব্য একটি প্রশ্ন হল, নির্লিপ্ত ও সত্ত্বময় চিত্তে অনুভাব বা বাহ্যবিক্রিয়াসমূহ সম্ভবপর হয় না, চিত্তে অহংভাব থাকলে তবে-ই আলম্বনাদির আক্ষেপ হয়, নির্বিকার চিত্তে ব্যভিচারিভাবের উৎপত্তি-ও অসম্ভব– সেক্ষেত্রে শান্তরসের আস্বাদ হয় কি উপায়ে? শান্তরসের আস্বাদনের পথে এই বিঘ্ন ও সমস্যার সমাধান করেছেন দর্পণকার –
''যুক্তবিযুক্তদশায়ামবস্থিতো য শমঃ স এব যতঃ।
রসতামেতি তদস্মিন্ সঞ্চার্যাদেঃ স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধা ॥''(সা.দ. ৩/২১২)
– শ্লোকধৃত 'যুক্ত' ও 'বিযুক্ত' পদদুটির ব্যাখ্যার জন্য টীকার সহায়তা অপেক্ষিত। আচার্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মতে– ''যুক্তঃ সমাধিমান্ বিযুক্তস্তদ্বিপরীতঃ সংসারী। যুক্তশ্চাসৌ বিযুক্তশ্চেতি যুক্তবিযুক্তঃ। তথা চ যঃ সংসারকর্মণি ব্যাপ্রিয়মাণ এব যোগমভ্যস্যতি স যুক্তবিযুক্ত ইত্যুচ্যতে। যথা–

জনকরাজর্ষিঃ"।[১০০]– যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় কর্মে নিরত থেকে-ও, এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য মোক্ষার্থপ্রতিপাদক চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন, সেইরূপ উত্তমোত্তম পাত্রের যে অবস্থা,সেই অবস্থায় শম শান্তরসত্ব প্রাপ্ত হয়; এই অবস্থায় অনুভাবাদি রসপরিপন্থী নয়।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ-ও শান্তরসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন – "নাট্যে শান্তরসমভ্যুপগচ্ছদ্‌ভিঃ ফলবলাত্তদ্‌গীতবাদ্যাদেস্তস্মিন্ বিরোধিতায়া অকল্পনাৎ। বিষয়চিন্তাসামান্যস্য তত্র বিরোধিত্বস্বীকারে তদীয়ালম্বনস্য সংসারানিত্যস্য তদুদ্দীপনস্য পুরাণশ্রবণ-সৎসঙ্গ-পুণ্যবনতীর্থাবলোকনাদেরপি বিষয়ত্বেন বিরোধিত্বাপত্তেঃ" (রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন)।

শান্তরস বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় বৌদ্ধ ও জৈন আলঙ্কারিকদের কাছে। এই দুই ধর্মের জীবনাদর্শ শান্তরসের অনুকূল; তাই এই দুই সাহিত্যে এই রসের সর্বোত্তম প্রকাশ দেখা যায়। 'সৌন্দরানন্দ', 'শারিপুত্তপ্রকরণ', 'নাগানন্দ' প্রভৃতি কাব্য-নাটকে এই রসের-ই প্রাধান্য। জৈনাচার্য মুনিসুন্দর সূরি তাঁর 'অধ্যাত্মকল্পদ্রুম' গ্রন্থে শান্তরসকে 'রসোদ' বলেছেন ।[১০১] 'অনুযোগদ্বারসূত্র' নামক জৈনগ্রন্থে 'প্রশান্ত' রসকে নবম রসরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০২] এই ভাবে পরবর্তী অনেক গ্রন্থে-ই শান্তরসের মর্যাদা পরিদৃষ্ট হয়।

শান্তরসের পক্ষীয় ও বিপক্ষীয় যাবতীয় মতের আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বস্তুতঃপক্ষে সকল রসের আস্বাদনের মূলে আছে এই রস। দশরূপকে যে বলা হয়েছে, অনাদিকাল যাবৎ প্রবাহিত রাগদ্বেষাদিকে চিত্ত থেকে বিলুপ্ত করা অসম্ভব – একথা যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়। কারণ, অন্ততঃ সাময়িকভাবে রাগদ্বেষমুক্ত না হলে শান্তরস কেন, শৃঙ্গারাদির ন্যায় সর্বজনভোগ্য ও সর্বজনহৃদ্য রসের আস্বাদ-ও সম্ভবপর নয়। রাগদ্বেষশূন্যতা-ই হল চিত্তের সত্ত্বময়তা, যে সত্ত্বময় চিত্তে রস আস্বাদ্যমানতা লাভ করতে পারে। পৃথিবীতে সকল ব্যক্তির রুচি ভিন্ন– 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ'– সব বস্তু সবার কাছে আস্বাদযোগ্য নয়। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে–

"তুষ্যন্তি তরুণাঃ কামে বিদগ্ধাঃ সময়াশ্রিতে।
অর্থেষ্বর্থপরাশ্চৈব মোক্ষেস্বথ বিরাগিনঃ ॥" (না.শা. ২৭/৫৮)

অতএব মোক্ষ যদি একশ্রেণীর লোকের কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে, বৈরাগ্য সেখানে নিশ্চয়-ই আস্বাদ্য, অতএব সেখানে-ই শান্তরসের আবেদন। প্রসঙ্গক্রমে ভি. রাঘবনের এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধেয় –"To say that it is impossible to exterminate Raga and Dvesa is to insult humanity , its heritage of philosophy and the long chain of its spiritual leaders. Surely there are men of that mind which can respond to a Santa drama...... If Vitas delight in Srngara,Vitaragas delight in Santa."[১০৩]

শান্তরসের অভিনয়দর্শনে সুখানুভূতির উদ্রেক হয় না, এই ধারণাটি-ও ঠিক নয়। এই রসের অভিনয়দ্বারে পরম সুখের আস্বাদন সম্ভব;তবে তা বৈষয়িক সুখ নয়, বৈরাগ্যসুখ – 'যশ্চাস্মিন্ সুখাভাবো2প্যুক্তস্তস্য বৈষয়িকসুখপরত্বান্ন বিরোধঃ' (সা.দ. তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

দশরূপককারের মতে, রাগদ্বেষাদির সম্পূর্ণ অপসারণের মাধ্যমে চিত্তের সত্ত্বময়তা আপাদন এবং তদ্রূপ অবস্থায় শান্তরসের অনুভব সর্বথা অসম্ভব। দশরূপকধৃত রসানুভাবের এই প্রসঙ্গটি কেবলমাত্র সহৃদয়গত। কিন্তু এই অনুভব নটগতরূপে-ও উপলক্ষিত হতে পারে, এরূপ একটি পূর্বপক্ষ উত্থাপন করে এর খণ্ডনমানসে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলেছেন , নট কখনো-ই রসের আস্বাদন করে না, অভিনয় করে মাত্র। অতএব রাগদ্বেষাদিমুক্ত হয়ে-ই নটকে শান্তরসের অনুভব করতে হবে,এই কল্পটি সর্বথা অযুক্ত– "অষ্টাবেব রসা নাট্যেষ্বিতি কেচিদচূচুদন্ । তদচারুঃ যতঃ কঞ্চিন্ন রসং স্বদতে নটঃ" (রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন)।

দশরূপককার যে নাট্যরসরূপে শান্তকে সমর্থন করেননি, এই মতটি-ও যুক্তিসহ নয়। শান্ত রসে সব চরিত্রগুলি অচল, অনড়, স্থাণু – এই ধারণার জন্য-ই দৃশ্যকাব্যে শান্তরসের অস্তিত্বে আপত্তি ওঠে। কিন্তু পূর্বে-ই বলা হয়েছে, যুক্ত অথচ বিযুক্ত চরিত্র শান্তরসের অবলম্বন। নিষ্ক্রিয় নিশ্চলতা শান্ত রসের বিষয় নয়; অন্যান্য রসের মত এই রসের-ও নিজস্ব গতি ও ক্রিয়া আছে । পার্থক্য এইমাত্র যে, সেই গতি ও ক্রিয়ার লক্ষ্য শৃঙ্গারাদির ন্যায় কেবল রসাস্বাদনজনিত আনন্দবিধান নয়, তদতিরিক্ত রূপে দর্শকচিত্তে বৈরাগ্যসুখের আনন্দ উদ্রেক করা। অভিনবগুপ্তাচার্যের মন্তব্যটি এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধেয় – "ইহ তাবদ্ধর্মাদিত্রিতয়মিব মোক্ষো2পি পুরুষার্থঃ। শাস্ত্রেষু স্মৃতীতিহাসাদিষু চ প্রাধান্যেনোপায়তো ব্যুৎপাদ্যত ইতি সুপ্রসিদ্ধম্। যথা চ কামাদিষু সমুচিতাশ্চিত্তবৃত্তয়ো রত্যাদিশব্দবাচ্যাঃ কবিনটব্যাপারেণাস্বাদযোগ্যতাপ্রাপণদ্বারেণ তথাবিধহৃদয়সংবাদবতঃ সামাজিকান্ প্রতি রসত্বং শৃঙ্গারাদিতয়া নীয়ন্তে, তথা মোক্ষাভিধানপরমপুরুষার্থোচিতা চিত্তবৃত্তিঃ কিমিতি রসত্বং নানীয়ত ইতি বক্তব্যম্" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)। গুপ্তপাদের এই অভিমত এবং কাব্যনাট্যনির্বিশেষে শান্তরসের রসত্বকে সমর্থন করে অধ্যাপক রাঘবন মন্তব্য করেছেন –"To grant it in Kavya and to deny it in Natya is as clumsy a compromise as the one which grants it inherrent Rasatva and denies it conventional vogue as a Rasa. Kavya is, in essence, only drama and this Abhinava has emphasised in his Abhinavabharati. If it is possible to develop it as the theme of a Kavya, equally is it possible to handle it as the motif of a drama." [১০৪]

রসসমূহের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ

রসবিষয়ক সামগ্রিক বিমর্শ, রসের সংখ্যা, এদের আন্তর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের পর নাট্যদর্পণের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হল নয়প্রকার রসের প্রাতিস্বিক লক্ষণ ও তাদের বৈশিষ্ট্যবিচার। রসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক আনন্দদায়ক ও সেই কারণে-ই সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ রস হল শৃঙ্গার। তাই শৃঙ্গাররসের পর্যালোচনা দ্বারা-ই এই বিমর্শের আরম্ভ করা হচ্ছে।

শৃঙ্গার রস ঃ

নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে, যেমন লোকের নাম ও গোত্র, বংশ-আচার ও প্রামাণ্য ব্যক্তির উপদেশানুসারে বিহিত হয়, তেমনি নাট্যসংক্রান্ত সকল রস এবং ভাব-ও, আচার ও প্রামাণ্য ব্যক্তির উপদেশানুসারে সিদ্ধ হয়। এইরূপে আচারসিদ্ধ, মনোগ্রাহী, উজ্জ্বল বেষাত্মক রসের নামকরণ হয়েছে শৃঙ্গার। নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, পৃথিবীতে যা কিছু শুভ্র, পবিত্র ও সুদর্শন, তা শৃঙ্গারের সঙ্গে উপমিত হয় – 'যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যং দর্শনীয়ং বা তচ্ছৃঙ্গারেণোপমীয়তে' (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়)।পরভাবী দর্পণকারের মতে 'শৃঙ্গ' শব্দের অর্থ কামের আবির্ভাব। কামাবির্ভাবের হেতুস্বরূপ যে রসের মূল প্রায়শঃ-ই উত্তম প্রকৃতির হয়ে থাকে, সেই রসকে-ই শৃঙ্গাররস বলা হয়ে থাকে –

"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ॥" (সা.দ. ৩/১৮৩)

এই শৃঙ্গাররসের দুটি স্থান – সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ। বিলাসী ও বিলাসিনী অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে যখন দর্শন, স্পর্শন, অধরপান, চুম্বন ইত্যাদি করতে থাকে, তখন সেই শৃঙ্গারের নাম সম্ভোগ। অন্যদিকে পরস্পর আসক্ত প্রণয়ীযুগলের প্রবল রতি যখন পারতন্ত্র্যাদি কারণবশতঃ অভীষ্টকে পায় না, সেই শৃঙ্গারের নাম বিপ্রলম্ভ।

উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণে কিন্তু সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভকে শৃঙ্গারের দুটি 'ভেদ' রূপে অভিহিত করা হয়নি; এরা শৃঙ্গারের দুটি প্রয়োগস্থল। এই দুটি অবস্থা-ই শৃঙ্গারের স্বভাব, আত্মস্থ ধর্ম। যেমন শাবলেয় ও বাহুলেয় দুটি পৃথক বলীবর্দ হলে-ও, এদের উভয়ের মধ্যে গোত্ব বিরাজমান, যেমন 'গোত্ব' জাতির দৃষ্টিকোণ থেকে এরা সগোত্র, অনুরূপভাবে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ উভয়ের মধ্যে-ই শৃঙ্গার বর্তমান থাকায় এরা-ও একপ্রকৃতিক ; এদের যা পার্থক্য তা কেবল বৈশিষ্ট্যগত, স্বভাবগত নয়। কারণ, সম্ভোগের মধ্যে-ও ভাবী বিরহের উৎকণ্ঠায় বিপ্রলম্ভ সম্ভব ; বিপরীতে বিপ্রলম্ভের মধ্যে-ও মানস সম্ভোগের রসাস্বাদন সম্ভব। নাট্যদর্পণের ভাষায়– 'সম্ভোগে2পি বিপ্রলম্ভসম্ভাবনাসদ্ভাবাদ্, বিপ্রলম্ভে2পি মনসা সম্ভোগানুবেধাদুভয়সংবলিতস্বভাবঃ শৃঙ্গারঃ'। [১০৫]এই ওতোপ্রোতঃ সম্পর্কের

কারণে-ই নাট্যদর্পণকাররা বলেছেন যে, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের দুটি ভেদ নয়, এরা শৃঙ্গারের দুটি স্থানমাত্র। প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নাট্যশাস্ত্রে-ও কিন্তু সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভকে শৃঙ্গারের স্থানরূপে অভিহিত করা হয়েছে, ভেদরূপে নয়– 'তস্য (শৃঙ্গারস্য) দ্বে অধিষ্ঠানে সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ' (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের যুগপৎ সন্নিবেশের একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে–

"একস্মিন্ শয়নে পরাঙ্মুখতয়া বীতোত্তরং তাম্যতোঃ
অন্যোন্যং হৃদয়স্থিতে2প্যনুনয়ে সংরক্ষতোর্গৌরবম্।
দম্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনান্মিশ্রীভবচ্চক্ষুষোঃ
ভগ্নো মানকলিঃ সহাসরভসব্যাবৃত্তকণ্ঠগ্রহম্ ॥"

–উল্লিখিত শ্লোকটিতে বিপ্রলম্ভ ও শৃঙ্গারের সম্মিলিত নিবন্ধনে এক অসাধারণ চমৎকৃতির উৎপত্তি সহৃদয়মাত্রের-ই অনুভাবগ্রাহ্য।

পরস্পর অবলোকন, চুম্বন, বিচিত্র-সুন্দর উক্তি ইত্যাদি বহু ভেদ অনুসারে সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গাররসের বিবিধ প্রকার হতে পারে। সম্ভোগের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণকাররা উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ক থেকে এই শ্লোকটি উপন্যস্ত করছেন –

"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগাদ্
অবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণোঃ
অবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীত্ ॥"

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার-ও মান, শাপ, ইচ্ছা, বিরহাদি ভেদে বহুপ্রকারের হতে পারে। অনুরাগ সত্ত্বে-ও ঈর্ষ্যাজনিত বৈমনস্যের নাম মান। যথা –

"যাতে দ্বারবতী তদা মধুরিপৌ তদ্দত্তজ্ঝম্পানতাং
কালিন্দীতটরূঢ়বঞ্জুললতামালিঙ্গ্য সোৎকণ্ঠয়া।
তদ্ গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলতারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুক্তমুৎকূজিতম্ ॥"

সন্নিহিত হওয়া সত্ত্বে-ও দিব্যপ্রকোপবশতঃ প্রণয়ীযুগলের একজনের রূপান্তরের নাম শাপ। যথা – 'কাদম্বরী'-তে বৈশম্পায়নের শুকপক্ষীর রূপপ্রাপ্তি। মাতাপিত্রাদির পারতন্ত্র্যবশতঃ অপূর্ণ

সঙ্গমাভিলাষের নাম ইচ্ছা। এর উদাহরণরূপে রামচন্দ্ররচিত 'সুধাকলশ' থেকে একটি শ্লোক উপন্যস্ত হয়েছে –

"রত্যাই সংচরংতং নিয়চ্ছিউং পাডিবেসিয়জুযাণং।

কম্পয়রীকম্ভং পি হু ধণবই ধূআ সযং কুণই ॥"

সম্ভূতভোগ প্রণয়ীযুগলের মধ্যে একজনের কার্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গমনের ফলে বিরহের উৎপত্তি । যথা–

"অন্যত্র ব্রজতীতি কা খলু কথা নাপ্যস্য তাদৃক্ সুহৃদ্

যো মাং নেচ্ছতি নাগতশ্চ স হহা! কো2য়ং বিধেঃ প্রক্রমঃ।

ইত্যল্পেতরকল্পনাকবলিতস্বান্তা নিশান্তান্তরে

বালা বৃত্তবিবর্তনব্যতিকরা নাপ্নোতি নিদ্রাং নিশি ॥"

নাট্যশাস্ত্র, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি সকল গ্রন্থে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গারের দুটি স্থানকে স্বীকার করা হয়েছে। একমাত্র দশরূপকে এই দুটি ছাড়া-ও 'অযোগ' নামক একটি প্রকারকে স্বীকার করা হচ্ছে। তদনুসারে, অনুরাগ থাকা সত্ত্বে-ও, দৈব বা পারতন্ত্র্যবশতঃ প্রণয়ীযুগলের বিপ্রকর্ষের নাম অযোগ –

"অযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সম্ভোগশ্চেতি স ত্রিধা।

তত্রাযোগো2নুরাগে2পি নবয়োরেকচিত্তয়োঃ ॥

পারতন্ত্র্যেণ দৈবাদ্বা বিপ্রকর্ষাদসঙ্গমঃ।"(দশ.রূ. ৪/৫০,৫১)

কিন্তু অযোগ নামক এই অতিরিক্ত প্রকারটি স্বীকারের কোনো যৌক্তিকতা নেই। লক্ষণদৃষ্টে স্পষ্ট-ই বোঝা যাচ্ছে, বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্যে-ই এর অন্তর্ভাব সম্ভব।

উত্তমপ্রকৃতির যুবাবয়স্ক নারী ও পুরুষ শৃঙ্গাররসের আলম্বনবিভাব। কাব্যাদিশ্রবণ, অভিনয়দর্শন, গীত-বাদ্য-নৃত্য, বসন্তাদি ঋতু, মাল্য, চন্দন, তাম্বুল, সুন্দরগৃহ, উত্তম বস্ত্রাভরণ, বিদূষক-চন্দ্রোদয়-চক্রবাক-হংস-আলেখ্যাদি হৃদ্য বিষয়ের সন্নিধান, নয়ন ও বদনের প্রসন্নতা, স্মিতহাস্য, মনোরম অঙ্গভঙ্গি, পুষ্পাবচয়, উপবনগমন, জলক্রীড়া ইত্যাদি শৃঙ্গারের উদ্দীপন বিভাব।

শৃঙ্গাররসের সর্বাতিশায়ী প্রাধান্যের সমর্থনে দশরূপকে বলা হয়েছে, আটটি সাত্ত্বিকভাব, আটটি স্থায়ীভাব এবং তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব – সাকুল্যে ঊনপঞ্চাশটি ভাব যুক্ত হয়ে শৃঙ্গারের পরিপোষণ করে থাকে –

"যে সত্ত্বজাঃ স্থায়িন এব চাষ্টৌ

ত্রিংশৎত্রয়ো যে ব্যভিচারিণশ্চ।

একোনপঞ্চাশদমী হি ভাবাঃ

যুক্ত্যা নিবদ্ধাঃ পরিপোষয়ন্তি ॥" (দশ.রূ. ৪/৪৯)

উৎসাহ, অভিপ্রেত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে জাত কায়মনঃপীড়া, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, চাটুবাক্য, নয়নচাতুর্য, ভ্রূবিক্ষেপ, পরিদেবন ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা শৃঙ্গারের অভিনয় করণীয়। সম্ভোগশৃঙ্গারে ধৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের প্রয়োগ হয় এবং বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে ব্যভিচারিভাব হয় ভয়, আলস্য ও জুগুপ্সাবর্জিত। নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, চিন্তা, নিদ্রা, জাগরণ, জড়তা, মোহ, মরণাদি হল বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের ব্যভিচারিভাবসমূহ। প্রশ্ন হতে পারে, আনন্দাত্মক শৃঙ্গারের ভাবগুলি দুঃখাত্মক ও করুণরসাশ্রিত হয় কি ভাবে? এর সমাধানকল্পে আচার্য সাগরনন্দী বলেছেন, বিপ্রলম্ভ করুণের-ই অনুরূপ ; তাই বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে করুণরসাত্মক ভাবসমূহের প্রয়োগ সঙ্গত – "করুণবদ্বিপ্রলম্ভঃ স্যাদিতি। করুণে যাবান্ ভাবাস্তাবানিত্যর্থঃ" (না.ল.র.ষোড়শ অধ্যায়)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মহর্ষি ভরত করুণ ও বিপ্রলম্ভকে অনুরূপ বলে মনে করেন না। করুণরস শাপ, ক্লেশ, প্রিয়বিরহাদি থেকে উদ্ভূত এবং নৈরাশ্যযুক্ত ; বিপরীতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ঔৎসুক্য, চিন্তা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত এবং আশাবাদযুক্ত – এই হল করুণ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের পার্থক্য।

শৃঙ্গাররসে বর্জনীয় ব্যভিচারিভাব সম্পর্কে নাট্যদর্পণের মতটি নাট্যশাস্ত্রানুসারী। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে এই বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। দশরূপক ও তদনুসারী সাহিত্যদর্পণ অনুসারে শৃঙ্গারে আলস্য, উগ্রতা, জুগুপ্সা ও মরণ – এই চারটি ব্যভিচারিভাবের প্রয়োগ করা যাবে না। ভাবপ্রকাশনে আবার মরণ বাদে দশরূপকোক্ত তিনটি ব্যভিচারিভাবকে শৃঙ্গারে বর্জনীয় বলে মত পোষণ করা হয়েছে।

শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব হল রতি। নেত্র ও বদনের প্রসন্নতা, চিত্তোল্লাস এবং উৎসাহের দ্বারা পরিপূর্ণ আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের মাধ্যমে এই শৃঙ্গার সহৃদয় সামাজিকের হৃদ্‌গোচর করা কুশলী নটের কর্তব্য।

নাট্যশাস্ত্রমতে এই শৃঙ্গাররস ত্রিবিধ – বাক্যগত, বেশগত ও ক্রিয়াগত। ভাবপ্রকাশনে-ও এক-ই ভাবে শৃঙ্গারত্রৈবিধ্য স্বীকৃত হয়েছে। শৃঙ্গারের বর্ণ শ্যাম, এর অধিষ্ঠাতা দেবতা শ্রীবিষ্ণু।

হাস্য রস ঃ

হাস্যরসের নাট্যদর্পণধৃতলক্ষণটি হল –

"বিকৃতাচারজল্পাঙ্গাকল্প বিস্মাপনোদ্ভবঃ ।

হাস্যো2স্যাভিনেয়ো নাসাস্পন্দাশ্রুজঠরগ্রহৈঃ ॥" (না.দ.৩/১২)

– প্রকৃতি-দেশ-কাল-বয়ঃ-অবস্থাদির বিকৃতি অর্থাৎ বৈপরীত্য, হাস্যকর কথাবার্তা, খঞ্জ-কুণ্ঠত্বাদি অঙ্গবিকার , প্রগল্ভতা, লৌল্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার অনৌচিত্য থেকে হাস্যরসের উৎপত্তি। নাসাবাদন, গ্রীবা-কর্ণ-চূড়াদির বিকার, ভ্রূনর্তন, পরভাষার অনুকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিস্ময় উৎপাদনের দ্বারা-ও হাস্যরসের উদ্ভব হতে পারে। বিকৃত রূপ, বাক্য, অঙ্গভঙ্গি ও বেশবাসের দ্বারা লোককে হাসায় বলে এই রসের নাম হাস্য। নাট্যশাস্ত্রে এ প্রসঙ্গে একটি আনুবংশ্য শ্লোক উদ্ধার করা হচ্ছে –

"বিকৃতাকারৈর্বাক্যৈরঙ্গবিকারৈর্বিকৃতবেষৈশ্চ।
হাসয়তি জনং যস্মাৎ তস্মাদ্ জ্ঞেয়ো রসো হাস্যঃ ॥"(না.শা. ৬/৫০)

নাসা-গণ্ড-ওষ্ঠাদি অঙ্গের স্পন্দন, অশ্রু, নেত্রকুঞ্চন, নেত্রপ্রসারণ, জঠরদেশের সঞ্চালন, পার্শ্বদেশে হস্তস্থাপন, করতাড়ন, মুখরাগ ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা হাস্যের অভিনয় করণীয়। আচার্য শারদাতনয়ের মতে, হাস্যরসে প্রলয় ব্যতীত সর্ববিধ সাত্ত্বিক ভাবের প্রয়োগ হতে পারে – 'সাত্ত্বিকা হাস্যসম্পত্তৌ সর্বে প্রলয়বর্জিতাঃ' (ভাব.প্র.৩/৩৫)। অবহিত্থা, হর্ষ, উৎসাহ, বিস্ময় ইত্যাদি হাস্যের ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব হল হাস। এই হাস্যরসের দুটি প্রকার – আত্মস্থ ও পরস্থ। যখন কেউ নিজে হাসে, তখন আত্মস্থ; যখন অপরকে হাসানো হয়, তখন পরস্থ – "দ্বিবিধাশ্চায়মাত্মস্থঃ পরস্থশ্চ। যদা স্বয়ং হসতি তদাত্মস্থঃ। যদাপরং হাসয়তি তদা পরস্থঃ" (না.শা. ষষ্ঠ অধ্যায়) । নাট্যশাস্ত্রে অঙ্গগত, বেশগত ও বাক্যগত ভেদে হাস্যের অপর ত্রৈবিধ্যের কথা বলা হয়েছে। ভাবপ্রকাশনে আবার বাচিক, নেপথ্যজ ও আঙ্গিক ভেদে হাস্যের ত্রিবিধ প্রকার স্বীকার করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রমতে হাস্যের বর্ণ শ্বেত, এর অধিষ্ঠাতা দেবতা প্রমথ।

উত্তমাদি পাত্রভেদে হাস্যের ছয়টি ভেদ। স্মিত ও হসিত ভেদে উত্তমপাত্রের হাস্য দুই প্রকার। ঈষদ্বিকশিত গণ্ডস্থল ও সৌষ্ঠবযুক্ত কটাক্ষসহকারে ধীর হাস্যের নাম স্মিত, এতে দন্তরাজি লক্ষিত হয় না। উৎফুল্ল মুখ, নেত্র ও বিকশিত গণ্ডসহ হাস্যের নাম হসিত, এতে দন্ত অল্প লক্ষিত হয়। বিহসিত ও উপহসিত ভেদে মধ্যম পাত্রের হাস্য দ্বিবিধ। আকুঞ্চিত চক্ষু ও গণ্ডস্থল এবং মধুর ধ্বনি সংযুক্ত হাস্যের নাম বিহসিত। বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন এবং স্কন্ধ ও মস্তকের কম্পনযুক্ত হাস্যের নাম উপহসিত। অধম পাত্রদের হাস্য-ও দ্বিবিধ – অপহসিত ও অতিহসিত। অশ্রুপূর্ণ চক্ষু এবং স্কন্ধ ও মস্তকের উৎকম্পনযুক্ত অস্থানে কৃত হাস্যের নাম অপহসিত। সাশ্রু চক্ষু, উদ্ধত ও তীব্র কণ্ঠস্বর এবং পার্শ্বদেশে হস্তস্থাপনপূর্বক হাস্যের নাম অতিহসিত।

নাট্যদর্পণসম্মত হাস্যের এই প্রকারভেদ অবিকল নাট্যশাস্ত্রানুসারী। নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে-ও এক-ইভাবে এগুলির লক্ষণ আলোচিত হয়েছে। দশরূপকে এই ক্রমের সামান্য পরিবর্তন হলে-ও, মূল বক্তব্যটি এক-ই।

স্ত্রীজন এবং নীচপ্রকৃতির ব্যক্তিদের হাস্যরস অধিক পরিমাণে দেখা যায় । নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'স্ত্রীনীচপ্রকৃতাবেষ ভূয়িষ্ঠং দৃশ্যতে রসঃ' (না.শা. ৬/৫১)। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, কেবল হাস্য নয়, করুণ-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভুত – এই চারটি রস-ও স্ত্রী এবং অধমপ্রকৃতির ব্যক্তিদের মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয়। হৃদ্গত ভাব গোপনে বা রোধে অপটু এই সকল অপরিশীলিত ব্যক্তিরা সহজে-ই উল্লিখিত রসগুলির প্রয়োগে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'পামরপ্রায়ঃ সর্বঃ প্রকর্ষেণ হসতি বিভেতি পরনিন্দামাদ্রিয়তে, স্বল্পেনাপি সুভাষিতেন সর্বত্র বিস্ময়তে ইতি'।[১০৬]

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাস্যের প্রয়োগ অতিশয় অমার্জিত ও অরুচিকর। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, শাণিত বিদ্রূপ, বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক ইত্যাদি শীলিত হাস্যরসের প্রয়োগ এখানে প্রায় নেই বললে-ই চলে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', 'মৃচ্ছকটিকম্' ইত্যাদি অঙ্গুলিগণ্য কতিপয় রূপক ব্যতীত আর বিশেষ কোথাও বিদগ্ধ হাস্যরসের যথার্থ উপযোগ পরিলক্ষিত হয় না। অধিকাংশ গ্রন্থে বর্ণিত বিদূষকের বিকৃত অঙ্গভঙ্গি এবং বুদ্ধিহীন, নিরর্থক সংলাপের তথাকথিত হাস্যরসাত্মক অংশগুলি সহৃদয় সামাজিকের চিত্তকে কখনো-ই আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই এদের প্রচার ও প্রসার আবদ্ধ হয়ে পড়ে কেবলমাত্র অল্পধী নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিদের পরিসরে।

নাট্যদর্পণধৃত হাস্যলক্ষণটি বিরূপ সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। এই গ্রন্থে হাস্যরসের উৎপত্তির কারণবিষয়ে বিকৃত বা অনুচিত বেশভূষা, বাক্য ও অঙ্গভঙ্গির উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এগুলির চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ রসের অনৌচিত্যের বিষয়টি অস্পৃষ্ট রয়ে গেছে। অনুচিত বেশভূষাদির দ্বারা হাস্যোদ্রেক হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে; রুচি, মানসিক অবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে এটি একান্তভাবে সামাজিকের ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু শৃঙ্গারাদি রসের অনুচিত প্রয়োগ যে কোনো সহৃদয়ের চিত্তে হাস্যের উদ্রেক করতে বাধ্য। হাস্যের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে রসের অনৌচিত্যের মত সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণটি অনালোচিত থাকায় নাট্যদর্পণসম্মত হাস্যলক্ষণটি অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়।

করুণ রস ঃ

প্রিয়জনের মৃত্যু, বন্ধন, ধননাশ, দিব্য আক্রোশের প্রভাবে অভিশম্পাতবশতঃ ইষ্টবিয়োগ, অনর্থপাত, রাষ্ট্রবিপ্লব ইত্যাদি শোচ্য বিষয়ের দ্বারা করুণরসের উৎপত্তি। বাষ্প, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, নিঃশ্বাস, মুখের শুষ্কভাব, স্মৃতিলোপ, শরীরের বিস্রস্ত অবস্থা, নিজের,অন্যের ও দৈবের প্রতি দোষারোপপূর্বক নিন্দা, রোদন, প্রলাপ, পরিদেবন ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা করুণরসের অভিনয় করণীয়। নির্বেদ, গ্লানি, চিন্তা, ঔৎসুক্য, মোহ, শ্রম, ভয়, বিষাদ, দৈন্য, ব্যাধি, জাড্য, উন্মাদ, অপস্মার, আলস্য, মরণ, স্তম্ভ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি প্রায় সর্ববিধ দুঃখাত্মক ব্যভিচারিভাব করুণরসে প্রযোজ্য। লক্ষণীয় যে, ব্যভিচারিবর্গে উল্লিখিত শেষ পাঁচটি ভাব কিন্তু সাত্ত্বিক ভাব, যেগুলি অনুভাববর্গের অন্তর্গত। অনুভাবের ব্যভিচারিতাপ্রাপ্তির এটি একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। করুণরসের স্থায়িভাব হল শোক।

হাস্যরসের মত করুণরসের পাত্র-ও প্রধানতঃ স্ত্রী ও অধম শ্রেণীর পুরুষগণ। ভাবপ্রকাশনে পাত্রভেদে করুণরসের প্রভাববিষয়ে আলোচনাবসরে বলা হচ্ছে, স্ত্রী ও অধম শ্রেণীর পুরুষদের করুণরসের প্রভাবে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে; মধ্যম শ্রেণীর পাত্ররা মূর্ছিত বা মৃতকল্প হয়ে পড়েন, কিন্তু উত্তম প্রকৃতির পাত্ররা প্রৌঢ়ি ও বিবেকের দ্বারা শোককে সহ্যবেদন করে নিতে সক্ষম হন।

নাট্যশাস্ত্রে করুণরসের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করা হয়েছে – ধর্মহানিজ, (ধন) ক্ষয়জ এবং শোকজ। অন্যদিকে ভাবপ্রকাশনকার করুণরসকে দুটি প্রকারে বিভক্ত করেছেন – মানস করুণ এবং বাচিক করুণ।

নাট্যশাস্ত্রমতে করুণরসের বর্ণ ‘কপোত’ অর্থাৎ ধূসর; এর অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন যমদেব।

রৌদ্র রস ঃ

শস্ত্রাদির দ্বারা প্রচণ্ড প্রহার, গৃহনাশ, ভৃত্যাদির নিধন, মিথ্যাচার, বধ, বন্ধন, বাক্‌পারুষ্য, মাৎসর্য অর্থাৎ পরগুণের প্রতি অসূয়া, দ্রোহ, আধর্ষ অর্থাৎ পত্নী-বিদ্যা-কর্ম-দেশ-জাতি ইত্যাদির নিন্দা, রাজ্যহরণ, ধনহরণ, দুর্নীতি, অন্যায় ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা রৌদ্ররসের উদ্ভব। আঘাত ও প্রত্যাঘাত, ছেদন, ভেদন, রক্তপাত, দন্ত ও ওষ্ঠের পীড়ন, গণ্ডদেশ ও ওষ্ঠের স্ফুরণ, অঙ্গুলিনিষ্পেষণ ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়। রৌদ্ররসের ব্যভিচারিভাবগুলি হল – মোহ, আবেগ, উৎসাহ, অমর্ষ, চাপল, ঔগ্র্য, স্বেদ, বেপথু, রোমাঞ্চ প্রভৃতি। লক্ষণীয়, করুণরসের মত রৌদ্ররসের ক্ষেত্রে-ও, স্বেদাদি সাত্ত্বিকভাব তথা অনুভাবগুলি ব্যভিচারিভাবরূপে পরিগণিত হচ্ছে। রৌদ্ররসের

স্থায়ী ভাব হল ক্রোধ। নাট্যশাস্ত্রাদিমতে, এই রসে রাক্ষস, দানব এবং উদ্ধত প্রকৃতির মানুষদের প্রাধান্য।

নাট্যশাস্ত্রে রৌদ্ররসের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করা হয়েছে – অঙ্গগত, বেশগত এবং বাক্যগত। ভাবপ্রকাশনে 'বেশগত'-র পরিবর্তে 'নেপথ্যজ' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। রৌদ্ররস রক্তবর্ণ, এর অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন রুদ্র।

বীর রস ঃ

পরমণ্ডল আক্রমণের সামর্থ্য, হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিযুক্ত সৈন্যবাহিনী,ধন, ধান্যাদি শস্য, বিশ্বস্ত মন্ত্রী প্রমুখ পরিজন, শারীরিক ক্ষমতা, সামাদি উপায়চতুষ্টয়ের সুপ্রয়োগ, ইন্দ্রিয়জয়, সর্বত্র প্রসারিত যশ, শৌর্যাদি গুণের খ্যাতি, শত্রুবিজেতারূপে প্রসিদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বতঃ যাথার্থ্য নিরূপণের ক্ষমতা ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা বীররসের উৎপত্তি। মহাবিপদে-ও চিত্তস্থৈর্য, অকাতরতা, ধৈর্য, সৈন্যদের উৎসাহদান, শত্রুর প্রতি ক্ষোভ, দান, প্রমোদ, মধ্যস্থতা, প্রশান্ত চেষ্টা ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়। বীররসের ব্যভিচারিভাবগুলি হল – ধৃতি, মতি, গর্ব, আবেগ, ঔগ্র্য, অমর্ষ, স্মৃতি, রোমাঞ্চ প্রভৃতি। লক্ষণীয়, এখানে-ও রোমাঞ্চ নামক অনুভাবটি ব্যভিচারিভাবরূপে গৃহীত। বীররসের স্থায়িভাব হল উৎসাহ। নাট্যশাস্ত্রাদিমতে, এই রসের আশ্রয় হল উত্তমপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ – 'বীরো নাম উত্তমপ্রকৃতিরুৎসাহাত্মকঃ' (না.শা.ষষ্ঠ অধ্যায়)।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, যুদ্ধ-ধর্ম-দান-গুণ-প্রতাপাদি উপাধিভেদে বীররস বহু প্রকারের হতে পারে। নাট্যশাস্ত্রকার মহর্ষি ভরতের মতে বীররস ত্রিবিধ – দানবীর, ধর্মবীর এবং যুদ্ধবীর। দর্পণকার এর সঙ্গে 'দয়াবীর'-কে সংযোজন করে বীররসের চাতুর্বিধ্য স্বীকার করেছেন – 'স চ দানধর্মযুদ্ধৈর্দয়য়া চ সমন্বিতশ্চতুর্ধা স্যাৎ'(সা.দ.৩/২০৬)। অন্যদিকে ভাবপ্রকাশনকার শারদাতনয় আবার যুদ্ধাত্মক, দানাত্মক ও দয়াত্মক ভেদে বীররসের তিনটি প্রকারের কথা স্বীকার করেছেন।

নাট্যশাস্ত্রমতে বীররস গৌরবর্ণ, এর অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন মহেন্দ্র।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে রৌদ্র ও বীররসের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। উভত্র-ই যুদ্ধ এবং উগ্রদীপ্ত আচারাদির প্রাধান্য সত্ত্বে-ও, বীররসের প্রধান ভাব হল উৎসাহ ও ন্যায়সম্মত আচরণ; রৌদ্ররসের প্রধান ভাব হল মোহ, অহঙ্কার ও অন্যায় আচরণ – এই হল উভয়ের পার্থক্য।

ভয়ানক রস ঃ

নাট্যদর্পণধৃত ভয়ানকরসলক্ষণে বলা হচ্ছে –

"পতাকাকীর্তিরৌদ্রাজিশূন্যতস্করদোষজঃ।

ভয়ানকো2ভিনেতব্যঃ স্তম্ভরোমাঞ্চকম্পনৈঃ ॥" (না.দ. ৩/১৭)

– পতাকারূপী কীর্তির দ্বারা যুক্ত প্রচণ্ড সংগ্রাম, স্বরবিকৃতি, পিশাচাদি সত্ত্বদর্শন, পেচকের ভয়, শস্ত্রাঘাত, বধ, বন্ধন, চৌরদর্শন, শূন্য গৃহ, নির্জন অরণ্য, গুরু বা রাজার প্রতি অপরাধ ইত্যাদি বিষয়ের দর্শন, শ্রবণ বা চিন্তনরূপ বিভাবসমূহ থেকে ভয়ানকরসের উৎপত্তি। শরীরের নিশ্চল অবস্থা, স্তম্ভ, হস্তপদাদির কম্পন, মুখ ও দৃষ্টির বিকার, কণ্ঠের শুষ্কভাব, বৈবর্ণ্য, মূর্ছা ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়। এর ব্যভিচারিভাবগুলি হল – শঙ্কা, মোহ, দৈন্য, আবেগ, চপলতা, ত্রাস, অপস্মার, মরণ, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমঞ্চ, বেপথু , স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য ইত্যাদি। এই রসটির ক্ষেত্রে-ও বেশ কয়েকটি সাত্ত্বিকভাব ব্যভিচারিভাবরূপে পরিগণিত হয়েছে। ভয়ানকরসের স্থায়িভাব হল ভয়। হাস্যরসের আলোচনার সময়ে-ই বলা হয়েছে, ভয়ানক রসের আশ্রয় হবে স্ত্রীজন ও অধমপ্রকৃতির পুরুষগণ।

নাট্যশাস্ত্রে ভয়ানকরসের তিনটি প্রকারের কথা বলা হয়েছে – কৃত্রিম বা ছলহেতু, অপরাধজনিত এবং ভয়হেতুক। ভাবপ্রকাশন অনুসারে এই রস দ্বিবিধ – আঙ্গিক ভয়ানক এবং স্বাভাবিক মানস ভয়ানক।

নাট্যশাস্ত্রমতে ভয়ানকরসের বর্ণ কৃষ্ণ, এর অধিষ্ঠাতা দেবতা কাল।

বীভৎস রস ঃ

অহৃদ্য, অপ্রিয়, অপবিত্র ও অনিষ্টকর বিষয়ের দ্বারা বীভৎসরসের উৎপত্তি। মালিন্য, দুর্গন্ধ, কর্কশত্ব ইত্যাদি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির বিকৃতি, শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তির স্তুতিরূপ অপ্রিয় বিষয় প্রভৃতির দর্শন, শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি বীভৎসরসের বিভাব। নিষ্ঠীবন, উদ্বেগ, অঙ্গসংহার, অন্যের দোষখ্যাপন, গাত্রসঙ্কোচন, মুখকুঞ্চন, নাসা ও কর্ণের প্রচ্ছাদন, হৃৎপিণ্ডে বেদনা ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়। ব্যাধি, মোহ, আবেগ, অপস্মার, মরণ প্রভৃতি হল এই রসের ব্যভিচারিভাব। এই রসের স্থায়িভাব হল জুগুপ্সা। বীভৎসরসের-ও আশ্রয় হল স্ত্রীজন ও অধমশ্রেণীর পুরুষগণ।

নাট্যশাস্ত্রে বীভৎস রসের তিনটি প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে – ক্ষোভজ, শুদ্ধ এবং উদ্বেগী। ভাবপ্রকাশনে আবার এই রসের চাতুর্বিধ্য স্বীকার করা হয়েছে – ক্ষোভজ, মানস ক্ষোভজ, আঙ্গিক এবং আঙ্গিক উদ্বেগজ।

নাট্যশাস্ত্রমতে বীভৎস রসের বর্ণ নীল ; এর অধিষ্ঠাতা দেবতা মহাকাল।

অদ্ভুত রস ঃ

শক্র প্রমুখ দিব্য চরিত্রের কার্যকলাপ, মন্ত্রাদি ব্যাপারের দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন, ইন্দ্রজালের দ্বারা অসম্ভব বস্তুপ্রদর্শন, অত্যন্ত মনোজ্ঞ শিল্পকর্ম দর্শন, বাক্য-রূপ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-নৃত্য-গীতাদি মনোহর বিষয়ের উপভোগ, অতিশয় ঈপ্সিত বস্তুবিশেষের প্রাপ্তি ইত্যাদি বিভাব থেকে অদ্ভুতরসের উৎপত্তি। আত্মপ্রসাদ, রোমাঞ্চ, হর্ষ, নয়নবিকাশ, রোমহর্ষ, অনিমেষ দৃষ্টি, বস্ত্র-অঙ্গুলি ইত্যাদির সঞ্চালন, গদ্‌গদ বচন, কম্পন, স্বেদাদি অনুভাবের দ্বারা এই রসের অভিনয় করণীয়। আবেগ, জাড্য, সম্ভ্রম, স্তম্ভ, অশ্রু ইত্যাদি হল এই রসের ব্যভিচারিভাব। লক্ষণীয় , এই রসটির ক্ষেত্রে-ও কয়েকটি সাত্ত্বিকভাব (বা অনুভাব) ব্যভিচারিভাবরূপে গণ্য হয়েছে। অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব হল বিস্ময়। এই রসটি-ও প্রধানতঃ স্ত্রী ও অধমশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

নাট্যশাস্ত্রমতে অদ্ভুত রস দ্বিবিধ – দিব্য এবং আনন্দোত্থ। ভাবপ্রকাশনমতে, মানস, বাচিক ও আঙ্গিক ভেদে এই রসের তিনটি প্রকার।

নাট্যশাস্ত্র অনুসারে অদ্ভুতরসের বর্ণ পীত; এর অধিষ্ঠাতা দেবতা ব্রহ্মা।

শান্ত রস ঃ

নাট্যদর্পণসম্মত শান্তরসের লক্ষণটি হল–

“সংসারভয়বৈরাগ্যতত্ত্বশাস্ত্রবিমর্শনৈঃ।

শান্তো2ভিনয়নং তস্য ক্ষমাধ্যানোপকারতঃ ॥” (না.দ.৩/২০)

– দেব, মনুষ্য, নারকী, তির্যগ্‌যোনি ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বারংবার আবর্তনের ভয়, বিষয়ভোগের প্রতি বৈমুখ্য, পাপ-পুণ্যাদির অতিরিক্ত একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মের অন্বেষণ, মোক্ষপ্রতিপাদক বিভিন্ন শাস্ত্রের বারংবার অধ্যয়নের দ্বারা চিত্তে সেগুলির ন্যাস ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা শান্তরসের উৎপত্তি। সাহিত্যদর্পণে নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকোদ্ধারপূর্বক বলা হচ্ছে – যেখানে কোনো দুঃখ নেই, চিন্তা নেই, দ্বেষ বা রাগ নেই, কোনো ইচ্ছা নেই, সর্বত্র সর্বভাবে সমজ্ঞান বিরাজিত, মুনীন্দ্র ভরত তাকে-ই শান্তরস নামে অভিহিত করেছেন।

তর্জন-বধ-বন্ধনাদির পরে-ও কৃতকর্মাকে ক্ষমা, জীব ও অজীবের তত্ত্বচিন্তনাত্মক ধ্যান, নিশ্চল দৃষ্টি, পরোপকার, মৈত্রী, কারুণ্য, প্রমোদ, মধ্যস্থতা ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়। নির্বেদ, স্মৃতি, মতি, ধৃতি প্রভৃতি হল শান্তরসের ব্যভিচারিভাব।

শান্তরসের স্থায়িভাবপ্রসঙ্গে আলঙ্কারিকদের মধ্যে বহুপ্রকার বৈমত্য বিদ্যমান। নাট্যদর্পণমতে, কাম-ক্রোধ-লোভ-মান-মায়াদি থেকে উদ্ভূত যাবতীয় অনুরক্তির বিবর্জনের পর সমাহিত ও অক্লিষ্ট চিত্তে উদ্রিক্ত 'শম' শান্তরসের স্থায়িভাব। দর্পণকার-ও শমকে-ই শান্তরসের স্থায়িভাব বলে স্বীকার করেছেন – 'শান্তঃ শমস্থায়িভাবঃ' (সা.দ. ৩/২১০)।

আচার্য মম্মট নির্বেদকে শান্তরসের স্থায়িভাব রূপে স্বীকার করেছেন – 'নির্বেদস্থায়িভাবো2পি শান্তো2পি নবমঃ রসঃ' (কা. প্র. চতুর্থ উল্লাস)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দশরূপককার আচার্য ধনঞ্জয় নির্বেদকে শান্তরসের স্থায়িভাবরূপে স্বীকার করলে-ও, অন্য কোনো স্থায়িভাব-ও যে শান্তরসের স্থায়িভাবরূপে গণ্য হতে পারে, এই মত-ও পোষণ করেছেন। দশরূপকের চতুর্থ প্রকাশের ষট্‌ত্রিংশসংখ্যক শ্লোকে ব্যবহৃত 'নির্বেদাদি' পদটির মাধ্যমে তাঁর এই অভিমতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে শার্ঙ্গদেব বিরচিত 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আচার্য শার্ঙ্গদেবের মতে, বিবিধ প্রকার স্থায়িভাব থেকে শান্তরসের উদ্ভব হতে পারে –

১. নির্বেদ – পূর্ব-পূর্ব জন্মে মোক্ষলাভের উপযোগী কোনো চেষ্টা না করার কারণে ইহজন্মে উদ্ভূত ক্ষোভ, পশ্চাত্তাপ, বৈমনস্যাদির নাম নির্বেদ; এ থেকে-ই শান্তরসের উৎপত্তি
২. জুগুপ্সা – জাগতিক বিষয়াদির ভোগসুখের প্রতি তীব্র বিরাগ থেকে শান্তরসের উৎপত্তি
৩. উৎসাহ – সাধনচতুষ্টয়ের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যমের পরিণতিতে শান্তরসের উৎপত্তি
৪. শম – সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ব্যাপার থেকে নিবৃত্তির দ্বারা শান্তরসের উৎপত্তি
৫. উল্লিখিত ভাবচতুষ্টয়ের সম্মিলিত ফলরূপে শান্তরসের উৎপত্তি।[১০৭]

আচার্য আনন্দবর্ধনের মতে, সর্বপ্রকার ভোগতৃষ্ণার বিনাশের দ্বারা উৎপন্ন 'তৃষ্ণাক্ষয়সুখ' শান্ত রসের স্থায়িভাব – 'শান্তশ্চ তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্য যঃ পরিপোষস্তল্লক্ষণো রসঃ প্রতীয়ত এব' (ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত)। দর্পণকার-ও তাঁর গ্রন্থে তৃষ্ণাক্ষয়সুখের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীতে কামসুখ ও দিব্যসুখ রূপে কথিত সুখগুলি তৃষ্ণাক্ষয়রূপ সুখের ষোড়শকলার একভাগ-ও নয় –

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ ।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥"(সা.দ. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

পার্থিব বিষয়সম্ভোগের যাবতীয় ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিনষ্টিরূপ এই মানসিক স্থিতি থেকে-ই শান্তরসের উৎপত্তি।

শান্তরসের আলোচনার অন্তিমে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে, কোনো-কোনো আচার্য ব্যাপারবহুল নাটকাদি রূপকে চেষ্টাবিবর্জিত, ইচ্ছাপরাঙ্মুখ এই শান্তরসকে স্বীকার করেন না। নাট্যে শান্তরসের গ্রহণযোগ্যতাবিষয়ক বিতর্কের বিশদ আলোচনা পূর্বে-ই করা হয়েছে, পুনরুক্তিভয়ে এখানে আর সেই অবতারণা করা হল না।

বিরোধী রসসমূহের ব্যবহার ঃ

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, কাব্যাদির প্রকৃত অনুভবকে পরিস্ফুট করার এবং সেটিকে সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়গোচর করার একমাত্র উপায় হল রসসমূহের যথাযথ সন্নিবেশ। বলা বাহুল্য যে, এই সন্নিবেশ বিষয়ে কবির অত্যন্ত সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়; অন্যথায় কাব্য তার কাঙ্ক্ষিত রসময়তা লাভ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলিতে কবির বিশেষ অবধানের প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম হল বিরোধী রসের ব্যবহার। কাব্যমধ্যে বিরোধী রসসমূহের প্রয়োগ কদাচ অভিপ্রেত নয়। কারণটি সহজবোধ্য। রসবিশেষের সঙ্গে তার বিরুদ্ধ রসটি-ও সন্নিবেশিত করলে দুটির-ই রসহানির সমূহ আশঙ্কা থাকে। তাই কাব্যরচনাকালে কবি বিরোধী রসসমূহের প্রয়োগকে যথাসম্ভব যত্নসহকারে পরিহার করার চেষ্টা করবেন।

সাহিত্যদর্পণে নির্ধারিত বিরোধিরসের তালিকাটি হল –

রস	বিরোধিরস
১. শৃঙ্গার	করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক
২. হাস্য	করুণ, ভয়ানক, রৌদ্র
৩. করুণ	হাস্য, শৃঙ্গার
৪. রৌদ্র	হাস্য, শৃঙ্গার, ভয়ানক
৫. বীর	শান্ত, ভয়ানক
৬. ভয়ানক	শান্ত, শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, হাস্য
৭. বীভৎস	শৃঙ্গার
৮. শান্ত	বীর ,ভয়ানক

উল্লেখ্য, ধ্বন্যালোক, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যানুশাসনাদি গ্রন্থে এবং তদনুসারে আমাদের নাট্যদর্পণ গ্রন্থে-ও শান্ত ও শৃঙ্গারকে পরস্পর বিরোধিরসরূপে পরিগণিত করা হয়েছে।

যাই হোক্, নাট্যদর্পণের অধুনা ব্যাখ্যেয় বিষয়টি বিরোধিরসের প্রয়োগজনিত ত্রুটির আলোচনা নয়; বরং কিভাবে প্রয়োগ করলে বিরোধিরসগুলি তাদের অন্তর্লীন বিরোধ পরিত্যাগপূর্বক রসোৎপত্তির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে, তার আলোচনা। প্রসঙ্গতঃ বলা হচ্ছে, প্রধানতঃ তিনটি প্রকারে রসবিরোধ প্রকটিত হয় –

প্রথমতঃ, যখন দুটি রস একাশ্রয় হয়,

দ্বিতীয়তঃ, যখন দুটি রস স্বতন্ত্র হয় এবং

তৃতীয়তঃ, যখন দুটি রস সমান কাব্যগুণসম্পন্ন অর্থাৎ তুল্যবল হয়।

অতএব এই বিষয়গুলি পরিহার করতে পারলে কাব্যকে বিরোধিরসের প্রয়োগজনিত দোষ থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

বিরুদ্ধ রসসমূহ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিরোধ পরিত্যাগ করে, এ বিষয়ে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনাচার্যের মতটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয় –

"বিবক্ষিতে রসে লব্ধপ্রতিষ্ঠে তু বিরোধিনাম্ ।

বাধ্যানামঙ্গভাবং বা প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলা ॥" (ধ্বন্যালোক, ৩/২০)

– বিরোধী বস্তুসমূহ বিরোধরহিত হয় তখন, যখন বিবক্ষিত রস পরিপুষ্ট হয় অথবা বিরোধী বস্তুসমূহ পরিপোষপ্রাপ্ত বিবক্ষিত রসের বশীভূত হয় অথবা বিরোধী রসগুলি প্রস্তাবিত রসের অঙ্গভাব লাভ করে। সমাসতঃ, বিরোধী বস্তুসমূহ যখন সর্বপ্রকারে প্রস্তাবিত রসের পরিপুষ্টিসাধনে সহায়তা করে, তখন রসবিরোধ অবলুপ্ত হয়। বশীভূত ব্যক্তি যেমন বশকারী প্রভুর সন্তোষবিধানে ও সেবায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করে, অঙ্গ যেমন অঙ্গীর অনুবর্তী হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে বিরোধিরসগুলি-ও প্রস্তাবিত রসের সঙ্গে সেই সম্পর্কে অবস্থান করে। ফলে রসবিরোধ তিরোহিত হয় এবং অঙ্গীরস-ই সর্বতোভাবে পরিপুষ্ট হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, দর্পণকার-ও এবিষয়ে প্রায় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, বিরোধিরসের স্মরণ হলে অথবা সাদৃশ্যসহকারে বর্ণিত হলে অথবা কোনো অঙ্গীরসের অঙ্গভূত হলে, এদের পারস্পরিক বিরোধ থাকে না –

"বিরোধিনো2পি স্মরেণ সাম্যেন বচনে2পি বা।

ভবেদ্বিরোধো নান্যোন্যমঙ্গিন্যঙ্গত্বমাপ্তয়োঃ ॥" (সা.দ.৭/৩০)

এবার রসবিরোধের অবসানকল্পে নাট্যদর্পণে যে নির্দেশগুলি দেওয়া হয়েছে, আমরা একে-একে সেগুলির প্রতি আলোকপাত করবো।

যে সকল রস এক আশ্রয়ে থাকলে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাদের 'বিরুদ্ধৈকাশ্রয়' বলা হয়। এরূপ বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ত্বহেতু যে রস প্রস্তাবিত বা স্থায়ী রসের বিরোধী হয়, তাকে ভিন্ন আশ্রয়ে সন্নিবিষ্ট

করা উচিৎ। এইভাবে এইরকম ক্ষেত্রে বিরোধিরসের প্রয়োগজনিত দোষ পরিহার করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে আনন্দবর্ধনাচার্যবিরচিত 'অর্জুনচরিত' কাব্য থেকে অর্জুনের পাতালাবতরণ প্রসঙ্গে রচিত একটি শ্লোক উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে উপন্যস্ত করা হয়েছে –

"সমুত্থিতে ধনুর্ধ্বনৌ ভয়াবহে কিরীটিনঃ ।

মহানুপপ্লবো2ভবৎ পুরে পুরন্দরদ্বিষাম্ ॥"

– উদাহৃত শ্লোকটিতে বীর ও ভয়ানক – এই বিরুদ্ধ রসদ্বয়ের একাশ্রয়ে অবস্থান পারস্পরিক বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করে; কারণ কোনো ব্যক্তি যুগপৎ বীর ও ভীরু হতে পারেন না। তাই এক্ষেত্রে দোষপরিহারমানসে দুটি রসকে দুটি ভিন্ন আশ্রয়ে স্থাপিত করা হয়েছে। বীরভাব নায়ককে আশ্রয় করেছে এবং ভয়ানকভাব প্রতিনায়ককে আশ্রয় করেছে। এইভাবে উদাহৃত শ্লোকে একাশ্রয়ত্ববশতঃ যে বিরুদ্ধতার সম্ভাবনা ছিল, তা পরিহার করা সম্ভব হয়েছে।

বিরুদ্ধৈকাশ্রয়দোষ বর্জনবিষয়ে ধ্বনিকার-ও এক-ই অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি-ও নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিরুদ্ধ রসগুলিকে একাশ্রয়ে সন্নিবেশ না করে , ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে সেগুলির স্থাপন করলে এদের বিরোধ বর্জন করা যেতে পারে –

"বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ো যস্তু বিরোধী স্থায়িনো ভবেৎ।

স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কার্যস্তস্য পোষে2প্যদোষতা ॥"(ধ্বন্যালোক ,৩/২৫)

কাব্যপ্রকাশকার মম্মটাচার্য-ও এক-ই মর্মে মন্তব্য করেছেন –'আশ্রয়ৈক্যে বিরুদ্ধো যঃ স কার্যো ভিন্নসংশ্রয়ঃ' (কা.প্র. ৭/৬৪) ।

ধ্বন্যালোকে একটি পূর্বপক্ষের অবতারণাপূর্বক বলা হচ্ছে, উক্ত নিয়মানুসারে যদি প্রতিনায়কগত ভাবটি পরিপুষ্টি লাভ করে, তবে সেই পরিপুষ্টি কি দোষের হবে? উত্তরে ধ্বনিকার বলছেন – এরূপ পরিপুষ্টি দোষের কারণ তো হবে-ই না, বরং বিপরীতক্রমে নায়কের বীরত্বাদি উৎকর্ষকে ধ্বনিত করার কারণে কাব্যে এজাতীয় বিরোধিরসের পরিপোষ-ই কাম্য। প্রতিনায়কগত বিরুদ্ধভাবের পরিপুষ্টি না হলে-ই বরং তা দোষের হয়ে থাকে। কারিকাধৃত 'পোষে2প্যদোষতা' অংশের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্য তাই স্পষ্টভাবে বলেছেন – "তস্য বিরোধিনো2পি তথাকৃতস্য তথানিবদ্ধস্য পরিপুষ্টতায়াঃ প্রত্যুত নির্দোষতা নায়কোৎকর্ষাধানাৎ। অপরিপোষণন্তু দোষ এব" (ধ্বন্যালোকলোচনটীকা, তৃতীয় উদ্দ্যোত)। কাব্যপ্রকাশের সংশ্লিষ্ট অংশে 'বালবোধিনী' টীকায় উদ্দ্যোতের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে – "উৎসাহাতিশয়বান্ বীরঃ। ন হি তত্র ভয়সংভবঃ । প্রতিপক্ষে তু ভয়নিবন্ধো নায়কপরাক্রমাতিশয়ায়েতি বীরস্য পরিপোষঃ" (কা. প্র. সপ্তম উল্লাস)।

বিরুদ্ধৈকাশ্রয় রসগুলিকে ভিন্ন আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করতে হবে, নাট্যদর্পণে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত একটি বিষয়ের প্রতি-ও নির্দেশ করা হয়েছে। নাট্যদর্পণকারদের মতে, ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক বিরুদ্ধরস কোনোরূপ বিরোধ ব্যতিরেকে-ও একাশ্রয়ে অবস্থান করতে পারে, যদি সেই রসগুলির প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। এপ্রসঙ্গে বৃত্তিতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে –

"দন্তক্ষতানি করজৈশ্চ বিপাটিতানি
প্রোদ্‌ভিন্নসান্দ্রপুলকে ভবতঃ শরীরে।
দত্তানি রক্তমনসা মৃগরাজবধ্বা
জাতস্পৃহৈর্মুনিভিরপ্যবলোকিতানি ॥"

– প্রেয়সীর দ্বারা কৃত দন্তক্ষতাদিদর্শনে কামুক ব্যক্তির চিত্তে যেমন পুলকোদ্‌গম ঘটে, তেমনিভাবে পরার্থে নিবেদিতপ্রাণ মুনি প্রমুখ সজ্জনদের চিত্ত স্বীয় শরীরে পরোপকারার্থে উৎপন্ন সিংহীর দংশনাদি চিহ্নদর্শনে-ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে – এই হল শ্লোকের ভাবার্থ । অঙ্গাঙ্গীরূপে সম্পৃক্ত দুই শ্লোকার্ধে যথাক্রমে শৃঙ্গার ও শান্ত – এই দুটি বিরুদ্ধ রসের সহাবস্থান ঘটেছে। কিন্তু কামুক এবং মুনি ভেদে পরিপ্রেক্ষিত দুটি ভিন্ন হওয়ার কারণে, বিরোধিরসের প্রয়োগজনিত দোষ এক্ষেত্রে পরিহার করা সম্ভব হয়েছে।

রসবিরোধপরিহারার্থে নাট্যদর্পণের পরবর্তী নির্দেশে বলা হচ্ছে, একাধিক বিরুদ্ধ রস একাশ্রয় হলে-ও, যেকোনো একটিকে স্বতন্ত্র এবং অপরটিকে তৎপরতন্ত্ররূপে সন্নিবিষ্ট করতে হবে অথবা দুটি বিরুদ্ধ রসকে-ই অন্য কোনো রস বা ভাবের দ্বারা গুণীভূত হতে হবে – এই প্রকারে রসসন্নিবেশ করলে বিরুদ্ধ রসগুলির বিরোধ প্রকটিত হতে পারবে না। কাব্যপ্রকাশকার-ও এবিষয়ে এক-ই অভিমত পোষণ করেছেন –

"স্মর্যমাণো বিরুদ্ধোঽপি সাম্যেনাথ বিবক্ষিতঃ।
অঙ্গিন্যঙ্গত্বমাপ্তৌ যৌ তৌ ন দুষ্টৌ পরস্পরম্ ॥" (কা. প্র. ৭/৬৪)

ক্রমিক উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে –

"কুরবক! কুচাঘাতক্রীড়াসুখেন বিযুজ্যসে
বকুলবিটপিন্ ! স্মর্তব্যং তে মুখাসবসেচনম্ ।
চরণঘটনাশূন্যো যাস্যস্যশোক! সশোকতাম্
ইতি নিজপুরত্যাগে যস্য দ্বিষাং জগদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥"

– উদাহৃত শ্লোকে কুরবকাদি উদ্দীপনবিভাবের দ্বারা শৃঙ্গাররসের উদ্বোধ ঘটেছে। কিন্তু এই শৃঙ্গাররস প্রকৃতপক্ষে শত্রুপক্ষের স্ত্রীসম্বন্ধীয় করুণ রসকে-ই পরিপোষ দান করেছে। অর্থাৎ এই শ্লোকে অঙ্গী হল করুণ, শৃঙ্গার তার অঙ্গ; করুণ হল স্বতন্ত্র, শৃঙ্গার তৎপরতন্ত্র; অতএব করুণ প্রধান, শৃঙ্গার গৌণ। এরূপ রসবিন্যাসের কারণে এখানে শৃঙ্গার এবং করুণ – এই দুটি বিরুদ্ধ রসের বিরোধ বর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল –

“ অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দনঃ ।

নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ ॥”

– নিহত ভূরিশ্রবার পতিত বাহুদর্শনে তাঁর কান্তাদের বিলাপাত্মক খেদোক্তি এটি। এখানে আলম্বনবিভাব নায়কের মৃত্যুর ফলে রতি শৃঙ্গাররসত্ব লাভ করেনি। কিন্তু স্মরণপথে উদিত তাঁর হস্ত রূপ অঙ্গ শোকোদ্দীপক বিভাব ও অনুভাব রূপে করুণরসের আনুকূল্য করছে।শুধু তাই নয়, শৃঙ্গারের দ্বারা সংযোজিত হওয়ার কারণে প্রধান বাক্যার্থরূপে গৃহীত এই করুণরস অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করেছে। কারণ, স্বভাবতঃ মধুর পদার্থসমূহ শোচনীয়তা প্রাপ্ত হলে, তাদের পূর্বাবস্থার বিলাসসমূহ যখন স্মরণ করা হয়, তখন তাদের শোকাবেশ অধিকতর রূপে প্রতিভাত হয়। প্রসঙ্গতঃ ধ্বনিকারের বক্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে – “..... বাক্যার্থীভূতস্যাপি কস্যচিৎ করুণরসবিষয়স্য তাদৃশেন শৃঙ্গারবস্তুনা ভঙ্গিবিশেষাশ্রয়েণ সংযোজনং রসপরিপোষায়ৈব জায়তে। যতঃ প্রকৃতিমধুরাঃ পদার্থাঃ শোচনীয়তাং প্রাপ্তাঃ প্রাগবস্থাভাবিভিঃ সংস্মর্যমাণৈর্বিলাসৈরধিকতরং শোকাবেশমুপজনয়ন্তি” (ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত)। বৃত্তির অন্তর্গত ‘ভঙ্গিবিশেষাশ্রয়েণ’ পদটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শৃঙ্গাররসকে করুণরসের পরিপোষক অঙ্গ হতে হলে, করুণরসের সঙ্গে এর সংযোজন হতে হবে বিশেষ ভঙ্গিকে আশ্রয় করে, গ্রাম্যতাদোষবিবর্জিত রূপে। লোচনটীকায় গুপ্তপাদ ‘ভঙ্গিবিশেষ’ শব্দটির এইরূপ-ই ব্যাখ্যা করেছেন – ‘ভঙ্গিবিশেষেতি। অগ্রাম্যতয়া বিভাবানুভাবাদিরূপতাপ্রাপণয়া গ্রাম্যোক্তিরহিতয়েত্যর্থঃ’ (ধ্বন্যালোকলোচনটীকা, তৃতীয় উদ্দ্যোত)।

নাট্যদর্পণধৃত পরবর্তী উদাহরণটি হল –

“ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহতো2প্যাদদানো2শুকান্তং

গৃহ্ন্ কেশেষ্বপাস্তশ্চরণনিপতিতো নেক্ষিতঃ সংভ্রমেণ।

আলিঙ্গন্ যো2বধূতস্ত্রিপুরযুবতিভিঃ সাশ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ

কামীবার্দ্রাপরাধঃ স দহতু তুরিতং শাম্ভবো বঃ শরাগ্নিঃ ॥”

– উল্লিখিত শ্লোকে কবির অভিপ্রেত ভগবদ্বিষয়ক রতি প্রধান। তার পরিপোষক হচ্ছে মহাদেবের ত্রিপুরধ্বংসে উৎসাহ। এটি অপরিপুষ্ট হওয়ার কারণে রসত্ব প্রাপ্ত হয়নি, অতএব এটি ভাবমাত্ররূপে করুণরসের অঙ্গ হয়েছে। 'কামীব ' – এই শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য প্রদর্শিত হওয়ায় শৃঙ্গাররসের-ও আবির্ভাব ঘটেছে। করুণরসের বিশ্রান্তি না হওয়ায় করুণরসের-ও অঙ্গতা সাধিত হয়েছে। উক্ত উদাহরণের ব্যাখ্যাবসরে কাব্যপ্রকাশের বালবোধিনীটীকায় প্রাঞ্জলরূপে বলা হয়েছে – 'যদ্যপি শৃঙ্গারাপেক্ষয়া করুণো2ঙ্গী তথাপি তত্র প্রকর্ষপর্যাবসানং নাস্তি তেনাপি ভাবপ্রকর্ষণাদিত্যঙ্গমেব তদিতি তাৎপর্যম্'(কা.প্র.সপ্তম উল্লাস)। সুতরাং করুণ ও শৃঙ্গার উভয় রস-ই ভগবদ্বিষয়ক রতিকে উৎসাহভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট করে তার আস্বাদের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেছে। এইভাবে এই উদাহরণে শৃঙ্গার ও করুণ উভয় রস-ই উৎসাহ নামক ভাবের দ্বারা গুণীভূত ও অঙ্গভূত হওয়ার কারণে, বিরুদ্ধ রসদ্বয়ের একাশ্রয়ে সন্নিবেশ সত্ত্বে-ও কোনোরূপ রসবিরোধ উৎপন্ন হয়নি। নাট্যদর্পণে একটি সুন্দর উদাহরণযোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজার সম্মুখে তাঁর প্রভাববশতঃ জিঘাংসু ব্যক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরকে হত্যা করতে পারে না, যেন তেমনিভাবে উল্লিখিত শ্লোকে রাজস্বরূপ উৎসাহভাবের কাছে করুণ ও শৃঙ্গার– এই দুই বিরোধী রস নিজ-নিজ বিরোধ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে – 'নৃপসমীপস্থিতাততায়িদ্বয়বৎ কুতঃ করুণশৃঙ্গারয়োর্ঘাত্যঘাতকভাব ইতি'।[১০৮]

রসবিরোধপরিহারার্থে নাট্যদর্পণের পরবর্তী কল্পে বলা হয়েছে, দুটি বিরুদ্ধ রস একাশ্রয় হলে-ও, দুটি তুল্যবল না হলে কোনো বিরোধ উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ একাশ্রয়ে সন্নিবিষ্ট দুটি বিরুদ্ধরসের একটি হবে অধিকবলযুক্ত এবং অপরটি হবে অপেক্ষাকৃত অল্পবলশালী। ভাষান্তরে, বিবক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত রসটির তুলনায় তার বিরোধিরসটিকে হীনবলরূপে প্রযুক্ত হতে হবে। ধ্বনিকার-ও বলেছেন যে, অঙ্গীরসের তুলনায় বিরোধী অঙ্গরসের ন্যূনতা সম্পাদন করা প্রয়োজন; যেমন শান্ত রস অঙ্গী হলে শৃঙ্গাররসের কিংবা শৃঙ্গাররস অঙ্গী হলে শান্তরসের – 'বিরোধিনস্তু রসস্যাঙ্গিরসাপেক্ষয়া কস্যচিন্ন্যনতা সম্পাদনীয়া, যথা শান্তে2ঙ্গিনি শৃঙ্গারস্য শৃঙ্গারে বা শান্তস্য' (ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত) । প্রাসঙ্গিক উদাহরণরূপে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি নাট্যদর্পণে উপন্যস্ত হয়েছে –

''ক্বাকার্যং শশলক্ষ্মণঃ ক্ব চ কুলং ভূয়ো2পি দৃশ্যেত সা
দোষাণাং প্রশমায় মে শ্রুতমহো কোপে2পি কান্তং মুখম্ ।
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নে2পি সা দুর্লভা
চেতঃ স্বাস্থ্যমুপৈহি কঃ খলু যুবা ধন্যো2ধরং পাস্যতি॥''

– উল্লিখিত শ্লোকে শান্ত এবং শৃঙ্গার – এই বিরুদ্ধরসদ্বয়ের একত্র সন্নিবেশ ঘটেছে। রস দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এরা তৃতীয় কোনো রস বা ভাবের দ্বারা গুণীভূত-ও হয়নি। তৎসত্ত্বে-ও এই শ্লোকটিতে রসবিরোধজনিত কোনো দোষ অনুভূত হয় না। তার কারণ, শান্তরস এখানে আগন্তুকমাত্র, এর পরিসর অত্যল্প; অতএব এটি অল্পবলশালী। তুলনায় এই শ্লোকের বাক্যার্থভূত প্রধান রস শৃঙ্গারের পরিসর অনেক বেশি, অতএব তা অধিকবলযুক্ত । এইভাবে হীনাধিকবলযুক্তরূপে প্রয়োগের কারণে শান্ত ও শৃঙ্গার– এই বিরুদ্ধ রসদ্বয় তুল্যবলরূপে প্রতিভাত হয়নি এবং এদের অন্তর্লীন বিরোধ-ও পরিস্ফুট হওয়ার অবকাশ লাভ করেনি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় আচার্য অভিনবগুপ্ত ঔৎসুক্যের দ্বারা বিতর্ক, স্মৃতির দ্বারা মতি, দৈন্যের দ্বারা শঙ্কা এবং চিন্তার দ্বারা ধৃতি – এইসকল ব্যভিচারিভাবের পরস্পরবাধকতার প্রতি নির্দেশ করেছেন – 'ক্বাকার্যমিতি বিতর্ক ঔৎসুক্যেন মতিঃ স্মৃত্যা শঙ্কা দৈন্যেন ধৃতিশ্চিন্তয়া চ বাধ্যতে' (ধ্বন্যালোকলোচনটীকা, তৃতীয় উদ্দ্যোত)। উল্লিখিত শ্লোকটির আলোচনায় সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে যে, এখানে শৃঙ্গারসের অঙ্গভূত ঔৎসুক্য, স্মৃতি, দৈন্য ও চিন্তার দ্বারা শান্তরসের অঙ্গভূত বিতর্ক, মতি, শঙ্কা ও ধৃতির তিরস্কার হওয়ায় শেষ অবধি চিন্তাপ্রধান আস্বাদের উৎকর্ষ অনুভূত হয়েছে –'অত্র প্রশমাঙ্গানাং বিতর্কমতিশঙ্কাধৃতীনামভিলাষাঙ্গৌৎসুক্যস্মৃতিদৈন্যচিন্তাভিস্তিরস্কারঃ পর্যন্তে চিন্তা-প্রধানমাস্বাদপ্রকর্ষমাবির্ভাবয়তি' (সা. দ. সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

রসবিরোধনিবারণকল্পে নাট্যদর্পণের অন্তিম সমাধানে বলা হচ্ছে, যে সকল রস একাশ্রয়ে বিরোধশূন্য, কিন্তু নিরন্তর সমাবেশবশতঃ বিরোধযুক্ত, তাদেরকে অন্যরসের ব্যবধানপূর্বক সন্নিবিষ্ট করতে হবে। এমন দুটি রস থাকতে পারে, যারা একাশ্রয়ে থাকলে দোষাবহ হয় না, কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান না থাকলে তা দোষের কারণ হতে পারে। যেমন – শৃঙ্গারের সঙ্গে শান্তর যুগপৎ সন্নিবেশে দোষের উৎপত্তি হতে পারে। সেই দোষ পরিহার করতে হলে উক্ত রসদ্বয়ের মধ্যে উভয়ের অবিরোধী তৃতীয় একটি রসকে সন্নিবেশিত করে, উক্ত বিরুদ্ধ রসদ্বয়কে অভিব্যঞ্জিত করে তুলতে হবে।

আনন্দবর্ধনাচার্য প্রাসঙ্গিক বিষয়টিতে অবিকল অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন –

"একাশ্রয়ত্বে নির্দোষো নৈরন্তর্যে বিরোধবান্।
রসান্তরব্যবধিনা রসো ব্যঙ্গ্যঃ সুমেধসাম্ ॥"(ধ্বন্যালোক ,৩/২৬)

–একাশ্রয়ে অবস্থান করলে যে বিরোধিরসগুলি দোষশূন্য হয়, কিন্তু নিরন্তর সমাবেশবশতঃ বিরোধী হয়ে থাকে, সুপণ্ডিত ব্যক্তি মধ্যে অন্য রসের ব্যবধান রচনা করে সেই রসকে ব্যঞ্জিত করবেন । কাব্যপ্রকাশকার মম্মটাচার্য-ও এক-ই মর্মে মন্তব্য করেছেন – 'রসান্তরেণান্তরিতো নৈরন্তর্যেণ যো

রসঃ'(কা.প্র.৭/৬৪)। বোধসৌকর্যার্থে বালবোধিনীটীকায় উদ্দ্যোতের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে – 'যস্য তু যেন রসেন নৈরন্তর্যেণ বিরোধঃ সো2বিরোধিনা রসান্তরেণান্তরিতো নিবদ্ধব্যঃ' (কা.প্র. সপ্তম উল্লাস)।

নাট্যদর্পণে এই প্রসঙ্গে নাগানন্দের প্রথমাঙ্কের অংশবিশেষ উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে। নায়ক জীমূতবাহনের 'রাগস্যাস্পদমিত্যবৈমি ন হি মে ধ্বংসীতি ন প্রত্যয়ঃ' ইত্যাদি উক্তিতে শান্ত রসের প্রকাশ ঘটেছে। এর ফলে (মলয়বতী নাম্নী) নায়িকানিষ্ঠ শৃঙ্গাররসের বিরোধের আশঙ্কা উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু 'অহো গীতমহো বাদিত্রম্' ইত্যাদি উক্তির দ্বারা উক্ত বিরুদ্ধ রসদ্বয়ের মধ্যে উভয়ের অবিরোধী অদ্ভুতরসের সন্নিবেশের দ্বারা নৈরন্তর্য্যদোষ পরিহার করা সম্ভব হয়েছে এবং শান্ত ও শৃঙ্গার – এই বিরুদ্ধ রসদ্বয়ের একাশ্রয়ত্বে-ও কোনো বিরোধ উৎপন্ন হয়নি।

নাট্যদর্পণধৃত বিরোধিরসসংক্রান্ত আলোচনা এই পর্যন্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিরোধ পরিহারপূর্বক বিরুদ্ধ রসসমূহের ব্যবহারবিষয়ে প্রথম সুসম্বদ্ধ আলোচনার গৌরব আচার্য আনন্দবর্ধনের। পরবর্তীকালে আচার্য মম্মট-ও তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। কাব্যপ্রকাশের অনুসরণে 'কাব্যানুশাসন'প্রণেতা আচার্য হেমচন্দ্র এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। নাট্যদর্পণধৃত বিরোধিরসের আলোচনায় উক্ত আচার্যদের অভিমতের প্রভাব ও আধমর্ণ্য সবিশেষ লক্ষণীয়।

রসদোষ ঃ

নাট্যদর্পণের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হল রসদোষ। এবিষয়ে নাট্যদর্পণের প্রাসঙ্গিক কারিকাটি হল – 'দোষো2নৌচিত্যমঙ্গৌগ্র্যমপোষো2ত্যুক্তিরঙ্গিভিৎ'(না.দ. ৩/২৩) – অনৌচিত্য, অঙ্গরসের 'ঔগ্র্য' অর্থাৎ অতিবিস্তার, অঙ্গীরসের পরিপোষের অভাব, প্রাসঙ্গিক রসের অত্যধিক বর্ণন ইত্যাদি বিষয় রসদোষের সৃষ্টি করে।

রসদোষসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য হল অনৌচিত্য। কবির মুখ্য কর্ম হল রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে কাব্যে বাচ্য ও বাচকের, অর্থ ও শব্দের নিবন্ধন। এই উপযোগিতাবিধানের জন্য কবিকে যে নিয়মটি মান্য করে চলতে হয়, অলঙ্কারশাস্ত্রে তাকে-ই 'ঔচিত্য' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কোনো রচনায় রস উৎকর্ষলাভ করেছে, না রসভঙ্গ হয়েছে – তা বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হল সেই রচনা সর্ববিষয়ে ঔচিত্যের

নিয়ম অনুসরণ করেছে কিনা, তার অনুসন্ধান। এপ্রসঙ্গে ধ্বনিকারের অভিমতটি বিশেষভাবে স্মরণীয় –

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্ ।

প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা ॥"(ধ্বন্যালোক, ৩/১৫)

প্রসিদ্ধি অনুসারে ঔচিত্যবন্ধের বিন্যাস-ই রসবিষয়ে শ্রেষ্ঠ নির্দেশক। বেদ ও উপনিষদাদি যেমন সকল কর্মের নির্দেশক ,পরা ও অপরা বিদ্যার পথপ্রদর্শক, তেমনি এই ঔচিত্যবিচার রসোৎকর্ষসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ নির্দেশক এবং নিয়ামক। কাব্যে রসসৃষ্টির যাবতীয় রহস্য এই ঔচিত্যের মধ্যে-ই নিহিত।

নাট্যদর্পণকাররা সৎকাব্যে ঔচিত্যের এই সর্বাতিশায়ী প্রভাব বিষয়ে সবিশেষ অবগত ছিলেন। কেবলমাত্র বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য অংশে নয়, এর বহু পূর্বে গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকগুচ্ছের অষ্টম শ্লোকে তাঁরা বলেছেন, কবিযশোলিপ্সু জনৈক ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের নিরিখে কপর্দকশূন্য ভিক্ষুক বা মহৈশ্বর্যশালী নরপতি যা-ই হোন্ না কেন, ঔচিত্যসম্পদে সমৃদ্ধ না হলে কাব্যনির্মাণব্যাপারে তিনি কখনো-ই সার্থকতা অর্জন করতে পারবেন না এবং ঔচিত্যজ্ঞান ব্যতিরেকে নির্মিত তাঁর সেই রচনা বিদ্বন্মণ্ডলীর উপহাসাস্পদে পরিণত হবে–

" আরঙ্কাৎ ভূপতিং যাবৎ ঔচিতীং ন বিদন্তি যে ।

স্পৃহয়ন্তি কবিত্বায় খেলনং তে সুমেধসাম্ ॥"

ঔচিত্যের অভাব অর্থাৎ অনৌচিত্য নানাভাবে সংঘটিত হতে পারে; সেই প্রকারগুলি এবার একে একে আলোচনা করা যাক্ –

১. বর্ণনীয় রসের বিরোধী যে রস, তৎসম্পর্কিত বিভাবাদির গ্রহণের দ্বারা প্রাসঙ্গিক রসের ঔচিত্যের হানি ঘটে এবং এটি রসদোষরূপে পরিগণিত হয়। এর উদাহরণরূপে 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের নবম সর্গস্থ একটি শ্লোক নাট্যদর্পণে উপন্যস্ত হয়েছে –

"ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈর্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ ।

পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে স্মরতে রমতে স্ম বধূজনঃ।"

– উদাহৃত শ্লোকে প্রধান প্রতিপাদ্য হল শৃঙ্গাররস। কিন্তু তার উদ্বোধের জন্য যৌবনের অনিত্যত্বরূপ যে বিভাবটির প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটি শৃঙ্গারের বিরোধী শান্তরসের অনুকূল বিভাব। এইভাবে প্রতিকূল বিভাবগ্রহের কারণে বিহিত অনৌচিত্যের দ্বারা এই শ্লোকে রসদোষ উৎপন্ন হয়েছে।

বর্ণনীয় রসের বিরোধী রসের বিভাবাদিগ্রহণে প্রস্তুতরসের হানির সম্ভাবনা ধ্বনিকার-ও স্বীকার করেছেন –

"বিরোধিরসসম্বন্ধিবিভাবাদিপরিগ্রহঃ।

...রসস্য স্যাদ্বিরোধায়.....॥''(ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত)

সাহিত্যদর্পণে-ও বিরোধিরসের বিভাবাদির বর্ণনাকে রসগত দোষরূপে গণ্য করা হয়েছে – ' পরিপন্থিরসাঙ্গস্য বিভাবাদেঃ পরিগ্রহঃ' (সা.দ. ৭/১২)।

লক্ষণীয় এই যে, ধ্বন্যালোক, নাট্যদর্পণ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি সকল গ্রন্থে প্রতিকূল বিভাবগ্রহের উদাহরণে কেবল শান্ত ও শৃঙ্গাররসকে গ্রহণ করা হয়েছে; হাস্য, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস ইত্যাদি রসের গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, হাস্যাদি রসের বিভাবগুলির মধ্যে বিরোধ সর্বদা পরিলক্ষিত হয় না। অভিনবগুপ্তাচার্য ধ্বন্যালোকলোচনটীকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন – 'হাস্যশৃঙ্গারয়োর্বীরাদ্ভুতয়োঃ রৌদ্রকরুণয়োর্ভয়ানকবীভৎসয়োর্ন বিভাববিরোধঃ'(ধ্বন্যালোকলোচনটীকা , তৃতীয় উদ্দ্যোত) । কিন্তু শান্তরস ও শৃঙ্গার রসের মধ্যে একটি স্বতঃ বিরোধ রয়েছে – 'প্রশমরাগয়োর্বিরোধাৎ' (ধ্বন্যালোকলোচনটীকা, তৃতীয় উদ্দ্যোত) – কারণ একটিতে আছে প্রশমন ও অপরটিতে আছে অনুরাগ এবং এই দুটি ভাব পরস্পরবিরুদ্ধ । অতএব এদের একটির বিভাববর্ণনাকালে অপরটির বিভাববর্ণনা করলে পরস্পরবিরুদ্ধতাবশতঃ রসদোষ অনিবার্য।

২. অকাণ্ডে, অর্থাৎ অনুপযুক্ত অবসরে রসের প্রকাশন এবং অনবসরে রসের বিচ্ছেদ রসভঙ্গের অন্যতম কারণ। অনবসরে রসের আর্বিভাব , যথা – বেণীসংহারের দ্বিতীয় অঙ্কে যেখানে ভীষ্মাদি অসংখ্য বীরের প্রাণনাশ বর্ণিত হচ্ছে, সেই সময় সেই অনুপযুক্ত কালে ভানুমতীর সঙ্গে দুর্যোধনের শৃঙ্গারের বিস্তৃত বর্ণনা। এই উদাহরণটির ব্যাখ্যাবসরে কাব্যপ্রকাশের বালবোধিনীটীকায় উদ্দ্যোতের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে – 'তদা করুণস্য বীরস্য বাবসরো ন শৃঙ্গারাদেঃ, ন হি শোকোৎসাহবাসনানিরুদ্ধে প্রতিপর্ত্তৃচেতসি শৃঙ্গারাদিঃ পদমপি লভতে সুতরামাস্বাদ ইতি ভাবঃ' (কা. প্র. সপ্তম উল্লাস) । অনবসরে রসবিচ্ছেদ, যথা– মহাবীরচরিতে রামচন্দ্র ও ভার্গব পরশুরামের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার প্রাক্মুহূর্তে 'কঙ্কণমোচনায় গচ্ছামি' রামচন্দ্রের এই উক্তি। বহু বীরের ধ্বংসকারণ, কল্পান্তকারী সংগ্রামের মুহূর্তে নায়ক দেবসদৃশ রামচন্দ্রের, বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসোচিত ভাবের উদয় ব্যতিরেকে শৃঙ্গারের অবতারণার কারণে এটি রসদোষের উদাহরণ।

৩. চরিত্রের অনুপযোগী কার্যকলাপের বিবরণ – দিব্য, অদিব্য ও দিব্যাদিব্য ভেদে নাটকীয় চরিত্রসমূহের প্রকৃতি ত্রিবিধ। এদের আবার ধীরোদাত্তাদি বিভাগ আছে। এদের-ও আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীভেদ আছে। চরিত্র যেরূপ, তার অযথাযথ কার্যকলাপের বর্ণনায় প্রকৃতিবিপর্যয় দোষের উদ্ভব হয়। এই দোষ বহুবিধ হতে পারে –

ক. উত্তম প্রকৃতির চরিত্রে হাস্য, বীভৎস, করুণ, ভয়ানক, অদ্ভুত ইত্যাদি রসের সাতিশয় প্রয়োগ এবং মধ্যম ও অধম প্রকৃতির চরিত্রে অগ্রাম্য শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, শান্ত ইত্যাদি রসের অতিশায়িত ব্যবহার রসদোষের কারণ।

খ. দিব্য এবং বিশিষ্ট উত্তমোত্তম চরিত্রের বর্ণনায় তাঁদের সম্ভোগশৃঙ্গারের ও রতিক্রীড়ার বিবরণ সর্বথা অনুচিত। এর উদাহরণ হল কুমারসম্ভবে উমা ও মহেশ্বরের সুরতক্রীড়ার বিবরণ। নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, এ জাতীয় বর্ণনা স্বীয় পিতামাতার রতিবর্ণনার ন্যায় লজ্জাকর; অতএব সর্বথা পরিহর্তব্য। কাব্যপ্রকাশকার মম্মটাচার্য-ও এপ্রসঙ্গে অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন – "কিং তু রতিঃ সম্ভোগশৃঙ্গাররূপা উত্তমদেবতাবিষয়া ন বর্ণনীয়া। তদ্বর্ণনং হি পিত্রোঃ সংভোগবর্ণনমিবাত্যন্তমনুচিতম্" (কা.প্র. সপ্তম উল্লাস)।

গ. অদিব্য উত্তমচরিত্রসমূহের বর্ণনায় সদ্যঃফলদ ক্রোধ, স্বর্গ বা পাতালে গমন, সমুদ্রলঙ্ঘনাদি অত্যধিক উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপারাদির বিবরণ রসদোষের সৃষ্টি করে।

ঘ.ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত এবং ধীরপ্রশান্ত – চতুর্বিধ প্রকৃতির নায়কচরিত্রের চিত্রণে যথাক্রমে বীর, রৌদ্র, শৃঙ্গার এবং শান্তরসের বর্ণনা না করা অথবা এই রসগুলির বিরুদ্ধ রসের বর্ণনা করা– দুটি-ই রসদোষরূপে পরিগণিত হয়।

ঙ.মধ্যম এবং অধম শ্রেণীর ব্যক্তির চরিত্রবর্ণনায় বীরাদি উত্তমোচিত রসের অধিক বা প্রকৃষ্ট ব্যবহার রসদোষের পর্যায়ভুক্ত।

৪. ভাষায় অনৌচিত্য – কাব্যের ভাষায় অর্থাৎ শব্দ ও বাক্যবন্ধে কোনোপ্রকার অনৌচিত্য রসাপকর্ষকরূপে গণ্য হয়। কাব্যের ভাষাকে হতে হবে রস ও ভাবের অনুসারী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বীর-রৌদ্রাদির ন্যায় দীপ্ত রসের ক্ষেত্রে ভাষা-ও হবে উগ্রদীপ্ত এবং গুরুগম্ভীর। এজাতীয় রচনায় শব্দবন্ধে মূর্ধণ্যবর্ণের বহুল প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়, বাক্যবন্ধে সন্ধি ও সমাসের ব্যাপক ব্যবহার অভিপ্রেত। বিপরীতে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, শান্ত ইত্যাদি অদীপ্ত রসের ক্ষেত্রে ভাষা হবে পেলব ও কান্তকোমল। তাতে মূর্ধণ্যাদি পরুষবর্ণের আধিক্য থাকবে না, সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ হবে স্বল্প এবং এজাতীয় রচনা হবে প্রসন্ন, সুন্দর ও সর্বথা সুকুমার প্রকৃতির। অতএব বীরাদি উগ্র রস হোক্, বা শৃঙ্গারাদি কোমল রস হোক্ – সর্বক্ষেত্রে কাব্যের ভাষাকে হতে হবে রস ও ভাবের উপযোগী, স্পষ্টার্থ, শুদ্ধ এবং মহিমান্বিত।

৫. আচরণের অনৌচিত্য – নায়ক-নায়িকাদি উত্তমপ্রকৃতির চিত্রায়ণে ঐসকল চরিত্রের মাহাত্ম্যাপকর্ষক কোনো ঘটনার সন্নিবেশ কাব্যে রসদোষের সৃষ্টি করে। উত্তমপ্রকৃতির নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক বঞ্চনা বা মিথ্যাচার, নায়িকার পদাঘাতে নায়কের ক্রোধ ইত্যাদি ঘটনার প্রয়োগে কাব্যের

গুণগত উৎকর্ষের বিশেষ হানি ঘটে। কেবলমাত্র আচরণের অনৌচিত্য-ই নয়, কাব্যস্থ চরিত্রসমূহের বয়স, বেশভূষা, স্থান, কাল, অবস্থা, ব্যবহার ইত্যাদির অযথাযথ প্রয়োগে-ও রসদোষের সৃষ্টি হয়। কাব্যপ্রকাশকার তাই বলেছেন – 'এবং দেশকালবয়োজাত্যাদীনাং বেষব্যবহারাদিকমুচিতমেবোপনিবন্ধব্যম্' (কা.প্র. সপ্তম উল্লাস)।

৬. মূল কাহিনীর অন্তর্গত বিষয়ান্তরের অতিবিস্তৃত বর্ণনা – কাহিনীর উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রস্তাবিত রসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অন্য বস্তুর বর্ণনা কখনো-কখনো আবশ্যক হয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, তা যেন উদ্দিষ্ট রসের উপযোগী হয়। কারণ, অবান্তর, অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনাসমূহের সন্নিবেশে কাহিনীর রসভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। বহু মহাকবির রচনাতে-ও প্রায়শঃ-ই দেখা গেছে যে, কোনো একটি প্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণনা চলাকালীন অবস্থাতে-ই ঋতু, সমুদ্র, চন্দ্রোদয়, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ইত্যাদি যৎসামান্য সম্বদ্ধ বস্তুর বর্ণনায় কবি বিশেষভাবে আকৃষ্টচিত্ত হয়ে ওঠেন এবং যমক-শ্লেষাদি বিচিত্র অলঙ্কারের অসামান্য প্রয়োগকৌশলে ঐসকল বস্তুর সুবিস্তৃত বর্ণনা উপস্থাপিত করেন। উদাহরণস্বরূপ ভারবিরচিত কিরাতার্জুনীয়মের সপ্তম সর্গে অপ্সরাদের বর্ণনা, মাঘবিরচিত শিশুপালবধমের সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সর্গের যাদবযুবতীদের বর্ণনা ইত্যাদি উল্লেখ্য। অলঙ্কারচাতুর্য, ছন্দোমাধুর্য ইত্যাদির কারণে স্বতন্ত্র রচনারূপে এইসব বর্ণনার গুণগত মান প্রশ্নাতীত। কিন্তু প্রধান ঘটনার সঙ্গে অতি সামান্যভাবে সম্বদ্ধ এইসকল ঘটনার এত বিস্তৃত ও অলঙ্কৃত বর্ণনা সর্বথা নিস্প্রয়োজন এবং তা মূল রসের পক্ষে হানিকারক। ধ্বনিকার-ও তাঁর গ্রন্থে এই বিষয়টিকে রসদোষরূপে নির্দেশপূর্বক বলেছেন – "অয়ং চান্যো রসভঙ্গহেতুর্যৎ প্রস্তুতরসাপেক্ষয়া বস্তুনো2ন্যস্য কথঞ্চিদন্বিতস্যাপি বিস্তরেণ কথনম্ । যথা – বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে নায়কস্য কস্যচিদ্ বর্ণয়িতুমুপক্রান্তে কবের্যমকাদ্যলঙ্কারনিবন্ধনরসিকতয়া মহতা প্রবন্ধেন পর্বতাদিবর্ণনে" (ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত)।

৭. প্রধানরসের তুলনায় অঙ্গরসের অতিবিস্তার – নাট্যদর্পণে এই দোষটিকে বলা হয়েছে 'অঙ্গৌগ্র্যম্'। এই দোষযুক্ত কাব্যে মুখ্য বা প্রধান বা অঙ্গীরসের তুলনায় অঙ্গরসের অতিবিস্তৃত বর্ণনা থাকে, যা কাহিনীর মূল সুরের অপকর্ষ সৃষ্টি করে। যেমন – 'কৃত্যারাবণ' নামক বীররসাত্মক রূপকে জটায়ুবধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতার দুর্দৈব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীরামের মুহুর্মুহুঃ রোদন ও বিলাপাদিদ্বারে অঙ্গভূত করুণরসের বারংবার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা এই রূপকের প্রধান, প্রাসঙ্গিক ও অঙ্গীভূত বীররসের বিকাশের অন্তরায়রূপে প্রতীত হয়।

অঙ্গরসের বিস্তারিত বিবরণজনিত দোষের উদাহরণরূপে আচার্য মম্মট মেণ্ঠবিরচিত 'হয়গ্রীববধ' কাব্য থেকে হয়গ্রীবের বর্ণনাটি উপন্যস্ত করেছেন – 'অঙ্গস্যাপ্রধানস্যাতিবিস্তরেণ বর্ণনং যথা হয়গ্রীববধে হয়গ্রীবস্য' (কা. প্র. সপ্তম উল্লাস)। নাট্যদর্পণকাররা এর সঙ্গে সহমত নন। তাঁদের

মতে, উল্লিখিত অংশে প্রধান নায়কের কার্যকলাপের অতি সংক্ষিপ্ত এবং অপর্যাপ্ত বিবরণের কারণে এটি ইতিবৃত্তের দোষ, রসদোষ নয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তি-তে তাই বলা হচ্ছে – ''কেচিদত্র হয়গ্রীববধে হয়গ্রীববর্ণনমুদাহরন্তি। স পুনর্বৃত্তদোষো বৃত্তনায়কস্যাল্পবর্ণনাৎ''। [১০৯] শুধু তাই নয়, বৃত্তিতে আরো বলা হয়েছে যে, হয়গ্রীববধের মত একটি বীররসপ্রধান কাব্যে বধ্য হয়গ্রীবের শৌর্যবিভূত্যতিশয়বর্ণনার দ্বারা প্রাসঙ্গিক বীররসের পরিপুষ্টি-ই সাধিত হয়েছে; অতএব এটি কোনোমতে-ই রসদোষের উদাহরণ হতে পারে না – 'তত্র হি বীরো রসঃ, স বিশেষতো বধ্যস্য শৌর্যবিভূত্যতিশয়বর্ণনেন ভূষ্যত ইতি'। [১১০]

৮. প্রাসঙ্গিক রসের পর্যাপ্ত পরিপোষের অভাব – অঙ্গীরসের যথাযথ ও পর্যাপ্ত পরিপুষ্টির অভাব রসভঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এপ্রসঙ্গে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদাহৃত হয়েছে –

''বীভৎসা বিষয়া জুগুপ্সিততমঃ কায়ো বয়ো গত্বরং
প্রায়ো বন্ধুভিরধ্বনীব পথিকৈর্যোগো বিয়োগাবহঃ।
হাতব্যো2য়মসম্ভবায় বিরসঃ সংসার ইত্যাদিকং
সর্বস্যাপি হি বাচি চেতসি পুনঃ কস্যাপি পুণ্যাত্মনঃ ৷৷''

– বিষয়-সম্পদের নিন্দা , যৌবনের অনিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত মানুষ-ই কথা বলে থাকে; কিন্তু এই অসারতা প্রকৃত-ই হৃদয়ঙ্গম করেন মুষ্টিমেয় পুণ্যাত্মা ব্যক্তি – এই হল উদাহৃত শ্লোকটির ভাবার্থ। নশ্বর ধনসম্পদ, জীবন-যৌবন ইত্যাদির অধমত্ব কবির রচনায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সকল বিভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ শান্তরসটি 'সর্বস্যাপি হি বাচি'– এই অংশটির কারণে যথাযথ পোষণ লাভ করতে পারেনি। কারণ, এই অংশটির মধ্যে শান্তরসের সর্বজনজ্ঞাততত্ত্বরূপ বিষয়টির বাক্যমাত্রে পর্যবসান ঘটেছে। এই অংশটি যদি 'সর্বস্যাপি জনস্য চেতসি'– এভাবে রচিত হত সেক্ষেত্রে শান্তরসের যথাযথ পরিপুষ্টি হত এবং কোনোরূপ রসদোষের সৃষ্টি হত না। অথবা যদি এটি অঙ্গাঙ্গিভাবশূন্য কোনো মুক্তক কাব্যের অংশবিশেষ হত, তাহলে-ও কোনো রসদোষের উৎপত্তি হত না। কিন্তু কাব্যের মুখ্য ও প্রাসঙ্গিক রসরূপে গৃহীত এই শান্তরসের যথাযথ ও পর্যাপ্ত পরিপোষ না হওয়ার কারণে এখানে সামগ্রিক রসোৎপত্তির হানি ঘটেছে।

৯. পরিপুষ্ট রসের বারংবার প্রকাশ – রসভঙ্গের অপর একটি কারণ হল, রস পরিপোষপ্রাপ্ত হলে-ও তার পুনঃপুনঃ প্রকাশ। রস যখন স্বীয় বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবসমূহের দ্বারা পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তার পরে-ও বারংবার তার পরিপোষবিধান অন্যতম একটি রসদোষরূপে পরিগণিত হয়। পুষ্পের ন্যায় সুকোমল রসের ব্যবহার অতি সন্তর্পণে করণীয়; অন্যথায় অবিরত ব্যবহারে রসের

ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যায়। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, উপভুক্ত রস নিজ বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষপ্রাপ্ত হওয়ার পর-ও যদি বারংবার তার বর্ণনা করা হয়, তবে তা পরিম্লান মালতীমাল্যের ন্যায় অনাকর্ষক হয়ে পড়ে – 'লব্ধপরিপোষো হি রসঃ পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্যমানো মালতীমাল্যমিব ম্লায়তি'।[১১১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আনন্দবর্ধনাচার্য-ও প্রায় অনুরূপ উদাহরণযোগে বিষয়টি বিশদীভূত করেছেন – 'উপভুক্তো হি রসঃ স্বসামগ্রীলব্ধপরিপোষঃ পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্যমানঃ পরিম্লানকুসুমকল্পঃ কল্পতে' (ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত)। মহাকবি কালিদাস বিরচিত কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ অংশটি এজাতীয় দোষে দুষ্ট বলে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে অভিমত পোষণ করা হয়েছে।

১০. প্রধানরসের অপ্রকাশন – বহুরসপূর্ণ কাব্যবন্ধে অন্যান্য অবান্তর ঘটনার অনুপ্রবেশে কবি যদি অঙ্গীভূত প্রধানরসের অনুসন্ধান বা পরামর্শে বিরতি দেন, তবে তা অন্যতম একটি রসদোষরূপে পরিগণিত হয়। এর উদাহরণরূপে রত্নাবলী নাটিকার চতুর্থ অঙ্কের অংশবিশেষের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে কবি শ্রীহর্ষ বাভ্রব্যের আগমনে অঙ্গীরস শৃঙ্গারের প্রধান সূত্রস্বরূপ রত্নাবলীকে বিস্মৃত হচ্ছেন।

নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে রসদোষসমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম হল অনৌচিত্য । অন্যান্য রসদোষগুলি এর প্রকারভেদ মাত্র; তাদের অনৌচিত্যের-ই অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যেতে পারে – 'অঙ্গৌগ্র্যাদয়শ্চ দোষাঃ পরমার্থতো2নৌচিত্যান্তঃপাতিনঃ'।[১১২]

এরপর নাট্যদর্পণকাররা জনৈক পূর্বাচার্যের অভিমতের সমালোচনা করেছেন, যে মত অনুসারে ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, রস ইত্যাদির প্রতিপাদন উচিৎ কেবল বিভাবাদির দ্বারা; এদের স্বশব্দবাচ্যত্ব সর্বথা দোষাবহ। এই মত খণ্ডনপূর্বক নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে যে, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যভিচারিভাবাদির স্বশব্দবাচ্যত্ব দোষাবহ না-ও হতে পারে, যদি তা বিভাবাদির পুষ্টির সহায়ক হয় – 'কেচিত্তু ব্যভিচারিরসস্থায়িনাং স্বশব্দেন বাচ্যত্বং রসদোষমাহুস্তদযুক্তম্, ব্যভিচার্যাদীনাং স্ববাচকপদপ্রয়োগে2পি বিভাবপুষ্টেঃ'।[১১৩]

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই সমালোচনার লক্ষ্য হলেন আচার্য মম্মট। তিনি-ই ব্যভিচারিভাবাদির স্বশব্দনিবেদিতত্বকে অন্যতম রসদোষরূপে স্বীকার করেছেন – 'ব্যভিচারিরসস্থায়িভাবানাং শব্দবাচ্যতা …… রসে দোষাঃ স্যুরীদৃশাঃ'(কা.প্র. সপ্তম উল্লাস)।

কিন্তু এবিষয়ে লক্ষণীয় যে, আচার্য মম্মটের প্রকৃত অভিমত এই যে, যেখানে অনুভাব ও বিভাবের দ্বারা অর্থ প্রতিপাদন করলে অর্থের স্পষ্ট প্রতীতি হয় না, যেখানে বিভাব ও অনুভাবকৃত রসপুষ্টির অভাব, তদ্ব্যতীত স্থলে ব্যভিচারিভাবাদির স্বশব্দনিবেদিতত্ব দোষের কারণ। অর্থাৎ যেখানে কেবল বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা রসের পর্যাপ্ত উদ্বোধ সম্ভব নয়, সেখানে স্বশব্দের দ্বারা

ব্যভিচারিভাবের প্রকাশ হলে, তা দোষাবহ হয় না। পরভাবী দর্পণকার-ও এবিষয়ে অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। মম্মটকৃত সম্পূর্ণ কারিকাটি নিম্নরূপ –

"ব্যভিচারিরসস্থায়িভাবানাং শব্দবাচ্যতা।

কষ্টকল্পনয়া ব্যক্তিরনুভাববিভাবয়োঃ ॥"(কা.প্র. ৭/৬০)

বিষয়টির প্রাঞ্জলতাবিধানমানসে একটি শ্লোক উদাহৃত করা যেতে পারে –

"ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্তমানা হ্রিয়া

তৈস্তৈর্বন্ধুবধূজনস্য বচনৈর্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ।

দৃষ্ট্বাগ্রে বরমাত্তসাধ্বসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে

সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতা শ্লিষ্টা শিবায়াস্তু বঃ ॥"

– (পতির সঙ্গে) প্রথম মিলনকালে যে গৌরী ঔৎসুক্যবশতঃ ত্বরান্বিত এবং স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ নিবৃত্ত হয়েছিলেন, সখিগণের তৎকালোচিত বাক্যে যিনি আবার যেতে সম্মত হয়েছিলেন, সম্মুখে পতিকে দেখে যিনি ভয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সহাস্য হরের দ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ায় যাঁর পুলকরোমাঞ্চ হয়েছিল, সেই গৌরী তোমাদের মঙ্গল করুন – এই হল শ্লোকটির অর্থ। এই উদাহরণটিতে ত্বরারূপ অনুভাবের দ্বারা ঔৎসুক্যের প্রতিপাদন হলে-ও , তার দ্বারা পতিমিলনরূপ ব্যাপারের দ্রুত প্রতীতি হয় না, কারণ ত্বরা ভয়াদিহেতুজনিত-ও হতে পারে। মুখব্যাবৃত্তিরূপ লজ্জার অনুভাব কোপাদি থেকে-ও উৎপন্ন হতে পারে। ভয় ও হাস্য – এই দুটির বিভাবাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হলে প্রস্তাবিত অঙ্গীরসের প্রতিকূলতা সাধিত হবে। অতএব এক্ষেত্রে নিজ-নিজ শব্দের দ্বারা এগুলির বর্ণনা-ই অধিকতর সঙ্গত হয়েছে।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে ব্যভিচারিভাবাদির স্বশব্দবাচ্যত্বের সমর্থনে একটি শ্লোকের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে –

"দূরাদুৎসুকমাগতে বিচলিতং সম্ভাষিণি স্ফারিতং

সংশ্লিষ্যত্যরুণং গৃহীতবসনে কিং চাঞ্চিতভ্রূলতম্ ।

মানিন্যাশ্চরণানতিব্যতিকরে বাষ্পাম্বুপূর্ণেক্ষণং

চক্ষুর্জাতমহো! প্রপঞ্চচতুরং জাতাগসি প্রেয়সি ॥"

– প্রিয়তম দূরে অবস্থান করলে সেই মানিনীর চক্ষুদ্বয় উৎসুক, নিকটে এলে বিচলিত, সম্ভাষণকালে বিস্ফারিত, আলিঙ্গনকালে অরুণবর্ণ, বস্ত্রাকর্ষণকালে স্বল্প ভ্রূকুটিযুক্ত, প্রেমিক পদানত হলে চক্ষু বাষ্পপূর্ণ এবং প্রেমিক অপরাধী হলে ক্রোধে সুতীব্র – এই হল শ্লোকটির সরলার্থ। উদাহৃত শ্লোকে অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের শব্দতঃ প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু তা কোনোরূপ রসভঙ্গের কারণ হয়নি।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, একথা সত্য যে, এই শ্লোকে বক্রোক্তিজনিত বিশিষ্ট কোনো চমৎকৃতি নেই; কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যভিচারিভাবাদির স্বশব্দনিবেদিতত্বের কারণে কোনো রসদোষের-ও সৃষ্টি হয়নি, কারণ তা প্রধান বিভাবাদির পরিপুষ্টিসাধনে অনুকূল ভূমিকা পালন করেছে।

পূর্বোক্ত অভিমতের সূত্র ধরে কাব্যপ্রকাশে আরো একটি রসদোষের উল্লেখ করা হয়েছে । তদনুসারে বলা হচ্ছে, যখন একাধিক রস, এক বা একাধিক সাধারণ বিভাবের দ্বারা উদ্বোধিত হয়, তখন সেই বিভাব বা অনুভাবটি যে ঠিক কোন্ রসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এর উদাহরণরূপে কাব্যপ্রকাশকার নিম্নোক্ত শ্লোকটি উপন্যস্ত করেছেন –

"পরিহরতি রতিং মতিং লুনীতে স্খলতিতরাং পরিবর্ততে চ ভূয়ঃ ।
ইতি বত বিষমা দশা স্বদেহং পরিভবতি প্রসভং কিমত্র কুর্মঃ ॥"

– আচার্য মম্মটের মতে রতিপরিহার, বুদ্ধিবিপর্যয় ইত্যাদি অনুভাবগুলি শৃঙ্গার এবং করুণ – এই দুটি রসের-ই উদ্বোধকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট অংশে এই অনুভাবগুলির দ্বারা কোন্ রসটিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেবিষয়ে দ্বিধা ও অস্পষ্টতা থাকার কারণে এটি একটি রসদোষের উদাহরণ। নাট্যদর্পণকাররা এর সঙ্গে সহমত নন। বৃত্তিতে এই অভিমতের সমালোচনাপূর্বক তাঁরা বলেছেন, কোনো ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ দেখা দিলে, একে রসদোষের পরিবর্তে বাক্যদোষের পর্যায়ভুক্ত করা-ই সঙ্গত – 'এবমুভয়রসসাধারণবিভাবপদানাং কষ্টেন নিয়তবিভাবাভিধায়িত্বাধিগমো2পি সন্দিগ্ধত্বলক্ষণো বাক্যদোষ এব'।[১১৪]

স্থায়িভাবসমূহের লক্ষণ ঃ

নাট্যদর্পণের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হল ভাবসমূহের প্রাতিস্বিক লক্ষণবিচার। রসনিষ্পত্তিতে সর্ববিধ ভাবের মধ্যে স্থায়িভাবের গুরুত্ব যেহেতু সর্বাধিক, অতএব স্থায়িভাবসমূহের লক্ষণ আলোচনার দ্বারা এই বিমর্শের সূচনা করা হচ্ছে।

নাট্যদর্পণে নয়প্রকার স্থায়িভাব স্বীকার করা হয়েছে – রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম। প্রথম আটটি স্থায়িভাব নাট্যশাস্ত্রসম্মত; শান্তকে পৃথক রসরূপে গণ্য না করার কারণে অন্তিম অর্থাৎ নবম স্থায়িভাব 'শম'কে নাট্যশাস্ত্রে স্বীকার করা হয়নি। স্থায়িভাবের সংখ্যা যেহেতু রসের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল, তাই রসের সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে স্থায়িভাবের সংখ্যা-ও বৃদ্ধি পেয়েছে। নাট্যদর্পণে উক্ত নয়টি স্থায়িভাবের সঙ্গে লোভ (লৌল্যরসাত্মক), আর্দ্রতা (স্নেহরসাত্মক), আসক্তি (ব্যসনরসাত্মক), অরতি (দুঃখরসাত্মক), সন্তোষ (সুখরসাত্মক) ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে । বৈষ্ণব আলঙ্কারিকরা এতদ্ব্যতিরিক্ত দাস্য,সখ্য ইত্যাদি স্থায়িভাবকে স্বীকার

করেছেন। অতএব বোঝা গেল, স্থায়িভাবের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, আলঙ্কারিক মতভেদবশতঃ এই সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে। আমরা আপাততঃ আমাদের গবেষ্য গ্রন্থ নাট্যদর্পণ অনুসরণে-ই স্থায়িভাবসমূহের লক্ষণবিচারে প্রবৃত্ত হবো।

স্ত্রী এবং পুরুষের অন্যোন্য প্রণয়ের নাম রতি। ব্যভিচারিণী নারীর সম্ভোগলিপ্সা অথবা দেবতা, গুরু, বন্ধুবান্ধব বা মনোহর বস্তুবিশেষের প্রতি আসক্তি থেকে এই প্রণয়জাত অনুভবের আনন্দ সর্বথা পৃথক । নাট্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে, অভিপ্রেত বিষয়ে মনের প্রবণতা ও তৎপ্রাপ্তিজনিত আনন্দের নাম রতি। আনন্দোত্থ অনুভূতির বাহ্য প্রকাশের নাম হাস। এই হাস উন্মাদ অবস্থা, অসম্বন্ধপ্রলাপাদি বাগ্‌বিকার প্রভৃতি দ্বারা-ও উৎপন্ন হতে পারে। মনোবেদনা ও হতাশার মিশ্রিত অনুভূতির নাম শোক। দর্পণকারের মতে, অভীষ্টনাশাদির ফলে উৎপন্ন মনঃপীড়ার নাম শোক। নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রতি শাস্তিদানাদি অপকারের নাম ক্রোধ। দর্পণকারের মতে, প্রতিকূল পরিবেশে উদ্রিক্ত চারিত্রিক তীক্ষ্ণতার নাম ক্রোধ। ধর্ম, দান, যুদ্ধাদিবিষয়ক আরব্ধ কার্যে উদ্যমের নাম উৎসাহ। উৎসাহ উত্তমপ্রকৃতির ব্যক্তিদের চরিত্রের এক বিশেষ ধর্ম। রৌদ্রশক্তিজাত চিত্তবিকলতার নাম ভয়। স্ত্রী এবং নীচপ্রকৃতির পাত্রগণ এর আশ্রয়। অপ্রিয় বিষয়ের শ্রবণ, অপ্রিয় বস্তুদর্শন ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন বিরক্তি ও বৈমুখ্যের নাম জুগুপ্সা। বিবিধ অলৌকিক বস্তুর প্রত্যক্ষজনিত চিত্তবিস্ফারের নাম বিস্ময়। নিস্পৃহ অবস্থায় বিশ্রান্ত চিত্তে উদ্ভূত সুখের নাম শম।

উক্ত স্থায়িভাবগুলি সংশ্লিষ্ট রসের উদ্বোধে হেতুরূপে পরিগণিত হয়; নাট্যদর্পণে তাই এগুলিকে রসোৎপত্তির 'পরিণামিকারণ' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই স্থায়িভাবগুলির প্রতিটি আবার সময়বিশেষে ব্যভিচারিভাব বা অনুভাবরূপে-ও ব্যবহৃত হতে পারে। রসনিষ্পত্তির সহকারী হলে ব্যভিচারিভাবরূপে এবং রসোৎপত্তির বহিঃপ্রকাশক কার্য হলে অনুভাবরূপে এগুলি পরিগণিত হয় – 'সহভাবিত্বেন পোষকত্বে ব্যভিচারিতা কার্যত্বে ত্বনুভাবতা'।[১১৫] তবে ব্যভিচারিভাব বা অনুভাবরূপে ব্যবহৃত হলে-ও, কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট রসে-ই এগুলির প্রয়োগ হবে, রসান্তরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতি সময়বিশেষে শৃঙ্গাররসের-ই ব্যভিচারিভাব বা অনুভাবরূপে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু কখনো-ই তা করুণাদি অন্য রসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্থায়িভাবগুলি ব্যভিচারিভাবরূপে প্রযুক্ত হলে-ও, বিপরীতক্রমে ব্যভিচারিভাবগুলি কিন্তু কখনো-ই স্থায়িভাবরূপে পরিগণিত হতে পারে না। গুপ্তপাদের ভাষায় – 'স্থায়িনো হি ব্যভিচারিতা ভবতি, ন তু ব্যভিচারিণাং স্থায়িতা' (না.শা. সপ্তম অধ্যায়)। একথা সত্য যে, ব্যভিচারিভাব এবং স্থায়িভাব – দুটি-ই মানস ব্যাপার। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ব্যভিচারিভাবগুলি চিত্তে ক্রমাগত উদ্রিক্ত ও বিনষ্ট হতে থাকে, বিপরীতে স্থায়িভাবগুলি মানবচিত্তে

বাসনাকারে অতি সূক্ষ্মভাবে সুদৃঢ় সংস্কারের ন্যায় সুদীর্ঘকাল যাবৎ অবস্থান করে। এই দীর্ঘ অবস্থানের কারণে-ই স্থায়িভাবগুলি থেকে রসোদ্বোধ সম্ভব হয়, ক্ষণস্থায়িত্বের কারণে ব্যভিচারিভাবসমূহের রসপর্যবসান সম্ভব নয়।

ব্যভিচারিভাবসমূহ ঃ

ব্যভিচারিভাবের সামান্য লক্ষণ, স্থায়িভাবের সঙ্গে এদের আন্তর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনার পর এবার নাট্যদর্পণকাররা ব্যভিচারিভাবগুলির সংখ্যা ও প্রতিটির লক্ষণনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছেন।

নাট্যদর্পণমতে ব্যভিচারিভাবের সংখ্যা তেত্রিশটি – নির্বেদ, গ্লানি, অপস্মার, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, চিন্তা, চাপল, আবেগ, মতি, ব্যাধি, স্মৃতি, ধৃতি, অমর্ষ, মরণ, মোহ, নিদ্রা, সুপ্ত, ঔগ্র্য, হর্ষ, বিষাদ, উন্মাদ, দৈন্য, ব্রীড়া, ত্রাস, তর্ক, গর্ব, ঔৎসুক্য, অবহিত্থা, জাড্য, আলস্য এবং বিবোধ।

নাট্যশাস্ত্রমতে-ও ব্যভিচারিভাবের সংখ্যা তেত্রিশ – 'ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ' (না.শা.৬/২১)। কিন্তু বহু নাট্যতাত্ত্বিকের মতে, ব্যভিচারিভাবের সংখ্যা নির্দিষ্ট হতে পারে না; নাট্যশাস্ত্র-নির্দেশিত সংখ্যাটি ন্যূনতম সংখ্যার সীমা – 'ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ইতি ন্যূনসংখ্যায়া ব্যবচ্ছেদকং ন তু অধিকসংখ্যায়াঃ'।[১১৬] নাট্যদর্পণকাররা-ও এই তালিকাকে সম্পূর্ণ বলে মনে করেননি। তাই তাঁরা আরো কতকগুলি ব্যভিচারিভাবের নাম প্রস্তাব করেছেন। সেগুলি হল – ক্ষুৎ, তৃষ্ণা, মৈত্রী, মুদিতা, শ্রদ্ধা, দয়া, উপেক্ষা, অরতি, সন্তোষ, ক্ষমা, মার্দব, আর্জব, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, স্থায়িভাব এবং অনুভাবগুলি-ও ব্যভিচারিতাপ্রাপ্ত হতে পারে। রৌদ্ররসবিষয়ক আলোচনাবসরে নাট্যদর্পণকাররা-ও বলেছেন – 'স্থায়িনো2পি চোৎসাহাদয়ো রসান্তরং প্রতি ব্যভিচারিতাং স্বীকুর্বন্তি'।[১১৭]

এপ্রসঙ্গে ভানুদত্তরচিত 'রসতরঙ্গিনী' গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশটির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। ভানুদত্তের মতে, নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংখ্যানিয়মটি অবশ্য পালনীয় নয় বলে-ই স্থায়িভাবগুলি ব্যভিচারিভাবরূপে গণ্য হতে পারে – 'স্থায়িনো2পি ব্যভিচরন্তি' (রসতরঙ্গিনী, পঞ্চম তরঙ্গ)। তাঁর মতে, শৃঙ্গারে 'হাস', শান্ত-করুণ-হাস্যে 'রতি', করুণ ও শৃঙ্গারে 'ভয়' ও শোক', বীরে 'ক্রোধ', ভয়ানকে 'জুগুপ্সা' এবং সর্বরসে 'উৎসাহ' ও 'বিস্ময়' ব্যভিচারী –

''হাসঃ শৃঙ্গারে রতিঃ শান্তকরুণহাস্যেষু ভয়শোকৌ করুণশৃঙ্গারয়োঃ।
ক্রোধো বীরে জুগুপ্সা ভয়ানকে উৎসাহবিস্ময়ৌ সর্বরসেষু ব্যভিচারিণৌ ॥''(রসতরঙ্গিনী, পঞ্চম তরঙ্গ)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'উত্তররামচরিত'-এর সমালোচনাকালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় রসতত্ত্বকে অসম্পূর্ণ বলে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, মানবের চিত্তবৃত্তি অসংখ্য এবং মাত্র

আটটি বা নয়টি স্থায়িভাব ও তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা তা পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হতে পারে না। ডঃ. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের একদেশদর্শিতার সমালোচনা করে-ও স্বীকার করেছেন যে, ব্যভিচারিভাবের সংখ্যাগণন নির্দোষ হয়নি। এপ্রসঙ্গে ডঃ. দাশগুপ্তের অভিমতটি একটু অন্যরকম। তাঁর মতে, একমাত্র স্থায়িভাব ব্যতীত সকল চিত্তবৃত্তি-ই ব্যভিচারিভাব হতে পারে। অন্যান্য গ্রন্থে যেখানে অনুভাবের না হলে-ও, স্থায়িভাবের ব্যভিচারিতাপ্রাপ্তিকে অবশ্য-ই স্বীকার করা হয়েছে, সেখানে ডঃ.দাশগুপ্ত স্থায়িভাবের ব্যভিচারিতাকে স্বীকার করেননি এবং তিনি নাট্যশাস্ত্রোক্ত ব্যভিচারিভাবের তালিকার সঙ্গে প্রসন্নতা, নিন্দা, অনুতাপ, কোমলতা, কঠিনতা, বিদ্রোহ, বিদ্রূপ, সাম্য, সেবা ইত্যাদি আরো তেত্রিশ প্রকার সম্ভাব্য ব্যভিচারিভাবের নামোল্লেখ করেছেন। [১১৮]

প্রসঙ্গতঃ অবশ্য উল্লেখ্য যে, স্থায়িভাব ব্যভিচারী হলে-ও, ব্যভিচারিভাব কিন্তু কখনো-ই স্থায়িভাব হতে পারে না। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন – ‘স্থায়িনো হি ব্যভিচারিতা ভবতি, ন তু ব্যভিচারিণাং স্থায়িতা’ (না.শা.সপ্তম অধ্যায়) ।

সংখ্যা যাই হোক্ না কেন, ব্যভিচারিভাবগুলির প্রতিটির প্রয়োগ হবে ঔচিত্যানুসারী। এগুলির মধ্যে কয়েকটি একাধিক রসের সঙ্গে, কয়েকটি একটিমাত্র রসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ।

এবার একে-একে নাট্যদর্পণোক্ত তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের আলোচনা করা যাক্ –

১. নির্বেদ – নির্বেদের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – ‘নির্বেদস্তত্ত্বধী ক্লেশৈঃ বৈরস্যং শ্বাসতাপকৃৎ’ (না.দ. ৩/২৮) – দারিদ্র্য, ব্যাধি, অপমান, ঈর্ষ্যা, ভ্রম, আক্রোশ, তাড়ন , ইষ্টবিয়োগ, পরের সমুন্নতি দর্শনাদি ক্লেশ থেকে জাত এবং শাশ্বত তত্ত্বজ্ঞান থেকে উদ্রিক্ত বিরাগ ও ঔদাসীন্যের নাম নির্বেদ। দশরূপক এবং সাহিত্যদর্পণমতে, তত্ত্বজ্ঞান, আপদ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতির ফলে যে আত্মাবমাননা, তার-ই নাম নির্বেদ। দশরূপকে বলা হচ্ছে – ‘তত্ত্বজ্ঞানাপদীর্ষ্যাদের্নির্বেদঃ স্বাবমাননম্’ (দশ.রূ.৪/৯)। নিঃশ্বাস, সন্তাপ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্যাদি অনুভাবের দ্বারা নির্বেদের অভিনয় করণীয়। ভাবপ্রকাশনে বলা হচ্ছে, যোগিপুরুষদের স্বতোনির্বিণ্ণ চিত্তে এই নির্বেদের পুনরাবির্ভাব ঘটে না, তাই যোগিদের ক্ষেত্রে নির্বেদের প্রয়োগ অনুচিত – ‘তত্ত্বাববোধজো যোগিস্বনুপাদেয়তাং ব্রজেৎ’ (ভাব.প্র. ১/১১০) ।

কোনো বিশেষ এক বা একাধিক রসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় এবং পরিস্থিতিবিশেষে উদ্রিক্ত হওয়ায় নির্বেদ একটি ব্যভিচারিভাবরূপে-ই পরিগণিত হয়, এটিকে স্থায়িভাব বলা চলে না। মম্মটাচার্য যে নির্বেদকে শান্তরসের স্থায়িভাবরূপে স্বীকার করেছেন (‘নির্বেদস্থায়িভাবো2পি শান্তো2পি নবমো রসঃ’ – কা.প্র. চতুর্থ উল্লাস), নাট্যদর্পণকারদের মতে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আচার্য মম্মট

অবশ্য এই অভিমত পোষণ করেন যে, নির্বেদ যেহেতু অমঙ্গলজনক, সেই কারণে স্থায়িভাবসমূহের তালিকায় প্রথমে উল্লেখের অযোগ্য। কিন্তু ব্যভিচারিভাব হওয়া সত্ত্বে-ও, এর মধ্যে স্থায়িভাবের গুণ-ও বর্তমান; তাই স্থায়িভাবরূপে এই নির্বেদের স্বীকরণ যথার্থ – 'নির্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য প্রথমমনুপাদেয়ত্বে2প্যুপাদানং ব্যভিচারত্বে2পি স্থায়িতাভিধানার্থম্' (কা.প্র. চতুর্থ উল্লাস)। নাট্যদর্পণকাররা এর সঙ্গে সহমত নন। এঁদের মতে, নির্বেদের স্থান ব্যভিচারিভাবের তালিকায়; নাট্যপ্রয়োজন অনুসারে আগত ও প্রত্যাবৃত্ত এই ভাবকে কখনো স্থায়িভাব বলা চলে না। এক-ই সঙ্গে মম্মটচার্যের এই অভিমত অত্যন্ত স্ববিরোধী বলে-ও তাঁরা মন্তব্য করেছেন – 'মম্মটস্তু ব্যভিচারিকথনপ্রস্তাবে নির্বেদস্য শান্তরসং প্রতি স্থায়িতাং, প্রতিকূলবিভাবাদিগ্রহ ইত্যত্র তু তমেব প্রতি ব্যভিচারিতাং চ ব্রুবাণঃ স্ববচনবিরোধেন প্রতিহত ইতি' ।[১১৯]

২. গ্লানি – গ্লানির নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'গ্লানিঃ পীড়াজরায়াসৈঃ অশক্তিঃ কার্শ্যকম্পভাক্' (না.দ. ৩/২৮)– ব্যাধি, বমন, বিরেচন, ক্ষুধা, পিপাসাদি পীড়া, ব্যায়াম, পথশ্রম, সুরতক্রীড়াদি আয়াস, জরা, নিদ্রাভঙ্গ, মনস্তাপাদির দ্বারা উৎপন্ন শারীরিক অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের নাম গ্লানি। কৃশাঙ্গ,ক্ষীণকণ্ঠে বাক্যোচ্চারণ, গাত্রকম্পন, মন্দগতিতে পদচারণ, বৈবর্ণ্য, অনুৎসাহাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

৩.অপস্মার – অপস্মারের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'বৈকল্যং গ্রহদোষেভ্যো2পস্মারো নিন্দ্যচেষ্টিতঃ' (না.দ.৩/২৯) – পিশাচ, নাগ, যক্ষ, রাক্ষসদের দ্বারা গ্রহণ অর্থাৎ ধৃত হওয়া , ধাতুর বিকার, উচ্ছিষ্ট ভোজন, শূন্যগৃহে বাস, নিদ্রা-ভোজনাদি ব্যাপারে অশুচিতা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন চিত্তবৈকল্য ও কৃত্যাকৃত্যবিষয়ে অবিবেকিতার নাম অপস্মার। নাট্যশাস্ত্রে এবিষয়ে অনুরূপ একটি শ্লোক রয়েছে –

''ভূতপিশাচগ্রহণানুস্মরণোচ্ছিষ্টশূন্যগৃহগমনাৎ।
কালান্তরাতিপাতাদশুচেশ্চ ভবত্যপস্মারঃ ॥'' (না.শা.৭/৭৩)

সহসা ভূমিতে পতন, ফেনমোচন, নিঃশ্বাস, ধাবন, কম্পন, স্তম্ভ, স্বেদাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

৪. শঙ্কা – শঙ্কার নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'শঙ্কা স্বপরদৌরাত্ম্যাদ্ দোলনং শ্যামতাদিযুক্' (না.দ.৩/২৯) – স্বকৃত বা পরকৃত অকার্যের দ্বারা অনর্থসম্ভাবনায় শঙ্কার উদ্ভব। ভাবপ্রকাশনে তাই এই ভাবটিকে 'স্বাত্মোত্থা' ও 'পরোত্থা' এই দুটি ভেদে বিভক্ত করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, ভাবপ্রকাশনাদি গ্রন্থে বলা হচ্ছে স্ত্রী এবং নীচপাত্র এই ভাবের আশ্রয় – 'শঙ্কা

সন্দেহরূপা স্যাৎ স্ত্রীনীচপ্রকৃতিশ্রিতা' (ভাব.প্র. ১/১১২) । নাট্যশাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে, ভয়ানকরসে চৌর্যাদিহেতু শঙ্কা করণীয়, শৃঙ্গাররসে শঙ্কা হবে প্রিয়জনের প্রতারণাজাত –

"চৌর্যাদিজনিতা শঙ্কা প্রায়ঃ কার্যা ভয়ানকে।

প্রিয়ব্যলীকজনিতা তথা শৃঙ্গারিণী মতা ॥ " (না.শা. ৭/৩৩)

ক্ষোভ ও সন্দেহে দোলায়িত চিত্ত, বারংবার অবলোকন, অবগুণ্ঠন, মুখ-ওষ্ঠ-কণ্ঠের শুষ্কতা, জিহ্বার দ্বারা লেহন, কম্পন, চঞ্চল দৃষ্টি ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা শঙ্কার অভিনয় করণীয়। কোনো-কোনো আচার্যর মতে, শঙ্কাগ্রস্ত ব্যক্তি কখনো কখনো নিপুণ ছল ও ইঙ্গিতের দ্বারা মুখের বাহ্য অবস্থাকে গোপন করে।

৫. অসূয়া – 'দ্বেষাদেঃ সদ্গুণাক্ষান্তিঃ অসূয়া দোষদর্শনী' (না.দ. ৩/৩০)– এই হল নাট্যদর্পণধৃত অসূয়ালক্ষণ। অপরের প্রতি বিদ্বেষ, অপরাধদর্শন, গর্ব, অন্যের সৌভাগ্য-ঐশ্বর্য-বিদ্যা-ক্রীড়াদির দর্শনে উৎপন্ন ঈর্ষ্যার ভাবকে বলে অসূয়া। অন্য ব্যক্তির জ্ঞানক্রিয়াদি বিশিষ্ট গুণ ও ঋদ্ধির প্রতি অসহিষ্ণুতা এর প্রধান লক্ষণ। মিথ্যা অপবাদ রটনা, অবিদ্যমান দোষের খ্যাপন, ভ্রূকুটি, অবজ্ঞা, ক্রোধ, বিদ্যমান গুণের অপহ্নব ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

৬. মদ – মদ্যপানজনিত সংমোহ ও আনন্দের মিলনকে বলা হয় মদ। ভাবপ্রকাশনে মদ্যপানের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, পুত্রাদির জন্ম, উত্তম স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদিকে-ও মদ নামক ব্যভিচারিভাবের উৎপত্তির কারণরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

উত্তমাদি ত্রিবিধ পাত্রের উপর মদের প্রভাব ত্রিবিধ। উচ্চাশয় ব্যক্তির মদ স্মিতহাস্যযুক্ত মুখ, সুন্দর মুখরাগ, রোমহর্ষ, ঈষৎ আকুলিত বাক্য, সুকুমার গতি ইত্যাদির দ্বারা অভিনেয়; মধ্যম ব্যক্তির মদ হাস্য, স্খলন, ঘূর্ণন, বাহুপ্রসারণ, বক্রগতি ইত্যাদির দ্বারা অভিনেয় এবং নীচ ব্যক্তির মদ অশ্রুপাত, নিষ্ঠীবন, জিহ্বার লম্বমান অবস্থা, স্মৃতিনাশ, স্খলিত গতি, হিক্কা, কফ ইত্যাদির দ্বারা অভিনেয়। মদের এই প্রভাবত্রৈবিধ্যানুসারে নাট্যশাস্ত্রে মদকে তিন প্রকারে ভাগ করা হয়েছে – তরুণ, মধ্য ও অবকৃষ্ট – 'জ্ঞেয়স্তু মদস্ত্রিবিধস্তরুণো মধ্যস্তথাবকৃষ্টশ্চ' (না.শা. ৭/৩৮)।

সময়বিশেষে অভিনয়মধ্যে মদ্যপান প্রয়োজন হলে, নট মঞ্চে মদ্যপান করতে পারেন। কিন্তু যে নট বিনা প্রয়োজনে মদ্যপ অবস্থায় মঞ্চে উপস্থিত হন, তাঁর মত্ততার হ্রাস আশু করণীয়। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ত্রাস, শোক, হর্ষ, ভয়প্রদর্শন ইত্যাদির দ্বারা প্রয়োজনে নাট্যক্রমের উল্লঙ্ঘন করে-ও মত্তব্যক্তির মত্ততার দূরীকরণ কর্তব্য–

"সন্ত্রাসাচ্ছোকাদ্বা ভয়াৎ প্রহর্ষাৎ কারণোপগতাৎ।

উৎক্রম্যাপি হি কার্যা মদপ্রণাশঃ ক্রমাৎ তজ্‌জ্ঞৈঃ ॥" (না. শা. ৭/ ৪৫)

৭. শ্রম – 'শ্রম' নামক ব্যভিচারিভাবের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'শ্রমো রতাদিভিঃ সাদঃ স্বেদঃশ্বাসাদিকারণম্' (না.দ.৩/৩১) – রতি, পথের ক্লান্তি, ব্যায়ামাদির দ্বারা উদ্রিক্ত ক্লান্তি ও অবসাদের নাম শ্রম। স্বেদ, মুখকুঞ্চন, জৃম্ভণ, অঙ্গমর্দন, শ্লথগতি ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় কর্তব্য।

৮. চিন্তা – চিন্তার নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'আধিশ্চিন্তা প্রিয়ানাপ্তেঃ শূন্যতা শ্বাসকার্শ্যযুক্' (না.দ.৩/৩১) – কাঙ্খিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রাপ্তি হেতু উৎপন্ন মানসিক পীড়ার নাম চিন্তা। শূন্যতা , ইন্দ্রিয়সমূহের বৈকল্য, একাগ্র দৃষ্টি, স্মরণ ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা চিন্তার অভিনয় করণীয়।

৯. চাপল – 'চাপলং সাহসং রাগদ্বেষাদেঃ স্বৈরিতাদিমৎ' (না.দ. ৩/৩২) – এই হল 'চাপল' নামক ব্যভিচারিভাবের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণ। লক্ষণে ব্যবহৃত 'সাহস' পদের বৃত্তিগত অর্থ হল অবিমৃশ্যকারিতা। এই অবিমৃশ্যকারিতা, বুদ্ধিমান্দ্য ইত্যাদির ফলে কৃত স্বচ্ছন্দাচারের নাম চাপল। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে মাৎসর্য, দ্বেষ, অনুরাগ প্রভৃতি থেকে জাত চঞ্চলতাকে চাপল নামে অভিহিত করা হয়েছে। স্বেচ্ছাচারিতা, বাক্‌পারুষ্য, তাড়ন, বধ, বন্ধন ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় কর্তব্য।

১০. আবেগ – নাট্যদর্পণোক্ত আবেগলক্ষণটি হল – 'আবেগঃ সম্ভ্রমো2তর্ক্যাদ্ বিকর্তাঙ্গমনোগিরাম্' (না.দ. ৩/৩২) – অচিন্তিতপূর্ব কোনো ইষ্ট বা অনিষ্ট ব্যাপারের দ্বারা উদ্রিক্ত আঙ্গিক, মানসিক ও বাচিক আকস্মিক ব্যাকুলতার নাম আবেগ। ইষ্টজ আবেগ দেবভক্তি, গুরুমান্য, প্রিয়সন্দর্শন, প্রিয়সংবাদ, সম্পদবৃদ্ধি ইত্যাদি বিভাব থেকে জাত। অনিষ্টজ আবেগ অগ্নিসংযোগ-অতিবৃষ্টি-ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক বিপদ, হস্তী-চৌর-সর্পাদি দর্শন অথবা অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনারূপ বিভাব থেকে উদ্ভূত। ইষ্টজাত আবেগ অভ্যুত্থান, পুলক, আলিঙ্গন, বস্ত্রাদি প্রদান ইত্যাদি আঙ্গিক অনুভাব, হর্ষ-বিস্ময়াদি মানস অনুভাব এবং স্তুতি-চাটুবাক্য-প্রশস্তি ইত্যাদি বাচিক অনুভাবের দ্বারা অভিনেয়। অনিষ্টজাত আবেগ সর্বাঙ্গের বিস্রস্তভাব, মুখবৈবর্ণ্য, শরীরের সঙ্কোচন, দ্রুত ধাবন, আকুলভাবে নিরীক্ষণ, ত্বরিতগতিতে পলায়ন, পশ্চাতে অবলোকন, শস্ত্রগ্রহণ, ভূমিতে পতন, কম্প, স্বেদ, স্তম্ভাদি আঙ্গিক অনুভাব; শঙ্কা, বিষাদ, ভয়াদি মানস অনুভাব এবং ক্রন্দন, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ, অসম্বদ্ধ বাক্যপ্রয়োগাদি বাচিক অনুভাবের দ্বারা অভিনেয়। ইষ্টজ ও অনিষ্টজ উভয়প্রকার আবেগে উত্তম শ্রেণীর পাত্রের চিত্তস্থৈর্য্য এবং অধম শ্রেণীর পাত্রের চিত্তচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়।

১১. মতি – নাট্যদর্পণে 'মতি' নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণে বলা হচ্ছে – 'প্রতিভানং মতিঃ শাস্ত্রতর্কাদ্ ভ্রান্তিচ্ছিদাদিকৃৎ' (না.দ. ৩/৩৩) – শাস্ত্রবিষয়ক চিন্তন, উপদেশ, তত্ত্ব, বিধিনিষেধ-

সম্ভাবনাপ্রত্যয়-অন্বয়ব্যতিরেকাদিরূপ তর্ক ইত্যাদির দ্বারা ভ্রান্তি ও সংশয়ের অপনোদনপূর্বক উদ্ভাসিত প্রতিভার নাম মতি। দশরূপকের মতিলক্ষণটি-ও প্রায় অনুরূপ – 'ভ্রান্তিচ্ছেদোপদেশাভ্যাং শাস্ত্রাদের্তত্ত্বধীর্মতিঃ' (দশ.রূ. ৪/২৭)। অন্যদিকে দর্পণকারের মতে, নীতিশাস্ত্রানুসারে পদার্থনির্ধারণের নাম মতি – 'নীতিমার্গানুসৃত্যাদেরর্থনির্ধারণং মতিঃ' (সা.দ. ৩/১৬৪)। সন্দেহনিরসন, উপদেশদান, শাস্ত্রার্থচিন্তা ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

১২. ব্যাধি – নাট্যদর্পণোক্ত ব্যাধিলক্ষণটি হল – 'দোষেভ্যো2ঙ্গমনঃক্লেশঃ ব্যাধিঃ স্বনিতকম্পবান্' (না.দ. ৩/৩৩) – বায়ু, পিত্ত ও কফের সন্নিপাত অর্থাৎ বিকারবশতঃ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের নাম ব্যাধি। নাট্যশাস্ত্রমতে, জ্বর প্রভৃতি এর প্রকারভেদ। জ্বর দুইপ্রকার – সশীত ও সদাহ। ভাবপ্রকাশনে-ও বলা হয়েছে – 'ব্যাধির্জ্বরাত্মা দ্বেধা স্যাদুষ্ণশীতবিভাগতঃ' (ভাব.প্র.১/১৫৬)। 'স্বনিত' অর্থাৎ আর্তস্বর, মুখের বিশুষ্ক ভাব, দন্তবাদ্য, শীতলতার ইচ্ছা, অঙ্গসমূহের বিক্ষিপ্ত ভাব, সন্তাপ ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

১৩. স্মৃতি – 'দৃষ্টাভাসঃ স্মৃতিস্তুল্যদৃষ্ট্যাদের্ভ্রূন্নতিক্রিয়া' (না.দ.৩/৩৪) – সাদৃশ্যবোধের দ্বারা পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞানকে স্মৃতি বলা হয়। সদৃশশ্রবণ, সদৃশচিন্তন, সংস্কার, রাত্রির পশ্চাদ্‌ভাগে নিদ্রাচ্ছেদ, অবধান, পুনঃ পুনঃ পরিশীলনের দ্বারা দর্শনাদিবিষয়ে পটুতাবিধান ইত্যাদি বিভাব থেকে স্মৃতির উৎপত্তি। ভ্রূযুগলের উন্নয়ন, মস্তকের কম্পন, অবলোকন ইত্যাদির দ্বারা স্মৃতির অভিনয় কর্তব্য।

১৪. ধৃতি – নাট্যদর্পণসম্মত 'ধৃতি' নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণটি হল– 'ধৃতির্জ্ঞানেষ্টলাভাদেঃ সন্তুষ্টির্দেহপুষ্টিকৃৎ' (না.দ. ৩/৩৪) – বহুবিদ্যায় পারদর্শিতা, বিবেকজ্ঞান, ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন আপ্তকামতার ভাবকে ধৃতি বলা হয়। শৌচাচরণ, ক্রীড়া, দেবভক্তি, বিশিষ্ট জ্ঞান, বিশিষ্ট ক্ষমতা ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা এর উৎপত্তি । নাটকরক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে, সুখ ও দুঃখে সমত্বের ভাব থেকে ধৃতির উৎপত্তি – 'সুখদুঃখেষু সমত্বেন' (না.ল.র. সপ্তদশ অধ্যায়) । অপ্রাপ্ত-অতীত-ক্ষতিপ্রাপ্ত-বিনষ্ট বিষয়াদির জন্য অনুতাপহীনতা, শারীরিক উন্নতি, স্বাস্থ্যবর্ধন ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

১৫. অমর্ষ – নাট্যদর্পণধৃত অমর্ষলক্ষণে বলা হচ্ছে – 'ক্ষেপাদেঃ প্রতিকারেচ্ছামর্ষো2স্মিন্ কম্পনাদয়ঃ' (না.দ.৩/৩৫) – তিরস্কার, ভৎর্সনা, অবমাননা ইত্যাদির প্রতিকারের ইচ্ছার নাম অমর্ষ। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে নিন্দা, আক্ষেপ, অপমান প্রভৃতি হেতু জাত অভিনিবিষ্টতাকে অমর্ষরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দশরূপককারের ভাষায়– 'অধিক্ষেপাপমানাদেরমর্ষো2ভিনিবিষ্টতা' (দশ.রূ.৪/১৮) । নাট্যশাস্ত্রে আরো বলা হচ্ছে, অধিকতর

বিদ্যা, ঐশ্বর্য ও বলশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সভায় উপহসিত বা নিন্দিত উদ্যমী ব্যক্তির চিত্তে অমর্ষের জন্ম হয় –

"আক্ষিপ্তানাং সভামধ্যে বিদ্যাশৌর্যবলাধিকৈঃ ।

নৃণামুৎসাহসযোগাদমর্ষো নাম জায়তে ॥" (না.শা. ৭/৭৮)

কম্পন, অধোমুখে চিন্তন, প্রস্বেদ, উৎসাহ, ধ্যান, উপায় অন্বেষণ, তর্জন, তাড়ন ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা অমর্ষের অভিনয় করণীয়।

তিরস্কার, অপমানাদির প্রতিকারবিধানের ইচ্ছার নাম অমর্ষ; অপমানাদির অভাবসত্ত্বে-ও অপরের অনর্থকরণের ইচ্ছার নাম ক্রোধ – এই হল অমর্ষ ও ক্রোধের পার্থক্য। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'অপকারিণি স্বয়মপকরণাভিলাষঃ প্রতিকারেচ্ছা,পরস্যাপকারাভাবে2পি পরানর্থকরণাভিপ্রায়রূপঃ ক্রোধ ইত্যনয়োর্ভেদঃ'। [১২০]

১৬. মরণ – নাট্যদর্পণে নির্ণীত 'মরণ' নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণটি হল – 'ব্যাধ্যাদের্মৃত্যুসংকল্পঃ মরণং বিকলেন্দ্রিয়ম্' (না.দ. ৩/৩৫) – বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-জ্বর-বিষর্চিকা(কলেরা)-পিটক(ফোঁড়া) ইত্যাদি ব্যাধি, অস্ত্রাঘাত, বিষপান, সর্পদংশন, শ্বাপদ-গজ-অশ্বাদির আক্রমণ, বাহনভঙ্গ, উচ্চস্থান থেকে পতন ইত্যাদি কারণে উৎপন্ন মৃত্যুসংকল্পের নাম মরণ। 'মৃত্যুসংকল্প' পদের অর্থ হল – দুষ্প্রতিকার্য কোনো অনর্থের কারণে আশু মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে – 'মৃত্যুসঙ্কল্পো দুষ্প্রতিকারো2য়মনর্থস্তস্মাদবশ্যং মরিষ্যামীত্যধ্যবসায়ঃ'। [১২১] ইন্দ্রিয়সমূহের বৈকল্য, বিহ্বল আচরণ, হিক্কা, নিশ্বাস, প্রিয়জনদের নিরীক্ষণ, অস্পষ্ট বাক্‌প্রয়োগ, মুখের মালিন্য, সহসা ভূমিতে পতন, কম্পন, স্ফুরণ, কৃশতা, ফেনমোচন, হস্তস্কন্ধাদি অঙ্গের জড়তা, গাত্রবিক্ষেপ ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখ্য যে, নাট্যদর্পণোক্ত 'মরণ' নামক ব্যভিচারিভাবের অর্থ হল, ব্যাধ্যাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়বৈকল্যের কারণে মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া; প্রাণবিয়োগরূপ মৃত্যু এই 'মরণ' পদের ঈপ্সিত অর্থ নয়। কারণ, প্রাণবিয়োগরূপ মৃত্যুর মঞ্চে প্রদর্শন সর্বথা নিষিদ্ধ; অতএব তার বিভাব-অনুভাব-অভিনয়াদি বিষয়ে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'প্রাণানিরোধরূপং তু মরণং ন নাট্যে প্রযোজ্যমিতি ন তস্য বিভাবানুভাবস্বরূপাণি প্রতিপাদ্যন্ত ইতি'। [১২২]

এক-ই সঙ্গে এ-ও উল্লেখ্য যে, মঞ্চে মৃত্যুপ্রদর্শন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বে-ও, নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু 'মরণ' নামক এই ব্যভিচারিভাবটি 'মৃত্যু' অর্থে-ই আলোচিত হয়েছে। ব্যাধিজ ও অভিঘাতজ ভেদে মরণের দ্বৈবিধ্য এবং এদের বিবিধ লক্ষণ বিষয়ে-ও এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দশরূপককার ধনঞ্জয় 'মরণ' নামক এই ব্যভিচারিভাবটির লক্ষণ সুব্যক্ত বলে এর ব্যাখ্যা করেননি – 'মরণং সুপ্রসিদ্ধত্বাদনর্থত্বাচ্চ নোচ্যতে' (দশ.রূ.৪/২১)। আচার্য শারদাতনয় নাট্যশাস্ত্রানুসারে মরণের স্বরূপ ও তার দ্বৈবিধ্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দর্পণকার তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত লক্ষণে শরাদিপ্রয়োগে প্রাণত্যাগকে মরণ নামে অভিহিত করেছেন।

১৭. মোহ – নাট্যদর্পণধৃত মোহলক্ষণটি হল – 'অচৈতন্যং প্রহারাদেঃ মোহো2ত্রাঘূর্ণনাদয়ঃ' (না.দ. ৩/৩৬) – মমর্ন্তুদ প্রহার, তীব্র বেদনা, অপ্রতিকার্য ব্যথা, চৌরদর্শন, রাজদর্শন, ব্যাঘ্রাদির আক্রমণ, রাজ্যবিপ্লব, অগ্নিসংযোগ, জলোচ্ছ্বাস, শত্রুদর্শন, শত্রুবিষয়ে শ্রবণ ইত্যাদির দ্বারা উদ্ভূত অচৈতন্য দশার নাম মোহ। 'অচৈতন্য' পদের দ্বারা নিশ্চেতন, চৈতন্যহীন এরূপ অর্থের গ্রহণ হবে না। এখানে 'অচৈতন্য' পদের অর্থ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিজ্ঞানাভাব অর্থাৎ চিত্তবৈকল্যের কারণে শুভাশুভ জ্ঞানের লোপ। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'অচৈতন্যং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিজ্ঞানাভাবঃ, ন তু সর্বথা গতচেতনত্বম্'। [১২৩] আচার্য সাগরনন্দীর মতে, দুর্বিপাক, তীব্র আবেগ ও অনবরত শত্রুতাস্মরণ ইত্যাদির দ্বারা মোহের জন্ম – 'ব্যসনাবেগবৈরানুস্মরণাদিভিঃ' (না.ল.র.সপ্তদশ অধ্যায়)। অন্যদিকে দর্পণকারের মতে, ভয়, দুঃখ, আবেগ ও অতিরিক্ত চিন্তার ফলে জাত চিত্তবৈকল্যের নাম মোহ– 'মোহো বিচিন্ততা ভীতিদুঃখাবেগানুচিন্তনৈঃ' (সা.দ.৩/১৫০)। মস্তকঘূর্ণন, ভ্রমণ, পতন, ইন্দ্রিয়বিকলতা ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা মোহের অভিনয় করণীয়।

১৮. নিদ্রা – নাট্যদর্পণসম্মত 'নিদ্রা' নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণটি হল – 'ইন্দ্রিয়াব্যাপৃতির্নিদ্রা খেদাদের্মূর্ধকম্পনী'(না.দ.৩/৩৬) – খেদ অর্থাৎ পরিশ্রম, আলস্য, দৌর্বল্য, রাত্রিজাগরণ, গুরুভোজন, মদ্যপান, শ্রম, ক্লান্তি, চিন্তা, শয়নের ইচ্ছা ইত্যাদি কারণে ইন্দ্রিয়সমূহের নিজ-নিজ ব্যাপারে বিরতি বা বিরামের নাম নিদ্রা। দর্পণকারের মতে, পরিশ্রম, মদ্যপানজনিত মত্ততা ইত্যাদি কারণে উৎপন্ন চিত্তের নিশ্চলতার নাম নিদ্রা – 'চেতঃ সংমীলনং নিদ্রা শ্রমক্লমমদাদিজা' (সা.দ. ৩/১৫৮)।

নাট্যদর্পণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, কেবল চক্ষুঃ ইত্যাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয় থেকে বিরত হওয়ার নাম নিদ্রা; অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের ক্রিয়া কিন্তু নিদ্রার মধ্যে-ও চলতে থাকে। বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – 'ইন্দ্রিয়াণি স্পর্শনাদীনি, ন তু মনস্তস্য নিদ্রায়ামপি ব্যাপারাত্'। [১২৪]

মূর্ধার কম্পন, জৃম্ভণ, মুখব্যাদান, নিঃশ্বাস, নেত্রঘূর্ণন, অঙ্গভঙ্গি, অক্ষিমীলন, সর্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রতি অনীহা ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা নিদ্রার অভিনয় করণীয়।

১৯. সুপ্ত – নিদ্রার-ই গাঢ়তম অবস্থার নাম সুপ্ত। নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণে তাই বলা হয়েছে – 'সুপ্তং নিদ্রাপ্রকর্ষো2ত্র স্বপ্নায়িত স্বমোহেন' (না.দ. ৩/৩৭) – স্বপ্নদর্শন, স্বপ্নমধ্যে কথা বলা ইত্যাদি সুপ্তের

লক্ষণ। নিদ্রার অনুরূপ অনুভাবাদির দ্বারা সুপ্তের-ও অভিনয় করণীয়। নিদ্রায় মনের অবধান বর্তমান থাকে; তমোগুণের প্রাধান্যের কারণে সুপ্তমধ্যে মনের ব্যাপার উপরুদ্ধ হয়ে যায় – এই হল নিদ্রা ও সুপ্তের মধ্যে পার্থক্য। বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'নিদ্রায়াং মনসো2বধানমস্তি, অত্র তু তদপি মনাগুপরুধ্যত ইতি ভেদঃ'।[১২৫]

২০. ঔগ্র্য – নাট্যদর্পণসম্মত ঔগ্র্যলক্ষণটি হল – 'দুষ্টে2পরাধান্নৈর্ঘৃণ্যম্ ঔগ্র্যং বন্ধবধাদিভিঃ' (না. দ. ৩/৩৭) – দুষ্ট, হিংস্র, মিথ্যাচারী, বঞ্চক ব্যক্তিদের প্রতি রাজাদির নির্দয় ক্রোধের নাম ঔগ্র্য। অপরাধ, অপকার্য, অসৎপ্রলাপ, বাক্‌পারুষ্য, চৌর্যাদি বিভাবের দ্বারা এর উৎপত্তি। দর্পণকারের মতে, শৌর্য, অপরাধ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত চণ্ডভাবের নাম উগ্রতা – 'শৌর্যাপরাধাদিভবং ভবেচ্চণ্ডমুগ্রতা'(সা.দ.৩/১৪৯)। অন্যদিকে ভাবপ্রকাশনকার শারদাতনয়ের মতে, পুত্র-মিত্র-স্ত্রী প্রমুখের বধবন্ধনাদি থেকে ঔগ্র্যের উদ্ভব – 'পুত্রমিত্রকলত্রাদিদ্রোহাদেবোগ্রতা ভবেৎ'(ভাব.প্র.১/১৫৫)। বধ, বন্ধন, তাড়ন, ভৎর্সনা, স্বেদ, শিরঃকম্প ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

২১. হর্ষ – হর্ষের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'হর্ষঃ প্রসত্তিরিষ্টাপ্তে অত্র স্বেদাশ্রুগদ্‌গদাঃ' (না.দ.৩/৩৮) – লক্ষণোক্ত 'ইষ্ট'পদটির প্রিয়সংযোগ ও অপ্রিয়বিয়োগ – এই দুটি অর্থ। এমত ইষ্টলাভ, দেবতা-গুরু-রাজা-প্রভু প্রমুখের অনুগ্রহ লাভ, উত্তম ভোজন, সুন্দর বস্ত্র, ধনলাভ, পুত্রপ্রাপ্তি, বিষয়োপভোগ ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন চিত্তের ঔদার্য ও প্রসন্নতার নাম হর্ষ। স্বেদ, অশ্রু, গদ্‌গদ ভাষণ, পুলক, প্রিয়বাক্য, নেত্রমুখাদির প্রসন্নভাব ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা হর্ষের অভিনয় করণীয়।

২২. বিষাদ – 'বিষাদ' নামক ব্যভিচারিভাবের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'বিষাদস্তান্তি রিষ্টস্যানাপ্তের্নিঃশ্বাসচিন্তনৈঃ' (না.দ.৩/৩৮)– দৈবপ্রাতিকূল্যাদি কারণবশতঃ প্রারব্ধ কার্যের অসমাপ্তি এবং অনভীপ্সিত লাভাদি থেকে জাত অনুৎসাহাত্মক চিত্তসন্তাপের নাম বিষাদ। আচার্য সাগরনন্দীর মতে, বিপৎপাত এবং কর্তব্যনিষ্পাদনে অসামর্থ্য থেকে বিষাদের জন্ম – 'বিপদ্যোগকর্তব্যানিস্ত রাদিভিঃ' (না.ল.র. সপ্তদশ অধ্যায়)। অন্যদিকে দর্পণকারের মতে, উপায়ের অভাবজনিত বলহানির নাম বিষাদ – 'উপায়াভাবজন্মা তু বিষাদঃ সত্ত্বসংক্ষয়ঃ' (সা.দ. ৩/১৭০)। নিঃশ্বাসত্যাগ, উপায়চিন্ত ন, সহায় অন্বেষণ, বিমনাভাব ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতির ব্যক্তির বিষাদের অভিনয় করণীয়; নীচপ্রকৃতির ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মুখের শুষ্কভাব, নিদ্রা, ধ্যান, মুখলেহনাদি দ্বারা বিষাদের অভিনয় করণীয়।

২৩. উন্মাদ – 'মনো বিপ্লুতিরুন্মাদঃ গ্রহদোষৈরযুক্তকৃৎ' (না.দ. ৩/৩৯) – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত 'উন্মাদ' নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণ। মনের একান্ত অবিস্রস্ত, অসম্বদ্ধ, অনবস্থিত, বিহ্বল অবস্থার নাম উন্মাদ। দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতে, সন্নিপাত, গ্রহের প্রভাব ইত্যাদির ফলে চিন্তা না করে কাজ করাকে উন্মাদ বলা হয় – 'অপেক্ষাকারিতোন্মাদঃ সন্নিপাতগ্রহাদিভিঃ' (দশ.রূ.৪/৩০)। অন্যদিকে দর্পণকারের মতে, কাম, শোক, ভয়াদিজনিত চিত্তসংমোহের নাম উন্মাদ – 'চিত্তসংমোহ উন্মাদঃ কামশোকভয়াদিভিঃ' (সা.দ. ৩/১৬১)। অকারণ নৃত্য-গীত- পাঠ-উত্থান-শয়ন-দ্রুতধাবন-রোদন-চিৎকার, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, অকারণ হাস্য, ভস্ম ও ধূলি গাত্রে লেপন, নির্মাল্য-ছিন্নবস্ত্র-ঘটের মুখ-সরা ইত্যাদি আভরণরূপে ধারণ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা উন্মাদের অভিনয় করণীয়।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে অপস্মার এবং উন্মাদের প্রভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। অপস্মার গ্রহদোষের প্রভাবে হতে পারে; কিন্তু উন্মাদে গ্রহদোষের কোনো সংস্রব নেই। অপস্মার বীভৎস ও ভয়ানকরসের ব্যভিচারিভাব; উন্মাদ উত্তমব্যক্তির ক্ষেত্রে শৃঙ্গারের এবং অধমব্যক্তির ক্ষেত্রে করুণরসের ব্যভিচারিভাব। অপস্মারে মনের বিকলতা; উন্মাদে মনের সম্পূর্ণ অনবস্থিতি – এই হল অপস্মার ও উন্মাদের পার্থক্য।

২৪. দৈন্য – নাট্যদর্পণোক্ত দৈন্যলক্ষণটি হল – 'আপদঃ স্বান্তনোচত্বং দৈন্যং কার্ষ্ণ্যাবগুণ্ঠনৈঃ' (না.দ. ৩/৩৯) – ন্যক্কারাদি দুর্গতির কারণে উদ্রিক্ত মনস্তাপের নাম দৈন্য। মুখের কৃষ্ণভাব, অবগুণ্ঠন, দেহসংস্কারবর্জন, ভূষণবাহুল্যপরিহার, বস্ত্রমালিন্য ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা দৈন্যের অভিনয় করণীয়।

২৫. ব্রীড়া – নাট্যদর্পণসম্মত 'ব্রীড়া' নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণটি হল – 'ব্রীড়ানুতাপগুর্বাদেঃ অধার্ষ্ট্যং গাত্রগোপকম্' (না.দ. ৩/৪০) – গুরু-মাতা-পিতা প্রমুখ পূজ্যব্যক্তিদের আদেশ লঙ্ঘন, তাঁদের অবজ্ঞা, মর্যাদাহানি, তাঁদের যথাযথ স্তুতিবিধান না করা, প্রতিজ্ঞার অপালন ইত্যাদি অকৃত্যকরণের পর উৎপন্ন মনস্তাপের নাম ব্রীড়া। অপ্রগল্ভতা, লজ্জিত ভাব, দেহসঙ্গোপন, অধোমুখে চিন্তা, নখের নিস্তোদন (নখ খোঁটা), ভূমিতে নখ দিয়ে আঁচড় কাটা, বস্ত্র-অঙ্গুরীয়াদি বারংবার স্পর্শ করা ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা ব্রীড়ার অভিনয় করণীয়।

২৬. ত্রাস – নাট্যদর্পণধৃত 'ত্রাস' নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণটি হল – 'ঘোরাচ্চকিত ত্রাসঃ কায়সঙ্কোচকম্পিতৈঃ' (না.দ. ৩/৪০) – ভয়ানক ঝড়-প্রবলবায়ু-ভূমিকম্পাদি নির্ঘাত, অশনিপাত, প্রচণ্ড নাদ, প্রচণ্ড বীরত্ব, ভূতদর্শন, শবদর্শন ইত্যাদির ফলে উৎপন্ন ভয়ের নাম ত্রাস। কায়সঙ্কোচন, কম্পন, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, মূর্ছা, আকুলিত ভাষণ ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

'চকিত' পদের অর্থ প্রারম্ভিক স্বল্প উদ্বেগযুক্ত চমৎকারী কোনো বিষয়। ত্রাস কিন্তু চকিত নয়; এতে চমৎকৃতির স্থান নেই। অনর্থসম্ভাবনায় উৎপন্ন কেবলমাত্র প্রচণ্ড ভীতির নাম ত্রাস। বৃত্তিতে তাই

বলা হচ্ছে – ''চকিতোদ্বেগকারী চমৎকারঃ। অনর্থসম্ভাবনাতঃ সত্ত্বভ্রংশো ভয়মিত্যনয়োর্ভেদঃ''।[১২৬] নাটকলক্ষণরত্নকোশে অবশ্য ত্রাসের ঠিক বিপরীত লক্ষণের কথা বলা হয়েছে – 'ভয়াৎ পৃথক্, উদ্বেগস্বরূপঃ' (না.ল.র.সপ্তদশ অধ্যায়)।

২৭. তর্ক – 'তর্ক' নামক ব্যভিচারিভাবের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'একসম্ভাবনং তর্কঃ বাদাদেরঙ্গনর্তকঃ' (না.দ. ৩/৪১) – বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ বিচার-বিমর্শ,সন্দেহভঞ্জন, বলবত্তর যুক্তি প্রদর্শন ইত্যাদির দ্বারা কোনো এক পক্ষের 'সম্ভাবনা' অর্থাৎ জয়প্রতীতির নাম তর্ক। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে অতিসংক্ষেপে সন্দেহজাত বিচারকে তর্ক নামে অভিহিত করা হয়েছে – 'তর্কো বিচারঃ সন্দেহাদ্' (দশ.রূ. ৪/২৯)। ভ্রূ,মস্তক,অঙ্গুলি প্রভৃতি অঙ্গের কম্পন-নর্তনাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

২৮. গর্ব – 'গর্ব' নামক ব্যভিচারিভাবের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল - 'আত্মন্যাধিক্যধীর্গর্বঃ বিদ্যাদেরন্যরীঢ়য়া' (না.দ.৩/৪১) – 'আধিক্যধীঃ' পদের ব্যাখ্যায় বৃত্তিতে বলা হচ্ছে – 'আধিক্যধীঃ পরজুগুপ্সাক্রান্তঃ স্বস্মিন্ বহুমানঃ'[১২৭]– অপরের প্রতি অবজ্ঞা, অপমান, নিন্দাদিপূর্বক স্বীয় উত্তমন্যতাবোধ, বংশ, জাতি, বুদ্ধি, বিদ্যা, বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রিয়পাত্র হওয়া, যৌবন,ঐশ্বর্য ইত্যাদির কারণে উৎপন্ন এই অহংবোধের নাম গর্ব। আচার্য সাগরনন্দীর মতে, এই ব্যভিচারিভাবটি কেবলমাত্র মধ্যমশ্রেণীর পাত্রদের মধ্যে পরিদৃষ্ট – 'যৌবনৈশ্বর্যবিদ্যাদিভির্মধ্যমানাম্' (না.ল.র. সপ্তদশ অধ্যায়)। 'রীঢ়া' অর্থাৎ অবজ্ঞা, বাক্পারুষ্য, অসূয়া, ধর্ষণ ,উত্তর না দেওয়া, অঙ্গাদির অবলোকন, অলঙ্কারাদির স্থানবিপর্যয় প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা গর্বের অভিনয় করণীয়।

২৯. ঔৎসুক্য – 'ইষ্টাভিমুখ্যমৌৎসুক্যং স্মরণাঘাত্ ত্বরাদিভিঃ' (না.দ. ৩/৪২) – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত ঔৎসুক্য নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণ। বিরহিত অবস্থায় প্রিয়জনের স্মরণ, মনোজ্ঞ বস্তুসমূহের দর্শন, প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গলাভের ইচ্ছা ইত্যাদি কারণে উদ্ভূত মানস অধীরতার নাম ঔৎসুক্য। নাট্যদর্পণের এই লক্ষণটি নাট্যশাস্ত্রানুসারী। নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য সাগরনন্দী-ও অনুরূপভাবে ঔৎসুক্যের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। অন্যদিকে দশরূপককার ও দর্পণকারের অভিমতটি একটু পৃথক। তাঁদের মতে, রতি-সম্ভ্রমাদি ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তির ফলে কালক্ষেপজনিত অসহিষ্ণুতার নাম ঔৎসুক্য – 'ইষ্টানবাপ্তেরৌৎসুক্যং কালক্ষেপাসহিষ্ণুতা' (সা.দ.৩/১৬০)। মন-বাক্-কায়-দৃষ্টির চঞ্চলতা, কর্তব্যবিস্মৃতি, দীর্ঘনিঃশ্বাস, অসম্বদ্ধ বচন, স্বেদ, হস্তপাদাদির বিক্ষেপ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা ঔৎসুক্যের অভিনয় করণীয়।

৩০. অবহিত্থা – নাট্যদর্পণধৃত অবহিত্থা নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণটি হল – 'ধার্ষ্ট্যাদের্বিক্রিয়ারোধো2বহিত্থা2ত্র ক্রিয়ান্তরম্' (না.দ.৩/৪২)– প্রাগল্ভ্য, ভয়, লজ্জা, গর্ব, কুটিলতা

ইত্যাদি মনোভাবের প্রকাশক ভ্রূবিকার, মুখরাগ ইত্যাদি বাহ্যবিকারের প্রচ্ছাদন বা সংবরণের নাম অবহিত্থা। কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়সমূহের নয়,অন্তরিন্দ্রিয় মনের বৃত্তিসমূহের রোধ-ও অবহিত্থার অংশ। দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণাদি অপরাপর গ্রন্থে-ও ভয়, গৌরব, লজ্জা প্রভৃতি কারণে জাত হর্ষাদির চিহ্নগোপনকে অবহিত্থা রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে – 'ভয়গৌরবলজ্জাদের্হর্ষাদ্যাকারগুপ্তিরবহিত্থা' (সা.দ. ৩/১৫৯)। আরব্ধ কার্য ত্যাগ করে কার্যান্তরগ্রহণ, অন্যত্র অবলোকন, কথাচ্ছেদ, অন্যকথন, মিথ্যা স্থৈর্য ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা অবহিত্থার অভিনয় করণীয়।

৩১. জাড্য – জাড্য নামক ব্যভিচারিভাবের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'জাড্যমিষ্টাদিতঃ কার্যাজ্ঞানং মৌননিমেষণৈঃ' (না.দ. ৩/৪৩) – ইষ্ট ও অনিষ্টের দর্শন ও শ্রবণহেতু অথবা ব্যাধিহেতু উৎপন্ন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার নাম জাড্য। মৌন অবলম্বন, অনিমেষ নিরীক্ষণ, পারবশ্য ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অপস্মার এবং মোহ নামক ব্যভিচারিভাব দু'টি ইন্দ্রিয়বৈকল্যজনিত অচৈতন্য থেকে উৎপন্ন। অন্যদিকে, ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব-স্ব ব্যাপারগ্রহণে সামর্থ্য সত্ত্বে-ও কর্তব্যনির্ধারণে বুদ্ধির অক্ষমতা থেকে জাড্যের উৎপত্তি – এই হল এদের প্রভেদ।

৩২. আলস্য – আলস্য নামক ব্যভিচারিভাবের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'কর্মানুৎসাহ আলস্যং শ্রমাদ্যাজৃম্ভিতাদিভিঃ' (না.দ. ৩/৪৩) – শ্রম, অত্যাহার, ব্যাধি, গর্ভ ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা উদ্ভূত অনুৎসাহের নাম আলস্য। স্ত্রী ও নীচজাতীয় ব্যক্তিরা এর আশ্রয়। জৃম্ভণ, উপবেশন, সর্বপ্রকার কার্যের প্রতি অনীহা প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, শ্রম একটি ব্যভিচারিভাব হলে-ও, আলস্যরূপ অপর একটি ব্যভিচারিভাবের প্রতি তার বিভাবত্বকল্পনায় কোনো দোষ নেই। শুধু বিভাব কেন, একটি ব্যভিচারিভাব অপর একটি ব্যভিচারিভাবের অনুভাব রূপে-ও স্বীকৃত হতে পারে, তাতে-ও কোনো বাধা নেই। কিন্তু একটি ব্যভিচারিভাব, কখনো-ই অপর একটি ব্যভিচারিভাবের ব্যভিচারিভাবরূপে কল্পিত হতে পারে না। কারণ, সেক্ষেত্রে অতিপ্রয়োগ ও অতিপ্রাধান্যের কারণে উদ্দিষ্ট ব্যভিচারিভাবটি স্থায়িভাবের স্তরে উন্নীত হয়ে যাবে – 'ব্যভিচারিতা তু পরস্পরং ব্যভিচারিণাং স্থায়িত্বপ্রসঙ্গাৎ দুষ্টৈব'।[১২৮]

৩৩. বিবোধ – 'নিদ্রাচ্ছেদো বিবোধশ্চ শব্দাদেরঙ্গভঙ্গত্বাৎ' (না.দ. ৩/৪৪) – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত বিবোধ নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণ। উচ্চশব্দ, স্পর্শ, স্বপ্নদর্শন, আহার বিপরিণাম

ইত্যাদি কারণে নিদ্রাচ্ছেদ ও নিদ্রাপগমের নাম বিবোধ। অঙ্গভঙ্গি, জৃম্ভণ, অক্ষিমর্দন, শয্যাত্যাগ, হস্ত াদির বিক্ষেপ, অঙ্গুলিমোটন ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

উল্লিখিত ব্যভিচারিভাবগুলির সবকটি-ই আভ্যন্তর বা মানস বিক্রিয়া। বাহ্যবিক্রিয়া অর্থাৎ অনুভাব থেকে এদের প্রতিটির অনুমান করা হয়ে থাকে। অন্তরে দৈন্যের উদয় হলে তার পরিচয় পাওয়া যায় সেই ভাবের প্রকাশক মালিন্য নামক বাহ্যবিক্রিয়াত্মক অনুভাবের দ্বারা। অনুরূপে ,অন্তরে ঔগ্র্যভাবের উন্মেষে শিরঃকম্প, তাড়ন, তর্জনাদি অনুভাব; বিষাদের উদয়ে অশ্রু, দীর্ঘশ্বাসাদি অনুভাব ইত্যাদির দ্বারা ব্যভিচারিভাবটি অনুভাবিত হয়।

নাট্যদর্পণধৃত ব্যভিচারিভাবসমূহের এই পর্যালোচনাটি সর্বাংশে নাট্যশাস্ত্রানুসারী; কেবল ক্ষুদ্র একটি পার্থক্য রয়েছে – নাট্যদর্পণোক্ত 'তর্ক' নামক ব্যভিচারিভাবটি নাট্যশাস্ত্রে 'বিতর্ক' রূপে অভিহিত।

দশরূপককার ধনঞ্জয়, ভাবপ্রকাশনকার আচার্য শারদাতনয় প্রমুখ মহর্ষি ভরতকে অনুসরণ করে-ই ব্যভিচারিভাবসমূহের আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে, বিশ্বনাথ কবিরাজ ও আচার্য সাগরনন্দীর পর্যালোচনাটি সর্বথা নাট্যশাস্ত্রানুগ নয়। দর্পণকার নাট্যশাস্ত্রোক্ত 'সুপ্ত' ও 'ব্রীড়া'-র পরিবর্তে 'স্বপ্ন' ও 'লজ্জা' নামক দুটি ব্যভিচারিভাব স্বীকার করেছেন। আচার্য সাগরনন্দীর তো মহর্ষি ভরতের সঙ্গে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নাট্যশাস্ত্রোক্ত 'বিবোধ'-কে নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'প্রবোধ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং নাট্যশাস্ত্রের 'সুপ্ত'-কে পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে 'শৌচ' নামক একটি ব্যভিচারিভাবকে স্বীকার করা হয়েছে। আচার্য সাগরনন্দীসম্মত ব্যভিচারিভাবের এই তালিকার সঙ্গে সর্বাংশে সাদৃশ্য রয়েছে সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব' গ্রন্থে মাতৃগুপ্তের রচনা রূপে উদ্ধৃত পরিগণনায়। সম্ভবতঃ মাতৃগুপ্ত 'নিদ্রা' ও 'সুপ্ত'-কে এক মনে করে নাট্যশাস্ত্রোক্ত সুপ্তকে বর্জন করেছিলেন (যদি-ও নাট্যশাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে নিদ্রা ও সুপ্ত এক নয়) এবং ব্যভিচারিভাবের সংখ্যা তেত্রিশটিকে স্থির রাখার জন্য 'শৌচ' নামক নতুন একটি ব্যভিচারিভাবের কল্পনা করেছিলেন। সাগরনন্দী সম্ভবতঃ মাতৃগুপ্তের রচনা থেকে-ই এই পরিগণনাটি গ্রহণ করেছিলেন। [১২৯]

নাটকলক্ষণরত্নকোশের ব্যভিচারিভাবের লক্ষণগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাবের মধ্যে মাত্র পনেরোটির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ডঃ. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই উদাহরণগুলির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। এগুলির বিষয় হয় রামায়ণের , নয় মহাভারতের এবং অল্প কয়েকটি ব্যতীত সবকটি উদাহরণ-ই অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত। এতদ্দৃষ্টে ডঃ. চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে,

এই উদাহরণগুলি অনুষ্টুভে রচিত কোনো নাট্যতত্ত্বের (সম্ভবতঃ মাতৃগুপ্তের) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । ১৩০

অনুভাব ঃ

রস, স্থায়িভাব এবং ব্যভিচারিভাবসমূহের বহিঃপ্রকাশক কার্যের নাম অনুভাব। বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় অনুভাবিত হয় বলে এই ভাবগুলির এই নাম। পূর্বে-ই অনুভাবের লক্ষণ, স্থায়ী প্রভৃতির সঙ্গে এগুলির সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এবার অনুভাবগুলির নাম ও তাদের লক্ষণবিষয়ক আলোচনায় নাট্যদর্পণকাররা প্রবৃত্ত হচ্ছেন।

বেপথু, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, অশ্রু, মূর্ছা, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, প্রসাদ, উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, ক্রন্দন, পরিদেবন, রোমহর্ষ, ভূমিতে নখের আঁচড়, ফিরে তাকানো, নখনিস্তোদন (নখ খোঁটা), ভ্রূকুটি, কটাক্ষ, তির্যগ্দৃষ্টি, অধোমুখে চিন্তন, নিরীক্ষণ, প্রশংসা,হাস্য, দান, চাটুকারিতা, মুখরাগ ইত্যাদি অজস্র প্রকার অনুভাব হতে পারে; এর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা স্থির করা যায় না।

নাট্যদর্পণে উক্ত তালিকার অন্তর্গত বেপথু থেকে বৈবর্ণ্য পর্যন্ত আটটি অনুভাবের আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যে, নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে নাট্যতত্ত্বমূলক অপরাপর সকল গ্রন্থে এই আটটি অনুভাব 'সাত্ত্বিক ভাব' নামে অভিহিত। নাট্যদর্পণে কিন্তু 'সাত্ত্বিক ভাব' নামক কোনো পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি।

সাত্ত্বিকভাবগুলি বস্তুতঃপক্ষে অনুভাব-ই। অন্য অনুভাবের সঙ্গে এদের পার্থক্যটি প্রকৃতিগত নয়, মাত্রাগত। সাত্ত্বিকভাবগুলি অনুভাবের অন্তর্গত বলে-ই মহর্ষি ভরতের রসনিষ্পত্তিসূত্রে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে সাত্ত্বিকভাবের পৃথক উল্লেখ হয়নি – 'সাত্ত্বিকাশ্চানুভাবরূপত্বাৎ ন পৃথগুক্তাঃ' (সা. দ. তৃতীয় পরিচ্ছেদ) ।

এই সাত্ত্বিকভাবসমূহ অনুভাবের অন্তর্গত হলে-ও, এদের কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সত্ত্বগুণজাত বিকারকে সাত্ত্বিকভাব বলা হয়। প্রশ্ন হতে পারে, ভাবমাত্র-ই চিত্তবৃত্তির ভেদ। সত্ত্বকে বর্জন করে কোনো ভাবের-ই অভিনয় সম্ভব নয়। তবে কেন কেবলমাত্র এই আটটিকে-ই সাত্ত্বিকভাব বলা হবে? নাট্যশাস্ত্রের ভাববিমর্শে এর উত্তর রয়েছে। মহর্ষি ভরতের মতে, এখানে সত্ত্ব শব্দের অর্থ 'মন' নয়; সত্ত্ব শব্দের (এখানে) অর্থ হল 'মন থেকে জাত'। তা সমাহিত চিত্ত হতে উৎপন্ন হয় – "ইহ সত্ত্বং নাম মনঃপ্রভবম্। তচ্চ সমাহিতমনস্ত্বাদ্ উৎপদ্যতে। মনসঃ সমাধৌ সত্ত্বনিষ্পত্তির্ভবতি"(না.শা. সপ্তম অধ্যায়)। পরভাবী দশরূপককার-ও এবিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন –

"পৃথগ্ভাবা ভবন্ত্যন্যে2নুভাবত্বে2পি সাত্ত্বিকাঃ।

সত্ত্বাদেব সমুৎপত্তেস্তচ্চ তদ্ভাবভাবনম্ ॥ ” (দশ.রূ. ৪/৪-৫)

দর্পণকারের মতে, সত্ত্ব হল নিজ আত্মায় অবস্থিত রসাদির উদ্বোধক কোনো এক আন্তরধর্ম – ‘সত্ত্বং নাম স্বাত্মবিশ্রামপ্রকাশকারী কশ্চনান্তরো ধর্মঃ’ (সা.দ. ৩/১৩৮)। ভাবপ্রকাশনকার আচার্য শারদাতনয়ের মতে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও আনন্দ ভেদে এই সত্ত্বের তিনটি প্রকার – ‘ত্রিধা সত্ত্বং ভবেদ্বুদ্ধিজ্ঞানানন্দবিভেদতঃ’ (ভাব.প্র. ১/১০০)। সাত্ত্বিকভাবগুলি সমাহিত চিত্তের এই সত্ত্বগুণসঞ্জাত বিকার; অতএব এগুলি শ্রেষ্ঠ অনুভাব।

অন্যমনা বা অসন্নিহিতমনা ব্যক্তির পক্ষে রোমাঞ্চ, অশ্রু, বৈবর্ণ্যাদি সুখদুঃখজনিত ভাবগুলির যথাযথ অভিনয় সম্ভব নয়। তাই লোকস্বভাবের যথাযথ অনুকরণের জন্য সমাহিত মনঃজাত এই সত্ত্বের প্রয়োজন। এই সত্ত্বসমভিপ্রেত সাত্ত্বিকভাবসমূহের দ্বারা-ই জনৈক কুশলী অভিনেতা স্বয়ং সুখী হলে-ও অনুকার্য চরিত্রের দুঃখাবস্থায় রোদন করেন, স্বয়ং বিষণ্ন হলে-ও অনুকার্য চরিত্রের সুখাবস্থায় হাস্য করেন।

এবার একে-একে বেপথু-আদি আটটি ভাবের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণগুলি আলোচনা করা যাক্ –

১. বেপথু – ‘বেপথু’ নামক অনুভাবের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – ‘ভয়াদের্বেপথুগাত্রস্পন্দো বাগাদিবিক্রিয়ঃ’ (না.দ. ৩/৪৬) – ভয়, রোগ, হর্ষ, শীত, রোষ, শ্রম, প্রিয়জনের স্পর্শ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন বাক্-গতি-চেষ্টাদির কম্পরূপ বিক্রিয়ার নাম বেপথু।

২. স্তম্ভ – নাট্যদর্পণধৃত ‘স্তম্ভ’লক্ষণে বলা হচ্ছে –‘যত্নে2প্যঙ্গাক্রিয়া স্তম্ভঃ হর্ষাদের্বা বিষাদবান্’ (না.দ. ৩/৪৬) – হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, ভয়, মদ, রোগাদি বিভাবের দ্বারা উদ্ভূত এবং হস্তপদাদির সক্রিয়তা সত্ত্বে-ও জড়তা, নিশ্চেষ্টগাত্রতা ও অবশভাবের নাম স্তম্ভ।

৩. রোমাঞ্চ – ‘রোমাঞ্চঃ প্রিয়দৃষ্ট্যাদেঃ রোমহর্ষো2ঙ্গমার্জনৈঃ’ (না.দ. ৩/৪৭) – এই হল নাট্যদর্পণসম্মত রোমাঞ্চ নামক অনুভাবের লক্ষণ। ব্যাধি, শীত, ক্রোধ, প্রিয়ব্যক্তির দৃষ্টিপাত, ইষ্টজনের স্পর্শ ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন রোমবিক্রিয়ার নাম রোমাঞ্চ। অঙ্গের কোমলতা, নেত্রবিকাশ, দন্তবাদ্য ইত্যাদির দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

৪. স্বরভেদ – ‘স্বরভেদঃ স্বরান্যত্বং মদাদের্হর্ষহাস্যকৃৎ’ (না.দ.৩/৪৭) – নাট্যদর্পণধৃত স্বরভেদ নামক অনুভাবের লক্ষণটি এইরূপ। মদ, ভয়, জরা, হর্ষ, ক্রোধ, অনুরাগ, রুক্ষতা, পারুষ্য ইত্যাদির কারণে উৎপন্ন হর্ষ, হাস্য, ব্রীড়া, নির্বেদাদিযুক্ত স্বরবিকৃতি, গদ্‌গদ ভাষণ প্রভৃতির নাম স্বরভেদ।

৫. অশ্রু – নাট্যদর্পণসম্মত 'অশ্রু' নামক অনুভাবের লক্ষণটি হল – 'অশ্রু নেত্রাম্বু শোকাদ্যৈঃ নাসাস্পন্দাক্ষিরুক্ষ্মণৈঃ' (না.দ. ৩/৪৮) – শোক, আনন্দ, অমর্ষ, ধূম, অঞ্জন, জৃম্ভণ, ভয়, পীড়া, হাস্য, অনিমেষ নিরীক্ষণ ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা জাত নেত্রোদ্ভূত বারির নাম অশ্রু। নাসিকার স্পন্দন, শ্লেষ্মাস্রবণ, অক্ষিমার্জন, নিষ্ঠীবন, গদ্‌গদ ভাষণ ইত্যাদির দ্বারা অশ্রুর অভিনয় করণীয়।

৬. মূর্ছন – 'মূর্ছনং ঘাতকোপাদ্যৈঃ স্বগ্লানির্ভূমিপাতনকৃৎ' (না.দ. ৩/৪৮) – এই হল নাট্যদর্পণধৃত মূর্ছন বা মূর্ছার লক্ষণ। নাট্যশাস্ত্রাদি গ্রন্থে এই অনুভাবটিকে 'প্রলয়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রচণ্ড আঘাত, ক্রোধ, মদ ইত্যাদির প্রভাবে চেষ্টা ও জ্ঞানের অভাবের নাম মূর্ছন। ইন্দ্রিয়বৈকল্য, ভূমিতে পতন, স্বেদ, ত্রাস ইত্যাদির দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

৭. স্বেদ – 'স্বেদ' নামক অনুভাবের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'স্বেদো রোমজলস্রাবঃ শ্রমাদের্ব্যজনগ্রহৈঃ' (না.দ. ৩/৪৯) – শ্রম, ভয়, হর্ষ, লজ্জা, রোগ, তাপ, গ্রহপ্রকোপ, দুঃখ, ব্যায়াম ইত্যাদির কারণে উৎপন্ন জলস্রাবের নাম স্বেদ। ব্যজন, বায়ুর ইচ্ছা, ললাটাদির মার্জনের দ্বারা স্বেদ অপনয়ন ইত্যাদির দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

৮. বৈবর্ণ্য – নাট্যদর্পণধৃত বৈবর্ণ্যলক্ষণটি হল – 'ছায়াবিকারো বৈবর্ণ্যং ক্ষেপাদের্দিগ্‌নিরীক্ষণৈঃ' (না.দ. ৩/৪৯) – তিরস্কার, সন্তাপ, ভয়, ক্রোধ, ব্যাধি, শীত, শ্রম, তীব্র রৌদ্র ইত্যাদি বিভাবের দ্বারা জাত মুখকান্তির বিকার ও বিপর্যয়ের নাম বৈবর্ণ্য। বিভিন্ন দিকে অবলোকন, নখনিস্তোদন, ব্রীড়া ইত্যাদির দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

নাট্যদর্পণধৃত এই অনুভাবের লক্ষণ ও আলোচনা সর্বাংশে নাট্যশাস্ত্রানুসারী। পরভাবী নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে আচার্য শারদাতনয়, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ-ও মহর্ষি ভরতকে অনুসরণ করে-ই উক্ত ভাবসমূহের পর্যালোচনা করেছেন। দশরূপককার ধনঞ্জয় এই আটটি ভাবের মধ্যে কেবলমাত্র স্তম্ভ ও প্রলয়ের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন; 'সুব্যক্ত' জ্ঞানে অবশিষ্ট ছয়টির আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেননি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রসতরঙ্গিনী গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য ভানুদত্ত 'জৃম্ভা' নামক নবম সাত্ত্বিক ভাব স্বীকার করেন – 'জৃম্ভা চ নবমঃ সাত্ত্বিকো ভাব ইতি প্রতিভাতি' (রসতরঙ্গিনী,চতুর্থ তরঙ্গ)।

অভিনয় ঃ

নাট্যদর্পণের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ আলোচ্য বিষয়টি হল অভিনয়। নাট্যশাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায়ে অভিনয়পদের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে বলা হচ্ছে – 'অভি' উপসর্গের পর 'ণীঞ্'-এই প্রাপণার্থক ধাতুর যোগে এই শব্দটির উৎপত্তি। 'অভিনী'-র উত্তর অচ্ প্রত্যয়যোগে অভিনয় শব্দটি সিদ্ধ। [১৩১]

আরো বলা হচ্ছে – অভি-পূর্বক নীঞ্ ধাতুর অর্থ আভিমুখ্যার্থনির্ধারণ। সাক্ষাৎভাবে নাট্যানুষ্ঠানের অর্থ নির্ণয়ের কারণে এই শব্দটি অভিনয় নামে জ্ঞাত –

"অভিপূর্বস্তু নীঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।

যস্মাৎ পদার্থান্নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ ॥" (না.শা. ৮/৬)

শাখা, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সংযুক্ত এই অভিনয়ব্যাপার সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানকে দর্শকসমক্ষে প্রতিভাত করে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও বলা হয়েছে, কবি বা নাট্যকারের রচনাকে সকলের সামনে উপস্থিত করে এই অভিনয় – 'আভিমুখ্যং নয়ত্যর্থং দ্রষ্টুঃ কবিবচঃ স্থিতম্' (না.ল.র. অষ্টাদশ অধ্যায়) ।

নাট্যদর্পণে 'আভিমুখ্য' পদের সাক্ষাৎকার অর্থটি গ্রহণপূর্বক, নাট্যবস্তুর সঙ্গে সামাজিকবর্গের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রধান সাধনকে অভিনয়রূপে অভিহিত করা হয়েছে – 'সামাজিকানামাভিমুখ্যেন সাক্ষাৎকারেণ নীয়তে প্রাপ্যতে অর্থো2নেনেত্যভিনয়ঃ'।[১৩২]

অন্যদিকে দর্পণকারের মতে, অবস্থার অনুকরণের নাম অভিনয়– 'ভবেদভিনয়ো2বস্থানুকারঃ' (সা.দ. ৬/০২)। অনুকরণ শব্দটির তাৎপর্য হল – আচার-আচরণ, বেশভূষা, বাক্যালাপ ইত্যাদির দ্বারা কবিবর্ণিত পাত্রপাত্রীর প্রতিটি অবস্থার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন, যার দ্বারা নটে ঐসব পাত্রপাত্রীর তাদাত্ম্যবোধ জন্মায়। যেমন – শ্রীরামচন্দ্রের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, বেশভূষাদির এমন অনুকরণ দক্ষ নটের করা উচিৎ,যার দ্বারা সামাজিকবর্গের দৃষ্টিতে নট-ই রামচন্দ্ররূপে প্রতিভাত হন। নট ও রামচন্দ্রের এই অভেদ-প্রতিপত্তির নাম-ই অবস্থার যথার্থ অনুকৃতি আর অবস্থার এই সার্থক অনুকরণ-ই হল অভিনয়। অভিনয়ের এই অনুকরণাত্মকতার কারণে-ই অ্যারিস্টটল্ অভিনয়কে 'mode of imitation' রূপে অভিহিত করেছেন।[১৩৩]

অনন্তর অভিনয়ের প্রকারভেদ। নাট্যশাস্ত্রাদি যাবতীয় গ্রন্থে অভিনয়ের চাতুর্বিধ্য স্বীকৃত হয়েছে – আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক–

"আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব হ্যাহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।

জ্ঞেয়স্ত্বভিনয়ো বিপ্রাঃ চতুর্ধা পরিকল্পিতঃ ॥"(না.শা. ৮/৯)

উল্লেখ্য, এই প্রধান চতুর্বিধ ভেদ ছাড়া-ও নাট্যশাস্ত্রে আরো বহু প্রকার অভিনয়ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সেগুলি-ও স্পর্শ করে যাওয়া যাক্ ।

আঙ্গিকাদি চতুষ্প্রকার অভিনয় ব্যতীত 'সামান্যাভিনয়' ও 'চিত্রাভিনয়' নামক আরো দুই প্রকার ভেদ নাট্যশাস্ত্রে স্বীকার করা হয়েছে। এর মধ্যে সামান্যাভিনয়কে পৃথক ভেদরূপে চিহ্নিত করা হলে-ও, আচার্য অভিনবগুপ্তর মতে, সর্বপ্রকার অভিনয়ে 'সামান্য' অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্যবহৃত বিষয়গুলি-ই এই অভিনয়ের বিষয়।[১৩৪] নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে-ও বলা হয়েছে, আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের দুটি

বা ততোধিকের একত্র সন্নিবেশে-ই সামান্যাভিনয়ের সৃষ্টি, অতএব আঙ্গিকাদি অভিনয়লক্ষণে-ই এর অন্তর্ভাব হয়ে যায়; পৃথকভাবে এটি স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই – 'অভিনয়দ্বয়-ত্রয়-চতুষ্টয়-সন্নিপাতরূপঃ সামান্যাভিনয়ঃ পুনর্বাচিকাদিলক্ষণেনৈব চরিতার্থ ইতি'।[১৩৫]

যাই হোক্, নাট্যশাস্ত্রধৃত সামান্যাভিনয়লক্ষণে বলা হয়েছে – মস্তক, হস্ত, কটি, বক্ষ, জঙ্ঘা, ঊরু ইত্যাদি অঙ্গের সমান প্রয়োগপূর্বক যে অভিনয়, তার নাম সামান্যাভিনয় –

''শিরোহস্তকটীবক্ষোজঙ্ঘোরুকরণেষু তু।

সমঃ কর্মবিভাগো যঃ সামান্যাভিনয়স্তু সঃ ॥'' (না.শা. ২২/৭৩)

এই সামান্যাভিনয় নাট্যজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা রসভাবযুক্ত ললিত হস্তসঞ্চালন এবং মৃদু অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা করণীয়। আভ্যন্তর ও বাহ্যভেদে এই অভিনয় দ্বিবিধ। অভ্রান্ত অঙ্গসঞ্চালন-লয়-তাল-কলার দ্বারা সমন্বিত, অসংভ্রান্ত (অর্থাৎ যাতে ব্যস্তভাব নেই), অনুদ্ধত, সুবিভক্ত পদালাপবিশিষ্ট, অকর্কশ, অনাকুল (অর্থাৎ সুস্থিত) – এরূপ অভিনয় আভ্যন্তর নামে জ্ঞাত। এই অভিনয় শাস্ত্রোক্ত লক্ষণানুসারী। এই অভিনয়-ই যখন বিপর্যস্ত, বিপরীত, অন্যথাকৃত, গীতবাদ্যবিহীন, ইচ্ছানুসারী গতি ও ক্রিয়াযুক্ত, অতএব অবশ্য-ই শাস্ত্রোক্ত নিয়মবহির্ভূত, তখন তার নাম বাহ্য।[১৩৬]

নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চবিংশ অধ্যায়টি চিত্রাভিনয়বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই আলোচনার প্রারম্ভে-ই মহর্ষি বলছেন যে, আঙ্গিকাদি অভিনয়চতুষ্টয়ের যে সকল বিচিত্র বৈশিষ্ট্য কখনো-কখনো পরিদৃষ্ট হয় এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলিতে যেগুলির বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি, তা-ই চিত্রাভিনয় নামে কথিত –

''অঙ্গাদ্যভিনয়স্যৈব যো বিশেষঃ ক্বচিৎ ক্বচিত্।

অনুক্ত উচ্যতে চিত্রঃ স চিত্রাভিনয়ঃ স্মৃতঃ ॥''(না.শা. ২৫/০১)

আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে, চিত্রাভিনয় সামান্যাভিনয়ের অংশবিশেষ। সামান্যাভিনয়ে রসের প্রাধান্য, চিত্রাভিনয়ে মূলতঃ তদুপযোগী বিভাবাদির প্রাধান্য – ''সামান্যাভিনয়স্য চিত্রাভিনয়ঃ শেষ ইত্যুক্তম্। কেবলসামান্যাধ্যায়ে রসাত্মকপ্রধানং পদার্থবিশেষমভিনয়ানাং সমানীকরণম্ । ইহ তু তদুপযোগী বিভাবাদিবিষয়ম্'' (না.শা. পঞ্চবিংশ অধ্যায়)। নাট্যদর্পণে-ও চিত্রাভিনয়ের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি। গ্রন্থকারদের মতে, মূলতঃ অঙ্গোপাঙ্গসঞ্চালনরূপ চিত্রাভিনয়কে সহজে-ই আঙ্গিক অভিনয়ের অন্তর্গত করা যায়; এর পৃথক স্বীকরণ নিষ্প্রয়োজন – 'যস্তু পঞ্চমশ্চিত্রাভিনয়ঃ প্রোক্তঃ, সো2প্যঙ্গোপাঙ্গকর্মবিশেষরূপত্বাদাঙ্গিক এবান্তর্ভবতি'।[১৩৭]

মহর্ষি ভরত অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যাভিনয়কে আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন – আবিদ্ধ ও সুকুমার –

"প্রয়োগো দ্বিবিধশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো নাটকাশ্রয়ঃ।

সুকুমারস্তথাবিদ্ধো নাট্যযুক্তিসমাশ্রয়ঃ ॥" (না.শা. ১৩/৫৮)

যে অভিনয়ের অঙ্গভঙ্গির মধ্যে ছেদন, ভেদন, যুদ্ধ, মায়া, ইন্দ্রজাল, পুস্তপ্রয়োগের বহুল সন্নিবেশ থাকে, তার নাম আবিদ্ধ অভিনয়। এতে পুরুষচরিত্রের সংখ্যা বেশি, নারীচরিত্রের সংখ্যা কম। এজাতীয় অভিনয়ে নাট্যের উগ্র, উদ্ধত, রাজসিক রূপের প্রকাশ। আবিদ্ধ অভিনয়ে তাই প্রায়শঃ-ই সাত্ত্বতী ও আরভটীবৃত্তির ব্যবহার হয়ে থাকে । ডিম, সমবকার, ব্যায়োগ ও ঈহামৃগ – এই রূপকগুলি আবিদ্ধ অভিনয়ের বিষয়। শৌর্য, বীর্য ও বলযুক্ত উদ্ধত মানব,দৈত্য,দানব ও রাক্ষসগণ এই অভিনয়ের প্রযোক্তা –

"যত্ত্বাবিদ্ধাঙ্গহারন্তু ছেদ্যভেদ্যাহবাত্মকম্ ।

মায়েন্দ্রজালবহুলং পুস্তনেপথ্যসংযুতম্ ॥

পুরুষৈর্বহুভির্যুক্তমল্পস্ত্রীকং তথৈব চ।

সাত্ত্বত্যারভটীযুক্তং নাট্যমাবিদ্ধসংজ্ঞিতম্ ॥" (না.শা. ১৩/৫৯,৬০)

অপরদিকে অভিনয় যখন কান্তকোমল, মমতামেদুর, হৃদয়রসে সিক্ত, তখন তার নাম সুকুমার। এর পাত্রপাত্রী প্রধানতঃ মানুষ। সুকুমার অভিনয় নৃত্য-গীত-বাদ্যে রমণীয় ও রমণীবহুল। এর বৃত্তি মূলতঃ কৈশিকী। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, বীথী, অংক ও নাটিকা – এই রূপকগুলি সুকুমার অভিনয়ের বিষয় –

"নাটকং সপ্রকরণং ভাণো বীথ্যঙ্কনাটিকে।

সুকুমারপ্রয়োগাণি মানুষেষ্বাশ্রিতাস্তু যে ॥" (না.শা. ১৩/৬৩)

নাটকলক্ষণরত্নকোশের একটি অভিমত প্রাসঙ্গিকবোধে উল্লেখ্য। আচার্য সাগরনন্দী এই গ্রন্থে বাক্য, সূচা, অঙ্কুর, শাখা এবং নিবৃত্ত্যঙ্কুর নামক পঞ্চবিধ অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন – "পঞ্চাভিনয়া ভবন্তি। যথা – বাক্যম্, সূচা, অঙ্কুরঃ, শাখা, নিবৃত্ত্যঙ্কুরশ্চেতি" (না.ল.র.ত্রয়োদশ অধ্যায়)। নাট্যশাস্ত্রে এগুলি 'শারীরাভিনয়' নামে অভিহিত এবং সেখানে ছয়প্রকার শারীরাভিনয়ের কথা বলা হয়েছে –

"ষড়াত্মকসু শারীরো বাক্যং সূচাঙ্কুরস্তথা ।

শাখা নাট্যায়িতং চৈব নিবৃত্ত্যঙ্কুর এব চ ॥" (না.শা. ২২/৫৩)

আচার্য সাগরনন্দী নাট্যশাস্ত্রোক্ত ছয়টি প্রকারের মধ্যে নাট্যায়িত বাদে পাঁচপ্রকার অভিনয়ের বর্ণনা করেছেন। অভিনবগুপ্তাচার্যর মতে, এগুলি হল সামান্য শারীর অভিনয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ডঃ. রাঘবন মনে করেন যে, 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের প্রথম অঙ্কের বিষ্কম্ভক অংশে গণদাসের 'ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাভিনয়মুপদিশ্য ময়া'– এই উক্তির মাধ্যমে কালিদাস পাঁচ প্রকার শারীর অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন।[১৩৮]

যাই হোক্, নাট্যদর্পণে যেহেতু কেবল আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের আলোচনা করা হয়েছে, অতএব আমরা-ও অভিনয়ের অন্যান্য ভেদে না গিয়ে কেবলমাত্র এই চারটি প্রকারের-ই আলোচনা করবো। আমাদের প্রথম আলোচ্য হল বাচিক অভিনয়।

বাচিক অভিনয় ঃ

বাচিক অভিনয়ের আলোচনার প্রারম্ভে নাট্যদর্পণকাররা 'বাচিক' পদটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করছেন । এবিষয়ে তাঁরা তাঁদের আচার্য হেমচন্দ্র কর্তৃক বিরচিত ব্যাকরণগ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন। তদনুসারে 'বাগনুকার্যা প্রয়োজনং হেতুরস্য'– এই অর্থে 'প্রয়োজনম্' (হেমচন্দ্র রচিত ব্যাকরণের ৬/৪/১১৭ সংখ্যক সূত্র)– এই সূত্রানুসারে 'বাক্' শব্দের উত্তর 'ইকণ্' প্রত্যয়ের যোগে বাচিক পদটি নিষ্পন্ন। বাগ্ব্যবহারের দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার কারণে এই অভিনয়ের এই নাম। অভিনেয় চরিত্রের মানসিকী অবস্থা, তার হৃদ্গত ভাব, মনোগত অভিলাষ ইত্যাদিকে বাক্যের মাধ্যমে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করা-ই এই অভিনয়ের লক্ষ্য। নাটকীয় চরিত্রের ক্রোধ, বীরত্ব ইত্যাদি প্রতিপাদনের সময় এই বাচিক অভিনয় হবে উদ্ধত, রুদ্রদীপ্ত। আবার শৃঙ্গারাদির বর্ণনায় তা হবে পেলব, কান্তকোমল। অর্থাৎ কেবলমাত্র নাটকীয় সংলাপ নয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রয়োজনীয় অভিনেয় চরিত্রের মনোগত ক্রোধ-উৎসাহ-বিস্ময়-হাস-রত্যাদি স্থায়িভাব, চিন্তা-চাপল-শঙ্কা-মোহ-ঔগ্র্যাদি ব্যভিচারিভাব, বেপথু-স্তম্ভ-রোমাঞ্চ-মূর্ছা-বৈবর্ণ্যাদি অনুভাবের দ্বারা সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসোদ্বোধ-ই বাচিক অভিনয়ের প্রধানতম প্রয়োজন। এই স্থায়িভাবাদি মানসিক অবস্থাগুলির পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে-ই নাট্যকাররা 'সক্রোধম্' ,'সাবেগম্' ইত্যাদি নির্দেশ নাট্যে সংযুক্ত করেন। রসভাববিহীন নাটকীয় সংলাপ উচ্চারণ বাচিক অভিনয়পদবাচ্য নয়, তা কেবল আবৃত্তিমাত্র। এপ্রসঙ্গে ভাষাব্যবহারের বিষয়টি অবাধ। সংস্কৃত বা প্রাকৃত যে কোনো ভাষার সার্থক শব্দপ্রয়োগের দ্বারা নাটকীয় চরিত্রের মানসিক অবস্থার যথাযথ অনুকরণে-ই বাচিক অভিনয়ের সার্থকতা।

এই প্রসঙ্গে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে একটি বিমর্শ রয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোনো দৃষ্ট বা অনুভূত বস্তুর অনুকরণ সম্ভব, অদৃষ্টপূর্ব বা অননুভূত কোনো বস্তুর অনুকরণ কখনো-ই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে , রামচরিত্রে অভিনয়কারী নট কোনোদিন-ই রামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব না করার কারণে তিনি কি রামচরিত্রের যথাযথ অনুকরণ করতে পারবেন? এক-ই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় প্রেক্ষকের ক্ষেত্রে-ও। তাঁরা-ও যেহেতু কোনোদিন রামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করেননি, অতএব অনুকর্তা নটের অনুকরণ ঠিক কতখানি যথাযথ, তার নির্ভুল বিচার কি তাঁরা করতে পারবেন? এর উত্তরে

নাট্যদর্পণকাররা বলছেন, অভিনেয় রামচরিতমূলক নাটকের পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন এবং কঠোর অভ্যাসের দ্বারা অনুকর্তা নট স্বয়ং রামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন অনুমান করতে থাকেন এবং সেই আরোপাত্মক নিশ্চয়জ্ঞান থেকে-ই তিনি রামচরিত্রের লোকব্যবহারানুসারী অনুকরণ করেন – 'তদয়ং নটো রামাদেশ্চরিতং কবিনিবদ্ধমধীত্যাত্যন্তাভ্যাসবশতঃ স্বয়ং দৃষ্টমনুমন্যমানো2নুকরোমীত্যধ্যবস্যতি,পরমার্থতস্তু লোকব্যবহারমেবায়মনুবর্ততে'।[১৩৯] এমতাবস্থায় রামচরিত্রের সঙ্গে তন্ময়ীভূত নট স্বয়ং প্রহৃষ্ট হলে-ও শ্রীরাম ক্রন্দন করলে ক্রন্দন করেন, স্বয়ং বিষণ্ন হলে-ও শ্রীরাম হাস্য করলে হাস্য করেন। অপরপক্ষে, সহৃদয় প্রেক্ষকবর্গ-ও অতিপরিচিত রামাদি শব্দ, অতিহৃদ্য নৃত্যগীতের প্রয়োগ ইত্যাদির দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হয়ে, রূপ-দেশ-কালাদির অন্যথাভাবের কথা বিস্মৃত হয়ে, অনুপম অভিনয়চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে নটকে-ই রামচন্দ্ররূপে জ্ঞান করতে থাকেন এবং রামচরিত্রের সুখ-দুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তন্ময় হয়ে গিয়ে রসানুভব করতে থাকেন – 'প্রেক্ষকো2পি রামাদিশব্দসঙ্কেতশ্রবণাদতিহৃদ্যসঙ্গীতকাহিতবৈবশ্যাচ্চ স্বরূপ-দেশ-কাল-ভেদেনাতথাভূতেস্বপ্যভিনেয়চতুষ্টয়াচ্ছাদনাৎ তথাভূতেস্বিব নটেষু রামাদীনধ্যবস্যতি ।অতএব তাসু তাসু সুখদুঃখরূপাসু রামাদ্যবস্থাসু তন্ময়ীভবতি'।[১৪০]

একথা সত্য যে, প্রেক্ষকবর্গের প্রত্যেক ব্যক্তি নাট্যবস্তুর সঙ্গে সমানভাবে একাত্ম হতে পারেন না। নটে রামাদির আরোপকালে-ও তাঁদের মনে এই প্রশ্নটি বারংবার আসতে থাকে যে, এই নাট্যকাহিনী, এই সকল নাট্যনির্দেশ – এসব-ই কবির কল্পনা। এখানে কতটুকু গ্রহণীয়, কতটুকু বর্জনীয় – এই হানোপাদানের সংশয়ে আন্দোলিত তাঁদের চিত্ত অভিনয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হয়ে উঠতে পারে না। এই শ্রেণীর প্রেক্ষকদের উদ্দেশ্যে নাট্যদর্পণকাররা বলছেন, ক্রান্তদর্শী ঋষিরা রামচন্দ্রের আকৃতি, গতি , বাক্যালাপ, ক্রোধাদি ভাব ইত্যাদির যেমন বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, তাকে উপাদানরূপে গ্রহণ করে 'আপনমনের মাধুরী মিশায়ে' নাট্যকার নির্মাণ করেছেন তাঁর কৃতি। অতএব সেই প্রজ্ঞাবান্ ঋষিদের সত্যদর্শনের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল নট কবিকৃতির বারংবার অধ্যয়ন ও অভ্যাসের দ্বারা যেন বাস্তবিক-ই শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। আর কেবল ঋষিরা-ই নন, কবিরা-ও ক্রান্তদর্শী, সত্যদ্রষ্টা। ঋষিকথিত কাহিনী থেকে যদি তিনি উপাদান সংগ্রহ না করেন, নাট্যবস্তু যদি সম্পূর্ণতঃ কবিকল্পিত হয়, তার সত্যতা স্বীকারে-ও কোনো মানসিক বাধা থাকা উচিৎ নয়। কাব্যভারতী সর্বদা জাগতিক নিয়মানুসারিণী নন। তাঁর স্রষ্টা কবি তাঁকে যেভাবে নির্মাণ করবেন, তেমনি হবে তাঁর নির্মিতি। বলা-ই হয়ে থাকে –

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥"

অতএব অশেষ ক্ষমতাশালী এই কাব্যস্রষ্টাদের নির্মিত রচনাতে-ও ঋষিরচনার মতন-ই বিশ্বাস স্থাপন করা যেতে পারে। সেই বিশ্বাসে পূর্ণচিত্ত নট কাব্যোক্ত চরিত্রগুলির সার্থক অনুকরণে সক্ষম হন। প্রেক্ষকগণ-ও এই অনুপম অভিনয়কৌশলে মুগ্ধ হয়ে নটের উপর রামাদিচরিত্রের (যেন) আরোপ করে রামচরিত্রের সুখদুঃখাদির অনুভব করতে থাকেন, অবাস্তব হওয়া সত্ত্বে-ও শৃঙ্গারাদি রসের আস্বাদন করতে থাকেন। একথা সত্য যে, এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক। কিন্তু যেমনভাবে স্বপ্নমধ্যে কোনো সুন্দরী রমণী বা শত্রু বা তস্করদর্শনে নিদ্রিত ব্যক্তির স্তম্ভাদি বিবিধ প্রকার অনুভাবের সৃষ্টি হয়, তেমনি নাট্যদর্শনকালে-ও অতি সুন্দর, পরিণামসুখাত্মক এই ভ্রান্তি থেকে-ই সহৃদয় সামাজিক নট-নটী-নাট্যকাহিনী ইত্যাদির সঙ্গে তন্ময়ীভূত হয়ে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর কাব্যরস আস্বাদন করতে পারেন। এই মোহাত্মক জ্ঞানের অপ্রয়োগে, নাট্যসংক্রান্ত যাবতীয় বস্তুর যথার্থজ্ঞানে সমগ্র নাট্যব্যাপারটি কৃত্রিমরূপে প্রতিভাত হতে থাকে, দর্শক কোনোমতে-ই এর সাথে নিজেকে একাত্ম করতে পারেন না; ফলতঃ রসাস্বাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নাট্যদর্পণে বাচিক অভিনয় সংক্রান্ত আলোচনা এটুকু-ই। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ – এই চারটি অধ্যায় ধরে বাচিক অভিনয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে এজাতীয় অভিনয়ের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বর্ণনাবসরে বলা হচ্ছে, ইহলোকে সকল শাস্ত্র বাঙ্ময় ও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত। অতএব বাক্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। বাক্য-ই সকলের কারণ। অতএব নাট্যবিষয়ে-ও বাক্যসম্পর্কে যত্ন গ্রহণীয়। এটি-ই নাট্যের শরীর রূপে জ্ঞাত। অঙ্গ, সজ্জা ও সত্ত্ব এই বাক্যার্থকে-ই অধিকতর ব্যক্ত করে মাত্র –

“বাচি যত্নস্তু কর্তব্যো নাট্যস্যেয়ং তনুঃ স্মৃতা।
অঙ্গনেপথ্যসত্ত্বানি বাক্যার্থং ব্যঞ্জয়ন্তি হি ॥”(না.শা. ১৪/০২)

আরো বলা হয়েছে, বাচিকাভিনয় নাম, আখ্যাত, নিপাত, উপসর্গ, সমাস, সন্ধি ও বিভক্তিযুক্ত বলে জ্ঞাতব্য। চতুর্দশ অধ্যায়ের পরবর্তী বিষয়গুলি হল বর্ণসমূহের উচ্চারণস্থান, শব্দলক্ষণ, সন্ধি-সমাস-নিপাত-প্রত্যয়-উপসর্গাদির লক্ষণ, ছন্দোবিভাগ ইত্যাদি। পঞ্চদশ অধ্যায়ে রয়েছে কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ছন্দের লক্ষণ। ষোড়শ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিবিধ প্রকার নাট্যালঙ্কার। সপ্তদশ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় হল বিবিধপ্রকার ভাষার লক্ষণ, তাদের প্রয়োগক্ষেত্র এবং সংলাপ উচ্চারণকালে স্বরক্ষেপণ অর্থাৎ ‘কাকু’-র স্বরূপ।

একথা অনস্বীকার্য যে, নাট্যদর্পণের বাচিক অভিনয় বিষয়ক আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রোক্ত কাকু, বৃত্তবিভাগ ইত্যাদি অতিপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে হলে-ও অপেক্ষিত ছিল। এক-

ই সঙ্গে একথা-ও উল্লেখ্য যে, বাচিক অভিনয়ের বৌদ্ধিক প্রেক্ষিত বিষয়ে নাট্যদর্পণে যে বিমর্শটি রয়েছে, নাট্যতত্ত্বের অপরাপর কোনো গ্রন্থে সেই আলোচনাটি স্পর্শমাত্র করা হয়নি।

আঙ্গিক অভিনয় ঃ

আঙ্গিকপদের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে, এই পদটি 'অঙ্গ' শব্দের উত্তর প্রয়োজনার্থে 'ইকণ্' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন – 'অঙ্গানি প্রয়োজনং হেতবো2স্যেত্যাঙ্গিকঃ'।[১৪১]এক্ষেত্রে-ও আচার্য হেমচন্দ্র রচিত ব্যাকরণের 'প্রয়োজনম্' সূত্রটির দ্বারা আঙ্গিক পদটির নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আঙ্গিক অভিনয়ের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'কর্মণো2ঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চ সাক্ষাদ্ ভাবনমাঙ্গিকঃ' (না.দ. ৩/৫০)– অর্থাৎ শিরঃ-হস্তাদি অঙ্গ এবং নেত্র-ভ্রূ-পক্ষ্মাদি উপাঙ্গের দ্বারা অনুকার্য বস্তু অর্থাৎ নাট্যবস্তুকে সহৃদয় সামাজিকবর্গের প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপিত করা হয় যে অভিনয়ের মাধ্যমে, তার নাম আঙ্গিক অভিনয়। এই অভিনয়কে-ও কিন্তু একান্তভাবে নাট্যচরিত্রের ভাবানুসারী হতে হবে। অনুকার্য ব্যক্তির ক্রোধ-উৎসাহ-হর্ষ-আবেগ-বৈবর্ণ্য-মুখরাগ-ভ্রূকুটি ইত্যাদি যাবতীয় বিচিত্র চেষ্টার সার্থক ও সম্যক্ পরিস্ফুটনে-ই এই অভিনয়ের সার্থকতা, অন্যথায় তা অভিনয়পদবাচ্য নয়।

অনন্তর উক্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের স্থানকালপাত্রানুসারী প্রয়োগের আলোচনা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণের এই আলোচনাটি সর্বাংশে নাট্যশাস্ত্রানুসারী। নাট্যশাস্ত্রের অষ্টম থেকে দ্বাদশ এই পাঁচটি অধ্যায়ে আঙ্গিক অভিনয়ের সুবিস্তৃত বিচার করা হয়েছে। নাট্যদর্পণের আলোচনাটি তার সংক্ষিপ্তসার মাত্র, এতে নূতন বা অভিনব কোনো তথ্য নেই।

অঙ্গসমূহের অভিনয়বিষয়ক আলোচনায় প্রথমে-ই উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ মস্তকের স্থান। আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুতাদি ভেদে মস্তকের ক্রিয়া ত্রয়োদশ প্রকার। কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যাদি অষ্ট প্রকার রসদৃষ্টি; স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনাদি অষ্ট প্রকার স্থায়িভাবসমূহের দৃষ্টি এবং শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তাদি ভেদে অন্যান্য বিংশতি প্রকার দৃষ্টি – সাকুল্যে ষট্‌ত্রিংশ প্রকার দৃষ্টি। নেত্র-ভ্রূ-অক্ষিতারক ইত্যাদির-ও বহুবিধ ক্রিয়া হতে পারে। তন্মধ্যে উন্মেষ, নিমেষ, প্রসৃত, কুঞ্চিতাদি ভেদে অক্ষিপুটের ক্রিয়া নয় প্রকার। উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রূকুটি, চতুরাদি ভেদে ভ্রূযুগলের ক্রিয়া সপ্তবিধ। নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছ্বাসাদি ভেদে নাসিকার ক্রিয়া ছয় প্রকার । ক্ষাম, ফুল্ল, পূর্ণ, কম্পিতাদি ভেদে গণ্ডের ক্রিয়া-ও ছয় প্রকার। বিবর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগূহনাদি ভেদে অধরের ক্রিয়া ছয় প্রকার। কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চুক্কিতাদি ভেদে চিবুকের ক্রিয়া বহুবিধ। সমা, নতা, উন্নতা, ত্র্যস্রাদি ভেদে গ্রীবার ক্রিয়া নয় প্রকার। স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত ও শ্যামভেদে মুখরাগ চতুর্বিধ । মুখরাগের উপযোগিতা বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রে বলা

হয়েছে, শাখা, অঙ্গ ও উপাঙ্গযুক্ত উত্তমমানের অভিনয় অনুষ্ঠিত হলে-ও, মুখরাগশূন্য অভিনয় কখনো শোভা পায় না –

"শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তঃ কৃতো2প্যভিনয়ঃ শুভঃ ॥
মুখরাগবিহীনস্তু নৈব শোভান্বিতো ভবেৎ।" (না.শা. ৮/১৬৬,১৬৭)

অনন্তর হস্তাদ্যঙ্গের ক্রিয়াসমূহ। পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখাদি চব্বিশ প্রকার অসংযুক্ত হস্ত মুদ্রা; অঞ্জলি, কপোত, কর্কটাদি ভেদে তেরো প্রকার সংযুক্ত হস্তমুদ্রা এবং চতুরস্র, তলমুখ, স্বস্তি কাদি ভেদে সাতাশ প্রকার নৃত্যহস্তমুদ্রা – সাকুল্যে হস্তমুদ্রার চৌষট্টিটি প্রকার। আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, উদ্বাহিত,সম ও প্রকম্পিত ভেদে বক্ষের ক্রিয়া পঞ্চবিধ। নত, সমুন্নত, প্রসারিত, বিবর্তিত ও অপসৃত ভেদে পার্শ্বদেশের ক্রিয়া-ও পঞ্চবিধ। ক্ষাম, খল্ব ও পূর্ণ – উদরের ক্রিয়া ত্রিবিধ। ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, প্রকম্পিতা ও উদ্বাহিতা ভেদে কটিদেশের ক্রিয়া পঞ্চ প্রকার। কম্পন, বলন, উদ্বর্তন, স্তম্ভন ও নিবর্তন ভেদে ঊরুর ক্রিয়া-ও পঞ্চবিধ। আবর্তিত, নত, ক্ষিপ্ত, উদ্বাহিত ও পরিবৃত্ত ভেদে জঙ্ঘার ক্রিয়া-ও পঞ্চ প্রকার। উদ্‌ঘট্টিত, সম, অগ্রতলসঞ্চার, সঞ্চিত ও কুঞ্চিত ভেদে পাদক্রিয়া-ও পঞ্চবিধ।

অনন্তর চারীবিধান। পদ, জঙ্ঘা, ঊরু ও কটিদেশের যুগপৎ সঞ্চালন চারী নামে কথিত । নাট্যশাস্ত্রমতে –

"এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া ঊরোঃ কট্যাস্তথৈব চ।
সমানকরণাচ্চেষ্টা চারীতি পরিকীর্তিতা ॥" (না.শা. ১০/০১)

চারীতে কেবলমাত্র একপদের সঞ্চালন হয়। পদদ্বয়ের সঞ্চালনে তা পরিক্রমারূপে কথিত হয়। এই চারী ভৌমী ও আকাশিকী ভেদে দ্বিবিধ। সমপাদা, স্থিতাবর্তা, শকটাস্যা, অধ্যর্ধিকাদি ভেদে ভৌমী চারী ষোড়শ প্রকার। অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, উর্দ্ধজান্বাদি ভেদে আকাশিকী চারী-ও ষোড়শ প্রকার। স্থিরহস্ত, পর্যস্তক ইত্যাদি ভেদে অঙ্গহারের সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ প্রকার।

অনন্তর নাট্যচরিত্রসমূহের গতি সম্পর্কিত আলোচনা। নাট্যশাস্ত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উত্তম, মধ্যম ও নীচপ্রকৃতির পাত্রদের সামান্য গতি হবে যথাক্রমে ধীর, মধ্যম ও দ্রুত। বৃদ্ধ, ব্যাধিত,ক্ষুধার্ত, শ্রান্ত, তপঃক্লান্ত, ক্ষুব্ধ, হৃদ্‌গত ভাব গোপনকারী, শোকার্ত, শৃঙ্গারান্বিত ও স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তির গতি হবে মন্থর। হর্ষ-আবেগ-কৌতুহল-ভয়-ঔৎসুক্যাদিযুক্ত ব্যক্তির গতি হবে ত্বরিত। প্রচ্ছন্নকামুক, শত্রু, চৌর, ক্রোধাদির কারণে শঙ্কিত ইত্যাদি ব্যক্তিদের পদসঞ্চার হবে নিঃশব্দ। এদের দৃষ্টি হবে চতুর্দিকে অবলোকনকারী। শীত-বর্ষাদির দ্বারা ক্লিষ্টব্যক্তিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হবে সঙ্কুচিত ও কম্পিত। ঘর্মাক্ত ব্যক্তি ক্রমাগত স্বেদ অপনয়ন করবে ও বৃক্ষাদির ছায়ার জন্য অন্বেষণ করবে। প্রহৃত ও স্থূলকায় ব্যক্তির গতি হবে সশ্বাস ও শ্লথ। তপস্বী ও

যতিগণের দৃষ্টি হবে স্থির, চাপল্যবিহীন ও কেবলমাত্র সম্মুখগামী। বিপরীতে মত্ত ও উন্মত্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টি হবে স্খলিত ও ঘূর্ণিত। বিদূষকের দৃষ্টি হবে অসম্বদ্ধ। জলসংক্রান্ত অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশদে বলা হচ্ছে, (অপরিষ্কার) জল স্পর্শের অভিনয়ে পাদবিকর্ষণ করতে হবে; সন্তরণের অভিনয়ে বক্ষ, উদর ও হস্তদ্বয়ের ক্রিয়ার দ্বারা জলের অপসারণ করতে হবে; সিক্ত অবস্থার অভিনয়ে বেশ, কেশ ইত্যাদির বিস্রস্ত অবস্থার প্রদর্শন করতে হবে। অন্ধ ব্যক্তি এবং অন্ধকারে অবস্থানকারী ব্যক্তির গতি হবে মন্দ। তারা সম্মুখভাগে হস্ত প্রসারণপূর্বক পথের অন্বেষণ বা অনুভব করবে। আরোহণকালে দৃষ্টি হবে ঊর্দ্ধগামী, অবরোহণকালে অধোগামী। আকাশপথে গমনের অভিনয়কালে সমপাদে, বাহনযোগে বা পক্ষযোগে গমন করণীয়। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের আকৃতিদর্শনকালে মস্তকে হস্তস্পর্শপূর্বক মুখের সামান্য চালনা এবং বারংবার নিমেষপাতন করণীয়। শব্দশ্রবণকালে মস্তকের পার্শ্বদিকে সামান্য অবনমন, স্পর্শকালে নেত্রদ্বয়ের আকুঞ্চন এবং রস ও গন্ধপ্রত্যক্ষকালে দীর্ঘ শ্বাসগ্রহণ করণীয়।

সর্বপ্রকার আঙ্গিক অভিনয়কে ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্টভেদে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। মুখাদির সুন্দর ও মনোহর ভাব, পুলকিত গাত্র, নেত্রবিকাশ ইত্যাদির দ্বারা ইষ্ট; মধ্যম প্রকার ভাবাদির দ্বারা মধ্য এবং মস্তকের আবর্তন, নেত্র ও নাসিকার সংকোচন ইত্যাদির দ্বারা অনিষ্ট – এবম্প্রকারে উক্ত ত্রিবিধ আঙ্গিক অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, তলপুষ্পপুট, বর্তিতাদি একশত আট প্রকার করণের প্রতিটি-ই কোনো-না-কোনো অঙ্গ বা উপাঙ্গ হওয়ার কারণে, এদের প্রতিটির দ্বারা সাধিত কার্য আঙ্গিক অভিনয়ের অংশরূপে-ই গণ্য হয়। অপরপক্ষে ভূপাতনাদি ব্যাপার সর্বশরীরসাধ্য হলে-ও, শরীর যেহেতু অঙ্গোপাঙ্গসমূহের সমন্বয়ে নির্মিত, অতএব এটি-ও আঙ্গিক অভিনয়ের-ই অন্তর্ভুক্ত রূপে পরিগণিত হয়।

সাত্ত্বিক অভিনয় ঃ

বাচিকাদি পদের ন্যায় সাত্ত্বিক পদটি-ও 'সত্ত্ব' শব্দের উত্তর প্রয়োজনার্থে 'ইকণ্' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। বিশেষ অবধানযুক্ত মন বা 'সত্ত্ব' যে অভিনয়ের হেতুভূত, তার নাম সাত্ত্বিক অভিনয় – 'অবহিতং মনঃ সত্ত্বং তৎ প্রয়োজনং হেতুরস্যেতি সাত্ত্বিকঃ'।[১৪২]

নাট্যদর্পণসম্মত সাত্ত্বিকলক্ষণটি হল – 'সাত্ত্বিকঃ স্বরভেদাদেঃ অনুভাবস্য দর্শনম্' (না.দ. ৩/৫১) – স্বরভেদাদি অনুভাবের প্রদর্শনের জন্য সাত্ত্বিক অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। 'স্বরভেদ' অর্থাৎ স্বরবিকৃতি, বেপথু, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, মূর্ছা, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু – এই আটটি স্বীকৃত সাত্ত্বিকভাবের সঙ্গে নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস, সন্তাপ, শৈত্য, জৃম্ভণ, কৃশতা, মেদুরতা, 'উল্লুকসন' অর্থাৎ রোমহর্ষ, মনোগত ভাব গোপন, একাগ্র মনোযোগ, লালা নিঃসরণ, (মুখ থেকে) ফেনমোক্ষণ, বিস্রস্ত দেহ,

হিক্কিত ইত্যাদির গ্রহণ হচ্ছে 'আদি' পদটির দ্বারা। মনের অনবধানতায় এইসকল ভাবের যথাযথ অভিনয় কখনো-ই সম্ভব নয়। বাক্‌প্রয়োগ না থাকার কারণে একে বাচিক অভিনয় বলা যায় না, অঙ্গোপাঙ্গাদির সুস্পষ্ট ক্রিয়া না থাকার জন্য একে আঙ্গিক অভিনয়-ও বলা যায় না। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে আরো বলা হয়েছে যে, উত্তম-মধ্যম-অধমাদি ত্রিবিধ পাত্রের প্রকৃতি, প্রাতিস্বিক চরিত্রানুগ রস এবং তৎ-তৎ রসানুযায়ী অনুভাবের প্রয়োগানুসারে এজাতীয় অভিনয়ের প্রয়োগ করণীয়।

নাট্যশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে সাত্ত্বিক ভাবসমূহের আলোচনাবসরে সাত্ত্বিক অভিনয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দু'একটির উল্লেখ করা যেতে পারে – নিশ্চেষ্ট, অবিকম্প, দণ্ডায়মান, শূন্য ও জড়রূপে, সংজ্ঞাহীন ও অবশাঙ্গরূপে স্তম্ভের অভিনয় করণীয়; বারংবার পুলকোদয়, শরীরে রোমহর্ষ এবং দেহস্পর্শের দ্বারা রোমাঞ্চের অভিনয় করণীয়; চক্ষুঘর্ষণ ও বাষ্পের দ্বারা অশ্রুর অভিনয় করণীয় ইত্যাদি।

আহার্য অভিনয় ঃ

বেশভূষা সংক্রান্ত বিধি 'আহার্য অভিনয়' নামে জ্ঞেয়। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে – 'আহার্যাভিনয়ো নাম জ্ঞেয়ো নেপথ্যজো বিধিঃ' (না.শা.২১/৩)। আহার্যাভিনয়ের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'বর্ণাদ্যনুক্রিয়া2হার্যঃ বাহ্যবস্তুনিমিত্তকঃ' (না.দ.৩/৫১) – বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের শ্বেত-শ্যামাদি গাত্রবর্ণ, রস, গন্ধ, 'আকল্প' অর্থাৎ বেশভূষা, যুদ্ধাস্ত্র, বাহন, দেশ, নদী, নগর, বন, পক্ষী, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, অপদ, প্রাসাদ, পর্বত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের অনুকরণ আহার্য অভিনয়ের অন্তর্গত।

নাট্যশাস্ত্রমতে পুস্ত, অলঙ্কার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব – বেশভূষার এই চারটি ভেদ। অস্ত্রের বিষয়ে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, রঙ্গমঞ্চে ভেদন, ছেদন ও প্রহার সর্বথা নিষিদ্ধ। অস্ত্রদ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দেহে স্পর্শমাত্র করণীয়। পর্বতাদিকে নাট্যশাস্ত্রে 'পুস্ত' এবং বাহনাদিকে 'চেষ্টিম পুস্ত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষী ও মনুষ্যাদি দ্বিপদ প্রাণী, গ্রাম্য ও আরণ্য চতুষ্পদ প্রাণী এবং সর্পাদি অপদ প্রাণিগণের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকে নাট্যশাস্ত্রে 'সঞ্জীব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত নাট্যশাস্ত্রে বেষ্টিতাদি ভেদে পঞ্চবিধ মাল্য, আবেধ্যাদি ভেদে চতুর্বিধ অলঙ্কার ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা রয়েছে। কোন্ চরিত্রের অঙ্গরঞ্জনের জন্য কোন্ বর্ণের প্রয়োগ উচিৎ, কোন্ চরিত্রের কি প্রকার শ্মশ্রুকর্ম করণীয়, শুদ্ধ-বিচিত্র-মলিন ভেদে বেশের ত্রৈবিধ্য ও কোন্ পাত্রের কি বেশ করণীয় ইত্যাদি আরো বহু বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে। নানা দেশের নানাবিধ নারীদের সাজসজ্জাদি বিষয়ে-ও এই গ্রন্থে অতি বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, এই সকল বিভিন্ন প্রকারের আহার্যাভিনয়ের প্রতিটি দেশ-কাল-কুল-প্রকৃতি-দশা-নারী-পুরুষ-নপুংসকাদি ভেদ অনুসারে প্রযুক্ত হবে; অন্যথায় ঔচিত্যের অভাবে তা সহৃদয় সামাজিকের মনোগ্রাহী হয়ে উঠতে পারবে না।

'বাহ্যবস্তুনিমিত্তকঃ' পদের ব্যাখ্যায় নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, আহার্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি ভস্ম-ধাতু-লাক্ষা-বিভিন্ন প্রকার বর্ণ-মসী-মৃত্তিকা-বস্ত্র-বংশ-পত্র ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত; এজাতীয় অভিনয়ে শরীর বা দেহের প্রত্যক্ষ কোনো প্রয়োজন নেই। বাচিকাদি ত্রিবিধ শরীরনিমিত্তক অভিনয়ের থেকে এটি-ই আহার্য অভিনয়ের পার্থক্য।

দৃশ্যকাব্যের প্রধানতম সাধন হল অভিনয়। শ্রব্যকাব্যের সঙ্গে পাঠকের বা শ্রোতার যোগ অতি প্রত্যক্ষ। তাই শ্রব্যকাব্যের জনপ্রিয়তা বা সমাদর একান্তভাবে পাঠকের স্বাধীন ও ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু দৃশ্যকাব্যের সমাদরব্যাপারে মধ্যস্থ হল অভিনয়। অভিনয় ত্রুটিহীন না হলে সুগ্রথিত হওয়া সত্ত্বে-ও, উদ্দিষ্ট দৃশ্যকাব্য যথাযোগ্য সমাদর ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না। অভিনয়-ই হল সেই মাধ্যম, যার দ্বারা কোনো একটি উত্তমমানের দৃশ্যকাব্য অত্যুত্তম, লোকোত্তীর্ণ মানের শিল্পবিষয়রূপে পরিগণিত ও প্রচারিত হতে পারে। এই অভিনয়ের মান নির্ণীত হয় সহৃদয় সামাজিকচিত্তের কষ্টিপাথরে । বিদ্বৎপরিষদের প্রশংসা ও অনুমোদন না-পাওয়া অবধি মনস্ক নাট্যকার তাই স্বস্তিলাভ করতে পারেন না। মহাকবি কালিদাসের সেই অনন্য উক্তিটি পুনরায় স্মরণীয় – 'আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্ ' (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রস্তাবনা)। এই প্রয়োগবিজ্ঞান অর্থাৎ অভিনয়কৌশল আবার নট-নটীদের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাঁরা যদি রসভাবস্পর্শবিহীন ভাবে, যন্ত্রচালিতের ন্যায় সংলাপ উচ্চারণ ও অঙ্গসঞ্চালন করেন, বলা বাহুল্য, সেই মঞ্চপরিবেশনা কখনো-ই অভিনয়পদবাচ্য হতে পারে না। বিপরীতে, তাঁরা-ই যদি রস ও ভাবসমূহের বিশ্বস্ত অনুসরণে আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা অভিনেয় চরিত্রের অনুকরণ করেন, তবে তার দ্বারা সহৃদয় সামাজিকের ব্রহ্মাস্বাদসহোদর আনন্দলাভ অবশ্যম্ভাবী । অভিনয়-ই হল সেই মাধ্যম, যার দ্বারা রসজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তে রসোদ্বোধ ঘটে। সমগ্র নাট্যব্যাপারে অভিনয় তাই এক অপরিহার্য অংশ এবং সেই কারণে-ই নাট্যশাস্ত্র, নাট্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে এই বিষয়ে এত বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ-২৫২

২. দ্রষ্টব্য ঃ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-৭৯,৮০
৩. তদেব, পৃঃ- ৮০
4. Sanskrit Drama in its origin, development , Theory and Practice, A.B. Keith, পৃঃ - ৩৩৭
৫. দশরূপক, আচার্য ও দাস সম্পাদিত, পৃঃ - ২৭৪
৬. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ২৫৪
৭. তদেব, পৃঃ- ২৫২
৮. নাট্যশাস্ত্র, আর. এস. নাগর সম্পাদিত, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-১০০, পাদটীকা
৯. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ২৫৩
১০. তত্রৈব
১১. তদেব, পৃঃ - ২৫৪
১২. নাট্যশাস্ত্র, ঐ, প্রথম খণ্ড,পৃঃ - ২১২-২১৪, ২২৬-২২৭
১৩. নাট্যদর্পণ, তত্রৈব
১৪. তত্রৈব
১৫. 'স্তনকেশবতীত্বং হি স্ত্রীণাং লক্ষণম্'– নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ - ২৫৫
১৬. তত্রৈব
১৭. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, কে. এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ- ১৩২, পাদটীকা
১৮. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ - ২৫৫
১৯. তদেব, পৃঃ- ২৫৬
২০. এবিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের সমবকার আলোচনা দ্রষ্টব্য
২১. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ- ৮৬
২২. সাহিত্যদর্পণ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পৃঃ- ৩৫৪
২৩. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ - ৯০
২৪. দ্রষ্টব্য ঃ ভাবপ্রকাশন, মদনমোহন অগ্রবাল সম্পাদিত, তৃতীয় অধিকার, পৃঃ- ৮০-৮১
২৫. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ২৫৬
২৬-২৮. তত্রৈব
২৯. দ্রষ্টব্য ঃ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ - ২৮৭
৩০. দশরূপক, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, পৃঃ- ১৭৬
৩১. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ - ২৫৬-২৫৭
৩২-৩৭. তদেব, পৃঃ - ২৫৭
৩৮. দ্রষ্টব্য ঃ The Number of Rasas, V. Raghavan, পৃঃ - ১৫৫
৩৯. কাব্যানুশাসন, রসিকলাল পারিখ সম্পাদিত, চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ- ১৯৬
৪০. শৃঙ্গারপ্রকাশ, ভি.রাঘবন সম্পাদিত, পৃঃ - ৪৩৩
৪১. নাট্যদর্পণ, কে. এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ - ১৩৯
৪২-৪৪. তত্রৈব
৪৫-৪৭. তদেব, পৃঃ - ১৪০
৪৮. দশরূপক, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, পৃঃ- ১৭০
৪৯. তদেব, পৃঃ - ১৭৬
৫০. নাট্যদর্পণ, কে.এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ- ১৪২
৫১. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ - ৩৫৩
৫২. Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts, S.H. Butcher, পৃঃ - ২৪০

৫৩. দ্রষ্টব্য ঃ তদেব, পৃঃ - ২৭-২৯
৫৪. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ-২৫৭
৫৫. শৃঙ্গারপ্রকাশ, ভি.রাঘবন সম্পাদিত, পৃঃ - ৬০
৫৬. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ২৫৭
৫৭-৬১. তত্রৈব
৬২. দশরূপক, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, পৃঃ- ১৭২-১৭৩
৬৩. সাহিত্যদর্পণ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পৃঃ - ৬৬
৬৪. নাট্যদর্পণ,ঐ, পৃঃ - ২৫৭-২৫৮
৬৫. দশরূপক, ঐ,পৃঃ - ১৭৪
৬৬. নাট্যদর্পণ, কে.এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ - ১৪৬
৬৭-৭৪. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ-২৫৮
৭৫-৮৪. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৫৯
৮৫. তদেব, পৃঃ-২৭৩
৮৬. তদেব, পৃঃ-২৬০
৮৭-৮৮. তদেব, পৃঃ-২৭৩
৮৯. নাট্যশাস্ত্র, ঐ, বিংশ অধ্যায়, পৃঃ-১০০
৯০. দ্রষ্টব্য ঃ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-৩৩১
৯১. তত্রৈব
৯২. তদেব, পৃঃ-৩৩৫
৯৩-৯৬. দশরূপক, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, পৃঃ- ১৬৫
৯৭. সৌন্দর্যলহরী, শঙ্করাচার্য, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ- ৪৭
৯৮. তদেব, প্রথম ভাগ, পৃঃ- ৩৫১
৯৯. দশরূপক, ঐ, পৃঃ- ১৭৬
১০০. সাহিত্যদর্পণ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পৃঃ -২০৯
১০১-১০২. দ্রষ্টব্য ঃ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ - ৩২৬
১০৩. The Number of Rasas, V. Raghavan, পৃঃ - ২৯
১০৪. তদেব, পৃঃ - ৪৭-৪৮
১০৫. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ - ২৬০
১০৬.তদেব, পৃঃ - ২৬২
১০৭. দ্রষ্টব্য ঃ সঙ্গীতরত্নাকর, ৭/১৩৭৪, শ্রিঞ্জী ও শর্মা সম্পাদিত, পৃঃ - ৮১৬
১০৮. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ - ২৬৬
১০৯-১১০. তদেব, পৃঃ - ২৬৭
১১১-১১৫. তদেব, পৃঃ - ২৬৮
১১৬. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক , সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-২৯১ থেকে গৃহীত
১১৭. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৬৩
১১৮. দ্রষ্টব্য ঃ কাব্যালোক, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, পৃঃ-১৩৩
১১৯. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৬৯
১২০-১২৫. তদেব, পৃঃ-২৭১
১২৬-১২৭. তদেব, পৃঃ-২৭২
১২৮. তদেব, পৃঃ-২৭৩
১২৯.দ্রষ্টব্য ঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ-২৪০

১৩০. দ্রষ্টব্যঃ তত্রৈব
১৩১. নাট্যশাস্ত্র, আর. এস. নাগর সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-০১
১৩২.নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৭৫
১৩৩. দ্রষ্টব্য ঃ Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts, S.H. Butcher, পৃঃ - ০১
১৩৪. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, আর. এস . নাগর সম্পাদিত, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-১৭৪,১৭৫
১৩৫. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৭৭
১৩৬. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, তত্রৈব
১৩৭. নাট্যদর্পণ, তত্রৈব
১৩৮. দ্রষ্টব্য ঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ-১৮৩
১৩৯-১৪১. নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৭৫
১৪২. তদেব, পৃঃ-২৭৬.

চতুর্থ বিবেক

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবেকে যথাক্রমে নাটকলক্ষণ, নাটক ব্যতীত আরো একাদশ প্রকার রূপকের লক্ষণ ও বৃত্তি-রসাদির লক্ষণবিচারের পর নাট্যদর্পণ গ্রন্থের চতুর্থ তথা অন্তিম বিবেকে সর্বপ্রকার রূপকে প্রযোক্তব্য কিছু নাটকীয় কৌশলের আলোচনা করা হচ্ছে। সকল রূপকে প্রয়োগার্হ বিষয়সামান্যের আলোচনার কারণে সঙ্গত ভাবে-ই এই বিবেকটির নাম রাখা হয়েছে 'সর্বরূপকসাধারণলক্ষণনির্ণয়ঃ'। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়াবলীর মধ্যে প্রথম হল নান্দী।

নান্দী ঃ

ভারতীয় সংস্কৃতিতে কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ অবিগীত শিষ্টাচার; সুতরাং তা অনুসরণীয়। সংস্কৃত রূপকসমূহের ক্ষেত্রে-ও তাই অভিনয়ানুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে সম্ভাব্য বিঘ্নাদির শান্তির জন্য দেবতার কৃপা প্রার্থনা করে নান্দী পঠিত হয়। নান্দীর মধ্যে দেবতা-রাজা-প্রভু-সভাস্থ সহৃদয় সামাজিকগণ প্রমুখের স্তুতি করা হয়। নাট্যদর্পণে দেবী সরস্বতী এবং রচয়িতা কবি বা নাট্যকারের প্রশস্তিবাচনের কথা-ও পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কবি, রাজা, প্রভু ও সভায় উপস্থিত দর্শকবৃন্দের প্রশংসা করা হয় তাঁদের সদ্‌গুণরাজির জন্য। অন্যদিকে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করা হয় আশীর্বাদ লাভের জন্য। বিভিন্ন নান্দীতে কোথাও একটি, কোথাও বা দুটি বিষয়-ই উপস্থিত থাকতে পারে। নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে নান্দীপ্রয়োগের উপযোগিতার বিষয়টি বিশদে আলোচিত হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে – নান্দীর মধ্যে সকল দেবতাকে নমস্কার, দ্বিজগণের মঙ্গল, সোমরাজের জয়, গো-কুলের রোগহীনতা প্রভৃতি কামনা করা হয়। আরো বলা হয়েছে, নান্দীপ্রয়োগের দ্বারা অক্ষুণ্ণ থাকুক বেদের শ্রেষ্ঠত্ব, নিপাত হোক্ বেদবিদ্বেষিগণের। মহারাজ এই সসাগরা পৃথিবীকে পালন করুন, রাজ্যের সমৃদ্ধিলাভ হোক্, রঙ্গের আশা সম্পূর্ণ হোক্ এবং বেদোক্ত মহান ধর্ম বিরাজ করুক দর্শকদের চিত্তে। নিত্যবর্ধিত হোক্ রচয়িতার যশ এবং নান্দীরূপ এই যজ্ঞের দ্বারা প্রীত হ'ন সকল দেবতা।[১] দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ-ও নান্দীর এরূপ লক্ষণ-ই নির্ণয় করেছেন। তিনি এর সঙ্গে বিশেষভাবে সংযোজন করছেন যে, নান্দীর অবয়বে মঙ্গলসূচক চন্দ্র-শঙ্খ-কুমুদ-চক্রবাক-শ্বেতপদ্ম ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে।[২]

দেখা যাচ্ছে, নাট্যশাস্ত্র, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে নান্দীর মঙ্গলসূচক দিকটি-ই গুরুত্ব পেয়েছে। 'নন্দয়তি দেবদ্বিজনৃপাদীন্ প্রশংসাপদেন আহ্লাদয়তি' –এই অর্থে নন্দ্ ধাতুর উত্তর অচ্-প্রত্যয়ে গঠিত 'নন্দ' শব্দের উত্তরে প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্-প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে 'নান্দী' পদটি সিদ্ধ হয়,

যার অর্থ হল আহ্লাদ বা আনন্দদায়িনী। এবং এই আনন্দ সম্ভবতঃ দেবতা-দ্বিজ-নৃপতিদের প্রশংসার কারণে। নাট্যপ্রদীপে তাই নান্দীর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হচ্ছে এইভাবে –

"নন্দন্তি কাব্যানি কবীন্দ্রবর্গাঃ কুশীলবাঃ পরিষদশ্চ সন্তঃ।

যস্মাদলং সজ্জনসিন্ধুহংসী তস্মাদিয়ং সা কথিতেহ নান্দী ॥"[৩]

নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে মহর্ষি ভরত বলেছেন – 'নান্দীপ্রয়োগে চ কৃতে প্রীতো ভবতি চন্দ্রমাঃ' (না.শা. ৫/৪৯) – চন্দ্র হলেন রসের আধার । তাঁর প্রীতিতে-ই রসসমৃদ্ধি লাভ সম্ভব। সেই চন্দ্র প্রীত হন নান্দী উচ্চারণের দ্বারা। নান্দীর প্রীতিজনকত্বের বিষয়টি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যশাস্ত্রকারের এই উক্তি-ই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

তবে মঙ্গলদ্যোতনা ব্যতীত নান্দীর অধিক গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উপযোগিতা আছে। সেটি হল 'রঙ্গবিঘ্নশান্তি' – অর্থাৎ অভিনয়ের নির্বিঘ্ন পরিচালনা ও পরিসমাপ্তির কারণে-ও নান্দীপাঠ করা হয়ে থাকে এবং প্রধানতঃ এই কারণের জন্য-ই পূর্বরঙ্গের অন্য কোনো অঙ্গের অনুষ্ঠান হোক্ বা না হোক্, নান্দীর অনুষ্ঠান অবশ্য-ই করতে হবে। এর সমর্থনে আচার্য বাদরায়ণের একটি শ্লোক উদ্ধার করা যেতে পারে –

" যদ্যপ্যঙ্গানি ভূয়াংসি পূর্বরঙ্গস্য নাটকে।

তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নপ্রশান্তয়ে ॥"[৪]

– অর্থাৎ নাটকে পূর্বরঙ্গের অনেকগুলি অঙ্গ থাকলে-ও বিঘ্নশান্তির জন্য নান্দীর পাঠ অবশ্য করণীয়। এই এক-ই অভিমতের অনুরণন পাই নাটকলক্ষণরত্নকোশে – 'নান্দী নাম বিধাতব্যা সর্ববিঘ্নপ্রশান্তয়ে' (না.ল.র.একাদশ অধ্যায়)। এই গুরুত্বের কারণে-ই নাট্যদর্পণে নান্দীকে 'নিত্যা' অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য করা হয়েছে।

অভিনয় আরম্ভের পূর্বে বাদ্যযন্ত্রবিন্যাস ('প্রত্যাহার'), যন্ত্রে সুর-বাঁধা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ থেকে আরম্ভ করে মূল রূপকের পাত্রপ্রবেশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দেব-দ্বিজ-স্তুতি, নৃত্য-গীতাদি এই সব কিছু-ই পূর্বরঙ্গের অন্তর্গত। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের প্রথমদিকে পূর্বরঙ্গ একটি অতি-জটিল, নানা ভেদে বিভক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার ছিল। নাট্যশাস্ত্রমতে পূর্বরঙ্গের অঙ্গসংখ্যা ঊনিশ বা কুড়ি। পরভাবী সাগরনন্দী, শারদাতনয়, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখের মতে পূর্বরঙ্গের অঙ্গসংখ্যা বাইশ। কালক্রমে ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক অসুবিধার কারণে জটিল পূর্বরঙ্গের একেকটি অঙ্গ বর্জিত হতে থাকে। কোনোটি তত প্রসিদ্ধি না পাওয়ার কারণে, কোনোটি প্রয়োগনিষ্ফলতার কারণে, আবার কোনোটি বা নিস্প্রয়োজনীয়তার কারণে। এই পরিমার্জন ও পরিবর্তনের পরে অবশেষে পূর্বরঙ্গ তার অধুনাতন সরল ও সংক্ষিপ্ত রূপটি পরিগ্রহ করে। তার মধ্যে প্রাধান্য পায়

(নাট্যশাস্ত্রসম্মত) দ্বাদশসংখ্যক অঙ্গটি, যার নাম নান্দী। রূপক অভিনয়ানুষ্ঠানের পূর্বে নান্দীর উচ্চারণ অবশ্যকরণীয় হয়ে ওঠে তার প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণদ্যোতনার কারণে।

নান্দীর পদসংখ্যা নিয়ে বিবিধ প্রকার বিতর্ক রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে অষ্টপদা ও দ্বাদশপদা নান্দীর কথা বলা হয়েছে।পরভাবী নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে এই এক-ই অভিমত অনুসৃত হয়েছে। অভিনবগুপ্তাচার্য নাট্যশাস্ত্রের 'নান্দীপদৈর্দ্বাদশভিরষ্টাভির্বাপ্যলংকৃতাম্'(না.শা.৫/১০৪) – এই চরণটির 'অপি' পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ষোড়শপদা বা তদধিকপদা নান্দী-ও মহর্ষি ভরতের দ্বারা সম্মত।

নাট্যদর্পণে নান্দীর পদসংখ্যাবিষয়ক আলোচনাটি অভিনব। কারিকায় প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে, নান্দী হবে ছয় বা আটটি পদে নির্মিত – 'পদৈঃ ষড়ভিরথাষ্টভিঃ' (না.দ.৪/১)। কিন্তু টীকায় বিস্তারিত আলোচনায় কিছু অন্য কথা বলা হয়েছে। নাট্যদর্পণে রঙ্গমঞ্চের আকারের উপর নির্ভর করে নান্দীর পদসংখ্যার ভেদ নিরূপণ করা হয়েছে। ষট্পদা ও অষ্টপদা নান্দী যথাক্রমে ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ রঙ্গে প্রযোজ্য মধ্যম প্রকার নান্দী। ত্রিকোণ রঙ্গে সর্বোত্তম হল দ্বাদশপদা নান্দী এবং এজাতীয় রঙ্গে ন্যূনপক্ষে ত্রিপদা নান্দীর প্রয়োগ করতে হবে। এক-ইভাবে, চতুষ্কোণ রঙ্গে সর্বোত্তম হল ষোড়শপদা নান্দী এবং এই প্রকার রঙ্গে ন্যূনপক্ষে চতুষ্পদা নান্দীর প্রয়োগ করতে হবে। রঙ্গমঞ্চের আকারের সমানুপাতে নান্দীর পদসংখ্যার চিন্তা কতখানি যুক্তিসঙ্গত, তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। তাহলে-ও উল্লিখিত আলোচনাদৃষ্টে একথা বলা যেতে পারে যে, নান্দীর পদসংখ্যা বিচারের ক্ষেত্রে নাট্যদর্পণের এই অভিমতটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। উল্লেখ্য, অভিনবগুপ্তাচার্য 'অস্র' পদটির 'তাল' অর্থ গ্রহণ করে ত্র্যস্রতালে নান্দীর পদসংখ্যা তিন,ছয় বা আঠারো এবং চতুরস্রতালে চার, আট বা ষোলো কে গ্রহণ করেছেন।[৫]

নান্দীতে ব্যবহর্তব্য 'পদ' শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হতে পারে – ১. সুবন্ত বা তিঙন্ত শব্দ ২. শ্লোকের চরণ এবং ৩. অবান্তর বাক্য। এপ্রসঙ্গে নাট্যপ্রদীপের বিখ্যাত শ্লোকটির উল্লেখ করা উচিত –

''শ্লোকপাদঃ পদং কেচিৎ সুপ্তিঙন্তমথাপরে।

পরে2বান্তরবাক্যৈকস্বরূপং পদমূচিরে ॥''[৬]

অবান্তর বাক্যকে 'পদ' নামে অভিহিত করার রীতি কে প্রবর্তন করেছেন, তা জানা যায় না। অভিনবগুপ্তাচার্যের মতটি এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। নাট্যশাস্ত্রমতে, নান্দীর পদান্তরে পারিপার্শ্বিকদ্বয় 'তাহা-ই হউক' বলে সূত্রধারের উক্তি সমর্থন করবেন –

''নান্দীপদান্তরেষ্বেষু হ্যেবমার্যেতি নিত্যশঃ।

বদেতাং সম্যগুক্তাভির্বাগ্ভিস্তৌ পারিপার্শ্বিকৌ ॥''(না.শা. ৫/১০৯)

বাক্যশেষ না হলে 'তাহা-ই হউক' বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে 'পদান্তর' শব্দের অর্থ অবান্তর বাক্যগুলির মধ্যে-মধ্যে। এই ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত। আচার্য অভিনবগুপ্ত তাই সুবন্ত-তিঙন্ত পদ শব্দ, শ্লোকপাদ পদ এবং অবান্তর বাক্য-ও পদ – নান্দীর পদগণনায় এই তিনটি রীতি-ই স্বীকার করেছেন।

কবি তথা নাট্যকার এই নান্দী রচনা করবেন। ভাসের সবকটি নাটক, 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর প্রাচীন সংস্করণ ইত্যাদি গ্রন্থে যে 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' ইত্যাদি পাঠ পাওয়া যায়, আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে এর ব্যাখ্যা করে বলছেন, এর অভিপ্রায় হল, ''নান্দীর শেষে সূত্রধার এর প্রয়োগ করেছিলেন, এরপর থেকে আমি (নাট্যকার) কাব্য রচনা করছি''। কবিকৃতা নান্দী যে-যে স্থলে দেখা যায় না, সেই সব স্থলে প্রধানতঃ সূত্রধার, স্থানান্তরে স্থাপক বা পারিপার্শ্বিক কোনো ব্যক্তি নান্দী পাঠ করেন। নান্দী উচ্চারণের বিষয়ে সূত্রধারের-ই প্রাধান্য। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'সূত্রধারঃ পঠেত্তত্র মধ্যমং স্বরমাশ্রিত্য' (না.শা.৫/১০৪) – অর্থাৎ মধ্যমস্বর আশ্রয় করে সূত্রধার নান্দী পাঠ করবেন ।

ধ্রুবা ঃ

নাট্যদর্পণগ্রন্থের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি হল ধ্রুবা, যাকে এখানে কবিধ্রুবা নামে অভিহিত করা হচ্ছে। এই কবিধ্রুবা নাট্যশাস্ত্রোক্ত 'গানধ্রুবা' বা 'রঙ্গধ্রুবা'-র থেকে চরিত্রগত ভাবে ভিন্ন। কবির কর্ম হল কাব্য এবং একান্তভাবে এই কাব্যের অঙ্গ বা অংশ হল কবিধ্রুবা। কবিধ্রুবা হল একপ্রকার সঙ্গীত, যা কবিরচিত দৃশ্যকাব্যের মূল অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও কাহিনীর সঙ্গে একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হচ্ছে – 'কবিধ্রুবা ইতি কবেঃ প্রবন্ধকর্তুরিয়ং পঞ্চবিধা ধ্রুবা'।[৭] অন্যদিকে নাট্যশাস্ত্রের দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়ের ধ্রুবাবিষয়ক সুবিস্তৃত আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট বলা হচ্ছে ধ্রুবা হল পূর্বরঙ্গের অন্যতম একটি অঙ্গ। নান্দী আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে, নাটকপ্রয়োগের প্রাথমিক স্তরে পূর্বরঙ্গ ছিল বহু অঙ্গ-সমন্বিত অতিজটিল এক প্রক্রিয়া। এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াটির অন্যতম অঙ্গ ছিল ধ্রুবা। ক্বচিৎ অত্যল্পস্থলে সূত্রধারের ইচ্ছানুরূপ ধ্রুবার প্রয়োগ দৃষ্ট হলে-ও, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে নাট্যশাস্ত্রোক্ত ধ্রুবা পূর্বরঙ্গের একটি অঙ্গমাত্র। এই ধ্রুবার প্রয়োগবিধান ছিল মূলতঃ নাটকের সঙ্গীত সম্পাদনের কারণে। অর্থাৎ এককথায় বলা যেতে পারে, নাট্যশাস্ত্রমতে সুর-তাল-লয় সমন্বিত নাটকের সঙ্গীত অংশের প্রয়োগবিধির নাম হল ধ্রুবা, যা কিনা পূর্বরঙ্গের অর্থাৎ নাটক অভিনয়ের পূর্বের মঙ্গলাচরণের অন্যতম একটি অঙ্গ। আর নাট্যদর্পণমতে এটি হল কবিকৃতির (এক্ষেত্রে নাটকের) মূল কাহিনীর সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত সঙ্গীত। স্বোপজ্ঞবিবরণে

নাট্যদর্পণকাররা নাট্যশাস্ত্রের থেকে নিজেদের মতপার্থক্য এভাবে স্পষ্টতঃ নির্দেশ করছেন – ' ..... রঙ্গমধ্যবর্তিনীনাং ধ্রুবানাং রঙ্গবিধ্যনন্তরং নাট্যাচার্যকল্পিতানাং গানধ্রুবানাং চ ব্যুদাস ইতি' ।[৮]

নাট্যদর্পণে ধ্রুবায় বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, এর মধ্যে সরোবর-উদ্যান-দিন-রাত্রি-সন্ধ্যা,হস্তী-অশ্ব-সিংহাদি বিবিধপ্রকার পশু এবং অবশ্য-ই রত্যাদি ভাবের চিত্তচমৎকারী বর্ণনা থাকবে। ধ্রুবায় গেয় ছন্দোবদ্ধ গীতির উৎস হল বৈদিক ছন্দ। যেমনভাবে বৈদিক সংস্কৃত থেকে লৌকিক সংস্কৃত ও অর্বাচীন প্রাকৃতাদি ভাষার সৃষ্টি, তেমনি বৈদিক ছন্দ থেকে উদ্ভব এই ধ্রুবার । ধ্রুপদী সংস্কৃতের ছন্দোবিষয়ক নিয়মগুলি যথেষ্ট কঠোর হওয়ার কারণে এগুলিতে নির্মিত শ্লোকাদি গান গাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী নয়। অন্যদিকে বৈদিক ছন্দের ক্ষেত্রে নিয়মের শিথিলতা থাকার কারণে যুক্তিসঙ্গতভাবে-ই এগুলি সুরসঞ্চারের পক্ষে উপযোগী। নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুবায় ব্যবহর্তব্য ছন্দ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, ধ্রুবাগুলিতে চৌষট্টি প্রাথমিক শ্রেণী আছে, এদের কতগুলি সমসংখ্যক অক্ষরে রচিত এবং অন্যান্যগুলি আবার অসমসংখ্যক অক্ষরে রচিত। যুগ্ম বা অযুগ্ম সংখ্যক অথবা যুগ্ম-অযুগ্ম বা অসমসংখ্যক অক্ষরযুক্ত পাদবিশিষ্ট তিন প্রকার ধ্রুবা বিবিধ ছন্দে হতে পারে।[৯]

ধ্রুবার বিষয়বস্তু বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রে হয়েছে, উত্তম,মধ্যম ও অধম পুরুষ এবং নারীচরিত্রের ক্ষেত্রে ধ্রুবার প্রয়োগ হবে এমন সম্বন্ধে, যা তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনীয়। এবিষয়ে দু'একটি উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন বলা হচ্ছে, বিদ্যুৎ,উল্কা, সূর্যরশ্মি –এগুলি দিব্য চরিত্রের সাথে তুলনীয় এবং দেবগণের প্রতি প্রযোজ্য বস্তু রাজগণের পক্ষে-ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার রাজপত্নীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে রাত্রি, পৃথিবী, জ্যোৎস্না, পদ্মসরোবর, হস্তিনী এবং নদীর। এরূপ আরো অজস্র উদাহরণ নাট্যশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারভয়ে আর কোনোটির উল্লেখ করা হল না।

এরপর আসা যাক্ ধ্রুবার উপযোগিতা প্রসঙ্গে। এবিষয়ে রাজশেখরের বালভারত গ্রন্থের একটি শ্লোক উদ্ধার করা যেতে পারে, যার মধ্যে নাটকে ধ্রুবার প্রয়োজনগুলি সমাসতঃ উল্লেখ করা হয়েছে –

"প্রথয়তি পাত্রবিশেষং সামাজিকমনাংসি রঞ্জয়তি।

অথ সন্দধাতি (চ) রসং নাট্যবিশেষে ধ্রুবাগীতিঃ ৷৷" (বালভারত ১/১৪)

– অর্থাৎ পাত্রপ্রবেশ, গীতিমাধ্যমে সহৃদয় সামাজিকের মনোরঞ্জন এবং অবশ্য-ই নাটকীয় রসসম্পাদনে সহায়তা – এই হল ধ্রুবার প্রয়োজন।

নাট্যশাস্ত্রে, নাট্যদর্পণে সর্বত্র এইভাবে-ই ধ্রুবার প্রয়োজন বর্ণিত হয়েছে। ধ্রুবার দ্বারা বিবিধ পাত্রের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সূচনা করা হয়। আবার কোনো-কোনো ধ্রুবার দ্বারা অভিনয়মধ্যে কোনো বিশেষ ঘটনার নাটকীয় গুরুত্ব সূচনা করা হয়।অধ্যাপক D.R. Mankad এর মতে – " In the actual practice of the performance of a drama, there was a musical programme gone through. At the entrance of particular characters in particular scenes, certain songs were sung declaring their entrance. They were called Dhruvas." [১০] ধ্রুবার ভেদ বিষয়ে আলোচনার সময় এগুলি বিশদে বলা হবে।

তবে ধ্রুবার প্রথম ও প্রধান উপযোগিতা হল নাটকে সঙ্গীতসম্পাদন। প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা অভিনয়ের ক্ষেত্রে নৃত্য-গীতাদির প্রয়োজন বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। অভিনয়ের সমগ্র অংশ জুড়ে বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন রসের আস্বাদ্যমানতার বৃদ্ধির কারণে সঙ্গীতের অনস্বীকার্য উপযোগিতার কারণে-ই ধ্রুবার ব্যাপক প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। কেবলমাত্র 'প্রচলিত ছিল' বললে ভুল হবে; বর্তমান কাল অবধি নাটক-যাত্রা-চলচ্চিত্র–দৃশ্যকাব্যের সবকটি প্রকারের মধ্যে যে ব্যাপকভাবে এই সঙ্গীতের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়, তা বলা-ই বাহুল্য।

নাট্যশাস্ত্রে কোন্ অবস্থায়, কোন্ রসের প্রয়োগে কি প্রকার ধ্রুবার প্রয়োগ হবে, সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে – যেখানে কোনো নাটকীয় পাত্রের অধৈর্য, ভান, চিন্তা, বিলাপ, ক্লান্তি,অবসাদ ও নৈরাশ্য প্রকাশিত হয়, সেখানে বিলম্বিত লয়ে ধ্রুবা গেয়; শারীরিক দুর্দশা, ক্রোধ ও কারো প্রতি অস্ত্রসন্ধানের ক্ষেত্রে ধ্রুবা হবে বিরামবিহীন; রোরুদ্যমান বা গানরত পাত্রের প্রবেশ, তাদের আগমনে ব্যস্ততা, তাদের দ্বারা কোনো কিছুর ঘোষণা অথবা বিপদ ও বিস্ময়কর কোনো ব্যাপারের অভিনয়কালে ধ্রুবা গান গেয় নয়।[১১]প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ধ্রুবার অবিষয়রূপে ভাবপ্রকাশনে প্রায় অনুরূপ মত দেখা যায় –

"গীতরোদনসম্ভ্রান্তিপ্রেষণোৎপাতবিস্ময়াঃ।

যত্র যত্র ধ্রুবাস্তত্র ন যোজ্যা নাট্যযোক্তৃভিঃ ॥" (ভাব.প্র.১০/১৩৯)

এরকম আরো অসংখ্য প্রেক্ষিতের উদাহরণে বিভিন্ন ধ্রুবাগানের বিধান নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ধ্রুবার প্রয়োগ কতখানি ব্যাপক হলে মহর্ষি ভরতের পক্ষে তার এতোরকম প্রভেদ নির্দেশ করা সম্ভব। ধ্রুবার গুরুত্ব নির্দেশ করে শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে তাই যথার্থ-ই বলা হয়েছে –

"ন বিবেকং বিনা জ্ঞানং ধ্যানং নাত্মরসং বিনা।

শ্রদ্ধয়া ন বিনা দানং গীতং ন ধ্রুবকং বিনা ॥'' (শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, গান্ধর্বশাস্ত্রম্ ,শ্লোকসংখ্যা ১৯৬৫)–অর্থাৎ যেমন বিবেক ব্যতিরেকে কোনো জ্ঞানলাভ হয় না, আত্মিক উন্নতি ব্যতিরেকে কোনো ধ্যান হয় না, যেমন বিশ্বাস ব্যতীত সাহায্য হয় না, তেমনি ধ্রুবক (ধ্রুবা) ব্যতিরেকে কোনো সঙ্গীত হয় না।

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হল ধ্রুবার ভাষা। নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশে বলা হয়েছে, ধ্রুবাগুলির প্রয়োগের ভাষা হওয়া উচিৎ শৌরসেনী। তবে নৎকুট নামক ধ্রুবার ভেদবিশেষের প্রয়োগে ভাষা মাগধী-ও হতে পারে –

''ভাষা তু শূরসেনী স্যাৎ ধ্রুবানাং সম্প্রযোজনে।
কদাপি মাগধী যত্র কর্তব্যং নৎকুটং বুধৈঃ ॥'' (না.শা.৩২/৩৮৩)

ভাবপ্রকাশনে-ও এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করা হয়েছে।

নাট্যদর্পণে ধ্রুবার ভাষা বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেখা যায় না। এই গ্রন্থে প্রদত্ত ধ্রুবার উদাহরণগুলির মধ্যে আক্ষেপিকী ধ্রুবার উদাহরণটি সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত; অন্যান্যগুলি প্রাকৃতে। অতএব বোঝা যাচ্ছে নাট্যদর্পণকাররা ধ্রুবার ভাষাবিষয়ে খুব কঠোর কোনো নিয়মের পক্ষপাতী নন। প্রাকৃতভাষা তার মিষ্টত্ব, শ্রুতিমাধুর্য, বৈয়াকরণ নিয়মের শৈথিল্য, সহজ প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে ধ্রুবার ভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়ায় জন্য অধিকতর উপযোগী, একথা সত্য। তবে তাই বলে ধ্রুবা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হতে পারবে না, এমন কোনো নিয়ম নেই। ধ্রুবার ভাষারূপে প্রাকৃতের অগ্রাধিকার – এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে।

ধ্রুবা যে সংস্কৃতে হতে পারে, তার নির্দেশ নাট্যশাস্ত্রে-ই রয়েছে। সেখানে দিব্যজনের জন্য সংস্কৃতগানের, মর্ত্যজনের জন্য অর্ধসংস্কৃত গানের বিধান দেওয়া হয়েছে –

''দিব্যানাং সংস্কৃতং গানং প্রমাণৈস্তু বিধীয়তে।
অর্ধসংস্কৃতমেবং তু মানুষাণাং প্রযোজয়েৎ ॥''(না.শা. ৩২/৩৮৪)

ধ্রুবায় ব্যবহর্তব্য ভাষা বিষয়ে ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে শারদাতনয় বিশদে আলোচনা করেছেন। সেই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, দেবতা-ব্রাহ্মণ-রাজাদের জন্য সংস্কৃত ভাষায়, বৈশ্যদের জন্য সংস্কৃত বা অর্ধপ্রাকৃত ভাষায়, এবং শূদ্রদের জন্য পৈশাচী বা মাগধী প্রাকৃত ভাষায় ধ্রুবা রচনা করা উচিৎ।

ডঃ. ত্রিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত নাট্যদর্পণ গ্রন্থে তিনি অধ্যাপক কে.বি. ধ্রুব -এর একটি অভিমতের উল্লেখ করেছেন। ডঃ. ধ্রুব রচিত গ্রন্থটির নাম 'সাহিত্য আনে বিবেচনা'– মূল গ্রন্থটি গুজরাটি ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত রূপকের ধ্রুবার সাথে গ্রীক নাটকের 'কোরাস' গানের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, দুয়ের-ই উদ্দেশ্য হল নাটকীয় কাহিনীর অগ্রগতিতে

সহায়তা করা। পার্থক্য এইমাত্র যে, সংস্কৃত রূপকের ধ্রুবা (মূলতঃ) চরিত্রকেন্দ্রিক, যেখানে গ্রীক কোরাস হল নাটকের কাহিনীকেন্দ্রিক।[১২]

অনন্তর ধ্রুবার প্রকারভেদ। নাট্যশাস্ত্রে বিবিধ প্রেক্ষিতে ধ্রুবার বিবিধপ্রকার ভেদের কথা বলা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে উত্থাপনী, পরিবর্ত, অপকৃষ্টা, সিতা (বা অড্ডিতা বা অড্ডিকা) ও বিক্ষিপ্তা (বা বিক্ষিপ্তকা) নামক পাঁচপ্রকার ধ্রুবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ,এই পাঁচ প্রকার ধ্রুবায় প্রদত্ত উদাহরণগুলির প্রতিটি-ই শিবস্তুতি।

নাট্যশাস্ত্রের দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়ে ধ্রুবার আরো একটি ভেদ দেখানো হয়েছে, যদনুসারে ধ্রুবাগুলি ছয়প্রকার – শীর্ষক, উদ্ধতা, অনুবন্ধ, বিলম্বিতা, অড্ডিতা ও অপকৃষ্টা (না.শা.৩২/৩২৯)।

নাট্যদর্পণে যে পাঁচপ্রকার ধ্রুবার উল্লেখ করা হয়েছে, নাট্যশাস্ত্রের দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়ে এগুলিকে-ও ধ্রুবার আরেক প্রকার বিভাগ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। এই পাঁচটি ভেদ হল – প্রাবেশিকী, নৈষ্ক্রামিকী, আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী এবং আন্তরী। এবার ক্রমে-ক্রমে এই ভেদগুলির সোদাহরণ আলোচনা করা হল–

১.প্রাবেশিকী ধ্রুবা ঃ

'প্রাবেশিকী' পদটি 'প্রবেশ' শব্দনিষ্পন্ন। 'প্রবেশ' অর্থাৎ রস-ভাব-প্রকৃতি-অবস্থা ইত্যাদি সংযুক্ত অবস্থায় কোনো নাটকীয় পাত্রের মঞ্চে প্রবেশ। নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে – 'প্রবিশতঃ পাত্রস্য রস-ভাব-প্রকৃত্যবস্থাদিকং প্রবেশশব্দেনোচ্যতে'[১৩] – অর্থাৎ যে ধ্রুবাগানের মধ্যে মঞ্চে প্রবেশকারী সংশ্লিষ্ট পাত্রের শৃঙ্গারাদি রস, রত্যাদি ভাব, অবস্থা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে, তার নাম প্রাবেশিকী ধ্রুবা। টীকায় আরো বলা হচ্ছে, এই প্রকাশ ঘটবে শ্লেষ-সমাসোক্ত্যাদি অলঙ্কার প্রয়োগদ্বারে। এই ভাবে যখন কোনো পাত্রের প্রবেশ সূচিত হয়, তখন সেই ধ্রুবাকে প্রাবেশিকী ধ্রুবা নামে অভিহিত করা হয়। এইপ্রকার ধ্রুবার উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে অনর্ঘরাঘব থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করা হচ্ছে –

''দিণয়রকিরণুক্কেরো পিয়ায়রো কো বি জীবল্লোয়স্‌স।
কমলমউলকবালী-কয়- মহুঅর-কড্ঢণ-বিয়ড্‌টো ॥''

– উল্লিখিত শ্লোকে দিনকর অর্থাৎ সূর্যের বর্ণনব্যাজে ঋষি বিশ্বামিত্র, যিনি নিজ আশ্রমরক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে নিতে এসেছেন, তাঁর প্রবেশ সূচিত হয়েছে। অতএব এটি প্রাবেশিকী ধ্রুবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

নাট্যদর্পণে 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক থেকে প্রাবেশিকী ধ্রুবার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, যেখানে চন্দ্রোদয়বর্ণনাব্যাজে কুমার চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশের সূচনা করা হচ্ছে।

নাট্যশাস্ত্রবিহিত প্রাবেশিকী ধ্রুবার লক্ষণটি প্রায় অনুরূপ –

"নানার্থরসসংযুক্তা নৃণাং যা গীয়তে প্রবেশে তু।

প্রাবেশিকী তু নাম্না বিজ্ঞেয়া সা ধ্রুবা তজ্জ্ঞৈঃ ॥" (না.শা.৩২/৩১১)

– অর্থ স্পষ্ট। বিবিধ রসাত্মক যে গান কোনো পাত্রের প্রবেশমুহূর্তে পরিবেশিত হয়, তাকে প্রাবেশিকী ধ্রুবা নামে অভিহিত করা হয়। 'নানার্থরসসংযুক্তা' পদটির ব্যাখ্যা অভিনবভারতীতে সুন্দর ভাবে করা হয়েছে – 'নানা রসা ভাবা অর্থাশ্চ বিভাবাদয়ঃ তেষাং যুক্তঃ সামাজিকানাং হৃদয়েষু প্রবেশো যয়েতি প্রয়োজনম্'(না.শা. দ্বাত্রিংশ অধ্যায়)। ভাবপ্রকাশনে শারদাতনয় এক-ইভাবে প্রাবেশিকীর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন –

"নানার্থরসসংযুক্তা পাত্রাণাং নাট্যকর্মণি ।

প্রবেশসূচনী গাথা যা সা প্রাবেশিকী স্মৃতা ॥" (ভাব.প্র. ১০/১২৭)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশে একপ্রকার 'শ্রব্য' অর্থাৎ সঙ্গীতের উল্লেখ করা হয়েছে, যার নাম 'আক্ষিপ্তিকা'। এই নাম নাট্যশাস্ত্রের কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রকার গানের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নাট্যশাস্ত্র- নাট্যদর্পণাদি-কথিত প্রাবেশিকী ধ্রুবার অবিকল অনুরূপ। আক্ষিপ্তিকার উদাহরণরূপে 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নামক ত্রোটকটির চতুর্থ অঙ্কের দুটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে। উভয়ত্র-ই নানা রসে মণ্ডিত গানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পাত্রদের প্রবেশ সূচিত করা হয়েছে। আরো যে বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয়,সেটি হল 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' -এ এই গানটিকে 'প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভোজের মতে, এই গান হল 'রাগবিশেষ-আক্ষেপ' অর্থাৎ একান্তভাবে রাগাশ্রয়ী কোনো সঙ্গীত, যার দ্বারা পাত্রবিশেষের প্রবেশ সূচিত হয়েছে। স্পষ্ট-ই বোঝা যাচ্ছে, চরিত্রগত বিচারে ভোজকথিত 'আক্ষিপ্তিকা' প্রাবেশিকী ধ্রুবার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ।

২. নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবা ঃ

অঙ্কের শেষে অথবা অঙ্কের মাঝখানে কোনো কারণবশতঃ কোনো পাত্রের বহির্গমন সূচিত হয় যে ধ্রুবার দ্বারা, তার নাম নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবা। 'নৈষ্ক্রামিকী' পদের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করে অভিনবভারতীতে বলা হয়েছে – 'প্রবিষ্টস্যাবশ্যং নিষ্ক্রমণং ন ত্বেবমাক্ষেপাদিত্যাশয়েন নৈষ্ক্রামিকীমাহ'(না.শা. দ্বাত্রিংশ অধ্যায়)। 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত'-র পঞ্চম অঙ্ক থেকে একটি শ্লোক নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবার উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে –

"বহুবিহ-কজ্জবিসেসং অইগূঢ়ং নিহ্নবেই ময়ণাদো।
নিক্ষলই খুদ্ধচিত্তউ রত্তাহুত্তং মণো রিউণো ॥"

–উল্লিখিত শ্লোকে মদনবিকারগ্রস্ত, ঈষৎ শত্রুভীত, উন্মত্তপ্রায় চন্দ্রগুপ্তের রাজকুল-গমনের বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। এইকারণে মঞ্চ থেকে তাঁর নিষ্ক্রমণ সূচিত হয়েছে এই নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবাটির দ্বারা।

নাট্যশাস্ত্রে নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবার এক-ই লক্ষণ দেওয়া হয়েছে –

"অঙ্কান্তে নিষ্ক্রমণে পাত্রাণাং গীয়তে প্রয়োগেষু ।
নিষ্ক্রামোপগতগুণাং বিদ্যান্নৈষ্ক্রামিকীং তাং তু ॥" (না.শা.৩২/৩১২)

– অর্থ স্পষ্ট। আর 'অঙ্কান্ত' মানে কেবলমাত্র অঙ্কের শেষে নয়; প্রয়োজনে অঙ্ক চলাকালীন অঙ্কের মাঝে-ও এর প্রয়োগ হতে পারে। তাই অভিনবগুপ্ত বলেছেন –'অঙ্কস্য সমাপ্তৌ অসমাপ্তে2প্যঙ্কে যদা পাত্রাণাং নিষ্ক্রমণং তদা চেত্যর্থঃ'(না.শা. দ্বাত্রিংশ অধ্যায়)। পরভাবী শারদাতনয় নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবার অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করেছেন–

"প্রস্তুতার্থস্য নির্যোগে সর্বস্যাঙ্কান্তনিষ্ক্রমে।
যা নিষ্ক্রামগুণোপেতা সৈব নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবা ॥" (ভাব.প্র.১০/১৩১)

৩. আক্ষেপিকী ধ্রুবা ঃ

রসবিশেষের প্রয়োগমধ্যে সেই রসের প্রয়োগকে উল্লঙ্ঘন করে যদি অন্য কোনো রসের পরিবেশন করা হয়, তখন আক্ষেপিকী প্রকারের ধ্রুবার প্রয়োগ হয়ে থাকে। নাট্যদর্পণের টীকায় তাই বলা হয়েছে – 'প্রস্তুতরসোল্লঙ্ঘনেন রসান্তরোদ্‌ভাবনমাক্ষেপঃ, তৎপ্রয়োজনা আক্ষেপিকী'[১৪] –পরিবেশ্যমান রসের প্রয়োগকে অতিক্রম করে অন্য কোনো রসের প্রযোজনার নাম আক্ষেপ; এই আক্ষেপকে সূচিত করে যে ধ্রুবা, তার নাম আক্ষেপিকী। নাট্যদর্পণে উদাত্তরাঘব থেকে এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণটি সংস্কৃত ভাষায় –

" (নেপথ্যে) – অরে রে তাপস! স্থিরীভব, ক্বেদানীং গম্যতে?
স্বসুর্মম পরাভবপ্রসব একদন্তব্যথঃ
স্বরপ্রভৃতিবান্ধবোদ্দলনকাতসঙ্খ্যক্ষিতঃ।
তবেহ বিদলীভবত্তনুসমুচ্ছলচ্ছোণিত-
-চ্ছটাচ্ছুরিতবক্ষসঃ প্রশমমেতু কোপানলঃ ॥"

– উল্লিখিত অংশটির অব্যবহিত পূর্বে রামচন্দ্রের শৃঙ্গারাত্মক কিছু সংলাপাদি চলছিল। কিন্তু নেপথ্য থেকে এই শ্লোকটির উচ্চারণের ফলে মুহূর্তমধ্যে, শৃঙ্গাররস চলাকালীন অবস্থায় 'বীর' নামক রসান্ত

রের সূচনা ঘটল। এই সূচনা এখানে কার্যকর করা হয়েছে আক্ষেপিকী ধ্রুবার মাধ্যমে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অভিনবভারতীতে-ও আক্ষেপিকী ধ্রুবার এই উদাহরণটি-ই উপন্যস্ত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে-ও এইবিষয়ে এক-ই অভিমত পোষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে-ও বলা হয়েছে, কোনো বিশেষ রস পরিবেশনকালে তাকে উল্লঙ্ঘন করে রসান্তরের সূচনা হলে আক্ষেপিকী ধ্রুবার প্রয়োগ হবে –

"ক্রমমুল্লঙ্ঘ্য বিধিজ্ঞৈঃ ক্রিয়তে যা দ্রুতলয়েন নাট্যবিধৌ।

আক্ষেপিকী ধ্রুবা সা দ্রুতাস্থিতা বাপি বিজ্ঞেয়া ॥" (না.শা.৩২/৩১৩)

ভাবপ্রকাশনে-ও আক্ষেপিকী ধ্রুবার অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে।

যে বিষয়টি নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, কিন্তু নাট্যদর্পণে উল্লেখ করা হয়নি, সেটি হল এজাতীয় ধ্রুবা প্রযুক্ত হবে দ্রুত লয়ে। এর কারণরূপে অভিনবভারতী টীকায় বলা হয়েছে – 'তত্রাক্ষিপ্যমাণরসস্য দীপ্ততয়া দ্রুতা' (না.শা.দ্বাত্রিংশ অধ্যায়) – অর্থাৎ পরিবেশ্যমান রসের মধ্যে যেন বলপূর্বক অন্য রসের সূচনার কারণে, যেন তার অধিকতর গুরুত্ব ও তজ্জনিত প্রাধান্যের কারণে এজাতীয় ধ্রুবার পরিবেশন দ্রুতলয়ে হওয়া-ই বাঞ্ছনীয়। তবে এই বিষয়টি, বোঝা-ই যাচ্ছে একান্ত ভাবে শ্রোতা-দর্শকের ব্যক্তিগত রুচির বিষয়।

৪. প্রাসাদিকী ধ্রুবা ঃ

আক্ষেপিকী ধ্রুবার দ্বারা সূচিত অন্য রসটি বিভাবাদি প্রয়োগের দ্বারা আরো পরিস্ফুটিত করা হয় প্রাসাদিকী ধ্রুবার মাধ্যমে। অভিনবভারতীতে বিষয়টি আরো প্রাঞ্জল রূপে বলা হয়েছে – 'অনুক্তস্য বিভাবানুভাবব্যভিচারিবর্গস্য আক্ষেপবশাৎ স্থিরীকরণসমর্থত্বাদিতি' (না.শা. দ্বাত্রিংশ অধ্যায়) – অর্থ স্পষ্ট। আক্ষেপিকী ধ্রুবায় যে অন্য রসটির অকস্মাৎ পরিবেশন হয়, তার বিভাবাদি বিষয়ে দর্শকগণের সম্যক্ কোনো ধারণা তৈরি হয়ে ওঠার সময় পায় না। অথচ বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাব ব্যতীত স্থায়িভাবের রসে পরিণতি অসম্ভব। প্রাসাদিকী ধ্রুবা হল সেই মাধ্যম, যার দ্বারা আক্ষেপিকী ধ্রুবায় আক্ষিপ্ত আকস্মিক রসটি বিভাবাদি দ্বারা শ্রোতা-দর্শকের চিত্তে পরিস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ পায়। নাট্যদর্পণের টীকায় তাই বলা হয়েছে – 'প্রস্তুতস্য রসস্য বিভাবোন্মীলনেন নির্মলীকরণং প্রসাদঃ'।[১৫]

নাট্যদর্পণে 'প্রসাদ' শব্দটির আরো একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেটি হল – মঞ্চে প্রবিষ্ট কোনো পাত্রের অন্তঃকরণ অর্থাৎ চিত্তের গতিপ্রকৃতি সামাজিকদের জানানোর নাম প্রসাদ। যে ধ্রুবার

দ্বারা এই কার্য সম্পাদিত হয়, তার নাম প্রাসাদিকী ধ্রুবা। টীকায় তাই বলা হয়েছে – 'প্রবিষ্টপাত্রস্যান্ত-র্গতচিত্তপ্রবৃত্তেঃ সামাজিকান্ প্রতি গ্রথনং বা প্রসাদঃ'।[১৬]

নাট্যশাস্ত্রে এই ধ্রুবার লক্ষণটি হল –

"যা চ রসান্তরমুপগতমাক্ষেপবশাৎ প্রসাদয়তি রঙ্গম্।

রাগপ্রসাদজননী জ্ঞেয়া প্রাসাদিকী তু সা ॥"(না.শা.৩২/৩১৪)

– অর্থ এক-ই। আকস্মিক চিত্তবিক্ষেপের পর যে গান অন্যরসোপভোগী শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকে সুস্থিত করে, তার নাম প্রাসাদিকী ধ্রুবা; কারণ এটি তাদের অনুভূতিকে প্রসাদিত করে। ভাবপ্রকাশনধৃত প্রাসাদিকী লক্ষণটি-ও অনুরূপ –

"আক্ষেপবশতো যাসামন্তরং সমুপাগতা।

রঙ্গং প্রসাদয়তি যা সৈব প্রাসাদিকা ধ্রুবা ॥" (ভাব.প্র. ১০/১২৯)

নাট্যদর্পণে আরো বলা হয়েছে যে, প্রাবেশিকী ও আক্ষেপিকী ধ্রুবার অব্যবহিত পরে প্রাসাদিকী ধ্রুবার প্রয়োগ হবে– এই হল পূর্বাচার্যদের অভিমত। অভিনবভারতীতে-ও এই কথাটি বলা হয়েছে– 'ইয়ং হি প্রাবেশিক্যাক্ষেপিক্যা অনন্তরমবশ্যপ্রযোজ্যা ভবতি' (না.শা. দ্বাত্রিংশ অধ্যায়)।

৫. আন্তরী ধ্রুবা ঃ

'আন্তরী' পদটি 'অন্তর' শব্দ নিষ্পন্ন। 'অন্তর' অর্থাৎ ব্যবধান। অতএব নামদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, আন্তরী ধ্রুবা প্রযোক্তব্য কোনো ব্যবধান পূরণের জন্য । অভাবিত কোনো বিপদ বা উপদ্রব, ধনসম্পদের নাশ, কোনো নাটকীয় পাত্রের মূর্চ্ছিত হওয়ার উপক্রম, নাটকীয় কোনো ত্রুটির সম্ভাবনা অথবা বস্ত্রাভরণাদি স্থানচ্যুত হলে তা পুনরায় যথাস্থানস্থ করার প্রয়োজনে দর্শকচিত্তকে অন্যত্র ব্যাপৃত রাখার জন্য এজাতীয় ধ্রুবার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ অভাবিত, আকস্মিক কোনো নাটকীয় ঘটনার বর্ণনাবসরে অথবা নাটকীয় কোনো ভুলত্রুটির সংশোধনাবসরে দর্শকের চিত্তকে মঞ্চে আকৃষ্ট করে রাখার উপায় হল আন্তরী ধ্রুবা। নাট্যদর্পণের টীকায় তাই যথার্থ-ই বলা হয়েছে – 'অন্তরং ছিদ্রং তত্র ভবা আন্তরী'।[১৭] অভিনবভারতীতে-ও অনুরূপ প্রকারে এর ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হয়েছে – 'অন্তরে ছিদ্রে গীয়ত ইত্যন্তরা ধ্রুবা' (না.শা. দ্বাত্রিংশ অধ্যায়)। এজাতীয় ধ্রুবার মূলরস অবশ্য-ই পূর্বতন বা অধুনাতন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। নাট্যদর্পণে আরো বলা হয়েছে, এই আন্তরী ধ্রুবা নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণের দ্বারা নেপথ্য থেকে গীত হবে, মূল রঙ্গমঞ্চ থেকে নয়।

নাট্যশাস্ত্রে 'আন্তরী'র পরিবর্তে 'আন্তরা' পদের প্রয়োগ হয়েছে। এর লক্ষণ নির্ণয় করে সেখানে বলা হয়েছে –

"বিষণ্ণে মূর্ছিতে ভ্রান্তে বস্ত্রাভরণসংযমে।

দোষপ্রচ্ছাদনা যা চ গীয়তে সান্তরা ধ্রুবা ॥" (না.শা. ৩২/৩১৫)

– অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্রগুলির বিষণ্ণ-মূর্চ্ছিত-উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় বস্ত্রাভরণাদি স্থানভ্রষ্ট হলে এবং সামান্যতঃ নাটকের যেকোনো প্রকার ত্রুটির আচ্ছাদনের প্রয়োজনে আন্তরা ধ্রুবার প্রয়োগ হবে।

ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে শারদাতনয়-ও আন্তরা ধ্রুবার প্রায় অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করেছেন –

"সর্বাসামন্তরা বস্তুরসাদিবশকল্পিতা।

আন্তরা সা ধ্রুবা জ্ঞেয়া নাট্যাভিনয়রঞ্জনী ॥"(ভাব.প্র. ১০/১৩০)

অভিনবভারতী টীকায় বলা হয়েছে যে, আন্তরী ধ্রুবা দ্রুত, মধ্য বা বিলম্বিত যে কোনো প্রকার লয় আশ্রয়পূর্বক পরিবেশিত হতে পারে, এবিষয়ে কোনো কঠোর নিয়ম নেই – 'দ্রুতমধ্যবিলম্বিতান্যতমেন ভাব্যম্' (না.শা. দ্বাত্রিংশ অধ্যায়)।

আন্তরী ধ্রুবার কোনো উদাহরণ নাট্যদর্পণ বা নাট্যশাস্ত্রে না থাকার কারণে এখানে আলোচনা করা সম্ভব হল না ।

নাটকীয় পাত্রের প্রকারভেদ ঃ

নান্দী ও ধ্রুবার আলোচনার পর নাট্যদর্পণের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি হল নাটকীয় পাত্র অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্রের প্রকারভেদ। চরিত্র ব্যতিরেকে যেহেতু নাটকের রূপায়ণ অসম্ভব, অতএব বলা বাহুল্য, এই বিষয়টি আলোচনার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

নাটকীয় চরিত্রবিষয়ক আলোচনায় নাট্যদর্পণের গ্রন্থকারদ্বয় বিশেষ কোনো অভিনবত্বের অবতারণা করেননি। পূর্বাপর সকল নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের মত গতানুগতিক পন্থাতে-ই তাঁরা এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন। প্রথমে নাটকীয় পাত্রদের লিঙ্গভেদে পুরুষচরিত্র ও স্ত্রীচরিত্র – এভাবে ভাগ করা হয়েছে। অনন্তর এই উভয়প্রকার পাত্রের প্রকৃতিগত গুণের তারতম্য অনুসারে এদের আরো ভেদ নির্ণীত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে নাট্যদর্পণের টীকায় 'প্রকৃতি' পদটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে – 'প্রকর্ষেণ ক্রিয়ন্তে বাহ্যা চেষ্টা অস্যা ইতি প্রকৃতির্জন্মসহভবং শুভাশুভং শীলম্' ।[১৮] সহজাত শুভাশুভ গুণ অর্থাৎ ভালো বা মন্দ স্বভাব, যাকে ঘিরে ব্যক্তিমানুষের উত্তরণের যাবতীয় প্রচেষ্টা, এই সবকিছু নিয়ে-ই নির্মিত হয় কোনো ব্যক্তির প্রকৃতি অর্থাৎ চরিত্র। এই প্রকৃতি বা চরিত্রের ভিত্তিতে নাটকীয় পাত্রদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় –

১. উত্তম প্রকৃতির পাত্র

২. মধ্যম প্রকৃতির পাত্র এবং

৩. অধম প্রকৃতির পাত্র। নাট্যদর্পণের কারিকায় বলা হচ্ছে –

" উত্তমা মধ্যমা নীচা প্রকৃতির্নৃস্ত্রিয়োস্ত্রিধা।

একৈকাপি ত্রিধা স্বস্বগুণানাং তারতম্যতঃ ॥" (না.দ. ৪/৩)

গুণের তারতম্যের বিষয়টি নাট্যদর্পণের টীকায় এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে – প্রকৃষ্ট অর্থাৎ উত্তম প্রকৃতির পাত্রদের চরিত্রে, মধ্যম বা নীচ প্রকৃতির পাত্রদের তুলনায় গুণের আধিক্য থাকবে, যে আধিক্য তরপ্-তমপ্ ইত্যাদি প্রত্যয়প্রয়োগদ্বারে বোধিত হবে। অর্থাৎ এক-ই গুণ নীচ প্রকৃতির পাত্রে স্বল্প-পরিমাণে, মধ্যম প্রকৃতির পাত্রে তদধিক পরিমাণে এবং উত্তম প্রকৃতির পাত্রে সাতিশয় পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। টীকায় বলা হচ্ছে-- '...তারতম্যং সামান্য-কিঞ্চিদাধিক্য-সাতিশয়াধিক্যলক্ষণাবস্থাত্রয়যোগিত্বমিতি'। [১৯]

এই প্রসঙ্গে দশরূপকের অবতারণাটি প্রাসঙ্গিক। আচার্য ধনঞ্জয়-ও নাটকীয় পাত্রবিষয়ক আলোচনাকালে নায়ক, নায়িকা, দূত, মন্ত্রী, পুরোহিতাদি যাবতীয় পাত্রপাত্রীকে উত্তম, মধ্যম ও অধম – এই তিনভাগে বিভক্ত করেছেন –'জ্যেষ্ঠমধ্যাধমত্বেন সর্বেষাং চ ত্রিরূপতা' (দশ.রূ.২/৪৫)। যে বিষয়ে নাট্যদর্পণকারদের থেকে এঁদের পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে, সেটি হল এই পাত্রদের গুণের তারতম্যের কারণ নির্ণয়ে। নাট্যদর্পণের টীকায় যেখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে, গুণের আধিক্য বা হ্রাসের কারণে-ই তিনপ্রকার পাত্রভেদ, দশরূপকের বৃত্তিকার ধনিক কিন্তু অন্যরকম মত পোষণ করছেন। তাঁর মতে, পাত্রপাত্রীর গুণের সংখ্যা বা আধিক্যের ভিত্তিতে নয়, বরং গুণের বিশেষতার তারতম্য অনুসারে-ই এদের উত্তমাদি ভেদ নির্দিষ্ট হয়। টীকায় তাই বলা হচ্ছে –" উত্তমাদিভাবশ্চ ন গুণসংখ্যোপচয়াপচয়েন। কিং তর্হি? গুণাতিশয়তারতম্যেন" (দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ)।

পাত্রভেদ বিষয়ে সাহিত্যদর্পণকারের মতটি-ও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। স্বীয় গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি এই পাত্রদের সুস্পষ্ট শ্রেণীনির্দেশ করছেন। তাঁর মতে, রাজা, পীঠমর্দ, মন্ত্রী,পুরোহিত,ঋত্বিক প্রভৃতি উত্তম শ্রেণীর; বিট, বিদূষক প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর এবং শকার, চেট এরা হল অধম শ্রেণীর নাটকীয় চরিত্রের উদাহরণ।

অনন্তর উত্তমাদি তিনপ্রকার পুরুষ পাত্রের লক্ষণ বিবৃত করা হল –

১.উত্তমপ্রকৃতির পুরুষ পাত্র– এজাতীয় পাত্রের লক্ষণ আলোচনাবসরে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে–

"শরণ্যো দক্ষিণস্ত্যাগী লোকশাস্ত্রবিচক্ষণঃ।

গাম্ভীর্য-ধৈর্য-শৌণ্ডীর্য-ন্যায়বানুত্তমঃ পুমান্ ॥"(না.দ. ৪/৪)

– অর্থাৎ উত্তম প্রকৃতির পুরুষ হবেন শরণাগতজনের পরিত্রাতা, দানপরায়ণ, ত্যাগী, লোকাচার-দেবাচার বিষয়ে অভিজ্ঞ, গাম্ভীর্য-ধৈর্য-বীর্য ইত্যাদি গুণে অন্বিত এবং ন্যায়পরায়ণ । নাট্যশাস্ত্রে উত্তম পুরুষ চরিত্রের প্রকৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে –

"জিতেন্দ্রিয়জ্ঞানবতী নানাশিল্পবিচক্ষণা।

দক্ষিণাথ মহালক্ষ্যা ভীতানাং পরিসান্ত্বনী॥

নানাশাস্ত্রার্থসংপন্না গাম্ভীর্যৌদার্যশালিনী ।

স্থৈর্যত্যাগগুণোপেতা জ্ঞেয়া প্রকৃতিরুত্তমা ॥"(না.শা.২৪/২,৩)

– জিতেন্দ্রিয়, প্রাজ্ঞ, বিবিধ কলা ও শিল্পে নিপুণ, দানশীল, মহান্ লক্ষ্যপূরণে ব্রতী, ভীত জনের সান্ত্বনাদাতা ,বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, গম্ভীর, উদার, ধৈর্যশীল ও বদান্য – পুরুষের এইরূপ প্রকৃতি উত্তম।

২.মধ্যমপ্রকৃতির পুরুষ পাত্র – এজাতীয় পাত্রের লক্ষণ আলোচনায় নাট্যদর্পণে কেবলমাত্র বলা হচ্ছে – 'মধ্যো মধ্যগুণঃ' (না.দ.৪/৫) – মধ্যম প্রকৃতির পাত্ররা না উৎকৃষ্ট, না অপকৃষ্ট। উত্তমপ্রকৃতির পাত্রদের গুণাবলী এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বর্তমানে থাকে, এইমাত্র। এরা হল সাধারণ প্রকৃতির; না উত্তম, না অধম। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু মধ্যমশ্রেণীর পুরুষের জন্য পৃথক গুণাবলীর নির্দেশ আছে । মহর্ষি ভরতের মতে, লোকাচারে পারদর্শী, কলাশিল্প ও শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, প্রাজ্ঞ, মধুর ব্যবহারযুক্ত– পুরুষের এইরূপ প্রকৃতি মধ্যম –

"লোকোপচারচতুরা শিল্পশাস্ত্রবিশারদা।

বিজ্ঞানমাধুর্যযুতা মধ্যমা প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥"(না.শা.২৪/৪)

৩.নীচপ্রকৃতির পুরুষপাত্র – এজাতীয় পাত্রের লক্ষণ নির্ণয় করে নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে –

"নীচঃ পাপীয়ান্ পিশুনো2লসঃ ।

কৃতঘ্নঃ কলহী ক্লীবঃ স্ত্রীলোলো রুক্ষবাগ্ জড়ঃ ॥"(না.দ. ৪/৫)

– অর্থাৎ নীচপ্রকৃতির পাত্ররা হবে পাপাচারী, পিশুন অর্থাৎ নিন্দুক, অলস, অকৃতজ্ঞ, কলহপরায়ণ, 'ক্লীব' অর্থাৎ হীনসত্ত্ব, স্ত্রীসম্ভোগের প্রতি লুব্ধ,পরুষভাষী এবং 'জড়' অর্থাৎ হীনবুদ্ধি।

নাট্যশাস্ত্রে তিনটি শ্লোকে অধম প্রকৃতির পুরুষচরিত্র বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– যে পুরুষরা কর্কশভাষী, দুর্ব্যবহারপরায়ণ, নীচাশয়, জড়বুদ্ধি, কোপনস্বভাব,হত্যাকারী, বন্ধুঘাতক, ছিদ্রান্বেষী, অকৃতজ্ঞ,উদ্ধতভাষী,উপকারস্বীকারে বিমুখ, অলস, মাননীয় ব্যক্তিদের সম্মানরক্ষায় উদাসীন, স্ত্রীসম্ভোগে লোলুপ,কলহপরায়ণ,পাপাচারী, পরদ্রব্যাপহারক, তারা হল অধম প্রকৃতির পুরুষচরিত্র।

এবিষয়ে একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবে উঠতে পারে যে, নীচপ্রকৃতির পাত্রদের নাটকীয় পাত্ররূপে গ্রহণ করার-ই কি প্রয়োজন? এর উত্তরে নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে কিছু-কিছু রূপকে, যেমন – ভাণ, প্রহসন, কখনো বা বীথীতে হাস্যোদ্রেকের প্রয়োজনে এজাতীয় নীচপাত্রের অস্তিত্ব-ও স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ নাটকীয় ইতিবৃত্তের প্রয়োজন অনুসারে নীচশ্রেণীর পাত্রদের-ও অন্তর্গত করা অসঙ্গত নয়। কারিকায় তাই বলা হয়েছে – 'নীচো2পীশঃ কথাবশাৎ'(না.দ.৪/৭)।

অনন্তর উত্তমাদি স্ত্রীপাত্রের লক্ষণ –

উত্তম প্রকৃতির স্ত্রী চরিত্রের লক্ষণনির্ণয় করে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে –

"লজ্জাবতী মৃদুর্ধীরা গম্ভীরা স্মিতহাসিনী।
বিনীতা কুলজা দক্ষা বৎসলা যোষিদুত্তমা ॥"(না.দ. ৪/৬)

–উত্তম প্রকৃতির নারী হবেন লজ্জাশীলা, মৃদুস্বভাবা, ধীরা, গম্ভীরা, স্মিতহাস্যকারিণী, বিনীতা, সদ্বংশজা, কর্মাদিতে নিপুণা এবং স্নেহশীলা।

নাট্যশাস্ত্রে উত্তম প্রকৃতির নারীর গুণাবলীর দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে, যে নারীর স্বভাব কোমল, অচঞ্চল, সস্মিত বাচনযুক্তা, নিষ্ঠুরতাবিহীন, গুরুজনের কথায় মনোযোগী, লজ্জাশীলা, বিনয়সম্পন্ন, সৌন্দর্য-আভিজাত্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিতা, যিনি ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্যসম্পন্না, তিনি-ই উত্তম প্রকৃতির নারী।

মধ্যম ও নীচপ্রকৃতির স্ত্রীচরিত্র বিষয়ে নাট্যদর্পণে পৃথক কোনো লক্ষণ নির্ণয় করা হয়নি। কেবলমাত্র বলা হয়েছে, মধ্যম ও অধম প্রকৃতির পুরুষ পাত্রদের অনুরূপ এজাতীয় স্ত্রী চরিত্রগুলির বিন্যাস হবে। নাট্যশাস্ত্রে-ও এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করা হয়েছে।

নাট্যদর্পণে নাটকীয় পাত্রদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এদের অন্য এক প্রকার ভেদ-ও প্রদর্শিত হয়েছে –

১.অনুরূপা – যখন অভিনয় প্রদর্শনকালে পাত্রপাত্রীরা তাদের চরিত্রানুসারী অবস্থার যথাযথ অনুকরণ করে, সেটি হল অনুরূপা প্রকৃতি। এজাতীয় অভিনয়ে পুরুষচরিত্রগুলি যথেষ্ট পৌরুষব্যঞ্জক, নারীচরিত্রগুলির আচরণ যথেষ্ট স্ত্রীসুলভ কমনীয়তায় পূর্ণ।

২.বিরূপা – যখন অভিনয়কালে অযথাযথ কিছু সংঘটিত হয়, তখন তাকে বিরূপা প্রকৃতি বলে। যেমন–যখন কোনো বৃদ্ধচরিত্র বালকোচিত অভিনয় করে অথবা বিপরীতক্রমে কোনো বালক বৃদ্ধজনোচিত আচরণ করে, তখন এটিকে বিরূপা প্রকৃতির উদাহরণ বলা যেতে পারে।

৩.রূপানুরূপিনী – যখন কোনো পুরুষ নারীচরিত্রে অথবা বিপরীতক্রমে কোনো নারী পুরুষচরিত্রে অভিনয় করে, তখন তাকে রূপানুরূপিনী প্রকৃতি বলা হয়।

এই প্রভেদটি একান্তভাবে নাট্যশাস্ত্রের অনুসারী ;নাট্যশাস্ত্রের ষড়ুবিংশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিতে অনুরূপভাবে পাত্রদের প্রকারভেদ নির্ণয় করা হয়েছে।

নায়ক ও তার বিভিন্ন গুণ ঃ

নায়কের গুণাবলী আলোচনার পূর্বে 'নায়ক' কাকে বলে, তা জানা দরকার। নাট্যদর্পণের কারিকায় সংক্ষেপে বলা হয়েছে – 'প্রধানফলসম্পন্নো2ব্যসনী মুখ্যনায়কঃ'(না.দ. ৪/৭) –দৃশ্যকাব্যে যে চরিত্র প্রধান, যাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ঘটনার আবর্তন, নাট্যফলের অধিকারী যে ব্যক্তি, স্ত্রীসম্ভোগাদিব্যসনবিবর্জিত সেই ব্যক্তি-ই হলেন রূপকের মুখ্যনায়ক।

প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য কিছু নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে বিধৃত নায়কলক্ষণগুলি আলোচনা করা অবান্ত র হবে না। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে নাটকের বহু পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দুর্ভাগ্যহত বা বিপন্ন যে ব্যক্তি অবশেষে উন্নতি লাভ করেন, তাকে বলা হয় নায়ক; তিনি-ই প্রধান –

"ব্যসনী প্রাপ্য দুঃখং বা যুজ্যতে2ভ্যুদয়েন যঃ ॥

তথা পুরুষমাহুস্তং প্রধানং নায়কং বুধাঃ।"(না.শা.২৪/২১,২২)

যদি কোন রূপকে এ জাতীয় একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তখন যাঁর দুর্ভাগ্য ও উন্নতি প্রধানভাবে প্রতীত হয়, তাঁকে-ই নায়ক বলা হবে। এই কথার দ্বারা প্রধান নায়কের সঙ্গে পতাকানায়কের বা প্রকরীনায়কের পার্থক্য সূচিত হচ্ছে।

দশরূপকে বলা হচ্ছে – নায়ক বা নেতা হবেন বিনীত, মধুরস্বভাবসম্পন্ন, ত্যাগী, দক্ষ, প্রিয়ভাষী, লোকপ্রিয়, শুচি, বাগ্মী, প্রখ্যাতকুলোদ্ভব, স্থিরচরিত্র ও যুবাবয়স্ক। আরো বলা হয়েছে, তিনি হবেন বুদ্ধিমান, উৎসাহী, স্মৃতিমান্, প্রজ্ঞাশালী, কলাসমন্বিত, বীর, দৃঢ়চেতা, তেজস্বী, শাস্ত্রানুসারী এবং ধার্মিক। দর্পণকার-ও তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশদে নায়ক লক্ষণ আলোচনা করেছেন –

"ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।

দক্ষো2নুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা ॥"(সা.দ. ৩/৩৬)

আবার সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে অতি সংক্ষেপে নায়কের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন –

'নাটকাদিবিনিষ্পত্তিফলযোগস্য ভাজনম্ ।

নায়কঃ কথিতঃ ....॥" (না.ল.র. অষ্টাদশ অধ্যায়)

– অর্থাৎ নাটকাদিতে বর্ণিত ফললাভের যিনি ভাজন, তাঁকে-ই পণ্ডিতরা 'নায়ক' আখ্যায় অভিহিত করেন। এর অতিরিক্ত কোনো লক্ষণ তাঁর মতে এখানে নিষ্প্রয়োজন।

নায়কের গুণাবলী ঃ

নাট্যশাস্ত্র থেকে শুরু করে সাহিত্যদর্পণাদি পর্যন্ত প্রাচীন-অর্বাচীন যাবতীয় নাট্যতত্ত্বগ্রন্থে নায়কের আটটি গুণের কথা স্বীকার করা হয়েছে – তেজ, বিলাস, মাধুর্য, শোভা, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, ঔদার্য এবং ললিত। দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে এই গুণগুলির সোদাহরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে; কিন্তু নাট্যদর্পণে অতিসংক্ষেপে কেবল এই গুণগুলির লক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এখানে উদাহরণ ব্যতিরেকে-ই এই আলোচনা করা হচ্ছে –

১.তেজ – নাট্যদর্পণসম্মত 'তেজ' নামক গুণটির লক্ষণ হল – 'ক্ষেপাদেরসহিষ্ণুত্বং তেজঃ প্রাণাত্যয়ে2পি চ' (না.দ.৪/৯) – কোনো নায়ক যদি প্রাণের বিনিময়ে-ও তিরস্কার, অপমান প্রভৃতি সহ্য না করেন, তবে তাঁর মধ্যে তেজ নামক সাত্ত্বিক গুণের প্রকাশ ঘটে।

নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি সকল গ্রন্থে তেজের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে লক্ষণটি একটু পৃথক। তত্রোক্ত তেজলক্ষণটি হল – 'অধিক্ষেপাপমানপ্রত্যবায়দর্শনৈঃ পরৈরুচ্যমানস্যারব্ধাদনিবর্তনং তেজঃ' (না.ল.র. দ্বাদশ অধ্যায়) – অর্থাৎ অন্যে তিরস্কার, অপমান ও প্রত্যবায়ের ভয় দেখিয়ে নিষেধ করলে-ও আরব্ধ কর্ম থেকে নিবৃত্ত না হওয়ার নাম তেজ।

২. মাধুর্য – নাট্যদর্পণে মাধুর্যের যে লক্ষণটি দেওয়া হয়েছে, সেটি হল –'মাধুর্যং বিকৃতিঃ স্তত্যা ক্ষোভহেতৌ মহত্যপি' (না.দ.৪/১০) – ক্ষোভের অনেক কারণ থাকা সত্ত্বে-ও স্তত্যাদিপ্রয়োগের দ্বারা সামান্য পরিমাণ বিকারের জন্ম হলে, তাকে মাধুর্য নামক গুণরূপে অভিহিত করা হয়।

নাট্যশাস্ত্রে মাধুর্যের লক্ষণ নির্ণয় করে বলা হয়েছে –

''অভ্যাসাৎ করণানাং তু শ্লিষ্টত্বং যত্র জায়তে।
মহৎস্বপি বিকারেষু তন্মাধুর্যমিতি স্মৃতম্ ॥'' (না.শা.২২/৩৬)

– অর্থ এক-ই। অভিনবভারতী টীকার বিশদ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যুদ্ধব্যায়ামাদি অভ্যাসহেতু চিত্তবিকারের গুরুতর কারণ সত্ত্বে-ও ইন্দ্রিয়সমূহের অচঞ্চলভাব মাধুর্য নামে কথিত।

দশরূপকে-ও মাধুর্যের লক্ষণ নির্ণয় করে বলা হয়েছে – 'শ্লক্ষ্ণো বিকারো মাধুর্যং সংক্ষোভে সুমহত্যপি' (দশ.রূ.২/১২) – অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষোভের মধ্যে নায়কের সামান্য বিকারের নাম মাধুর্য। সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে-ও বলা হয়েছে নানাপ্রকার অপ্রিয়, ক্ষোভজনক ঘটনার মধ্যে-ও নায়কের নিরুদ্বিগ্ন ভাবের নাম মাধুর্য।

৩. শোভা – নাট্যদর্পণে শোভার লক্ষণনির্ণয় করে বলা হয়েছে, নীচ বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা, উত্তমব্যক্তির সাথে সমতা স্থাপনের ইচ্ছা, শৌর্য, দক্ষতা ইত্যাদির সমাবেশে শোভা নামক গুণের উদ্ভব। কারিকায় বলা হচ্ছে – 'শোভা চিহ্নং ঘৃণাস্পর্ধাদাক্ষ্যশৌর্যোদ্যমোন্নয়ে' (না.দ.৪/১০)।

নাট্যশাস্ত্র, দশরূপকে শোভার অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। দর্পণকার তাঁর গ্রন্থে শোভার আরেকটু বিস্তারিত লক্ষণ দিয়েছেন –

"শূরতা দক্ষতা সত্যং মহোৎসাহো2নুরাগিতা।

নীচে ঘৃণা2ধিকে স্পৃহা যতঃ শোভেতি তাং বিদুঃ ॥" (সা.দ. ৩/৬৩)

– অর্থাৎ বিশ্বনাথের মতে, শোভা হল নায়কচরিত্রে বিদ্যমান বীরত্ব, দক্ষতা, সত্যনিষ্ঠা, মহোৎসাহ, অনুরাগ, নীচের প্রতি ঘৃণা ও প্রবলের প্রতি স্পর্ধা। নাটকলক্ষণরত্নকোশে লৌকিক ব্যাপারে সদাচরণকে-ও শোভা নামক গুণের অন্তর্গত করা হয়েছে।

৪. স্থৈর্য – স্থৈর্য নামক গুণের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'বিঘ্নে2প্যচলনং স্থৈর্যং প্রারব্ধাদশুভাদপি' (না.দ. ৪/১১) – বিঘ্নের মধ্যে-ও নিজসংকল্পের লক্ষ্যে অবিচল থাকার নাম স্থৈর্য। 'অশুভ' পদের ব্যাখ্যায় টীকায় বলা হয়েছে – ইহলোক ও পরলোকের জন্য অনুচিৎ কোনো কাজ 'অশুভ' পদের দ্বারা বোধ্য। অতএব দেখা যাচ্ছে, শুভসংকল্প তো বটে-ই, পরিস্থিতিবিশেষে অশুভসংকল্প থেকে-ও বিচ্যুত না হওয়ার নাম হল স্থৈর্য।

নাট্যশাস্ত্রে স্থৈর্যের যে লক্ষণটি দেওয়া হয়েছে, সেটি হল –

"ধর্মার্থকামসংযুক্তাচ্ছুভাশুভসমুত্থিতাৎ।

ব্যবসায়াদচলনং স্থৈর্যমিত্যভিধীয়তে ॥" (না.শা. ২২/৬৭)

– অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ ও কামসংক্রান্ত শুভ এবং অশুভ সংকল্প থেকে বিচলিত না হওয়াকে স্থৈর্য নামে অভিহিত করা হয়।

দশরূপককার ধনঞ্জয়-ও বলেছেন, নানা প্রতিবন্ধকতা বা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বে-ও নায়ক যদি নিজ সংকল্প থেকে বিচ্যুত না হন, তবে-ই স্থৈর্য নামক সাত্ত্বিক গুণের প্রকাশ ঘটে। সাহিত্যদর্পণে এই গুণকে স্থৈর্যের পরিবর্তে 'ধৈর্য' আখ্যা দিলে-ও লক্ষণ অনুরূপভাবে-ই করা হয়েছে।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে এই গুণের লক্ষণ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত–'ধৈর্যবৎ ধর্মার্থকামব্যবসায়াদচলনম্, অতিজিতকাশিত্বম্, সদামানশৌর্যাভ্যামবস্থানম্, অদীনং চেষ্টিতং চ' (না.ল.র. দ্বাদশ অধ্যায়)– অর্থাৎ স্থৈর্য হল ধৈর্যশীলতা, ধর্ম-অর্থ-কাম সম্পর্কিত আচরণ থেকে অবিচলত্ব, জয়দৃপ্তভাব, সর্বদা মান ও শৌর্যের সঙ্গে অবস্থান এবং অদীন আচরণ – এই সমস্ত গুণের সমাবেশ।

৫.গাম্ভীর্য – নাট্যদর্পণধৃত গাম্ভীর্যের লক্ষণটি হল – 'গাম্ভীর্যং সহজা মূর্তিঃ কোপহর্ষাদিগোপনী' (না.দ.৪/১১)– টীকার সাহায্য নিয়ে এই কারিকাটির যা অর্থ করা যেতে পারে, সেটি হল – ক্রোধ, হর্ষ, (আদি পদের দ্বারা বোধ্য) ভয়, শোক প্রভৃতি ভাবের উদয়ে আগত মুখের ভঙ্গি, দৃষ্টিবিকার ইত্যাদির দ্বারা যখন নায়কের 'মূর্তি' অর্থাৎ বহিরাকৃতির কোনো বিকার লক্ষিত হয় না, তখন তাকে 'গাম্ভীর্য' নামক গুণরূপে অভিহিত করা হয়।

গাম্ভীর্যের লক্ষণবিষয়ে পূর্বাপর সকল আচার্য-ই সহমত । নাট্যশাস্ত্রে এর লক্ষণে বলা হয়েছে–

''যস্য প্রভাবাদাকারা হর্ষক্রোধভয়াদিষু।
ভাবেষু নোপলক্ষ্যন্তে তদ্ গাম্ভীর্যমিতি স্মৃতম্ ॥''(না.শা.২২/৩৯)

– অর্থাৎ যার প্রভাবহেতু ক্রোধ, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি ভাবে আকার অর্থাৎ বহিরাকৃতি বিকৃত হয় না, তা গাম্ভীর্য নামে কথিত। পরভাবী দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণাদি অন্যান্য গ্রন্থে-ও সুখে-দুঃখে , বিপদে-সম্পদে নায়কের অবিচল অবস্থাকে গাম্ভীর্য বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'মাধুর্য' নামক গুণে নায়কচিত্তের সামান্য বিকার পরিলক্ষিত হয়; গাম্ভীর্যে সামান্য বিকার-ও অনুপস্থিত – এইমাত্র উভয়ের পার্থক্য।

৬.ঔদার্য – ঔদার্য নামক গুণের লক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে – 'ঔদার্যং শত্রুমিত্রাণাং প্রাণিতেনাপ্যুপগ্রহঃ' (না.দ. ৪/১২)। টীকায় 'প্রাণিত' শব্দের অর্থ নির্দেশ করে বলা হয়েছে – 'প্রাণিতশব্দেন স্বজীবিতব্যস্য দানমুচ্যতে'। অতএব কারিকার অর্থ হল – নিজ প্রাণের বিনিময়ে-ও শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সকলের উপকার করার নাম ঔদার্য। কারিকাস্থ 'অপি' পদের দ্বারা দান-প্রিয়ভাষণাদির গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দান-মিষ্টবাক্য ইত্যাদি তো বটে-ই, চূড়ান্ত ক্ষেত্রে প্রাণাত্যয়ে-ও মানুষের উপকার সাধনের সাত্ত্বিক গুণের নাম ঔদার্য।

নাট্যশাস্ত্রে-ও ঔদার্যের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে –

''দানমভ্যুপপত্তিশ্চ তথা চ প্রিয়ভাষণম্ ।
স্বজনে চ পরে বাপি তদৌদার্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥'' (না.শা. ২২/৪০)

'অভ্যুপপত্তিঃ' পদের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন – 'অভ্যুপপত্তিঃ পরিত্রাণাদ্যর্থিনো2ঙ্গীকরণম্' (না.শা.দ্বাবিংশ অধ্যায়) । অতএব অভিনবভারতীর সাহায্যে কারিকাটির নিষ্কাশিত অর্থটি হল – আপন-পর নির্বিশেষে সকলকে দান, (শরণাগতকে) পরিত্রাণের অঙ্গীকার এবং প্রিয়ভাষণ ঔদার্য নামে কথিত । নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও অনুরূপভাবে ঔদার্যের লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

দশরূপকে ঔদার্যের লক্ষণটি একটু অন্যরকম। তত্রোক্ত লক্ষণটি হল– 'প্রিয়োক্ত্যা আজীবিতাদ্ দানমৌদার্যং সদুপগ্রহঃ' (দশ.রূ. ২/১৪)। এই কারিকা অনুসারে ঔদার্য নামক গুণের সদ্ভাব দু'ভাবে হতে পারে – প্রথমতঃ, প্রিয়বাক্যের সঙ্গে জীবন পর্যন্ত দান করা এবং দ্বিতীয়তঃ,প্রিয়বাক্য ও আচরণের দ্বারা সজ্জনদের আপন করা।

দর্পণকার বিশ্বনাথ আবার প্রিয়বাক্যসমন্বিত দান ও শত্রুমিত্রে সমদর্শিতাকে ঔদার্য নামে অভিহিত করেছেন – 'দানং সপ্রিয়ভাষণমৌদার্যং শত্রুমিত্রয়োঃ সমতা' (সা.দ. ৬/৬৮)।

৭. ললিত – নাট্যদর্পণে ললিত নামক গুণের লক্ষণটি এভাবে নির্ণয় করা হয়েছে – 'শৃঙ্গারাদিচেষ্টা ললিতং নির্বিকারাঃ স্বভাবজাঃ'(না.দ.৪/১২) – নায়কচিত্তের নির্বিকার, স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্গারাত্মক প্রচেষ্টা সম্পাদিত হয় যে গুণের দ্বারা, তার নাম ললিত। টীকায় শৃঙ্গারাত্মক চেষ্টাগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে। যথা – তির্যক দৃষ্টিনিক্ষেপ, বক্রোক্তিযুক্ত ভাষণ, শারীরিক প্রসাধন ইত্যাদি। 'নির্বিকার' অর্থাৎ কৃত্রিমতারহিত; 'স্বভাবজা' পদের ব্যাখ্যায় টীকায় বলা হয়েছে 'অবুদ্ধিপূর্বকা' অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত। অতএব নায়কের অকৃত্রিম, স্বতঃস্ফূর্ত বিবিধ শৃঙ্গারজ চেষ্টার নাম ললিত।

নাট্যশাস্ত্রে ললিতের লক্ষণটি অবিকল একরকম। দশরূপকে-ও নায়কের সহজ ও কোমল শৃঙ্গারাত্মক প্রচেষ্টাকে ললিত বলা হয়েছে – 'শৃঙ্গারাকারচেষ্টাত্বং সহজং ললিতং মৃদু' (দশ.রূ.২/১৪)। স্বাভাবিক শৃঙ্গার মৃদু এবং তাদৃশ শৃঙ্গারচেষ্টা ললিত – এই হল বৃত্তিকার ধনিকের মত। দর্পণকার বিশ্বনাথ বাক্য ও বেশের মধুরতা ও তদনুরূপ শৃঙ্গারচেষ্টাকে 'ললিত' নামে অভিহিত করেছেন – 'বাগ্‌বেশয়োর্মধুরতা তদ্বচ্ছৃঙ্গারচেষ্টিতং ললিতম্' (সা.দ. ৩/৬৮)।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে সাগরনন্দী একটু অন্যভাবে ললিতের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, মধুরবাক্য, শৃঙ্গারী বেশ, সদাচরণ এবং সর্বদা সাধুসঙ্গের বাসনা-ই হল ললিত নামক গুণ। কারিকায় বলা হয়েছে – 'মধুরা বাক্,বেষঃ শৃঙ্গারী, চেষ্টিতং সাধু , সাধূনাং সদা সঙ্গমবাঞ্ছা' (না.ল.র. দ্বাদশ অধ্যায়)।

৮. বিলাস – নাট্যদর্পণে বিলাস নামক গুণের লক্ষণটি এভাবে নির্ণয় করা হয়েছে – 'বিলাসো বৃষবদ্‌যানং ধীরা দৃক্ সস্মিতং বচঃ' (না.দ. ৪/১১) –বৃষবদ্ গতি, ধীর দৃষ্টি এবং সস্মিত বচনের নাম বিলাস।

নাট্যশাস্ত্রে কথিত বিলাসের লক্ষণটি-ও অনুরূপ –

"ধীরসংচারিণী দৃষ্টির্গতির্গোবৃষভাঞ্চিতা।

স্মিতপূর্বমথালাপো বিলাস ইতি কীর্তিতঃ ॥"(না.শা.২২/৩৫)

– অর্থাৎ স্থির ধৈর্যসমন্বিত দৃষ্টি, বৃষের ন্যায় উত্তমগতি ও স্মিতহাস্যপূর্ণ বাক্য বিলাস নামে কথিত। নাটকলক্ষণরত্নকোশে আরো বিশদে বিলাসের লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে – "ধীরদৃষ্টিঃ, গতির্গোবৃষভাঞ্চিতা, মধুরা বাক্, স্মিতপূর্বং ভাষণম্, শুভাকৃতিঃ, সম্পদ্‌বিপদোঃ সমতা। এষাং সমুদয়ো বিলাসঃ" (না.ল.র. দ্বাদশ অধ্যায়)– ধীর দৃষ্টি, উত্তম বৃষের ন্যায় গতি, মধুর বাক্য, সস্মিত ভাষণ, শুভ আকৃতি এবং সম্পদ্-বিপদে সমতা – এদের সমুদয়কে বিলাস নামক গুণ বলা হয়। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে-ও অচঞ্চল দৃষ্টি, আশ্চর্য গতি ও সস্মিত বাক্য-ই বিলাস – এভাবে সংক্ষেপে বিলাসের লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

অমুখ্য (গৌণ) নায়ক ঃ

নাট্যদর্পণে অমুখ্য নায়কের যে লক্ষণটি নির্ণয় করা হয়েছে তা হল –'অমুখ্যো নায়কঃ কিঞ্চিদূনবৃত্তো2গ্র্যনায়কাৎ' (না.দ. ৪/১৩) – প্রধান নায়কের তুলনায় যে নায়কের ইতিবৃত্ত, কার্যকলাপ ইত্যাদি গুরুত্বে ও আয়তনে অপেক্ষাকৃত গৌণ, সেই নায়ক হলেন অমুখ্য নায়ক। এজাতীয় চরিত্রের কাজ হল বিবিধপ্রকার কার্যে প্রধান নায়কের সহায়তা করা এবং এভাবে-ই এই চরিত্রগুলি নায়কপর্যায়ে উন্নীত হয়। এঁদের-ও নানাপ্রকার শৌর্য-বীর্য-ত্যাগ-যুদ্ধাদি বিষয়ক ঘটনা রূপকে বিধৃত থাকবে; তবে এর গুরুত্ব প্রধান নায়কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর গুরুত্বের চেয়ে একটু কম হবে।

অমুখ্য নায়কের উদাহরণ হল পতাকা নামক প্রাসঙ্গিক ও ব্যাপী কথাবস্তুর নায়ক।এই পতাকানায়ককে বলা হয় 'পীঠমর্দ'। পদটির ব্যুৎপত্তি হল – 'পীঠং সমানস্থানং মর্দয়তি অবস্থানেন পীড়য়তীতি' – ব্যুৎপত্তিদৃষ্টে-ই স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে পীঠমর্দ রূপকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যিনি তাঁর বিভিন্ন সহায়তামূলক কার্যকলাপের দ্বারা নায়কের (প্রায়) সমান গুরুত্ব অর্জন করেন, তাঁর নাম পীঠমর্দ অর্থাৎ পতাকানায়ক। অনুরূপে প্রকরী নামক ক্ষুদ্র ও নাটকের অল্প অংশ জুড়ে বিস্তৃত কিন্তু প্রাসঙ্গিক কথাবস্তুর নায়ক অর্থাৎ প্রকরীনায়ক-ও হলেন অমুখ্য নায়কের উদাহরণ।

অমুখ্য নায়কের পৃথক কোনো নাটকীয় ফলের প্রাপ্তি হবে না। প্রধান নায়কের ফললাভে-ই এজাতীয় চরিত্রের সার্থকতা। সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাই বলা হচ্ছে – 'পতাকানায়কস্য স্যান্ন স্বকীয়ং ফলান্তরম্' (সা.দ. ৩/৬৭), 'প্রকরীনায়কস্য স্যান্ন স্বকীয়ং ফলান্তরম্' (সা.দ. ৩/৬৮) ।

প্রসঙ্গতঃ পতাকানায়ক বিষয়ে সাগরনন্দীর মতটি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। লক্ষণীয় এই যে, তিনি কেবলমাত্র নায়কের সহায়ককে-ই পতাকানায়কের মর্যাদা দেননি, তাঁর মতে, প্রতিনায়কের সহায়ক অর্থাৎ নায়কের বিরুদ্ধাচারী-ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতাকানায়ক রূপে গণ্য হতে পারে। তাই স্বীয়

গ্রন্থে ‘বেণীসংহার’-এর কর্ণচরিত্রটিকে তিনি পতাকানায়কের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত করেছেন, যিনি এই রূপকের প্রধান নায়ক ভীমসেনের পরিপন্থী এবং প্রতিনায়ক দুর্যোধনের সহায়ক। এই অভিমতের সমর্থনে একথা বলা যেতে পারে যে, পতাকাবৃত্তকে অবশ্য-ই মূলকাহিনীর উপকারক হতে হবে। নায়কের বিরুদ্ধাচারীর কার্যকলাপ-ও মূলকাহিনীর বিস্তারে সহায়ক, অন্যথায় রূপকে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন-ই থাকে না। অতএব সেক্ষেত্রে প্রতিনায়কের সহায়ককে-ও পতাকানায়কের মর্যাদা দেওয়া অযৌক্তিক বলা যায় না।

প্রতিনায়ক ঃ

মুখ্য নায়কের ফলপ্রাপ্তির পথে বিঘ্নসৃষ্টিকারী চরিত্রের নাম হল প্রতিনায়ক। পাশ্চাত্য নাটকে এই চরিত্রটি Villain নামে অভিহিত। নাট্যদর্পণে প্রতিনায়কের লক্ষণ নির্ণয় করে বলা হয়েছে – ‘লোভী ধীরোদ্ধতঃ পাপী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ’ (না.দ.৪/১৩) – প্রতিনায়ক হবেন ধীরোদ্ধত শ্রেণীর, লুব্ধ, পাপাচারী ও ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ শ্রীরাম ও যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে রাবণ ও দুর্যোধনের উল্লেখ করা হয়েছে।

নাট্যতত্ত্বের অপরাপর গ্রন্থে-ও প্রতিনায়কের প্রায় অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। দশরূপকে বলা হয়েছে – ‘লুব্ধো ধীরোদ্ধতঃ স্তব্ধঃ পাপকৃদ্ ব্যসনী রিপুঃ’ (দশ.রূ.২/৯) – (নায়কের) লুব্ধ, ধীরোদ্ধত, ‘স্তব্ধ’ অর্থাৎ জেদী, পাপকারী, ব্যসনাসক্ত শত্রুর নাম প্রতিনায়ক। সাহিত্যদর্পণে-ও লোভ-ঔদ্ধত্য-পাপ-ব্যসনিত্ব – এগুলিকে প্রতিনায়ক চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যরূপে নির্ণয় করা হয়েছে।

অন্যান্য অধম চরিত্রসমূহ ঃ

অনন্তর নাট্যদর্পণে বিভিন্ন অধম চরিত্রের আলোচনা করা হচ্ছে। প্রকৃতিগতভাবে এরা সকলে-ই অধম। তবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রভু অর্থাৎ স্বামীর প্রতি সহায়কত্বে বা সংশ্লিষ্ট প্রভুর মান অনুসারে এদের মধ্যমত্ব-ও স্বীকৃত হতে পারে। এই চরিত্রগুলি হল বিদূষক, শকার, বিট, পরিচারক ইত্যাদি। প্রথমে এখানে বিদূষকের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

বিদূষকচরিত্র ঃ

বিদূষকের চরিত্রবিষয়ে নাট্যদর্পণে কোনো কারিকা রচনা করা হয়নি; কেবলমাত্র টীকায় বিদূষকের লক্ষণ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

রূপকে বিদূষকের উপস্থাপনা প্রধানতঃ হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়োজনে। এই প্রয়োজন সাধিত হয় তিনপ্রকারে। প্রথমতঃ, অঙ্গাদির বিকার দ্বারা – কেশবিহীন মস্তক, বিকলাঙ্গত্ব, খঞ্জত্ব, দন্তুর ও বিকৃত আনন ইত্যাদির দ্বারা; দ্বিতীয়তঃ, অদ্ভুত, হাস্যকর, সময়বিশেষে অত্যন্ত লম্বা পোশাকের দ্বারা, হাস্যকর, বিলোল দৃষ্টিনিক্ষেপের দ্বারা এবং তৃতীয়তঃ, হাস্যকর বাক্যবিন্যাসের দ্বারা। সময়বিশেষে বিদূষকের বাক্য অনর্থক বা অশ্লীল-ও হতে পারে। এই তিনটি প্রকারের একটি বা একাধিককে আশ্রয় করে বিদূষকের চরিত্রটি নির্মিত হবে।

নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায়ে বিদূষকের লক্ষণবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বিদূষকের বাহ্য অবয়বের বর্ণনায় বলা হয়েছে, বিদূষক হবেন বামনাকৃতি, বৃহৎ দন্তযুক্ত, কুব্জপৃষ্ঠ, দ্বিজিহ্ব, কেশহীন মস্তকযুক্ত এবং পিঙ্গলচক্ষু –

"বামনো দন্তুরঃ কুব্জো দ্বিজিহ্ব বিকৃতাননঃ।
খলতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ ॥"[২০]

বিদূষকের কর্তব্যবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, তিনি-ই বিদূষক, যিনি লোকের আনন্দ সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখেন, সকল লোকের আচরণ অনুকরণ করতে পারেন এবং নারীদের সঙ্গে অবাধে মিশতে পারেন। আরো বলা হচ্ছে –

"প্রত্যুৎপন্নপ্রতিভো নর্মকৃতৈর্নর্মগর্ভনির্ভেদৈশ্চ।
ছেকো বিদূষিতবচনো বিদূষকো নাম বিজ্ঞেয়ঃ ॥" (না.শা. ৩৫/২৫)

– অর্থাৎ বিদূষক হবেন উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন, নর্মের মাধ্যমে গুপ্ত তথ্যের প্রকাশে অথবা গুপ্ত আনন্দের হাস্যরসিক এবং চতুর বাক্যের দ্বারা বয়স্যকে সান্ত্বনাদানে সক্ষম।

বিদূষককে দশরূপককার ধনঞ্জয় কেবলমাত্র হাস্যকারী বলে উল্লেখ করেছেন। টীকাকার ধনিকের মতে বিদূষকের অদ্ভুত চেহারা ও বেশভূষা হাস্যোদ্রেকের সহায়ক। তিনি-ও বিদূষক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। কারণ তাঁর মতে – 'বিদূষকঃ প্রসিদ্ধ এব'। দর্পণকার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বিদূষকের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন –

"কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজ্ঞঃ ॥" (সা.দ. ৩/৫১)

– বিদূষকের নাম হবে কোনো পুষ্প বা বসন্তকালের বাচক। তিনি নিজের আকৃতি, বেশভূষা, আচার-আচরণ ও কথাবার্তার দ্বারা হাস্যের উদ্রেক করবেন। তিনি হবেন ভোজনপ্রিয় ও কলহপটু। তবে লঘুপ্রকৃতির বিদূষক স্বকর্মজ্ঞ হবেন অর্থাৎ তাঁর প্রভুকে সান্ত্বনাদানাদি কার্যে তিনি হবেন যথেষ্ট তৎপর।

ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে বিদূষক লক্ষণবিষয়ে অভিনব কোনো মত নেই। নাটক লক্ষণরত্নকোশে-ও রাজার সহচরকে বিদূষক বলা হয়,এইমাত্র বলা হয়েছে – 'বয়স্যকঃ সহচরঃ স এব বিদূষকঃ' (না.ল.র. অষ্টাদশ অধ্যায়) ।

বিদূষক হবেন নায়কের একান্ত সুহৃদ্ । নায়কের সুখে-দুঃখে সর্বদা তিনি তাঁর পাশে থেকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্যে তৎপর থাকবেন। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের কারণে বিরহী প্রভুর সান্ত্বনাদানে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। নাট্যদর্পণের টীকায় বিদূষকের অন্য একটি ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, যা যথেষ্ট অদ্ভুত। বলা হচ্ছে, তিনি কোনো সময় তাঁর বাক্পাটবের দ্বারা দুই রাজার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধকে সন্ধিতে পরিণত করতে পারেন, আবার সময়বিশেষে তাঁর মূর্খতা ও স্থূলবুদ্ধির কারণে দুষ্ট বাক্য প্রয়োগে দুই রাজার সন্ধিকে বিগ্রহে রূপান্তরিত করতে পারেন। বলা বাহুল্য, বিদূষকের এই ভূমিকার বিষয়টি অপরাপর কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

এই দুই প্রকার উপযোগিতার ভিত্তিতে নাট্যদর্পণকাররা বিদূষক পদটির দুটি ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করেছেন –

১.'বিপ্রলম্ভং তু বিনোদদানেন বিস্মারয়ন্তীতি বিদূষকাঃ'[২১]– অর্থাৎ নায়কের বিয়োগব্যথাকে যিনি বিভিন্নভাবে আনন্দ দানের মাধ্যমে ভুলিয়ে দিতে পারেন, তিনি বিদূষক।

২.'যথাসম্ভবং সন্ধিং বিগ্রহং বিগ্রহেণ সন্ধিনা চ বিশেষেণ দূষয়ন্তি বিনাশয়ন্তি'[২২] – ক্ষেত্রবিশেষে স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা যিনি বিগ্রহকে সন্ধিতে পরিণত করতে পারেন, সময়বিশেষে নির্বুদ্ধিতার কারণে যিনি এর বিপরীতটি-ও করে বসেন, তিনি-ই বিদূষক।

এরপর নায়কভেদে বিদূষকের ভেদ। ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ নায়কের জন্য বিভিন্নপ্রকার বিদূষকের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রধানতঃ চার শ্রেণীর ব্যক্তিরা বিদূষক হতে পারেন – ঋষি বা সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী এবং শিষ্য। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, দেবতা নায়কের জন্য ঋষি, ব্রাহ্মণ নায়কের জন্য শিষ্য, এবং রাজা বা বণিক্ নায়ক হলে শিষ্য ব্যতীত অপর তিনটি প্রকার অর্থাৎ ঋষি-ব্রাহ্মণ-রাজজীবী – এই ত্রিতয়ের কোনো একজন বিদূষকপদে বৃত হবেন।

নাট্যদর্পণের এই মত অনেকাংশে নাট্যশাস্ত্রানুসারী। পার্থক্য এই যে, নাট্যশাস্ত্রে রাজার জন্য কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ বিদূষকের বিধান দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো শ্রেণীর নয়। এবং এখানে অমাত্য নায়কের জন্য রাজোপজীবী বিদূষকের প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, নাট্যদর্পণে যদি-ও রাজার জন্য ঋষি, রাজজীবী ও ব্রাহ্মণ বিদূষকের বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু উপলভ্যমান কোনো রূপকে প্রথমোক্ত দুই প্রকারের প্রয়োগ দেখা যায়নি; রাজা নায়কের ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা ব্রাহ্মণ বিদূষকের-ই প্রয়োগ দেখেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভাবপ্রকাশনের নবম অধিকারে শারদাতনয় দেবতা, রাজা, অমাত্য ও বণিক্ (বা বৈশ্য) নায়কের ক্ষেত্রে বিহিত চতুর্বিধ বিদূষকের বিস্তৃত লক্ষণ দিয়েছেন। ছায়ামাত্র এখানে উল্লেখ করা হল –

১. দেবতার বিদূষক – ইনি হবেন সত্যবাদী, ত্রিকালজ্ঞ, কৃত্যাকৃত্যবিশেষজ্ঞ, বিচারবিমর্শে প্রবীণ, যথার্থবাদী, নাট্যতত্ত্ববিদ্ ও পরিহাসপ্রিয়।

২. রাজার বিদূষক – রাজার বিদূষক হবেন 'অগ্রাম্য-পরিহাসক' অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরিহাসে সক্ষম, ধন ও নারীর প্রতি শুচি, রাজার মহিষীদের সেবক ও তাঁদের প্রিয়পাত্র, রাজা ও তাঁর মহিষীবিশেষের মধ্যে প্রণয় ও সদ্ভাব স্থাপনে তৎপর, ও সেই কারণে-ই অন্যান্য মহিষীদের মধ্যে কলহের সৃষ্টিকারী ইত্যাদি।

৩. অমাত্যর বিদূষক – অমাত্যর বিদূষক হবেন অশ্লীলবক্তা, নায়ক-নায়িকার অপরাধের প্রকাশক, অর্থলাভে খুশি, হাস্যাস্পদ, রুচিবোধসম্পন্ন ও হাস্যকর বাক্যের বক্তা ইত্যাদি।

৪. বণিকের বিদূষক – বণিকের বিদূষক হবেন শঠ, ছলনাপর, অবান্তর বাক্যের বক্তা, অদ্ভুত আচার-আচরণযুক্ত, অকারণে হাস্যকারী ইত্যাদি।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থে বিদূষকের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলির দ্বারা এই চরিত্রের হাস্যকরতা ও স্থূলতার বিষয়টি-ই বারবার স্পষ্ট হয়। এবং বাস্তবিক-ই , অধিকাংশ সংস্কৃত রূপকে-ই বিদূষক অত্যন্ত গতানুগতিকভাবে স্থূল এবং প্রভুর মানসিক সাহচর্যদানে অক্ষম। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর মাধব্য, 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর মৈত্রেয়, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর 'বসন্তক', 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর মানবক প্রমুখ এই নিয়মের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

শকার চরিত্র ঃ

শকারের লক্ষণ বিষয়ে নাট্যদর্পণে বিস্তারিত লক্ষণ আলোচনা করা হয়নি। খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, শকার হবেন রাজার পত্নীর ভ্রাতা অর্থাৎ রাজশ্যালক। হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়োজনে-ই এই চরিত্রটির অবতারণা। তবে এর সঙ্গে-সঙ্গে টীকায় আরো বলা হচ্ছে, রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার কারণে কোনো বিকারগ্রস্ত, কুরুচিপূর্ণ হাস্য-পরিহাসের সঙ্গে শকারকে যুক্ত করা যাবে না। প্রয়োজনবিশেষে বিকৃত হাস্যরসের প্রয়োগ করতে হলে পরিচারক নামক চরিত্রর অবতারণা করতে হবে, শকারকে দিয়ে এজাতীয় কাজ করানো শোভন হয় না। টীকায় বলা হয়েছে – " হাস্যায় ইত্যত্রাপি সম্বন্ধান্ন সর্বো রাজপুত্রাদির্নৃপশ্যালঃ শকারঃ। কিং তর্হি? বিকৃতহাস্যহেতুঃ পরিচারক এব"।[২৩]

নাট্যশাস্ত্রে শকারের লক্ষণ আলোচনায় বলা হয়েছে, শকার হবেন উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ভূষিত, বিনাকারণে ক্রুদ্ধ, আবার বিনাকারণে-ই প্রসন্ন, চরিত্রে বহুবিকৃতিসম্পন্ন, মাগধীপ্রাকৃতভাষী অধম শ্রেণীর চরিত্র–

"উজ্জ্বলবস্ত্রাভরণঃ ক্রুধ্যত্যনিমিত্ততঃ প্রসীদতি চ।
অধমো মাগধীভাষী ভবতি শকারো বহুবিকারঃ ॥"[২৪]

দর্পণকার তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শকারের লক্ষণ এভাবে নির্ণয় করেছেন–

"মদমূর্খতাভিমানী দুষ্কুলতৈশ্বর্য্যসংযুক্তঃ ।
সো2য়মনূঢ়াভ্রাতা রাজ্ঞঃ শ্যালঃ শকার ইত্যুক্তঃ ॥"(সা.দ. ৩/৫৪)

– অহঙ্কারী, মূর্খ, অসদ্‌বংশজাত, প্রচুর ঐশ্বর্যসমন্বিত, অবিবাহিত রাজশ্যালককে শকার নামে অভিহিত করা হয়।

বিটচরিত্র ঃ

নাট্যদর্পণবিহিত বিটলক্ষণটি অতি সংক্ষিপ্ত। রাজার চিত্তবিনোদনের উপযোগী সঙ্গীতাদি যে কোনো একটি কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিট নামে অভিহিত করা হয়।

দশরূপকে বিটের অবিকল অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। ভাবপ্রকাশনকার এর সঙ্গে বিটের কামকলায় কুশলতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নাটকলক্ষণরত্নকোশে কেবলমাত্র গণিকাদিবিষয়ে রাজার সহায়ককে বিট নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে – 'বেশ্যাং প্রতি সখা রাজ্ঞো বিট ইত্যভিধীয়তে' (না.ল.র. অষ্টাদশ অধ্যায়)। দর্পণকার আরো একটু বিশদে বিটলক্ষণ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, সম্ভোগের জন্য হীনসম্পদ, ধূর্ত, নৃত্য-গীতাদি কলায় আংশিক পারদর্শী, বেশরচনায় দক্ষ, বাগ্মী, লোকপ্রিয় ও সভাস্থলে সমাদৃত সহায়কে বিট বলা হয় –

"সম্ভোগহীনসম্পদ্বিটস্তু ধূর্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরো2থ বহুমতো গোষ্ঠ্যাম্ ॥"(সা.দ. ৩/৫০)

নাট্যশাস্ত্রে বিটের লক্ষণটি এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এই গ্রন্থে বিহিত বিটলক্ষণ কেবলমাত্র অপরাপর গ্রন্থ অপেক্ষা বিস্তৃততর-ই নয়, অনেক বেশি সম্মানসমন্বিত। এখানে বলা হয়েছে, নাট্যপ্রয়োগ বিষয়ে সূত্রধারের যাবতীয় গুণবিশিষ্ট হবেন বিট। তিনি গণিকাগণের সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষজ্ঞ, মধুরভাষী, পক্ষপাতহীন, কবিভাবাপন্ন, শাস্ত্রার্থবিদ্, 'উহাপোহ' অর্থাৎ বিচার-বিতর্কে সক্ষম, বাগ্মী ও চতুর।

প্রসঙ্গতঃ অবশ্য উল্লেখ্য যে, নাট্যশাস্ত্রবিহিত এই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসমূহে ভূষিত কোনো বিটচরিত্র উপলভ্যমান কোনো রূপকে পাওয়া যায় না। ভাণজাতীয় রূপকে বিটের স্থান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি-ই সেখানে একমাত্র চরিত্র। কিন্তু সেখানে-ও তাঁর মান অতি সাধারণ, অধিকাংশ সময় অতি নিম্ন। অতএব সাধারণ আলোচনায় বিটকে আমরা অধম চরিত্রের মধ্যে-ই অন্তর্গত করবো।

রাজার অন্যান্য সহায়ক ঃ

রাজার সহায়করা হলেন যুবরাজ, সেনাপতি, পুরোহিত, অমাত্যবর্গ, অরণ্যাঞ্চলের অধিপতি আটবিক রাজন্যবর্গ, সামন্তরাজগণ, ঋষি-তপস্বিবর্গ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ রাজার শাসনকার্যের সহায়ক, কেউ প্রণয়ব্যাপারের সহায়ক, অন্যরা আবার ধর্মাচরণ ব্যাপারাদির সহায়ক।

ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ নায়কের ক্ষেত্রে-ই এই সহায়কদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষতঃ ধীরললিত প্রকৃতির নায়কের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের সমস্ত ব্যাপার তাঁর অমাত্যদের দ্বারা-ই সাধিত হয়। ধীরোদাত্তাদি নায়কের ক্ষেত্রে-ও তাঁদের উন্নতিতে তাঁদের নিজেদের কার্যকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে সহায়কদের সাহায্য-ও যথেষ্ট প্রয়োজন।

শুদ্ধান্তঃপুরের অনুচরবর্গ ঃ

অনন্তর রাজঅন্তঃপুরের সহায়কদের আলোচনা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে এদের সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যদর্পণের আলোচনাটি অনেকাংশে-ই নাট্যশাস্ত্রানুসারী। স্থলবিশেষে পার্থক্যের বিষয়গুলি এখানে নির্দেশ করা হবে।

এই অন্তঃপুরসহায়করা হলেন–

১. **কারুক –** ইনি হবেন নপুংসক। সচ্চরিত্র ও স্বকার্যে দক্ষ এই কারুককে নিয়োগ করা হয় দ্বাররক্ষার কাজে ।

২. **কঞ্চুকী –** কঞ্চুকী হবেন অনিন্দনীয় কোনো জাতির। তিনি হবেন স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে কঞ্চুকী হবেন বিদ্বান্, সত্যনিষ্ঠ ও যৌনব্যসনমুক্ত। অন্যথায় তাঁদের অন্তঃপুরে নিয়োগ করা সমীচীন নয়।

৩. **বর্ষবর –** এঁরা হবেন নপুংসক, বাধ্য ও বিনীত। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে, যারা জন্মগত দোষমুক্ত, অল্পজীবনীশক্তিসম্পন্ন, চতুর, স্ত্রীস্বভাবযুক্ত, নপুংসক, তারা বর্ষবর সংজ্ঞায় অভিহিত ।

৪. **নির্মুণ্ড –** সম্পূর্ণতঃ নির্বীর্য অর্থাৎ নপুংসক ও অলস প্রকৃতির অন্তঃপুর-কর্মচারীদের নাম নির্মুণ্ড । নারী ও দাসীগণকে নিয়ে যাওয়া ও কন্যাদের রক্ষণের জন্য এদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

৫. **প্রতিহারী –** যে সকল নারী সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ রাজকীয় কার্য রাজার নিকট উপস্থাপিত করে, তাদের প্রতিহারী বলে।

৬. **মহত্তরা –** যে সকল নারী অন্তঃপুর ও (সামান্যতঃ) রাজার মঙ্গলের ও সমৃদ্ধির জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে গান ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যথাযথ পালন করেন, তাদের মহত্তরা বলা হয় । নাট্যশাস্ত্রে এদেরকে 'মহত্তরী' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৭. **বৃদ্ধা –** যে সকল নারী প্রয়াত রাজগণের ব্যবহার জানেন, তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন, পূর্ব রাজাদের ও অন্তঃপুরস্থ ব্যক্তিদের চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত, তাঁদের বৃদ্ধা নামে অভিহিত করা হয়।

৮. **শিল্পকারিকা –** শিল্পকারিকা নারীরা বিবিধ কলা যথা – নৃত্য, গীত, চারুকলা, চিত্ররচনা ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ, সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করতে পারদর্শী, শয্যা-আসন-যানবাহন-সম্বন্ধী আরামবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মধুরস্বভাবা, চতুরা, দক্ষা, সর্বদা সুসজ্জিতা, ব্যবহারে পরিচ্ছন্না, শান্ত ও বিনীত।

নায়িকা ও তার বিবিধ ভেদ ঃ

নায়কলক্ষণ বিষয়ে নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা থাকলে-ও নায়িকালক্ষণ বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে-ই গ্রন্থকাররা নীরব। এবিষয়ে কেবলমাত্র এই পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, নায়কের সামান্য গুণের দ্বারা নায়িকা যুক্ত হবেন। তবে যেহেতু নায়কের সমস্ত গুণ নায়িকার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়, তাই দর্পণকার সংক্ষেপে বলেছেন – 'নায়কসামান্যগুণৈর্ভবতি যথাসম্ভবৈর্যুক্তা' (সা.দ. ৩/৬৯)– অর্থাৎ যথাসম্ভব নায়কগুণসংযুক্ত স্ত্রীকে নায়িকা বলা হবে। নাটকলক্ষণরত্নকোশাদি গ্রন্থে নায়কের পত্নীমাত্রকে-ই নায়িকা নামে অভিহিত করা হয়েছে, তদতিরিক্ত কিছু বলা হয়নি।

নাট্যদর্পণে নায়িকা লক্ষণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়নি। তবে নায়িকার ভেদ বিষয়ক বিবিধ প্রকারের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তদনুসারে প্রাথমিকভাবে নায়িকাকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে –

১. কুলজা

২. দিব্যাঙ্গনা

৩. ক্ষত্রিয়া এবং

৪. পণ্যকামিনী অর্থাৎ গণিকা।

কুলজা অর্থাৎ বিপ্রাদি উচ্চবংশসম্ভূতা। এই কুলজা নায়িকা ধৈর্য-লালিত্য-উদাত্তত্ব প্রভৃতি গুণের দ্বারা ভূষিতা। দিব্যা নায়িকা কেবল দিব্য নায়কের জন্য, ক্ষত্রিয়াদি নায়কের জন্য নয়। গণিকা নায়িকার প্রয়োগ হবে ধীরললিত জাতীয় রূপকে, এজাতীয় চরিত্রের কামোপচারকুশলতার কারণে।

গণিকানায়িকার প্রয়োগবিষয়ে নাট্যদর্পণের টীকায় আরো কিছু কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, প্রহসন ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল প্রকার রূপকে নায়িকারূপে গণিকার প্রয়োগ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'মৃচ্ছকটিকম্' নামক প্রকরণের কথা বলা হয়েছে, যেখানে চারুদত্তের নায়িকা হলেন গণিকা বসন্তসেনা। কিন্তু প্রহসনে যেহেতু হাস্যরসের উৎপাদন-ই মুখ্য ও প্রধান, সেই ক্ষেত্রে কামকলানিপুণা গণিকার নায়িকারূপে প্রয়োগ কেবলমাত্র অপ্রয়োজন-ই নয়, অবাঞ্ছনীয়-ও বটে।

কারিকায় আরো বলা হচ্ছে – 'নৃপে দিব্যে ন চ প্রভৌ' (না.দ. ৪/১৯) – অর্থাৎ নৃপ ও দিব্য নায়কের ক্ষেত্রে গণিকা নায়িকার প্রয়োগ হবে না । তবে এর অপবাদস্বরূপ এ-ও বলা হচ্ছে যে, গণিকা কোনো দিব্যাঙ্গনা হলে এজাতীয় প্রয়োগ হতে পারে। উদাহরণরূপে বিক্রমোর্বশীয়ম্ নামক ত্রোটকে রাজা পুরূরবার নায়িকারূপে দিব্যা অপ্সরা উর্বশীর প্রয়োগের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কুলজাদি ভেদে নায়িকার এই চাতুর্বিধ্য একান্তভাবে নাট্যশাস্ত্রানুসারী । নাট্যশাস্ত্রের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বলা হচ্ছে –

"দিব্যা চ নৃপপত্নী চ কুলস্ত্রী গণিকা তথা।

এতাস্তু নায়িকা জ্ঞেয়া নানাপ্রকৃতিলক্ষণাঃ ॥"(না.শা. ২৪/২৩,২৪)

– অর্থাৎ বিবিধ গুণবিশিষ্টা নায়িকারা দিব্যা, নৃপপত্নী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া, কুলস্ত্রী এবং গণিকা এই চারপ্রকারের হতে পারেন।

অনন্তর বয়ঃক্রম ও মানসিক স্থিতির উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ ধর্মী অনুসারে স্বীয়া নায়িকার ভেদ দেখানো হচ্ছে। এতদনুসারে নায়িকা তিনপ্রকার – মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা । ক্রমে এদের সবিশেষ আলোচনা করা হচ্ছে –

১.মুগ্ধা –কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে স্থিতা যে নায়িকা অনভিজ্ঞতার কারণে রতিবিষয়ে বিমুখ, অভিমানবশতঃ নায়কের প্রতি ক্রুদ্ধ হলে-ও যে কোমলস্বভাবা, যার বয়ঃক্রম, যৌবন ও কামকুশলতা ক্রমবর্ধমান, এজাতীয় নায়িকাকে মুগ্ধা বলা হয়ে থাকে। দশরূপকে বলা হয়েছে, এইপ্রকার নায়িকাকে প্রসন্ন করা সহজ। বয়োমুগ্ধা, কামমুগ্ধা, রতবামা, ও মৃদুকোপা ভেদে এই নায়িকার চার প্রকার ভেদের কথা-ও দশরূপকে বলা হয়েছে। দর্পণকারের মতে-ও প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদবিকারা, সুরতবামা,মানে মৃদু ও অধিক লজ্জাশীলা নায়িকা-ই মুগ্ধা নায়িকা –

"প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদবিকারা রতৌ বামা।

কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিকলজ্জাবতী মুগ্ধা ॥ "(সা.দ. ৩/৭২)

বিশ্বনাথ মুগ্ধা নায়িকার পাঁচ প্রকার ভেদের উল্লেখ করেছেন –প্রথমাবতীর্ণযৌবনা, প্রথমাবতীর্ণমদনবিকারা, রতবামা, মৃদু মানবতী ও অধিক লজ্জাশীলা।

২.মধ্যা – স্বীয়া নায়িকার দ্বিতীয়প্রকার ভেদ হল মধ্যা। মধ্যা নায়িকা পূর্ণযৌবনা, প্রাপ্তবয়স্কা ও তাঁর অন্তর কামবাসনায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ যৌবন ও কাম – উভয় দিক থেকে-ই এই নায়িকা পরিণতা। 'মোহান্ত' অর্থাৎ চরম তৃপ্তি পর্যন্ত এই নায়িকা সুরতক্রীড়ায় সমর্থা। অর্থাৎ কামকুশলতায় ইনি যথেষ্ট অভিজ্ঞা।

দশরূপকাদি অপরাপর নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে মধ্যা নায়িকার অনুরূপ লক্ষণ-ই নির্ণীত হয়েছে। ধনঞ্জয় এই প্রকার নায়িকাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন – যৌবনবতী, কামবতী এবং মোহান্তসুরতক্ষমা। দর্পণকার বিচিত্রসুরতা ,প্ররূঢ়যৌবনা,ঈষৎ প্রগল্ভা ও মধ্যমব্রীড়িতা নায়িকাকে মধ্যা নামে চিহ্নিত করেছেন –

"মধ্যা বিচিত্রসুরতা প্ররূঢ়স্মরযৌবনা।

ঈষৎপ্রগল্ভবচনা মধ্যমব্রীড়িতা মতা ॥" (সা.দ. ৩/৭৩)

বিশ্বনাথ প্রদত্ত এই লক্ষণ থেকে মধ্যা নায়িকার পাঁচপ্রকার ভেদ স্পষ্ট – বিচিত্রসুরতা, প্ররূঢ়স্মরা, প্ররূঢ়যৌবনা,ঈষৎ প্রগল্ভবচনা এবং মধ্যমব্রীড়িতা।

আবার, অন্য নায়িকার প্রতি নায়কের আসক্তির কথা জানতে পারলে অথবা নায়ক প্রণয়ঘটিত কোনো অপরাধে লিপ্ত হলে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রোধ প্রকাশের বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিতে মধ্যা নায়িকার ত্রিবিধ ভেদ স্বীকার করা হয়–

ক. ধীরা – মধ্যা ধীরা অপরাধী নায়ককে ক্রুদ্ধ বক্রোক্তির দ্বারা ক্লেশ দান করে।

খ. ধীরাধীরা – মধ্যা ধীরাধীরা নায়িকা অশ্রুপাত ও বক্রোক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা প্রিয়তমকে পীড়া দেয়।

গ. অধীরা – মধ্যা অধীরা নায়িকা অশ্রুপাত ও কর্কশ বাক্যের দ্বারা নায়ককে পীড়িত করে।

অতএব দেখা গেল, ক্রোধপ্রকাশের কালে নায়কের প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ,অশ্রুবিসর্জনের দ্বারা ক্ষোভপ্রকাশ এবং বক্রোক্তিবাক্যে নায়ককে বিদ্ধ করা মধ্যা নায়িকার বৈশিষ্ট্য। নাট্যদর্পণ, দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, ভাবপ্রকাশন ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে মধ্যা নায়িকার এইরূপ প্রভেদ স্বীকৃত হয়েছে।

৩.প্রগল্‌ভা – নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, তারুণ্য ও যৌবনের অহংকারে অন্ধ, ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধী নায়কের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণা, কামবাসনায় অত্যধিক প্রমত্ত, সুরতক্রীড়ার আরম্ভে-ই যথেষ্ট অভিজ্ঞতার কারণে আনন্দাতিশয্যে অচেতনপ্রায়া নায়িকাকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলা হয়।

দশরূপকে বলা হয়েছে, যৌবনান্ধা,প্রেমান্ধা, দয়িতলগ্না, রতি আরম্ভের আনন্দে নায়কের অঙ্গের সঙ্গে বিলীয়মানে অভিলাষিণী নায়িকাকে বলা হয় প্রগল্‌ভা। টীকাকার ধনিক এই নায়িকাকে তিনটি প্রাথমিক ভেদে বিভক্ত করেছেন –যৌবনান্ধা বা গাঢ়যৌবনা, ভাবপ্রগল্‌ভা এবং রতপ্রগল্‌ভা ।

দর্পণকারের মতে, কামান্ধ, গাঢ়-তারুণ্য, সমস্ত প্রকার শৃঙ্গারচেষ্টায় ও সুরতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ, ভাবোন্নতা ও ঈষৎ লজ্জাক্রান্তা রমণী হলেন প্রগল্‌ভা নায়িকা। তাই বলা হচ্ছে –

''স্মরান্ধা গাঢ়তরুণ্যা সমস্তরতকোবিদা।

ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্‌ভাক্রান্তনায়কা ॥'' (সা.দ. ৩/৭৪)

এই প্রকার নায়িকা সকল প্রকার ছলা-কলা, হাব-ভাব-বিলাসে নিপুণা এবং রতিক্রীড়াসময়ে নায়কের দেহের সঙ্গে আবদ্ধ থাকতে নিতান্ত অভিলাষিণী।

অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত নায়কের প্রতি ক্রোধপ্রকাশের ভিন্নতা অনুসারে (মধ্যা নায়িকার মত) প্রগল্‌ভা নায়িকার তিনপ্রকার ভেদ রয়েছে –

ক. ধীরা –ধীরা প্রগল্‌ভা দুইভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে। হয় তারা ক্রোধ গোপন করে নায়ককে অতিরিক্ত ঔপচারিক আদরের দ্বারা লজ্জিত করে, এই নায়িকাকে 'সাবহিত্থাদরা' বলা হয়; নতুবা রতিবিষয়ে উদাসীন থেকে সুরতক্রীড়ায় নায়কের সঙ্গে অসহযোগিতা করে।

খ. ধীরাধীরা – ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা মধ্যার মতন-ই বক্রোক্তিপূর্ণ বাক্যে অপরাধী নায়ককে জর্জরিত করে।

গ. অধীরা – অধীরা প্রগল্‌ভা ক্রোধান্ধ হয়ে নায়ককে তীব্র ভর্ত্সনা এমনকি শারীরিক নির্যাতন-ও করে থাকে।

সাহিত্যদর্পণ, দশরূপকাদি অন্যান্য গ্রন্থে-ও প্রগল্‌ভা নায়িকার এই ত্রৈবিধ্য স্বীকার করা হয়েছে।

অমুগ্ধা নায়িকার মধ্যে মধ্যা ও প্রগল্‌ভা উভয় প্রকার নায়িকা-ই ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে তিনপ্রকার। অতএব অমুগ্ধা মধ্যা ও অমুগ্ধা প্রগল্‌ভা নায়িকার মোট ভেদ ছয় প্রকার। এদের প্রত্যেকে আবার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে দ্বিবিধ। অতএব স্বীয়া নায়িকার মধ্যে অমুগ্ধা নায়িকা দ্বাদশ প্রকার। সাহিত্যদর্পণ, ভাবপ্রকাশন ইত্যাদি গ্রন্থে-ও জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা ভেদে নায়িকাদের এই বিভাজন

দেখা যায়। মুগ্ধা নায়িকার দ্বাদশ ভেদ কোনো নাট্যতাত্ত্বিক স্বীকার করেননি। তাই মুগ্ধার একটি মাত্র প্রকার-ই স্বীকৃত হয়েছে।

প্রোষিতাদি ভেদে নায়িকার বিভাগ ঃ

প্রোষিতাদি ভেদসমূহের অবস্থা নির্ণয়ের মূলে আছে নায়কের সঙ্গে নায়িকার আচরণ। এই বিষয়ের ভিত্তিতে নায়িকার আটটি প্রকার হতে পারে – প্রোষিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, স্বাধীনভর্তৃকা এবং অভিসারিকা। দশরূপকে তাই বলা হচ্ছে –'আসামষ্টাববস্থাঃ স্যুঃ' (দশ.রূ.২/২৩)। টীকায় বলা হয়েছে, 'অষ্টৌ' পদের দ্বারা নায়িকাসংখ্যা এর কম-ও হতে পারবে না, বেশি-ও হতে পারবে না–এই কথা বোঝানো হয়েছে। কারণ এদের প্রতিটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় একটির মধ্যে অপরটির অন্তর্ভাব হতে পারে না। এবার একে-একে এই নায়িকাদের আলোচনা করা হচ্ছে –

১.প্রোষিতা– কোনো নায়িকার প্রিয়তম যখন ধনার্জন, রাজকার্য ইত্যাদি কার্যব্যপদেশে দূরদেশে গমন করে, তখন সেই নায়িকাকে প্রোষিতা নায়িকা বলা হয়। ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র কার্যোপলক্ষে নয়, অন্যস্ত্রীসঙ্গের কারণে পূর্বপ্রতিজ্ঞাত সময়ে নায়ক উপস্থিত না হলে, সেই নায়িকাকে-ও প্রোষিতা নায়িকা বলা যেতে পারে। এই নায়িকার অপর পারিভাষিক নাম প্রোষিতপতিকা বা প্রোষিতভর্তৃকা।

নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, মানসিক সন্তাপের কারণে এজাতীয় নায়িকা বিবিধ কেশবিন্যাস, বিভিন্ন প্রসাধন ইত্যাদি বর্জন করেন। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে – 'সা রূঢ়ালককেশান্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা' (না.শা. ২২/২১৯)। প্রিয়তমের সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিতা এই নায়িকা কোনোরূপ প্রসাধনে আগ্রহ অনুভব করেন না। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে – 'সা তু তদাগমননিমিত্তব্রতোপবাসব্রাহ্মণপরিচর্যাতনুতরাঙ্গযষ্টিস্তস্যাগমনমেব চিন্তয়তি' (না.ল.র. ঊনবিংশ অধ্যায়) – অর্থাৎ নায়কের আগমনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ব্রত, উপবাস, ব্রাহ্মণপরিচর্যাদির কারণে প্রোষিতা নায়িকার দেহলতা কৃশতর হয়ে পড়ে এবং সে দিবারাত্র কেবলমাত্র নায়কের প্রত্যাগমনের জন্য-ই চিন্তা করতে থাকে। সাহিত্যদর্পণকারের মতে কামপীড়া অনুভব করা-ই এই নায়িকার বৈশিষ্ট্য – 'সা মনোভবদুঃখার্তা..' (সা.দ.৩/৯৩)।

ভাবপ্রকাশনে প্রোষিতা নায়িকার বিবিধপ্রকার আচরণের কথা বিশদে বলা হয়েছে। তদনুসারে মালিন্য, জাগরণ,কৃশতা, বিভিন্ন শুভাশুভ নিমিত্ত দর্শন, অঙ্গতনুতা, চিন্তা, জড়তা, সর্বদা শয্যালীন থাকার প্রবণতা ইত্যাদি হল এই জাতীয় নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

২. বিপ্রলব্ধা – সঙ্কেতমুখে অথবা দূতীমুখে মিলনের প্রতিজ্ঞা করে-ও, কার্যবশতঃ নায়ক যদি যথাসময়ে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত না হয়, তখন অপমানিতা ও প্রতারিতা সেই নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলা হয়।

নাট্যতত্ত্বের পূর্বাপর সকল গ্রন্থে বিপ্রলব্ধার অনুরূপ লক্ষণ-ই নির্ণীত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে সেই নায়িকাকে-ই বিপ্রলব্ধা বলা হয়েছে, যে (প্রতিদিন) দূতী পাঠিয়ে অথবা কোনো সঙ্কেতস্থলে আগ্রহের আতিশয্যে পূর্বে-ই উপস্থিত হয়ে-ও প্রিয়তমকে পায় না।

ভাবপ্রকাশনে বলা হচ্ছে, চিন্তা, খেদ, দীর্ঘনিঃশ্বাস, মানসিক সন্তাপ, বারংবার মূর্ছা, প্রলাপ, জাগরণ, কৃশতা ইত্যাদি বিপ্রলব্ধা নায়িকার বৈশিষ্ট্য ।

৩ খণ্ডিতা –অপর নায়িকার সম্ভোগচিহ্নিত অঙ্গে নায়ককে দেখে যে নায়িকা ঈর্ষ্যাপরবশ হয়ে কুপিত হয়, তাকে-ই বলা হয় খণ্ডিতা নায়িকা। নায়কের শরীরে অন্য নায়িকার সঙ্গসুখের কারণে উৎপন্ন নানাপ্রকার সম্ভোগচিহ্ন দেখে এই নায়িকা ক্রোধে ও ঈর্ষ্যায় কাতর হয়ে পড়ে। বিপ্রলব্ধা নায়িকা-ও মানসিক কষ্টে কাতর হয়ে থাকে, কিন্তু সেইক্ষেত্রে নায়কের অপর নায়িকার প্রতি আসক্তি ইত্যাদি ঘটনা অনুপস্থিত। এটি-ই বিপ্রলব্ধা ও খণ্ডিতা নায়িকার মধ্যে পার্থক্য – এই হল নাট্যদর্পণের অভিমত।

নাট্যশাস্ত্রে এই নায়িকার লক্ষণ একটু পৃথকভাবে নির্ণীত হয়েছে। বলা হচ্ছে –

"ব্যাসঙ্গাদুচিতে যস্যা বাসকে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
তদনাগমদুঃখার্তা খণ্ডিতা সা প্রকীর্তিতা ॥" (না.শা. ২২/২১৭)

–'ব্যাসঙ্গ' অর্থাৎ অন্যনারীসঙ্গের কারণে (সুসজ্জিত মিলনস্থলে) নায়ক যখন উপস্থিত হয় না, তখন তার অনাগমনজনিত দুঃখে কাতর নায়িকার নাম খণ্ডিতা নায়িকা। দশরূপকাদি অপরাপর গ্রন্থে অবশ্য নাট্যদর্পণের অনুরূপ অভিমতের-ই প্রকাশ।

ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে, ভীতি, চিন্তা, মৌন, ধ্যান, মানসিক খেদ, অকারণ ভ্রমণ, বারবার বিলাপ করা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ, ক্রন্দন ইত্যাদি এজাতীয় নায়িকার বৈশিষ্ট্য।

৪. কলহান্তরিতা –নায়কের অন্যরমণী সংসর্গজনিত অপরাধ জানার পর যে নায়িকা নায়ককে তিরস্কার করে, কিন্তু পরে নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়, তাকে-ই বলা হয় কলহান্তরিতা নায়িকা। খণ্ডিতার মধ্যে পশ্চাত্তাপ অনুপস্থিত আর কলহান্তরিতা প্রিয়তমের প্রতি নিষ্করুণ ও কলহপরায়ণ ব্যবহারের জন্য অনুতপ্তা –এখানে-ই উভয় নায়িকার প্রভেদ।

নাট্যশাস্ত্রাদি যাবতীয় গ্রন্থে কলহান্তরিতা নায়িকার এই লক্ষণ-ই নির্ণীত হয়েছে। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে –

“চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।

পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা ॥” (সা.দ. ৩/৯১)

– প্রিয়বাদী প্রাণনাথকে যে নায়িকা ক্রোধবশতঃ দূরীভূত করে পরে অনুতাপ ভোগ করে, সেই কলহান্তরিতা। দশরূপকারের মতে –‘কলহান্তরিতা2মর্ষাদ্বিধূতে2নুশয়ার্তিযুক্’(দশ.রূ.২/২৬) – অপরাধী নায়কের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের পর, স্বকৃত ব্যবহারের জন্য অনুতপ্তা ও বেদনার্তা নায়িকাকে কলহান্তরিতা বলা হয়।

ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে, মানসিক অশান্তি, সংজ্ঞাহীনতা, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিঃশ্বাস, জ্বর, বারংবার বিলাপ, সর্ববিধ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ ইত্যাদি হল কলহান্তরিতা নায়িকার আচরণের বৈশিষ্ট্য।

৫. বিরহোৎকণ্ঠিতা –নায়ক নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বে-ও অর্থাৎ অন্য রমণীর সংসর্গে লিপ্ত না হলে-ও কোনো কারণবশতঃ তার আগমনে বিলম্ব হলে তার জন্য উৎকণ্ঠিতা নায়িকাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা বলা হয়। এজাতীয় নায়িকার মনে নায়কের আগমনের বিলম্বের জন্য উৎকণ্ঠা থাকলে-ও মিলন যে অবশ্যম্ভাবী মনে সেই বিশ্বাস থাকে এবং কোনোরকম কলহ বা মনোমালিন্যের কোনো প্রসঙ্গ-ই থাকে না। এই প্রেক্ষিত থেকে পূর্বোক্ত অন্যান্য নায়িকার চেয়ে এই নায়িকা পৃথক।

নাট্যশাস্ত্র, দশরূপকাদি বিবিধ গ্রন্থে কার্যবশতঃ প্রিয়ের আগমনবিলম্বের কারণে চিন্তিতা নায়িকাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা বলা হয়েছে। নায়িকা জানে, তার প্রিয়তম অন্য কোনো নায়িকার প্রতি আসক্ত নয়। তবু তার বিলম্ব নায়িকার মনে অজানা আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। এরূপ উৎকণ্ঠিতা নায়িকার নাম-ই বিরহোৎকণ্ঠিতা । দর্পণকারের মতে –

“আগন্তুং কৃতচিত্তো2পি দৈবান্নায়াতি যৎপ্রিয়ঃ ।

তদনাগমদুঃখার্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা ॥” (সা.দ. ৩/৯৫)

নাটকলক্ষণরত্নকোশ গ্রন্থে সাগরনন্দী একটু অন্যভাবে এই নায়িকার বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে – 'যাং পরিত্যজ্য প্রিয়তমো রতায়োপকল্পিতবেষাং গতশ্চিরান্নাগচ্ছতি সা বিরহোৎকণ্ঠিতা' (না.ল.র. ঊনবিংশ অধ্যায়) – অর্থাৎ মিলনের আশায় বেশরচনা করার পর যার প্রিয়তম তাকে ফেলে চলে যায় এবং বহুক্ষণ আসে না, সেই নায়িকাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা নায়িকা বলা হয়।

ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে অঙ্গতনুতা, কম্পন, মানসিক সন্তাপ, অশ্রুপাতন, অনুভূত স্মৃতির প্রতি দ্বেষভাব, সখীসমূহের কাছে নিজের মনোগত অবস্থা ব্যক্ত করা ইত্যাদি হল এই জাতীয়া নায়িকার চারিত্রিক লক্ষণ ।

৬. বাসকসজ্জা –নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে , নায়কের সঙ্গে মিলনসময়ের উপযুক্ত আভরণ ও আবরণের নাম 'বাসক'। প্রিয়তমের সমাগম সম্ভাবনায় যে নারী এই বাসকের দ্বারা নিজেকে সজ্জিতা করে, আনন্দিতা সেই নায়িকা-ই হল বাসকসজ্জা। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বিশদে বলা হয়েছে –

''বাসবেশ্মনি সুকল্পিততল্পা যা সমাগমবিধিং বিদধানা।

তিষ্ঠতি প্রিয়সমাগমসজ্জা তামিহাগময় বাসকসজ্জা ॥'' (না.ল.র.ঊনবিংশ অধ্যায়)

–অর্থাৎ প্রিয়সমাগমের আয়োজনে বাসগৃহে উত্তম শয্যা রচনা করে যে নায়িকা স্বয়ং সুসজ্জিতা হয়ে অবস্থান করে ,তাকে বাসকসজ্জা বলা হয়। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে বাসকসজ্জা নায়িকা কেবলমাত্র নিজে প্রসাধিতা হয়ে থাকে তাই নয়, প্রিয়তমের আনন্দোৎপাদনের জন্য নিজ কক্ষটিকে-ও সুসজ্জিত করে রাখে। নাট্যশাস্ত্রে-ও এজাতীয় নায়িকার অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে।

ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে, সখীদের সঙ্গে ভাবী মিলনের আলোচনা, হৃদয়ে আনন্দ, ঘন-ঘন শ্বাসগ্রহণ, সময়বিশেষে দূতীর প্রত্যাবর্তনের জন্য চিন্তা প্রভৃতি এজাতীয় নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পূর্বোক্ত প্রোষিতাদি পঞ্চবিধ নায়িকার ক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের প্রয়োগ; বাসকসজ্জা নায়িকার ক্ষেত্রে তা হল সম্ভোগশৃঙ্গার – এই হল অন্যদের থেকে এই নায়িকার পার্থক্য।

৭. স্বাধীনভর্তৃকা –প্রিয়তমের সামীপ্য হেতু যে রমণী প্রসন্না, তাকে-ই স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়। এই নায়িকা নায়কের কাছে এবং তার অধীনে থেকে হৃষ্ট হয়। নায়ক তার পাশে থেকে তার প্রতি মনোযোগী থাকে বলে এই নায়িকা প্রসন্নচেতা। নাট্যশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে –

''সুরতাতিরসৈর্বদ্ধো যস্যাঃ পার্শ্বে তু নায়কঃ।

সান্দ্রামোদগুণপ্রাপ্তা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা ॥''(না.শা. ২২/২১৫)

– অর্থ স্পষ্ট। নায়ক রতিক্রীড়াকুশলা যে নায়িকার পার্শ্বে অবস্থান করে এবং সেই কারণে যে 'আমোদ' অর্থাৎ হর্ষ-সৌভাগ্যাদি উপভোগ করে, সেই নারীকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়।

দর্পণকারের মতে, যার অনুরাগের গুণে পতি তার সান্নিধ্য ত্যাগ করে না, যে নায়িকা বিভিন্ন বিলাসে রত, এরূপ নায়িকা-ই স্বাধীনভর্তৃকা –

"কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকম্ ।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা ॥"(সা.দ. ৩/৮৬)

নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও বলা হয়েছে বিচিত্র রতিক্রীড়ার লালসায় যার পতি সর্বদা নিকটে-ই থাকে, সেই নায়িকার নাম স্বাধীনভর্তৃকা।

ভাবপ্রকাশনমতে, উদ্যানক্রীড়া, জলক্রীড়া,পুষ্পচয়ন, ইন্দ্রপূজা, বসন্তোৎসব, মদনোৎসব ইত্যাদি এজাতীয় নায়িকার চরিত্রবৈশিষ্ট্য।

বাসকসজ্জা নায়িকার প্রিয়মিলন ভাবী ; স্বাধীনভর্তৃকার প্রিয়ব্যক্তি তার সন্নিধে উপস্থিত –এই হল উভয়ের পার্থক্য।

৮. অভিসারিকা – কামপরবশা হয়ে যে নায়িকা স্বয়ং নায়কের কাছে গমন করে অথবা নায়ককে কাছে আহ্বান করে, সেই নায়িকাকে অভিসারিকা বলা হয়। নাট্যদর্পণের টীকায় 'অভিসারিকা' পদের ব্যাখ্যায় এই কথা-ই বলা হয়েছে – 'সরন্তী স্বয়ং তস্য পার্শ্বে, সারয়ন্তী বা তং প্রিয়মাত্মসমীপে রিরংসুঃ সুরতার্থিনী নায়িকা অভিসারিকা'।[২৫] দশরূপকে প্রদত্ত লক্ষণটি অবিকল এই মতের পরিপোষক– 'কামার্তাভিসরেৎ কান্তং সারয়েদ্বাভিসারিকা'(দশ.রূ. ২/২৭) ।

কামপরতন্ত্রা এই নায়িকা কোনো ঈপ্সিত পুরুষের সঙ্গে মিলনের জন্য নিজে-ই সঙ্কেতস্থলে যায় অথবা সখী বা দূতীর মাধ্যমে ঈপ্সিত জনকে সঙ্কেতস্থানে নিয়ে আসে। অভিসরণ করে বা করায় বলে এই নায়িকা অভিসারিকা নামে প্রসিদ্ধা।

নাট্যশাস্ত্র, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে এই নায়িকার অনুরূপ লক্ষণ-ই নির্ণীত হয়েছে।

সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশ ইত্যাদি গ্রন্থে বিবিধপ্রকার অভিসারিকার আচরণের বিভিন্নতা আলোচিত হয়েছে। কুলজা-বেশ্যা-দাসী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর নারী অভিসারকালে কি কি প্রকার আচরণ করে, তার আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই বিষয়টির সর্বাধিক বিশদ আলোচনা পাওয়া যায় শারদাতনয়রচিত ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে।

নায়িকাদের বিভিন্ন ভেদ আলোচনা সমাপ্ত হল। অধিকাংশ গ্রন্থে এরূপ বিভাজন-ই দেখা গেলেও কোনো-কোনো গ্রন্থে এতদতিরিক্ত নায়িকাদের কথা-ও বলা হয়েছে। ডঃ. কে. এইচ. ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থে ভানুদত্ত রচিত 'রসমঞ্জরী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যাতে ১১৫২ প্রকার নায়িকার কথা বলা হয়েছে।

যাই হোক্, উল্লিখিত আলোচনাদৃষ্টে একথা স্পষ্ট যে, নায়িকার এই বিভাজনের ভিত্তি হল নায়কের সঙ্গে তার ব্যবহার; আরো সমাসতঃ বলতে গেলে, রতিকালীন ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট নারীদের কারোর শিক্ষা, রুচি, লোকব্যবহারজ্ঞান এমনকি কর্মকুশলতাকে পর্যন্ত এই বিভাজনের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ নায়কদের চরিত্রে ধৈর্য, ত্যাগ, বীরত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রভৃতি যাবতীয় গুণের উজ্জ্বল সমাবেশ। গবেষকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই নায়িকার বিভাগটি বড় বেশি একমাত্রিক বলে প্রতিভাত হয় – একথা অনস্বীকার্য।

নারীদের যৌবনস্থ ধর্ম ঃ

সকল মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনপ্রকার গুণ বিদ্যমান। সত্ত্বগুণ নারীদের ক্ষেত্রে শৃঙ্গারের অভিব্যঞ্জক। এগুলি নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত গুণ। স্ত্রীদের পক্ষে এই গুণগুলি তাদের চরিত্রের অলঙ্কারস্বরূপ। কটককেয়ূরাদি অলঙ্কার যেমনভাবে শরীরের শোভাবর্ধন করে, এই সত্ত্বগুণোৎপন্ন গুণাবলী-ও নারীদের রূপ ও লাবণ্যের উৎকর্ষ বর্ধন করে। বাল্য বা কৈশোর অবস্থায় নারীদের স্বভাবে এই গুণগুলির স্ফুরণ ঘটে, বার্ধক্যে এই গুণসমূহ ক্রমে-ক্রমে প্রায় বিলীন হয়ে যায়। মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ যৌবনকালে নায়িকাদের শরীর মন এইসকল গুণরাজির দ্বারা বিভূষিত হয়।

নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে, পুরুষদের মধ্যে-ও ভাবাদি গুণের অস্তিত্ব থাকে। তবে ধীরোদাত্তাদি বিবিধ প্রকার নায়কের মধ্যে ধীরত্ব অর্থাৎ ধৈর্যের স্ফুরণ বিশেষভাবে থাকার কারণে ভাবাদি গুণ তাদের চরিত্রে গৌণ স্থান লাভ করে। নাট্যদর্পণ মতে পুরুষদের প্রধান গুণ হল উৎসাহ ইত্যাদি। ভাবাদি সুকুমার বৃত্তিগুলি পৌরুষদীপ্ত চরিত্রে তাই প্রচ্ছন্ন ও গৌণ হয়ে পড়ে। টীকায় তাই বলা হয়েছে – 'ভাবাদয়স্তু পুরুষানামুৎসাহাদ্যাচ্ছাদিতা এব ভবন্তীতি তে গৌণাঃ '।[২৬]

এই গুণরাজি, যাদের ভাষান্তরে চেষ্টালঙ্কার-ও বলা হয়, নাট্যদর্পণমতে তিনভাগে বিভক্ত –

১. অঙ্গজ

২. স্বভাবজ এবং

৩. অযত্নজ ।

প্রথমে সামান্যতঃ এগুলির আলোচনা করা হচ্ছে –

১.অঙ্গজ – 'অঙ্গজ' কথার অর্থ অঙ্গ অর্থাৎ শরীর থেকে উৎপন্ন। ভাব, হাব ও হেলা – নায়িকার এই তিনটি সত্ত্বগুণ হল অঙ্গজ বা শরীরজ। এই তিনটি গুণ সুন্দর পরিচ্ছদ, মাল্য, সুগন্ধ, চারুদৃষ্টি, অন্যান্য সুন্দর শারীরিক বিভঙ্গ ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়।

২.স্বভাবজ – স্বভাবজ গুণের সংখ্যা দশটি। এগুলি হল – বিভ্রম ,বিলাস, বিচ্ছিত্তি, লীলা, বিব্বোক, বিহৃত, ললিত, কুট্টমিত, মোট্টায়িত এবং কিলকিঞ্চিত। এই গুণগুলি সংশ্লিষ্ট নায়িকাদের প্রিয়মিলনজনিত রতি থেকে উদ্বুদ্ধ । 'স্বভাব' পদের ব্যাখ্যায় নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে – 'স্বস্মাদ্ রতিলক্ষণাদ্ ভাবাৎ'[২৭] – বিশেষ পরিস্থিতি অর্থাৎ মিলনসময়ে চেষ্টাপূর্বক ও যত্নপূর্বক নায়িকারা এই গুণগুলির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটান।

৩.অযত্নজ – অযত্নজ গুণরাজি সংখ্যায় সাতটি – শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য এবং ধৈর্য। এই গুণগুলি 'অযত্নজ' অর্থাৎ যত্ন ব্যতিরেকে উদ্ভূত। এই গুণসমূহকে প্রকটিত করতে নায়িকাদের কোনো চেষ্টা করতে হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অযত্নজ গুণগুলির কয়েকটি,যথা – মাধুর্য, ঔদার্য, ধৈর্য, শোভা ইত্যাদি পুরুষ অর্থাৎ নায়ক চরিত্রে-ও পরিলক্ষিত হয়।

নাট্যদর্পণের এই গুণবিভাগ সম্পূর্ণতঃ নাট্যশাস্ত্র ও দশরূপক অনুসারী। উক্ত দুটি গ্রন্থে এই এক-ই প্রকারে কুড়িটি গুণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নাটকলক্ষণরত্নকোশ গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য সাগরনন্দীর অভিমত একটু পৃথক। তিনি ভাবকে অঙ্গজ অলঙ্কার রূপে স্বীকার করেননি। অঙ্গজ ভেদের অপর দুটি গুণ অর্থাৎ হাব ও হেলাকে তিনি অযত্নজ শ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন এবং এর-ই সঙ্গে বিক্ষেপ, মৌগ্ধ্য, মদ ও তাপন নামক আরো চারটি গুণকে অযত্নজ শ্রেণীভুক্ত করে মোট ষোলো প্রকার অলঙ্কারের কথা স্বীকার করেছেন। দর্পণকার তাঁর গ্রন্থে লীলা-বিলাসাদি দশপ্রকার স্বভাবজ ভাবের সঙ্গে অতিরিক্ত আটটি ভাবকে স্বীকার করেছেন – মদ, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ,কুতূহল, হসিত, চকিত ও কেলি। এভাবে নাট্যদর্পণসম্মত কুড়িটি গুণের সঙ্গে আরো আটটিকে যোগ করে বিশ্বনাথ নায়িকালঙ্কারের সংখ্যাকে অষ্টাবিংশতিতে নির্দিষ্ট করেছেন।

এবার ক্রমে-ক্রমে এদের আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে অঙ্গজ অলঙ্কারসমূহের আলোচনা। এগুলির সংখ্যা তিনটি –

১.ভাব – নাট্যদর্পণসম্মত ত্রিবিধ অঙ্গজ অলঙ্কারের মধ্যে প্রথম হল ভাব। নির্বিকারাত্মক সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভূত প্রথম বিকারকে ভাব বলা হয়। নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে, এই ভাবের প্রকাশ ঘটে সুন্দর বাক্‌বিন্যাস, কর-চরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুন্দর বিভঙ্গ ইত্যাদি অন্তর্নিহিত-রতিভাবের দ্যোতক বিবিধ আচরণের দ্বারা। আরো বলা হয়েছে,ভাব হল প্রধানতঃ উত্তম প্রকৃতির নায়িকাদের গুণ। শালীনতা,অপ্রগল্ভতা ইত্যাদির

কারণে তাঁরা তাঁদের রতিগত মনোভাবকে সহজে ব্যক্ত করেন না, অধম শ্রেণীর নায়িকারা যা সহজে-ই করতে পারে। অতএব বোঝা গেল, নাট্যদর্পণমতে ভাব হল উত্তমপ্রকৃতির নায়িকাদের রতিসংক্রান্ত অথচ আভিজাত্যহেতু সংযত আচরণের নাম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য,নাট্যশাস্ত্রে প্রদত্ত ভাবের লক্ষণটি প্রায় এর অনুরূপ।

দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতে – 'নির্বিকারাত্মকাৎ সত্ত্বাদ্ ভাবস্তত্রাদ্যবিক্রিয়া' (দশ.রূ. ২/৩৩) – অর্থাৎ নির্বিকার চিত্তে উদ্ভূত সত্ত্বগুণের প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব। সত্ত্বগুণের বিশেষত্ব এই যে, বিকারের কারণ থাকা সত্ত্বে-ও তার মধ্যে কোনো বিকার দেখা যায় না। সাধারণতঃ ধীরস্বভাব ব্যক্তিদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নায়কের ক্ষেত্রে এই গুণকে-ই বলা হয় 'গাম্ভীর্য'। নায়িকাদের ক্ষেত্রে এই সত্ত্বগুণের থেকে প্রথম যে বিকারের স্ফুরণ ঘটে, তাকে-ই বলা হয় ভাব। অন্তরের বিপরীতবর্ত্তী সেই ভাব বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায়। সাহিত্যদর্পণে-ও নির্বিকার চিত্তে প্রথম বিকারের আবির্ভাবকে ভাব নামে চিহ্নিত করা হয়েছে –'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া' (সা.দ. ৩/১০০)। ইংরাজী ভাষায় এই প্রাথমিক বিক্রিয়াকে বলা হয় ' feeling'। দশরূপককারের মতে, মুগ্ধা নায়িকার মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিকারের স্ফুরণ দেখা যায়।

২. হাব – নায়িকার অঙ্গজ শৃঙ্গারাভিব্যঞ্জক গুণের অন্যতম হল হাব। যৌবনের আবির্ভাবে ও প্রেমের অভ্যুদয়ে নায়িকার চোখ ও ভ্রূতে চাঞ্চল্য দেখা দেয়, গ্রীবা ও চিবুকে লক্ষিত হয় মনোরম বিভঙ্গ, তার কথাবার্তায় পরিলক্ষিত হয় শৃঙ্গারের প্রকাশ ও প্রগল্ভতার অভাব। নায়িকার মধ্যে সূচিত এরূপ

বিকারের নাম 'হাব'। ইংরাজীতে একে বলা হয় 'emotion'। নায়িকার এই অলঙ্কারটি বস্তুতঃপক্ষে ভাবের-ই উন্নত রূপ।

নাট্যশাস্ত্রে অবিকল অনুরূপভাবে হাবলক্ষণটি নির্ণীত হয়েছে –

''তত্রাক্ষিভ্রূবিকারাদ্যঃ শৃঙ্গারাকারসূচকঃ।

সগ্রীবারেচকো জ্ঞেয়ো হাবঃ স্থিতসমুত্থিতঃ ॥'' (না.শা. ২২/১০)

– অর্থ এক-ই। 'হাব' হল অক্ষি-ভ্রূ-গ্রীবা ইত্যাদি অঙ্গের সুন্দর বিভঙ্গ, যা কিনা শৃঙ্গাররসের সূচক। 'স্থিতসমুত্থিত' পদের অর্থ হল, অন্তরে পূর্বে-ই জাগ্রত বিকার অর্থাৎ 'ভাব' থেকে-ই 'হাব' সমুত্থিত।

সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে, সীমিত বাক্যালাপ, দৃষ্টির চঞ্চলতা, ভ্রূযুগলের বিশেষ ভঙ্গিমা ইত্যাদির দ্বারা নায়িকার রতিসম্ভোগেচ্ছা ঈষৎ প্রকাশিত হলে তাকে হাব বলা হয় –

'' ভ্রূনেত্রাদিবিকারৈস্তু সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশকঃ।

ভাব এবাল্পসংলক্ষ্যবিকারো হাব উচ্যতে ॥" (সা.দ.৩/১০১)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ,নাটকলক্ষণরত্নকোশ গ্রন্থে আচার্য সাগরনন্দী কিছুটা অন্যভাবে এবং অত্যন্ত বিশদে হাবের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে – মহাদেবের নয়নানলে দগ্ধ মদনের তাপ-নির্বাপনে সুধাসারসদৃশ ঈষৎ হাস্য, প্রত্যেকটি পদের প্রয়োগে চাতুর্য ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষণ, অপাঙ্গে গমন ও আগমনশীল দৃষ্টিপাত, প্রেমপূর্ণ, স্নেহনির্ভর, সৎকুলোৎপন্নার আচরণের সূচক, দাক্ষিণ্যযুক্ত, দুঃখের নিবারণে সমর্থ, অশ্রুভারে রুদ্ধকণ্ঠ বাষ্পগদ্‌গদ ভাষণ ইত্যাদি আচরণের নাম হাব। বোঝা-ই যাচ্ছে, এই লক্ষণটি পূর্বোক্ত অন্যান্য গ্রন্থে বিধৃত লক্ষণগুলির থেকে অনেকাংশে পৃথক এবং অনেক বেশি বিস্তৃত।

৩. হেলা – নায়িকার তৃতীয় প্রকার অঙ্গজ অলঙ্কারের নাম হেলা। হাবের মাধ্যমে শৃঙ্গাররস স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়ে হেলা নামক শরীরজ অলঙ্কারে পর্যবসিত হয়। এখানে নায়িকার মধ্যে বিকার পূর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় লক্ষিত হয়। হাবে কথিত ভ্রূ-নেত্র-গ্রীবাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভ্রম-ও এই অলঙ্কারে অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। নায়িকার মধ্যে শৃঙ্গারচেষ্টার পরিপূর্ণ দ্যোতনা-ই হল হেলা। নাট্যদর্পণের টীকায় আরো বলা হয়েছে, প্রিয়ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নায়িকাচরিত্রে উদ্রিক্ত এই অলঙ্কারটি ক্রমে একটি স্থায়ী গুণে পর্যবসিত হয়। ইংরাজীতে এর নাম হল 'passion'।

নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে-ও বলা হচ্ছে, 'হাব' নামক অলঙ্কারের মাধ্যমে ব্যক্ত শৃঙ্গাররসের আরো স্পষ্ট সূচনা হলে তাকে হেলা বলা হয়। 'The Law and Practice of Sanskrit Drama' গ্রন্থে এস. এন. শাস্ত্রী তাই মন্তব্য করেছেন – "Passion (Hela)is a clear manifestation of the emotion and is a stage higher than the one expressed in Hava." [২৮]

নাটকলক্ষণরত্নকোশরচয়িতা আচার্য সাগরনন্দীর মতে – 'শৃঙ্গাররসপ্রবৃদ্ধৌ যা রত্যভিনিবেশনিষ্ঠা সা হেলা'(না.ল.র. বিংশ অধ্যায়)– অর্থাৎ তাঁর মতে শৃঙ্গাররসের অত্যন্ত বৃদ্ধিহেতু রতিতে অভিনিবেশের যে নিষ্ঠা, তাকে-ই হেলা বলা হয়।

এই তিনপ্রকার অঙ্গজ অলঙ্কারের আলোচনায় দেখা গেল, অন্তর্লালিত সত্ত্বগুণ বিকাশোন্মুখ হয় ভাবে, আরো প্রকাশিত হয় হাবে এবং স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয় হেলায় – এই হল নাট্যদর্পণের অভিমত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে-ও কিন্তু উক্ত অলঙ্কারত্রয়কে 'পরস্পরসমুত্থিত' বলা হয়েছে –

"হেলা হাবশ্চ ভাবশ্চ পরস্পরসমুত্থিতাঃ।
সত্ত্বভেদে ভবন্ত্যেতে শরীরে প্রকৃতিস্থিতাঃ ॥" (না.শা. ২২/৭)

অনন্তর স্বভাবজ অলঙ্কারসমূহের আলোচনা। নাট্যদর্পণমতে এগুলির সংখ্যা দশটি। প্রিয়তম ব্যক্তির সমাগমে নায়িকাদের মধ্যে এই অলঙ্কারগুলির স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত তিন প্রকার অঙ্গজ অলঙ্কার প্রিয়সমাগম না হলে-ও সূচিত হতে পারে। টীকায় তাই বলা হচ্ছে – "বিশিষ্টবিভাবলাভে রতিপ্রকর্ষাদ্ দেহবিকারাঃ স্বাভাবিকাঃ। অঙ্গজাস্তু বিশিষ্টবিভাবমন্তরেণেতি বিশেষঃ"।[২৯]

এবার ক্রমে ক্রমে এই দশটি স্বভাবজ অলঙ্কারের আলোচনা করা হচ্ছে –

১. **বিভ্রম –** বিভ্রম নামক চেষ্টালঙ্কারের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল – 'রাগাদিনা বিপর্যাসঃ ক্রিয়মাণামথ বিভ্রমঃ' (না.দ.৪/৩০)– টীকার সাহায্যে এই লক্ষণটির যা অর্থ হয়, তা হল প্রিয়তমের প্রতি বহুমানবশতঃ তার আগমনে চিত্তোল্লাস, সৌভাগ্য, গর্ব ইত্যাদির কারণে অসময়োচিত ভাষণ, একস্থানের অলঙ্কারের বা প্রসাধনের অন্যস্থানে ব্যবহার ইত্যাদি বিপর্যয়ের নাম বিভ্রম।

নাট্যদর্পণের এই বিভ্রমলক্ষণটি বহুলাংশে নাট্যশাস্ত্রানুসারী। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হচ্ছে –

"বিবিধানামর্থানাং বাগঙ্গাহার্যসত্ত্বযোগানাম্।
মদরাগহর্ষজনিতো ব্যত্যাসো বিভ্রমো জ্ঞেয়ঃ ॥"(না.শা. ২২/১৭)

–অর্থ স্পষ্ট। মদ-রাগ-হর্ষের কারণে প্রিয়তমের আগমনে বাক্যবিন্যাস ও অলঙ্কারবিন্যাসের ব্যত্যয়কে বিভ্রম বলা হয়।

দশরূপককারের মতে, দ্রুততার ফলে ভূষণের স্থানবিপর্যয়ের নাম বিভ্রম –'বিভ্রমস্ত্বরয়া কালে ভূষাস্থানবিপর্যয়ঃ' (দশ.রূ. ২/৩৯) । দর্পণকারের মতে-ও প্রিয়তমের আগমনজনিত হর্ষ ও আবেগে ,কখনো বা অনুরাগের আতিশয্যে ব্যস্ততাবশতঃ অস্থানে অলঙ্কারাদিসন্নিবেশকে-ই বিভ্রম বলা হয়।

আচার্য সাগরনন্দী কিন্তু বিভ্রমের ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, বিনা কারণে কোনো রমণীর আসনত্যাগ করে গমন, প্রিয়ের আরব্ধ কথার সূত্র ধরে সখীদের সঙ্গে বার্তালাপ, অকারণে হাস্য-ক্রোধাদির প্রকাশ, অকারণে মাল্য-আভরণ-বস্ত্রাদির দলন ও ছেদন – এরূপ আচরণ-ই বিভ্রম। প্রসঙ্গক্রমে কোনো এক প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রীর মত-ও তিনি উল্লেখ করেছেন,যাঁর মতানুসারে নারীদের যৌবনজনিত বিকার-ই বিভ্রম নামে অভিহিত।

২. **বিলাস –** নাট্যদর্পণসম্মত বিলাসের লক্ষণটি হল – 'বিলাসঃ প্রিয়দৃষ্ট্যাদৌ চারুত্বং গাত্রকর্মণোঃ' (না.দ.৪/৩১) – প্রিয়তমের আগমনে, তার সন্দর্শনে বা তার সঙ্গে সম্ভাষণাবসরে

নায়িকার অঙ্গ-ভঙ্গি, গমন, আগমন, আসনগ্রহণ, দৃষ্টিক্ষেপ ইত্যাদিতে পরিলক্ষিত মনোরম তাৎকালিক পরিবর্তনের নাম বিলাস।

পূর্বাপর যাবতীয় নাট্যতত্ত্ব গ্রন্থে বিলাসের অনুরূপ লক্ষণ-ই নির্ণীত হয়েছে।মহর্ষি ভরতের মতে –

''স্থানাসনগমনানাং হস্তভ্রূনেত্রকর্মণাম্ চৈব।

উৎপদ্যতে বিশেষো যঃ শ্লিষ্টঃ স তু বিলাসঃ স্যাৎ ॥'' (না.শা. ২২/১৫)

– অর্থ এক-ই। প্রিয়জনের সমাগমে বা প্রিয়তমের কাছে গমনকালে নায়িকার চলাফেরা, ওঠা-বসা, কথা বলা, তাকানো ইত্যাদির মধ্যে মনোমুগ্ধকর তাৎকালিক পরিবর্তিত ভাবের নাম বিলাস।

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে বিলাসের অনুরূপ লক্ষণ স্বীকৃত হয়েছে। সাগরনন্দী উক্ত ভাবের সঙ্গে সক্রোধ ও সহাস্য মুখবিকৃতিকে যোগ করে বিলাসের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন – 'প্রিয়োপগমনে যৎ স্থানাসনগমনবিলোকিতেষু বিকারো2কস্মাৎ ক্রোধস্মিতচমৎকৃতয়ো মুখনং বিকূণনং স বিলাসঃ' (না.ল.র. বিংশ অধ্যায়) ।

৩. **বিচ্ছিত্তি** – নাট্যদর্পণসম্মত বিচ্ছিত্তিলক্ষণটি এই রকম – 'বেষাল্পতৈব বিচ্ছিত্তিঃ পরাং শোভাং বিতন্বতী' (না.দ. ৪/৩১) – অর্থাৎ স্বভাবতঃ-ই রূপবতী কোনো নায়িকার সামান্যমাত্র বেশভূষা বা প্রসাধন যদি কমনীয়তাসম্পাদনকারী হয়, তবে তাকে-ই বিচ্ছিত্তি বলা হয়। রমণীরা মাঝে-মাঝে যৎসামান্য সাজসজ্জা, প্রসাধন ইত্যাদির দ্বারা প্রিয়জনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হয়। দৈহিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য সামান্য বেশভূষা রচনার এই প্রবৃত্তির নাম-ই বিচ্ছিত্তি।

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে বিচ্ছিত্তির অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। আচার্য সাগরনন্দী তাঁর গ্রন্থে নায়িকার এই সাজসজ্জার এক বিশেষ কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে প্রিয়তমের কোনো অপরাধের জন্য (অন্য নারীর প্রতি আসক্তির কারণে) ঈর্ষ্যাবশতঃ এবং নিতান্ত অনাদরে সখীদের চেষ্টায় নায়িকা যখন মাল্য-বস্ত্র-আভরণাদি দ্বারা সজ্জিত হয়, তখন সেই অযত্নসজ্জাকে-ই বিচ্ছিত্তি বলা হয়। নাটকলক্ষণরত্নকোশে তাই বলা হয়েছে – 'মালাভরণাচ্ছাদনবিশেষাণাং কুতশ্চিৎ প্রিয়াপরাধাদীর্ষয়ানাদরেণ সখীনাং প্রযত্নাদ্ ধারণং বিচ্ছিত্তিঃ' (না.ল.র. বিংশ অধ্যায়)। তিনি স্বীয় গ্রন্থে অপর একটি মতের-ও উল্লেখ করেছেন, যে মতানুসারে, প্রেমবশে সামান্য হলে-ও প্রিয়তমের দ্বারা প্রদত্ত ভূষণকে বিচ্ছিত্তি বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে-ও নায়িকার অযত্নজ সজ্জাকে বিচ্ছিত্তি বলা হয়েছে। তাই বিচ্ছিত্তির লক্ষণনির্ণয়াবসরে 'অনাদরন্যাসঃ' এই বিশেষণটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

৪. **লীলা –** নাট্যদর্পণসম্মত ‘লীলা’ নামক অলঙ্কারের লক্ষণটি হল – ‘লীলা দয়িতবাগাদেঃ স্বে ন্যাসো বহুমানতঃ’ (না.দ.৪/৩২) – নায়িকা যখন তার মধুর আঙ্গিক প্রচেষ্টা দ্বারা প্রিয়তমের কথাবার্তা, বেশভূষা, আচার-আচরণ ইত্যাদির অনুকরণ করে থাকে, শৃঙ্গারাত্মক সেই অলঙ্কারের নাম লীলা। সাধারণতঃ যৌবনাগমে নারীদের মধ্যে এরূপ অনুকরণপ্রিয়তা দেখা দেয়।

নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক ইত্যাদি গ্রন্থে লীলার অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। দর্পণকার-ও অঙ্গভঙ্গি, বেশ, অলঙ্কার, প্রণয়মূলক বাক্য ইত্যাদির দ্বারা প্রিয়তমের অনুকরণকে লীলা নামে অভিহিত করেছেন –

“অঙ্গৈর্বেশৈরলঙ্কারৈঃ প্রেমিভির্বচনৈরপি।

প্রীতিপ্রযোজিতৈর্লীলাং প্রিয়স্যানুকৃতিং বিদুঃ ॥” (সা.দ.৩/১১০)

আচার্য সাগরনন্দীর মতে, যে নায়িকার এখনো প্রিয়সমাগম ঘটেনি, সখীদের কাছে নিজের চিত্তবিনোদনের জন্য সে বেশ, গমন, হাস্য ও বাক্য দ্বারা প্রিয়তমের যে অনুকরণ করে, তাকে-ই বলা হয় লীলা। নাটকলক্ষণরত্নকোশে তাই বলা হয়েছে – ‘তত্র প্রিয়স্যানাপ্তসমাগমা সখীনাং পুরতঃ স্বচিত্তবিনোদনার্থং বেষগতিহসিতভণিতৈরনুকৃতির্যা ক্রিয়তে সা লীলা’ (না.ল.র. বিংশ অধ্যায়)।

৫. **বিব্বোক –** নাট্যদর্পণে প্রদত্ত বিব্বোক নামক অলঙ্কারের লক্ষণটি হল – ‘বিব্বোকো2নাদরো মানদর্পাদিষ্টে2পি বস্তুনি’ (না.দ.৪/৩২) – অভিমান বা গর্ববশতঃ ইষ্টবস্তুর প্রতি অনাদরপ্রদর্শনকে বলা হয় বিব্বোক। প্রণয়গরবিনী নায়িকারা অহঙ্কারে বা দয়িতের প্রতি অভিমানে তাকে অনাদর করে। অপরাধী নায়কের প্রতি অবজ্ঞা, তাকে বন্ধন-তাড়ন এমনকি পাদপ্রহার-ও করে থাকে নায়িকারা। নায়িকার চরিত্রের এরূপ স্বভাবজ অলঙ্কারের নাম-ই বিব্বোক। নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে, কেবলমাত্র প্রিয়তম-ই নয়, সময়বিশেষে কালোচিত সাজসজ্জা অর্থাৎ সুন্দর বস্ত্র, মাল্য-অলঙ্কার ইত্যাদির প্রতি-ও নায়িকার এরূপ অবহেলা দেখা যায় ।

নাট্যশাস্ত্রে বিব্বোকের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে –

“ইষ্টানাং ভাবানাং প্রাপ্তাবভিমানগর্বসম্ভূতঃ।

স্ত্রীণামনাদরকৃতো বিব্বোকো নাম বিজ্ঞেয়ঃ ॥” (না.শা.২২/২১)

– অর্থ এক-ই । সমাগত দয়িতকে প্রণয়জনিত গর্ব বা অভিমানের কারণে অনাদর করা হলে বিব্বোক নামক চেষ্টালঙ্কারের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

দশরূপক, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে বিব্বোকের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তিভয়ে সেগুলির উল্লেখ করা হল না।

৬. **বিহণম্ –** নাট্যদর্পণসম্মত বিহণলক্ষণটি হল – ‘বিহণং জল্পকালে2পি মৌনং হ্রী-ব্যাজ-মৌগ্ধ্যতঃ’ (না.দ. ৪/৩৩) – প্রিয়সমাগমে লজ্জাবশতঃ সময়ানুকূল বাক্য প্রয়োগ করতে না পারলে তাকে বিহণ বলা হয়। টীকায় বলা হয়েছে এই বাক্যাভাবের বিবিধ কারণ থাকতে পারে – ‘ছদ্ম’ অর্থাৎ অভিনয়াত্মক মৌনভাব, লজ্জা, মুগ্ধতা, মনোগত ভাবপ্রকাশে অপটুতা, অল্পবয়স্কতা ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্র ও দশরূপকে এই অলঙ্কারটিকে ‘বিহৃত’ নামে স্বীকার করা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশাদি গ্রন্থে এর-ই নাম হয়েছে ‘বিকৃত’।

নাট্যদর্পণধৃত বিহণ লক্ষণটি অনেকাংশে-ই নাট্যশাস্ত্র অনুসারী। সেখানে-ও বলা হচ্ছে ব্যাজ অর্থাৎ মৌনচ্ছলে অথবা বাস্তবিক-ই বাক্‌পাটবের অভাবে প্রিয়তমের প্রীতিপূর্ণ বাক্যের উত্তর করতে না পারার নাম বিহৃত –

“বাক্যানাং প্রীতিযুক্তানাং প্রাপ্তানাং যদভাষণম্ ।
ব্যাজাৎ স্বভাবতো বাপি বিহৃতং নাম তদ্ভবেৎ ॥” (না.শা. ২২/২৪)

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশাদি যাবতীয় গ্রন্থে-ও বক্তব্যকালে লজ্জাবশতঃ নায়িকার বাক্যাভাবকে-ই বিহণ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৭. **ললিত –** নাট্যদর্পণে ‘ললিত’ নামক চেষ্টালঙ্কারের লক্ষণটি এভাবে নির্ণয় করা হয়েছে – ‘ললিতং গাত্রসঞ্চারঃ সুকুমারো নিরর্থকঃ’ (না.দ.৪/৩৩)– অকারণে-ই নায়িকার কোমল-স্নিগ্ধ, অতি-মনোহর অঙ্গবিক্ষেপকে ললিত বলা হয়। প্রেমাবেশে নায়িকার সবিলাস গমন, মধুর দৃষ্টিপাত, বাহুর উন্নমন, ভ্রূযুগলের উল্লাস, স্মিতহাস্য প্রভৃতি হল নায়িকার স্নিগ্ধকোমল মনোহর অঙ্গবিন্যাস। নায়িকার এরূপ ভাবের নাম-ই ললিত।

নাট্যশাস্ত্রাদি অপরাপর নাট্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থে ললিতের অনুরূপ লক্ষণ-ই নির্ণীত হয়েছে। দশরূপককারের মতে – ‘সুকুমারাঙ্গবিন্যাসো মসৃণো ললিতং ভবেৎ’ (দশ.রূ. ২/৪১)। বিশ্বনাথ-ও ধনঞ্জয়কে অনুসরণ করে-ই ললিতের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন – ‘সুকুমারতয়াঙ্গানাং বিন্যাসো ললিতং ভবেৎ’ (সা.দ. ৩/১১৮)।

সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশ গ্রন্থে আরো বিশদে ললিতের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে – ভূমিতে মসৃণ চরণ সন্নিবেশিত করে নূপুরের নিক্কণসহ চরণপাত, ত্রিবলিতরঙ্গের সংস্থান পর্যন্ত বাহু উন্নমিত করে বক্ষঃস্থল প্রসারিত করায় স্তনভাগ দ্বিগুণ পৃথক্‌কৃত, কর্ণকুন্তল স্কন্ধ পর্যন্ত আনমিত এবং ভ্রূ উল্লসিত করে প্রিয়তমের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাতের নাম হল ললিত।

নাট্যদর্পণের টীকায় ললিতের সঙ্গে বিলাসের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। তদনুসারে প্রিয়তমের সান্নিধ্যে তাকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজনে নায়িকার অঙ্গবিন্যাসের চারুত্বের নাম বিলাস।

অপরপক্ষে, নিতান্ত অকারণে, বিনা প্রয়োজনে নায়িকার মনোরম অঙ্গবিক্ষেপের নাম ললিত – এই হল উভয়ের প্রভেদ।

৮. **কুট্টুমিত –** নাট্যদর্পণসম্মত কুট্টুমিতলক্ষণটি হল – 'কচৌষ্ঠাদিগ্রহে কোপো মৃষা কুট্টুমিতং মুদি' (না.দ.৪/৩৪) – নায়ক কেশ বা অধর ধারণ করলে অন্তরে আনন্দিত হয়ে-ও বাহ্যতঃ নায়িকার ক্রোধপ্রকাশের নাম কুট্টুমিত।

রতিক্রীড়াকালে নায়ক কামাধিক্যবশতঃ কখনো নায়িকার কেশাকর্ষণ করে, কখনো বা অধরচুম্বন করে। এরূপ অবস্থায় নায়িকারা অন্তরের তৃপ্তির ভাবকে গোপন রেখে বাইরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে। অন্তরে আনন্দ, বাহ্যতঃ কোপ – নায়িকার এরূপ সানন্দ কৃত্রিম ক্রোধকে-ই কুট্টুমিত বলা হয়।

নাট্যতত্ত্বের অপরাপর গ্রন্থে এই অলঙ্কারটির প্রায় অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। মহর্ষি ভরতের মতে, কুট্টুমিত নামক চেষ্টালঙ্কারে নায়িকারা অন্তরে তৃপ্তির ভাবকে গোপন রেখে বাহ্যতঃ কোপ নয়, দুঃখপ্রকাশ করে ; সেই কৃত্রিম দুঃখের নাম-ই কুট্টুমিত। নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে আচার্য সাগরনন্দী-ও রতিসুখের মধ্যে দুঃখের আবিষ্করণকে-ই কুট্টমিত নামে অভিহিত করেছেন – 'প্রিয়স্য রতিসম্ভোগে গাঢ়পরিপীড়নেষু উদ্দামহর্ষাবেশেন হি কিং পীড্যসি ন সহাস্মীতি সুখে দুঃখাবিষ্করণং কুট্টমিতম্' (না.ল.র. বিংশ অধ্যায়)।

দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থে রতিক্রীড়াকালে আন্তরিক তৃপ্তিকে গোপন রেখে নায়িকার কৃত্রিম কোপ প্রকাশকে-ই কুট্টুমিত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৯. মোট্টায়িত – নাট্যদর্পণধৃত মোট্টায়িতলক্ষণটি হল – 'মোট্টায়িতং প্রিয়েক্ষাদৌ রাগতো গাত্রমোটনম্' (না.দ. ৪/৩৪) – প্রিয়তমের ইষ্টবিষয়ে শ্রবণ বা দর্শনে স্বীয় গাত্রমর্দনের নাম মোট্টায়িত।

নাট্যশাস্ত্রে-ও অনুরূপভাবে মোট্টায়িতলক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে –

"ইষ্টজনস্য কথায়াং লীলাহেলাদিদর্শনে বাপি।

তদ্‌ভাবভাবনাকৃতমুক্তং মোট্টায়িতং নাম ॥" (না.শা.২২/১৯)

– ইষ্ট কথায় অর্থাৎ প্রিয়তমের কথায় অথবা তার কোনো চিহ্নদর্শনে দয়িতের প্রতি অনুরাগের কারণে ভাবিতান্তঃকরণের নাম মোট্টায়িত। নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে দশরূপককার ধনঞ্জয়-ও অতি সংক্ষেপে এইভাবে-ই মোট্টায়িতর স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন – 'মোট্টায়িতং তু তদ্ভাবভাবনেষ্টকথাদিষু' (দশ.রূ. ২/৪০)।

সাগরনন্দীর মতে – ‘প্রিয়তমকথাশ্রবণাবর্জিতকর্ণয়া যদ্ ভঙ্ক্ত্বাঙ্গানি বিজৃম্ভিতং তন্মোট্টায়িতম্’ (না.ল.র.বিংশ অধ্যায়) – অর্থাৎ প্রিয়তম বিষয়ক কথা শুনে নায়িকার আড়-মোড়া খাওয়া, হাই তোলা প্রভৃতি আচরণের নাম-ই মোট্টায়িত। অনুরূপ ভাবে ভাবিত হয়ে নায়িকার কর্ণকণ্ডূয়নাদি ক্রিয়াকে দর্পণকার মোট্টায়িত নামে অভিহিত করেছেন –

“তদ্ভাবভাবিতে চিত্তে বল্লভস্য কথাদিষু।
মোট্টায়িতমিতি প্রাহুঃ কর্ণকণ্ডূয়নাদিকম্ ॥” (সা.দ.৩/১১৫)

১০. কিলকিঞ্চিতম্ – নাট্যদর্পণসম্মত কিলকিঞ্চিত নামক অলঙ্কারের লক্ষণটি হল – ‘মুহুঃ স্মিতাশ্রুকম্পাদেঃ সঙ্করঃ কিলকিঞ্চিতম্’(না.দ.৪/৩৫)– টীকার সাহায্যে এই কারিকার অর্থটি দাঁড়ায়, প্রিয়তমের আগমনে বা আগমনের সংবাদে, তার সঙ্গে মিলনে অথবা তার দর্শনে নায়িকার মধ্যে অশ্রু, আনন্দ, ভয়, দুঃখ, গর্ব, শ্রম ইত্যাদির যুগপৎ উপস্থিতিতে এক অদ্ভুত ভাবের উদ্রেক হয়। নায়িকাচিত্তে এইসকল মানসিক ক্রিয়ার মিশ্রণকে বলা হয় কিলকিঞ্চিত।

নাট্যদর্পণের এই লক্ষণটি অবিকল নাট্যশাস্ত্রের অনুরূপ। তত্রধৃত কিলকিঞ্চিত লক্ষণটি হল –

“স্মিতরুদিতহসিতভয়হর্ষগর্বদুঃখশ্রমাভিলাষাণাম্।
সঙ্করকরণং হর্ষাদসকৃত্ কিলকিঞ্চিতং জ্ঞেয়ম্ ॥” (না.শা. ২২/১৮)

– অর্থ স্পষ্ট। নায়িকাচিত্তে হাস্য-রোদন-হর্ষ-গর্ব-দুঃখ-শ্রম ইত্যাদি ভাবের যুগপৎ সমুত্থানকে কিলকিঞ্চিত বলা হয়। দশরূপককার ধনঞ্জয়-ও এই বিষয়ে অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

সাগরনন্দী ও বিশ্বনাথের মতে প্রিয়তমের দর্শনে আনন্দাতিশয্যে প্রকাশিত শুষ্ক রোদন, হাস্য, ক্রোধ ও ভয়ের সংমিশ্রণ-ই হল কিলকিঞ্চিত।

অনন্তর অযত্নজ অলঙ্কারসমূহের আলোচনা। এগুলির সংখ্যা সাতটি –

১. শোভা – নাট্যদর্পণে শোভা নামক চেষ্টালঙ্কারের যে লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে, সেটি হল – ‘ঔজ্জ্বল্যং যৌবনাদীনাম্ অথ শোভোপভোগতঃ’ (না.দ. ৪/৩৫) – যৌবন, রূপ, সুখভোগাদি বিলাসের দ্বারা নায়িকার শরীর যখন অনুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়, তখন সেই সৌন্দর্য্যকে বলা হয় শোভা। পুষ্প-চন্দন-বসন-ভূষণ প্রভৃতি যেমন সৌন্দর্যবর্ধক, রূপ-যৌবন-তারুণ্য-সুখভোগ ইত্যাদি-ও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক।

নাট্যশাস্ত্রের শোভালক্ষণটিতে-ও এক-ই কথা বলা হচ্ছে –

“রূপযৌবনলাবণ্যৈরুপভোগোপবৃংহিতৈঃ।

অলঙ্করণমঙ্গানাং শোভেতি পরিকীর্তিতা ॥" (না.শা.২২/২৭)

– অর্থ স্পষ্ট। রূপযৌবনাদির দ্বারা দেহের অলঙ্করণ-ই শোভা। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ নাটকলক্ষণরত্নকোশাদি অপরাপর গ্রন্থে শোভার অনুরূপ লক্ষণ-ই নির্ণীত হয়েছে।

২. কান্তি – নাট্যদর্পণসম্মত কান্তি নামক গুণের লক্ষণটি হল – 'সা কান্তিঃ পূর্ণসম্ভোগা'(না.দ.৪/৩৬)– সম্ভোগের আর্বিভাবের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত হলে কান্তি নামক অলঙ্কার হয়।

শোভাতে কামের আবির্ভাব বা কামবিকার দেখা যায় না। কাম আবির্ভূত হওয়ার পর নায়িকার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। শোভা নামক অলঙ্কারটি কামোৎপত্তির পর আরো সৌন্দর্য দ্বারা মণ্ডিত হয়। একে-ই বলা হয় কান্তি। অর্থাৎ কান্তি হল কামোদ্ভবজনিত শোভার আরো উন্নত পরিণত স্তর।

নাট্যতত্ত্বের যাবতীয় গ্রন্থে কান্তির অনুরূপ লক্ষণ বিহিত হয়েছে। যেমন দশরূপকে বলা হচ্ছে – **'মন্মথাধ্যাসিতচ্ছায়া সৈব কান্তিরিতি স্মৃতা'** (দশ.রূ. ২/৩৫), তেমনি আবার সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে – 'সৈব কান্তির্মন্মথাপ্যায়িতদ্যুতিঃ' (সা.দ.৩/১০৪)।

৩. দীপ্তি – দীপ্তি নামক গুণের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি হল – 'দীপ্তিঃ কান্তেস্তু বিস্তরঃ' (না.দ. ৪/৩৬) – অর্থাৎ নায়িকার মধ্যে কান্তি নামক যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাব অধিক মাত্রায় প্রকাশ লাভ করলে দীপ্তি নামক অলঙ্কার হয়। সুতরাং কান্তির আতিশয্যের নাম-ই দীপ্তি।

নাট্যশাস্ত্রে-ও কান্তির অত্যধিক বিস্তারকে দীপ্তি নামে অভিহিত করা হয়েছে – 'কান্তিরেবাতিবিস্তীর্ণা দীপ্তিরিত্যভিধীয়তে' (না.শা.২২/২৮)। দর্পণকার দীপ্তিলক্ষণনির্ণয়াবসরে নাট্যশাস্ত্রের লক্ষণটি অবিকল উদ্ধার করেছেন। অন্যদিকে আচার্য সাগরনন্দীর মতে অঙ্গবৈশিষ্ট্যসম্পাদক কান্তি-ই দীপ্তি।

নাট্যদর্পণের টীকায় বলা হয়েছে এই শোভা, কান্তি ও দীপ্তি হল নায়িকার যৌবনাদিহেতু ঔজ্জ্বল্যের (যথাক্রমে) মন্দ, মধ্য ও তীব্র অবস্থা।

৪. মাধুর্য – শোক, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, রতিসময়জ অস্বস্তি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে-ও শারীরিক তথা আকারগত বিকারহীনতার নাম মাধুর্য। অর্থাৎ যেকোনো প্রকার পরিস্থিতিতে, সদা-সর্বদা সৌন্দর্যমণ্ডিত থাকার গুণের নাম-ই মাধুর্য।

নাট্যদর্পণের মাধুর্যলক্ষণটি অনেকাংশে নাট্যশাস্ত্র অনুসারী। তত্রধৃত মাধুর্যলক্ষণটি হল –

"সর্বাবস্থাবিশেষেষু দীপ্তেষু ললিতেষু চ।

অনুল্বণত্বং চেষ্টায়াং মাধুর্যমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥" (না.শা.২২/২৯)

– দীপ্ত, ললিত ইত্যাদি যাবতীয় অবস্থায় সৌন্দর্যের 'অনুল্বণত্ব' অর্থাৎ রমণীয়ত্বের নাম মাধুর্য।

দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থানুসারে যেকোনো অবস্থায় নায়িকার মধ্যে রমণীয়তা প্রকাশিত হলে তাকে মাধুর্য নামক গুণের আখ্যায় অভিহিত করা হয়। আচার্য সাগরনন্দী-ও বলেছেন,সকল অবস্থায় বিকারহীনতার নাম-ই মাধুর্য – 'কোপহর্ষাদ্যবস্থাসু সর্বাস্বপি ন বিকারস্পর্শো মাধুর্যম্' (না.ল.র. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

৫. ঔদার্য – মাধুর্যলক্ষণ আলোচনাবসরে উল্লিখিত শোকাদি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানসিক স্থিতিভঙ্গ না হওয়ার নাম ঔদার্য। অর্থাৎ নাট্যদর্পণমতে, সর্ব অবস্থায় সর্ব সময়ে মানসিক শান্তি অবিচ্ছিন্ন রাখার নাম-ই ঔদার্য।

ঔদার্য লক্ষণ বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থের অভিমত একটু পৃথক প্রকার। নাট্যশাস্ত্রমতে সর্বদা নায়কের প্রতি অনুকূল আচরণ অর্থাৎ নায়ককে সর্বদা প্রশ্রয়দানের নাম ঔদার্য – 'ঔদার্যং প্রশ্রয়ঃ প্রোক্তঃ সর্বাবস্থানুগো বুধৈঃ' (না.শা.২২/৩১)। দশরূপককার-ও এবিষয়ে অবিকল একমত পোষণ করেন। দর্পণকারের মতে, নায়িকার সর্বদা বিনীত ভাবের নাম ঔদার্য –'ঔদার্যং বিনয়ঃ সদা' (সা.দ.৩/১০৮)। আচার্য সাগরনন্দী-ও সকল অবস্থায় নায়কের প্রতি নায়িকার সৌজন্য প্রদর্শনকে ঔদার্য আখ্যায় অভিহিত করেছেন – 'সর্বাবস্থাসু প্রিয়স্য ন চ প্রশ্রয়খণ্ডনমৌদার্যম্' (না.ল.র. ঊনবিংশ অধ্যায়)।

৬. ধৈর্য – নাট্যদর্পণসম্মত ধৈর্য নামক চেষ্টালঙ্কারের লক্ষণটি হল – 'চেতো2বিকত্থনং ধৈর্যম্' (না.দ.৪/৩৭) – চিত্তবৃত্তির শ্লাঘাহীনতার নাম ধৈর্য। নায়িকার মধ্যে যখন চাঞ্চল্যহীনতা দেখা যায়, তার মনোবৃত্তি যখন আত্মপ্রশংসারহিত হয়, তখন তার মধ্যে প্রকাশিত হয় ধৈর্য নামক ভাব।

নাট্যশাস্ত্রে এই অলঙ্কারটির অনুরূপ লক্ষণবিধান করা হয়েছে –

"চাপলেনানুপহতা সর্বার্থেষ্ববিকত্থনা।
স্বাভাবিকী চিত্তবৃত্তির্ধৈর্যমিত্যভিধীয়তে ॥" (না.শা. ২২/৩০)

– অর্থাৎ চাপল্যে অভিভূত না হওয়া এবং চিত্তবৃত্তির শ্লাঘাবিহীনতার স্বাভাবিক প্রবণতাকে ধৈর্য বলা হয়। সাহিত্যদর্পণ, দশরূপক ইত্যাদিতে-ও ধৈর্যের অনুরূপ লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে।

আচার্য সাগরনন্দীর মতে নায়িকার কালোচিত আচরণের নাম ধৈর্য – 'ধৈর্যং কালোচিতব্যবহরণম্' (না.ল.র. ঊনবিংশ অধ্যায়)। কালোচিত ব্যবহার বলতে বোঝায় – রতিকালে প্রগল্ভতা, দিবসে লজ্জা, প্রিয়তমের গমনকালে অনুব্রজন, প্রত্যাগমনকালে প্রত্যুদ্গমন ইত্যাদি আচরণ।

৭. প্রাগল্ভ্যম্ – নাট্যদর্পণে প্রদত্ত প্রাগল্ভ্য নামের গুণের লক্ষণটি হল – 'প্রাগল্ভ্যং কৌশলং রতে' (না.দ.৪/৩৭) – সুরতক্রিয়ায় পারদর্শিতার নাম প্রাগল্ভ্য।

নাট্যশাস্ত্রে-ও প্রাগল্‌ভ্যের অনুরূপ লক্ষণ প্রদান করা হয়েছে –‘প্রয়োগনিস্‌সাধ্বসতা প্রাগল্‌ভ্যং সমুদাহৃতম্‌’ (না.শা.২২/৩১) – অর্থাৎ রতিকৌশলের প্রয়োগ বিষয়ে অবসাদ বা ভীতির অনুপস্থিতিকে প্রাগল্‌ভ্য বলা হয়। আচার্য সাগরনন্দী-ও কামকলায় অজ্ঞতার অভাবকে প্রাগল্‌ভ্য নামে অভিহিত করেছেন – ‘প্রাগল্‌ভ্যং প্রয়োগেষ্বমূঢ়তা’ (না.ল.র.ঊনবিংশ অধ্যায়)।

প্রাগল্‌ভ্যের দশরূপকধৃত লক্ষণটি হল – ‘নিঃসাধ্বসত্বং প্রাগল্‌ভ্যম্‌’ (দশ.রূ. ২/৩৬)। মানসিক ক্ষোভজনিত শারীরিক অবসাদকে বলা হয় সাধ্বস্‌ বা ভীতি। নায়িকার মধ্যে এই অবসাদপ্রসূত ভীতির অভাবের নাম-ই প্রাগল্‌ভ্য। আচার-আচরণ, কথাবার্তা বা সুরতক্রীড়াকালীন প্রয়োগকুশলতা – যে কোনো বিষয়ে নায়িকার মধ্যে কুণ্ঠাহীনতার নাম প্রাগল্‌ভ্য। উল্লেখ্য, দর্পণকার এই অলঙ্কারের সংজ্ঞারূপে ধনঞ্জয়প্রদত্ত লক্ষণটি-ই অবিকল উদ্ধার করেছেন।

স্ত্রীদের যৌবনস্থ ধর্মের বিংশ প্রকার আলোচনার শেষে গ্রন্থকারদ্বয় বলেছেন যে, এই ধর্মের আরো নানাপ্রকার হতে পারে। বাহুল্যভয়ে সেগুলির আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ‘সামান্যাভিনয়’ শীর্ষক আলোচনায় যে ক’টি যৌবনধর্মের গ্রহণ করা হয়েছে, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-ও একান্তভাবে সেই কয়টির-ই আলোচনা করেছেন।

নারীদের সহায়িকাগণ ঃ

অতঃপর নায়িকার সহায়িকাদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। নাট্যদর্পণ গ্রন্থে এই সহায়িকাদের ছয়টি প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই ছয়প্রকার নারীদের লক্ষণ বিবৃত করা হচ্ছে –

১. ধাত্রেয়ী – স্তন্যদায়িনী। শৈশবে যাঁর স্তন্যপানে নায়িকার জীবননির্বাহ হয়।

২. লিঙ্গিনী – পরিব্রাজিকা। স্মরণ-কীর্তনাদি অষ্টপ্রকার বিবর্জিত নারী।

৩. প্রাতিবেশিকা – প্রতিবেশিনী। নায়িকার গৃহের নিকটে বসবাসকারিণী।

৪. শিল্পিনী – চিত্রশিল্পাদি চারুকলায় অভিজ্ঞ রমণী।

৫. চেটিকা – দাসী। নায়িকার নিত্যকর্মের সহায়িকা।

৬. সখী – বান্ধবী। ইনি নায়িকার সমান গুণসম্পন্না এবং মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধা। নায়িকার সুখ-দুঃখ, সর্বমুহূর্তের একান্ত সঙ্গিনী।

এঁরা সকলে প্রয়োজনবোধে নায়কমিলনব্যাপারে নায়িকাকে সাহায্য করবেন। এঁরা গোপনীয়তা রক্ষায় পটু, দেশ-কাল-সময় বিষয়ে অভিজ্ঞ, অহঙ্কারবর্জিত এবং অচপলচরিত্রবিশিষ্ট।

উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে-ও নায়িকার সহায়িকাদের গুণাবলীর অনুরূপ তালিকার কথা বলা হয়েছে –'প্রোত্সাহনে2থ কুশলা মধুরকথা দক্ষিণাথ কালজ্ঞা' (না.শা. ২৩/১০)।

রূপকে ভাষাবিভাগ ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও কালের রুচিবৈচিত্র্যকে বলা হয় প্রবৃত্তি। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'পৃথিব্যাং নানাদেশবেষভাষাচারবার্তাঃ খ্যাপয়তীতি প্রবৃত্তিঃ'। এই প্রবৃত্তিভেদের কারণে-ই পৃথক হয় বিভিন্ন দেশের ভাষা, আচার-আচরণ ও বেশভূষা। দেশ-কাল ও পাত্র অনুযায়ী লোকব্যবহার পর্যালোচনা করে-ই নাট্যকারকে যথোচিতভাবে প্রবৃত্তিসমূহের প্রয়োগ করতে হয়। আর বলা বাহুল্য, প্রবৃত্তির অন্যতম অত্যাবশ্যক উপাদান হল ভাষা অর্থাৎ সংলাপ। তাই নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সকল নাট্যতত্ত্বমূলকগ্রন্থে রূপকে ভাষাব্যবহার বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ এবং আলোচনা করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে দশটি রূপকে প্রয়োগ অনুসারে ভাষা চার প্রকার – অতিভাষা, আর্যভাষা, জাতিভাষা এবং যোন্যন্তরী। বলা হয়েছে –

"অতিভাষার্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ।
তথা যোন্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীর্তিতা ॥" (না.শা. ১৭/২৭,২৮)

অতিভাষা দেবগণের, আর্যভাষা রাজগণের। জাতিভাষায় রচিত পাঠ্য চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রচলিত। এর দুটি প্রকার – প্রাকৃত ও সংস্কৃত। যোন্যন্তরী ভাষা গ্রাম্য ও আরণ্য বিবিধপ্রকার পশু ও বিভিন্ন বিহঙ্গের সংলাপক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এবার দেখা যাক, নাট্যদর্পণে এবিষয়ে কি বিধান দেওয়া হচ্ছে। নাট্যদর্পণমতে দেবতা ও দেবীগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলবেন। দেবগণ স্বাভাবিকভাবে-ই দেবভাষাতে-ই কথোপকথন করবেন। নাট্যশাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে, দেবগণের অনুবর্তনের কারণে অপ্সরারা-ও সংস্কৃত ভাষাতে-ই কথা বলবেন। সাহিত্যদর্পণে-ও এই এক-ই মত পোষণ করা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে এ-ও বলা হয়েছে যে, ইচ্ছানুসারে পৃথিবীতে অপ্সরারা প্রাকৃত ভাষায়-ও কথা বলতে পারেন – 'ছন্দতঃ প্রাকৃতং পাঠ্যং স্মৃতমপ্সরসাং ভুবি'(না.শা.১৭/৪৫)। এর প্রসিদ্ধ উদাহরণরূপে 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এ রাজা পুরূরবার পত্নীরূপা উর্বশী, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ মেনকাসখী সানুমতী প্রমুখের প্রাকৃত পাঠ্য স্মরণীয়।

নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতির পুরুষপাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলবেন। সাহিত্যদর্পণ ও দশরূপকে-ও বলা হয়েছে নায়কাদি কুলীন এবং কৃতাত্ম পুরুষেরা সংস্কৃত ভাষা

ব্যবহার করবেন – 'পাঠ্যং তু সংস্কৃতং নৃণামনীচানাং কৃতাত্মনাম্'(দশ.রূ.২/৬৪)। নাট্যশাস্ত্রে-ও ধীরোদ্ধতাদি চতুর্বিধ নায়কের জন্য সংস্কৃত ব্যবহারের বিধান দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রীচরিত্রগণের জন্য নির্দিষ্ট হল প্রাকৃতভাষা। উচ্চবর্ণসম্ভূতা শিক্ষিতা নারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৌরসেনী প্রাকৃতে কথা বলবেন। অন্যান্য শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্রগুলি অন্যান্য প্রাকৃতে কথা বলবে। সাহিত্যদর্পণে বলা হচ্ছে, উচ্চবংশীয়া নারীগণ গান বা শ্লোকরচনার সময় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ব্যবহার করবেন –'আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ' (সা.দ.৬/১৫৯)।

নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, ক্ষেত্রবিশেষে কদাচিৎ রাজমহিষী, মন্ত্রিকন্যা, গণিকা এবং তপস্বীগণ যথা – পরিব্রাজক, মুনি, বৌদ্ধ, শ্রোত্রিয় প্রমুখ সংস্কৃতে কথা বলবেন। নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য সকল প্রকার তপস্বীর জন্য কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার বিধান দেওয়া হয়েছে –

"পরিব্রান্মুনিশাক্যেষু চোক্ষেষু শ্রোত্রিয়েষু চ।

দ্বিজা যে চৈব লিঙ্গস্থাঃ সংস্কৃতং তেষু যোজয়েৎ ॥" (না.শা. ১৭/৩৮)

কিন্তু নাট্যদর্পণকাররা এই মত স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে – 'লিঙ্গিনাং বাহুল্যেন প্রাকৃতং ভবতীতি'[৩০] – অর্থাৎ তপস্বীদের ভাষা প্রধানতঃ হবে প্রাকৃত। কেবল ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা সংস্কৃতভাষায় কথা বলতে পারেন। সেই ক্ষেত্র-ও নাট্যদর্পণে নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো কার্যব্যপদেশে তপস্বীর ছদ্মবেশ ধারণ করবেন, তখন প্রকৃত অস্তিত্ব গোপন করার প্রয়োজনে তিনি সংস্কৃতে বাক্যালাপ করবেন।

রাজমহিষীরা সংস্কৃতে কথা বলবেন যখন তাঁরা সন্ধিবিগ্রহাদি রাজকীয় মন্ত্রণায় অংশ নেবেন। নাট্যশাস্ত্রে বিশদে বলা হচ্ছে, সন্ধিবিগ্রহ সংক্রান্ত কথা, গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয়, রাজার শুভাশুভসূচক বিহঙ্গধ্বনি ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথনাবসরে রাজমহিষীরা সংস্কৃতে কথা বলবেন –

"সন্ধিবিগ্রহসম্পন্নং তথা প্রাপ্তবাগ্‌গতিম্ ।

গ্রহনক্ষত্রচরিতং খগানাং রুতমেব চ ॥

সর্বমেতদ্ধি বিজ্ঞেয়ং যস্মাদ্রাজ্ঞঃ শুভাশুভম্ ।

নৃপপত্ন্যা স্মৃতং তস্মাৎকালে পাঠং তু সংস্কৃতম্ ॥"(না.শা. ১৭/৪০,৪১)

ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রিকন্যারা সংস্কৃতে কথা বলতে পারেন। বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আচরণকালে গণিকাদের ভাষা হবে সংস্কৃত। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হচ্ছে, ক্রীড়ার জন্য, (নাট্যাভিনয়কালে) সকলের আনন্দদানে, কলা অভ্যাসকালে গণিকাদের পক্ষে সংস্কৃত পাঠ্য প্রযোজ্য –

"ক্রীড়ার্থং সর্বলোকস্য প্রয়োগে তু সুখাশ্রয়ম্ ।

কলাভ্যাসাশ্রয়ং চৈব পাঠ্যং বেশ্যাসু সংস্কৃতম্ ॥" (না.শা. ১৭/৪২)

অনন্তর প্রাকৃতভাষী ব্যক্তিদের একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে। তদনুসারে, বালক (বা শিশু), নপুংসক, শনি ইত্যাদি গ্রহের প্রভাবে গ্রহদশাপ্রাপ্ত, মদ্যপ, স্ত্রীপ্রকৃতিবিশিষ্ট পুরুষ, নারীগণ এবং অধম প্রকৃতির পুরুষরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলবেন। এবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রে-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করা হয়েছে –

"বালে গ্রহোপসৃষ্টে চ স্ত্রীণাং স্ত্রীপ্রকৃতৌ তথা।

নীচে মত্তে সলিঙ্গে চ প্রাকৃতং পাঠ্যমিষ্যতে ॥"[৩১]

আরো বলা হচ্ছে ,ঐশ্বর্যমত্ত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং অপণ্ডিত উত্তম চরিত্রের কথায়-ও প্রাকৃত প্রযোজ্য। এবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশটি হল –

"ঐশ্বর্যেন প্রমত্তানাং দারিদ্র্যেণ প্লুতাত্মনাম্ ।

অনধীতোত্তমানাং চ সংস্কৃতং ন প্রযোজয়েত্ ॥" (না.শা. ১৭/৩৫)

নাট্যদর্পণমতে, অধমপ্রকৃতির পাত্রমাত্রের ভাষা হবে শৌরসেনী প্রাকৃত। কিন্তু অত্যন্ত নীচপ্রকৃতির পাত্র ও পিশাচগ্রস্ত পাত্রদের ক্ষেত্রে ভাষা হবে পৈশাচী ও মাগধী প্রাকৃতের সঙ্কর। দশরূপকে-ও বলা হয়েছে – 'পিশাচাত্যন্তনীচাদৌ পৈশাচং মাগধং তথা' (দশ.রূ. ২/৬৫)।

নাট্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, এই সকল প্রকার ভাষা-ই বক্তাদের বাস্তব্যদেশ অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে। দেশভেদে ভাষায় ভিন্নতা , বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় মনে রেখে নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের ভাষার বিধান করতে হবে। তাই কুরু-মগধাদি দেশভেদে নাটকীয় চরিত্রগুলির ভাষাব্যবহার ও বাচনভঙ্গির পার্থক্য থাকা-ই অভিপ্রেত। এর কারণরূপে নাট্যশাস্ত্রের এই অংশটি উদ্ধার করা যেতে পারে – 'নানাদেশসমুত্থং হি কার্যং ভবতি নাটকে' (না.শা. ১৭/৪৭) – অর্থাৎ নাটকে বিভিন্ন দেশসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য থাকে। অতএব প্রয়োজনানুসারে ভাষাব্যবহারের বিভিন্নতা নাটকে বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে রূপকে ব্যবহার্য সাতটি দেশভাষার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল – মাগধী, অবন্তিজা(বা আবন্তী), প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা এবং দাক্ষিণাত্যা। লক্ষণীয়, এই তালিকায় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের উল্লেখ নেই, যাকে নাট্যশাস্ত্রে উৎকৃষ্ট প্রাকৃত নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণে-ও ভাষাবিভাগের সময় বিবিধপ্রকার প্রাকৃতের প্রয়োগ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে প্রাকৃতের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধপ্রকার বিভাষার-ও উল্লেখ করা হয়েছে। বিভাষা অর্থাৎ 'Dialect' অর্থাৎ একান্তভাবে আঞ্চলিক ভাষা।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে এগুলি সংখ্যায় আটটি – শকার, আভীর, চণ্ডাল, শবর, দ্রবিড়, অন্ধ্র, নীচব্যক্তির ভাষা ও বনচরদের ভাষা। নাট্যদর্পণে এবিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সাহিত্যে পশু-পক্ষ্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণীকে কাহিনীর চরিত্ররূপে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। বিশেষতঃ সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে এর ভূরিপরিমাণ উদাহরণ পাওয়া যায়। নাট্যদর্পণকারদ্বয়ের মতে রূপকে ব্যবহৃত এই পশুপক্ষীদের রব যেন তাদের প্রকৃত রবের থেকে পৃথক না হয়। ফলে এই চরিত্রগুলির বাস্তবতা দৃঢ় হবে এবং দর্শকদের বুঝে নিতে কোনোরকম অসুবিধা হবে না।

নাট্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, ভাষার বিভাগ-তো আছে-ই, উপরন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, বণিক, ম্লেচ্ছ এমনকি গ্রাম্য, নাগরিক, বিট ইত্যাদি প্রতিটি চরিত্রের বাচনভঙ্গি-ও হবে বিভিন্ন এবং সেই-সেই চরিত্রানুগ। বলা বাহুল্য,স্থানকালভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কথাবার্তা ও বাচনভঙ্গি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। জীবনের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ রূপকে এই বৈচিত্র্যের প্রতিফলন তাই অবশ্যকাম্য।

নাটকে ভাষাব্যবহার বিষয়ক এই বিশদ আলোচনার শেষে বলা হচ্ছে, উত্তম-মধ্যম-অধম পাত্রভেদে, সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষাভেদে যেসকল নিয়মের কথা এখানে বলা হল, প্রয়োজনে এই সবগুলি নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে। বহতা নদীর ন্যায় গতিশীল ভাষাকে কোনো নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। তাই উল্লিখিত সকল নিয়মের-ই বিপর্যয় হতে পারে এবং রূপকে তা কখনো দোষাবহ হয় না। তাই 'মালতীমাধব' নাটকে মালতী ও তার সখী লবঙ্গিকার ভাষা সংস্কৃত ,'মৃচ্ছকটিকম্' প্রকরণে গণিকা বসন্তসেনার ভাষা সংস্কৃত, 'উত্তররামচরিত' নাটকে আত্রেয়ীর ভাষা-ও সংস্কৃত। নাটক যেহেতু 'লোকবৃত্তানুকরণ', তাই যে দেশের যে ভাষা, তা সেই দেশের লোকের সংলাপরূপে প্রযোজ্য। নাট্যশাস্ত্রে এবিষয়ে নাট্যকারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে – 'অথ নোক্তং ময়া যচ্চ লোকাত্ গ্রাহ্যং বুধৈস্তু তৎ' (না.শা.১৭/৬৩)। নাট্যশাস্ত্রে একথা-ও বলা হয়েছে যে, নাট্যতত্ত্ব যেসকল ভাষা সম্পর্কে নীরব, নাট্যকার লোকব্যবহার অনুযায়ী সেই সকল ভাষাকে-ও নাট্যভাষারূপে গ্রহণ করতে পারেন – এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত-ই চূড়ান্ত।

নাটকীয় সম্বোধন ঃ

নাট্যদর্পণের পরবর্তী বিষয় হল নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের পারস্পরিক সম্বোধন। এই গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে নিয়মগুলির উপর এবারে আলোকপাত করা হবে।

প্রথমে-ই ‘আর্য’ বা ‘আর্যা’ সম্বোধনের দ্বারা কারা অভিহিত হবেন, তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে পত্নী, তপস্বিনী, ব্রাহ্মণী, জননী, বৃদ্ধা রমণী, মান্যা নারী , অগ্রজ ভ্রাতা, অধম পাত্রদের দ্বারা অমাত্যবর্গ, নটী ও সূত্রধার পরস্পর, পুরোহিত বা বণিকদের দ্বারা তাঁদের পত্নী এবং বৃদ্ধ পতি– এঁরা লিঙ্গ অনুযায়ী ‘আর্য’ বা ‘আর্যা’ পদের দ্বারা সম্বোধিত হবেন। এতন্মধ্যে মাননীয়া নারীকে ‘অম্বা’ ও ‘ভবতী’ পদের দ্বারা-ও অভিহিত করা যাবে। মাতাকে-ও ‘অম্বা’ পদের দ্বারা সম্বোধিত করা যাবে।

রাজমহিষী বয়স্ক পতিকে ‘মহারাজ’ এবং অল্পবয়স্ক পতিকে ‘আর্যপুত্র’ সম্বোধনে অভিহিত করবেন। নাট্যশাস্ত্রে-ও আমরা অনুরূপ নির্দেশ পেয়ে থাকি –

“সর্বস্ত্রীভিঃ পতির্বাচ্য আর্যপুত্রেতি যৌবনে।
অন্যথা পুনরার্যেতি মহারাজেতি ভূপতিঃ ॥” (না.শা. ১৭/৮২)

অল্পপরিচয়ে কোনো পুরুষ কোনো নারীকে ‘ভদ্রা’ সম্বোধনে সম্বোধিত করবেন। প্রিয়তমা পত্নীকে ‘প্রিয়া’ সম্বোধনে অথবা তাঁর পিতা বা পুত্রের সম্পর্কে তাঁকে সম্বোধন করবেন। যথা – ‘হে মাধবপুত্রি’ ,‘হে সোমশর্মাজননি’ ইত্যাদি। প্রধানা মহিষীকে রাজা এবং অন্যান্য সকলে ‘দেবী’ সম্বোধনে অভিহিত করবেন। বিদূষক রাজ্ঞী ও চেটী উভয়কে ‘ভবতি’ রূপে সম্বোধন করবেন। ভৃত্যবর্গ মহিষীকে ‘ভট্টিনী’, ‘স্বামিনী’ অথবা ‘দেবী’ নামে অভিহিত করবেন। দশরূপকে বলা হয়েছে, স্বামীর মর্যাদা অনুসারে বিদ্বান্, রাজর্ষি, অমাত্য প্রভৃতির স্ত্রীরা ‘ভগবতি’, ‘দেবি’, ‘স্বামিনি’, ‘আর্যে’ ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে বিবিধ পাত্রপাত্রীর দ্বারা সম্বোধিত হবেন। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে –‘ পতির্যথা তথা বাচ্যা জ্যেষ্ঠমধ্যাধমৈঃ স্ত্রিয়ঃ’ (সা.দ.৬/১৫৫) ।

অল্পবয়স্কা গণিকাকে পরিজনেরা ‘আজ্জুকা’ নামে এবং বৃদ্ধা গণিকাকে ‘অত্তা’ নামে সম্বোধন করবেন। এই মতটি নাট্যশাস্ত্রে-ও স্বীকৃত –

“অজ্জুকেতি চ বক্তব্যা বেশ্যা পরিজনেন চ।
অত্তেতি গণিকামাতা বাচ্যা পরিজনেন হি ॥” (না.শা. ১৭/৯১,৯২)

সাহিত্যদর্পণে এবিষয়ে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। তদনুসারে গণিকাকে ‘হঞ্জে’ এবং কুট্টিনীকে ‘অজ্জুকা’ বলে সম্বোধন করতে হবে।

সমান বয়স, অবস্থা ও বংশবিশিষ্ট নারীরা পরস্পরকে ‘হলা’ সম্বোধন করবেন। পরিচারিকা এবং নীচশ্রেণীর নারীরা পরস্পরকে ‘হঞ্জে’ সম্বোধন করবেন।

সকল দেবতা , দেবীগণ, 'তপঃস্থা' অর্থাৎ ব্রতধারিণী স্বতন্ত্রা (পতিরহিত) নারী, পূজ্যবর্গ, ঋষিগণ, বিদ্বানবর্গ এবং তাঁদের পত্নীরা স্ব-স্ব লিঙ্গানুসারে 'ভগবন্' বা 'ভগবতি' পদের দ্বারা সম্বোধিত হবেন। নাট্যশাস্ত্রে-ও আমরা অনুরূপ নির্দেশ পেয়ে থাকি –

"দেবানামপি যে দেবা মহাত্মানো মহর্ষয়ঃ।

ভগবন্নিতি তে বাচ্যা যাস্তেষাং যোষিতস্তথা ॥

দেবাশ্চ লিঙ্গিনশ্চৈব নানাশ্রুতধরাশ্চ যে।

ভগবন্নিতি যে বাচ্যাঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীভিরেব চ ॥" (না.শা.১৭/৬৬,৬৭)

মাননীয় ব্যক্তিদের সাধারণতঃ তাঁদের নামের পরিবর্তে তাঁদের পদাধিকার বা বংশ অনুসারে সম্বোধন করা হয়। যেমন – 'হে অমাত্য!', 'হে শ্রেষ্ঠিন্!', 'হে বৎসরাজ!', 'হে সোমবংশের অলঙ্কার !' ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে এঁদের নাম ধরে-ও সম্বোধন করা যেতে পারে । মধ্যম শ্রেণীর পাত্রদের তাঁদের নামে-ই সম্বোধন করা হয় । তপস্বীরা রাজাকে 'রাজন্','ভূপতি' অথবা অপত্যপ্রত্যয়যোগে তাঁর পূর্বসূরী সম্পর্কে তাঁকে সম্বোধন করবেন, যথা– 'কৌরব্য' ইত্যাদি। বিদূষক রাজাকে 'রাজন্' বা 'বয়স্য' রূপে অভিহিত করবেন। অধমপাত্ররা রাজাকে বলবেন 'দেব'। উত্তম-মধ্যম-অধম সকলপ্রকার ব্যক্তি রাজাকে সামান্যতঃ 'দেব' নামে সম্বোধন করবেন। সূত সর্বদা রাজাকে 'আয়ুষ্মন্' নামে অভিহিত করবেন।

রাজা বিদূষককে 'বয়স্য' বলে সম্বোধিত করবেন। রাজপুত্রকে বলা হবে 'কুমার', রাজকন্যাকে বলা হবে 'কুমারী' । উক্ত দুইজন যথাক্রমে 'ভর্তৃদারক' ও 'ভর্তৃদারিকা' রূপে-ও সম্বোধিত হতে পারেন। অন্য শাখাধ্যায়ী তপস্বীকে তাঁর গোত্রানুসারে সম্বোধন করা হবে।

সূত্রধার নটদের দ্বারা 'ভাব' নামে সম্বোধিত হবেন এবং তিনি নটদের 'মার্ষ' নামে অভিহিত করবেন। উল্লেখ্য, সাহিত্যদর্পণে 'মার্ষ'-এর পরিবর্তে 'মারিষ' পদটি গ্রহণ করা হয়েছে। সমবয়স্ক বন্ধুরা পরস্পরকে 'সখা'-রূপে অথবা নাম অনুসারে সম্বোধন করবেন। শিষ্য, পুত্র ও অনুজভ্রাতা, যথাক্রমে আচার্য, পিতা ও অগ্রজের দ্বারা 'পুত্র', 'বৎস' বা 'তাত' নামে সম্বোধিত হবেন। 'তাত' সম্বোধন করা যাবে পূজ্য গুরুজনদের-ও । দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণ উভয়ত্র বলা হচ্ছে, পূজনীয় ব্যক্তিদের 'তাত' ব্যতিরেকে 'সুগৃহীত' পদের দ্বারা-ও সম্বোধিত করা যাবে। সাহিত্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, আচার্যকে 'উপাধ্যায়' এবং তপস্বী ও প্রশান্তচিত্ত বীতরাগ ব্রহ্মবিদ্‌কে জ্ঞানিগণ 'সাধো' শব্দে সম্বোধন করবেন।

কোনো অধম শ্রেণীর পাত্র উত্তম ও মধ্যম পাত্রদের দ্বারা 'সৌম্য' বা 'ভদ্রমুখ' শব্দের দ্বারা এবং একজন অধমপাত্র কর্তৃক 'হণ্ডে', 'অরে', 'হংহো' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত হবেন। যে ব্যক্তি

যে কার্যের জন্য পরিচিত বা প্রসিদ্ধ, তাঁকে সেই কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে সম্বোধন করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ– তিনি কৃষিকার্যে পটু, তাঁকে 'কৃষক' বলা হবে; যিনি গন্ধদ্রব্যনির্মাতা, তাঁকে 'গান্ধিক' বলা হবে; তাম্বুল উৎপাদককে 'তাম্বুলিক' বলা হবে;পশুপালনকারীকে 'গোপাল'; চিকিৎসককে 'বৈদ্য'; পঠন-পাঠন-যজন-যাজনকারীকে 'ব্রাহ্মণ' ইত্যাদিরূপে সম্বোধন করা হবে। সাহিত্যদর্পণে-ও বলা হয়েছে যার যা কার্য, শিল্প, বিদ্যা বা জাতি, তাকে তদনুসারে সম্বোধন করা হবে –

"যস্য যৎকর্ম শিল্পং বা বিদ্যা বা জাতিরেব বা।

তেনৈব নাম্না বাচ্যা2সৌ..৷" (সা.দ.৬/১৫৭)

সাহিত্যদর্পণে আরো বলা হচ্ছে, কাপালিকাদি পাষণ্ডগণকে 'কাপালিক' ইত্যাদি শব্দে-ই সম্বোধন করা হবে। শক প্রভৃতিকে 'ভদ্রদত্ত' নামে সম্বোধন করতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে সম্বোধনের এই নিয়মাবলী অযৌক্তিক এবং নাটকের স্বচ্ছন্দ গতির ব্যাঘাতকারী বলে মনে হয়। কিন্তু 'The Bible of Dramaturgy' নাট্যশাস্ত্রে এবিষয়ে অতি বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। নাট্যদর্পণোক্ত তথ্যগুলির সমস্ত নাট্যশাস্ত্র থেকে-ই গৃহীত। মহর্ষি ভরত তাঁর সমকালীন অসংখ্য নাটক দেখে ও তাদের বিচার করে সম্বোধনের এই নিয়মগুলি সূত্রিত করেছেন, পরভাবী কোনো নাট্যতাত্ত্বিক বা নাট্যকার এগুলিকে লঙ্ঘন করার সাহস করেননি। তাই আমরা দেখতে পাই, সমস্ত সংস্কৃত নাটকে সম্বোধনের এই নিয়মগুলি মেনে চলা হয়েছে।

তবে প্রকৃতপক্ষে এই নিয়মগুলি হল কোনো নবীন কবির পক্ষে নির্দেশিকাস্বরূপ। তাঁদের সুবিধার্থে মহর্ষি ভরত তাঁর অভিজ্ঞতার সুবিশাল সম্ভারের দ্বার তাঁদের সামনে উন্মুক্ত করেছেন যাতে তাঁরা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন প্রদেশের আচার-আচরণ, বেশ-ভূষা, বাগ্‌ভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হওয়ার পর কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। কালিদাস, ভবভূতির পরবর্তী কবিদের রচনায় স্বতঃস্ফূর্ততার যে একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেই অভাবপূরণের জন্য পরভাবীরা নাটকের এইসব প্রায়োগিক কৌশল বিষয়ে অভিনিবেশ স্থাপন করেন। সেই কারণে-ই পাত্রপাত্রীদের পারস্পরিক সম্বোধনের এই নিয়মগুলির প্রভূত চর্চা পরকালীন নাটকগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

পাত্রপাত্রীদের নামকরণ ঃ

নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের নামকরণ বিষয়ে-ও নাট্যদর্পণে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাটি সর্বাংশে নাট্যশাস্ত্র অনুসারী।

প্রথমে-ই বলা হয়েছে, নায়ক চরিত্রের নাম তাঁর কার্য বা গুণ অনুসারী হবে। যথা – প্রবল পরাক্রমের অধীশ্বর নায়কের নাম 'ভীমপ্রকর্মা', শত্রুহন্তা নায়কের নাম 'অরিমর্দন' ইত্যাদি। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'শৌর্যোদাত্তানি নামানি তথা শূরেষু যোজয়েৎ' (না.শা. ১৭/৯৬)।

বণিকদের নাম সাধারণতঃ 'দত্ত' পদান্ত হবে। যেমন – সমুদ্রদত্ত, সাগরদত্ত ইত্যাদি। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে –'দত্তপ্রায়াণি নামানি বণিজাং সম্প্রযোজয়েৎ' (না.শা. ১৭/৯৫)। তবে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, এই নিয়মের অন্যথা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর নৌব্যসনে মৃত বণিক ধনপতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ব্রাহ্মণব্যক্তির নাম তাঁর গোত্র, কুল বা কর্ম অনুসারী হবে। নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশটি হল –'ব্রহ্মক্ষত্রস্য নামানি গোত্রকর্মানুরূপতঃ' (না.শা.১৭/৯৪)। কুল (গুরু বা পিতৃকুল) অনুসারী নামের উদাহরণ – শাণ্ডিল্য (শণ্ডিল ঋষির শিষ্য), গার্গ্যায়ন(গার্গ্য ঋষির শিষ্য) ইত্যাদি; কর্মানুসারী নামের উদাহরণ – অগ্নিহোত্রীয় (অগ্নিহোত্রকর্তা), আথর্বণিক (অথর্ববেদের চর্চাকারী), সামক (সামগান কর্তা) ইত্যাদি। ব্রাহ্মণব্যক্তির নাম 'শর্মন্'পদান্ত-ও হতে পারে। যথা– অগ্নিশর্মা, সোমশর্মা ইত্যাদি।

রাজমহিষীর নাম হবে শুভলক্ষণের সূচক; যথা – সুলক্ষণা, বিজয়বতী ইত্যাদি। গণিকার নামের অন্তে সাধারণতঃ 'দত্তা' বা 'সেনা' পদটি থাকবে। যথা – দেবদত্তা, বসন্তসেনা ইত্যাদি। নাট্যশাস্ত্রে এই দুটির সঙ্গে 'মিত্রা' পদটি-ও গ্রহণ করা হয়েছে–'দত্তা মিত্রা সেনেতি বেশ্যানামানি যোজয়েৎ' (না.শা.১৭/৯৭)। সাহিত্যদর্পণকার এই তিনটির সঙ্গে 'সিদ্ধা' পদটি-ও গ্রহণ করছেন।নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, এই সকল পদবিশিষ্ট নাম না হয়ে গণিকার অন্যপ্রকার নামকরণে-ও কোনো বাধা নেই। যথা – বিদগ্ধমিত্রা, বসন্তশ্রী ইত্যাদি।

চেটী তথা পরিচারিকার নাম কোনো ফুলের নামানুসারে হতে পারে। যথা– মালিনী, মল্লিকা, চূতকলিকা, আম্রমঞ্জরী ইত্যাদি। এবিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশটি হল –'নানাকুসুমনামানঃ প্রেষ্যাঃ কার্যাস্তু নাটকে' (না.শা.১৭/৯৮)। চেট অর্থাৎ ভৃত্য, পরিচারকদের নাম হবে মঙ্গলবাচক; যথা– সিদ্ধার্থক ইত্যাদি । নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে –'মঙ্গলার্থানি নামানি চেটাণামপি যোজয়েৎ'(না.শা. ১৭/৯৮)।সাহিত্যদর্পণে এবিষয়ে একটু অন্যরকম মত পোষণ করা হয়েছে। তদনুসারে বসন্তকালে বর্ণনীয় বস্তুর নাম অনুসারে চেট-চেটীদের নামকরণ হবে –

"......চেটচেট্যোস্তথা পুনঃ।

বসন্তাদিষু বর্ণ্যস্য বস্তুনো নাম যদ্ভবেৎ ॥" (সা.দ. ৬/১৪১)

যেসকল নিয়মের কথা বলা হল, সেগুলি ছাড়া-ও সামান্যতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির জাতি ও কর্ম অনুসারে তাদের নামকরণ করা যাবে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে –

“জাতিচেষ্টানুরূপাণি শেষাণামপি কারয়েৎ।
নামানি পুরুষাণাং তু স্ত্রীণাং চোক্তানি তত্ত্বতঃ ॥”(না.শা. ১৭/১০০)

পরিশেষে বলা যেতে পারে, বাস্তবজীবনে নাম ও নামধারীর সাদৃশ্য এক প্রবিরল বিষয়। সংস্কৃতে-ও প্রাচীন সাহিত্যের অংশে লম্বকর্ণ, শুনঃশেপ ইত্যাদি নিরর্থক নাম আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু সাহিত্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সার্থক নামকরণের প্রতি কবিদের আগ্রহ বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হতে থাকে, যার মাধ্যমে চরিত্রবিশেষের জাতি, গুণ ইত্যাদির ইঙ্গিত-ও আমরা পেয়ে যাই। উদাহরণরূপে অগ্নিশর্মা, সমরকেতু ইত্যাদি নামের উল্লেখ করা যেতে পারে। আর এবিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে-ই মহাকবি কালিদাসের উল্লেখ করতে হয় যাঁর কেবলমাত্র ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকে-ই শকুন্তলা-অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ইত্যাদি প্রতিটি নাম চারিত্রিক প্রাতিস্বিকতায় ভাস্বর; অন্য চরিত্রগুলির নামকরণ-ও বলা বাহুল্য, এক-ই রকম সার্থক।

উপরূপকসমূহ ঃ

প্রসিদ্ধ দশপ্রকার রূপকের সঙ্গে নাটিকা ও প্রকরণীকে যুক্ত করে নাট্যদর্পণে দ্বাদশপ্রকার রূপকভেদের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে নাটক সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবশিষ্ট এগারো প্রকার রূপক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবার গ্রন্থের শেষতম অংশে, টীকার মধ্যে অত্যন্ত সংক্ষেপে তেরো প্রকার উপরূপকের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। নাট্যদর্পণসম্মত এই উপরূপকগুলি হল – সট্টক, শ্রীগদিত, দুর্মিলিতা, প্রস্থান, গোষ্ঠী, হল্লীসক, নর্তনক, প্রেক্ষণক, রাসক, নাট্যরাসক, কাব্য, ভাণক এবং ভাণিকা। এগুলির মধ্যে নর্তনক এবং ভাণক – এই দুই প্রকার উপরূপক অপরাপর কোনো গ্রন্থে স্বীকৃত হয়নি।

নাটকলক্ষণরত্নকোশে নাটিকা ও তোটককে প্রধান রূপকের অন্তর্গত করা হয়েছে। নাট্যদর্পণোক্ত তেরো প্রকার উপরূপকের সঙ্গে সংলাপ, শিল্পক ও ভাণী নামক আরো তিনপ্রকার উপরূপকযোগে নাটকলক্ষণরত্নকোশসম্মত উপরূপকসংখ্যা ষোলোটি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অধুনালভ্য সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থগুলির মধ্যে নাটকলক্ষণরত্নকোশ-ই প্রাচীনতম গ্রন্থ, যেখানে এতো প্রকার উপরূপকের সোদাহরণ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়।

সাহিত্যদর্পণে নাটিকা ও ত্রোটককে উপরূপকের-ই অন্তর্গত করা হয়েছে। নাটকলক্ষণরত্নকোশ-স্বীকৃত ভাণীকে দর্পণকার স্বীকার করেননি। তৎপরিবর্তে বিলাসিকা ও প্রকরণী নামক অতিরিক্ত দুইটি ভেদ স্বীকার করায় সাহিত্যদর্পণসম্মত উপরূপকসংখ্যা আঠারোটি।

ভাবপ্রকাশনকার শারদাতনয় সাহিত্যদর্পণোক্ত উপরূপকগুলির মধ্যে বিলাসিকা, প্রকরণী ও ভাণিকা-কে স্বীকার করেননি। তিনি তৎপরিবর্তে ডোম্বী, ভাণ, ভাণী, কল্পবল্লী ও পারিজাতক নামক পাঁচটি অতিরিক্ত উপরূপকের সংযোজন করেছেন। ফলতঃ ভাবপ্রকাশনসম্মত উপরূপকসংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে কুড়িটি। উল্লেখ্য, আচার্য শারদাতনয় বলেছেন, কোনো-কোনো আচার্যের মতানুসারে (সম্ভবতঃ দশরূপককার বিবক্ষিত) ডোম্বী-শ্রীগদিত-ভাণ-ভাণী-প্রস্থান-রাসক-কাব্য – এই সাতটিকে উপরূপকের শ্রেণীভুক্ত না করে এগুলিকে নৃত্যের ভেদরূপে স্বীকার করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত –

"ডোম্বী শ্রীগদিতং ভাণো ভাণীপ্রস্থানরাসকাঃ ॥

কাব্যং চ সপ্ত নৃত্যস্য ভেদাঃ স্যুস্তে2পি ভাণবৎ।

ইত্যাহুঃ কেচিদন্যে তান্ সর্বান্নৃত্যাত্মকান্ বিদুঃ ॥" (ভাব.প্র.নবম অধিকার)

এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টির উল্লেখ অবশ্য-ই করতে হয়, সেটি হল নাট্যশাস্ত্রের কথা। নাট্যশাস্ত্রে রূপক দশপ্রকার বলা হলে-ও নাটিকাকে ধরে বর্ণনা করা হয়েছে মোট এগারো প্রকার রূপকের। নাটিকাকে অবশ্য স্বতন্ত্র রূপকের মর্যাদা দেওয়া হয়নি, নাটক ও প্রকরণের মিশ্ররূপ বলা হয়েছে। যাই হোক্, এই এগারোটি প্রকার ব্যতীত দৃশ্যকাব্যের অন্য কোনোরকম ভেদের কথা নাট্যশাস্ত্রে স্বীকার করা হয়নি। উপরূপক শব্দটির প্রয়োগ-ই নাট্যশাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না। অনুমান করা যেতে পারে, নাট্যশাস্ত্র রচনার পূর্বে সম্ভবতঃ এগুলির উদ্ভব হয়নি। অন্যথায় নাট্যতত্ত্বের সমুদ্রপ্রতিম এই গ্রন্থে উপরূপকের আলোচনা না থাকার আর কোনো যুক্তিসহ কারণ চিন্তা করা যায় না। অভিনবগুপ্তাচার্য তাঁর টীকায় বলেছেন যে, নাট্যশাস্ত্রসম্মত দশ (বা এগারো) প্রকার রূপকের অতিরিক্ত আরো অনেক প্রকার রূপকের কথা বলা হয়, তবে সেগুলি রাগকাব্য ও নৃত্যাত্মক – দৃশ্যাত্মক নয়।

নাট্যশাস্ত্রের অনুগত অনুসারী দশরূপককার-ও নাটিকাকে সঙ্কীর্ণ আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন রূপক দশপ্রকার-ই। কোনো প্রকার উপরূপকের আলোচনা আমরা দশরূপকে-ও পাই না। এই প্রসঙ্গে-ই দশরূপকের টীকাকার ধনিক ডোম্বী ইত্যাদি সাতপ্রকারকে নৃত্যের ভেদরূপে স্বীকার করেছেন।

এবার নাট্যদর্পণসম্মত তেরোপ্রকার উপরূপকের ক্রমানুসারী আলোচনা করা যাক্ –

১.সট্টক ঃ

সট্টকের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল –

"বিষ্কম্ভকপ্রবেশকরহিতো যস্ত্বেকভাষয়া ভবতি।

অপ্রাকৃতসংস্কৃতয়া স সট্টকো নাটিকাপ্রতিমঃ ॥”[৩২]

– সট্টক নামক উপরূপকে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক নামক অর্থোপক্ষেপকদ্বয় থাকে না। প্রাকৃত অথবা সংস্কৃত ভাষার যেকোনো একটিতে সট্টক রচিত হয়। উভয় ভাষার মিশ্রণ ব্যবহার করা যাবে না। অন্যদিকে সাহিত্যদর্পণ ও ভাবপ্রকাশনে বলা হচ্ছে, সট্টক কেবলমাত্র প্রাকৃতে-ই রচিত হবে, সংস্কৃত ভাষা এখানে ব্যবহার করা যাবে না।ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে– ‘প্রকৃষ্টপ্রাকৃতময়ী সট্টকং নামতো ভবেৎ’(ভাব.প্র.অষ্টম অধিকার) । নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও বলা হচ্ছে যে, শৌরসেনী, প্রাচ্যা এবং মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে নির্মিত সট্টক নামক উপরূপকটিতে স্ত্রীলোকের ন্যায় রাজার পাঠ্য-ও প্রাকৃতে। এপ্রসঙ্গে তিনি আচার্য বাদরায়ণ-এর মত উদ্ধার করে বলেছেন যে, যদি-ও তাঁর মতে সট্টকে রাজার পাঠ্য সংস্কৃত-ও হতে পারে ; কিন্তু এই মতটি যথেষ্ট যৌক্তিক নয়। কারণ, আচার্য সাগরনন্দীর মতে প্রাকৃত পাঠ্য-ই হল এজাতীয় উপরূপকের বৈশিষ্ট্য এবং রাজা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় চরিত্রের সংলাপ তাই প্রাকৃতে রচিত হওয়া-ই বাঞ্ছনীয় – “যদ্যপি বাদরায়ণপ্রভৃতিভিরুক্তং রাজ্ঞঃ সংস্কৃতপাঠঃ কার্যাৎ প্রাকৃতপাঠঃ। তত্র রূপকমেবেদং কার্যমিতি রাজ্ঞাপি প্রাকৃতপাঠঃ কর্তব্যঃ” (না.ল.র.একবিংশ অধ্যায়)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণধৃত সট্টকলক্ষণটি শৃঙ্গারপ্রকাশের অবিকল অনুরূপ; যদি-ও শৃঙ্গারপ্রকাশে সট্টকের স্থান দ্বাদশবিধ প্রধান রূপকের মধ্যে।

অবমর্শসন্ধিবিহীন সট্টকে কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। দর্পণকারের মতে, সট্টকে অদ্ভুত রসের বহুল প্রয়োগ থাকবে –‘প্রচুরশ্চাদ্ভুতো রসঃ’(সা.দ.৬/২৭৮) । আচার্য সাগরনন্দীর মত অন্যপ্রকার। তিনি সট্টকে অদ্ভুত রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, রৌদ্র-বীর-ভয়ানক-বীভৎস এই চারপ্রকারের যে কোনোটি হবে সট্টকের অঙ্গীরস।

সট্টকের অঙ্কগুলির নাম ‘জবনিকা’, অঙ্কের সংখ্যা চার।

সট্টকজাতীয় উপরূপকটির অধিকাংশ লক্ষণ নাটিকার মত। সর্বথা নাটিকাপ্রতিম এই সট্টককে ভাবপ্রকাশনে তাই নাটিকার-ই একটি ভেদরূপে স্বীকার করা হয়েছে, পৃথক উপরূপকরূপে গণ্য করা হয়নি।

সট্টকের উদাহরণরূপে সাহিত্যদর্পণ ও নাটকলক্ষণরত্নকোশ – উভয়ত্র ‘কর্পূরমঞ্জরী’-র নাম করা হয়েছে।

ডঃ.কে.এইচ. ত্রিবেদী তাঁর গ্রন্থে ‘চন্দ্রলেখা’ গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ.এ.এন. উপাধ্যায়ের সট্টকের ব্যুৎপত্তিসংক্রান্ত একটি মতের উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে সেটির উল্লেখ করা হল – ডঃ. উপাধ্যায়ের মতে ‘সট্টক’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ নয়। ‘সট্ট’ শব্দটিকে ‘স+অট্ট’ এইভাবে ভাঙা যেতে

পারে। দ্রাবিড়ভাষায় 'অট্ট' শব্দের অর্থ নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি। অতএব এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা নৃত্যগীতাত্মক অভিনয়-ই সট্টক – এই অর্থ সহজে-ই প্রণিধান করা যায়। [৩৩]

২.শ্রীগদিত ঃ

নাট্যদর্পণোক্ত শ্রীগদিত নামক উপরূপকলক্ষণে বলা হয়েছে,দেবী লক্ষ্মীর ন্যায় উচ্চবংশীয়া কোনো নারী তাঁর সখীদের সম্মুখে স্বীয় পতির শৌর্য, ধৈর্য ইত্যাদি গুণের বিশদ বর্ণনা করেন –

"শ্রীরিব দানবশত্রোর্যস্মিন্ কুলাঙ্গনা পত্যুঃ।
বর্ণয়তি শৌর্য-ধৈর্য-প্রভৃতিগুণানগ্রতঃ সখ্যাঃ ॥" [৩৪]

এই নারী তাঁর বহুগুণান্বিত স্বামীর দ্বারা প্রতারিতা হন এবং সেই কারণে-ই উক্ত গুণবর্ণনা ক্রমে তর্জন ও গঞ্জনায় পর্যবসিত হয়। উল্লেখ্য, লক্ষণটি অবিকলভাবে শৃঙ্গারপ্রকাশ থেকে গৃহীত।

শ্রীগদিতের বিষয়বস্তু ইতিহাস বা পুরাণাদির প্রসিদ্ধ কোনো ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। নায়ক বিখ্যাত, ধীরোদাত্তলক্ষণযুক্ত এবং নায়িকা-ও খ্যাতনাম্নী।

শ্রীগদিত উপরূপকটি একাঙ্ক। ভাবপ্রকাশন অনুসারে এটি বিমর্শসন্ধিহীন অর্থাৎ চতুঃসন্ধি। দর্পণকারের মতে এটি গর্ভ ও বিমর্শসন্ধিহীন অর্থাৎ ত্রিসন্ধি।

এই উপরূপকটি, বলা বাহুল্য, ভারতীবৃত্তিপ্রধান। এটি বহু উদাত্তবচনসমন্বিত। ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে, এখানে কোনো-কোনো স্থলে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের প্রয়োগ হতে পারে।

'শ্রী' শব্দটি এতে ব্যাপ্ত বলে এর নাম শ্রীগদিত অর্থাৎ এটি 'শ্রী'শব্দবহুল। সাহিত্যদর্পণে জনৈক পূর্বাচার্যের মত উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কোনো নটী 'শ্রী' অর্থাৎ দেবী লক্ষ্মীর বেশধারণ করে উপবিষ্ট অবস্থায় কিছু গান ও কিছু পাঠ করে – তাই এজাতীয় উপরূপকের এই নাম।

শ্রীগদিতের উদাহরণরূপে সাহিত্যদর্পণ ও নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'ক্রীড়ারসাতল' এবং ভাবপ্রকাশনে 'রামানন্দ' – এই দুটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩.দুর্মিলিতা ঃ

নাট্যদর্পণে প্রদত্ত 'দুর্মিলিতা' নামক উপরূপকের লক্ষণটি নিম্নরূপ –

"চৌর্যরতপ্রতিভেদং যূনোরনুরাগবর্ণনং চাপি।
যত্র গ্রাম্যকথাভিঃ কুরুতে কিল দূতিকা রহসি ॥
মন্ত্রয়তি চ তদ্বিষয়ং ন্যগ্‌জাতিত্বেন যাচতে চ বসু।
লব্ধ্বাপি লব্ধুমিচ্ছতি দুর্মিলিতা নাম সা ভবতি ॥" [৩৫]

– দুর্মিলিতা নামক উপরূপকে জনৈকা দূতী দু'জন যুবক-যুবতীর অনুরাগ, গুপ্তপ্রণয়, চৌর্যরতি ইত্যাদি হীন বিষয়ের বর্ণনা করে। এই আলোচনার ভাষা হয় অতি নিম্নমানের, কখনো বা অশ্লীল। এই বর্ণনাবসরে এই দূতী বারংবার অর্থ প্রার্থনা করতে থাকে। এবং অর্থলাভের পরে-ও অধিকতর অর্থের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দুর্মিলিতার নাট্যদর্পণোক্ত লক্ষণ এবং ভাবপ্রকাশনোক্ত লক্ষণ – দুটি অবিকল অনুরূপ।

নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ, ভাবপ্রকাশন ইত্যাদি গ্রন্থে এই উপরূপকটির নাম 'দুর্মল্লিকা'। ভাবপ্রকাশনে এটিকে 'মত্তল্লিকা' নামে-ও স্বীকার করা হয়েছে। এইসকল গ্রন্থে এই উপরূপকটির লক্ষণ আরেকটু বিশদ এবং একটু অন্যরকম।

দুর্মল্লিকার যাবতীয় পাত্র 'নাগর' অর্থাৎ নাগরিক জীবন-যাপনে নিপুণ, সর্ববিষয়ে দক্ষ পুরুষ। নায়ক হবেন উত্তম বা মধ্যমপ্রকৃতির। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে – 'নাগরনরান্যুননায়কভূষিতা' (সা.দ. ৬/৩০৩)।

এজাতীয় রূপকের অঙ্কসংখ্যা চারটি। এটি গর্ভসন্ধি বাদে অপর চারটি সন্ধিসমন্বিত। চারটি অঙ্কের মধ্যে প্রথম অঙ্ক তিন নালিকায়, দ্বিতীয় অঙ্ক পাঁচ নালিকায় এবং চতুর্থ অঙ্ক দশ নালিকা সময়ে সম্পন্ন হয় (এক নালিকা = দুই ঘটিকা)। তৃতীয় অঙ্কের সময়কাল নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। দর্পণকারের মতে তৃতীয় অঙ্কটি ছয় নালিকা পরিমিত, নাটকলক্ষণরত্নকোশরচয়িতার মতে এটি দশ নালিকা পরিমিত, আবার ভাবপ্রকাশনমতে এটি সপ্ত নালিকা ব্যাপ্ত।

তবে উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থ-ই দুর্মল্লিকার চারটি অঙ্কের বিষয়বস্তু বিষয়ে সহমত। প্রথম অঙ্ক বিটের ক্রীড়াবহুল, দ্বিতীয় অঙ্ক বিদূষকের বিলাসবহুল, তৃতীয় অঙ্ক পীঠমর্দ নায়কের বিলাসবৃত্তান্ত এবং চতুর্থ অঙ্ক প্রধান নায়কের ক্রীড়াবৃত্তান্তবহুল। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে –'অস্যামেকাঙ্কো বিটবিলাসময়ঃ, দ্বিতীয়ো বিদূষকবিলাসময়ঃ, তৃতীয়ঃ পীঠমর্দবিলাসময়ঃ, চতুর্থশ্চ নাগরনায়কবিলাসময়ঃ' (না.ল.র.একবিংশ অধ্যায়)।

ভাবপ্রকাশনে এতদতিরেকে বলা হয়েছে, এজাতীয় উপরূপকে পুরোহিত, অমাত্য, তপস্বী প্রমুখের ঈপ্সিত কার্যের নির্বাহ হয় না। এবং গোরোচনা বিষয়ে অভিজ্ঞা কোনো নারীর নিয়োগ এখানে বাঞ্ছনীয়।

দুর্মল্লিকার ভাষা প্রাকৃত। ভাবপ্রকাশনে বলা হচ্ছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। বৃত্তি হবে কৈশিকী এবং ভারতী।

দুর্মল্লিকার উদাহরণরূপে 'বিন্দুমতী'-র উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪.প্রস্থান ঃ

প্রস্থান নামক উপরূপকের লক্ষণ আলোচনাবসরে নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে,শৃঙ্গাররসাশ্রয়ী এই উপরূপকে নায়ক-নায়িকার প্রথম অনুরাগ, মান-অভিমান, উৎকণ্ঠা, প্রবাস ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। এখানে থাকে বর্ষা, বসন্ত ইত্যাদি ঋতুর মনোহারী বর্ণনা। এর সমাপ্তি ঘটে বীরাদি দীপ্তরসের প্রয়োগের মাধ্যমে। এছাড়া চারজন অপ্সরার কথা ও কার্যাবলীর বর্ণনা-ও এখানে থাকে। নাট্যদর্পণমতে, কোনো-না-কোনো প্রকার যাত্রার বর্ণনা থাকার কারণে এজাতীয় উপরূপককে প্রস্থান নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, প্রস্থানের নাট্যদর্পণোক্ত লক্ষণ এবং ভাবপ্রকাশনোক্ত ও শৃঙ্গারপ্রকাশনোক্ত লক্ষণ অবিকল অনুরূপ। ভাবপ্রকাশনমতে হস্ত্যাদির ন্যায় সুমনোহর গতির কারণে এর নাম প্রস্থান।

সাহিত্যদর্পণাদি অন্যান্য গ্রন্থে প্রস্থানের লক্ষণটি অন্যপ্রকার। নাট্যদর্পণের লক্ষণ অনুসারে এই উপরূপকটি রোম্যান্টিক কাব্যরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের লক্ষণ অনুযায়ী এটি নিম্নমানের একটি নিকৃষ্ট রচনামাত্র। এজাতীয় উপরূপকে নায়ক হবেন দাসজাতীয়, উপনায়ক হবেন তদপেক্ষা-ও হীন, নায়িকা হবেন জনৈকা দাসী। নাটকলক্ষণরত্নকোশে বলা হয়েছে এর উপনায়ক হবেন বিট এবং নায়িকা হবেন 'ঘটচেটী'। ডঃ. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কৃত সম্পাদনায় 'ঘটচেটী' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'কুম্ভদাসী' অর্থাৎ কন্যাসংগ্রহকারিণী। নায়ক-নায়িকার মানদৃষ্টে এই উপরূপকটির কাব্যিক উৎকর্ষের মান-ও সহজে-ই অনুমেয়।

দুই অঙ্কবিশিষ্ট প্রস্থানে কেবল মুখ ও নির্বহণ সন্ধি থাকে। এর বৃত্তি হল কৈশিকী। সাহিত্যদর্পণে অবশ্য ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ-ও স্বীকার করা হয়েছে। এজাতীয় উপরূপকে সুরাপানের বিষয় অবলম্বন করে বহু দৃশ্য থাকে এবং লয়তালসমন্বিত প্রচুর বিলাসব্যসনের বর্ণনা থাকে।

প্রস্থানের উদাহরণরূপে 'শৃঙ্গারতিলক'-এর নাম পাওয়া যায়। সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, ভাবপ্রকাশন সর্বত্র এই গ্রন্থটির নাম-ই উল্লিখিত হয়েছে।

৫.গোষ্ঠী ঃ

'গোষ্ঠী' নামক উপরূপকের লক্ষণে নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে –

''গোষ্ঠে যত্র তু বিহরতঃ চেষ্টিতমিহ কৈটভদ্বিষঃ কিঞ্চিৎ।
রিষ্টাসুরপ্রমথনপ্রভৃতি তদিচ্ছন্তি গোষ্ঠীতি ॥'' [৩৬]

– গোষ্ঠীর কাহিনী ভগবান্ কৃষ্ণের কার্যকলাপ নিয়ে রচিত। গোষ্ঠে ভ্রমণ, গোপালন ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দৈত্য ও অসুরদের বধের ঘটনা-ও গোষ্ঠীর বর্ণনীয় বিষয়। উল্লেখ্য, গোষ্ঠীর নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি শৃঙ্গারপ্রকাশোক্ত গোষ্ঠীলক্ষণের অবিকল অনুরূপ।

এজাতীয় উপরূপকের শ্রীকৃষ্ণের জীবন-আশ্রয়ের বিষয়টি ভাবপ্রকাশনে-ও উল্লিখিত হয়েছে–

"গোপপতের্বিহরতো গোষ্ঠবালস্য চেষ্টিতম্ ।

যত্তু যমলার্জুনাদিদানবনিধনকৃতং তত্তু গোষ্ঠী স্যাৎ ॥" (ভাব.প্র. নবম অধিকার)

সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে বলা হচ্ছে, গোষ্ঠী জাতীয় উপরূপকে নয়জন বা দশজন পুরুষচরিত্র থাকে এবং পাঁচ বা ছয়জন রূপলাবণ্যময়ী নায়িকা থাকেন । এর ভাষা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃত। সংস্কৃত ভাষা এবং বিবিধ উদাত্তবচনের প্রয়োগ এখানে দৃষ্ট হয় না। এর বৃত্তি হল কৈশিকী, রস শৃঙ্গার; আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে কামশৃঙ্গার । একাঙ্ক এই উপরূপকটি ত্রিসন্ধি; এখানে গর্ভ ও বিমর্শসন্ধি থাকে না।

গোষ্ঠীর উদাহরণরূপে নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'সত্যভামা' এবং সাহিত্যদর্পণে 'রৈবতমদনিকা'-র উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.হল্লীসক ঃ

নাট্যদর্পণসম্মত হল্লীসক লক্ষণটি হল –

"যন্মণ্ডলেন নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীসকং তু তৎ প্রাহুঃ।

তত্রৈকো নেতা স্যাদ্ গোপস্ত্রীণামিব মুরারিঃ ॥"[৩৭]

– অর্থাৎ প্রথমে-ই বলা হল, হল্লীসক হল মূলতঃ নৃত্যের একটি প্রকারভেদ। বৃত্তাকারে সজ্জিতা নারীগণ এখানে নৃত্য প্রদর্শন করেন। মধ্যস্থলে একজন পুরুষ অর্থাৎ নায়ক বিরাজমান থাকেন। ঠিক যেমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে মাঝখানে রেখে গোপাঙ্গনাদের নৃত্যের প্রসিদ্ধি, হল্লীসক প্রকারের উপরূপকটির মূল বিষয়বস্তু তার-ই অনুরূপ। হল্লীসকের এই লক্ষণটি শৃঙ্গারপ্রকাশের অবিকল অনুসরণে নির্মিত।প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, লক্ষণদৃষ্টে পাশ্চাত্যের 'Ballet' প্রকারের নৃত্যের সাথে হল্লীসকের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, ভাবপ্রকাশন ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে হল্লীসকে সাত থেকে দশটি স্ত্রীচরিত্র থাকবে। অন্যদিকে, অপরাপর গ্রন্থে প্রধান ভূমিকায় একজন মাত্র পুরুষের কথা স্বীকৃত হলে-ও, ভাবপ্রকাশনে এবিষয়ে একেবারে ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। আচার্য শারদাতনয়ের মতে, হল্লীসকে ললিত, দক্ষিণ ও বিখ্যাত পাঁচজন বা ছয়জন নায়ক থাকেন।

এঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হন এবং এঁদের বিবিধ কার্যসিদ্ধি কোনো মন্ত্রীর অধীন হয়ে থাকে। ভাবপ্রকাশনের উক্তিটি উদ্ধৃত করা হল –

"ললিতা দক্ষিণাঃ খ্যাতা নায়কাঃ পঞ্চষা অপি ।

বিপ্রক্ষত্রবণিক্‌পুত্রাস্‌সচিবায়ত্তসিদ্ধয়ঃ ॥" (ভাব.প্র. নবম অধিকার)

হল্লীসকের ভাষা মূলতঃ প্রাকৃত। তবে কোনো কোনো সময় পুরুষচরিত্রের মুখে উদাত্ত সংস্কৃত সংলাপ থাকতে পারে। কৈশিকী বৃত্তিতে উজ্জ্বল এই উপরূপকে ভূরি পরিমাণ নৃত্যগীতাদির প্রয়োগ থাকে।

হল্লীসক একাঙ্ক। তবে ভাবপ্রকাশনে বলা হচ্ছে, কখনো এটি দুই অঙ্কবিশিষ্ট-ও হতে পারে। একাঙ্ক হলে কেবলমাত্র মুখ ও নির্বহণসন্ধিযুক্ত হবে ; দ্ব্যঙ্ক হলে এর সঙ্গে বিমর্শসন্ধির-ও প্রয়োগ হবে।

হল্লীসকের উদাহরণরূপে 'কেলিরৈবতক'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় ।

৭.নর্তনক ঃ

নাট্যদর্পণে 'নর্তনক' নামক উপরূপকের যে লক্ষণটি দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নরূপ–

"যস্য পদার্থাভিনয়ং ললিতলয়ং সদসি নর্তকী কুরুতে।

তন্নর্তনকং শম্যা-লাস্য-ছলিত দ্বিপদ্যাদি ॥" [৩৮]

– এই উপরূপকটি, বলা বাহুল্য, নৃত্যের-ই একটি প্রকারভেদ। এখানে একজন নর্তকী সুন্দর, ছন্দোময় এবং তালসমন্বিত দক্ষ নৃত্যের মধ্যে দিয়ে বিশেষ কোনো ঘটনার পরিবেশন করেন। এই বিশেষ ঘটনাটি কি হতে পারে, তা নিয়ে নাট্যদর্পণে কিছু বলা হয়নি। এই নর্তনকের শম্যা, লাস্য, ছলিত, দ্বিপদী ইত্যাদি প্রকার হতে পারে। নাট্যদর্পণে এই প্রকারগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা রয়েছে –

ক. শম্যা – কিন্নরদের দ্বারা পরিবেশিত নৃত্যের নাম শম্যা

খ. লাস্য – শৃঙ্গাররসপ্রধান নৃত্যের নাম লাস্য

গ. ছলিত – শৃঙ্গার-বীর-রৌদ্রাদি বিভিন্ন-রসসমন্বিত নৃত্যের নাম ছলিত এবং

ঘ. দ্বিপদী – বিভিন্ন ছন্দসমন্বিত নৃত্যের নাম দ্বিপদী।

'নর্তনক' নামক এই উপরূপকটি সাহিত্যদর্পণ বা নাটকলক্ষণরত্নকোশে স্বীকার করা হয়নি। অন্যদিকে ভাবপ্রকাশন গ্রন্থকার আচার্য শারদাতনয় এটিকে স্বীকার করেন। তত্রোক্ত নর্তনক লক্ষণটি

অবিকল নাট্যদর্পণের অনুরূপ। বিশেষ এই মাত্র যে, ভাবপ্রকাশনে এর লক্ষণ বিষয়ে আরো বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এতে গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি থাকে না, কৌশিক্যাদি সর্বপ্রকার বৃত্তি এখানে বর্তমান থাকে, এর নায়ক হবে উত্তম বা অধম প্রকৃতির, মূলতঃ শৌরসেনী প্রাকৃতে এর রচনা হবে ইত্যাদি। নর্তনকের একটি প্রকার লাস্যের ছলিত ও সমরথ্যা নামক দ্বৈবিধ্যের কথা-ও ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে।

নাট্যদর্পণে এই উপরূপকটির কোনো উদাহরণ দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভাবপ্রকাশনে নর্তনকের উদাহরণরূপে 'বালিবধ' ও 'নৃসিংহবিজয়' নামক দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.প্রেক্ষণক ঃ

প্রেক্ষণকের নাট্যদর্পণসম্মত লক্ষণটি হল –

"রথ্যা-সমাজ-চত্বর-সুরালয়াদৌ প্রবর্ত্যতে বহুভিঃ।
পাত্রবিশেষৈর্যৎ তৎ প্রেক্ষণকং কামদহনাদি ॥"[৩৯]

– প্রেক্ষণক জাতীয় উপরূপকের মাধ্যমে কোনো ঘটনাবিশেষের অভিনয় করা হয় এবং এই অভিনয়টি অনুষ্ঠিত হয় পথে, সভামধ্যে, চত্বরে বা কোনো মন্দিরে।

নাট্যতত্ত্বমূলক অন্যান্য গ্রন্থে এই উপরূপকটির সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে এর নায়ক হবে হীনচরিত্রের । এতে সূত্রধার নেই, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক নেই। এর নান্দীশ্লোকের উচ্চারণ হয় নেপথ্যে। কবিপরিচিতি-কাব্যপরিচয়-কবিপ্রশংসা-পরিষৎপ্রশংসা-নটনটীপ্রশংসা প্রভৃতি বিষয়ক প্রস্তাবনা ও প্ররোচনা-ও নেপথ্যে-ই অভিনীত হয়। নাটকলক্ষণরত্নকোশমতে, এই উপরূপকটিতে পূর্বরঙ্গের পরিবর্তক ও উপক্ষেপ নামক অঙ্গদ্বয়ের অনুষ্ঠান থাকে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ, রোষভাষণ, সম্ফেট এবং বিপদ্‌সম্পর্কিত চিন্তার বাহুল্য এজাতীয় উপরূপকের বৈশিষ্ট্য। এখানে চতুর্বিধ বৃত্তির প্রয়োগ থাকে। এখানে গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি থাকে না। কারো-কারো মতে প্রতিমুখসন্ধি-ও থাকে না। বহুভাষার দ্বারা শোভিত হলে-ও এখানে মূলতঃ শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

এবার ভাবপ্রকাশনে প্রদত্ত প্রেক্ষণকলক্ষণ বিষয়ে অবতারণা করা যাক্ । এই গ্রন্থে নর্তনক নামক উপরূপকটির দীর্ঘ বিবরণের অব্যবহিত পরের কারিকায় বলা হয়েছে, এই নর্তনকে-ই যদি গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি না থাকে, বৃত্তিচতুষ্টয়সংযুক্ত হয়, নেপথ্যবাক্যের প্রয়োগ হয় এবং সূত্রধার না থাকে,

তাহলে-ই তাকে প্রেক্ষণক বলা হবে। স্পষ্ট-ই বোঝা যাচ্ছে ভাবপ্রকাশনকারের মতে, নর্তনক ও প্রেক্ষণকের মধ্যে কেবল প্রয়োগবিষয়ে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; চরিত্রগতভাবে এরা অনুরূপ।

প্রেক্ষণকের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণে 'কামদহন', ভাবপ্রকাশনে 'ত্রিপুরমর্দন' এবং সাহিত্যদর্পণ ও নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'বালিবধ'-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৯.রাসক ঃ

যে প্রকার উপরূপকে ষোড়শ, দ্বাদশ বা অষ্টসংখ্যক নারীগণ পিণ্ডীবন্ধাদি বিভিন্ন প্রকার মুদ্রায় নৃত্য পরিবেশন করে, তার নাম রাসক – এই হল নাট্যদর্পণধৃত রাসকলক্ষণ। এই নৃত্যের চারপ্রকার মুদ্রা হতে পারে – ক.পিণ্ডীবন্ধ –অত্যন্ত ঘনসন্নিবদ্ধ মুদ্রার নাম পিণ্ডীবন্ধ

খ.শৃঙ্খলা –তন্তুবয়নের ন্যায় মুদ্রার নাম শৃঙ্খলা

গ.ভেদ্যক–পরস্পরের থেকে ভেদন অর্থাৎ দূরে অপসরণের মুদ্রার নাম ভেদ্যক এবং

ঘ. লতাবন্ধ – জালের ন্যায় সন্নিবদ্ধ নৃত্যশৈলীর নাম লতাবন্ধ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণে উক্ত রাসকলক্ষণ ও তার ভেদসংক্রান্ত আলোচনা এবং এবিষয়ে ভাবপ্রকাশন ও শৃঙ্গারপ্রকাশের আলোচনা অবিকল অনুরূপ।

অভিনবগুপ্তাচার্যের মতে, রাসক হল বহুসংখ্যক নারীগণের দ্বারা পরিবেশিত, সুন্দর তালসমন্বিত নৃত্য। এতে সর্বাপেক্ষা চৌষট্টিটি যুগ্ম অর্থাৎ একশত আঠাশজন নৃত্য- পরিবেশিকা থাকতে পারে। ভাবপ্রকাশনে-ও এই এক-ই সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে –

"অনেকনর্তকীযোজ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতম্।

আচতুঃষষ্টিযুগলাদ্রাসকং মসৃণোদ্ধতম্ ॥" (ভাব.প্র. নবম অধিকার)

আরো একটি বিষয় প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ভাবপ্রকাশনে এই রাসকে নৃত্যপরিবেশনের শৈলীর যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তদ্দৃষ্টে পাশ্চাত্যের আধুনিক 'Ballet' নৃত্যের সঙ্গে (হল্লীসকের ন্যায়) রাসকের যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

সঙ্গীতরত্নাকরের সপ্তম অধ্যায়ে রাসকের উৎপত্তিবিষয়ে একটি প্রবাদের উল্লেখ আছে। দেব মহেশ্বর তাণ্ডবনৃত্যের এবং দেবী পার্বতী লাস্যনৃত্যের নির্মাতারূপে প্রসিদ্ধ। পার্বতী অনিরুদ্ধজায়া উষাকে লাস্যের শিক্ষা দান করেন। উষা আবার এই বিদ্যা প্রদান করেন 'দ্বারাবতী' নগরীর গোপিনীদের এবং তাঁদের থেকে সৌরাষ্ট্রের যুবতীদের মধ্যে এই নৃত্যের প্রসার ঘটে। বস্তুতঃপক্ষে, আজ-ও পর্যন্ত সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ গুজরাট প্রদেশে এই প্রকার নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

যাই হোক, সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে কিন্তু রাসকের সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। তদনুসারে, এর পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা পাঁচ; এর নায়ক মূর্খ কিন্তু নায়িকা প্রসিদ্ধা। এতে দুটি সন্ধি – মুখ ও নির্বহণ। এতে দুই প্রকার বৃত্তির প্রয়োগ – কৈশিকী ও ভারতী। নায়িকার গুণ, মহিমা ও ক্রমবিকাশের পথে নৃত্যগীতাদি নানা কলার সমাবেশ থাকে। নাটকলক্ষণরত্নকোশে-ও বলা হচ্ছে, এই প্রকার উপরূপকে থাকে বহুপ্রকার কলাবিদ্যা সম্পর্কে উপদেশ ও তথ্য , মসৃণ ও উদাত্ত ভাব, উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রাধান্য – '... অনেককলোপদেশবার্তামণ্ডিতং মসৃণোদাত্তভাবভূষিতম্ উত্তরোত্তরপ্রধানম্.....' (না.ল.র. একবিংশ অধ্যায়)।

রাসকে সূত্রধারের অস্তিত্ব নেই। এর নান্দীপদ 'শ্লিষ্ট' অর্থাৎ দ্ব্যর্থক। সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষা-ই এই উপরূপকে সমান প্রাধান্যে ব্যবহৃত।একদিকে নৃত্যগীতের বিলাস, অন্যদিকে উদাত্ত,প্রদীপ্ত বচনের অপরূপ সমারোহে প্রোজ্জ্বল রাসক নামক এই উপরূপক নাট্যজগতের এক মনোহর সৃষ্টি।

রাসক নামক উপরূপকটির স্বরূপ বিষয়ে মতপার্থক্য দেখে মনে করা যেতে পারে যে, উৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থায় এটি কেবলমাত্র নৃত্যপরিবেশনের উদ্দেশ্যে-ই নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গীত, পাঠ্য, অভিনয় ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে এটি অভিনয়যোগ্য উপরূপকে উন্নীত হয়।

রাসকের উদাহরণরূপে সাহিত্যদর্পণে 'মেনকাহিতম্', নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'মদনিকাকামুকম্' ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১০.নাট্যরাসক ঃ

বসন্তের সূচনায়, দেশের রাজার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাবশতঃ নারীগণ যখন সেই রাজার জীবন ও কার্যাবলী নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেন, নাট্যদর্পণমতে সেটির-ই নাম নাট্যরাসক। উল্লেখ্য, ভাবপ্রকাশনে-ও নাট্যরাসকের অবিকল অনুরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে –

''কামিনীভির্ভুবো ভর্তুঃ চেষ্টিতং যত্র নৃত্যতে।
রাগাদ্বসন্তমালোক্য স জ্ঞেয়ো নাট্যরাসকঃ ॥'' (ভাব.প্র. নবম অধিকার)

অন্যদিকে সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে এই উপরূপকের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তদনুসারে একাঙ্ক এই উপরূপকটি উদাত্ত নায়ক ও পীঠমর্দ উপনায়কযুক্ত। এর নায়িকা বাসকসজ্জিতা প্রকারের।এর প্রধান রস হাস্য; কারো মতে হাস্য ও শৃঙ্গার দুই-ই। নাট্যরাসক দশবিধ লাস্যাঙ্গসমন্বিত। এটি মুখ ও নির্বহণ সন্ধিবিশিষ্ট অর্থাৎ দ্বিসন্ধি। আবার কারো কারো মতে, এতে

প্রতিমুখ বাদে চারটি সন্ধি-ই থাকে অর্থাৎ এটি চতুঃসন্ধি। এই উপরূপকটি বহুবিধ তাল ও লয় সমন্বিত ও গীতিপ্রধান।

নাট্যরাসকের দ্বিবিধ লক্ষণদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, এটি-ও (রাসকের ন্যায়) প্রাথমিকভাবে কেবল নৃত্যপরিবেশনের জন্য-ই উৎপন্ন হয়েছিল, পরে গীতি ও পাঠ্য অংশ যুক্ত হয়ে এটি উপরূপকপদে উন্নীত হয়।

সাহিত্যদর্পণে দ্বিসন্ধি ও চতুঃসন্ধি নাট্যরাসকের দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে 'নর্মবতী' ও 'বিলাসবতী'।

১১.কাব্য ঃ

নাট্যদর্পণের লক্ষণ অনুসারে ছন্দোময় ও সঙ্গীতময় উপরূপকবিশেষের নাম কাব্য। অসাধারণ কাব্যময়তার কারণে এটি অন্বর্থসংজ্ঞক। এটি আক্ষিপ্তিকা ও ভগ্নতালের দ্বারা সুশোভিত, মাত্রাধ্রুবকসংযুক্ত এবং বর্ণ, পদ্ধতিকা ও ছর্দনিকা নামক ছন্দের দ্বারা সমন্বিত।

সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণ আরো বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। তদনুসারে – একাঙ্ক, হাস্য ও শৃঙ্গাররসপূর্ণ সংলাপসমন্বিত, খণ্ডমাত্রা-দ্বিপদী-ভগ্নতালের দ্বারা শোভিত, বর্ণমাত্রা ও ছড্ডনিকা নামক ছন্দোযুক্ত উপরূপকের নাম কাব্য। এর নায়ক ও নায়িকা উভয়ে-ই উচ্চকুলোদ্ভব ও ধীরোদাত্তলক্ষণসম্পন্ন।

কাব্যে মুখ, প্রতিমুখ ও নির্বহণ সন্ধি থাকে; গর্ভ ও বিমর্শসন্ধি থাকে না। ভাবপ্রকাশন ও নাটকলক্ষণরত্নকোশে কাব্যে চতুর্বিধ বৃত্তির প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। দর্পণকার অবশ্য এখানে আরভটীবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।

ভাবপ্রকাশনে 'কাব্য' নামক উপরূপকটি-র দুটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি নাট্যদর্পণ, সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুরূপ । এই লক্ষণবিশিষ্ট কাব্যের উদাহরণরূপে এই গ্রন্থে 'গৌড়বিজয়'-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভাবপ্রকাশনে প্রদত্ত কাব্যের দ্বিতীয় লক্ষণ অনুসারে কাব্য নামক উপরূপকে বিট, অমাত্য বা বণিকের পুত্র-কন্যারা নায়ক-নায়িকা হন। এটিতে বিট-চেট প্রভৃতির বেশভূষা ও আচার-আচরণের বহুল বর্ণনা থাকে । এর বিষয়বস্তু হয় কবিকল্পিত। এই প্রকার কাব্যের উদাহরণরূপে 'সুগ্রীবকেলনম্'-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

কাব্যের উদাহরণরূপে সাহিত্যদর্পণে 'যাদবোদয়' এবং নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'উৎকণ্ঠিতমাধব'-এর নাম পাওয়া যায়।

১২.ভাণ বা ভাণক ঃ

নাট্যদর্পণসম্মত পরবর্তী আলোচ্য উপরূপকটির নাম ভাণ বা ভাণক। দ্বাদশপ্রকার রূপকের মধ্যে ভাণ অন্যতম। রূপক ভাণ এবং উপরূপক ভাণ চরিত্রগত দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নাম দুটি এক হওয়ার কারণে সম্ভাব্য ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য এই আলোচনায় ভাণের পরিবর্তে ভাণক শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

নাট্যদর্পণোক্ত লক্ষণ অনুসারে ভাণক মূলতঃ বিষ্ণু,শিব,সূর্য,ভবানী,স্কন্দ অর্থাৎ কার্তিকেয়, প্রমথাধিপতি অর্থাৎ মহাদেব প্রমুখের স্তব ও স্তুতি দ্বারা রচিত। এতে উল্লিখিত দেবগণের উদ্ধত, তেজস্বিতাপূর্ণ কার্যকলাপের বিবরণ থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য নানাবিধ ঘটনার বর্ণনা-ও থাকে। এই উপরূপকটি স্ত্রীচরিত্রবর্জিত। বিবিধ বিচিত্র ও আকর্ষণীয় ঘটনা, যা মঞ্চে অভিনয় করা দুঃসাধ্য,সেইরকম বিষয়সমূহ ভাণকের উপজীব্য।

ভাষাগত ভাবে এই ভাণককে তিনভাগে ভাগ করা যায় –

ক. শুদ্ধ – যেটি বিশুদ্ধ ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে রচিত

খ. সঙ্কীর্ণ – যেটি সংস্কৃত, প্রাকৃত উভয় ভাষার মিশ্রণে রচিত এবং

গ. চিত্র – এটি নানাধরণের ভাষায় নির্মিত এবং নানাবিধ বিচিত্র কার্যকলাপসমন্বিত।

আবার চরিত্রগত দিক থেকে-ও ভাণককে তিনভাগে ভাগ করা যায় –

ক. উদ্ধত – এটি নানাপ্রকার উগ্র-উদ্ধত কর্মের বর্ণনার দ্বারা উজ্জ্বল

খ. ললিত – বিভিন্ন ললিত, কমনীয়, মৃদুস্বভাবের ঘটনাবলীর দ্বারা সুশোভিত

গ. ললিতোদ্ধত – উগ্র ও কমনীয় উভয়বিধ কার্যকলাপের দ্বারা নির্মিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভাণকের লক্ষণ ও তার প্রকারভেদ বিষয়ে নাট্যদর্পণে যা-যা বলা হয়েছে, ভাবপ্রকাশনের আলোচনাটি অবিকল অনুরূপ। আরো উল্লেখ্য, সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে 'ভাণক' নামে কোনো উপরূপক স্বীকার করা হয়নি।

আরো একটি বিষয় এই আলোচনায় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। নাট্যতত্ত্বমূলক যাবতীয় গ্রন্থে রূপক ভাণের যে-যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত লক্ষণসমন্বিত একটি উপরূপক ভাবপ্রকাশনগ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে। সেটি ভাণকের-ই একটি ভেদ, নাম 'নন্দিমালী'। স্ত্রীচরিত্রবর্জিত এই নন্দিমালীতে একজনমাত্র বিট আকাশভাষিতের দ্বারা সমগ্র অভিনয়টি নিষ্পন্ন করে। বলা বাহুল্য, রূপক ভাণের মূল লক্ষণটি অবিকল এর অনুরূপ।

সাহিত্যদর্পণাদি অন্যান্য গ্রন্থে 'ভাণক' নামে কোনো উপরূপক স্বীকার করা হয়নি।

১৩.ভাণিকা ঃ

প্রধানতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর কার্যকলাপ যার বিষয়বস্তু, যা গাথাদি বর্ণ ও মাত্রার দ্বারা সমন্বিত এবং নানাবিধ সুকুমার ললিত প্রয়োগের দ্বারা শোভিত – এরূপ ভাণককে-ই 'ভাণিকা' বলা হয়। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর বিচারে ভাণক ও ভাণিকা অনুরূপ। ভাণকে উগ্র-উদ্ধত ঘটনাবলীর বর্ণনা, ভাণিকায় ললিত-মধুর কার্যাবলীর বর্ণনা – এইমাত্র এদের পার্থক্য। নাট্যদর্পণে তাই বলা হয়েছে –

"প্রায়ো হরিচরিতযুতঃ স্বীকৃতগাথাদিবর্ণমাত্রস্য।

সুকুমারতঃ প্রয়োগাৎ ভাণো2পি হি ভাণিকা ভবতি ॥" [৪০]

উল্লেখ্য, নাট্যদর্পণ ও ভাবপ্রকাশনে উক্ত ভাণিকালক্ষণ দুটি অবিকল অনুরূপ।

সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভাণিকার নায়ক হবে নীচশ্রেণীর ; কিন্তু নায়িকা হবেন উত্তম প্রকৃতির। ভাবপ্রকাশনে আরো বিশদে বলা হয়েছে, এর নায়ক হবেন বিট। এতে পীঠমর্দ ও বিদূষকের চরিত্র থাকবে এবং কোনো দিব্যচরিত্রের অবতারণা করা যাবে না।

একাঙ্ক এই উপরূপকে কেবল মুখ ও নির্বহণ সন্ধি থাকে। ভাবপ্রকাশনে অবশ্য এতে প্রতিমুখসন্ধির প্রয়োগের কথা-ও বলা হয়েছে। এর অঙ্গীরস শৃঙ্গার। এতে কৈশিকী ও ভারতী বৃত্তির প্রাধান্য। ভাবপ্রকাশনমতে এটি পাঞ্চালী রীতিতে নির্মিত এবং দশবিধ লাস্যাঙ্গসমন্বিত।

ভাণিকা নামক উপরূপকটি নায়ক-নায়িকার উজ্জ্বল, বিচিত্র, সূক্ষ্ম বেশভূষার বর্ণনায় মনোহর। ভাবপ্রকাশনে এতে ব্যবহর্তব্য বহুবিধ তালের প্রয়োগের কথা-ও বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অভিনয়-গেয়-পাঠ্য সর্বপ্রকার ভিত্তিতে এই উপরূপকটি অত্যুজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছল এবং মনোহর।

সাহিত্যদর্পণ, নাটকলক্ষণরত্নকোশাদি গ্রন্থে ভাণিকার সাতটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। দর্পণকারের মতে সেগুলি হল – উপন্যাস, বিন্যাস, সাধ্বস্, সমর্পণ, সংহার, বিবোধ এবং নিবৃত্তি। আচার্য সাগরনন্দী শেষদুটি পদের পরিবর্তে যথাক্রমে বিরোধ এবং অনুবৃত্তি – এই পদদুটি স্বীকার করেছেন। ভাবপ্রকাশনকার এবিষয়ে নীরব।

ভাণিকার উদাহরণরূপে সাহিত্যদর্পণ ও নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'কামদত্তা', ভাবপ্রকাশনে 'বীণাবতী' ইত্যাদি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

নাট্যদর্পণে উপরূপকবিষয়ক বিবরণ এই অবধি। এবার সংস্কৃত সাহিত্যে উপরূপকসমূহের উদ্ভব ও তার স্থান বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে এই আলোচনার ইতি টানা যাক্ ।

'উপরূপক' শব্দটি 'উপ'-উপসর্গযোগে নির্মিত। এর নানাবিধ অর্থের মধ্যে একটি হল সামীপ্য বা নৈকট্য। বলা বাহুল্য, এই নৈকট্য রূপকের নিরিখে। বলার অর্থ, উপাদানগত, চরিত্রগত, রসগত

বিভিন্ন দিক থেকে উপরূপকগুলির মান প্রায় রূপকের-ই মত; রূপকের প্রায় অনুরূপ, অতিনিকট; রূপক অপেক্ষা সামান্য ন্যূন। প্রশ্ন,এই ন্যূনতার কারণটি কি? আকার না উৎকর্ষ? আকৃতিগত ন্যূনতা যদি রূপক ও উপরূপকের পার্থক্যের হেতু হয়, তবে বীথী-ব্যায়োগ-অঙ্ক-ভাণ ইত্যাদি একাঙ্ক রূপকগুলির উপরূপকসংজ্ঞা হওয়া উচিৎ। বিপরীতক্রমে উল্লিখিত রূপকগুলির তুলনায় বৃহত্তর নাটিকা-ত্রোটক-সট্টক-প্রকরণিকা ইত্যাদির রূপকসংজ্ঞা হওয়া উচিৎ। আবার যদি গুণগত অপকর্ষ উপরূপকত্বের কারণ হয়, তবে ভাণ, প্রহসনাদি নিকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যগুলিকে কোনোভাবে-ই রূপক বলা চলে না। বিপরীতে নাটিকা, ত্রোটকাদির ন্যায় উৎকৃষ্ট উপরূপকগুলিকে রূপকশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তাহলে এই প্রভেদের প্রকৃত ভিত্তিটি কি? নাট্যদর্পণে প্রাঞ্জলভাবে একটি বাক্যে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে – 'এতানি চ স্বল্পমাত্ররঞ্জননিমিত্তত্বাদ্....' [৪১]– স্বল্পরঞ্জকতার কারণে এগুলি অর্থাৎ উপরূপকগুলি রূপক অপেক্ষা গৌণ। রসাত্মক কাব্যের মূল প্রয়োজন যেটি, অর্থাৎ রসাস্বাদন বা রসচর্বণা – সেটি-ই রূপক ও উপরূপকসমূহের চারিত্রিক ভেদের মূল কারণ। রূপকে রস প্রধান, উপরূপকে রস গৌণ। রূপকে প্রধানভাবে রসের সর্বতোমুখী স্ফুরণ; উপরূপকে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির মত রস একটি সামান্য উপাদানমাত্র, প্রধান নয়। বিচারপূর্বক বলা যেতে পারে, নাট্যদর্পণে প্রদত্ত এই অভিমতটি সুচিন্তিত এবং যথেষ্ট যুক্তিসহ।

উপরূপকসংক্রান্ত আলোচনার প্রারম্ভে-ই বলা হয়েছে, নাট্যদর্পণে মূল কারিকার মধ্যে এদের আলোচনা নেই। টীকার অন্তিম অংশে এগুলির সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। এর কারণস্বরূপ প্রথমটি হল এগুলির রসসৃষ্টির অক্ষমতা এবং দ্বিতীয় কারণটি হল মহর্ষি ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে এদের অনুল্লেখ। নাট্যশাস্ত্রে উপরূপকের আলোচনা না থাকার কারণ, সম্ভবতঃ নাট্যশাস্ত্র রচনার পূর্বে এদের উদ্ভব হয়নি। উপরূপকবিষয়ক আলোচনার প্রথম প্রবক্তা রূপে আচার্য কোহলের নাম প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। নাট্যদর্পণ গ্রন্থের-ই একটি উক্তি এবিষয়ে প্রণিধেয়– '..... তেন কোহলপ্রণীতলক্ষমাণাঃ সট্টকাদয়ো ন লক্ষ্যন্তে'[৪২]– বক্তব্য হল, মহর্ষি ভরত দ্বারা উল্লিখিত না হওয়ার কারণে আচার্য কোহলের দ্বারা উল্লিখিত ও নিরূপিতলক্ষণ হলে-ও সট্টকাদির লক্ষণ এই গ্রন্থে বিচারিত হবে না।

অপর একটি বিষয় এখানে দৃষ্টি আকর্ষণের অপেক্ষা রাখে। দৃশ্যকাব্যের এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পরঞ্জক ভেদগুলির 'উপরূপক' সংজ্ঞা প্রথম উচ্চারিত হয়েছে সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে। তৎপূর্বসূরীদের কেউ-ই কিন্তু এই বিশেষ শব্দটির ব্যবহার করেননি। আচার্য কোহল এগুলিকে দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য ভেদরূপে উল্লেখ করেছেন। ভোজদেব তাঁর 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' গ্রন্থে 'প্রেক্ষ্যপ্রবন্ধ' (অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য)-কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন – বাক্যার্থাভিনয় ও পদার্থাভিনয়। অধুনাতন সংজ্ঞানুসারে প্রথমটি রূপক ও দ্বিতীয়টি উপরূপকের লক্ষণাক্রান্ত। কাব্যানুশাসন গ্রন্থে দৃশ্য কাব্যের দুটি ভেদ – পাঠ্য ও গেয়; এবং

গ্রন্থকারের মতে উপরূপকগুলি গেয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং নাট্যদর্পণকারদ্বয় এগুলিকে উপরূপক নামে স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে এগুলি রূপকের অন্য রূপমাত্র। তাই বৃত্তিতে আলোচনার আরম্ভ হচ্ছে এই ভাবে – 'অন্যান্যপি চ রূপকানি দৃশ্যন্তে'।[৪৩]আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে, এগুলি নৃত্য-গীতাত্মক, রসাত্মক নয়। অন্যদিকে দশরূপকের টীকাকার ধনিক স্পষ্টতঃ-ই এগুলিকে কেবলমাত্র নৃত্যভেদ রূপে স্বীকার করেছেন।

উল্লিখিত আলোচনাদৃষ্টে তাই মনে করা যেতে পারে যে, উদ্ভূতির প্রাথমিক অবস্থায় উপরূপকগুলি প্রধানতঃ নৃত্যাত্মক-ই ছিল। পরে এগুলির সঙ্গে পাঠ্য-গেয়-অভিনেয় ইত্যাদি অংশ যুক্ত হয়ে এগুলি উপরূপকের বর্তমান রূপ ধারণ করে। উপরূপকের সংখ্যাবিষয়ে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের বৈমত্য-ও প্রকারান্তরে এর প্রমাণ। এগুলির মধ্যে কোন্‌-টি নৃত্যপ্রধান, কোন্‌-টি যথার্থ উপরূপক – এবিষয়ে নানাজনের নানামত দৃষ্টে স্পষ্টতঃ-ই প্রতীত হয়, কালের দীর্ঘ যাত্রাপথে এগুলির নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ঘটেছে এবং তারপরে-ও রূপক ও নৃত্যের দীর্ঘ ব্যবধানে কোন্‌-কোন্‌টি উপরূপক পদে উন্নীত হতে পেরেছে, তা তর্কের বিষয়।

উপরূপক নামে পরিচিত দৃশ্যকাব্যের এই ভেদগুলি নাট্যশাস্ত্রাদি প্রণীত রূপকাদির ধর্ম থেকে অনেকাংশে পৃথক। কিন্তু এই পার্থক্য যে সর্বত্র নাট্যের প্রগতির সূচনা করতে পেরেছে, তা নয়; বরং এর বিপর্যয়-ই আমরা দেখেছি বেশি।

ডঃ. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক' গ্রন্থে যথার্থ -ই সমীক্ষা করেছেন – ''ব্যতিক্রম প্রগতিরই লক্ষণ। কিন্তু এইসব উপরূপকে যে নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা বিপ্লব বা বিবর্তনের সাক্ষী নহে। নাট্যবন্ধে নির্জীবতা ও শিথিলতারই সূচক।এই ব্যতিক্রম, এই বন্ধশৈথিল্যে ইহাদের অনেকের মধ্যে আমরা দেখি নায়কের নিকৃষ্টতা, কোথাও বা নায়ক 'মূর্খ', কোথাও 'বিধর্মী', কোথাও বা নায়িকা অপেক্ষা নায়ক হীন, আবার কোথাও 'দাস্যবৃত্তিযুক্ত' ব্যক্তিই হইল নায়ক। নায়কচরিত্রে এই সব গুণবিপ্লবের মধ্য দিয়া যদি নাট্যবস্তু, নাট্যচরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইত, তাহা হইলে আপত্তি ছিল না, অধিকন্তু নাট্যনিয়মের গতানুগতিকতার পথে এই পরিবর্তন 'যুগান্তর' সৃষ্টি করিত। কিন্তু তাহা হয় নাই।''[৪৪]

সমাপ্তিশ্লোক ঃ

নাট্যদর্পণের সমাপ্তি হচ্ছে শ্লোকপঞ্চকে নির্মিত একটি স্তবকের মাধ্যমে। তন্মধ্যে প্রথমটি আচার্য হেমচন্দ্রের প্রতি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের শ্রদ্ধার্ঘ্য। সুযোগ্য শিষ্যদ্বয় এই শ্লোকে ব্যাকরণ-ছন্দ-

তর্কবিদ্যা-সাহিত্যতত্ত্বাদি অশেষশাস্ত্রবেত্তা হেমচন্দ্রাচার্যের আশীর্বাদ প্রার্থনাপূর্বক তাঁর উদ্দেশ্যে বিনয়াবনত প্রণাম জ্ঞাপন করেছেন।

পরবর্তী চারটি শ্লোকে গ্রন্থকাররা বহু পরিশ্রমে রচিত তাঁদের 'নাট্যদর্পণ' গ্রন্থের মূল্যায়ন করেছেন। দ্বিতীয় শ্লোকের বক্তব্য হল – যে সকল ব্যক্তি অন্যের রচনার উপর নির্ভর করে যশস্বী হতে চান, যাঁদের নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রচনার ক্ষমতা নেই, অল্পধী সেইসকল সমালোচকরা কোনোদিন-ই অনুভব করতে পারবেন না কত পরিশ্রম ও কত ক্লেশ সহ্য করে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র এই নাট্যদর্পণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

অবশিষ্ট শ্লোকত্রয় সম্পূর্ণতঃ গ্রন্থপ্রশস্তি। গ্রন্থকাররা বলছেন, তাঁদের রচিত বৃত্তি এবং কারিকাগুলি সর্বতোভাবে অনিন্দ্য এবং সুসম্পূর্ণ। এগুলি নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব এবং সর্বথা অর্থবহ। ত্রিস্রোতা জাহ্নবীর তিনটি ধারার ন্যায়, ব্যাকরণ,তর্কবিদ্যা ও সাহিত্যতত্ত্বরূপ বিদ্যার ত্রিবিধ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারদের অবাধ অধিকার এবং স্বচ্ছন্দ বিচরণ গ্রন্থের সর্বত্র অনায়াসলক্ষ্য। পরিশেষে, শ্লোকগুচ্ছের পঞ্চম তথা অন্তিম শ্লোকে নাট্যদর্পণরচয়িতা রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র সুধী বিদ্বন্মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, রূপকাদির স্বরূপ বিষয়ে যদি তাঁদের প্রকৃত জিজ্ঞাসা থাকে, তবে তাঁরা যেন অবশ্য-ই নাট্যতত্ত্বের নির্মল দর্পণস্বরূপ এই 'নাট্যদর্পণ' গ্রন্থের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, আর. এস. নাগর সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ-২৩৮
২. দ্রষ্টব্য ঃ সাহিত্যদর্পণ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ-২৮৬
৩. দ্রষ্টব্য ঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃঃ-০৯
৪. দ্রষ্টব্য ঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ-১৪৩
৫. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, ঐ, পৃঃ-২৪০
৬. দ্রষ্টব্য ঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ঐ, পৃঃ-১০
৭. নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত,পৃঃ-২৮০
৮. তত্রৈব
৯. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, ঐ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ-৩৫১
১০.Types of Sanskrit Drama,D.R.Mankad, পৃঃ-১৮১
১১.দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যশাস্ত্র, ঐ, পৃঃ-৩৫৬-৩৫৭
১২.দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, কে.এইচ. ত্রিবেদী , পৃঃ-১৮২
১৩.নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত,পৃঃ-২৭৯
১৪.তত্রৈব
১৫.নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৮০
১৬.– ১৯. তত্রৈব

২০.নাট্যশাস্ত্র, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ-২৩৩
২১.নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ- ২৮২
২২.তত্রৈব
২৩.তত্রৈব
২৪.নাট্যশাস্ত্র, তত্রৈব
২৫.নাট্যদর্পণ, ঐ,পৃঃ-২৮৪
২৬.তত্রৈব
২৭.তত্রৈব
২৮.The law and practice of Sanskrit Drama,S.N.Sastri, পৃঃ-২২২
২৯.নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৮৫
৩০.তদেব, পৃঃ-২৮৭
৩১.নাট্যশাস্ত্র, ঐ, তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ- ১৯৭
৩২.নাট্যদর্পণ, ঐ, পৃঃ-২৯০
৩৩.নাট্যদর্পণ, কে. এইচ. ত্রিবেদী , পৃঃ- ২০০
৩৪.নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ- ২৯০
৩৫. - ৩৯. তত্রৈব
৪০.তদেব,পৃঃ-২৯১
৪১.তত্রৈব
৪২.তদেব, পৃঃ-১৭২
৪৩.তদেব, পৃঃ-২৯০
৪৪.ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-১৭২

বর্তমানে আলোচ্য অধ্যায়টির বিষয় হল নাট্যদর্পণের উপর পূর্ববর্তী গ্রন্থরাজির প্রভাব এবং পরবর্তী গ্রন্থসমূহের উপর নাট্যদর্পণের প্রভাব। নাট্যদর্পণের উপর নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী টীকা, দশরূপক, শৃঙ্গারপ্রকাশ ইত্যাদি গ্রন্থের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। রচনার প্রতি মূহুর্তে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি যে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের মানসনেত্রে বিরাজমান ছিল, নাট্যদর্পণের মনোযোগী পাঠকের সামনে তা স্পষ্ট। তুলনায় কাব্যানুশাসন, ধ্বন্যালোক, কাব্যপ্রকাশ ইত্যাদি গ্রন্থের খুব বেশি প্রভাব নাট্যদর্পণে অনুমিত হয় না। কেবলমাত্র বিশেষ কোনো বিষয় আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থগুলির মতবিমর্শ দেখা যায়, সামগ্রিক আলোচনায় নয়।

নাট্যদর্পণ-পরবর্তী সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে নাট্যদর্পণের প্রভাব প্রায় নেই বললে-ই চলে। নাট্যদর্পণে উক্ত ও ব্যাখ্যাত বেশ কিছু অভিনব ও সুচিন্তিত মতামত পরভাবী পণ্ডিতবর্গের কাছে কেন আদৃত হয়নি, তা বোঝা দুষ্কর। যে কোন কারণে-ই হোক্, পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে নাট্যদর্পণের এই অভিমতগুলির ছায়ামাত্র-ও পরিলক্ষিত হয় না ।

যাই হোক্, আমরা এবার নাট্যদর্পণ এবং নাট্যতত্ত্বসংক্রান্ত অন্যান্য গ্রন্থগুলির তুলনামূলক আলোচনায় প্রবেশ করি।

নাট্যদর্পণ এবং নাট্যশাস্ত্র ঃ

মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্র ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের অধুনালভ্য প্রাচীনতম গ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে-ই এই গ্রন্থের প্রাচীনতার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে–'যস্ত্বয়া কথিতো হ্যেষ নাট্যবেদঃ পুরাতন' (না.শা.৩৬/৭)।এই মহাগ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্কলন এবং ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় তার বর্তমান আকার পরিগ্রহ করেছিল। তবে পরবর্তীকালে-ও কিছু-কিছু বিষয় এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে বলে মনে হয়। নাট্যশিক্ষক, পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শক, সমালোচক–এককথায় নাট্যতত্ত্বের সমস্ত প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে এই গ্রন্থটি রচিত।কেবল নাট্যতত্ত্ব নয়, অলঙ্কার-সঙ্গীত-নৃত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে-ও এই গ্রন্থটি প্রাচীনতম পথপ্রদর্শক। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে-ও নাট্যশাস্ত্রের অবদান অসামান্য। এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধ রসসূত্রটিকে ভিত্তি করে রসনিষ্পত্তিবিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে রসের ব্রহ্মাস্বাদসহোদরত্ব, চমৎকারিত্ব, লোকোত্তরত্ব ইত্যাদি যে-সকল নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা আছে, তার মূল হল ভরতের রসসূত্র।

বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে দু'ভাবে মহর্ষি ভরতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়– আদিভরত বা বৃদ্ধভরত এবং ভরত। নাট্যশাস্ত্রের-ও দুটি গ্রন্থ পাওয়া যায়– নাট্যবেদাগম এবং নাট্যশাস্ত্র। প্রথম

গ্রন্থটি দ্বাদশসাহস্রী এবং দ্বিতীয়টি ষট্‌সাহস্রী রূপে পরিচিত। নাট্যশাস্ত্রের অধ্যায়সংখ্যা নিয়ে-ও বৈমত্য দেখা যায়। প্রাচীন টীকাকারদের মতে এটি ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। আচার্য অভিনবগুপ্ত এই গ্রন্থটিকে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়বিশিষ্ট বলে স্বীকার করলে-ও, সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ের উপর-ও টীকা রচনা করেছেন।

বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই নাট্যশাস্ত্র 'ভারতীয় ললিতকলার বিশ্বকোষ' রূপে যথার্থ-ই অভিহিত। কালক্রমে এই গ্রন্থটি ভারতীয় নাট্য ও সাহিত্যমীমাংসায় প্রায় ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করে। পরভাবী প্রত্যেক নাট্যতত্ত্ববিদ্ নিখিলতত্ত্ববেত্তা, পণ্ডিতপ্রবর মহর্ষি ভরতের প্রতি তাঁদের ভক্তিনম্র অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন। নাট্যতত্ত্বের সমুদ্রোপম পরিধির প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এঁরা প্রত্যেকে তাঁর কাছে শ্রদ্ধাবনত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। এপ্রসঙ্গে দশরূপককার ধনঞ্জয়ের নামটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে, যিনি তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকে একাসনে দশাবতারে অবতীর্ণ ভগবান বিষ্ণু এবং দশবিধ রূপকের ব্যাখ্যাতা ও প্রযোক্তা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত– এই দুজনের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন করেছেন।

নাট্যদর্পণ গ্রন্থের রচয়িতা রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-ও অন্যান্যদের মত-ই নাট্যশাস্ত্রের কাছে অশেষ ঋণী। প্রাগ্‌ভাবী গ্রন্থসমূহের মধ্যে নাট্যশাস্ত্র-ই আদর্শ এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য হওয়ার কারণে, এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়সমূহের নির্বাচনে তো বটে-ই, বহু ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলির লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে-ও নাট্যদর্পণকাররা একান্তভাবে নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণ করেছেন। যেহেতু আমার গবেষণার মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই তুলনাগুলি স্পষ্টতঃ নির্দেশ করা হয়েছে, তাই আলোচ্যমান এই অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে এবং অল্পসংখ্যক উদাহরণযোগে নাট্যদর্পণের উপর নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

নাট্যদর্পণরচনাবসরে গ্রন্থকাররা যে নাট্যশাস্ত্রকে-ই প্রামাণ্য রূপে স্বীকার করেছেন, নাট্যতত্ত্বের অন্য কোনো গ্রন্থকে নয়, তার কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে –

১. নাট্যদর্পণের মূল কারিকা অংশে উপরূপকসমূহের আলোচনা নেই। বৃত্তির একেবারে শেষ অংশে অতি সংক্ষিপ্তভাবে এগুলির লক্ষণনির্ণয় করা হয়েছে। এর কারণরূপে বলা হয়েছে, যেহেতু এদের রঞ্জকতাগুণ স্বল্প এবং সেই কারণে মহর্ষি ভরত এগুলির আলোচনা করেননি, সেহেতু নাট্যদর্পণে-ও এদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হল না। (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ.পৃঃ-২৯১)

২. 'মালতীমাধব' প্রকরণে কৈশিকীবৃত্তির অতিব্যবহারের জন্য নাট্যকার ভবভূতির সমালোচনা করেছেন নাট্যদর্পণকারদ্বয়। তাঁদের মতে, প্রকরণে কৈশিকী বৃত্তির অত্যধিক প্রয়োগ ভরতকথিত অভিমতের পরিপন্থী এবং সেই কারণে-ই তা দোষদুষ্ট। (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ.পৃঃ-২৩২)

৩. যে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা বলেছেন,নাটকের নায়ক সর্বদা ধীরোদাত্ত প্রকৃতির হবেন, নাট্যদর্পণে তাঁদের সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ নাট্যশাস্ত্রে এরূপ কোনো মত পোষণ করা হয়নি। (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ.পৃঃ-১৭৪)

৪. যাঁদের মতে, প্রকরণের নায়ক হবেন কেবলমাত্র ধীরপ্রশান্ত প্রকৃতির কোনো অমাত্য, নাট্যদর্পণে সেই পূর্বাচার্যদের মতের সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ এক-ই। মহর্ষি ভরত এবিষয়ে সহমত পোষণ করেননি। (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ.পৃঃ-২৩০)

৫. ধ্রুবাবিষয়ক আলোচনায় নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, প্রাবেশিকী এবং আক্ষেপিকী ধ্রুবার পর প্রাসাদিকী ধ্রুবার প্রয়োগ অবশ্য-ই করতে হবে। মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রে এই অভিমত পোষণ করেছেন; অতএব তা অবশ্যমান্য। (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ-২৮০)

নাট্যশাস্ত্রোক্ত মতের বিরুদ্ধ অভিমতের এই সমালোচনাদৃষ্টে স্পষ্ট-ই বুঝতে পারা যায়, নাট্যদর্পণকারদের কাছে নাট্যশাস্ত্রের প্রামাণ্য-ই ছিল সর্বাধিক।

নাট্যদর্পণে বৃত্তির কিছু স্থলে নাট্যশাস্ত্রের কারিকাগুলি অবিকল উদ্ধার করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

১. 'ভাণ' নামক রূপকভেদের আলোচনায় ভরতোক্ত দশবিধ লাস্যাঙ্গের নাম অবিকল উদ্ধার করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ না.শা. ১৯/১১৯,১২০, পৃঃ-৬৫-৬৬ এবং না.দ.পৃঃ-২৩৬)

২. চৌষট্টি প্রকার সন্ধ্যঙ্গের আলোচনার পর নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, কোনো কোনো পূর্বাচার্যের মতে একুশ প্রকার সন্ধ্যন্তর রয়েছে এবং এরপর নামোল্লেখ না করে ভরতোক্ত একুশপ্রকার সন্ধ্যন্তরের তালিকাটি উদ্ধার করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ না. শা. ১৯/১০৭-১০৯, পৃঃ- ৬২-৬৩ এবং না.দ. পৃঃ - ২২৯)

৩. রসবিমর্শে মহর্ষি ভরতের বিখ্যাত রসসূত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ না.শা. ৬/৩২, পৃঃ - ২৭১ এবং না. দ. পৃঃ- ২৫৮)

৪. নান্দী বিষয়ক আলোচনাবসরে মহর্ষি ভরতকথিত নান্দীলক্ষণ থেকে পরপর চারটি শ্লোক অবিকল উদ্ধার করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ না.শা. ৫/১০৫-১০৮, পৃঃ-২৪০ এবং না.দ. পৃঃ-২৭৮) ।এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আচার্য ভরতের নামোল্লেখপূর্বক এই শ্লোকগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। নাট্যদর্পণগ্রন্থের ক্ষেত্রে এটি এক বিরল ঘটনা। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র কোনো মতবিশেষের সমালোচনা বা খণ্ডনের সময় সেই মতের প্রবক্তা আচার্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই উদাহরণ-ও সংখ্যায় খুব কম। মহর্ষি ভরত হলেন একমাত্র আচার্য এবং নান্দী আলোচনাটি হল একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে নাট্যদর্পণের রচয়িতারা পূর্বাচার্যের নামোল্লেখপূর্বক তাঁর অভিমতের উল্লেখ করেছেন।

কেবলমাত্র বৃত্তিতে নয়, নাট্যদর্পণের কারিকা রচনার ক্ষেত্রে-ও গ্রন্থকাররা নাট্যশাস্ত্রের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বহু ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণগুলির অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করে কারিকায় ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ –

১. আঙ্গিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে কি-কি অঙ্গ ও উপাঙ্গের ব্যবহার হবে, তার বিবরণটি নাট্যদর্পণ ও নাট্যশাস্ত্রে প্রায় অনুরূপ –

নাট্যদর্পণ–"অঙ্গৈঃ শিরোহস্তবক্ষঃকটীপার্শ্বপাদাদিভিরুপাঙ্গৈশ্চ।

নেত্রভ্রূপক্ষ্মাধরকপোলচিবুকাদিভিঃ......... ॥" (না.দ. পৃঃ-২৭৭)

নাট্যশাস্ত্র–"তস্য শিরোহস্তোরঃপার্শ্বকটীপাদতঃ ষড়ঙ্গানি।

নেত্রভ্রূনাসাধরকপোলচিবুকান্যুপাঙ্গানি ॥"(না.শা. ৮/১৩, পৃঃ-০২)

২. সন্ধ্যঙ্গগুলির লক্ষণনির্ণয়ের ক্ষেত্রে বহু স্থলে নাট্যদর্পণ নাট্যশাস্ত্রের প্রায় অবিকল অনুসারী। 'তাপ' নামক প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গের লক্ষণটি তুলনা করা যেতে পারে–

নাট্যদর্পণ– 'অপায়দর্শনং তাপঃ' (না.দ. ১/৪৯, পৃঃ- ৫১)

নাট্যশাস্ত্র – 'অপায়দর্শনং যত্তু তাপনং নাম তদ্ভবেৎ'(না.শা. ১৯/৭৭, পৃঃ- ৪৪)

৩. 'রূপ' নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের লক্ষণদুটি তুলনা করা যেতে পারে –

নাট্যদর্পণ– 'রূপং নানার্থসংশয়ঃ' (না.দ. ১/৫৩, পৃঃ - ৫৪)

নাট্যশাস্ত্র –'চিত্রার্থসমবায়ে তু বিতর্কো রূপমিষ্যতে' (না.শা. ১৯/৮৩, পৃঃ- ৪৮)

৪. 'সময়' নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের লক্ষণদুটি তুলনা করা যেতে পারে –

নাট্যদর্পণ– 'সময়ো দুঃখনির্যাসঃ' (না.দ. ১/৬৪, পৃঃ-৬৮)

নাট্যশাস্ত্র – 'দুঃখস্যাপগমো যস্তু সময়ঃ স নিগদ্যতে' (না.শা. ১৯/১০১, পৃঃ-৫৯)

৫. নাটকের নায়কভেদ সম্পর্কিত আলোচনায় উভয় গ্রন্থে এক-ই মত পোষণ করা হয়েছে। উভয়ত্র-ই বলা হচ্ছে সেনাপতি ও অমাত্যগণ ধীরোদাত্ত প্রকৃতির হবেন –

নাট্যদর্পণ– 'ধীরোদাত্তাঃ সৈন্যেশমন্ত্রিণঃ' (না.দ. ১/৭, পৃঃ-১০)

নাট্যশাস্ত্র– 'সেনাপতিরমাত্যশ্চ ধীরোদাত্তৌ প্রকীর্তিতৌ' (না.শা. ২৪/১৮,পৃঃ- ২৪৪)

এতদ্ব্যতীত নাট্যদর্পণের বহু স্থলে গ্রন্থকাররা নাট্যশাস্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মতের নির্যাসটুকু এবং বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি গ্রহণ করে বিষয়টি নিজেদের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ –

১. নাটকে প্রাকৃতভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের যে তালিকাটি নাট্যশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, নাট্যদর্পণে-ও সেই তালিকার অন্তর্গত সর্বপ্রকার ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে –

নাট্যদর্পণ– "বাল-ষণ্ঢ- গ্রহগ্রস্ত-মত্ত-স্ত্রীরূপযোষিতাম্ ।

প্রাকৃতেনোত্তমস্যাপি দারিদ্র্যৈশ্বর্যমোহিনঃ ॥" (না.দ. ৪/৪০, পৃঃ- ১৬৫)

নাট্যশাস্ত্র– "বালে গ্রহোপসৃষ্টে চ স্ত্রীণাং স্ত্রীপ্রকৃতৌ তথা।

নীচে মত্তে সলিঙ্গে চ প্রাকৃতং পাঠ্যমিষ্যতে ॥

ঐশ্বর্যেন প্রমত্তানাং দারিদ্র্যেণ প্লুতাত্মনাম্।

অনধীতোত্তমানাং চ সংস্কৃতং ন প্রযোজয়েৎ ॥" (না.শা.১৭/৩৪, ৩৫,পৃঃ- ২৭৪)

২. নাট্যদর্পণগ্রন্থে স্ত্রীদের যৌবনস্থ ধর্মবিষয়ক আলোচনায় ভাব, হাব ও হেলা এই ত্রিবিধ অঙ্গজ ভাবকে পরস্পরসম্ভূত বলা হয়েছে, নাট্যশাস্ত্রের অবিকল অনুসরণে –

নাট্যদর্পণ–'এতে চ ত্রয়ো 2ঙ্গজাঃ পরস্পরসমুত্থিতা অপি ভবন্তি' (না.দ. পৃঃ- ২৮৪)

নাট্যশাস্ত্র – 'হেলা হাবশ্চ ভাবশ্চ পরস্পরসমুত্থিতাঃ' (না.শা. ২২/৭, পৃঃ- ১৪৯)

৩. নাট্যদর্পণধৃত প্রতিমুখসন্ধির লক্ষণে-ও নাট্যশাস্ত্রের ছায়া স্পষ্ট–

নাট্যদর্পণ – 'প্রতিমুখং কিয়ল্লক্ষ্যবীজোদ্ঘাটসমন্বিতঃ' (না.দ. ১/৩৮, পৃঃ - ৩৯)

নাট্যশাস্ত্র – "বীজস্যোদ্ঘাটনং যত্র দৃষ্টনষ্টমিব ক্বচিৎ।

মুখন্যস্তস্য সর্বত্র তদ্বৈ প্রতিমুখং স্মৃতম্ ॥" (না.শা. ১৯/৪০, পৃঃ- ২৪)

৪. সমবকার আলোচনার সময় ঘটিকার কালমান বিষয়ে নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে – 'মুহূর্তো ঘটিকাদ্বয়ম্' (না.দ.পৃঃ-২৬৫) – অর্থাৎ দুই ঘটিকা যাবৎ সময়কালকে মুহূর্ত বলা হয়। ভাষান্তরে বলা যেতে পারে, এক ঘটিকা অর্থাৎ অর্ধমুহূর্ত। নাট্যশাস্ত্রে ঘটিকার পরিবর্তে 'নাড়ী' বা 'নালিকা' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। পরিভাষাটি পৃথক হলে-ও, কালমানের বিচারে ঘটিকা ও নাড়ী কিন্তু সমান। নাট্যশাস্ত্রে-ও বলা হয়েছে এক নাড়ী হল অর্ধমুহূর্ত যাবৎ পরিমিত কাল – 'নাড়ীসংজ্ঞা জ্ঞেয়া মানং কালস্য যন্মুহূর্তার্ধম্' (না.শা. ১৮/৬৭, পৃঃ- ৩২৩)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে নালিকা ও ঘটিকাকে সমমান বলে স্বীকার করা হলে-ও, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, দশরূপক ইত্যাদি গ্রন্থে নালিকার কালমান নাট্যশাস্ত্রসম্মত মানের দ্বিগুণ– 'নালিকা চ ঘটিকাদ্বয়ম্' (দশ.রূ. তৃতীয় প্রকাশ,পৃঃ-৬২)। নাট্যদর্পণের রচয়িতারা কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থগুলির পরিবর্তে নাট্যশাস্ত্রের অভিমতটি-ই গ্রহণ করেছেন।

নাট্যশাস্ত্রকার মহর্ষি ভরত নাট্যদর্পণ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকারে অভিহিত হয়েছেন। একমাত্র নান্দী আলোচনার সময় 'ভরতমুনি' বলে নামোল্লেখপূর্বক তাঁর অভিমতের উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থের অন্যান্য স্থলে 'মুনি', পূর্বমুনি', 'বৃদ্ধ', 'পূর্বাচার্য', 'নাট্যাচার্য' ইত্যাদি পদের দ্বারা তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর অভিমতগুলি আলোচনার সময় 'মুনিসামান্য', 'বৃদ্ধসম্প্রদায়' অথবা 'বৃদ্ধাভিপ্রায়' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত বেশ কিছু স্থলে 'কেচিৎ', 'অপরে', 'অন্যে' ইত্যাদি পদের আবরণে প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি ভরতের অভিমতগুলি-ই উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ –

১. 'পূর্বভাব' নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে কোনো কোনো আচার্য 'পূর্বভাব' শব্দের পরিবর্তে 'পূর্ববাক্য' শব্দটি স্বীকার করেন– 'পূর্ববাক্যমঙ্গমস্য স্থানে কেচিদামনন্তি' (না.দ.পৃঃ-২২৭)। এখানে প্রকৃতপক্ষে 'কেচিৎ' পদের দ্বারা মহর্ষি ভরতের কথা-ই বলা হয়েছে, কারণ তিনি পূর্বভাবের পরিবর্তে পূর্ববাক্য শব্দের ব্যবহার করেছেন–'পূর্ববাক্যং তু বিজ্ঞেয়ং যথোক্তার্থপ্রদর্শনম্' (না. শা. ১৯/১০৩, পৃঃ - ৫৯)।

২. 'দ্যুতি' নামক বিমর্শসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, কোনো কোনো আচার্যের মতে 'তর্জন' এবং 'আধর্ষ' অর্থাৎ ন্যক্কারজনক বাক্যের নাম দ্যুতি– 'অপরে তু তর্জনাধর্ষণে দ্যুতিং মন্যন্তে' (না.দ.পৃঃ- ২১৬)। এখানে-ও 'অপরে' পদটির দ্বারা মহর্ষি ভরতের কথা বলা হয়েছে, কারণ নাট্যশাস্ত্রে-ই দ্যুতির এই লক্ষণটি নির্ণীত হয়েছে–'বাক্যমাধর্ষসংযুক্তং দ্যুতিস্তজ্জৈরুদাহৃতা' (না.শা. ১৯/৯২, পৃঃ-৫৪)।

৩. 'উপাস্তি' নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, কোনো কোনো পূর্বাচার্য 'উপাস্তি'-র পরিবর্তে 'প্রসাদ' শব্দটি স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে প্রিয়কার্যসম্পাদনের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের প্রসন্নতাবিধানের নাম 'প্রসাদ' – 'অন্যে ত্বস্য স্থানে প্রিয়হিতাচরণজনিতাং প্রসত্তিং প্রসাদমঙ্গং মন্যন্তে' (না.দ.পৃঃ- ২২৩)। মহর্ষি ভরত 'উপাস্তি'র পরিবর্তে 'প্রসাদ' শব্দের গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মতে, শুশ্রূষাদিব্যাপারযুক্ত প্রিয়বিষয়ের দ্বারা প্রসন্নতাবিধানের নাম 'প্রসাদ'– 'শুশ্রূষাদ্যুপসম্পন্নঃ প্রসাদঃ প্রতিরুচ্যতে' (না.শা. ১৯/১০১,পৃঃ-৫৯)। অতএব দেখা যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে-ও 'অন্যে' পদটির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি ভরতের মতটি-ই উল্লিখিত হয়েছে।

নাট্যদর্পণের উপর নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব যে কতখানি, উল্লিখিত আলোচনাদৃষ্টে তা স্পষ্ট প্রতীত হয়। তবে এমন-ও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে নাট্যদর্পণকাররা নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে নাট্যদর্পণের এই বৈমত্যের বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

১. নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যদর্পণের প্রথম এবং সম্ভবতঃ প্রধানতম মতপার্থক্যটি রূপকের সংখ্যাবিষয়ক। নাট্যশাস্ত্রানুসারে প্রধান রূপকের সংখ্যা দশটি। নাট্যদর্পণে কিন্তু এই দশটির সঙ্গে নাটিকা ও প্রকরণিকা-কে যুক্ত করে মোট দ্বাদশপ্রকার রূপক স্বীকার করা হয়েছে।

২. সন্ধ্যঙ্গবিষয়ক আলোচনার শেষে নাট্যশাস্ত্রসম্মত একুশপ্রকার সন্ধ্যন্তরের উল্লেখ করলে-ও, নাট্যদর্পণকাররা কিন্তু এগুলির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে, এই সন্ধ্যন্তরগুলিকে

অন্যান্য সন্ধ্যঙ্গ, ব্যভিচারিভাব বা ইতিবৃত্তের অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এগুলি কোনোরূপ পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না।

৩. নাট্যশাস্ত্রসম্মত চতুর্থপ্রকার পতাকাস্থানটি নাট্যদর্পণে তৃতীয়প্রকার পতাকাস্থানরূপে বর্ণিত হয়েছে।

৪. সমবকার আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, সমবকারে গায়ত্রী, উষ্ণিক্ ইত্যাদি বৈদিক ছন্দের প্রচুর প্রয়োগ থাকা উচিৎ। নাট্যদর্পণে এই মতটি একেবারে-ই সমর্থন করা হয়নি। উপরন্তু বলা হয়েছে, রৌদ্র ও বীররসপ্রধান সমবকারের ওজোগুণসম্পন্ন, দীর্ঘসমাসবহুল ভাষায় স্বল্পাক্ষর বৈদিক ছন্দের পরিবর্তে স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত ইত্যাদি দীর্ঘ, বহ্বক্ষর লৌকিক ছন্দের প্রয়োগ অধিক উপযোগী।

৫. নাট্যশাস্ত্রে আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয় ছাড়া-ও চিত্রাভিনয় নামক একপ্রকার অভিনয়কে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু নাট্যদর্পণে চিত্রাভিনয়কে আঙ্গিক অভিনয়ের-ই অন্তর্গত বলে স্বীকার করা হয়েছে, কারণ এটি মূলতঃ অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা পরিবেশিত হয়।

৬. নাট্যশাস্ত্রে ভারত্যাদি চতুর্বিধ বৃত্তির প্রতিটির চারটি করে অঙ্গ স্বীকার করা হয়েছে। যেমন–ভারতীবৃত্তির ক্ষেত্রে, বীথী, প্রহসন, আমুখ ও প্ররোচনা হল চারটি অঙ্গ। নাট্যদর্পণে কিন্তু কোনোপ্রকার বৃত্তির কোনোরূপ অঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি।

৭. নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে করুণ ও বীভৎস রসের ক্ষেত্রে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ হবে–'বীভৎসে করুণে চৈব ভারতী সংপ্রকীর্তিতা' (না.শা.২০/৭৪,পৃঃ-১০০)। আবার অন্যদিকে এই নাট্যশাস্ত্রে-ই বলা হয়েছে বীথী,প্রহসন ও ভাণে ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ করতে হবে। নাট্যদর্পণে এই মতদ্বয়ের স্ববিরোধিতার দিকে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ উক্ত রূপকত্রয়ের কোনোটিতে-ই করুণ বা বীভৎস প্রধানরস রূপে প্রযুক্ত হয় না।

৮. রসবিমর্শে নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যদর্পণের মধ্যে কিছু বৈমত্য পরিদৃষ্ট হয়। মহর্ষি ভরতের মতে রসের সংখ্যা আটটি। নাট্যদর্পণে কিন্তু শান্তরসকে স্বীকার করে মোট নয় প্রকার রসের কথা বলা হয়েছে। এমনকি বৃত্তিতে আরো বলা হয়েছে যে, এই নয়টির অতিরিক্ত অন্য রসের অস্তিত্ব-ও স্বীকার করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ সুখ, দুঃখ, স্নেহ, লৌল্য ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. নাট্যশাস্ত্রমতে সকল প্রকার রস সহৃদয়ের উপভোগ্য এবং আনন্দদায়ক। নাট্যদর্পণকাররা এর সঙ্গে সহমত নন। তাঁদের মতে, শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি রস আনন্দদায়ক হলে-ও, রৌদ্র-করুণ-বীভৎস-ভয়ানক এই রসগুলি কখনো আনন্দদায়ক হতে পারে না।

১০. স্তম্ভ ও স্বেদকে মহর্ষি ভরত সাত্ত্বিকভাব রূপে স্বীকার করেছেন। নাট্যদর্পণকাররা এগুলিকে অনুভাবের তালিকার অন্তর্গত করেছেন।

১১. মহর্ষি ভরত পূর্বরঙ্গের সবকটি অঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, নাটকের অভিনয়ের পূর্বে এই পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্যকরণীয়। নাট্যদর্পণে পূর্বরঙ্গের একটিমাত্র অঙ্গ 'নান্দী'-কে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের মতে, অবশিষ্ট অঙ্গগুলি গুরুত্বহীন এবং সেই কারণে এগুলি পৃথক আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

১২. নাট্যশাস্ত্রে প্রস্তাবনার উদ্‌ঘাত্যকাদি পঞ্চবিধত্ব স্বীকার করা হয়েছে। নাট্যদর্পণে প্রস্তাবনার কোনো ভেদ স্বীকার করা হয়নি। মহর্ষি ভরতের মতে যেগুলি 'প্রস্তাবনার ভেদ', নাট্যদর্পণকারদের মতে সেগুলি 'পাত্রপ্রবেশের বিভিন্ন উপায় বা রীতি'।

১৩. নাট্যশাস্ত্রে দুই প্রকার বীথ্যঙ্গকে প্রস্তাবনার ভেদরূপে স্বীকার করা হয়েছে –উদ্‌ঘাত্যক এবং অবলগিত। নাট্যদর্পণকারদের মতে ত্রয়োদশ প্রকার বীথ্যঙ্গের প্রতিটি-ই প্রস্তাবনাভেদ রূপে প্রযুক্ত হতে পারে।

১৪. মহর্ষি ভরতের মতে, রাজার বিদূষক হবেন কেবল জনৈক ব্রাহ্মণ। নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, শুধু ব্রাহ্মণ-ই নন, তপস্বী ও রাজকর্মচারী কোনো ব্যক্তি-ও রাজার বিদূষক হতে পারেন।

১৫. গ্রন্থের শেষ অংশে নাট্যদর্পণকাররা তেরো প্রকার 'অন্য রূপক' (যাদের পরবর্তী কালে উপরূপক নামে অভিহিত করা হয়েছে)-এর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে এগুলির উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না।

সমগ্র আলোচনার নির্যাসস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কিছু মতপার্থক্য থাকলে-ও, নাট্যদর্পণ মূলতঃ নাট্যশাস্ত্র-অনুসারী। কোনো কোনো বিষয়ে দুটি গ্রন্থে-ই প্রায় সমান আলোচনা রয়েছে – যেমন সন্ধি, অর্থপ্রকৃতি ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে উদাহরণযোগে বিস্তৃততর করা হয়েছে – যেমন সন্ধ্যঙ্গ ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের সুবিস্তৃত আলোচনাকে নাট্যদর্পণে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত করা হয়েছে – যেমন নাট্যশাস্ত্রের অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত আঙ্গিক অভিনয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে; নাট্যদর্পণে মাত্র কয়েকটি শ্লোকে আঙ্গিক অভিনয়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, আলোচনার আয়তন যাই হোক্ না কেন, আলোচনার চরিত্রনির্মাণে নাট্যদর্পণ বহুলাংশে নাট্যশাস্ত্র-অনুসারী।

নাট্যদর্পণ এবং অভিনবভারতী ঃ

আচার্য অভিনবগুপ্তের আবির্ভাবকাল হল দশম শতক। নাট্যশাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত টীকার নাম 'অভিনবভারতী'। এই গ্রন্থের রচনাকাল ৯৮০ – ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই গ্রন্থে বহু পূর্বাচার্যের মত উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রাগ্‌ভাবী অন্য কোনো গ্রন্থে এইভাবে নাট্যশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করা হয়নি। ভরতের রসসূত্রের 'সংযোগ' পদটির ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক সম্বন্ধকে স্বীকার করে 'অভিব্যক্তিবাদ' নামক রসবাদের প্রবক্তা-ও এই আচার্য অভিনবগুপ্ত। বহুশাস্ত্রের আলোচনায় সমৃদ্ধ এবং যুক্তিজালে পরিপূর্ণ অভিনবভারতী টীকা সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের মনোযোগী পাঠকের অবশ্য অধ্যেতব্য গ্রন্থ। ব্যাকরণশাস্ত্রে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের যে স্থান, ভারতীয় নাট্য ও নন্দনতত্ত্বে অভিনবভারতীকে সেই স্থান দেওয়া যায়। এই মহামূল্য গ্রন্থের সমস্ত অংশ সুষ্ঠুরূপে উদ্ধার করা হয়েছে কিনা, সেবিষয়ে এখনো কিছু সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। যাই হোক্ না কেন, একথা অসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের আকাশে অভিনবগুপ্তাচার্য এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজমান এবং তাঁর পাণ্ডিত্যচ্ছটায় দীপ্ত গ্রন্থ হল এই 'অভিনবভারতী'।

নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের উপর অভিনবগুপ্তাচার্যর প্রভাব অপরিসীম বললে-ও চলে। কারিকারচনার ব্যাপারে নাট্যদর্পণকাররা যেমন ঋণী মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রতি, বৃত্তিরচনায় ব্যাপারে তাঁদের ঋণ অভিনবভারতীর প্রতি এবং কারিকার তুলনায় বৃত্তির আয়তন যেহেতু অনেক বেশি, অতএব সমানুপাতিক ভাবে নাট্যশাস্ত্রের চেয়ে অভিনবভারতীর প্রভাব এঁদের রচনায় অনেক বেশিভাবে পরিলক্ষিত। সত্য বলতে, নিবিষ্ট অধ্যয়নে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, নাট্যদর্পণের 'অভিনব'-রূপে প্রতিভাত অভিমতগুলির সিংহভাগের-ই উৎস অভিনবভারতী।

অভিনবভারতীর প্রতি নাট্যদর্পণের এই আধমর্ণ্যের বিষয়টিকে প্রধানতঃ তিনটি প্রকারে নির্দেশ করা যেতে পারে–

১. অভিনবভারতীর অবিকল উদ্ধার–

ক. অনুচ্ছেদের

খ. বাক্যের

গ. উদাহরণের

২. স্বল্পপরিবর্তনপূর্বক অভিনবভারতীর উদ্ধার –

ক. অনুচ্ছেদের

খ.বাক্যের এবং

৩.অভিনবভারতীর মতের অনুসরণ।

যেহেতু গবেষণাগ্রন্থের প্রতিটি বিষয়ে অভিনবভারতীর সংশ্লিষ্ট অংশের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, অতএব বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনাটি অকারণ দীর্ঘায়িত না করে অল্প কয়েকটি উদাহরণযোগে প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করা যাক্।

১. অভিনবভারতীর অবিকল উদ্ধার ঃ

ক. অনুচ্ছেদের – একথা বলা বাহুল্য যে, সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদের অবিকল উদ্ধার খুব বেশি স্থলে পাওয়া যায় না; সেক্ষেত্রে নাট্যদর্পণকাররা চৌর্যবৃত্তির ন্যায় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হতেন। তবু অভিনবভারতীর একটি অনুচ্ছেদের প্রায় অবিকল উদ্ধারের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে –

নাট্যদর্পণ	অভিনবভারতী
যথা রত্নাবল্যাম্– সাগরিকায়াং পাশাবলম্বন-প্রবৃত্তায়াং বাসবদত্তেতি মন্যমানো রাজা পাশাদ্ বিমোচয়তি, তদা তদুক্ত্যা সাগরিকাং প্রত্যভিজ্ঞায়াহ– 'কথং মে প্রিয়া সাগরিকা? অলমলমতিমাত্রেণ' ইত্যাদি। অত্রান্যৎ প্রয়োজনং চিন্তিতম্, বৈচিত্র্যকারি চ প্রয়োজনান্তরং সম্পন্নম্ । (না.দ. পৃঃ- ১৮৪)	যথা রত্নাবল্যাং সাগরিকায়াং পাশাবলম্বন-প্রবৃত্তায়াং বাসবদত্তেয়মিতি মন্যমানো রাজা পাশং মুঞ্চতি, তদা তদুক্ত্যা সাগরিকাং প্রত্যভিজ্ঞায় 'হা! কথং প্রিয়া মে সাগরিকা, অলমলমতিমাত্রমি'ত্যাদি।অত্রান্যৎ প্রয়োজনং চিন্তিতং তদ্‌বৈচিত্র্যকারি চ প্রয়োজনান্তরং সম্পন্নম্ । (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ- ১৯)

খ.বাক্যের অবিকল উদ্ধার – নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে অভিনবভারতীর বহু বাক্যের অবিকল উদ্ধার করা হয়েছে। দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হল –

নাট্যদর্পণ	অভিনবভারতী
১. তত্র কঞ্চুকিস্থানে দাসঃ। অমাত্যস্থানে শ্রেষ্ঠী। বিদূষকস্থানে বিটঃ (না.দ. পৃঃ-২৩১)	১. .....কঞ্চুকিস্থানে দাসঃ, বিদূষকস্থানে বিটঃ, অমাত্যস্থানে শ্রেষ্ঠীত্যর্থঃ (অভি. ভা.দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ - ৩১৭)
২. অন্যস্মিন্ উপায়ে চিন্তিতে সহসোপায়ান্তরপ্রাপ্তির্যথা নাগানন্দে জীমূতবাহনস্য শঙ্খচূড়াদপ্রাপ্তবধ্যপটস্য কঞ্চুকিনা বাসোযুগলার্পণমিতি। (না. দ. পৃঃ–১৮৪)	২. অন্যস্মিন্ উপায়ে চিন্তিতে সহসোপায়ান্তরপ্রাপ্তিঃ যথা নাগানন্দে জীমূতবাহনস্য শঙ্খচূড়াদপ্রাপ্তবধ্যপটস্য কঞ্চুকিনা বাসোযুগলার্পণমিতি। (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ–১৯-২০)
৩. যদাহ কোহলঃ "উত্তমাধমমধ্যাভির্যুক্তা প্রকৃতিভিস্ত্রিধা। একহার্যা দ্বিহার্যা বা সা বীথ্যভিসংজ্ঞিতা॥" (না. দ. পৃঃ-২৩৯)	৩. তথা চ কোহলঃ "উত্তমাধমমধ্যাভির্যুক্তা প্রকৃতিভিস্ত্রিধা। একহার্যা দ্বিহার্যা বা সা বীথ্যভিসংজ্ঞিতা ॥" (অভি. ভা.দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ - ৩৩৯)

৪. ....তদবস্পন্দিতং চক্ষুঃস্পন্দনাদিবদন্ত র্গতসূচনীয়সম্ভবাৎ। যথা বেণীসংহারে – ‘‘সৎপক্ষা মধুরগিরঃ প্রসাধিতাশা ...’’ইত্যাদি (না. দ.পৃঃ- ২৫১)	৪. তদবস্পন্দিতং চক্ষুঃস্পন্দনাদিবদন্ত-র্গতসূচনীয়সম্ভবাৎ। যথা – ‘‘সৎপক্ষা মধুরগিরঃ প্রসাধিতাশা...’’ ইত্যাদি। (অভি. ভা. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৩৩৫)
৫. মৃদা পরপক্ষমর্দনেন স্বপক্ষভবতি রক্ষতীতি মৃদবম্ । (না. দ. পৃঃ-২৪৮)	৫. মৃদবমিতি মর্দনং মৃৎপরপক্ষমর্দনেন স্বপক্ষভবতি রক্ষতীতি । (অভি. ভা.দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩৩৭)
৬. যস্তু বেণীসংহারে ভানুমত্যা সহ দুর্যোধনস্য দর্শিতো রত্যভিলাষরূপো বিলাসঃ। স নায়কস্য তাদৃশেঽবসরেঽনুচিতঃ।যদাহ– ‘‘সন্ধিসন্ধ্যঙ্গঘটনং রসবন্ধব্যপেক্ষয়া। ন তু কেবল শাস্ত্রার্থস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥’’ ইতি । (না.দ.পৃঃ-২০০)	৬. যস্তু বেণীসংহারে ভানুমত্যা সহ দুর্যোধনস্য দর্শিতো বিলাসঃ, স নায়কস্য তাদৃশেঽবসরেঽনুচিত ইতি চিরন্ত নৈরেবোক্তম্ ।যথা সহৃদয়ালোককারঃ–‘‘সন্ধিসন্ধ্যঙ্গঘটনং রসবন্ধব্যপেক্ষয়া। ন তু কেবলশাস্ত্রার্থস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥’’ (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৪২)

গ. উদাহরণের অবিকল উদ্ধার – নাট্যদর্পণে আলোচিত অজস্র বিষয়ের উদাহরণ অভিনবভারতী থেকে গৃহীত। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে – শৃঙ্গার, অঙ্ক, প্রকরণ, পরিকর, পরিন্যাস, পূর্বভাব, উদ্ভেদ, সমাহিতি, অসৎপ্রলাপ, বাক্‌কেলী, ছল, ত্রিগত, ব্যাহার,উদ্‌ঘাত্যক, অবস্পন্দিত, নালিকা, নর্ম, নর্মদ্যুতি, উদাহৃতি, সন্ধি, অবস্থা, পতাকাস্থানক, রসসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের উদাহরণপ্রয়োগে নাট্যদর্পণকাররা অভিনবভারতীর কাছে ঋণী।

২. স্বল্পপরিবর্তনপূর্বক অভিনবভারতীর উদ্ধার ঃ

ক. অনুচ্ছেদের – নাট্যদর্পণের বৃত্তির বহু স্থলে অভিনবগুপ্তাচার্যের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনাটি সামান্য পরিবর্তনপূর্বক উপস্থাপিত করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

নাট্যদর্পণ	**অভিনবভারতী**

১. এষু চ কেষাঞ্চিৎ সামাদীনাং স্বয়মঙ্গরূপত্বাৎ কেষাঞ্চিৎ ব্যভিচারিরূপত্বাৎ ... ন পৃথগুপলক্ষণে প্রয়াসঃ। তথোদাত্তরাঘবে হেত্ববধারণাত্মা উপক্ষেপঃ। প্রতিমানিরুদ্ধে স্বপ্ররূপঃ। রামাভ্যুদয়ে ভয়াত্মা। বেণীসংহারে ক্রোধাত্মা ।(না. দ. পৃঃ - ২২৯)	১. অন্যে মন্যন্তে - য এবোপক্ষেপাদ্যাঃ সামান্যা উক্তাঃ তেষামেবৈতদ্বিশেষা অবান্তরভেদাঃ। উপক্ষেপো হি সামাদিবিশেষভিন্নঃ, তথা হি 'লাক্ষাগৃহানলঃ'(বেণী.প্রথম.) ইতি ক্রোধাত্মোপক্ষেপঃ, রামাভ্যুদয়ে ভয়াত্মোপক্ষেপঃ, প্রতিমানিরুদ্ধে স্বপ্ররূপঃ,উদাত্তরাঘবে হেত্ববধারণাত্মা। (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৬২)
২. তেনৈকমপ্যঙ্গং রসপোষকত্বাদেকস্মিন্নপি সন্ধৌ দ্বিস্ত্রিধা নিবধ্যতে। যথা বেণীসংহারে সম্ফেটবিদ্রবৌ পুনঃ পুনঃ দর্শিতৌ বীররৌদ্ররসাবুদ্দীপয়তঃ। রত্নাবল্যাং চ বিলাসঃ পুনঃ পুনরুক্তঃ শৃঙ্গারমুল্লাসয়তি। অতঃ পরমপি বৈরস্যমাবহতীতি। তথাঙ্গদ্বয়েন সাধ্যং যদেকেনৈব সিধ্যতি তদেকমেব নিবধ্যতে। যথা ভীমদেবসুনোর্বসুনাগস্য কৃতৌ প্রতিমানিরুদ্ধে পরিকরার্থস্যোক্ষেপেনৈব গতত্বান্ন নিবন্ধঃ এবমঙ্গত্রয়েনাপি। যথা ভেজ্জলবিরচিতে রাধাবিপ্রলম্ভে রাসকাঙ্কে পরিকর পরিন্যাসয়োরুপক্ষেপেণৈব গতত্বান্ন তন্নিবন্ধঃ। এবম্... চতুরঙ্গো2পি সন্ধির্ভবতি। (না. দ. পৃঃ- ২২৯)	২. তেনৈকমপি সন্ধ্যঙ্গং তত্রৈব সন্ধৌ দ্বিস্ত্রির্বা কর্তব্যম্ । যথা রত্নাবল্যাং... বিলাসঃ অসকৃদুপনিবদ্ধঃ প্রধানং শৃঙ্গারমুদ্দীপয়তি। বেণীসংহারে সম্ফেটবিদ্রবৌ পুনঃপ্রদর্শিতৌ বীররৌদ্রোদ্দীপকৌ ভবতঃ। অতিশয়েন তু পৌনঃপুন্যে বৈরস্যং স্যাৎ...। তথা দ্বয়োর্যোগে দ্বাভ্যামঙ্গাভ্যাং সম্পাদ্যঃ তদেকেনৈব চেদ্ঘটতে তৎ কিমপরেণ। এবং ত্রিযোগঃ। দ্বিযোগো যথা প্রতিমানিরুদ্ধে ভীমসুনোর্বসুনাগস্য কৃতে উপক্ষেপানন্তরমেব ন পরিকরঃ ...। এবং ত্রিযোগঃ, যথা ভেজ্জলবিরচিতে রাধাবিপ্রলম্ভে রাসকাঙ্কে উপক্ষেপেণৈব হি...। এবং চতুরঙ্গো ... সন্ধির্ভবতীতি। (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৬১-৬২)
৩. তত্র কামস্য সর্বজাতিসুলভতয়া2ত্যন্ত পরিচিততয়া চ সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ। ততঃ শৃঙ্গারানুগামিত্বাৎ হাস্যঃ ততো হাস্যবিরোধিত্বাৎ করুণঃ কামস্য চার্থজত্বাদ্... শম ইতি। (না. দ. পৃঃ- ২৬০)	৩. তত্র কামস্য সর্বজাতিসুলভতয়া2ত্যন্ত পরিচিতত্বেন সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বে শৃঙ্গারঃ তদনুগামী চ হাস্যঃ নিরপেক্ষভাবত্বাৎ। তদ্বিপরীতঃ করুণঃ। ... শান্তঃ। (অভি. ভা.প্রথম খণ্ড, পৃঃ-২৬৬-২৬৭)
৪. এবঞ্চ পুষ্পদূষিতকে2শোকদত্তাদি শব্দাকর্ণনেন সমুদ্রদত্তস্য নন্দয়ন্ত্যাং যা ব্যলীকশঙ্কোপনিবদ্ধা সা ন দোষায় পরপুরুষসম্ভাবনায়া নির্বহণং যাবদত্রোপযোগিত্বাৎ। অপরথোত্তমপ্রকৃতিনা শ্বশুরেণ বধ্বাঃ পুত্রে দূরস্থিতে নির্বাসনম্, নির্বাসিতায়াশ্চ শবরসেনাপতি গৃহে2বস্থানমনুচিতমেব। (না. দ. পৃঃ - ২৩০)	৪....পুষ্পদূষিতকে2শোকদত্তাদিশব্দাকর্ণনেন সমুদ্রদত্তস্য শঙ্কা যোপনিবদ্ধা সা ন দোষায়। নির্বহণান্তোপযোগিনী হি নন্দয়ন্তীনির্বাসনং তস্যাশ্চ গৃহান্তরাবস্থা। ইদমেব মুখসন্ধৌ মূলং পরপুরুষসম্ভাবনামূলত্বাৎ। এবমনভ্যুপগমে তু শ্বশুরেণ বধ্বা অসন্নিহিতে পুত্রে নির্বাসনং শবরসেনাপতিগৃহে2বস্থানমিত্যুত্তমপ্রকৃতীনামনুপ পন্নমেব।(অভি.ভা.দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩১৭-৩১৮)

৫. ফলস্য মুখ্যসাধনস্য হেতব উপায়াঃ। ইহ হেতুর্দ্বিধা অচেতনশ্চেতনশ্চ। অচেতনো2পি মুখ্যামুখ্যভেদাদ্ দ্বিধা। মুখ্যো বীজম্.....। অমুখ্যস্তু কার্যম্। চেতনো2পি দ্বিধা মুখ্য উপকরণভূতশ্চ। মুখ্যো বিন্দুঃ ...। উপকরণভূতশ্চ দ্বিধা স্বার্থসিদ্ধিযুতঃ পরার্থসিদ্ধিপরঃ। ... পূর্বঃ পতাকা অন্যঃ প্রকরীতি। (না. দ. পৃঃ- ১৮২)	৫. যথার্থঃ ফলং তস্য প্রকৃতয়ঃ...। তত্র জড়চেতনতয়া দ্বিধাকরণম্, জড়শ্চ মুখ্য কারণভূতঃ ...। আদ্যং বীজং দ্বিতীয়ং কার্যম্ ...। চেতনো2পি দ্বিধা মুখ্য উপকরণভূতশ্চ, অন্যো2পি দ্বিধা স্বার্থসিদ্ধিসহিতয়া পরার্থসিদ্ধয়া যুক্তঃ শুদ্ধয়া চ, তত্রাদ্যো বিন্দুঃ দ্বিতীয়ঃ পতাকা তৃতীয়ঃ প্রকরী। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ - ১২)

খ. স্বল্পপরিবর্তনযোগে অভিনবভারতীর বাক্যের উদ্ধার – নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে অজস্র স্থলে অভিনবভারতীর বাক্যগুলিকে সামান্য পরিবর্তিত করে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ভূরি পরিমাণ নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে, বিস্তারভয়ে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে –

নাট্যদর্পণ	**অভিনবভারতী**
১.বিষ্কভনাত্যনুসন্ধানেন বৃত্তমুপষ্টম্ভয়তীতি বিষ্কম্ভকঃ। (না. দ. পৃঃ-১৮০)	১.বিষ্কম্ভয়ত্যুপস্তম্ভয়তীতি বিষ্কম্ভকঃ। (অভি.ভা. দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ-৩১৯)
২. অল্পকালে চাঙ্কাস্যম্, অল্পতরকালে চ চূলিকা...। অল্পতমকালে চাঙ্কাবতার ইতি। (না.দ.পৃঃ-১৮২ ১৮২)	২. পরিমিতং তু যদনুসন্ধেয়ম্ তত্রাঙ্কমুখমল্পানুসংধেয়ে চূলিকা, অল্পতমে অঙ্কাবতারঃ। (অভি.ভা.দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩১০)
৩. সর্বব্যাপিত্বাদ্বা জলে তৈলবিন্দুরিব বিন্দুঃ (না.দ.পৃঃ- ১৮৫)	৩. তৈলবিন্দুবৎ সর্বব্যাপিত্বাদপি বিন্দুঃ (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ - ১৪)
৪. কেবলং বীজং মুখসন্ধেরেব প্রভৃতি নিবধ্যতে বিন্দুস্তু তদনন্তরমিতি। (না.দ.পৃঃ- ১৮৫)	৪. বীজং চ মুখসন্ধেরেব প্রবর্ত্যমানমুন্মেষয়তি বিন্দুস্তদনন্তরমিতি বিশেষো2নয়োঃ। (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ- ১৪)
৫. তাপসবৎসরাজে হি বৎসরাজস্য মুখ্যায় কৌশাম্বীরাজ্যলাভায় প্রবৃত্তেন ... বাসবদত্তাসঙ্গমপদ্মাবতীপ্রাপ্ত্যাদিকমপি সাধ্যতে। (না.দ.পৃঃ-১৭৫)	৫. তাপসবৎসরাজে রাজ্যপ্রত্যাপত্তেঃ প্রধানফলত্বে বাসবদত্তাসঙ্গমপদ্মাবতীপ্রাপ্ত্যাদৌ ক্রিয়ান্ত রানুপযোগ এব মন্তব্যঃ। (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ-০৩)
৬. নেতুর্মুখ্যফলং প্রতি বীজাদ্যুপায়ান্ প্রযোক্তুরবস্থাঃ... কায়বাঙ্মনসো ব্যাপারাঃ। (না.দ.পৃঃ-১৮৭)	৬. সাধ্যে ব্যাপারপরিস্পন্দো যো বাঙ্মনসভূতস্ত স্য যা অবস্থা ... (অভি.ভা. তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-০৬)
৭.প্রারম্ভাবস্থাভাবিত্বাৎ... মুখমিব মুখম্...। (না. দ. পৃঃ-১৯০)	৭. প্রাগারম্ভভাবিত্বাত্ মুখমিব মুখম্ (অভি.ভা. তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ- ২৩)
৮. প্রারম্ভোপযোগী যাবানর্থরাশিঃ প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা বিচিত্ররসসন্নিবেশস্তাবান্ মুখসন্ধিঃ। (না. দ. পৃঃ-১৯০)	৮. প্রারম্ভোপযোগী যাবানর্থরাশিঃ প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা বিচিত্রাস্বাদ আপতিতঃ তাবত্ মুখসন্ধিঃ। (অভি. ভা. তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ২৩)

৯. অমাত্যেন সাগরিকাচেষ্টিতরূপং বীজং মুখসন্ধৌ ন্যস্তং বসন্তে ৎসবকামদেবপূজাদিনা তিরোহিতত্বাদীষল্লক্ষ্যম্। (না. দ.পৃঃ-১৯০)	৯....মুখে ন্যস্তং ভূমাবিব বীজম্ অমাত্যেন সাগরিকাচেষ্টিতং বসন্তোৎসবকামদেবপূজাদিনা তিরোহিতং নষ্টমিব। (অভি.ভা. তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-২৪)
১০. নিশ্চয়রূপত্বাদেব চোহরূপায়া যুক্তের্ভিদ্যতে ।(না.দ.পৃঃ-২০৯)	১০. অনুমানং নিশ্চয়াত্মকত্বাদূহঃ, উপায়াযুক্তেরন্যত্বাৎ। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-৪৯)
১১.পরস্পরবঞ্চনপ্রবৃত্তয়োর্যস্য বৃদ্ধিসহায়াদিবলাধিক্যেন যৎ কর্মেতরমতিসংঘাতুং সমর্থং তৎকর্ম ... অধিছলম্। (না.দ.পৃঃ-২১২)	১১.পরস্পরবঞ্চনপ্রবৃত্তয়োর্যস্যৈবাধিকং সহায়বুদ্ধ্যাদীনবলম্বয়তি স এব তম-তিসংঘাতুং......সমর্থ ইতি তদিদং কর্মাধিবলম্। (অভি.ভা. তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ-৫১)
১২. ক্রুদ্ধস্য প্রসাদনং... বুদ্ধিবিভবাদিশক্তিকার্যত্বেন সা শক্তিঃ (না. দ.পৃঃ-২১৯)	১২. কুপিতস্য প্রশমঃ প্রসাদনং শক্তিঃ বুদ্ধিবিভবাদিশক্তিকার্যত্বাৎ। (অভি.ভা. তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৫৩)
১৩. যোগ্যতাং চ রসনিবেশৈকব্যবসায়িনঃ প্রবন্ধকবয়ো বিদন্তি ন পুনঃ ... মুক্তককবয়ঃ। (না. দ.পৃঃ-২২৯)	১৩. যোগ্যতাং চ কবিরেব জানাতি ন মুক্তককবিঃ কিন্তু প্রবন্ধযোজনাসমর্থঃ। (অভি.ভা. তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৬০)
১৪. যথা শাক্যানাং স্ত্রীসম্পর্কো গর্হণীয়ো ন চৌর্যম্। (না.দ.পৃঃ-২৩৭)	১৪. শাক্যানাং স্ত্রীসম্পর্কো গর্হণীয়ো ন চৌর্যম্। (অভি.ভা.দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ-৩৩১)
১৫. ডিমো ডিম্বো বিপ্লব ইত্যর্থঃ তদ্যোগাদয়ং ডিমঃ। (না. দ. পৃঃ- ২৩৮)	১৫. ডিমো ডিম্বো বিদ্রব ইতি পর্যায়াঃ। তদ্যোগাদয়ং ডিমঃ। (অভি.ভা. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩২৭)
১৬. উৎক্রমণোন্মুখা সৃষ্টির্জীবিতং যাসাং তা উৎসৃষ্টিকাঃ শোচন্ত্যঃ স্ত্রিয়স্তাভিরঙ্কিতত্বাদুৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ । (না.দ.পৃঃ-২৩৮)	১৬. উৎক্রমণীয়া সৃষ্টির্জীবিতং প্রাণা যাসাং তা উৎসৃষ্টিকাঃ শোচন্ত্যঃ স্ত্রিয়স্তাভিরঙ্কিত ইতি তথোক্তঃ। (অভি.ভা.দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ-৩২৯)
১৭. ঈহা চেষ্টা মৃগস্যেব স্ত্রীমাত্রার্থাত্রেতীহামৃগঃ। (না.দ.পৃঃ-২৩৯)	১৭. ঈহা চেষ্টা মৃগস্যেব স্ত্রীমাত্রার্থা যত্র স ঈহামৃগঃ। (অভি.ভা. দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ-৩২৬)
১৮. প্রয়োজনান্তরেন প্রযুক্তং যদ্ বচনং অন্যস্যান্যস্য হাস্যবঞ্চনারোষকারণং তৎ... ছলম্। (না. দ.পৃঃ-২৪৬)	১৮. প্রয়োজনান্তরমুদ্দিশ্য বচনমুচ্যমানং কস্যচিদ্ বচনমন্যস্য হাস্যপরস্য রোষং জনয়তি তচ্ছলম্। (অভি.ভা.দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ- ৩৩৮)
১৯. পরবিপ্রতারণকারি... যদুত্তরং হাস্যনিমিত্তং ... ভবতি সা নালী ব্যাজরূপা প্রণালিকা (না.দ.পৃঃ-২৪৮)	১৯. পরবিপ্রতারণকারি যদুত্তরং অতএব হাস্যযুক্তা সা নালিকা প্রণালিকা ব্যাজেত্যর্থঃ (অভি.ভা. দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ- ৩৩৬)
২০. এতদ্বচঃ সখ্যা ভর্তৃপ্রত্যায়নপ্রয়োজনেনোক্তং বিদগ্ধজনস্য হাস্যং শ্বশুরাদের্বঞ্চনাং সপত্ন্যা রোষং জনয়তি। (না.দ. পৃঃ-২৪৬)	২০. এতদ্বচনং সখিসম্বন্ধি ভর্তৃপ্রত্যায়নং প্রয়োজনমুদ্দিশ্য প্রযুক্তং... সম্বন্ধিনাং ছলং বিদগ্ধজনস্য হাস্যং সপত্ন্যা বঞ্চনং রোষং জনয়তি। (অভি.ভা. দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ-৩৩৮)

২১. বিবিধো2র্থঃ আদ্রিয়তে নয়েতি ব্যাহারঃ (না. দ. পৃঃ-২৪০)	২১. স ব্যাহারঃ বিবিধো2র্থো2ভিনীয়তে যেন। (অভি.ভা.দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ-৩৩৮)
২২. গুণানাং দোষত্বং দোষাণাং চ গুণত্বম্... ইতি মৃদবম্। (না. দ.পৃঃ-২৪৮)	২২. গুণানাং দোষত্বং দোষাণাং চ গুণত্বং যত্র ক্রিয়তে তন্মৃদবম্ (অভি.ভা. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩৩৭)
২৩. অন্যকার্যকরণব্যাজেন সম্পত্তির্যত্র তদন্যকার্যাবলগনাদবলগিতম্। (না.দ.পৃঃ-২৫০)	২৩.অন্যানুসন্ধানপূর্বকে2প্যন্যৎকার্যে সিদ্ধয়তি তদন্যকার্যাবলগনাদবলগিতম্। (অভি.ভা. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩৩৫)
২৪. রাগঃ প্রিয়তমং প্রতি বহুমানঃ। ... হর্ষঃ সৌভাগ্যগর্বঃ। অন্যথা বক্তব্যে2ন্যথাবচনম্, হস্তেনাদাতব্যে পাদেনাদানম্, কটিযোগ্যস্য কণ্ঠে নিবেশনমিত্যাদিকঃ...। (না.দ.পৃঃ-২৮৫)	২৪. সৌভাগ্যগর্বকৃতঃ বিভ্রমঃ তদ্যথা... অন্যথা বক্তব্যে2ন্যথাভাষণম্, হস্তেনাদাতব্যে পাদেনাদানম্, রশনায়াঃ কণ্ঠে ন্যাস ইত্যাদি।... রাগঃ প্রিয়তমং প্রতি বহুমানঃ হর্ষঃ... ।(অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ-১৫৩-১৫৪)
২৫. সৎ সত্ত্বং প্রকাশস্তদ্ যত্রাস্তি তৎ সত্ত্বং মনস্তত্রভবা সাত্ত্বতী। (না.দ.পৃঃ-২৫৫)	২৫. সৎ সত্ত্বং প্রকাশঃ তদ্বিদ্যতে যত্র তৎ সত্ত্বং মনঃ তস্মিন্ ভবঃ। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ-৬২)

৩. অভিনবভারতীর অভিমতের অনুসরণ ঃ

বৃত্তির অজস্র স্থলে অভিনবভারতীর মতামতের নির্যাসমাত্র গ্রহণ করে নাট্যদর্পণের রচয়িতারা সেটিকে নিজেদের ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন ।কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল –

নাট্যদর্পণ	অভিনবভারতী
১.জনানামেকস্যৈব গোপ্যত্বাৎ ... জনান্তিকম্। ... যদ্বিপরীতমপবারিতম্। - (না.দ.পৃঃ-১৭৬)	১.এক এব শৃণুয়াদিতি তদপবারিতং জনান্তিকং ঐকান্তিকত্বং চৈকস্যৈব নিগূহ্যত ইতি বিশেষঃ। (অভি.ভা. তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ-২৬)
২. গোপুচ্ছস্য চ কেশাঃ কেচিৎ স্তে াকমাত্রযায়িনঃ কেচিন্মধ্যাবধয়ঃ কেচিদন্ত ব্যাপিনঃ। এবং প্রবন্ধবস্তুন্যপি...। (না.দ পৃঃ-১৭৭)	২.গোপুচ্ছে কেচিদ্ বালাঃ হ্রস্বাঃ কেচিদ্দীর্ঘাঃ এবং কানিচিৎ কার্যাণি মুখসন্ধৌ... (অভি.ভা. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৩১৫)
৩.মুখ্যফলং প্রতি বীজাদ্যুপায়ান্ প্রযোক্তুরবস্থাঃ প্রধানবৃত্তবিষয়ে কায়বাঙ্মনসাং ব্যাপারাঃ। (না.দ.পৃঃ- ১৮৭)	৩. ...সাধ্যে ব্যাপারপরিস্পন্দো যো বাঙ্মনসগতস্তস্য যা অবস্থা...। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ-০৬)
৪.প্রেক্ষাপূর্বকারিণাং প্রথমমারম্ভস্ততঃ প্রযত্নঃ। (না.দ.পৃঃ-১৮৮)	৪.ন হি প্রেক্ষাপূর্বকারিণঃ অবস্থান্তরসংভাবনায়াং প্রারম্ভঃ উচিতঃ ভবতি। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-০৬)

৫.ফলে মুখ্যং তদর্থমৌৎসুক্যমুপায়বিষয়মনেনোপায়েনৈতৎ সিধ্যতি ইতি স্মরণোৎকণ্ঠাদিকর্ম ... আরম্ভঃ। (না.দ.পৃঃ-১৮৭)	৫.প্রধানভূতস্য ফলস্য ... যদ্বীজমুপায়সম্পত্তস্য মদৌৎসুক্যমাত্রং তদ্বিষয়স্মরণোৎকণ্ঠারূপম্, অনেনোপায়েনৈতৎ সিধ্যতীতি প্রারম্ভঃ। (অভি.ভা.তৃতীয়খণ্ড,পৃঃ-০৬)
৬.মুখ্যফলোপায়ব্যাপারণে ত্বরা অনেনোপায়েন বিনা ফলং ন ভবতীতি নিশ্চয়েন পরমৌৎসুক্যং .. প্রযত্নঃ। (না. দ. পৃঃ- ১৮৭)	৬.ফলমুদ্দিশ্য যো ব্যাপারঃ উপায়বিষয়পরমৌৎসুক্যগমনলক্ষণে তেন বিনেদং ফলং ন ভবতি তস্মাৎ স এবোপায়ঃ... প্রযত্নঃ। (অভি.ভা. তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ- ০৭)
৭. মাত্রশব্দেন ফলান্তরযোগঃ প্রতিবন্ধনিশ্চয়শ্চ ব্যবচ্ছিদ্যতে। যা সম্ভাবনা ন তু নিশ্চয়ঃ সা... প্রাপ্ত্যাশা। (না. দ. পৃঃ-১৮৮)	৭. তস্য সহকার্যন্তরযোগঃ প্রতিবন্ধকারণং চ মাত্রপদেনাবধারিতম্। ... ফলপ্রাপ্তিঃ সম্ভাবনামাত্রেন ... স্থাপ্যতে ন তু নিশ্চীয়তে তদা প্রাপ্তেঃ সংভবঃ। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-০৭)
৮. প্রতিবন্ধকাভাবেন সকলসহকারিসম্পত্ত্যা কার্যস্য নিশ্চয়ো নিয়তা ফলাব্যভিচারিণ্যাপ্তির্নিয়তাপ্তিঃ। (না.দ.পৃঃ-১৮৮)	৮. ফলস্য প্রকর্ষেণাপ্তির্যতঃ সহকারিবর্গঃ প্রতিবন্ধকবিধ্বংসনসহিততা...চ সামগ্রীরূপতা যদা... নিয়তাং ফলাব্যভিচারিণীং পশ্যতি তদা নিয়তফলপ্রাপ্তির্নামাবস্থা। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ-০৭)
৯.গর্ভসন্ধাবপ্রাপ্ত্যংশঃ প্রধানফলসম্ভাবনাত্মকত্বাৎ। অন্যথা ফলনিশ্চয়াত্মক এব স্যাৎ। (না.দ.পৃঃ-১৯১)	৯. অপ্রাপ্ত্যংশশ্চাত্রাবশ্যম্ভাবী অন্যথা সম্ভাবনাত্মা প্রাপ্তিসম্ভবঃ কথং নিশ্চয় এব স্যাৎ।(অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ২৬)
১০.অল্পং বিস্তারণং পরিকরঃ। (না. দ.পৃঃ-১৯৪)	১০. ঈষদ্‌বিস্তার্যতে পরিকরঃ। (অভি. ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩৮)
১১. কেচিত্তু মুখাদয়ঃ সন্ধয়ো2বস্থাশ্চ যত্র পৃথক্ পৃথক্ ... উল্লিখ্যন্তে তং নির্বহণসন্ধিমাহুঃ। (না.দ.পৃঃ-১৯৩)	১১. অত্র কেচিদমূন্ সর্বান্ সন্ধীন্ অবস্থাপঞ্চকনির্বহণে পৃথক্ বৃত্ত্যাযোজ্যমানানিচ্ছন্তি। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ২৯)
১২. যতঃ শুদ্ধসংকীর্ণভেদত্রয়রূপং সপ্তভেদং প্রকরণম্। (না. দ. পৃঃ- ২৩১)	১২. সপ্তবিধস্যাপি প্রকরণস্য প্রত্যেকং ভেদত্রয়ম্ ... । (অভি.ভা.দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩১৮)
১৩. তয়োঃ প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যপ্রসিদ্ধিভ্যাং চাতুর্ভেদত্বান্নাটিকাপি চতুর্বিধা (না. দ.পৃঃ-২৩৩)	১৩. দেবী কন্যা চ খ্যাতাখ্যাতভেদেন চতুর্ধা। (অভি.ভা.দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৩২০)
১৪. সর্বরসানাং চাভাসা অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্বাদ্ হাস্যরসস্য কারণম্।(না. দ. পৃঃ- ২৭৬)	১৪. অনৌচিত্যপ্রবৃত্তিকৃতমেব হি হাস্যবিভাবত্বম্।(অভি.ভা.প্রথম খণ্ড,পৃঃ- ২৯৪)
১৫. পরস্পরসমুত্থিতা অপি ভবন্তি। তথা হি কুমারীশরীরে প্রৌঢ়তমকুমারগতভাবহাবহেলাদর্শনশ্রবণাভ্যাং .াবাদয়ো... ...ভবন্তি। (না. দ. পৃঃ- ২৮৪)	১৫. পরস্পরসমুত্থিতা ভবন্তি। তথা হি কুমারীশরীরে প্রৌঢ়তমকুমার্যন্ত রগতহেলাবলোকনে সতি ... ভাবস্যোদ্‌ভবঃ। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ১৪৯)

১৬.তদ্ভাবভাবনাত্মকরাগবশাদঙ্গমর্দনপর্যন্তং যোষিতঃ চেষ্টিতম্। (না. দ. পৃঃ-২৮৫)	১৬. যোষিতো লীলাদিতদ্ভাবভাবনবশাদঙ্গমর্দনপর্যন্তম্ ... মোট্টায়িতম্। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ১৫৪)
১৭........ঔজ্জ্বল্যস্য মন্দমধ্যতীব্রাবস্থাঃ ক্রমেণ শোভাকান্তিদীপ্তয়ঃ। (না. দ. পৃঃ-২৮৬)	১৭. কান্তিদীপ্তিশোভানাং ক্রমেণ সাতিশয়মাহ। (অভি.ভা.তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ১৫৭)

উল্লিখিত উদাহরণযোগে স্পষ্ট-ই প্রতীত হয় অভিনবভারতীর প্রতি নাট্যদর্পণের ঋণ কতখানি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিপুল আত্তীকরণের (বা আত্মীকরণের) মধ্যে কোথাও কিন্তু অভিনবগুপ্তাচার্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর অভিমতগুলি 'পরে', 'কেচিৎ' ইত্যাদি পদের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে – আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে রূপকের প্রথম অঙ্কে প্রবেশকের প্রয়োগ করা যাবে না –'প্রবেশকঃ প্রথমোপক্ষেপে ন যোগ্য ইতি যুক্তম্'(অভি. ভা. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৩১৯)। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে এই মতটি উপস্থাপিত হয়েছে এইভাবে –'কেচিৎ প্রবেশকং প্রথমাঙ্কাস্যাদৌ নেচ্ছন্তি' (না.দ.পৃঃ-১৮০)। 'দ্যুতি' নামক অবমর্শসন্ধ্যঙ্গের আলোচনার সময়-ও অভিনবভারতীর মতটি এই এক-ইভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

সমগ্র নাট্যদর্পণে কেবল তিনটিমাত্র স্থলে অভিনবভারতীর সঙ্গে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয় –

১. প্রথমটি 'নাটক' পদের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে। নাট্যদর্পণকারদের মতে নাটক পদটির উৎপত্তি 'নাট্' ধাতু থেকে; অন্যদিকে অভিনবগুপ্তাচার্যের মতে 'নাটক' পদের উৎপত্তি 'নট্' ধাতু থেকে। বিশেষ উল্লেখ্য যে, নাট্যদর্পণের এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে নামোল্লেখপূর্বক অভিনবগুপ্তের মতটি উল্লিখিত (বা সমালোচিত) হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশটি প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধার করা হল – 'নাটকমিতি নাটয়তি বিচিত্রং রঞ্জনাপ্রবেশেন সভ্যানাং হৃদয়ং নর্তয়তীতি নাটকম্। অভিনবগুপ্তস্তু নমনার্থস্যাপি নটের্নাটকশব্দং ব্যুৎপাদয়তি, তত্র তু ঘটাদিত্বেন হ্রস্বাভাবশ্চিন্ত্যঃ' (না. দ. পৃঃ- ১৭৪)।

২. আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে, মোহমূর্ছাদিতে তো বটে-ই , এমনকি মৃত্যুর মধ্যে-ও সূক্ষ্ম প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান থাকায়, ব্যাপারশূন্য কোনো ক্রিয়া মঞ্চে উপস্থাপিত হতে পারে না এবং সেই কারণে-ই নাট্যের সামান্যতম অংশ-ও বৃত্তির অবিষয়রূপে চিহ্নিত হতে পারে না। অন্যদিকে নাট্যদর্পণের টীকায় কিন্তু বৃত্তির অবিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বাঙ্-মনস-কায়চেষ্টাবিহীন কোনো অভিনয়ব্যাপার যদি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপন করা হয়, তবে সেখানে বৃত্তির প্রয়োগ না করা যেতে-ই পারে।

৩. নাট্যদর্পণের রসবিষয়ক আলোচনায় প্রসিদ্ধ নয়টি রসের অতিরিক্ত স্নেহ, বাৎসল্য, সুখ ইত্যাদি কয়েকটিকে-ও নাট্যরসরূপে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আচার্য অভিনবগুপ্ত এগুলিকে পৃথক রসরূপে গণ্য করেননি। তাঁর মতে, এগুলির স্থায়িভাব রতি, উৎসাহ, ইত্যাদির অন্তর্গত; অতএব এগুলি শৃঙ্গার,বীর ইত্যাদি রসের ভেদমাত্র।

নাট্যদর্পণে অভিনবভারতী থেকে অজস্র উপাদান সংগৃহীত হলে-ও, নাট্যদর্পণের রচয়িতাদের কৃতিত্বকে খর্ব করা কখনো-ই সঙ্গত হবে না। অভিনবভারতী থেকে গৃহীত প্রতিটি অভিমতের উপর তাঁরা সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, যে সকল স্থলে অভিনবভারতী অতি জটিল ও দুর্বোধ্য, নাট্যদর্পণে সেগুলির যথাসাধ্য সরলীকরণ করা হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে অভিনবভারতী অতি সংক্ষিপ্ত, নাট্যদর্পণে ব্যাখ্যাযোগে এবং উদাহরণযোগে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন – অভিনবভারতীর অবস্থাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে নাট্যদর্পণে অনেক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার বিপরীতে, যেসকল স্থলে অভিনবভারতী অকারণ বিস্তৃত, বোধসৌকর্যার্থে নাট্যদর্পণে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যেমন – পঞ্চবিধ অর্থোপক্ষেপকের সময়বিষয়ে অভিনবভারতীতে যে সুবিস্তৃত আলোচনা রয়েছে, নাট্যদর্পণে তাকে অনেক সংক্ষিপ্ত অথচ পর্যাপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ডঃ. কে. এইচ. ত্রিবেদী নাট্যদর্পণ ও অভিনবভারতীর আরেকটি প্রয়োজন-সম্বন্ধের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। অভিনবভারতীর উপলভ্যমান সংস্করণের পাঠ এবং নাট্যদর্পণোদ্ধৃত পাঠের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা বহু স্থলে অভিনবভারতীর মূল গ্রন্থের সঠিক পাঠটি জানা সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

১. অধিবল আলোচনায় অভিনবভারতীর উপলভ্যমান সংস্করণে এই পাঠটি পাওয়া যায় – 'পরস্পরবচনপ্রবৃত্তয়োর্যস্যৈবাধিকম্' ইত্যাদি(অভি. ভা. তৃতীয় খণ্ড,পৃঃ- ৫১) । নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে (না. দ.পৃঃ - ২১২) বচনের পরিবর্তে 'বঞ্চন' পদটি উদ্ধার করা হয়েছে; বিষয় অনুসারে এটি-ই সঠিক পাঠ।

২. অঙ্ক আলোচনায় অভিনবভারতীর উপলভ্যমান সংস্করণে এই পাঠটি পাওয়া যায়– 'অঙ্কসমাপ্তায়াম্ অপি বা অবস্থায়াং যদা বীজস্য সংহরণং ভবতি তদাপ্যঙ্কচ্ছেদঃ' ইত্যাদি(অভি. ভা. দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ- ৩০৫) । এর পরিবর্তে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে প্রাপ্ত সঠিকতর পাঠটি হল – 'অসমাপ্তায়াম্ অপি অবস্থায়াং কার্যবশেন যো বা ছেদঃ সো2ঙ্কচ্ছেদঃ' (না. দ. পৃঃ-১৭৭)।

৩. ‘গণ্ড’ নামক বীথ্যঙ্গের আলোচনায় অভিনবভারতীর বর্তমানে প্রাপ্ত সংস্করণে এই পাঠটি পাওয়া যায় – ‘দৃষ্টার্থগর্ভত্বাৎ গণ্ড ইব গণ্ডঃ’(অভি. ভা. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ - ৩৩৮) । নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে উদ্ধৃত সঠিক পাঠটি হল – ‘দুষ্টার্থগর্ভত্বাদ্ দুষ্টশোণিতগর্ভগণ্ড ইব গণ্ডঃ’(না. দ. পৃঃ-২৪৩)।

৪. ‘বিষ্কম্ভক’ পদের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে অভিনবভারতীর উপলভ্যমান সংস্করণে (অভি. ভা. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ - ৩১৯) ‘বি’-পূর্বক ‘স্কম্ভ্’ ধাতুর ণিজন্ত রূপের ব্যবহারপূর্বক এই পাঠটি দেখা যায় –‘বিষ্কম্ভয়তি উপষ্টম্ভয়তীতি বিষ্কম্ভকঃ’। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে এই অকারণ ‘ণিচ্’-টি পরিহারপূর্বক এই পাঠটি উদ্ধার করা হয়েছে – ‘বিষ্কভ্নাতি বৃত্তম্ উপষ্টম্ভয়তীতি বিষ্কম্ভকঃ’ (না. দ. পৃঃ-১৮০)।

নাট্যদর্পণ এবং শৃঙ্গারপ্রকাশ ঃ

ধারাধিপতি ভোজদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচনা করেন ‘শৃঙ্গারপ্রকাশ’। এই বিশাল গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হল রস সম্পর্কে ভোজদেবের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গক্রমে ভাষা,ছন্দ ইত্যাদি বহু বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যতত্ত্ব-ও আলোচিত হয়েছে। কারণ, নাট্যকে অবলম্বন করে-ই যে ভারতীয় রসবাদের সূত্রপাত, বিকাশ এবং পরিণতি – ভোজদেবের তা অজ্ঞাত ছিল না। নাট্যতত্ত্বের যেটুকু আলোচনা এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট উন্নত এবং যুক্তিগ্রাহ্য। তবে এই গ্রন্থের আলোচনাশৈলীর জটিলতা সাধারণ শিক্ষার্থীর সুখাববোধের পথে প্রধান অন্তরায়।

নাট্যদর্পণগ্রন্থের রচয়িতাদ্বয় শৃঙ্গারপ্রকাশের দ্বারা-ও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই কারিকা ও বৃত্তি উভয়ত্র-ই নানা স্থলে শৃঙ্গারপ্রকাশের সদৃশ বা প্রায়-সদৃশ বহু অভিমত পরিদৃষ্ট হয়। আলোচনার সুবিধার্থে এই সাদৃশ্যগুলিকে আমরা তিনটি প্রকারে ভাগ করতে পারি –

১. অভিমতের সাদৃশ্য,

২. বাক্যের সাদৃশ্য এবং

৩. উদাহরণের সাদৃশ্য।

১. অভিমতের সাদৃশ্য ঃ

শৃঙ্গারপ্রকাশের বহু অভিমতের সারমাত্র গ্রহণ করে নাট্যদর্পণকাররা সেগুলিকে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় ও নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষতঃ উপরূপকসমূহের আলোচনার ক্ষেত্রে এই প্রভাব অতি স্পষ্ট। শৃঙ্গারপ্রকাশে যতগুলি উপরূপক স্বীকার করা হয়েছে, নাট্যদর্পণে-ও সেই সবকটিকে স্বীকার করা হয়েছে, অতিরিক্তরূপে নাট্যদর্পণে সট্টকের উল্লেখ করা হয়েছে। সট্টককে শৃঙ্গারপ্রকাশে প্রধান রূপকবর্গের অন্তর্গত করা হয়েছে, নাট্যদর্পণে এটির স্থান উপরূপকসমূহের

তালিকায় – এইমাত্র পার্থক্য। অন্যথায় সট্টকের নাট্যদর্পণধৃত লক্ষণটি শৃঙ্গারপ্রকাশের-ই অনুসারী। এবং শুধু সট্টক-ই নয়, শ্রীগদিত-প্রস্থান-গোষ্ঠী-হল্লীসক-রাসক ইত্যাদি উপরূপকের লক্ষণ নির্ণয়ে-ও নাট্যদর্পণকাররা একান্তভাবে শৃঙ্গারপ্রকাশকে অনুসরণ করেছেন।

২. বাক্যের সাদৃশ্য ঃ

নাট্যদর্পণের বহু স্থলে শৃঙ্গারপ্রকাশোদ্ধৃত লক্ষণগুলি সামান্য পরিবর্তনপূর্বক উদ্ধার করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে –

নাট্যদর্পণ	**শৃঙ্গারপ্রকাশ**
১. অন্যে তু সংহতানাং প্রতিপক্ষাণাং বিশ্লেষকং ভেদরূপমুপায়ং ভেদনং মন্যন্তে। (না.দ.পৃঃ-১৯৭)	১. ১.সজ্জাতরূপভেদো যস্য ভেদঃ। (শৃ. প্র. দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ-৫০৯)
২. অন্যে তু চিত্রার্থং রূপকং বচঃ ইতি পঠন্তি। (না. দ.পৃঃ-২০৯)	২. চিত্রার্থসমবায়ে তু রূপমুচ্যতে। (শৃ. প্র. দ্বাদশ অধ্যায়,পৃঃ- ৫১৫)
৩.কপটস্যান্যথাভাবমন্যে অধিবলমাহুঃ। (না.দ.পৃঃ-২১২)	৩. কপটস্যান্যথাভাবং ব্রুবতে2ধিবলং বুধাঃ।(শৃ.প্র.দ্বাদশ অধ্যায়,পৃঃ- ৫১৭)
৪.কেচিদপ্রস্তুতার্থবচনে প্রসঙ্গমিচ্ছন্তি। (না.দ. পৃঃ- ২১৪)	৪. অপ্রস্তুতার্থবচনং প্রসঙ্গঃ পরিকীর্তিতঃ। (শৃ. প্র. দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ- ৫২১)
৫.অপরে তু ক্রোধাদেঃ প্রাপ্তস্য শমনং দ্যুতিমামনন্তি (না.দ. পৃঃ- ২১৬)	৫. ঈর্ষ্যাকোপপ্রশমনং দ্যুতিমাচক্ষতে বুধাঃ (শৃ.প্র. দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ- ৫২৭)
৬.অন্যে তু বর্তমানপ্রত্যক্ষার্থবাচকং হাস্যলেশকরং বচো ব্যাহারমিচ্ছন্তি। (না. দ. পৃঃ- ২৪১)	৬. প্রত্যক্ষবৃত্তিরুক্তো ব্যাহারো হাস্যলেশঃ। (শৃ.প্র. দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ- ৪৯৪)
৭.কেচিত্তু পাত্রান্তরে স্বব্যাপারং নিক্ষিপ্য যৎ কার্যান্ত রকরণং তদবলগিতমিত্যাহুঃ (না.দ. পৃঃ- ২৫০)	৭.যত্রান্যস্মিন্ সমাবেশ্য কার্যমন্যত্ প্রসাধ্যতে। ত**চ্চাবলগিতং** নাম বিজ্ঞেয়ং নাট্যযোক্তৃভিঃ ॥ (শৃ. প্র. দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ- ৪৯২)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শৃঙ্গারপ্রকাশের অভিমতগুলির উল্লেখের সময় (যথারীতি) কোথাও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করা হয়নি। 'অন্যে', 'কেচিৎ', 'যদাহুঃ' ইত্যাদি পদের অন্তরালে গ্রন্থরচয়িতা ভোজদেবের মতগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৩. উদাহরণের সাদৃশ্য ঃ

কোনো একটি বিষয়ের আলোচনায় শৃঙ্গারপ্রকাশে ব্যবহৃত উদাহরণটি নাট্যদর্পণে-ও উদাহৃত হয়েছে, এরকম বহু নিদর্শন রয়েছে। যেমন 'রামাভ্যুদয়' থেকে পতাকাস্থানকের উদাহরণ, 'মুদ্রারাক্ষস' থেকে গৃহীত পতাকাস্থানকের উদাহরণ, 'রত্নাবলী' থেকে গৃহীত উপক্ষেপ ও নর্মের

উদাহরণ, 'রাধাবিপ্রলম্ভ' থেকে গৃহীত বাক্কেলীর উদাহরণ, 'ইন্দুলেখা' নামক বীথী থেকে গৃহীত ত্রিগতের উদাহরণ – এগুলি দুই গ্রন্থে-ই অবিকল এক।

এতদ্ব্যতীত, যেমন নাট্যদর্পণের সঙ্গে অভিনবভারতীর, এক-ই ভাবে নাট্যদর্পণের সঙ্গে শৃঙ্গারপ্রকাশের-ও একটি প্রয়োজনসম্বন্ধ রয়েছে। নাট্যদর্পণধৃত শৃঙ্গারপ্রকাশের উদ্ধৃত অংশের দ্বারা এই গ্রন্থের বিতর্কিত কিছু ক্ষেত্রের সঠিক পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অতএব শৃঙ্গারপ্রকাশের সুষ্ঠু ও বিষয়ানুগ পাঠের বিষয়ে নাট্যদর্পণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নাট্যদর্পণ এবং নাটকলক্ষণরত্নকোশ ঃ

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত আচার্য সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ' নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসে এক মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সাগরনন্দী ছিলেন অভিনবগুপ্তের সমসাময়িক। নাটকলক্ষণরত্নকোশের আলোচনার পরিধি যথেষ্ট ব্যাপক। মূলতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে অবলম্বন করে গ্রন্থটি রচিত হলে-ও, সাগরনন্দী এই গ্রন্থে কেবলমাত্র নাট্যের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবস্থা, অর্থোপক্ষেপক, অর্থপ্রকৃতি, সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গ, পতাকাস্থান, বৃত্তি, নাট্যভাষা, নাট্যালঙ্কার, নায়কের গুণ, নায়িকার স্বভাবজ গুণ, অভিনয়ভেদ, রূপকসমূহের লক্ষণ ইত্যাদি আলোচনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। ছন্দ-নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি কিছু বিষয়ের আলোচনা এখানে অনুপস্থিত। অন্যদিকে এই গ্রন্থের কোথাও কোথাও নাট্যশাস্ত্রে অনালোচিত বিষয়বিশেষের আলোচনা করা হয়েছে। মহর্ষি ভরতের মতের পাশাপাশি অন্যান্য পূর্বাচার্যদের মত-ও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে; বিশেষতঃ আচার্য মাতৃগুপ্তের প্রতি গ্রন্থকারের বিশেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন বহুশঃ পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থটির রচনাশৈলী সহজ ও অনাড়ম্বর। গ্রন্থকারের বিশ্লেষণীশক্তি-ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি অভিনবভারতীর মত অতিবিস্তৃত নয়, আবার ভাবপ্রকাশন বা শৃঙ্গারপ্রকাশের মত কোশগ্রন্থ-ও নয়। অতএব সবদিক থেকে-ই সাধারণ পাঠকের জ্ঞানলাভের পক্ষে এটি উপযোগী।

নাট্যদর্পণকাররা যে নাটকলক্ষণরত্নকোশের মনোযোগী অধ্যেতা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে এঁদের রচনা এই গ্রন্থটির দ্বারা খুব বেশি প্রভাবান্বিত হয়নি। স্থানে-স্থানে কিছু অভিমতের ও উদাহরণের সাদৃশ্য পাওয়া যায় বটে, তবে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। নিদর্শনস্বরূপ কিছু সাদৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে –

১.অভিমতের সাদৃশ্য ঃ

নাট্যদর্পণের বৃত্তির কিছু স্থলে নাটকলক্ষণরত্নকোশে আলোচিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের **অভি**মতটি সামান্য পরিবর্তিত রূপে উদ্ধার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ –

নাট্যদর্পণ	**নাটকলক্ষণরত্নকোশ**
১.একে তু বর্ণিতার্থতিরস্কারং বর্ণসংহারমামনন্তি। (না.দ.পৃঃ- ২০২)	১. বর্ণিতার্থস্য তিরস্কারো বর্ণসংহারঃ। (না. ল. র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ- ৯০)
২. কপটস্যান্যথাভাবমন্যে অধিবলমাহুঃ। (না. দ. পৃঃ- ২১২)	২. কপটস্যান্যথাকরণমধিবলম্। (না. ল. র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ- ৯৯)
৩.কেচিদপ্রস্তুতার্থবচনং প্রসঙ্গমিচ্ছন্তি। (না. দ. পৃঃ- ২১৪)	৩. অপ্রস্তুতার্থখ্যাপনং প্রসঙ্গঃ। (না. ল. র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ-১০৬)
৪.অন্যে তু ভবিষ্যদর্থতত্ত্বোপলব্ধিং ক্রমমিচ্ছন্তি। (না. দ. পৃঃ-২১০)	৪. ভবিষ্যত্তত্ত্বোপলব্ধিঃ ক্রমঃ। (না. ল. র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ-৯৮)
৫.অন্যে তু সংহতানাং প্রতিপক্ষাণাং বীজফলোৎপত্তিনিরোধকানাং বিশ্লেষকং ভেদরূপমুপায়ং ভেদনং মন্যন্তে। (না. দ. পৃঃ-১৯৭)	৫. সঙ্ঘাতেন মিলিতস্যার্থস্য ভঙ্গো ভেদঃ। (না. ল. র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ-৮০)
৬.অন্যে তু বর্তমানপ্রত্যক্ষার্থবাচকং হাস্যলেশকরং বচো ব্যাহারমিচ্ছন্তি। (না. দ. পৃঃ-২৪১)	৬. প্রত্যক্ষানুভবারূঢ়ো ব্যাহারো হাস্যলেশকৃৎ। (না. ল. র.একবিংশ অধ্যায়, পৃঃ-২৯৯)
৭. কেচিত্তু পাত্রান্তরে স্বব্যাপারং নিক্ষিপ্য যত্তু কার্যান্তরকরণং তদবলগিতম্ (না. দ. পৃঃ-২৫০)	৭. যত্রান্যস্মিন্ সমাবেশ্য কার্যমন্যৎ প্রকাশ্যতে। তচ্চাবলগিতম্ ... (না.ল.র.একবিংশ অধ্যায়,পৃঃ-২৯৭)

৮. ‘কৃতি’ নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, কোনো কোনো আচার্য ‘কৃতির’ পরিবর্তে ‘দ্যুতি’ পদটি স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের মত অনুসারে ক্রোধাদির প্রশমনের নাম দ্যুতি – ‘অপরে তু ক্রোধাদেঃ প্রাপ্তস্য শমনং দ্যুতিমামনন্তি’ (না.দ.পৃঃ-২২৪)। সাগরনন্দী-ই হলেন সেই আচার্য যিনি কৃতির পরিবর্তে ‘দ্যুতি’ নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গটি স্বীকার করেছেন এবং তাঁর-ই মতানুসারে ক্রোধ-ঈর্ষ্যা ইত্যাদির প্রশমনের নাম দ্যুতি –‘ঈর্ষ্যাক্লেশোপগমনং দ্যুতিঃ’ (না.ল. র. অষ্টম অধ্যায়,পৃঃ- ১১৪) ।

৯. অনুরূপে ‘পূর্বভাব’ নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে কোনো কোনো পূর্বাচার্য পূর্বভাবের পরিবর্তে ‘পূর্ববাক্য’ পদটি স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের মত অনুসারে বীজপ্রকাশক বাক্যের নাম পূর্ববাক্য – ‘মুখসন্ধ্যাদ্যুক্তবাক্যসদৃশবাক্যদর্শনং পূর্ববাক্যমঙ্গমস্য স্থানে কেচিদামনন্তি’ (না.দ.পৃঃ-২২৭)। সাগরনন্দী-ই হলেন সেই আচার্য ,যিনি ‘পূর্ববাক্য’ পদটি ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর-ই মতানুসারে বীজোদ্ঘাটক বাক্যের নাম পূর্ববাক্য – ‘বীজোদ্ঘাটনং পূর্ববাক্যম্’ (না. ল. র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ-১১৫)।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য আচার্যদের ন্যায় সাগরনন্দীর নাম-ও নাট্যদর্পণের কোথাও উল্লিখিত হয়নি। তাঁর অভিমতগুলি 'একে', 'অন্যে', 'কেচিৎ' ইত্যাদি পদপ্রয়োগের অন্তরালে উপস্থাপিত হয়েছে।

অপর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। নাট্যতত্ত্বের অন্যান্য গ্রন্থের অভিমত উল্লেখের ক্ষেত্রে নাট্যদর্পণকাররা শব্দগুলি অক্ষুণ্ন রেখে সংশ্লিষ্ট মতটি উদ্ধার করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হল নাটকলক্ষণরত্নকোশ। উল্লিখিত উদাহরণসমূহদৃষ্টে একথা স্পষ্ট যে, নাট্যদর্পণোদ্ধৃত পাঠের সঙ্গে বর্তমানে উপলভ্যমান নাটকলক্ষণরত্নকোশের পাঠের কিছু পার্থক্য রয়েছে। ডঃ. কে. এইচ. ত্রিবেদী এই বৈসাদৃশ্যের বিষয়ে দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ, নাট্যদর্পণকাররা সম্ভবতঃ নাটকলক্ষণরত্নকোশের অন্য কোনো সংস্করণ ব্যবহার করেছেন; দ্বিতীয়তঃ, নাট্যদর্পণ রচয়িতাদের কাছে নাটকলক্ষণরত্নকোশের মূল গ্রন্থটি ছিল-ই না, তাঁরা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে এই গ্রন্থের অভিমতগুলি উপস্থাপিত করেছেন, যার ফলে অল্প-বিস্তর প্রমাদ রয়ে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় অবধেয়। নাটকলক্ষণরত্নকোশের উল্লিখিত অভিমতগুলির অধিকাংশ-ই অভিনবভারতী এবং শৃঙ্গারপ্রকাশে-ও পাওয়া যায়। অতএব, নাট্যদর্পণে উদ্ধারের ক্ষেত্রে এই মতগুলির প্রকৃত উৎস যে কোন্‌টি, নাটকলক্ষণরত্নকোশ না শৃঙ্গারপ্রকাশ না অভিনবভারতী, তা নির্ণয় করা অসাধ্য।

২. উদাহরণের সাদৃশ্য ঃ

অল্প কিছু স্থলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণ ও নাটকলক্ষণরত্নকোশে এক-ই উদাহরণ উপন্যস্ত করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে –

১. 'বেণীসংহার' থেকে গৃহীত ''চঞ্চদ্‌ভুজভ্রমিত....'' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণ ও নাটকলক্ষণরত্নকোশ উভয়ত্র-ই 'পরিন্যাস' নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে গৃহীত হয়েছে।

২. 'বেণীসংহার' থেকে গৃহীত ''মথ্‌নামি কৌরবশতম্‌ .... '' ইত্যাদি উক্তি দু'টি গ্রন্থে-ই 'প্রাপণ' (বা প্রাপ্তি) নামক সন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে।

৩. 'বেণীসংহার' থেকে উদ্ধৃত কৃপাচার্যের উক্তির 'রাজন্‌ দুর্যোধন! মহান্‌ খলু দ্রোণপুত্রেণ বোঢুমধ্যবসিতঃ সমরভারঃ ...' এই অংশটি দুটি গ্রন্থে-ই 'ক্রম' নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে গৃহীত হয়েছে।

আলোচ্যমান গ্রন্থদ্বয়ের উদাহরণসাদৃশ্যের প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উল্লিখিত তিনটি উদাহরণ ছাড়া-ও এমন বহু উদাহরণ রয়েছে, যেগুলি নাট্যদর্পণ ও

নাটকলক্ষণরত্নকোশ এই দুটি গ্রন্থে-ই পাওয়া যায়, কিন্তু পার্থক্য হল সেগুলির সংশ্লিষ্ট বিষয়টি এক নয়। অর্থাৎ কোনো গ্রন্থের একটি-ই অংশ নাট্যদর্পণে একটি বিষয়ের এবং নাটকলক্ষণরত্নকোশে সম্পূর্ণ অন্য একটি বিষয়ের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে। কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া যাক্ –

১. ''আতাম্রতাম্ অপনয়ামি...'' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণে 'অধিবল' নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হয়েছে (না.দ.পৃঃ-২১২)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে এটি 'অনুনয়' নামক নাট্যলক্ষণের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত (না. ল. র. চতুর্দশ অধ্যায়, পৃঃ-১৯০)।

২. ''অন্যোন্যাস্ফালনভিন্ন...'' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণে 'ভেদন' নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে উল্লিখিত (না.দ.পৃঃ-১৯৭); নাটকলক্ষণরত্নকোশে এটি 'সমাধান' নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ (না. ল. র. অষ্টম অধ্যায়,পৃঃ-৭৯)।

৩. ''ভূয়ঃ পরিভবক্ষান্তিঃ...'' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণে 'উদ্ভেদ' নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ(না.দ.পৃঃ-১৯৫)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে এটি 'বিধান' নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ (না. ল. র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ-৭৯)।

৪. ''মনশ্চলং প্রকৃত্যৈব...'' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণে 'উদাহৃতি' নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ (না.দ.পৃঃ-২১০)। নাটকলক্ষণরত্নকোশে এটি 'রূপ' নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ- ৯৮)।

৫. ''সৎপক্ষমধুরগিরঃ...'' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণে 'অবস্পন্দিত' নামক বীথ্যঙ্গের উদাহরণ (না.দ.পৃঃ-২৫১); নাটকলক্ষণরত্নকোশে এটি শ্লেষজাতীয় বীজের উদাহরণ (না.ল.র. চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ- ১৫)।

৬. ''স্বর্গস্ত্রী যদি....'' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণে 'পরিভাবনা' নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে উল্লিখিত (না.দ.পৃঃ-১৯৯); নাটকলক্ষণরত্নকোশে এটি 'সংশয়' নামক নাট্যলক্ষণের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত (না.ল.র. চতুর্দশ অধ্যায়, পৃঃ-১৮৬)।

৭. ''তবাস্মি গীতরাগেন... '' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণে আহ্বানের দ্বারা পাত্রপ্রবেশের উদাহরণ (না.দ.পৃঃ-২৫৪); নাটকলক্ষণরত্নকোশে এটি 'অবলগিত' প্রকারের প্রস্তাবনার উদাহরণ (না.ল.র. একাদশ অধ্যায়, পৃঃ-১৪৭)।

৮. ''তীর্ণে ভীষ্মমহোদধৌ...'' ইত্যাদি উক্তি নাট্যদর্পণে ক্রোধজ অবমর্শের উদাহরণরূপে উল্লিখিত (না.দ.পৃঃ-১৯২); অন্যদিকে নাটকলক্ষণরত্নকোশে এটি ব্যসনজ অবমর্শের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত (না.ল.র. অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ-১০৫)।

নাট্যদর্পণ এবং কাব্যানুশাসন ঃ

জৈন আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দীতে রচনা করেন 'কাব্যানুশাসন'। মূলতঃ সাহিত্যতত্ত্বের বিষয়ে রচিত এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে নাট্যতত্ত্বের আলোচনা-ও এসেছে। এই গ্রন্থের নাট্যতত্ত্বের আলোচনাটি সর্বাংশে নাট্যশাস্ত্র-অনুসারী এবং এর মধ্যে নতুন, অভিনব কোনো তত্ত্ব বা তথ্যের উল্লেখ নেই।

পূর্বে-ই আলোচনা করা হয়েছে যে, নাট্যদর্পণ-রচয়িতা রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র ছিলেন আচার্য হেমচন্দ্রের শিষ্য। গুরুর প্রতি ছাত্রদের অসীম শ্রদ্ধার বহু নিদর্শন নাট্যদর্পণে পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকগুচ্ছের একটি শ্লোকে সর্বশাস্ত্রনিষ্ণাত আচার্য হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হয়েছে এইভাবে–

"শব্দ-প্রমাণ-সাহিত্য-ছন্দো-লক্ষ্মবিধায়িনাম্।

শ্রীহেমচন্দ্রপাদানাং প্রসাদায় নমো নমঃ ॥" (না.দ.পৃঃ-১৭০)

এছাড়া-ও রামচন্দ্র তাঁর রচিত কয়েকটি নাটকে আচার্য হেমচন্দ্রর শিষ্য হতে পারার কারণে স্বীয় কৃতার্থতা ব্যক্ত করেছেন। গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র নাট্যদর্পণের প্রারম্ভিক শ্লোকে জৈনী বাক্-এর বন্দনা করেছেন। গুরুর রচিত গ্রন্থের ন্যায় এঁরা-ও তাঁদের গ্রন্থের অধ্যায়গুলিকে 'বিবেক' নামে অভিহিত করেছেন।বাচিক অভিনয় বিষয়ক আলোচনার সময় 'বাচিক' পদটির ব্যুৎপত্তিনির্ণয়াবসরে নাট্যদর্পণকাররা আচার্য হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের 'প্রয়োজনম্' (৬/৪/১১৭) – এই সূত্রের দ্বারা 'ইকণ্'-প্রত্যয়ের প্রয়োগ স্বীকার করেছেন(না.দ.পৃঃ-২৭৫)।

আচার্যর প্রতি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের শ্রদ্ধা প্রশ্নাতীত হলে-ও, নাট্যদর্পণ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে কিন্তু এঁরা গুরুর মতামতের দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হননি। তাই নাট্যদর্পণের অল্প কয়েকটি মাত্র স্থলে কাব্যানুশাসনের অভিমতের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আচার্য হেমচন্দ্র তাঁর অভিমতগুলির সিংহভাগ গ্রহণ করেছেন নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী,কাব্যপ্রকাশ ইত্যাদি প্রাগ্ভাবী গ্রন্থ থেকে। তাই নাট্যদর্পণের সঙ্গে কাব্যানুশাসনের সাদৃশ্যের ক্ষেত্রগুলিকে 'কাব্যানুশাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব' নাকি 'অভিনবভারতী, কাব্যপ্রকাশাদির পরোক্ষ প্রভাব'– কোন্‌টি বলা সমীচীন, তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। ...যাই হোক্, এবার নাট্যদর্পণ ও কাব্যনুশাসনের কিছু সদৃশ অভিমত উদাহৃত করা যাক্–

নাট্যদর্পণ	কাব্যানুশাসন
১. তথাহি রামবদ্ বর্তিতব্যং ন রাবণবদিতি। (না.দ. পৃঃ -১৭১)	১. ...রামাদিবদ্ বর্তিতব্যং ন রাবণাদিবত্ ইত্যুপদিশতীতি। (কা.অনু. পৃঃ -০৪)
২. ধর্মস্য চ মোক্ষহেতুতয়া মোক্ষো2পি পারম্পর্যেন ফলম্। (না.দ. পৃঃ -১৭১)	২. দ্রব্যাদ্যনুযোগানামপি মোক্ষো2পি পারম্পর্যেন নিঃশ্রেয়স্প্রয়োজনত্বাৎ। (কা.অনু. পৃঃ -০২)
৩. অথ শিষ্টসময়পরিপালনায়... সমুচিতচেষ্টাধিদৈবতস্য সূত্রকারৌ নমস্কারশ্লোকং পরামৃশতঃ।(না.দ. পৃঃ -১৭১)।	৩. শিষ্টসময়পরিপালনায় শাস্ত্রকারঃ সমুচিতেষ্টদেবতাং প্রণিধত্তে। (কা.অনু. পৃঃ -০১).
৪. ....পরস্পরাবলোকনচুম্বনবক্রোক্ত্যাদিভেদনো2 নন্তপ্রকারঃ। (না.দ. পৃঃ -২৬০)	৪. স চ পরস্পরাবলোকনালিঙ্গনচুম্বনপানাদ্যনন্ত ভেদঃ।(কা.অনু. পৃঃ -১০৯)
৫. ক্বচিদকাণ্ডে গ্রথনম্। যথা বেণীসংহারে...দুর্যোধনস্য ভীষ্মপ্রমুখমহাবীরলক্ষক্ষয়কারিণি প্রবৃত্তে সমরসংরম্ভে শৃঙ্গারবর্ণনম্ ।(না.দ. পৃঃ -২৬৬)	৫. অকাণ্ডে গ্রথনম্। যথা বেণীসংহারে দ্বিতীয়ে2ঙ্কে দুর্যোধনস্য... তথাভূতভীষ্মপ্রমুখমহাবীর লক্ষক্ষয়কারিণি সমরসংরম্ভে প্রবৃত্তে শৃঙ্গারবর্ণনম্।(কা.অনু. পৃঃ -১৭০)
৬. ক্বচিদকাণ্ডে বিচ্ছেদো যথা বীরচরিতে রাঘবভার্গবয়োর্ধারাধিরূঢ়ে বীররসে 'কঙ্কণমোচনায় গচ্ছামি' ইতি রাঘবস্যোক্তিঃ । (না.দ. পৃঃ -২৬৭)	৬. অকাণ্ডে ছেদো যথা রত্নাবল্যাম্...। যথা বা বীরচরিতে... রাঘবভার্গবয়োর্ধারাধিরূঢ়ে বীররসে 'কংকণমোচনায় গচ্ছামি' ইতি রাঘবস্যোক্তৌ।(কা.অনু. পৃঃ -১৭১)
৭. অঙ্গিনো... রসস্য ভিদনুসন্ধানং দোষঃ। অনুসন্ধিহি সর্বস্বং রসপোষস্য...। যথা রত্নাবল্যাং চতুর্থে2ঙ্কে বাভ্রব্যাগমনাৎ সাগরিকাবিস্মৃতিরিতি।(না.দ. পৃঃ -২৬৮)	৭. অঙ্গিনঃ প্রধানস্যাননুসন্ধানং যথা রত্নাবল্যাং চতুর্থে2ঙ্কে বাভ্রব্যাগমনেন সাগরিকায়া বিস্মৃতিঃ। অনুসন্ধিহি সর্বস্বং সহৃদয়তায়াঃ।(কা.অনু. পৃঃ - ১৭১)
৮. পামরপ্রায়ঃ সর্বঃ প্রকর্ষেণ হসতি শোচতি বিভেতি পরনিন্দামাদ্রিয়তে, স্বল্পেনাপি সুভাষিতেন সর্বত্র বিস্ময়তে ইতি।(না.দ. পৃঃ - ২৬২)	৮. পামরপ্রায়ঃ সর্বো2পি হসতি শোচতি বিভেতি পরনিন্দামাদ্রিয়তে। স্বল্পসুভাষিতত্বেন চ সর্বত্র বিস্ময়তে। (কা.অনু. পৃঃ -১০১)
৯. তেন শৃঙ্গারস্য নেভৌ ভেদৌ শাবলেয়বাহুলেয়াবপি তু সম্ভোগে2পি বিপ্রলম্ভসম্ভাবনাসদ্ভাবাদ্ ... উভয়সংবলিতস্বভাবশৃঙ্গারঃ। ...অবস্থাদ্বয়মীলননিবন্ধনে চ সাতিশয়শ্চমৎকারঃ। যথা– একস্মিন্ শয়নে পরাঙ্মুখতয়া বীতোত্তরং... (ইত্যাদি)।(না.দ. পৃঃ -২৬০)	৯. তেন ন শৃঙ্গারস্যেভৌ ভেদৌ গোত্বস্যেব শাবলেয়বাহুলেয়ৌ,অপিতু তদ্দশাদ্বয়ে2প্যনুযায়িনী যা রতিঃ...তস্যাঃ স্বাদ্যমানং রূপং শৃঙ্গারঃ। অতএব তদ্দশাদ্বয়মীলন এব সাতিশয়শ্চমৎকারঃ। যথা– একস্মিন্ শয়নে বীতোত্তরং ...(ইত্যাদি)।(কা.অনু. পৃঃ -১০৮)

১০. তত্র কামস্য সর্বজাতিসুলভতয়া2ত্যন্ত-পরিচিততয়া চ সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ। ততঃ শৃঙ্গারানুগামিত্বাৎ হাস্যঃ। ততো হাস্যবিরোধিত্বাৎ করুণঃ।...ততো2র্থপ্রধানো রৌদ্রঃ। কামার্থয়োর্ধর্মজত্বাৎ ততো ধর্মপ্রধানো বীরঃ। অস্য চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাৎ ততো ভয়ানকঃ। (না.দ. পৃঃ -২৬০)	১০. তত্র কামস্য সর্বজাতিসুলভতয়া2ত্যন্ত-পরিচিতিতত্ত্বেন সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্যঃ।... তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততঃ... অর্থপ্রধানো রৌদ্রঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্মমূলত্বাৎ ধর্মপ্রধানো বীরঃ। তস্য ভীতাভয়প্রদানসারত্বাদনন্তরং ভয়ানকঃ।(কা.অনু. পৃঃ -১০৬)
১১. ...ধারাধিরূঢ়স্যাপি রসস্য পুনঃ পুনরুদ্দীপ্তির্দোষো। যথা কুমারসম্ভবে রতিপ্রলাপেষু। লব্ধপরিপোষো হি রসঃ পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্যমানো মালতীমাল্যমিব ম্লায়তি।(না.দ. পৃঃ -২৬৭)	১১. পুনঃ পুনর্দীপ্তির্যথা কুমারসম্ভবেষু রতিপ্রলাপেষু। উপভুক্তো হি রসঃ স্বসামগ্রীলব্ধপরিপোষঃ পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্যমানঃ পরিম্লানকুসুমকল্পঃ কল্পত ইতি।(কা.অনু. পৃঃ -১৭০)

সট্টক,গোষ্ঠী, হল্লীসক ও শ্রীগদিত– এই চতুষ্প্রকার উপরূপকের নাট্যদর্পণধৃত এবং কাব্যানুশাসনধৃত লক্ষণগুলি অবিকল অনুরূপ।তবে মনে হয়, এই লক্ষণগুলি নাট্যদর্পণকাররা শৃঙ্গারপ্রকাশ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, কাব্যানুশাসন থেকে নয়। কারণ, এই উপরূপকগুলির অতিরিক্ত আরো কয়েকটির লক্ষণ নাট্যদর্পণ ও শৃঙ্গারপ্রকাশে অবিকল এক।

উদাহরণের ক্ষেত্রে নাট্যদর্পণ ও কাব্যানুশাসনের কয়েকটি সাদৃশ্য চোখে পড়ে। যেমন – শৃঙ্গার, রসদোষ ইত্যাদি বিষয়ে দুই গ্রন্থে এক-ই উদাহরণের ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, এক-ই উদাহরণ,দুটি গ্রন্থে দুটি ভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য উদ্ধৃত হয়েছে, এমন নিদর্শন-ও আছে। যেমন – বেণীসংহার থেকে গৃহীত "চঞ্চদ্‌ভুজভ্রমিত...." ইত্যাদি শ্লোকটি কাব্যানুশাসনে রৌদ্ররসের উদাহরণরূপে ব্যবহৃত; নাট্যদর্পণে এটির ব্যবহার হয়েছে পরিন্যাস নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের বর্ণনাবসরে। একইভাবে "ক্বাকার্য শশলক্ষ্মণঃ..." ইত্যাদি শ্লোকটি কাব্যানুশাসনে ব্যভিচারিভাবসমূহের মিশ্রণের উদাহরণরূপে ব্যবহৃত; নাট্যদর্পণে এটি পরস্পরবিরোধী রসের উদাহরণরূপে গৃহীত।

উল্লিখিত সাদৃশ্যসমূহের পাশাপাশি নাট্যদর্পণকাররা কাব্যানুশাসনের কিছু কিছু মতের সঙ্গে বৈমত্য-ও পোষণ করেছেন। এবং এইভাবে স্বীয় আচার্যর সম্মত অভিমতের বিরোধিতার দ্বারা রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র তাঁদের স্বচ্ছ ও স্বাধীন চিন্তার প্রমাণ রেখেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

১. প্রথমে-ই বলা যেতে পারে দুই গ্রন্থের প্রারম্ভিক নমস্কার শ্লোকের বিষয়ে । উভয়গ্রন্থে-ই আরাধিতা হয়েছেন জৈনী বাগ্‌দেবী। কিন্তু রচনাশৈলী এবং উপস্থাপনার বিচারে নাট্যদর্পণের বন্দনাশ্লোকটি অনেক বেশি কাব্যিক, অর্থবহ এবং সেই কারণে বেশি মনোগ্রাহী।

২. নাট্যদর্পণ ও কাব্যানুশাসন–উভয়ত্র-ই দ্বাদশপ্রকার রূপক স্বীকার করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, কাব্যানুশাসনে সট্টককে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; অন্যদিকে নাট্যদর্পণে সম্পূর্ণতঃ প্রাকৃত রূপক সট্টককে প্রধানরূপকের মর্যাদা না দিয়ে তার পরিবর্তে প্রকরণিকা-কে এই তালিকার অন্তর্গত করা হয়েছে, যা যথেষ্ট-ই যৌক্তিক।

৩. কাব্যানুশাসনে দৃশ্যকাব্যকে রূপক ও উপরূপকভেদে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নাট্যদর্পণে, প্রকৃতপক্ষে, উপরূপক পদটির প্রয়োগ-ই করা হয়নি। কাব্যানুশাসনে অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দৃশ্যকাব্যকে 'পাঠ্য' ও 'গেয়' ভেদে বিভক্ত করে উপরূপকগুলিকে গেয় দৃশ্যকাব্যরূপে স্বীকার করা হয়েছে। নাট্যদর্পণে এরকম কোনো ভেদ-ও স্বীকৃত হয়নি। তাঁদের মতে, রূপকের ভেদ কেবলমাত্র দুইপ্রকার –

ক. প্রধানরস রূপক – নাটকাদি দ্বাদশবিধ রূপক এবং

খ. অপ্রধানরস রূপক – সট্টকাদি অন্যান্য বিভিন্ন রূপক।

৪. নাট্যদর্পণের সঙ্গে কাব্যানুশাসনের (কেবল কাব্যানুশাসনের কেন, প্রকৃতপক্ষে নাট্যতত্ত্বের পূর্বাপর যাবতীয় গ্রন্থের) প্রধান বৈমত্যের বিষয়টি রসসংক্রান্ত। সমস্ত নাট্যতাত্ত্বিক যেখানে মহর্ষি ভরতকে অনুসরণপূর্বক বলেছেন যে, সমস্ত প্রকার রস পরিণামে যেহেতু সহৃদয় হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করে, অতএব রস মাত্রে-ই সুখাত্মক; নাট্যদর্পণে এই অভিমতের বিরোধিতাপূর্বক বলা হয়েছে রস দুঃখাত্মক-ও হতে পারে। তাঁদের মতে, শৃঙ্গার,হাস্য ইত্যাদি রস আনন্দদায়ক হলে-ও,রৌদ্র-করুণ-বীভৎস-ভয়ানক–এই চতুর্বিধ রস কখনো-ই আনন্দজনক হতে পারে না। নাট্যতত্ত্বের মনোযোগী অধ্যেতার কাছে একথা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, রসের চরিত্র বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের মত প্রামাণ্য গ্রন্থের এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে স্বীয় আচার্যের অভিমতের বিরোধী মত পোষণ করা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র এবিষয়ে তাঁদের চিন্তার বলিষ্ঠতার প্রশংসনীয় প্রমাণ রাখতে পেরেছেন।

৫. কাব্যানুশাসন গ্রন্থে শান্তরস সহ মোট নয়প্রকার রস স্বীকার করা হয়েছে; স্নেহাদি অন্যান্য অনুভূতিকে এই গ্রন্থে রসের মর্যাদা দেওয়া হয়নি – "এতে নব এব ...রসাঃ। তেন...স্নেহো রসঃ ইতি অসৎ" (কা.অনু.পৃঃ-১০৬)। নাট্যদর্পণের গ্রন্থকাররা তাঁদের আচার্যের সঙ্গে সহমত হননি। তাই তাঁরা সুখ, দুঃখ,স্নেহ, লৌল্য ইত্যাদিকে-ও পৃথক রস রূপে গণ্য করেছেন।

নাট্যদর্পণের বৃত্তির কিছু স্থলে 'কেচিৎ' পদপ্রয়োগের দ্বারা আচার্য হেমচন্দ্রের অভিমতটি উল্লিখিত এবং খণ্ডিত হয়েছে; এমন অন্ততঃ তিনটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তবে উল্লেখ্য যে, এই মতগুলি আচার্য হেমচন্দ্র সম্পূর্ণতঃ কাব্যপ্রকাশ থেকে গ্রহণ করেছেন। তাই নাট্যদর্পণকারদের সমালোচনার প্রকৃত লক্ষ্য কাব্যানুশাসন না কি কাব্যপ্রকাশ– তা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

৬. কাব্যপ্রকাশের অনুসরণে কাব্যানুশাসনে-ও মেণ্ঠবিরচিত 'হয়গ্রীববধকাব্য' থেকে হয়গ্রীবের বর্ণনাটি রসদোষের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে (কা.অনু.পৃঃ-১৭১)। নাট্যদর্পণে রসদোষবিষয়ক আলোচনায় এর উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে–'কেচিদত্র হয়গ্রীববধে হয়গ্রীববর্ণনামুদাহরন্তি'(না.দ.পৃঃ-২৬৭)।নাট্যদর্পণকাররা কিন্তু এর সাথে সহমত নন। তাঁদের মতে এটি রসদোষ নয়; এটি ইতিবৃত্ত অর্থাৎ কাহিনীর বিন্যাসের দোষ। কারণ, এই অংশে প্রধান নায়কের চরিত্র বা কার্যকলাপের বিবরণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে, যা পর্যাপ্ত এবং সন্তোষজনক নয়। তাই বৃত্তিতে বলা হয়েছে –'স পুনর্বৃত্তদোষো বৃত্তনায়কস্যাল্পবর্ণনাৎ'(না.দ.পৃঃ-২৬৭)।

৭. কাব্যানুশাসনে রসদোষবিষয়ক আলোচনার সময় বলা হয়েছে, রস,স্থায়িভাব এবং ব্যভিচারিভাবগুলি সর্বদা বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারা প্রকাশিত হবে;এদের স্বশব্দনিবেদিতত্ব সর্বথা দোষাবহ–'রসস্থায়িব্যভিচারিণাং স্বশব্দেন বাচ্যত্বং দোষঃ' (কা.অনু.পৃঃ-১৫৯)। এপ্রসঙ্গে ধ্বনিকারের মতটি উল্লেখ করা যেতে পারে।তিনি-ও বলেছেন, রসাদির অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ স্বশব্দবাচ্যত্ব নেই, রসগুলি অভিধেয়ের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় –'অভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বমেব রসাদীনাং,ন তু অভিধেয়ত্বং কথঞ্চিৎ' (ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্দ্যোত)। নাট্যদর্পণে কিন্তু এই মতটির বিরোধিতাপূর্বক বলা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে রসাদির স্বশব্দবাচ্যত্ব দোষাবহ না-ও হতে পারে, যদি তা বিভাবাদির পুষ্টির সহায়ক হয়। অর্থাৎ রসাদির স্বশব্দনিবেদিতত্ব যে একান্তভাবে-ই একটি কাব্যদোষ, নাট্যদর্পণকাররা তা স্বীকার করছেন না। বৃত্তিতে তাই তাঁরা বলেছেন –'কেচিত্তু ব্যভিচারিরসস্থায়িনাং স্বশব্দেন বাচ্যত্বং রসদোষমাহুস্তদযুক্তম্, ব্যভিচার্যাদীনাং স্ববাচকপদপ্রয়োগে2পি বিভাবপুষ্টেঃ' (না.দ.পৃঃ-২৬৮)।

৮. নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, কোনো-কোনো আচার্যের মতে, যখন দুটি রস এক বা একাধিক সাধারণ বিভাবের দ্বারা উদ্বোধিত হয়, তখন বিভাবটি যে ঠিক কোন্ রসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই মতের বর্ণনায় নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে "পরিহরতি রতিং মতিং লুনীতে..." ইত্যাদি একটি শ্লোক-ও উদ্ধার করা হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে এই অভিমতটি এবং এই উদাহরণটি – দুটি-ই কাব্যানুশাসন থেকে গৃহীত। আচার্য হেমচন্দ্রসম্মত অষ্টবিধ রসদোষের মধ্যে এটি-ই প্রথম।কিন্তু নাট্যদর্পণে হেমচন্দ্রের এই অভিমতের বিরোধিতাপূর্বক বলা হয়েছে,এটি কোনোপ্রকার রসদোষের উদাহরণ নয়; এটি কেবলমাত্র বাক্যদোষ, প্রকাশভঙ্গির ত্রুটি।তাঁদের মতে, একথা সত্য যে, রতি-মতি-পরিহারাদি বিভাব যেমন শৃঙ্গাররসে, তেমনি করুণরসের ক্ষেত্রে-ও উদ্বোধের কারণরূপে পরিগণিত হতে পারে; তবে এটিকে রসদোষ বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। কারণ, যথাযথ

বাক্যবিন্যাসের দ্বারা-ই কাব্যের এই ত্রুটি সংশোধিত হতে পারে। অতএব কোনো ক্ষেত্রে এই সংমিশ্রণের সমস্যা দেখা দিলে তাকে রসদোষ না বলে বাক্যদোষের পর্যায়ভুক্ত করা-ই শ্রেয়ঃ।

নাট্যদর্পণ ও কাব্যানুশাসনের সংক্ষিপ্ত একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হল। কৌতূহলী পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, আচার্য হেমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে তো নাট্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন; তৎসত্ত্বে-ও তাঁর সুপণ্ডিত শিষ্যরা অন্য কোনো বিষয় না নির্বাচিত করে পুনরায় নাট্যতত্ত্বের-ই আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন কেন? সম্ভাব্য উত্তর এই যে, কাব্যানুশাসন যেহেতু প্রধানতঃ কাব্যতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের আলোচনমূলক গ্রন্থ, তাই নাট্যতত্ত্বের আলোচনার পরিমাণ এই গ্রন্থে অতি অল্প। স্বীয় আচার্যের এই অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য-ই যেন তাঁর সুযোগ শিষ্য রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নাট্যতত্ত্বের বিশদ আলোচনামানসে নাট্যদর্পণ রচনা করেন। এবং একথা-ও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নাট্যতত্ত্বের প্রায় সমস্ত আঙ্গিকের সোদাহরণ ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে উপনীত-ও হয়েছেন।

নাট্যদর্পণ এবং দশরূপক ঃ

নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসে ধনঞ্জয়-রচিত দশরূপক একটি মূর্ধণ্যভূত গ্রন্থ। দশরূপকের অন্তিম কারিকা থেকে জানা গেছে যে, মালবের পরমার বংশীয় রাজা মুঞ্জের রাজসভায় বিদগ্ধ পণ্ডিতরূপে ধনঞ্জয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে এই মুঞ্জ হলেন দ্বিতীয় বাক্‌পতিরাজ। খ্রীষ্টীয় ৯৭৪ থেকে ৯৯৫ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে তাঁর রাজত্বকালরূপে ঐতিহাসিকেরা চিহ্নিত করেছেন। যেহেতু ধনঞ্জয় মুঞ্জের সমসাময়িক এবং মুঞ্জের রাজত্বকালে-ই তাঁর প্রতিভার সমধিক বিকাশ ঘটেছিল, অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় দশরূপকের রচনাকাল মুঞ্জের সময়ে-ই অর্থাৎ দশম শতাব্দীর উত্তরার্ধে।

নাটক-প্রকরণাদি ভেদে রূপকের প্রধান যে দশটি ভেদ স্বীকৃত, সেগুলির সোদাহরণ বর্ণনা এবং তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা দশরূপকের বিষয়বস্তু। ধনঞ্জয় সম্ভবতঃ তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'দশরূপম্'। গ্রন্থের অন্তিম কারিকায় (৪/৮৬) তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। টীকাকার ধনিক-ও এই গ্রন্থের টীকার নামকরণ করেছেন 'দশরূপাবলোক'। পরবর্ত্তিকালে গ্রন্থটি 'দশরূপক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'দশরূপক' প্রায় তিনশত কারিকায় রচিত এবং চারটি প্রকাশে বিভক্ত। কারিকা অংশের রচয়িতা ধনঞ্জয়। 'অবলোক' নামক বৃত্তির রচয়িতা ধনিক। অবলোকের সাহায্য ব্যতিরেকে দশরূপকের অর্থবোধ অসম্পূর্ণ। মূলতঃ মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত হলে-ও, গ্রন্থের বহুস্থলে গ্রন্থকারের স্বকীয় চিন্তা অতি স্পষ্ট। ব্যঞ্জনাবৃত্তি অস্বীকার, রসানুভূতি সম্পর্কে

আলোচনা, নাট্যে শান্তরসের নিষেধ, রসবিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে।

নাট্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় যে সকল আলঙ্কারিক ধনঞ্জয়বিরচিত দশরূপকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, দশরূপকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নাট্যদর্পণ গ্রন্থ রচনা করেন। মানসিকতা যাই থাকুক্ না কেন, দুটি গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, নাট্যদর্পণ রচনার সময় গ্রন্থকারদের মানসপ্রত্যক্ষে দশরূপক সদা বিরাজমান ছিল। তাই নাট্যদর্পণের কোথাও দশরূপক বা দশরূপককার ধনঞ্জয়ের নামোল্লেখ না থাকলে-ও , উভয় গ্রন্থের চরিত্রগত, বিষয়গত ও আঙ্গিকগত অজস্র সাদৃশ্য সহজে-ই মনোযোগী পাঠকের চোখে পড়ে।

প্রারম্ভিক নমস্কারশ্লোক থেকে-ই এই সাদৃশ্যের সূত্রপাত। দশরূপকের নমস্কারশ্লোকটি গ্রন্থকারের ইষ্টদেবতা ভগবান বিষ্ণুর স্তুতিতে রচিত। এই শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুর দশাবতারের সঙ্গে সম্বন্ধরূপে দশপ্রকার রূপক স্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে নাট্যদর্পণের নমস্কারশ্লোকে উপাসনা করা হয়েছে জৈনী বাগ্‌দেবীর এবং এই শ্লোকে জৈন ধর্মগ্রন্থ আগমের দ্বাদশ অঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধরূপে দ্বাদশপ্রকার রূপক স্বীকার করা হয়েছে। এইভাবে ধর্মভাবনার সঙ্গে রূপকের সংখ্যার সংযুক্তিকরণের বিষয়টি দুই গ্রন্থে এক-ইরকম।

গ্রন্থরচনার আঙ্গিকগত বিচারে-ও দশরূপক এবং নাট্যদর্পণের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দশরূপক 'প্রকাশ' নামক চারটি অধ্যায়ে রচিত, নাট্যদর্পণ 'বিবেক' নামক চারটি অধ্যায় নির্মিত। দুটি গ্রন্থ-ই কারিকা ও বৃত্তি – এই দুই অংশে বিন্যস্ত। পার্থক্য এইমাত্র যে, প্রথমোক্ত গ্রন্থের কারিকাকার ও বৃত্তিকার ভিন্ন; দ্বিতীয় গ্রন্থের কারিকা ও বৃত্তি এক-ই ব্যক্তিদের রচনা। দুই গ্রন্থের কারিকাগুলি-ই অনুষ্টুভ্ ছন্দে এবং সূত্রাকারে নিবদ্ধ। দুই গ্রন্থের টীকাতে প্রায়শঃ-ই পারিভাষিক পদসমূহের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কেবলমাত্র বিষয়বিন্যাসে নয়, বিষয়নির্বাচনে-ও দশরূপক এবং নাট্যদর্পণের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়গ্রন্থে-ই প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে নাটকীয় ইতিবৃত্ত, অবস্থা, অর্থপ্রকৃতি, সন্ধি, সন্ধ্যঙ্গ, অর্থোপক্ষেপক, নাট্যোক্তি ইত্যাদি । নাট্যদর্পণের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং দশরূপকের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়গুলি প্রায় অনুরূপ। রূপকের বিভিন্ন প্রকার, তাদের লক্ষণ ও বর্ণনা, বীথ্যঙ্গসমূহ– এগুলি এখানে আলোচিত বিষয়। দশরূপকের এই অধ্যায়ে অতিরিক্তরূপে বৃত্তিসমূহের আলোচনা করা হয়েছে, যা নাট্যদর্পণের পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্য বিষয়। অন্যদিকে দশরূপকের এই অধ্যায়ে নাটক ও অঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা

হয়েছে, যা নাট্যদর্পণের প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। নাট্যদর্পণের তৃতীয় অধ্যায় এবং দশরূপকের চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ রস ও ভাবসংক্রান্ত। নাট্যদর্পণে অতিরিক্তরূপে চতুর্বিধ বৃত্তি এবং চতুর্বিধ অভিনয়ের আলোচনা রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দশরূপকে অভিনয় ও তার ভেদসংক্রান্ত কোনোরকম আলোচনা-ই করা হয়নি। শেষতঃ, নাট্যদর্পণের চতুর্থ অধ্যায় এবং দশরূপকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়গুলি প্রায় অনুরূপ। উভয়ত্র-ই সর্ববিধ রূপকে প্রযোক্তব্য কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উত্তমাদি ভেদে ত্রিবিধ শ্রেণীর পাত্রপাত্রী, নায়কের গুণ, নায়িকার গুণ, নায়িকার প্রকারভেদ, নায়কের সহায়ক, প্রতিনায়ক, রূপকের ভাষা, সম্বোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদি। নাট্যদর্পণে এর-ই সঙ্গে নান্দী ও ধ্রুবাবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, দশরূপকে এদুটি বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই।অতএব দেখা গেল কেবলমাত্র নান্দী, ধ্রুবা এবং অভিনয় এই তিনটি মাত্র বিষয় অতিরিক্ত; অন্যথায় দশরূপকে আলোচিত বিষয়গুলি-ই নাট্যদর্পণের-ও প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়েছে।

এতো হল নাট্যদর্পণ ও দশরূপকের বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের বিষয়। গ্রন্থমধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়গুলিকে আলোচনা সুবিধার্থে তিনটি প্রকারে ভেদ করা যেতে পারে–

১. কারিকার সাদৃশ্য

২. বাক্যের সাদৃশ্য এবং

৩. উদাহরণের সাদৃশ্য।

যেহেতু গবেষণাগ্রন্থের সর্বত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় দশরূপকের মতগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, তাই অতিবিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আলোচ্যমান গ্রন্থদ্বয়ের সাদৃশ্যগুলির সামান্য কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছে–

১. কারিকায় সাদৃশ্য ঃ

নাট্যদর্পণের বহু কারিকার সঙ্গে দশরূপকের কারিকার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল–

নাট্যদর্পণ	দশরূপক
১. ধীরোদ্ধতশ্চলশ্চণ্ডো দর্পী দম্ভী বিকত্থনঃ।(না.দ.১/৮ পৃঃ -১১)	১. ধীরোদ্ধতস্ত্বহঙ্কারী চলশ্চণ্ডো বিকত্থনঃ।(দশ.রূ. ২/৬ পৃঃ -১৭১)
২. ধীরোদাত্তো2তিগম্ভীরো ন্যায়ী সত্ত্বী ক্ষমী স্থিরঃ।(না.দ.১/৮ পৃঃ -১১)	২. মহাসত্ত্বো2তিগম্ভীরো ক্ষমাবানবিকত্থনঃ।(দশ.রূ. ২/৪ পৃঃ -১৬৫)

৩. বস্তুনঃ সূচনং চূলা পাত্রৈর্নেপথ্যসংস্থিতৈঃ। (না.দ.১/২৬ পৃঃ -২৫)	৩. অন্তর্জবনিকাসংস্থৈশ্চূলিকার্থস্য সূচনা।(দশ.রূ. ১/৬১, পৃঃ -১৪৫)
৪. ফলায়ৌৎসুক্যমারম্ভঃ।(না.দ.১/৩৫ পৃঃ -৩৫)	৪. ঔৎসুক্যমাত্রমারম্ভঃ ফললাভায় ভূয়সে। (দশ.রূ.১/২০, পৃঃ - ৩১)
৫. পুষ্পং বাক্যং বিশেষবৎ। (না.দ.১/৪৯, পৃঃ -৫২)	৫. পুষ্পং বাক্যং বিশেষবৎ । (দশ.রূ. ১/৩৪, পৃঃ -৭০)
৬. ভাণোক্তসন্ধিবৃত্ত্যঙ্কো বাগ্‌যুদ্ধঃ করুণাঙ্গিকঃ।(না.দ.২/২৩, পৃঃ -৮৭)	৬. রসস্তু করুণঃ স্থায়ী... ভাণবৎ সন্ধিবৃত্ত্যঙ্গৈর্যুক্তঃ স্ত্রীপরিদেবিতৈঃ।(দশ.রূ. ৩/৭১, পৃঃ -৬৫)
৭. নির্ণয়ো2নুভবখ্যাতিঃ।(না.দ.১/৬৩, পৃঃ -৬৬)	৭. অনুভূতাখ্যা তু নির্ণয়ঃ।(দশ.রূ. ১/৫১, পৃঃ -১২৭)

২.বাক্যের সাদৃশ্য ঃ

নাট্যদর্পণের কারিকা এবং বৃত্তি – দুই অংশে-ই দশরূপকের অনুরূপ বহু বাক্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। তার কয়েকটি উদ্ধার করা যেতে পারে–

নাট্যদর্পণ	**দশরূপক**
১. বীজস্যোক্তিরুপক্ষেপঃ।(না.দ.১/৪৩, পৃঃ -৪৩)	১. বীজন্যাস উপক্ষেপঃ।(দশ.রূ. ১/২৭, পৃঃ -৪০)।
২. পরাবৃত্য রহস্যাখ্যা2ন্যস্মৈ তদপবারিতম্। (না.দ.১/১২, পৃঃ -১৪)	২. রহস্যং কথ্যতে2ন্যস্মৈ পরাবৃত্যাপবারিতম্। (দশ.রূ. ১/৬৬, পৃঃ -১৫৩)
৩. অঙ্কাস্যমন্তপাত্রেণ ছিন্নাঙ্কমুখযোজনম্ । (না.দ.১/২৬, পৃঃ -২৫)	৩. অঙ্কান্তপাত্রৈরঙ্কাস্যং ছিন্নাঙ্কস্যার্থসূচনাৎ। (দশ.রূ. ১/৬২, পৃঃ -১৪৭)
৪. ইত্যত্র পূর্বাঙ্কান্ত এব প্রবিষ্টেন সুমন্ত্রপাত্রেণ শতানন্দজনককথার্থবিচ্ছেদে উত্তরাঙ্কমুখসূচনাদ্ অঙ্কাস্যমিতি।(না.দ. পৃঃ -১৮১)	৪. ইত্যত্র পূর্বাঙ্কান্ত এব প্রবিষ্টেন সুমন্ত্রপাত্রেণ শতানন্দজনককথার্থবিচ্ছেদে উত্তরাঙ্কমুখসূচনাদঙ্কাস্যম্ ।(দশ.রূ. প্রথম প্রকাশ, পৃঃ -১৪৭)
৫. অগ্রাম্য ইষ্টাবর্জনরূপো বাগ্‌বেশচেষ্টাভিঃ পরিহাসো নর্ম।(না.দ. পৃঃ -২৫৫)	৫. অগ্রাম্য ইষ্টাবর্জনরূপঃ পরিহাসো নর্ম।(দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃঃ -২৫৪)
৬. নিযুদ্ধাদি তু রামায়ণীয়েষু ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণয়োরিতি।(না.দ. পৃঃ -২৫৬)	৬. (সম্ফেটঃ) ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণয়োশ্চ রামায়ণপ্রতিবদ্ধবস্তুষু।(দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃঃ -২৭০)
৭. উদয়নচরিতে কিলিঞ্জহস্তিপ্রয়োগঃ । (না.দ. পৃঃ -২৫৬)	৭. যথোদয়নচরিতে কিলিঞ্জহস্তিযোগঃ ।(দশ.রূ. দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃঃ -২৬৮)

৩. উদাহরণের সাদৃশ্য ঃ

নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে উপন্যস্ত প্রায় পঞ্চাশটি উদাহরণ দশরূপক থেকে গৃহীত । এর মধ্যে কয়েকটি দশরূপকের অভিমত সহযোগে,কয়েকটি তদ্ব্যতিরেকে উল্লিখিত। অঙ্কাস্য, অঙ্কাবতার, বীজ, প্রযত্ন, প্রতিমুখ, প্ররোচনা, সন্ধি, গ্রথন, কৃতি, পূর্বভাব, ব্যাহার, গণ্ড, মৃদব, উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, অবস্পন্দিত, উপক্ষেপ, করণ, প্রাপণ,বিধান, সম্ফেট, আমুখ, নর্ম ইত্যাদি অজস্র বিষয়ের উদাহরণ নাট্যদর্পণকাররা দশরূপক থেকে গ্রহণ করেছেন।

এতদ্ব্যতীত এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে গ্রন্থবিশেষের একটি-ই অংশ নাট্যদর্পণ ও দশরূপক–এই দুই গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়ের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ –

১.'রত্নাবলী' থেকে গৃহীত 'উদয়নস্যেন্দোরিবোদ্‌বীক্ষতে....' ইত্যাদি অংশ নাট্যদর্পণে তৃতীয় প্রকার পতাকাস্থানকের উদাহরণরূপে প্রদত্ত (না.দ.পৃঃ-১৮৪); দশরূপকে এই অংশটি বিন্দুর উদাহরণরূপে উপন্যস্ত (দশ.রূ. প্রথম প্রকাশ, পৃঃ -২৮)।

২. 'বেণীসংহার' থেকে গৃহীত ''চঞ্চদ্‌ভুজভ্রমিত...... '' ইত্যাদি অংশ নাট্যদর্পণে পরিন্যাস নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণ (না.দ. পৃঃ -১৯৫); দশরূপকে এটি সমাধান নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত (দশ.রূ. প্রথম প্রকাশ, পৃঃ -১৪৭)।

৩.'বেণীসংহার' থেকে গৃহীত ''যৎ সত্যব্রতভঙ্গভীরুমনসা....'' ইত্যাদি অংশ নাট্যদর্পণে সমাহিতি নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে উপন্যস্ত (না.দ. পৃঃ -১৯৫); দশরূপকে এটি উদ্ভেদ নামক মুখসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে উল্লিখিত।

আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে কোনো একটি বিষয়ের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণ ও দশরূপক – এই দুই গ্রন্থে এক-ই আকরগ্রন্থ থেকে দুটি ভিন্ন অংশ উদাহৃত হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ –

১. নর্ম ও নর্মদ্যুতি নামক প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গদ্বয়ের উদাহরণরূপে নাট্যদর্পণ ও দশরূপকে রত্নাবলী নাটিকা থেকে দুটি ভিন্ন অংশ উপন্যস্ত হয়েছে ।(দ্রষ্টব্য ঃ না.দ.পৃঃ -২০৪,২০৫; দশ.রূ. প্রথম প্রকাশ, পৃঃ -৬৪,৬৬)

২. উদাহৃতি এবং সংগ্রহ নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণের ক্ষেত্রে-ও নাট্যদর্পণ ও দশরূপকে রত্নাবলী থেকে দুটি ভিন্ন অংশ উপস্থাপিত হয়েছে।(দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ -২০৮,২১০; দশ.রূ. প্রথম প্রকাশ, পৃঃ -৮২,৮৫)

৩. উদ্বেগ নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের উদাহরণরূপে আলোচ্যমান দুটি গ্রন্থে-ই বেণীসংহার থেকে দুটি ভিন্ন অংশ উপন্যস্ত হয়েছে। উদ্বেগের রত্নাবলী থেকে গৃহীত উদাহরণ-ও দুটি পৃথক অংশ থেকে উল্লিখিত ।(দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ -২১১; দশ.রূ. প্রথম প্রকাশ, পৃঃ -৯২)

আলোচিত উদাহরণসমূহদৃষ্টে স্পষ্ট-ই বোঝা যাচ্ছে, নাট্যদর্পণের উপর দশরূপকের প্রভাব কতখানি গভীর। আগে-ই বলা হয়েছে, নাট্যদর্পণের কোথাও দশরূপকগ্রন্থের বা গ্রন্থপ্রণেতা ধনঞ্জয়ের নামোল্লেখ করা হয়নি। 'কেচিৎ','অন্যে', 'অপরে','একে' ইত্যাদি পদপ্রয়োগের অন্তরালে দশরূপকের অভিমতগুলি উপন্যস্ত করা হয়েছে; সন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অনায়াসবোধ্য।

তবে এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে, প্রচুর আধমর্ণ্য সত্ত্বে-ও, নাট্যদর্পণ কিন্তু কখনো-ই দশরূপকের অন্ধ অনুসরণ নয়। বেশ কিছু স্থলে উভয় গ্রন্থের মতপার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

১. রূপ, ক্রম, দ্যুতি, শক্তি, বর্ণসংহার, নর্মদ্যুতি, উদ্ভেদ, ভেদন, ব্যবসায় ইত্যাদি সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণনির্ণয়ে উভয় গ্রন্থের মতপার্থক্য দেখা যায়।

২. অধিবল, প্রপঞ্চ, বাক্‌কেলী, অসৎপ্রলাপ, নালিকা, অবলগিত এই বীথ্যঙ্গগুলির লক্ষণনির্ণয়ে দুই গ্রন্থে মতবৈষম্য রয়েছে।

৩. নাট্যে শান্তরসের প্রয়োগকে নাট্যদর্পণে স্বীকার করা হয়েছে; দশরূপকে করা হয়নি।

৪. নাট্যদর্পণে 'মৃচ্ছকটিকম্'-কে একটি শুদ্ধ প্রকরণ রূপে অভিহিত করা হয়েছে; দশরূপকে এটি সঙ্কীর্ণ প্রকরণ রূপে অভিহিত।

৫.নাট্যদর্পণে 'প্রার্থনা' নামক একটি গর্ভসন্ধ্যঙ্গ স্বীকার করা হয়েছে; দশরূপকে এটি স্বীকৃত হয়নি।

৬. নাট্যদর্পণসম্মত 'ছাদন' নামক অবমর্শসন্ধ্যঙ্গের পরিবর্তে দশরূপকে 'ছলন'পদটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.নাট্যদর্পণসম্মত 'খেদ' ও 'বিরোধ' নামক অবমর্শসন্ধ্যঙ্গের পরিবর্তে দশরূপকে 'বিদ্রব' ও 'বিচলন' পদদুটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. নাট্যদর্পণোক্ত 'নিরোধ' নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের পরিবর্তে দশরূপকে 'বিবোধ'পদটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. নাটকের নায়কবিষয়ক আলোচনাবসরে নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হয়েছে, নাটকের নায়ক কেবলমাত্র ধীরোদাত্ত প্রকৃতির হবেন বলে কোনো-কোনো আচার্য মত পোষণ করে থাকেন। কিন্তু এই মতটি যেহেতু মহর্ষি ভরতের সম্মত নয়, অতএব এটি গ্রহণীয়-ও নয় – 'যে তু নাটকস্য নেতারং ধীরোদাত্তমেব প্রতিজানতে, ন তে মুনিসময়াব্যগাহিনঃ ...' (না.দ.পৃঃ-১৭৪)। এই অভিমতটি স্পষ্টতঃ-ই দশরূপককার ধনঞ্জয়ের। দশরূপকের তৃতীয় প্রকাশে নাটকের নায়কলক্ষণ আলোচনার সময় বলা হচ্ছে – 'অভিগম্যগুণৈর্যুক্তো ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্' (দশ.রূ.৩/২২,পৃঃ-৩৩)।

নাট্যদর্পণকাররা এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না। কারণ উপলভ্যমান বহু নাটকে ধীরললিতাদি প্রকৃতির পাত্ররা-ও নায়করূপে পরিগণিত হয়েছেন।

১০. প্রকরণের নায়কবিষয়ক আলোচনাবসরে নাট্যদর্পণে বলা হয়েছে, কোনো-কোনো আচার্য এই মত পোষণ করেন যে, প্রকরণের নায়ক কেবলমাত্র ধীরপ্রশান্ত প্রকৃতির হবেন; কারণ প্রকরণের নায়ক রূপে স্বীকৃত অমাত্য, বণিক্ ও বিপ্র– এই ত্রিবিধ পাত্র-ই ধীরপ্রশান্ত প্রকৃতির। কিন্তু এই মত গ্রহণীয় নয়; কারণ স্বয়ং মহর্ষি ভরতের মতে,সেনাপতি এবং অমাত্যরা হবেন ধীরোদাত্ত প্রকৃতির পাত্র।নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হয়েছে –'যস্ত্বমাত্যং নেতারমভ্যুপগম্য ধীরপ্রশান্ত নায়কমিতি প্রকরণং বিশেষয়তি, স বৃদ্ধসম্প্রদায়বন্ধ্যঃ' (না.দ.পৃঃ-২৩০)।এই সমালোচিত অভিমতটি-ও বস্তুতঃপক্ষে দশরূপককারের । এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশে প্রকরণের নায়কবিষয়ে আলোচনার সময় এদের ধীরপ্রশান্তত্ব স্বীকৃত হয়েছে –

"অমাত্যবিপ্রবণিজামেকং কুর্যাচ্চ নায়কম্।
ধীরপ্রশান্তং ...॥"(দশ.রূ.৩/৩৯-৪০,পৃঃ -৪৬)।

নাট্যদর্পণ এবং দশরূপকের সংক্ষিপ্ত একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হল। অন্তিমে একটি বিষয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। সেটি এই যে,দশরূপকের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নির্মিত নাট্যদর্পণ অনেক ক্ষেত্রে দশরূপককে অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হয়েছে। এরকম কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে –

১. অতি সংক্ষিপ্তির কারণে দশরূপক অনেক স্থলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য। নাট্যদর্পণে কিন্তু প্রতিটি বিষয় বিশদে আলোচিত।

২. বেশ কিছু স্থলে দশরূপকের আলোচনা অতি জটিল। নাট্যদর্পণে কিন্তু জটিল কোনো বিষয়ের যথাসম্ভব সরলীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.কোনো একটি বিষয়কে সহজবোধ্য করার মানসে নাট্যদর্পণে তৎসংশ্লিষ্ট বহু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দশরূপকে উদাহরণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম।

৪. বিষয়বিশেষের আলোচনার সময় নাট্যদর্পণে অন্যান্য গ্রন্থের তৎসংশ্লিষ্ট অভিমতগুলি-ও আলোচনা করা হয়েছে। দশরূপকে মাত্র দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতীত অবশিষ্ট সর্বত্র কেবলমাত্র গ্রন্থকার ও টীকাকারের মত-ই আলোচিত হয়েছে, পূর্বাপর কোনো গ্রন্থের নয়।

৫. নাট্যদর্পণে নান্দী, ধ্রুবা এবং অভিনয় বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে; দশরূপকে এই বিষয়গুলি অস্পৃষ্ট।

৬.নাট্যদর্পণের তুলনায় দশরূপকের বিষয়বিন্যাস অপেক্ষাকৃত অসম্বদ্ধ। অর্থপ্রকৃতির বিষয়টি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। দশরূপকে প্রথমে ইতিবৃত্তের মুখ্য ও প্রাসঙ্গিক ভেদে দ্বৈবিধ্যের কথা বলা হয়েছে। অনন্তর প্রাসঙ্গিক কথাবস্তুর ভেদরূপে পতাকা ও প্রকরীর আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকীয় ইতিবৃত্তকে প্রখ্যাত, উৎপাদ্য ও মিশ্র ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এরপর কার্য এবং তদনন্তর বীজ ও বিন্দুর আলোচনা করা হয়েছে।এর-ও পর পঞ্চবিধ অর্থপ্রকৃতির নাম উল্লেখপূর্বক একটি কারিকা রচনা করা হয়েছে।ক্রমটি যে সুবিন্যস্ত নয়, তা স্পষ্ট-ই বোঝা যাচ্ছে।এর পরিবর্তে যেমনভাবে নাট্যদর্পণের আলোচনাটি করা হয়েছে, প্রথমে অর্থপ্রকৃতিসমূহের নাম এবং তারপর প্রতিটির সোদাহরণ ব্যাখ্যা–এটি-ই অনেক বেশি সুসম্বদ্ধ ।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যেতে পারে যে, বক্তব্যের স্বচ্ছতা, সহজবোধ্যতা, উদাহরণপ্রাচুর্য, অন্যান্য গ্রন্থের মতামত উল্লেখ ইত্যাদির বিচারে দশরূপকের তুলনায় নাট্যদর্পণের গুরুত্ব ও মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক।

নাট্যদর্পণ এবং ধ্বন্যালোক ঃ

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজানক আচার্য আনন্দবর্ধন রচনা করেন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থ। কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মার সময় ইনি বিরাজমান ছিলেন। 'রাজতরঙ্গিনী'র ''মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ...'' ইত্যাদি শ্লোক তার প্রমাণ।

'ধ্বন্যালোক' অলঙ্কারশাস্ত্রের শিরোমণি গ্রন্থ বললে-ও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের এমন মার্মিক ও সহৃদয় ব্যাখ্যা বিশ্বে দুর্লভ। তাঁর মতে, কাব্যের আত্মা হল ধ্বনি। শুধু ধ্বনি নয়, 'রসধ্বনি' বললে আরো নির্দিষ্ট করে নির্দেশ করা যেতে পারে। বাচ্যার্থ থেকে ভিন্ন এই ধ্বনির তিন ভেদ – বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে, উত্তমোত্তম কাব্যসমূহে প্রথম দুই প্রকার ধ্বনি রসধ্বনিতে-ই পর্যবসিত হয়।

চারটি উদ্দ্যোতে নির্মিত ধ্বন্যালোক গ্রন্থটি কারিকা ও বৃত্তি – এই দুই অংশে বিভক্ত। দুয়ের-ই রচয়িতা আনন্দবর্ধন কিনা –এবিষয়ে কিছু বিতর্ক থাকলে-ও অধিকাংশের-ই মত এই যে, আনন্দবর্ধন-ই স্বয়ং কারিকা ও বৃত্তি দুটি অংশ রচনা করেন।

ধ্বন্যালোকের উপর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ টীকাগ্রন্থ হল অভিনবগুপ্ত কর্তৃক বিরচিত 'ধ্বন্যালোকলোচন'। বস্তুতঃপক্ষে, এই টীকাটি প্রায় মূলগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। এই টীকা ব্যতিরেকে ধ্বন্যালোকের অর্থবোধ অসম্পূর্ণ।

নাট্যদর্পণের উপর ধ্বন্যালোকের প্রভাব খুব সুগভীর বলে মনে হয় না। কারণ, ধ্বন্যালোকে নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা প্রায় নেই বললে-ই চলে। তাই নাট্যদর্পণের তৃতীয় বিবেকের রসসংক্রান্ত আলোচনায় কিছু স্থল ব্যতীত অন্যত্র ধ্বন্যালোকের প্রভাব অনুমিত হয় না।... আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ধ্বন্যালোক থেকে আচার্য মম্মট এবং আচার্য হেমচন্দ্র যথাক্রমে তাঁদের বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থে বহু তথ্য উদ্ধার করেছেন। নাট্যদর্পণরচয়িতারা উক্ত গ্রন্থ দুটি-ও যথেষ্ট মনোনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। অতএব, ধ্বন্যালোকের সদৃশ অভিমতগুলি যে নিঃসন্দেহে ধ্বন্যালোক থেকে-ই গৃহীত, কাব্যপ্রকাশ বা কাব্যানুশাসন থেকে নয় – একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না।

যাই হোক্, আমরা এবার নাট্যদর্পণ ও ধ্বন্যালোকের সদৃশ অংশগুলির আলোচনায় আসি। প্রথম সাদৃশ্যের বিষয়টি রসদোষবিষয়ক। ধ্বন্যালোকস্বীকৃত বেশ কয়েকটি রসদোষ নাট্যদর্পণে-ও স্বীকার করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

১. রসবিশেষের উদ্বোধব্যাপারে প্রতিকূল বিভাবের প্রয়োগ (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ -২৬৬; ধ্বনি.আ.তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -১৮৭)

২. উত্তম-মধ্যম-অধম পাত্রসমূহের বিপরীত বর্ণনা (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ -২৬৭; ধ্বনি.আ.তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -১৮৭)

৩. অঙ্গরসের অতিবিস্তৃত বর্ণনা (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ -২৬৭; ধ্বনি.আ.তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -১৮৭)

৪. অকারণ দীর্ঘায়িত রসবর্ণনা (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ -২৬৭; ধ্বনি.আ.তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -১৮৭)

৫. বর্ণনীয় বিষয়বিশেষের আলোচনার মধ্যে আকস্মিক অপ্রাসঙ্গিক উক্তি (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ -২৬৭; ধ্বনি.আ.তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -১৮৭)

বিরোধী রসসমূহ বিষয়ে নাট্যদর্পণের আলোচনাটি-ও অনেকাংশে ধ্বন্যালোক- অনুসারী। কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখের অপেক্ষা রাখে –

নাট্যদর্পণ	ধ্বন্যালোক
১.একস্মিন্নাশ্রয়ে... পরস্পরবিরুদ্ধয়ো রসয়োর্বিরুদ্ধতা, ন তু ভিন্নে। (না.দ. পৃঃ-২৬৫)	১. বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ো যস্তু বিরোধী স্থায়িনো ভবেৎ। স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কার্যস্তস্য পোষে2প্যদোষতা ॥(ধ্বনি.আ.তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -২৩৪)
২. তথৈকাশ্রয়য়োরপি তুল্য-বলয়োর্বিরোধো ন তু হীনাধিকবলয়োঃ যথা– পুরূরবাঃ প্রাহ–'ক্কাকার্য শশলক্ষ্মণঃ... ' ইত্যাদি। (না.দ. পৃঃ -২৬৬)	২. যত্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠে তু বিবক্ষিতে রসে বিরোধিরসাঙ্গানাং বাধ্যত্বেনোক্তাবদোষঃ। যথা–'ক্কাকার্য শশলক্ষ্মণঃ...' ইত্যাদি।(ধ্বনি.আ.

	তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -২০৩)
৩.তথৈকাশ্রয়য়োঃ স্বৈরিণীস্তুল্যশক্ত্যোর্বিরুদ্ধয়োর্যোগে নৈরন্তর্যে বিরোধো ন ত্বিবিরুদ্ধেন রসান্তরেণ ব্যবধানে। যথা নাগানন্দে ... (না.দ. পৃঃ -২৬৬)	৩. একাশ্রয়ত্বে নির্দোষো নৈরন্তর্যে বিরোধবান্। রসান্ত রব্যবধিনা রসো ব্যঙ্গঃ সুমেধসা ॥ ...যথা শান্তশৃঙ্গারৌ নাগানন্দে নিবেশিতৌ ।(ধ্বনি.আ. তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -২৩৭)
৪.অয়ং স রশনোৎকর্ষী ...॥...অত্র ভূরিশ্রবসঃ সমরভুবি পতিতবাহুদর্শনেন তৎপ্রিয়ানাং শৃঙ্গারঃ স্মর্যমাণঃ করুণং পোষয়তি। (না.দ. পৃঃ -২৬৫-২৬৬)	৪. যতঃ... প্রাগবস্থাভাবিভিঃ সংস্মর্যমানৈর্বিলাসৈরধিকতরং শোকাবেশমুপজনয়ন্তি। যথা– অয়ং স রশনোৎকর্ষী ...ইত্যাদি ।(ধ্বনি.আ. তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -২১৩)
৫. তথা স্বৈরিণোঃ স্বতন্ত্রয়োঃ সতোর্বিরুদ্ধয়োঃ রসয়োর্বিরুদ্ধতা, ন তু পরতন্ত্রস্বতন্ত্রয়োর্মুখস্যায়ত্তয়োর্বা। (না.দ. পৃঃ -২৬৫)	৫. ইয়ং চাঙ্গভাবপ্রাপ্তিরন্যা যদ্... প্রধান একস্মিন্ বাক্যার্থে রসয়োর্ভাবয়োর্বা পরস্পরবিরোধিনোর্দ্বয়োরঙ্গভাবগমনং তস্যামপি ন দোষঃ। যথোক্তং ‘ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ’ ইত্যাদৌ (ধ্বনি.আ. তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -২০৫)

নাট্যদর্পণধৃত ঔচিত্যবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে ধ্বন্যালোকের কিছু প্রভাব অনুমিত হয়। আচার্য আনন্দবর্ধনের মতে রসোদ্বোধে ঔচিত্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঔচিত্য-ই হল রসাস্বাদের প্রাণ ।ঔচিত্যবিহীন কাব্য কখনো উত্তম কাব্যরূপে পরিগণিত হতে পারে না। অনৌচিত্য-ই হল কাব্যে রসোৎকর্ষের সবচেয়ে বড় বাধা। ধ্বনিকারের মতে –

‘‘অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা ॥’’(ধ্বনি.আ. তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃঃ -১১৩)

নাট্যদর্পণে-ও এই অভিমতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে বলা হচ্ছে, রসদোষসমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম হল অনৌচিত্য। আরো বলা হচ্ছে, অন্যান্য রসদোষগুলিকে অনৌচিত্যের অন্তর্ভুক্তরূপে-ই গণ্য করা যেতে পারে –‘অঙ্গৌগ্র্যাদয়শ্চ দোষঃ পরমার্থতো2নৌচিত্যান্তঃপাতিনঃ’ (না.দ.পৃঃ-২৬৮)। শুধু রসদোষবিষয়ক আলোচনাবসরে-ই নয়, নাট্যদর্পণের প্রথম বিবেকের অন্তর্গত সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গসমূহের প্রয়োজনবিষয়ক আলোচনাতে-ও ধ্বন্যালোকের অনুসরণে নাট্যদর্পণকাররা এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, নাট্যে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গসমূহের প্রয়োগ রসানুসারী ও ঔচিত্যানুগ হতে হবে, কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দেশবশতঃ এদের প্রয়োগ করা উচিৎ নয়।

নাট্যদর্পণ এবং কাব্যপ্রকাশ ঃ

সংস্কৃত সাহিত্যমীমাংসার ক্ষেত্রে আচার্য মম্মট-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। মূলতঃ 'সুধাসাগর' (বা 'সুধোদধি') নামক কাব্যপ্রকাশের একটি টীকা এবং অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, মম্মটের আবির্ভাবকাল খ্রীঃ একাদশ শতকের প্রথমার্ধে কাশ্মীরের আনন্দপুর নামক স্থানে। মুখ্যতঃ ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবক্তা আচার্য আনন্দবর্ধনের কাব্যসমালোচনার নিয়মগুলি অনুসরণ করলে-ও,'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের বহুস্থলে মম্মটাচার্য তাঁর স্বাধীন চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। আচার্য ভামহের 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'– এই সংজ্ঞাসূত্র অবলম্বন করে মম্মট শব্দার্থের সাহিত্যকে কাব্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং কাব্যের বৈশিষ্ট্যাধায়ক ধর্মরূপে গুণ,অলঙ্কার ও দোষের অভাবকে স্বীকার করেছেন। শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য, রসচর্বণার প্রকারভেদ, ব্যঞ্জনার সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য, দোষসমূহের বিস্তারিত বিবরণ, রসপরিবেশনে গুণ ও অলঙ্কারের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিবিধ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় পূর্ণ কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থটি পাঠকসমাজের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্রেক করে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে একথা-ও বলা উচিৎ যে, ন্যায়দর্শন-মীমাংসাদর্শন-বেদান্ত দর্শন-ব্যাকরণপ্রস্থান-বৌদ্ধপ্রস্থান ইত্যাদি অসংখ্য শাখার অবতারণা এবং সাহিত্যমীমাংসার সূত্রগুলির সঙ্গে এদের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ক্ষেত্রবিশেষে এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের কাছে অতি দুরধিগম্য।

নাট্যদর্পণরচনাকালে রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র যে কাব্যপ্রকাশ অধ্যয়ন করেছিলেন, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তবে এ-কথাও সত্য যে, প্রধানতঃ সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাত্মক কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে নাট্যতত্ত্বের আলোচনার পরিসর অতি স্বল্প । এই কারণে-ই নাট্যদর্পণের উপর কাব্যপ্রকাশের প্রভাব খুব বেশি নয়। মূলতঃ রসসংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে দুই গ্রন্থে কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কোথাও উল্লেখনীয় কোনো ঐকমত্য নেই।

আলোচ্যমান দুটি গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে কিছু শব্দসাদৃশ্য দেখা যায়। স্বল্প গুরুত্বের হলে-ও এখানে তাদের উল্লেখ করা হচ্ছে –

নাট্যদর্পণ	**কাব্যপ্রকাশ**
১.অথ শিষ্টসময়পরিপালনায় প্রত্যূহব্যূহোপশমনায় চ... সমুচিতেষ্টাধিদৈবতস্য সূত্রকারৌ নমস্কারশ্লোকং পরামৃশতঃ। (না.দ.পৃঃ-২৭১)	১. গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায় সমুচিতেষ্টদেবতাং গ্রন্থকৃৎ পরামৃশতি । (কা.প্র. প্রথম উল্লাস, পৃঃ-০১)
২....রামবদ্ বর্ত্তিতব্যং ন রাবণবদিতি...। (না.দ.পৃঃ-২৭১)	২....রামাদিবদ্ বর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিতি...। (কা.প্র. প্রথম উল্লাস, পৃঃ-০১)

রসসংক্রান্ত আলোচনায়, আরো নির্দিষ্টভাবে বললে রসদোষ এবং বিরোধী রসসমূহের যুগপৎ প্রয়োগবিষয়ক আলোচনায় নাট্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশের মধ্যে মতৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে একথাটি যদি-ও অনস্বীকার্য যে, উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনায় দুই গ্রন্থের-ই ভিত্তিভূমি হল আনন্দবর্ধনাচার্য-বিরচিত 'ধ্বন্যালোক', তবু নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, নাট্যদর্পণকাররা উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনাবসরে কাব্যপ্রকাশের সংশ্লিষ্ট মতামতের-ও বিশেষ বিমর্শ করেছেন। নাট্যদর্পণে গৃহীত কাব্যপ্রকাশের কয়েকটি উদাহরণকে আমরা এই বক্তব্যের প্রমাণরূপে গণ্য করতে পারি –

১. 'একস্মিন্ শয়নে...' (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ-২৬০, কা.প্র.চতুর্থ উল্লাস, পৃঃ-২১)

২.'অন্যত্র ব্রজতীতি...' (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ-২৬১, কা.প্র.চতুর্থ উল্লাস, পৃঃ-১৭)

৩. 'ক্বাকার্যঃ শশলক্ষ্মণঃ...' (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ-২৬৬, কা.প্র.চতুর্থ উল্লাস, পৃঃ-২১)

৪. 'অয়ং স রশনোৎকর্ষী...' (দ্রষ্টব্য ঃ না.দ. পৃঃ-২৬৫, কা.প্র.পঞ্চম উল্লাস, পৃঃ-৩৬) ইত্যাদি।

উল্লিখিত সহমতের পাশাপাশি বহুস্থলে নাট্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশের মতের বিরোধিতা-ও পরিদৃষ্ট হয়। সত্য বলতে, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত সাধারণ বিষয়গুলির মধ্যে সাদৃশ্যের পরিবর্তে বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা-ই বেশি।উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে –

১. কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসের সপ্তম কারিকায় আচার্য মম্মট স্থায়িভাবসমূহের যে তালিকাটি দিয়েছেন, তার মধ্যে নির্বেদের উল্লেখ নেই। অষ্টম থেকে একাদশ সংখ্যক কারিকা পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে ব্যভিচারিভাবসমূহের নাম, যার মধ্যে প্রথমে-ই উল্লেখ রয়েছে নির্বেদের। আবার এর অব্যবহিত পরবর্তী দ্বাদশ সংখ্যক কারিকায় নির্বেদকে শান্তরসের স্থায়িভাব রূপে স্বীকার করা হয়েছে– 'নির্বেদস্থায়িভাবো2পি শান্তো2পি নবমো রসঃ' (কা.প্র. চতুর্থ উল্লাস, পৃঃ-১৯)। এইভাবে এক-ই নির্বেদকে একবার ব্যভিচারিভাবরূপে, আবার স্থায়িভাবরূপে স্বীকার করার জন্য নাট্যদর্পণকাররা মম্মটচার্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মম্মট স্বয়ং অবশ্য নির্বেদের এই যুগপদ্ বর্গীকরণের পক্ষে একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, নির্বেদ যেহেতু অমঙ্গলজনক, তাই এটি প্রথমে উল্লেখের অযোগ্য।কিন্তু অন্যদিকে ব্যভিচারিভাব হওয়া সত্ত্বে-ও এর মধ্যে স্থায়িভাববৈশিষ্ট্য-ও বর্তমান। তাই প্রথমে উক্ত স্থায়িভাবসমূহের তালিকায় নির্বেদের অনুল্লেখ সত্ত্বে-ও পরে পৃথক ভাবে এর উল্লেখ করা প্রয়োজন – 'নির্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য প্রথমমনুপাদেয়ত্বে2প্যুপাদানং ব্যভিচারত্বে2পি স্থায়িতাভিধানার্থম্' (কা.প্র. চতুর্থ উল্লাস, পৃঃ-১৯)। নাট্যদর্পণকাররা এই অভিমতের সঙ্গে সহমত নন; তাঁদের মতে মম্মটাচার্যের এই বিচার অত্যন্ত স্ববিরোধী – 'মম্মটস্তু ব্যভিচারিকথনপ্রস্তাবে

নির্বেদস্য শান্তরসং প্রতি স্থায়িতাং , প্রতিকূলবিভাবাদিগ্রহ ইত্যত্র তু তমেব প্রতি ব্যভিচারিতাং চ ব্রুবাণঃ স্ববচনবিরোধেন প্রতিহত ইতি' (না.দ. পৃঃ-২৬৯)।

২. কাব্যপ্রকাশের সপ্তম উল্লাসে রসদোষবিচারাবসরে মেণ্ঠবিরচিত 'হয়গ্রীববধ' কাব্য থেকে হয়গ্রীবের বর্ণনাটি রসদোষের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। মম্মটের মতে, অপ্রধান বস্তুর অতিবিস্তৃত বর্ণনার কারণে এটি একটি রসদোষের উদাহরণ – 'অঙ্গস্যাপ্রধানস্যাতিবিস্তরেণ বর্ণনং যথা হয়গ্রীববধে হয়গ্রীবস্য' (কা.প্র. সপ্তম উল্লাস, পৃঃ-৪৪১)। নাট্যদর্পণকাররা এর সঙ্গে সহমত নন। তাঁদের মতে, উল্লিখিত অংশে প্রধান নায়কের কার্যকলাপের অতিসংক্ষিপ্ত এবং অপর্যাপ্ত বিবরণের কারণে এটি ইতিবৃত্তের দোষ, রসদোষ নয়। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে তাই বলা হচ্ছে – "... কেচিদত্র হয়গ্রীববধে হয়গ্রীববর্ণনমুদাহরন্তি। স পুনর্বৃত্তদোষো বৃত্তনায়কস্যাল্পবর্ণনাৎ" (না.দ. পৃঃ-২৬৭)।

৩. কাব্যপ্রকাশসম্মত রসদোষসমূহের মধ্যে প্রথমটি-ই হল ব্যভিচারিভাবাদির স্বশব্দনিবেদিতত্ব। আচার্য মম্মটের মতে ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব,রস ইত্যাদির প্রতিপাদন ঘটে কেবলমাত্র বিভাবাদির দ্বারা ; এদের স্বশব্দবাচ্যত্ব সর্বথা দোষাবহ। কিন্তু নাট্যদর্পণকাররা এই অভিমতের সমালোচনাপূর্বক বলেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যভিচারিভাবাদির স্বশব্দবাচ্যত্ব দোষাবহ না-ও হতে পারে, যদি তা বিভাবাদির পুষ্টির সহায়ক হয় – 'কেচিত্তু ব্যভিচারিরসস্থায়িনাং স্বশব্দেন বাচ্যত্বং রসদোষমাহুস্তদযুক্তম্, ব্যভিচার্যাদীনাং স্ববাচকপদপ্রয়োগে2পি বিভাবপুষ্টেঃ' (না.দ. পৃঃ-২৬৮)।

৪. কাব্যপ্রকাশে আরেকটি রসদোষের উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে বলা হচ্ছে, যখন একাধিক রস, এক বা একাধিক সাধারণ বিভাব বা অনুভাবের দ্বারা উদ্বোধিত হয়, তখন বিভাব বা অনুভাবটি যে ঠিক কোন্ রসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই মতের বর্ণনায় কাব্যপ্রকাশে "পরিহরতি রতিং মতিং লুনীতে..." ইত্যাদি শ্লোকের উদ্ধার করা হচ্ছে। নাট্যদর্পণের বৃত্তিতে এই অভিমতের সমালোচনাপূর্বক বলা হচ্ছে, কোনো ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ দেখা দিলে, একে রসদোষের পরিবর্তে বাক্যদোষের পর্যায়ভুক্ত করা উচিৎ –'এবমুভয়রসসাধারণবিভাবপদানাং কষ্টেন নিয়তবিভাবাভিধায়িত্বাধিগমো2পি সন্দিগ্ধত্বলক্ষণো বাক্যদোষ এব' (না.দ. পৃঃ-২৬৮)।

সাদৃশ্যের পরিবর্তে বৈসাদৃশ্য বেশি হলে-ও , উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নাট্যদর্পণরচয়িতা রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং সম্ভবপর সকল স্থলে তাঁরা সেই পরিচিতির প্রয়োগ-ও করেছেন।

এই অধ্যায়ে অত্রাবধি আলোচিত আটটি গ্রন্থের সবিশেষ প্রভাব নাট্যদর্পণে পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ভামহরচিত‘কাব্যালঙ্কার’ এবং দণ্ডীরচিত ‘কাব্যাদর্শ’ গ্রন্থের সঙ্গে নাট্যদর্পণের সামান্য কিছু ভাবসাদৃশ্য ও শব্দসাদৃশ্য চোখে পড়ে। গুরুত্বে স্বল্প হলে-ও আলোচনার সম্পূর্ণতাবিধানমানসে সেগুলির-ও উল্লেখ করা হল –

নাট্যদর্পণ	কাব্যালঙ্কার
১.প্রাণাঃ কবিত্বং বিদ্যানাং লাবণ্যমিব যোষিতাম্। ত্রৈবিদ্যবেদিনো2প্যস্মৈ ততো নিত্যং কৃতস্পৃহাঃ ॥ (না.দ. পৃঃ-০২)	১. অধনস্যেব দাতৃত্বং ক্লীবস্যেবাস্ত্রকৌশলম্ । অজ্ঞস্যেব প্রগল্ভত্বং অকবেঃ শাস্ত্রবেদনম্ ॥(কা.অ.১/৩, পৃঃ-০১)
২. অকবিত্বং পরস্তাবৎ কলঙ্কঃ পাঠশালিনাম্। অন্যকাব্যৈঃ কবিত্বং তু কলঙ্কস্যাপি চূলিকা ॥ (না.দ. পৃঃ-০২)	২. অকবিত্বমধর্মায় ব্যাধয়ে দণ্ডনায় চ । কুকবিত্বং পুনঃ সাক্ষান্মৃতিমাহুর্মনীষিণঃ ॥ (কা. অ. ১/১২, পৃঃ-০২)
৩.অর্থশব্দবপুঃ কাব্যম্ (না.দ.৩/২১,পৃঃ-১৩২)	৩. শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্ (কা.অ. ১/১৬,পৃঃ-০২)

নাট্যদর্পণ	কাব্যাদর্শ
১.নাসিকান্তে দ্বয়ং শ্বিত্রং.... কাব্যাভাবো বিপশ্চিতঃ ॥ (না.দ. পৃঃ-০২)	১. স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ (কা.আ. ১/৭, পৃঃ-২৪)
২. অর্থশব্দবপুঃ কাব্যম্ (না.দ.৩/২১,পৃঃ-১৩২)	২. শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী (কা.আ. ১/১০, পৃঃ-৩৫)

পরবর্তী গ্রন্থরাজির উপর নাট্যদর্পণের প্রভাব ঃ

নাট্যতত্ত্বের বিচারে স্বতন্ত্র এবং যথেষ্ট অভিনব হওয়া সত্ত্বে-ও পরবর্তী গ্রন্থসমূহের উপর নাট্যদর্পণের কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। প্রভাব তো দূরস্থান, পরভাবী নাট্যতাত্ত্বিকগণ এই গ্রন্থটিকে যথেষ্ট উপেক্ষা-ই করেছেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহে নাট্যদর্পণের নামোল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অথচ দশের পরিবর্তে দ্বাদশপ্রকার রূপকের যৌক্তিক স্বীকরণ, সুখাত্মক ও দুঃখাত্মকভেদে রসের বর্গীকরণ, প্রসিদ্ধ নয় প্রকার রসের অতিরিক্ত লৌল্য, স্নেহ ইত্যাদি রসের স্বীকৃতি, ভারতীবৃত্তি প্রসঙ্গে মহর্ষি ভরতের অভিমতের সমালোচনাপূর্বক স্বতন্ত্র মতপোষণ ইত্যাদি নানাবিধ অভিনবত্বের কারণে নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসে নাট্যদর্পণের নাম বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল একটি মহাগ্রন্থরূপে পরিচিত হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু পরভাবী আলঙ্কারিকবর্গ, যার মধ্যে শারদাতনয়, বিশ্বনাথ কবিরাজ, রূপ

গোস্বামী, সুন্দরমিশ্র, আচার্য জগন্নাথ প্রমুখের ন্যায় মূর্ধণ্যভূত ব্যক্তিরা বিরাজমান, এঁরা কেউ তাঁদের গ্রন্থে নাট্যদর্পণের মতামতগুলি আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেননি। হয়তো গ্রন্থকারদের জৈনধর্মাবলম্বিতার কারণে, হয়তো বা অন্য কোনো হেতুতে– কারণ যাই হোক্ না কেন, পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ নাট্যদর্পণকে সর্বথা অগ্রাহ্য করেছেন। ভাবপ্রকাশনধৃত উপরূপকের আলোচনায় নাট্যদর্পণের অনুরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা ও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। তবে এক্ষেত্রে-ও বক্তব্য এই যে, স্বয়ং নাট্যদর্পণকাররা উপরূপকসমূহের লক্ষণরচনাবসরে শৃঙ্গারপ্রকাশ থেকে বহু লক্ষণ অবিকলভাবে গ্রহণ করেছেন। অতএব ভাবপ্রকাশনকার শারদাতনয় প্রকৃতপক্ষে কোন্ গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, নাট্যদর্পণ নাকি শৃঙ্গারপ্রকাশ– তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

নাট্যদর্পণোত্তর গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র যে গ্রন্থে নাট্যদর্পণের সামান্য প্রভাব অনুমিত হয়, সেটির নাম 'কাব্যপ্রকাশখণ্ডন'।এটি কাব্যপ্রকাশের অভিমতসমূহের খণ্ডনমানসে রচিত একটি গ্রন্থ, গ্রন্থকার হলেন জনৈক জৈনাচার্য সিদ্ধিচন্দ্রগণি।[১] সমস্ত প্রকার রস যে পরিণামসুখাত্মক নয়, নাট্যদর্পণসম্মত এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। গ্রন্থকারের মতে, বাস্তবিক-ই করুণ, বীভৎস ইত্যাদি থেকে কখনো-ই আনন্দোৎপত্তি হতে পারে না। তবে এক-ই সঙ্গে, উল্লিখিত করুণাদিকে রসরূপে স্বীকার-ও করা যায় না– এরূপ মত-ও পোষণ করেছেন এই নব্য নাট্যতাত্ত্বিক । ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব,রস ইত্যাদির স্বশব্দবাচ্যত্ব সর্বথা দোষাবহ আচার্য মম্মট যে মত পোষণ করেছেন, নাট্যদর্পণকাররা তার সমালোচনাপূর্বক বলেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যভিচারিভাবাদির স্বশব্দবাচ্যত্ব দোষাবহ না-ও হতে পারে, যদি তা বিভাবাদির পুষ্টির সহায়ক হয় । কাব্যপ্রকাশখণ্ডন গ্রন্থে সিদ্ধিচন্দ্রগণি এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। কেবল তাই নয়, রসাদির স্বশব্দনিবেদিতত্বকে তিনি রসের উৎকর্ষাধায়ক এক প্রকার গুণরূপে স্বীকার করেছেন।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, কে. এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ - ১৯০

নাট্যদর্পণধৃত যাবতীয় তত্ত্বের যথাযথ আলোচনার পর, এইবার নাট্যদর্পণের সামগ্রিক মূল্যায়ন বিষয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাগ্‌ভাবী অপরাপর নাট্যতত্ত্বগ্রন্থের প্রতি নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের আধমর্ণ্য প্রশ্নাতীত। নাট্যদর্পণের উপর নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী, দশরূপক, কাব্যানুশাসন ইত্যাদি গ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম। এই প্রভাবান্বিত হওয়ার ব্যাপারটি অবশ্য অতি স্বাভাবিক। যে কোনো নবীন তাত্ত্বিকের পক্ষে-ই প্রাক্তন গ্রন্থসমূহে বিধৃত মতামতের সঙ্গে পরিচিতি এবং নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই মতসমূহের বিমর্শ একান্ত আবশ্যক। কারণ, তদ্ব্যতিরেকে নবীন গ্রন্থে সেইসকল অভিমতের সন্নিবেশ, সেগুলির পর্যালোচনা, স্বীয় গ্রন্থের সঙ্গে পূর্বতন গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি বিষয়গুলি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একান্ত বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর এইরূপ তত্ত্বগ্রন্থে রচয়িতার কাব্যনির্মাণক্ষমতা বা কল্পনাশক্তির প্রকাশের যথার্থ অবসর থাকে না; থাকে কেবল সমীক্ষা, বিশ্লেষণ ও তুলনাত্মক আলোচনাপূর্বক পর্যেষণার বিস্তৃত সুযোগ । তাই তাত্ত্বিক গ্রন্থপ্রণেতার পক্ষে পূর্বতন আচার্যদের অভিমতের অধ্যয়ন ও পরিবেশন অত্যাবশ্যক , ফলতঃ প্রাগ্‌ভাবী গ্রন্থসমূহের প্রভাব-ও অপরিহার্য।

একথা সর্বজনস্বীকৃত অবিসংবাদিত সত্য যে, মহর্ষি ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রকে এককথায় 'নাট্যতত্ত্বের বিশ্বকোষ'রূপে চিহ্নিত করা যায়। এই মহাগ্রন্থে নাট্যতত্ত্বের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং সেই কারণে-ই পরভাবী গ্রন্থগুলিতে একান্ত স্বকীয় ও উদ্ভাবিত বিষয়বিশেষের অবতারণা ও আলোচনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সর্বজনমানিত মুনি ভরতের এই সর্বাতিশায়ী মাহাত্ম্য ও প্রভাবের কথা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন দশরূপককার আচার্য ধনঞ্জয়। উক্ত গ্রন্থের নমস্কারশ্লোকে তিনি দশবিধ রূপকের প্রযোক্তা ও ব্যাখ্যাতা এবং নাট্যবিষয়ক নিখিল তত্ত্বের বেত্তা মহর্ষি ভরতকে ইষ্টদেবতারূপে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন। আচার্য ধনঞ্জয় স্পষ্টতঃ বলছেন, মহর্ষি ভরত ব্যতীত অন্য কোনো মর্ত্য মানুষের পক্ষে নাট্যবেদের সমগ্র লক্ষণ নির্ণয় সম্ভব নয়। অতিবিস্তৃত এই নাট্যশাস্ত্রের আলোচনায় অল্পধী ব্যক্তিদের মতিভ্রম হতে পারে, একমাত্র সেই কারণে-ই নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়সমূহকে সরলভাবে ও সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশনের মানসে তিনি 'দশরূপক' রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন –

''ব্যাকীর্ণে মন্দবুদ্ধীনাং জায়তে মতিবিভ্রমঃ।

তস্যার্থস্তৎপদৈস্তেন সংক্ষিপ্য ক্রিয়তে2ঞ্জসা॥'' (দশ.রূ.১/৫)

বলা বাহুল্য, মহর্ষি ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রের প্রাধান্য ও প্রামাণ্য বিষয়ক এই অভিমতটি কেবলমাত্র দশরূপককারের নয়, অপরাপর সকল নাট্যতাত্ত্বিকের দ্বারা-ও স্বীকৃত।

নাট্যশাস্ত্রে নাট্যতত্ত্বের যাবতীয় বিষয় পর্যালোচিত হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বে-ও উত্তরকালে রচিত নাট্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থগুলি কেবলমাত্র নাট্যশাস্ত্রের চর্বিতচর্বণ এবং তাদের প্রণয়ন সর্বথা নিষ্প্রয়োজন– এই অভিমত যাঁরা পোষণ করেন, সেই সমালোচকদের সঙ্গে সহমত হওয়া যায় না। এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে আচার্য হেমচন্দ্র তাঁর 'প্রমাণমীমাংসা' গ্রন্থে অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ একটি তর্কের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আচার্য পাণিনির পূর্বে বহু বৈয়াকরণ ছিলেন। স্বয়ং পাণিনি তাঁর রচনায় শাকটায়ন, শাকল্য, পরাশর প্রমুখ আচার্যের নামোল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আচার্য কণাদের পূর্বে বিরাজমান ছিলেন বহু দার্শনিকপ্রবর। তৎসত্ত্বে-ও যখন ব্যাকরণ এবং বৈশেষিকদর্শনের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতারূপে যথাক্রমে পাণিনি এবং কণাদের নাম করা হয়, তখন কেউ তো তার বিরোধ করেন না। যে নাট্যশাস্ত্রর তুলনায় পরভাবী রচনাগুলিকে অসার বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, সেই নাট্যশাস্ত্রের পূর্বে-ও যে বহু নাট্যতত্ত্বাত্মক গ্রন্থ ছিল, তার প্রমাণ নাট্যশাস্ত্রে-ই বহুশঃ পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থমধ্যে বহুস্থলে 'অত্র আর্যা', 'অত্র শ্লোকঃ', 'আনুবংশ্যশ্লোকঃ' ইত্যাদি উক্তির দ্বারা প্রাগ্ভাবী রচনার উদ্ধার করা হয়েছে। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে নটসূত্রের উল্লেখ করেছেন, যা সন্দেহাতীতভাবে ভরত-পূর্ববর্তী যুগের রচনা।[১] এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত তথ্যের পর-ও সর্বকালের সকল সমালোচক মহর্ষি ভরতকে নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতারূপে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তার কারণ হল, মহর্ষি ভরত-ই প্রথম তাঁর নিজস্ব মতামতের সামগ্রিক সন্নিবেশে একটি মহাগ্রন্থ নির্মাণ করেন, যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কলনটির মধ্যে তিনি তাঁর প্রাগ্ভাবী আচার্যদের অভিমতের প্রয়োজনানুগ আত্তীকরণ করেছেন। অবিকল এই কার্যটি-ই সাধিত হয়েছে পরভাবী নাট্যতাত্ত্বিকবর্গের রচনায়, যেখানে তাঁরা প্রাক্তন গ্রন্থরূপে পেয়েছেন নাট্যশাস্ত্রকে। কেউ তার সঙ্গে স্বকীয় মতামতের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করেছেন, কেউ অর্বাচীন পাঠকের সুবিধার্থে সমুদ্রোপম নাট্যশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন, আবার কেউ বা কেবলমাত্র নাট্যকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অংশমাত্রের বিমর্শ করেছেন। অতএব ভরতোত্তর যুগের রচনাগুলি অপ্রয়োজনীয় ভাবে পুনরাবৃত্ত – এই মত যথেষ্ট বিচারসহ নয় এবং এইসকল গ্রন্থের প্রণেতাবর্গ যথেষ্ট সমাদরের যোগ্য নন – এই অভিমত-ও অত্যন্ত নিন্দনীয়।[২]

তত্ত্বগ্রন্থের সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে-ও আমরা এই আধমর্ণ্যের বিষয়টি অনুভব করতে পারি। কালিদাসের ন্যায় মহাকবি, ভবভূতির ন্যায় মহান্ নাট্যকার – এঁরা সকলে-ই স্বীয় কাব্যরচনাব্যাপারে মূল কাহিনী সংগ্রহ করেছেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে। নাটক, মহাকাব্য ইত্যাদির লক্ষণে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে, এগুলির বৃত্তান্ত হবে প্রখ্যাত অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণাাদিপ্রসিদ্ধ।

অতএব এইজাতীয় কাব্যরচনার ব্যাপারে ইতিহাসাদির নিকট রচয়িতার ঋণের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ। এই ঋণের প্রতি নির্দেশ করে আচার্য রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে অত্যন্ত সরস ভঙ্গিতে মন্ত ব্য করেছেন–

"নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনঃ নাস্ত্যচৌরঃ বণিগ্‌জনঃ।

স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্॥"(কাব্যমীমাংসা, প্রথম অধিকরণ, একাদশ অধ্যায়)

কবি, নাট্যকার প্রমুখ প্রাচীন কাহিনী থেকে কতখানি সার সংগ্রহ করলেন, তা বিচার্য নয়। সেই কাঠামো-মাত্রকে আশ্রয় করে, বৈদগ্ধ্যের বিচ্ছুরণে ও প্রতিভার নব-নব উন্মেষে, অনুপম শৈলীর দ্বারা কবি কিভাবে তিলে-তিলে তাঁর কাব্যপ্রতিমাকে নির্মাণ করেন, সহৃদয়ের কাছে তাই একমাত্র বিচারার্হ। প্রাচীন গ্রন্থাদির ভিত্তিতে কাব্যবিরচনের দ্বারা কবি যেমন পুনরাবৃত্তিদোষে অভিযুক্ত হন না, অনুরূপভাবে তত্ত্বগ্রন্থপ্রণয়নকালে-ও পূর্বতন গ্রন্থরাজির প্রতি আধমর্ণ্য এবং রচনায় সেই সকল গ্রন্থের প্রভাব দোষের বা অনাদরের কারণরূপে গণ্য হতে পারে না। অতএব নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী, দশরূপকাদি বিভিন্ন গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলে-ও স্বাতন্ত্র্যবিহীন গ্রন্থরূপে নাট্যদর্পণের চিহ্নিতকরণ সর্বথা অনুচিত।

সংস্কৃত তথা ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের বিকাশে জৈনধর্মাবলম্বী আচার্যদের অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, শব্দতত্ত্ব, ছন্দ,শিল্পকলা, গণিত, পূর্তবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাজনীতি, নীতিকথা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যার শাখায় এঁরা বহু মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। জৈনধর্মের দ্বাদশ অঙ্গ অর্থাৎ 'আগম' বা সিদ্ধান্তগুলির উপর রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। আগমগ্রন্থের সূত্রব্যাখ্যা করেছেন আচার্য নিজ্জুটি (বা নির্যুক্তি), 'উত্তরাধ্যয়ন'-এর টীকা রচনা করেছেন শান্তি সূরি ও দেবচন্দ্র গণি, 'কল্পসূত্র' রচনা করেছেন আচার্য ভদ্রবাহু। জিনসেন রচিত 'আদিপুরাণ', নেমিচন্দ্র রচিত 'গোম্মটসার', শীলঙ্ক বা শীলাচার্য রচিত 'মহাপুরুষচরিত' ইত্যাদি জৈনধর্মের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ-ই নয়, কাব্যচর্চায়-ও যে এই জৈনাচার্যগণ পশ্চাৎপদ ছিলেন না, বিমলসূরির 'পউমচরিঅ', আচার্য কুন্দকুন্দের বহু প্রাকৃত রচনা, পালিত্ত-বিরচিত ধর্মীয় উপন্যাস, সিদ্ধর্ষি-বিরচিত রূপকাত্মক গদ্যকাব্য, দিগম্বর অমিতগতি-রচিত দুটি নীতিমূলক স্তোত্র ও অন্যান্য রচনা – এসব-ই তার প্রমাণ। দর্শনের ক্ষেত্রে-ও এই জৈনাচার্যরা তাঁদের মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। কুমারিল ভট্টের দার্শনিক আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে লেখনী ধারণ করেন বিদ্যানন্দ এবং প্রভাচন্দ্র। দার্শনিকপ্রবক্তা হরিভদ্র-ও বহু নিবন্ধ রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য , আচার্য হরিভদ্রকে জৈন আগমসমূহের সূত্রগুলির প্রথম সংস্কৃত ব্যাখ্যাতারূপে অভিহিত করা হয়– "Probably,he was also the first to write commentaries to the canon in Sanskrit."[৩] 'কলিকালসর্বজ্ঞ'-রূপে

অভিহিত আচার্য হেমচন্দ্র রচনা করেন অসংখ্য দার্শনিক গ্রন্থ, যেগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রমাণমীমাংসা ইত্যাদি। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত জিনেন্দ্রবুদ্ধি, উমাস্বতী, ভট্টকের , কার্তিকেয় স্বামী, সিদ্ধসেন দিবাকর প্রমুখের নাম-ও জৈন সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মহিমায় ভাস্বর।[৪]

সাহিত্যতত্ত্বের বিষয়ে-ও জৈনাচার্যদের অবদান সবিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। হেমচন্দ্রাচার্য-রচিত 'কাব্যানুশাসন', বাগ্‌ভটাচার্য-রচিত 'কাব্যানুশাসন', 'বাগ্‌ভটালঙ্কার', 'অলঙ্কারমহোদধি', 'অলঙ্কারচিন্তামণি', 'কাব্যমীমাংসা', 'বক্রোক্তিপ্রকাশিকা' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের চর্চাকে বিশিষ্টভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্যতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে আসে নাট্যতত্ত্বের নাম। অতএব সঙ্গতভাবে-ই অনুমান করা চলে যে, নাট্যতত্ত্ববিষয়ে-ও এই জৈনাচার্যরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র কর্তৃক বিরচিত নাট্যদর্পণ ব্যতিরেকে এই বিষয়ে প্রণীত অন্য কোনো জৈনগ্রন্থের সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এটি-ই নাট্যদর্পণের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের অন্যতম একটি কারণ যে, জৈনাচার্য্যগণ কর্তৃক বিরচিত নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থরাজির মধ্যে একমাত্র প্রাপ্ত গ্রন্থ এই নাট্যদর্পণ; এই গ্রন্থের পূর্বকালীন, সমকালীন বা উত্তরকালীন অন্য কোনো নাট্যতত্ত্বমূলক জৈনগ্রন্থের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের ইতিহাসে নাট্যদর্পণ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থানের সঙ্গত অধিকারী।

নাট্যশাস্ত্রাদি বিভিন্ন প্রাগ্‌ভাবী গ্রন্থের যথেষ্ট প্রভাব থাকলে-ও, নাট্যদর্পণকাররা কিন্তু সেইসকল গ্রন্থে ধৃত মতামতের প্রতি নির্বিচার, অন্ধ আনুগত্য পোষণ করেননি। বরং যে-যে স্থলে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্য হয়েছে, সে সমস্ত স্থলে তাঁরা সেই মতামতগুলির সমালোচনা করেছেন। সমালোচনার সুরটি কোথাও-ই কঠোর হয়নি; কিন্তু এক-ই সঙ্গে একথা-ও উল্লেখ্য যে, নাট্যশাস্ত্রের ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ বা কাব্যানুশাসনের ন্যায় রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের আচার্য কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ – কোনোটি-ই এই সমালোচনার পরিসর থেকে বাদ যায়নি। রূপকের সংখ্যা, আঙ্গিকাদি চতুর্বিধ অভিনয়ের অতিরিক্তরূপে চিত্রাভিনয়ের স্বীকরণ, ভারত্যাদি চতুর্বিধ বৃত্তির প্রতিটির চতুর্ধা ভেদ, রসের সংখ্যা, রসের কেবলসুখাত্মকতা, প্রস্তাবনার পঞ্চবিধত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যদর্পণের বৈমত্য বিদ্যমান। ভারতীবৃত্তির প্রয়োগ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রধৃত মতের স্ববিরোধিতার প্রতি নাট্যদর্পণকাররা নির্দেশ করেছেন। এতদ্ব্যতীত নাট্যদর্পণের শেষ অংশে তেরোপ্রকার 'অন্য রূপক'-এর লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে, নাট্যশাস্ত্রে এগুলির উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না। অতএব নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যদর্পণের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়ে যে মতবৈষম্য রয়েছে, তা স্পষ্ট-ই প্রতীত হচ্ছে।[৫] আচার্য শঙ্কুক প্রথমে প্রহসন, ভাণ ইত্যাদিতে অধমশ্রেণীর পাত্রের নায়কত্ব অস্বীকার করার পর পুনরায়

বিটাদির নায়কত্ব স্বীকার করেছেন,এই স্ববিরোধের প্রতি নির্দেশ করেছেন নাট্যদর্পণকাররা – 'শঙ্কুকস্ত্বধমপ্রকৃতের্নায়কত্বমনিচ্ছন্ প্রহসনভাণাদৌ হাস্যরসপ্রধানে বিটাদের্নায়কত্বং প্রতিপাদয়ন্ কথমুপাদেয়ঃ স্যাত্' (না.দ. পৃঃ- ২৪০) । অভিনবগুপ্তাচার্যর অভিনবভারতী টীকার দ্বারা নাট্যদর্পণকাররা সবিশেষ প্রভাবিত; এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তৎসত্ত্বে-ও 'নাটক' পদের ব্যুৎপত্তি, স্নেহাদির রসত্ব, বৃত্তিব্যবহারের বিষয় – অন্ততঃ এই তিনটি ক্ষেত্রে নাট্যদর্পণকাররা গুপ্তপাদের অভিমতের বিরোধিতা করেছেন।[৬] অন্ততঃ দুটি স্থলে 'বৃদ্ধসম্প্রদায়বন্ধ্যঃ' হওয়ার কারণে তাঁরা দশরূপককার ধনঞ্জয়ের সমালোচনা করেছেন।[৭] রসদোষের আলোচনাবসরে তাঁরা মম্মটাচার্যের কিছু অভিমতের বিরূপ সমালোচনা করেছেন।[৮]এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের আচার্য হেমচন্দ্র-বিরচিত কাব্যানুশাসন গ্রন্থের সঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্য। গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বে-ও, যেসকল স্থলে তাঁর অভিমতের সঙ্গে কিছুমাত্র বৈমত্য হয়েছে, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নির্দ্বিধায় তা ব্যক্ত করে তাঁদের স্বচ্ছ ও স্বাধীন চিন্তাধারার প্রমাণ রেখেছেন। তাই রূপকের সংখ্যা, রসের কেবলসুখাত্মকত্ব, রসের সংখ্যা, স্নেহাদির রসত্ববিচার, রসদোষের বর্ণনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নাট্যদর্পণকাররা হেমচন্দ্রাচার্যের অভিমতের সমালোচনা করেছেন।[৯] অতএব স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র পূর্বতন কোনো রচনার-ই অন্ধ অনুসরণ করেননি। ঐসকল গ্রন্থধৃত যাবতীয় মতামতকে স্বীয় সাহিত্যচিন্তার নিকষে যথাযথ নিরীক্ষণের পর যোগ্যবোধে সেই অভিমতগুলিকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন মাত্র।

কেবলমাত্র সাহিত্যতাত্ত্বিক অভিমতের-ই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে নাট্যদর্পণকাররা বহু মূর্ধণ্যভূত সাহিত্যিকের রচনার-ও সমালোচনা করেছেন। 'মালতীমাধব' প্রকরণে কৈশিকীবৃত্তির অত্যধিক ব্যবহারের জন্য তাঁরা নাট্যকার ভবভূতির সমালোচনা করেছেন।[১০] 'মহাবীরচরিত'-এ যুদ্ধাবসরে শ্রীরামের 'কঙ্কণমোচনায় গচ্ছামি' এই উক্তিতে রসদোষের নির্দেশ করেছেন।[১১] মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের দুটি স্থলে, প্রথমতঃ, জগতের মাতাপিতাস্বরূপ পার্বতী ও মহাদেবের রতিক্রীড়াবর্ণনে এবং দ্বিতীয়তঃ, রতির বিলাপের দৈর্ঘ্যের বিষয়ে নাট্যদর্পণকাররা কালিদাসের রচনার বিরূপ সমালোচনা করেছেন।[১২] ভট্টনারায়ণবিরচিত 'বেণীসংহার'-এ যুদ্ধকালীন সময়ে দুর্যোধন ও ভানুমতীর শৃঙ্গারবর্ণনাকে অনুচিত বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] শ্রীহর্ষবিরচিত 'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্কে মন্ত্রী বাভ্রব্যের আগমনে রত্নাবলীর বিস্মরণকে অঙ্গরসের প্রাধান্যাত্মক রসদোষের উদাহরণরূপে চিহ্নিত করেছেন।[১৪]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র সমালোচনার দ্বারা কোনো একটি সমীক্ষাত্মক রচনার সম্পূর্ণতা সাধিত হয় না। পূর্ণতাবিধানকল্পে সেইসকল সমালোচনার উত্তরে যথার্থ , যুক্তিনিষ্ঠ

ও তথ্যনির্ভর কিছু স্বতন্ত্র অভিমতের সংস্থাপন একান্ত প্রয়োজন। সেই আঙ্গিকের বিচারে-ও নাট্যদর্পণের স্বকীয়তা গ্রন্থের বহুশঃ পরিদৃষ্ট হয়। দ্বাদশবিধ রূপক স্বীকার, প্রসিদ্ধ নবরসের অতিরিক্ত স্নেহাদির রসত্ব স্বীকার, রসের সুখদুঃখাত্মকত্ববাদ, নান্দী ব্যতীত পূর্বরঙ্গের অন্যান্য অঙ্গগুলির অস্বীকার, প্রস্তাবনার পঞ্চবিধ ভেদ অস্বীকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রাগ্‌ভাবী আচার্যদের মতামতের সমীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে অননুকরণীয় মৌলিকতায় নাট্যদর্পণকাররা তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ অভিমতের উপস্থাপনা করেছেন। অতএব একথা স্পষ্ট যে, নাট্যদর্পণ নিছক পূর্বতন গ্রন্থরাজিতে বিধৃত মতামতসমূহের সংক্ষিপ্ত সংকলন নয়, বরং সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের জগতে এই গ্রন্থটি অনন্য স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল এক অমূল্য মহাগ্রন্থ।

রচনাশৈলীর মূল্যায়ন ঃ

নাট্যদর্পণের রচনাশৈলীর মূল্যায়নব্যাপারে গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকগুচ্ছের কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন –

"ন সূত্রবৃত্ত্যোরাধিক্যং ন হীনত্বং ন কুণ্ঠতা।
যাবদর্থা গিরঃ সন্তি স্বয়ং সন্তো বিবেচতাম্ ॥
শব্দলক্ষ্ম-প্রমালক্ষ্ম-কাব্যলক্ষ্ম-কৃতশ্রমঃ ।
বাগ্‌বিলাসস্ত্রিমার্গো নৌ প্রবাহ ইব জাহ্নুজঃ ॥
রূপস্বরূপং বিজ্ঞাতুং যদীচ্ছত যথাস্থিতম্।
সন্ততস্তদানীং গৃহ্নীত নির্মলং নাট্যদর্পণম্ ॥"

–উল্লিখিত অংশটির মধ্যে নাট্যদর্পণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়–

প্রথমতঃ, সূত্র এবং বৃত্তি – রচনার দুটি অংশের কোনোটি-ই অতিবিস্তৃতি বা অতিসংক্ষিপ্তি দোষে দুষ্ট নয়। উভয়ত্র-ই শব্দচয়ন যথাযথ এবং যথার্থ । গ্রন্থের বহুশঃ রচনায় ঔচিত্যের ব্যবহার বিষয়ে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি উদাহরণ উপন্যস্ত করা যেতে পারে –

১.'অঙ্গৌগ্র্যাদয়শ্চ দোষাঃ পরমার্থতো2নৌচিত্যান্তঃপাতিনো2পি সহৃদয়ানামনৌচিত্যব্যুৎপাদনার্থমুদাহরণত্বেনোপাত্তাঃ ' (না.দ.পৃঃ- ২৬৮)

২. 'দোষো2নৌচিত্যম্......। সহৃদয়ানাং বিচিকিৎসাহেতুঃ কর্মানৌচিত্যং তচ্চানেকধা ' (না.দ.পৃঃ- ২৬৬)

৩. "আরম্ভাদ্ ভূপতিং যাবৎ ঔচিতীং ন বিদন্তি যে।

স্পৃহয়ন্তি কবিত্বায় খেলনং তে সুমেধসাম্ ॥ ” (না.দ.প্রারম্ভিক শ্লোকগুচ্ছ)

৪. ‘ কবিরপি ন স্বেচ্ছয়া ফলস্যোৎকর্ষং নিবদ্ধুমর্হতি কিন্ত্বৌচিত্যেন ’ (না.দ.পৃঃ- ১৭৫)

৫. ‘তেনোদ্ধতাদীনাং যথৌচিত্যমপরে2পি ধর্মা দ্রষ্টব্যাঃ ’ (না.দ.পৃঃ- ১৭৫)

৬. ‘তস্য নীরসানুচিতস্য সূচ্যস্য বিপর্যয়ঃ সরসমুচিতং চ প্রযুজ্যতে.... ’ (না.দ.পৃঃ- ১৭৫)

এই ঔচিত্য নাট্যদর্পণের প্রতিটি ছত্রে সযত্নে বিধৃত। অতএব তাঁদের গ্রন্থ প্রয়োজনানুগ এবং অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টিতে নির্মিত সর্বথা ঔচিত্যপূর্ণ একটি রচনা – এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, নাট্যদর্পণগ্রন্থটি প্রণেতৃদ্বয়ের ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা এবং সাহিত্যতত্ত্বের অপার জ্ঞানের দর্পণস্বরূপ। ব্যাকরণের প্রয়োগবিষয়ে আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করব। তর্কবিদ্যা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়াবলীর নিয়মানুগ বর্ণনায়। আর সাহিত্যতত্ত্বে জ্ঞানের বিষয়টি তো বলা-ই বাহুল্য। অতিশয় সমৃদ্ধ সাহিত্যভাবনা ব্যতীত এরকম একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা কদাচ সম্ভবপর নয়। অতএব নাট্যদর্পণগ্রন্থে তাঁদের ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা ও সাহিত্যতত্ত্বের জ্ঞানরাজির ত্রিবেণীসঙ্গমের যে দাবি রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র উত্থাপন করেছেন, তা সর্বথা সঙ্গত।

তৃতীয়তঃ, নাট্যদর্পণকাররা বহু শ্রমে, বহু আয়াস স্বীকার করে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। একথা ইতিপূর্বে-ই বিশদে আলোচিত হয়েছে যে, নাট্যদর্পণের রচয়িতাদ্বয় নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, দশরূপক, শৃঙ্গারপ্রকাশ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, কাব্যানুশাসন ইত্যাদি যাবতীয় মূর্ধণ্যভূত সাহিত্যতত্ত্বগ্রন্থের নিবিষ্ট অধ্যয়নের পর এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, ষাটটির-ও অধিক রূপক থেকে তাঁরা উদাহরণ দিয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণ গ্রন্থের অধ্যয়ন, প্রতিটি গ্রন্থধৃত যাবতীয় অভিমতের সমীক্ষা এবং তারপর সূত্র ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত নাট্যদর্পণগ্রন্থের প্রণয়ন– এই সকল কার্য নিঃসন্দেহে যথেষ্ট শ্রমসাধ্য।

চতুর্থতঃ, নাট্যদর্পণগ্রন্থটি নাট্যতত্ত্বের একটি নির্মল দর্পণস্বরূপ। বিষয়বৈচিত্র্যে এবং তার যথাযথ বিন্যাসে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি মনোযোগী অধ্যেতার সমক্ষে বাস্তবিক-ই নাট্যতত্ত্বের জগতে প্রবেশের একটি দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। নাট্যের দ্বাদশপ্রকার ভেদ, সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গ-অর্থপ্রকৃতি-অর্থোপক্ষেপক-অবস্থা-নান্দী-ধ্রুবা-নায়ক ও নায়িকার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী, অন্যান্য নাটকীয় পাত্রের বৈশিষ্ট্য, বিবিধ প্রকার উপরূপক ইত্যাদি যাবতীয় নাট্যসংক্রান্ত তত্ত্বের সন্নিবেশে সুসমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি নবীন নাট্যকার, নাট্যতত্ত্বের নবীন শিক্ষার্থী – সকলের-ই একান্ত উপযোগী সহায়ক গ্রন্থরূপে চিহ্নিত হতে পারে।

নাট্যদর্পণকারদের স্বয়ংপ্রোক্ত এই বৈশিষ্ট্যচতুষ্টয়ের অতিরিক্তরূপে গ্রন্থের আরো কিছু বিশেষত্ব মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টিপথে আসে –

নাট্যদর্পণের প্রথম ও প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর সহজ, স্বচ্ছ ও সাবলীল রচনাশৈলী। নাট্যতত্ত্বের ন্যায় পারিভাষিক বিষয়ের ভাষার স্বভাবতঃ-ই গুরুগম্ভীর হওয়ার প্রবণতা থাকে। কিন্তু নাট্যদর্পণকাররা সেই প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে অতি সহজভাবে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তদ্ব্যতীত, বহু শ্রদ্ধেয় আচার্যর গ্রন্থে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে তাঁদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের বহুল প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। নাট্যদর্পণের রচয়িতাদ্বয় কিন্তু গ্রন্থের কোথাও স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কৃত্রিম চেষ্টা করেননি। তাই সহজ-সাবলীল ভাষায়, যথাযথ শব্দের বিন্যাসে নির্মিত এই নাট্যদর্পণ গ্রন্থটি কোথাও-ই সাধারণ পাঠকের সুখাববোধের অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।

গ্রন্থের সুখবোধ্যতা রক্ষার জন্য নাট্যদর্পণকাররা যথাসম্ভব কম পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। কেবলমাত্র নাট্যতত্ত্বের শিক্ষার্থীর পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য কিছু শব্দ, যথা – সন্ধি, অবস্থা, রস, ভাব, বৃত্তি ইত্যাদি পারিভাষিক পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে অর্থপ্রকৃতি, অর্থোপক্ষেপক, নাট্যোক্তি, উপরূপক ইত্যাদি শব্দগুলিকে ইচ্ছা করে-ই ব্যবহার করা হয়নি; কারণ ব্যাখ্যাগম্য এই শব্দগুলি সাধারণ পাঠকের অনায়াসবোধ্যতায় বিঘ্নোৎপাদন করতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে কঠিন কোনো একটি পারিভাষিক পদের পরিবর্তে তৎসমার্থক সহজ একটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন – নাট্যশাস্ত্র, দশরূপকাদি যাবতীয় গ্রন্থে প্রযুক্ত 'আধিকারিক বৃত্ত'-র পরিবর্তে নাট্যদর্পণে 'মুখ্য বৃত্ত' পদটির ব্যবহার করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে সহজ এবং এক-ই অর্থানুসারী। এক-ই কারণে নাট্যদর্পণকাররা কথোদ্‌ঘাতাদি প্রস্তাবনার পঞ্চবিধ ভেদ স্বীকরণের জটিলতায় না গিয়ে, এগুলিকে মঞ্চে পাত্রপ্রবেশের উপায়মাত্ররূপে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নাট্যদর্পণের রচনার এই সহজ শৈলী কেবলমাত্র যে এই গ্রন্থের ভাষার সরলতা বিধান করেছে তাই নয়, নাট্যতত্ত্বের যাবতীয় বিষয়ের উপর রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের সবিশেষ অধিকারের বিষয়টি-ও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করেছে। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, গ্রন্থপ্রণেতৃদ্বয়ের স্বচ্ছ সাহিত্যচিন্তা-ই যেন গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে লিখিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

পদসাধনবিষয়ে নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের সবিশেষ প্রীতি এই গ্রন্থের বহুশঃ পরিদৃষ্ট হয়। সম্ভবপর প্রতিটি স্থলে তাঁরা সংশ্লিষ্ট পদটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন। সঠিক ব্যুৎপত্তিনির্ধারণের প্রয়োজনে 'নাটক' পদের ব্যুৎপত্তিবিষয়ে তাঁরা অভিনবগুপ্তাচার্যের অভিমতের বিরোধিতা করেছেন। দ্বাদশপ্রকার রূপকের প্রতিটি ভেদ, বৃত্তির চতুর্ধা ভেদ, বিভাবাদি ভেদে ভাবের প্রকারভেদ প্রভৃতি অজস্র পদের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি তাঁরা সাধন করে দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ব্যুৎপন্ন পদগুলির

অর্থাবগমে পাঠকের বিশেষ সহায়তা হয়েছে। নাট্যদর্পণধৃত কয়েকটি পদের ব্যুৎপত্তিগুলি উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে –

১. জনান্তিকম্ – '...... জনানামেকস্যৈব গোপ্যত্বাদ্ বহূণামন্তিকং শ্রাব্যতয়া নিকটং জনান্তিকম্' (না.দ. পৃঃ-১৭৬)

২. পতাকাস্থানকম্ – 'উপকারিত্বমাত্রসাম্যাৎ পতাকাস্থানস্য তুল্যং পতাকাস্থানকম্' (না.দ. পৃঃ-১৮৩)

৩. উৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ – 'উৎক্রমণোন্মুখা সৃষ্টির্জীবিতং যাসাং তা উৎসৃষ্টিকাঃ শোচন্ত্যঃ স্ত্রিয়স্ত াভিরঙ্কিতত্বাদুৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ' (না.দ. পৃঃ-২৩৮)

৪. আরভটী – 'আরেণ প্রতোদকেন তুল্যা ভটা উদ্ধতাঃ পুরুষা আরভটাস্তে সন্ত ্যস্যামিতি.........আরভটী' (না.দ. পৃঃ-২৫৬)

৫. কৈশিকী – 'অতিশায়িনঃ কেশাঃ সন্ত্যাসামিতি কৈশিকাঃ স্ত্রিয়ঃ, তৎপ্রধানত্বাৎ তাসামিয়ং কৈশিকী' (না.দ. পৃঃ-২৫৫)

৬. সাত্ত্বতী – 'সৎ সত্ত্বং প্রকাশস্তদ্ যত্রাস্তি তৎ সত্ত্বং মনস্তত্র ভবা সাত্ত্বতী' (না.দ. পৃঃ-২৫৫)

৭. ভাবঃ – 'উপচয়ং প্রাপ্য রসরূপেণ রত্যাদির্ভবতীতি ভাবঃ' (না.দ. পৃঃ-২৫৬)

৮.বিভাবাঃ – 'স্থায়িনং রসত্বেন ভবন্তং বিভাবয়ন্ত্যাবির্ভাববিশেষেণ প্রযোজয়ন্তীতি ....বিভাবাঃ' (না.দ. পৃঃ-২৫৯)

৯. অনুভাবাঃ – 'অনু লিঙ্গনিশ্চয়াৎ পশ্চাৎ ভাবয়ন্তি গময়ন্তি লিঙ্গিনং রসমিত্যনুভাবাঃ' (না.দ. পৃঃ-২৫৯)

১০. ব্যভিচারিণঃ– 'রসোন্মুখং স্থায়িনং প্রতি বিশিষ্টেনাভিমুখ্যেন চরন্তি বর্তন্ত ইতি ব্যভিচারিণঃ।....... যদ্ বা ব্যভিচরন্তি স্থায়িনি সত্যপি কে2পি কদাপি ন ভবন্তীতি ব্যভিচারিণঃ' (না.দ. পৃঃ-২৫৯)

এপ্রসঙ্গে নাট্যদর্পণোক্ত 'বিদূষক' পদের ব্যুৎপত্তিটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।এই গ্রন্থে এই পদটির দুটি ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে। প্রথমতঃ, বিভিন্নভাবে আনন্দদানের মাধ্যমে যিনি নায়কের বিয়োগব্যথাকে ভুলিয়ে দেন – 'বিপ্রলম্ভং তু বিনোদদানেন বিস্মারয়ন্তীতি বিদূষকাঃ'(না.দ. পৃঃ-২৮২) এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রবিশেষে স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা যিনি বিগ্রহকে সন্ধিতে পরিণত করতে পারেন, আবার সময়বিশেষে নির্বুদ্ধিতার কারণে যিনি তার বিপরীত কার্যটি-ও করে বসেন– 'যথাসম্ভবং সন্ধিং বিগ্রহং বিগ্রহেণ সন্ধিনা চ বিশেষেণ দূষয়ন্তি বিনাশয়ন্তি ...... বিদূষকাঃ' (না.দ. পৃঃ-২৮২)। বিদূষকের পদের দুটি ব্যুৎপত্তি-ই, বলা বাহুল্য, অর্থবহ এবং যথেষ্ট অভিনব।

নাট্যদর্পণের অন্যতম একটি আকর্ষক বৈশিষ্ট্য হল, যে কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যাবসরে বহু উদাহরণের প্রয়োগ। এই গ্রন্থে ষাটটির-ও বেশি গ্রন্থ থেকে প্রায় তিনশটি উদাহরণ উপন্যস্ত হয়েছে।

যে কোনো বিষয়ের সুবোধ্যতার ব্যাপারে বিস্তৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে-সঙ্গে উদাহরণের-ও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এবং এই প্রয়োজন নাট্যদর্পণে পর্যাপ্ত পরিমাণে পূর্ণ করা হয়েছে। সিংহভাগ বিষয়ের আলোচনায় একাধিক উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে। যথা – ফলাগমের উদাহরণরূপে রত্নাবলী, বেণীসংহার এবং রাঘবাভ্যুদয় থেকে তিনটি উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে, 'বজ্র' নামক প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় উদাহরণরূপে কৃত্যারাবণ, বেণীসংহার এবং রঘুবিলাস থেকে দুটি – সাকুল্যে চারটি উদাহরণ উপন্যস্ত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বীথী এবং অন্যান্য সন্ধ্যঙ্গগুলির আলোচনায় অধিকাংশ স্থলে-ই দুটি বা ততোধিক গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদাহৃত হয়েছে।

গ্রন্থমধ্যে কোনো বিমূর্ত বিষয়ের ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য নাট্যদর্পণে লোকজগত থেকে গৃহীত বিবিধ জাগতিক উদাহরণ উপন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন – নাটকাদি দর্শনকালে প্রেক্ষক যখন রাম-সীতা চরিত্রের আঙ্গিকাদি অভিনয় দর্শন করেন, তখন তাঁরা রাম-সীতাকে দশরথাত্মজ রাম এবং জনকাত্মজা সীতারূপে, দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ নর-নারীরূপে কল্পনা করেন; ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বা পুরাণকল্প চরিত্ররূপে অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণের অবতাররূপে কল্পনা করেন না। নট-নটীর সঙ্গে প্রেক্ষকের ভাবনার এই যে সাধারণীকরণ, তা রাম-সীতার ন্যায় পরিচিত উদাহরণযোগে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, একথা সত্য যে, নাট্যদর্পণে উপন্যস্ত কয়েকটি উদাহরণ অভিনবভারতী, দশরূপক ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে গৃহীত; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথা-ও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থের সুবিশাল উদাহরণরাজির সিংহভাগ-ই নাট্যদর্পণকারদের স্বয়ংপ্রদত্ত। এপ্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় প্রণিধেয়। নাট্যদর্পণধৃত উদাহরণগুলির মধ্যে অনেকগুলি রামচন্দ্রের স্বকীয় রচনা থেকে গৃহীত । অতএব কবি ও নাট্যকার রূপে রামচন্দ্রের মূল্যায়ন-ও এইসকল উদাহরণের দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে।

কোনো একটি বিষয়ের ব্যাখ্যাবসরে, নাট্যদর্পণের বহু স্থলে, সুন্দর উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। এই উপমাগুলির প্রয়োগের ফলে বর্ণনীয় বিষয়টি নিঃসন্দেহে আরো সহজবোধ্য হয়েছে। উদাহরণরূপে কয়েকটি উপন্যস্ত করা যেতে পারে–

১.অভিনয়কালে ক্ষেত্রবিশেষে নট-ও যে রসাস্বাদন করতে পারেন, সেই বিষয়ের ব্যাখ্যাকল্পে –'পণ্যস্ত্রিয়ো হি ধনলোভেন পররত্যর্থং রতাদি বিপঞ্চয়ন্তঃ কদাচিৎ স্বয়মপি পরাং রতিমনুভবন্তি। গায়নাশ্চ পরং রঞ্জয়ন্তঃ কদাচিৎ স্বয়মপি রজ্যন্তে' (না.দ. পৃঃ-২৫৭-২৫৮)

২.দুঃখের পর সুখের আস্বাদ মধুরতর হয়, এই প্রসঙ্গে – 'পানকমাধুর্যমিব চ তীক্ষ্ণস্বাদেন দুঃখাস্বাদেন সুতরাং সুখানি স্বদন্তে' (না.দ. পৃঃ-২৫৭)

৩. পরিপুষ্ট রসের পুনঃ-পুনঃ পরিপোষের নিষিদ্ধকরণ ব্যাপারে– 'লব্ধপরিপোষো হি রসঃ...... মালতীমাল্যমিব ম্লায়তি' (না.দ. পৃঃ-২৬৭-২৬৮)

৪. রসহীন কাব্যরচনা ব্যাপারে –

"শ্লেষালঙ্কারভাজো2পি রসা নিঃস্যন্দকর্কশাঃ।

দুর্ভগা ইব কামিন্যঃ প্রীণন্তি ন মনো গিরঃ ॥"(না.দ. পৃঃ-০১)

৫. কবিত্বশক্তিবিহীন বিদ্বজ্জনের অক্ষমতা বিষয়ে–

" কবিত্ববন্ধ্যাঃ ক্লিশ্যন্তি সুখীকর্তুং জগন্তি যে।

নেত্রে নিমীল্য বিদ্বাংসঃ তে2ধিরোহন্তি পর্বতম্ ॥"(না.দ. পৃঃ-০১)

নাট্যদর্পণকারদের ব্যাকরণবৈদুষ্যের পরিচয় এই গ্রন্থের বহুশঃ পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে যে সকল পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলির ব্যাকরণগত পদসাধন-ও প্রদর্শন করা হয়েছে । সাধিত পদগুলিতে কোন্ ধাতু, কোন্ শব্দের সঙ্গে কি প্রত্যয়ের যোগ, গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের ব্যবস্থা, কারক-সমাসের সূত্রিত নিয়ম, লিঙ্গবিচার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ উপন্যস্ত করা যেতে পারে –

১. 'অভিনবগুপ্তস্তু নমনার্থস্যাপি নটের্নাটকশব্দং ব্যুৎপাদয়তি তত্র তু ঘটাদিত্বেন হ্রস্বাভাবশ্চিন্ত্যঃ'(না.দ. পৃঃ-১৭৪)

২.'আবিমর্শ ইতি যদা মর্যাদায়ামাঙ্ তদা মুখপ্রতিমুখগর্ভাৎ, যদা পুনরভিবিধৌ তদা বিমর্শমভিব্যাপ্য বিরমতি' (না.দ. পৃঃ-১৮৫)

৩.' ...... প্রকরী। ঔণাদিকে ইপ্রত্যয়ে সংজ্ঞাশব্দেন স্ত্রীত্বম্'(না.দ. পৃঃ-১৮৫)

৪. 'নাটয়তি নর্তয়তি ব্যুৎপাদ্যমনাংসীত্যচি গৌরাদেরাকৃতিগণত্বাচ্চ ঙ্যাং নাটী। অল্পবৃত্তত্বাদল্পার্থে কপি নাটিকেত্যপি' (না.দ. পৃঃ-২৩৩)

৫. " 'আঙ্ মর্যাদায়াম্' তেন মুখসন্ধিং সম্প্রাপ্য নিবর্ততে। 'ঈষদর্থে বা' তত ঈষন্মুখং ... আরম্ভঃ" (না.দ. পৃঃ-২৫৩)

৬.'.....সাত্বতী সংজ্ঞাশব্দত্বেন বাহুলকাৎ স্ত্রীত্বম্' (না.দ. পৃঃ-২৫৫)

৭. 'ন বহিঃস্থা চিত্তবৃত্তিরিতি পৃষোদরাদিত্বাদবহিত্থা' (না.দ. পৃঃ-২৭৩)

৮. '.... প্রবেশঃ প্রয়োজনমস্যা ইতীকণি প্রাবেশিকী '(না.দ. পৃঃ-২৭৯)

৯. '.... নিষ্ক্রমঃ তৎপ্রয়োজনা অনুশক্তিকাদেরাকৃতিগণত্বাদিকণ্যুভয়পদবৃদ্ধৌ নৈষ্ক্রামিকী' (না.দ. পৃঃ-২৭৯)

১০. '.... আধিক্য-বহুত্বভাবিনোস্তরপ্তমপ্প্রত্যয়য়োরনুকৃতিস্তরতমাবিতি তয়োর্ভাবস্তারতম্যং....' (না.দ. পৃঃ- ২৮০)

ব্যাকরণগত ব্যুপত্তিনির্ণয়াবসরে কয়েকটি ক্ষেত্রে নাট্যদর্পণকাররা সংশ্লিষ্ট সূত্রটির-ও উল্লেখ করেছেন। যথা –

১. 'বাচিক'পদের ব্যাখ্যায়–'বাগনুকার্যা প্রয়োজনং হেতুরস্যেতি 'প্রয়োজনম্' ইতীকণি বাচিকঃ'(না.দ. পৃঃ-২৭৫)। 'প্রয়োজনম্' সূত্রটি হেমচন্দ্রাচার্য-বিরচিত ব্যাকরণগ্রন্থের অন্তর্গত একটি সূত্র।

২. 'আরভটী' পদের ব্যাখ্যায় –'আরেণ প্রতোদকেন তুল্যা ভটা উদ্ধতাঃ পুরুষা আরভটাস্তে সন্ত্যাসামিতি 'জ্যোৎস্নাদিত্বাদণি' আরভটী' (না.দ. পৃঃ-২৫৬)

গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকগুচ্ছে নাট্যদর্পণকাররা তাঁদের ব্যাকরণজ্ঞানের গভীরতা বিষয়ে যে বক্তব্য উত্থাপন করেছেন, তা যে যথেষ্ট সঙ্গত, উল্লিখিত উদাহরণসমূহদৃষ্টে তা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

নাট্যদর্পণধৃত প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত যৌক্তিক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত। এমনকি এই গ্রন্থের অভিমতবিশেষের সঙ্গে যদি সহমত না-ও হওয়া যায় , তবু সেই মতামতের সমর্থনে বিস্তৃত যুক্তিজালের নিশ্ছিদ্রতা সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে। উদাহরণস্বরূপ এই গ্রন্থের তৃতীয় বিবেকের রসবিমর্শের উল্লেখ করা যেতে পারে। রস সুখাত্মক এবং দুঃখাত্মক – দুই-ই হতে পারে, এই মতটি যদি আমরা সমর্থন না-ও করি, তবু যে যুক্তিসমূহের বিন্যাসে নাট্যদর্পণকাররা রসের উভয়াত্মকত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছেন, তা অবশ্য-ই সবিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

কেবলমাত্র স্বীয় অভিমত প্রতিষ্ঠায় নয়,পূর্বাচার্যদের অভিমত খণ্ডনের ব্যাপারে-ও নাট্যদর্পণকাররা সর্বদা যুক্তিনিষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করেছেন। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

১. নাট্যশাস্ত্রাদি যাবতীয় গ্রন্থে দিব্য সত্তাকে নাটকের নায়করূপে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু নাট্যদর্পণকারদের মতে, কোনো দিব্য ব্যক্তি কখনো-ই নাটকের নায়ক হতে পারেন না।কারণ, দেবতাদের পক্ষে যেকোনো দুরূহ বিষয়ের-ই ইচ্ছামাত্র সম্পাদনসিদ্ধি থাকে,ফললাভের জন্য তাঁদের কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না;এই কারণে-ই দিব্যচরিত্রের কীর্তিকলাপ নাটকীয় ঘটনারূপে উপস্থাপিত হতে পারে না – 'দেবতানাং তু দুরুপপাদস্যাপ্যর্থস্যেচ্ছামাত্রত এব সিদ্ধিরিতি তচ্চরিতমশক্যানুষ্ঠানত্বাৎ ন মর্ত্যানামুপদেশযোগ্যম্' (না.দ. পৃঃ-১৭৩)

২. নাট্যদর্পণকারদের মতে, নাটকে কেবলমাত্র প্রাচীন রাজাদের কীর্তির বিবরণ থাকবে, বর্তমান রাজাদের নয়। কারণ, বর্তমান রাজাদের অতীত কীর্তি থাকে না এবং অতীতের মহারাজদের পরিবর্তে বর্তমান রাজাদের চরিতবর্ণনায় পূর্বরাজাদের অসম্মান ঘটে – 'বর্তমানে চ নেতরি তৎকালপ্রসিদ্ধিবাধয়া রসহানিঃ স্যাৎ , পূর্বমহাপুরুষচরিতেষু চ অশ্রদ্ধানং স্যাৎ' (না.দ. পৃঃ-১৭৩)

৩. 'ব্যায়োগ' নামক রূপভেদে প্রাপ্ত্যাশা ও নিয়তাপ্তি নামক অবস্থাদ্বয়ের অনবস্থিতির সমর্থনে নাট্যদর্পণে বলা হচ্ছে, ব্যায়োগে দীপ্তরসাশ্রিত নায়কগণ অকারণ কালক্ষেপ করেন না; তাই অতি দ্রুত তিনি তাঁর যাবতীয় বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে অভীষ্ট সিদ্ধি অর্জন করেন। এই কারণে-ই ব্যায়োগে প্রারম্ভ, তদনন্তর প্রযত্ন এবং তারপরে-ই ফলাগমের প্রয়োগ – 'দীপ্তরসো হি কালক্ষেপাসহিষ্ণুতয়া বিনিপাতানাং শঙ্কয়া চ প্রারম্ভপ্রযত্নানন্তরং ফলাগম এব যততে'(না.দ. পৃঃ-২৩৪)

নাট্যদর্পণের কারিকা অংশটি সূত্রাকারে নিবদ্ধ। কারিকার অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ সুপ্রযুক্ত, অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ । মূলতঃ পারিভাষিক পদসমূহের ব্যাখ্যা-ই এই অংশে প্রদত্ত হয়েছে। এই অংশে কোথাও বিস্তৃত আলোচনা, ব্যাখ্যা বা ভাববিস্তারের অবসর নেই। এই কারণে-ই মাত্র দুইশত ছয়টি কারিকার পরিসরে নির্মিত এই গ্রন্থে এত অধিক সংখ্যক বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর হয়েছে।

নাট্যদর্পণের বৃত্তি অংশের ভাষা-ও সহজ এবং সাবলীল। কোথাও গ্রন্থপ্রণেতাদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রচেষ্টা নেই। কারিকার অন্তর্গত পদগুলির একেকটিকে গ্রহণ করে তার যথাযথ ব্যাখ্যার দ্বারা এই বৃত্তি অংশটি নির্মিত। সহজবোধ্য পদগুলির পুনরায় বিশেষ ব্যাখ্যা করা হয়নি। অভিনবভারতী, শৃঙ্গারপ্রকাশ ইত্যাদি গ্রন্থের গুরুগম্ভীর ও সুবিস্তৃত আলোচনায় সাধারণ পাঠক উদ্ভ্রান্ত বোধ করতে থাকেন ;নাট্যদর্পণ সেই দোষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত।

নাট্যদর্পণকাররা বিষয়বিশেষের অকারণ বিভাজনকে সর্বথা বর্জন করেছেন। বিভাগ-উপবিভাগ রচনা করা সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের একটি বিশেষত্ব। কিন্তু নাট্যদর্পণগ্রন্থে অপ্রয়োজনীয় বিভাগনির্মাণের প্রতি কোনোরূপ পক্ষপাত করা হয়নি। সেই কারণে-ই প্রস্তাবনার পঞ্চবিধ ভেদ, ভারত্যাদি চারটি বৃত্তির প্রতিটির চতুর্ধা ভেদ ইত্যাদি সর্বজনস্বীকৃত বিভাগগুলির উল্লেখ নাট্যদর্পণে পাওয়া যায় না। অকারণ বিভাগনির্দেশবিষয়ে নাট্যদর্পণকারদের অনীহা স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয় আঙ্গিক অভিনয়ের আলোচনায়। নাট্যশাস্ত্রে যে আঙ্গিক অভিনয়ের সবকটি প্রকারের নামোল্লেখপূর্বক বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে, নাট্যদর্পণে সেখানে কেবলমাত্র আঙ্গিক অভিনয়ের প্রকারবিশেষে প্রযোক্তব্য অঙ্গগুলির উল্লেখ করা হয়েছে , প্রকারগুলির পৃথক নামোল্লেখ করা হয়নি।

তবে নাট্যদর্পণকে সর্বথা বিভাজনবর্জিত একটি গ্রন্থরূপে চিহ্নিত করা-ও সমীচীন নয়। কারণ, নাটিকার চতুর্বিধ ভেদ, প্রকরণের একুশ প্রকার ভেদ ইত্যাদির উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হয়েছে। মূল বক্তব্য এই যে, নাট্যদর্পণে কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনবোধে কোনো একটি বিষয়ের বিভাগ-উপবিভাগ নির্ণয় করা হয়েছে, অপ্রয়োজনে কখনো-ই নয় ।

নাট্যদর্পণের অন্তর্গত বিষয়াবলীর আলোচনা অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে এবং নিয়ম অনুসারে বিহিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম নাট্যদর্পণ, এটি নাট্যতত্ত্বের দর্পণবিশেষ; অতএব এই গ্রন্থে প্রধানতঃ

নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলির-ই আলোচনা করা হয়েছে, যা নবীন নাট্যকার এবং নাট্যতত্ত্বের নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, অর্থাৎ যে বিষয়গুলির জ্ঞান জনৈক নাট্যকারের পক্ষে অপরিহার্য নয়, এমন বিষয়গুলির, যথা – প্রেক্ষাগৃহের আকৃতি, তার আয়তন, তার প্রকারভেদ, নাট্যের আবরণ-আভরণাদি আহার্য বিষয় ইত্যাদির আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়নি। জটিলতা ও বিস্তৃতি পরিহারপূর্বক এই প্রয়োজনানুগ সুনির্দিষ্ট আলোচনার কারণে নাট্যতত্ত্বের সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এই গ্রন্থটি বিশেষ উপকারী রূপে প্রতিভাত হয়।

নাট্যদর্পণকাররা রসকে কাব্যের আত্মারূপে স্বীকার করে কাব্যে রসসৃষ্টির বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে, শব্দার্থময় কাব্যশরীরে রস হল প্রাণস্বরূপ। গ্রন্থের তৃতীয় বিবেকে তাই তাঁরা বলেছেন –

"অর্থশব্দবপুঃ কাব্যং রসৈঃ প্রাণৈর্বিসর্পতি।
অঞ্জসা তেন সৌহার্দং রসেষু কবিমানিনাম্॥" (না.দ. ৩/২১)

গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকগুচ্ছের অন্তর্গত পঞ্চম শ্লোকে তাঁরা কবিযশোলিপ্সু সেই সকল বিদ্বানদের নিন্দা করেছেন, যাঁরা কেবল চমৎকারী শব্দার্থে ও মনোহারী গুণালঙ্কারে ভূষিত বাক্যবন্ধকে কাব্য বলে মনে করেন। কাব্যাত্মভূত রসের স্পর্শবিহীন সেইসব রচনা কোনোদিন সহৃদয়ের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারে না –

"নানার্থশব্দলৌল্যেন পরাঞ্চো যে রসামৃতান্ ।
বিদ্বাংসস্তে কবীন্দ্রাণাং অর্হন্তি ন পুনঃ কথাম্ ॥"(না.দ.প্রারম্ভিক শ্লোকগুচ্ছ)

নাট্যদর্পণকাররা স্পষ্টতঃ বলেছেন, শ্লেষাদি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হলে-ও, রসহীন কাব্য সালঙ্কারা কিন্তু কুরূপা নারীর ন্যায় মনকে আকর্ষণে ব্যর্থ হয় –

"শ্লেষালঙ্কারভাজো2পি রসনিষ্যন্দকর্কশাঃ ।
দুর্ভগা ইব কামিন্যঃ প্রীণন্তি ন মনো গিরঃ ॥"(না.দ.প্রারম্ভিক শ্লোকগুচ্ছ)

একথা সত্য যে, নাট্যদর্পণকাররা রসপর্যাবসান ধ্বনির অস্তিত্ব এবং কাব্যে তার সর্বাতিশায়ী প্রাধান্যের বিষয়ে অবগত হতে পারেননি; কিন্তু তাঁরা যে বিষয়টিকে কাব্যপ্রাণভূত বলে মনে করেছেন, কাব্যাত্মভূত সেই রসের গুরুত্ব উদ্‌ঘোষণায় তাঁরা বিশেষভাবে যত্নবান্ হয়েছেন।

ইতিপূর্বে-ই এই বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাট্যদর্পণে ষাটটির-ও অধিক সংখ্যক গ্রন্থ থেকে প্রায় তিনশটি উদাহরণ উপন্যস্ত হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে – নলবিলাস, রাঘবাভ্যুদয়, যাদবাভ্যুদয়, রঘুবিলাস, সত্যহরিশচন্দ্র, নির্ভয়ভীমব্যায়োগ, কৌমুদীমিত্রানন্দ,

মল্লিকামকরন্দ, রোহিণীমৃগাঙ্ক, যদুবিলাস, বনমালা, সুধাকলশ, দেবীচন্দ্রগুপ্ত, পুষ্পদূষিতক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মায়াপুষ্পক, প্রয়োগাভ্যুদয়, ছলিতরাম, অভিনবরাঘব, অর্জুনচরিত, তরঙ্গদত্ত, প্রতিমা2নিরুদ্ধ, পাণ্ডবানন্দ, বেণীসংহার, কৃত্যারাবণ, নাগানন্দ, মৃচ্ছকটিকম্, উত্তররামচরিত, মহাবীরচরিত, মালতীমাধব, পার্থবিজয়, মুদ্রারাক্ষস, বিলক্ষদুর্যোধন, রত্নাবলী, তাপসবৎসরাজ, মনোরমাবৎসরাজ,স্বপ্নবাসবদত্তা, পাণ্ডবাভ্যুদয়, বালিকাবঞ্চিতক, হয়গ্রীববধ, রামাভ্যুদয়, বিধিবিলসিত, উদাত্তরাঘব, অনঙ্গসেনাহরিনন্দিনি, ইন্দুলেখা, রাধাবিপ্রলম্ভ, চিত্রোৎপলাবলম্বিতক ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে প্রথম এগারোটি রূপক এবং 'সুধাকলশ' নামক সুভাষিতাবলী – এই বারোটি রচনা রামচন্দ্রর নিজস্ব কৃতি; অবশিষ্টগুলি অন্যান্য রচয়িতাদের নির্মাণ। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকক'টি অধুনা নামমাত্রে পর্যবসিত।

এই সুবিশাল উদাহরণরাজির মধ্যে-ই নিহিত রয়েছে একটি বিশেষ কারণ, যে কারণে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে নাট্যদর্পণের নাম সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। কারণটি এই যে, নাট্যদর্পণে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি যে সকল গ্রন্থ থেকে গৃহীত, সেগুলির বেশ কয়েকটির নাম অশ্রুতপূর্ব এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থ অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত। বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

নাট্যদর্পণে 'অনুমান' নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় 'ভাসবিরচিত স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটক থেকে গৃহীত' রূপে এই শ্লোকটি উদ্ধার করা হয়েছে –

''পাদাক্রান্তানি পুষ্পাণি সোষ্ম চেদং শিলাতলম্ ।
নূনং কাচিদিহাসীনা মাং দৃষ্ট্বা সহসা গতা ॥'' (না.দ. পৃঃ- ২০৯)

– বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, নাট্যদর্পণে এটিকে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' থেকে গৃহীত বলা হলে-ও, অধুনাপ্রাপ্ত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর কোনো সংস্করণে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না। অনুমান করা যেতে পারে, হয়তো লিপিকরের প্রমাদবশতঃ এই শ্লোকটি মূল গ্রন্থমধ্যে লিখিত হয়নি। এমন-ও হতে পারে যে, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নামে অন্য কোনো নাট্যকারের অন্য কোনো নাটক ছিল। অথবা এমন-ও হতে পারে যে, স্বয়ং নাট্যকার ভাস-ই তাঁর 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর একটি মঞ্চোপযোগী রূপ নির্মাণ করেছিলেন, এই শ্লোকটি তার অন্তর্গত ছিল। তৃতীয় সম্ভাবনাটি যথেষ্ট প্রবল;কারণ নাটকলক্ষণরত্নকোশ এবং ভাবপ্রকাশনে-ও 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' থেকে উদ্ধৃত বলে দুটি শ্লোক পাওয়া যায়, যা বর্তমানে প্রাপ্ত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর সংস্করণগুলিতে পাওয়া যায় না। [১৫]

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে 'মুদ্রারাক্ষস'-এর রচয়িতারূপে প্রসিদ্ধ বিশাখদত্ত কর্তৃক বিরচিত 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' নামক প্রকরণের নাম। গ্রন্থটি অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত। 'রোধ' নামক

প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় (না.দ. পৃঃ-২০১), 'প্রার্থনা' নামক গর্ভসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় (না.দ. পৃঃ-২০৯), প্রকরণের বর্ণনায় (না.দ. পৃঃ-২৩০), 'ত্রিগত' নামক বীথ্যঙ্গের আলোচনায় (না.দ. পৃঃ-২৪৫), নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবার উদাহরণরূপে (না.দ. পৃঃ- ২৭৯) ইত্যাদি বিভিন্ন স্থলে নাট্যদর্পণকাররা দেবীচন্দ্রগুপ্ত থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। নাট্যদর্পণে উপন্যস্ত এই উদাহরণগুলির দ্বারা এই প্রকরণের ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি অনতিস্পষ্ট ধারণা করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত এবং ধ্রুবদেবীর প্রণয়ের পটভূমিতে রচিত এই কাহিনীটিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতিফলনের কারণে এর ঐতিহাসিক মূল্য-ও যথেষ্ট।

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে 'পুষ্পদূষিতক' নামক প্রকরণের নাম, রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। 'অপবাদ' নামক অবমর্শসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় (না.দ. পৃঃ-২১৪), 'প্ররোচনা' নামক অবমর্শসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় (না.দ. পৃঃ-২২১), 'পরিগূহণ' নামক নির্বহণসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় (না.দ. পৃঃ-২২৫), প্রকরণের বর্ণনায় (না.দ. পৃঃ-২৩০,২৩২) ইত্যাদি বিভিন্ন স্থলে নাট্যদর্পণকাররা এই 'পুষ্পদূষিতক' প্রকরণটি থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থটি-ও অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত।

নাট্যদর্পণে উল্লিখিত আরেকটি প্রকরণ হল শুক্তিবাসকুমার কর্তৃক রচিত 'অনঙ্গসেনাহরিনন্দী'। নাট্যদর্পণে মাত্র একবার, 'ছাদন' নামক অবমর্শসন্ধ্যঙ্গের আলোচনায় (না.দ. পৃঃ-২১৬) গ্রন্থকাররা এই প্রকরণটি থেকে উদাহরণ দিয়েছেন । এটি 'চারুদত্ত'-এর ছায়ায় রচিত হরিনন্দী এবং অনঙ্গসেনা নাম্নী গণিকার প্রণয়কাহিনী।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের এই অমূল্য রত্নগুলি নামেমাত্র হলে-ও ধারণ করে রাখার জন্য নাট্যদর্পণগ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বিশেষ গৌরবের দাবি করতে পারে। অধ্যাপক এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার যথার্থ-ই মন্তব্য করেছেন– " It (ND) is vauluable in literary history for its quotations from various works of great merit now lost to us."[১৬]

অতএব, নাট্যদর্পণে যে সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাট্যতত্ত্বসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, অত্যন্ত বলিষ্ঠতা ও যুক্তিনিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রন্থকাররা যে তাঁদের অভিনব অভিমতগুলির উপস্থাপনা করেছেন, এর সঙ্গে-সঙ্গে বিপুলসংখ্যক উদাহরণ যে তাঁরা গ্রন্থমধ্যে উপন্যস্ত করেছেন, উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে এই গ্রন্থটিকে নির্দ্বিধায় একটি মহত্বমণ্ডিত, তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল মহাগ্রন্থরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থের বিষয়ে যে কারণে-ই হোক্, আধুনিক পণ্ডিতগণ বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করেননি। ডঃ. কীথ তাঁর ' Sanskrit Drama' গ্রন্থে নাট্যদর্পণের নাম

উল্লেখ করেননি। ডঃ. পি.ভি. কাণে তাঁর ‘ History of Sanskrit Poetics’ গ্রন্থের অন্তিমে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে নাট্যদর্পণের উল্লেখ করেছেন, নাট্যদর্পণের গুরুত্ব বর্ণনায় যা অত্যন্ত-ই অপর্যাপ্ত – “The examples are more profuse than in Dasarupavaloka.Dilates upon 12 varieties of Rupakas and many Uparupakas….His references to Devicandragupta are of great historical value.”[১৭]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শেষোক্ত গ্রন্থধৃত সাহিত্যদর্পণ-বিষয়ক আলোচনায় ডঃ. কাণে মন্তব্য করেছেন– “ The Sahityadarpana...... forms, together with the Natyasastra of Bharata and the Dasarupa of Dhananjaya, a triumvirate in the domain of the Sanskrit Drama.”[১৮] কিন্তু জনৈক গবেষকের বুদ্ধিতে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় না যে, কি কারণে এতগুলি অভিনব অভিমতের উপস্থাপনাকারী নাট্যদর্পণ গ্রন্থটি ডঃ. কাণের দ্বারা এভাবে উপেক্ষিত হল। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সাহিত্যদর্পণ এবং দশরূপক সর্বথা নাট্যশাস্ত্রের পদাঙ্কানুসারী; নূতন বা অভিনব কোনো তত্ত্বের উপস্থাপন এ দুটি গ্রন্থে নেই বললে-ই চলে। সেই তুলনায় অনেক নূতন তথ্য ও তত্ত্বের সন্নিবেশ থাকা সত্ত্বে-ও নাট্যদর্পণের নাম কেন বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের দ্বারা অনাদৃত থেকে গেল, তা এক বিস্ময়ের কারণ। .... মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্র একটি সমুদ্রোপম গ্রন্থ ।এই গ্রন্থে নাট্যতত্ত্বের অতিরিক্ত-ও বহু বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, যা কেবলমাত্র নাট্যতত্ত্বের শিক্ষার্থীর কাছে তত প্রয়োজনীয় নয়। সেই আঙ্গিকের বিচারে, নাট্যদর্পণে কিন্তু অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে ও যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের-ই আলোচনা করা হয়েছে, বিষয়বাহুল্যের দ্বারা পাঠককে ভারাক্রান্ত করার চেষ্টা করা হয় নি। .... দশরূপকের বিষয়ে বলা যেতে পারে যে, এই গ্রন্থের প্রতিটি মতামত নাট্যশাস্ত্রের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র;নূতন কোনো তথ্য এই গ্রন্থে নেই। শুধু তাই নয়, দশরূপকের আলোচনা ক্ষেত্রবিশেষে অতি-সংক্ষিপ্ত, ক্ষেত্রবিশেষে অতি-জটিল। মাত্র দু’একটি স্থল ব্যতীত দশরূপকের অন্যত্র কোথাও পূর্বাচার্যদের অভিমতের উল্লেখ করা হয়নি। প্রবাদ এই যে, দশরূপকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নাট্যদর্পণ গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। এবং বক্তব্যের স্বচ্ছতা, সহজবোধ্যতা, উদাহরণপ্রাচুর্য, অন্যান্য গ্রন্থের মতামতের উল্লেখ, বহু নূতন তথ্যের সন্নিবেশ ইত্যাদি কারণসমবায়ের বিচারে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, নাট্যদর্পণ বাস্তবিক-ই দশরূপকের যশকে অতিক্রম করার সঙ্গত দাবি রাখতে পারে। ...... সাহিত্যদর্পণের বিষয়ে এককথায় বলা যেতে পারে যে, এটি নাট্যশাস্ত্র এবং দশরূপকের অভিমতসমূহের অতি-সংক্ষিপ্ত একটি সম্মিলিত সঙ্কলন; এই গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতিরিক্ত নূতন কোনো তথ্য সংযোজিত হয়নি।... একথা অনস্বীকার্য যে, নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে রচিত অদ্যাবধি প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে নাট্যশাস্ত্র প্রাচীনতম এবং

বিপুলায়তন। এই মহাগ্রন্থটি যথাযথভাবে-ই 'নাট্যকলার বিশ্বকোষ' রূপে চিহ্নিত; অতএব নাট্যশাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য, প্রাধান্য ও প্রামাণ্য – কোনোটি-ই অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাহিত্যদর্পণ এবং দশরূপকের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না। কারণ, ইতিপূর্বে-ও বলা হয়েছে যে, এই দুটি গ্রন্থ সর্বতোভাবে নাট্যশাস্ত্র-অনুসারী; তদ্ব্যতিরিক্ত কোনো তথ্য বা তত্ত্ব এই গ্রন্থদ্বয়ে উপস্থাপিত হয়নি। অন্যদিকে, বেশ কিছু অভিনব অভিমতের সন্নিবেশে, ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বাচার্যদের মতামতের বলিষ্ঠ বিরোধিতায়, নাট্যতত্ত্বসংক্রান্ত বিষয়াবলীর যুক্তিসম্মত উপস্থাপনায় নির্মিত নাট্যদর্পণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তায় ভাস্বর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । কি কারণে এই রকম একটি মৌলিক গ্রন্থের পরিবর্তে দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণের ন্যায় আবৃত্তবিষয় গ্রন্থগুলিকে ডঃ. কাণে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের স্তম্ভরূপে চিহ্নিত করেছেন, নিবিষ্ট অধ্যেতার কাছে তার কোনো সদুত্তর নেই।

সুখের বিষয় , ইদানীন্তন কতিপয় নাট্যতত্ত্ববিদ্ নাট্যদর্পণের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করেছেন। বহু অপ্রাপ্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিদানের কারণে অধ্যাপক এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁর ' History of Classical Sanskrit Literature' গ্রন্থে নাট্যদর্পণের ঐতিহাসিক মূল্যের বিশেষ উল্লেখ করেছেন। নাট্যসংক্রান্ত বহু তত্ত্বের সুনিয়ত আলোচনার কারণে এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ডঃ. রাঘবন। অধ্যাপক মানকড় তাঁর ' The Types of Sanskrit Drama' গ্রন্থের রূপক ও উপরূপকের আলোচনায় বহুবার নাট্যদর্পণের অভিমতের উল্লেখ করেছেন। নাট্যদর্পণের রসবিমর্শটি কিছু আধুনিক নাট্যতাত্ত্বিকের চিত্তে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। অধ্যাপক কে. সহল তাঁর 'আলোচনাকে পথপরা' নামক হিন্দী গ্রন্থে এবং অধ্যাপক আর. গুপ্তা তাঁর ' Psychological Studies in Rasa' গ্রন্থে নাট্যদর্পণধৃত রসের উভয়াত্মকত্ববিষয়ক বলিষ্ঠ অভিমতের সবিশেষ প্রশংসা করেছেন।

আলোচনার উপসংহারে এই কথা-ই বলা যায় যে, নাট্যশাস্ত্রাদি প্রাগ্ভাবী গ্রন্থসমূহের অল্পবিস্তর প্রভাব থাকলে-ও, নাট্যকলাসংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বের বিন্যাসে, বেশ কয়েকটি অভিনব অভিমতের সন্নিবেশে, অননুকরণীয় মৌলিকতায় নির্মিত এই নাট্যদর্পণ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অধুনাতন সাহিত্যতাত্ত্বিকদের অধিকতর মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. বিশদ আলোচনার জন্য প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ,কে. এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ - ২৯১

৩. History of Indian Literature , M. Winternitz,দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৪৬১

৪. তদেব, পৃঃ- ৪৫৬ – পৃঃ-৫৭১
৫-৯. বিশদ আলোচনার জন্য সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য
১০. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, পৃঃ- ২৩২
১১. তদেব, পৃঃ- ২৬৭
১২. তত্রৈব
১৩. তদেব, পৃঃ- ২৬৬
১৪. তদেব, পৃঃ- ২৬৮
১৫. দ্রষ্টব্য ঃ নাট্যদর্পণ, কে. এইচ. ত্রিবেদী, পৃঃ- ৩১৬
১৬. History of Classical Sanskrit Literature, M. Krishnamachariar, পৃঃ- ৬৪৪
১৭. History of Sanskrit Poeties, P.V. Kane,পৃঃ- ৪২৩
১৮. তদেব, পৃঃ- ৩০৩

নাট্যদর্পণধৃত পরিভাষাসূচী

১.অঙ্কাবতার –

দ্বিতীয়াঙ্কাবতারণাদঙ্কাবতারঃ । (না.দ.পৃঃ -১৮১)

২. অধিবলম্ –

অধিকবলসম্বন্ধাদধিবলম্ ।(না.দ. পৃঃ -২৪০)

৩. অনুভাবাঃ –

অনু লিঙ্গনিশ্চয়াৎ পশ্চাৎ ভাবয়ন্তি গময়ন্তি লিঙ্গিনং রসমিত্যনুভাবাঃ । (না.দ. পৃঃ -২৫৯)

৪. অপবারিতম্–

অপবার্যতে বহূণাং প্রচ্ছাদ্যত ইত্যপবারিতম্। (না.দ. পৃঃ -১৭৫)

৫. অভিসারিকা –

সরন্তী স্বয়ং তস্য পার্শ্বে বা সারয়ন্তী .... অভিসারিকা । (না.দ. পৃঃ -২৮৪)

৬. অবলগিতম্ –

অন্যকার্যাবলগনাদবলগিতম্ । (না.দ.পৃঃ -২৫০)

৭. অবস্পন্দিতম্ –

চক্ষুঃস্পন্দনাদিবদন্তর্গতসূচনীয়সম্ভবাৎ। (না.দ. পৃঃ -২৫১)

৮. অবহিত্থা –

ন বহিঃস্থা চিত্তবৃত্তিরিতি পৃষোদরাদিত্বাদবহিত্থা।(না.দ. পৃঃ -২৭৩)

৯. অসৎপ্রলাপঃ –

অসতো2সাধুভূতস্য প্রলপনমসৎপ্রলাপঃ । (না.দ. পৃঃ -২৪৬)

১০. আকাশোক্তিঃ –

আকাশে পাত্রাভাবাৎ শূন্যে উক্তিঃ আকাশোক্তিঃ । (না.দ. পৃঃ -১৭৬)

১১. আক্ষেপিকী –

প্রস্তুতরসোল্লঙ্ঘনেন রসান্তরোদ্ভাবনমাক্ষেপঃ, তৎপ্রয়োজনা আক্ষেপিকী। (না.দ. পৃঃ -২৭৯)

১২. আঙ্গিকঃ –

অঙ্গানি প্রয়োজনং হেতবো2স্যেত্যাঙ্গিকঃ। (না.দ. পৃঃ -২৭৫)

১৩. আন্তরী –

অন্তরং ছিদ্রং তত্র ভবা আন্তরী। (না.দ. পৃঃ -২৮০)

১৪. আরভটী –

আরেণ প্রতোদকেন তুল্যা ভটা উদ্ধতাঃ পুরুষা আরভটাস্তে সন্ত্যস্যামিতি ...... আরভটী। (না.দ. পৃঃ -২৫৬)

১৫. ঈহামৃগঃ –

ঈহা চেষ্টা মৃগস্যেব স্ত্রীমাত্রার্থাত্রেতি ঈহামৃগঃ । (না.দ. পৃঃ -২৩৯)

১৬. উৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ –

উৎক্রমণোন্মুখা সৃষ্টির্জীবিতং যাসাং তা উৎসৃষ্টিকাঃ শোচন্ত্যঃ স্ত্রিয়স্তাভিরঙ্কিতত্বাদুৎসৃষ্টিকাঙ্কঃ। (না.দ. পৃঃ -২৩৮)

১৭. উদাহৃতিঃ –

উৎকর্ষাহরণাদুদাহৃতিঃ । (না.দ. পৃঃ -২১০)

১৮. উদ্ঘাত্যম্ –

উদ্ঘাতে প্রশ্নাত্মকে সাধূদ্ঘাত্যম্ ।(না.দ. পৃঃ -২৫০)

১৯. কাব্যসংহারঃ –

কাব্যমেব সংহ্রিয়ত ইতি কাব্যসংহারঃ ।(না.দ. পৃঃ -২২৭)

২০. কৈশিকী –

অতিশায়িনঃ কেশাঃ সন্ত্যস্যামিতি কৈশিকাঃ স্ত্রিয়ঃ, তৎপ্রধানত্বাৎ তাসামিয়ং কৈশিকী। (না.দ. পৃঃ -২৫৫)

২১. ক্রমঃ –

বুদ্ধিস্তত্র ক্রমতে ন প্রতিহন্যত ইত্যর্থঃ। (না.দ. পৃঃ -২১০)

২২. গণ্ডঃ –

দুষ্টার্থগর্ভত্বাদ্ দুষ্টশোণিতগর্ভগণ্ড ইব গণ্ডঃ । (না.দ. পৃঃ -২৪৩)

২৩. গ্রথনম্ –

গ্রথ্যতে সম্বধ্যতে ব্যাপারেণ মুখ্যফলমনেনেতি গ্রথনম্। (না.দ. পৃঃ -২২২)

২৪. চূলিকা –

সা চূলেব চূলিকা রঙ্গাভিনেয়ার্থস্য নেপথ্যপাত্রোক্তেঃ শিখাকল্পত্বাৎ।(না.দ. পৃঃ -১৮১)

২৫. জনান্তিকম্ –

.....জনানামেকস্যৈব গোপ্যত্বাদ্ বহূণামন্তিকং শ্রাব্যতয়া নিকটং জনান্তিকম্ । (না.দ. পৃঃ -১৭৬)

২৬.ডিমঃ –

ডিমো ডিম্বো বিপ্লব ইত্যর্থঃ, তদ্যোগাদয়ং ডিমঃ ডিমেঃ সংঘাতার্থত্বাৎ। (না.দ. পৃঃ -২৩৮)

২৭. তোটকম্ –

তোটয়তি ভিনত্তি হৃদয়মিতি তোটকম্ ।(না.দ. পৃঃ -২১৪)

২৮. নর্মদ্যুতিঃ –

নর্মণো দ্যোতনং নর্মদ্যুতিঃ । (না.দ. পৃঃ -২০৩)

২৯. নাটকম্ –

নাটয়তি বিচিত্রং রঞ্জনাপ্রবেশেন সভ্যানাং হৃদয়ং নর্তয়তীতি নাটকম্ । (না.দ. পৃঃ -১৭৪)

৩০. নাটী –

নাটয়তি নর্তয়তি ব্যুৎপাদ্যমনাংসীতি ..... নাটী। (না.দ. পৃঃ -২৩৩)

৩১. নিয়তাপ্তিঃ –

নিয়তা ফলাব্যভিচারিণ্যাপ্তির্নিয়তাপ্তিঃ। (না.দ. পৃঃ -১৮৮)

৩২. নিরোধঃ –

নিরুদ্ধবস্তুবিষয়ত্বান্নিরোধঃ । (না.দ. পৃঃ -২২১)

৩৩. নৈষ্ক্রামিকী –

......নিষ্ক্রমঃ তৎপ্রযোজনা... নৈষ্ক্রামিকী। (না.দ. পৃঃ -২৭৯)

৩৪. পতাকা –

প্রসিদ্ধিপ্রাশস্ত্যহেতুত্বাৎ পতাকেব পতাকা ।(না.দ. পৃঃ -১৮৩)

৩৫. পতাকাস্থানকম্ –

উপকারিত্বমাত্রসাম্যাৎ পতাকাস্থানস্য তুল্যং পতাকাস্থানকম্ ।(না.দ. পৃঃ -১৮৩)

৩৬. পরিন্যাসঃ –

পরিতঃ ন্যসনং পরিন্যাসঃ ।(না.দ. পৃঃ -১৯৪)

৩৭. পুষ্পম্ –

তচ্চ বাক্যং পুষ্পমিব পুষ্পম্। কেশরচনায়াঃ পুষ্পমিব পূর্ববাক্যালঙ্কারকারিত্বাৎ ।(না.দ. পৃঃ -২০৫)

৩৮. প্রকরণী–

প্রকর্ষেণ ক্রিয়তে কল্প্যতে অস্যামর্থ ইতি প্রকরণী । (না.দ. পৃঃ -২৩৩)

৩৯. প্রকরী –

অন্যস্য মুখ্যনায়কস্যৈব প্রয়োজনং ..... প্রকর্ষেণ স্বার্থানপেক্ষয়া করোতীতি প্রকরী। (না.দ. পৃঃ - ১৮৫)

৪০. প্রকাশম্ –

যদ্ বৃত্তমগোপ্যতয়া অন্যেষামাত্মব্যতিরিক্তানামপি জ্ঞাপ্যং তৎ প্রকাশত ইতি প্রকাশম্। (না.দ. পৃঃ - ১৭৫)

৪১. প্রতিমুখম্ –

মুখস্যাভিমুখ্যেন বর্তত ইতি প্রতিমুখম্ ।(না.দ. পৃঃ -১৯০)

৪২. প্রযত্নঃ –

প্রকর্ষেণ যত্নঃ প্রযত্নঃ। (না.দ. পৃঃ -১৮৮)

৪৩. প্রবেশকঃ –

অপ্রত্যক্ষানর্থান্ সামাজিকহৃদয়ে প্রবেশয়তীতি প্রবেশকঃ।(না.দ. পৃঃ -১৮০)

৪৪. প্রাপ্ত্যাশা –

প্রাপ্তেঃ প্রধানফললাভস্যাশা প্রাপ্ত্যাশা । (না.দ. পৃঃ -১৮৮)

৪৫. প্রাবেশিকী –

প্রবেশঃ প্রয়োজনমস্যা ইতি ...... প্রাবেশিকী । (না.দ. পৃঃ -২৭৯)

৪৬. প্রাসাদিকী –

প্রসাদপ্রযোজনা প্রাসাদিকী । (না.দ. পৃঃ -২৮০)

৪৭. বিন্দুঃ –

সর্বব্যাপিত্বাদ্বা জলে তৈলবিন্দুরিব বিন্দুঃ।(না.দ. পৃঃ -১৮৫)

৪৮. বীজম্ –

.... স ধান্যবীজবদ্বীজম্ । (না.দ. পৃঃ -১৮২)

৪৯. ভাণঃ –

ভণ্যতে ..... স্বপরবৃত্তং প্রকাশ্যতে2ত্রেতি ভাণঃ ।(না.দ. পৃঃ -২৩৬)

৫০. ভাবঃ –

উপচয়ং প্রাপ্য রসরূপেণ রত্যাদির্ভবতীতি ভাবঃ । (না.দ. পৃঃ -২৫৬)

৫১. মুখম্ –

প্রারম্ভাবস্থাভাবিত্বাৎ প্রধানবৃত্তস্য ভাগো মুখমিব মুখম্ । (না.দ. পৃঃ -১৯০)

৫২. রসঃ –

.........রস্যতে আস্বাদ্যত ইতি রসঃ । (না.দ. পৃঃ -২৫৬)

৫৩. বাচিকঃ –

বাগনুকার্যা প্রয়োজনং হেতুরস্যেতি...... বাচিকঃ। (না.দ. পৃঃ -২৭৫)

৫৪. বিটঃ –

একং রাজোপযোগি কিঞ্চিদ্ গীতাদিষু মধ্যে বেত্তীত্যেকবিদ্ বিটঃ । (না.দ. পৃঃ -২৮২)

৫৫. বিদূষকঃ –

সন্ধিং বিগ্রহেণ বিগ্রহং সন্ধিনা চ বিশেষেণ দূষয়ন্তি নাশয়ন্তি বিপ্রলম্ভং তু বিনোদদানেন বিস্মারয়ন্তীতি বিদূষকাঃ । (না.দ. পৃঃ -২৮২)

৫৬. বিভাবঃ –

স্থায়িনং রসত্বেন ভবন্তং বিভাবয়ন্ত্যাবির্ভাবনাবিশেষেণ প্রযোজয়ন্তীতি.... বিভাবাঃ।(না.দ. পৃঃ -২৫৯)

৫৭. বীথী –

বক্রোক্তিমার্গেণ গমনাদ্ বীথীব বীথী । (না.দ. পৃঃ -২৩৯)

৫৮. ব্যভিচারিণঃ –

রসোন্মুখং স্থায়িনং প্রতি বিশিষ্টেনাভিমুখ্যেন চরন্তি বর্তন্ত ইতি ব্যভিচারিণঃ ।.... যদ্বা ব্যভিচরন্তি স্থায়িনি সত্যপি কে2পি কদাপি ন ভবন্তীতি ব্যভিচারিণঃ । (না.দ. পৃঃ -২৫৯)

৫৯. ব্যায়োগঃ –

বিশেষেণ আ সমন্তাৎ যুজ্যন্তে কার্যার্থং সংরভন্তে2ত্রেতি ব্যায়োগঃ। (না.দ. পৃঃ -২৩৪)

৬০. ব্যাহারঃ –

বিবিধো2র্থম্ আহ্রিয়তে2নয়েতি ব্যাহারঃ । (না.দ. পৃঃ -২৪০)

৬১. সন্ধিঃ –

মুখ্যস্য স্বতন্ত্রস্য মহাবাক্যার্থস্যাংশাঃ পরস্পরং স্বরূপেণ চাঙ্গৈঃ সন্ধীয়ন্ত ইতি সন্ধয়ঃ । (না.দ. পৃঃ -১৯০)

৬২.সমবকারঃ –

সঙ্গৈতেরবকীর্ণৈশ্চার্থৈঃ ত্রিবর্গোপায়ৈঃ পূর্বপ্রসিদ্ধৈরেব ক্রিয়তে নিবধ্যতে ইতি সমবকারঃ। (না.দ. পৃঃ -২৩৪)

৬৩. সমাহিতিঃ –

সম্যগ্ আ সমন্তাৎ ধানং পোষণং সমাহিতিঃ। (না.দ. পৃঃ -১৯৫)

৬৪. সাত্ত্বতী –

সৎ সত্ত্বং প্রকাশস্তদ্ যত্রাস্তি তৎ সত্ত্বং মনস্তত্র ভবা সাত্ত্বতী। (না.দ. পৃঃ -২৫৫)

৬৫. সাত্ত্বিকঃ –

অবহিতং মনঃ সত্ত্বং তৎ প্রয়োজনং হেতুরস্যেতি সাত্ত্বিকঃ। (না.দ. পৃঃ -২৭৬)

বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচী

অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থসমূহ ঃ

- (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসবিরচিত) *অগ্নিপুরাণ*, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।
- (কালিদাসবিরচিত) *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, এ.বি.গজেন্দ্রগাদকর সম্পাদিত, সুরাট, পপুলার বুক স্টোর্স, ১৯৫০।
- (অমরসিংহপ্রণীত) *অমরার্থচন্দ্রিকা*, মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য অনূদিত, কলকাতা, সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (চতুর্থ সংস্করণ)।
- (নন্দিকেশ্বরপ্রণীত) *অভিনয়দর্পণ*, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।
- (ঐ) *অভিনয়দর্পণ*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ২০১০।
- (ভবভূতিবিরচিত) *উত্তররামচরিত*, এম.আর.কালে সম্পাদিত, বম্বে, গোপাল নারায়ণ এণ্ড কোং, ১৯৩৪ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)।
- (ক্ষেমেন্দ্রপ্রণীত) *ঔচিত্যবিচারচর্চা*, দুণ্‌ঢিরাজ শাস্ত্রী সংশোধিত, জয়কৃষ্ণদাস-হরিদাস গুপ্ত প্রকাশিত, বারাণসী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৩৩।

- (দণ্ডীপ্রণীত) *কাব্যাদর্শ*, চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫।
- (হেমচন্দ্রপ্রণীত) *কাব্যানুশাসন*, রসিকলাল সি. পারিখ সম্পাদিত, বম্বে, শ্রীমহাবীর জৈন বিদ্যালয়, ১৯৩৮।
- (ঐ) *কাব্যানুশাসন*, শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সম্পাদিত, বম্বে, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯০১।
- (ভামহপ্রণীত) *কাব্যালঙ্কার*, রমণ কুমার শর্মা সম্পাদিত, দিল্লী, বিদ্যানিধি, ১৯৯৫।
- (রুদ্রটপ্রণীত) *কাব্যালঙ্কার* (নমিসাধুকৃত টীকাসমেত),বাসুদেব শর্মা সংশোধিত, বম্বে, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২৮।
- (বামনপ্রণীত) *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি* (কামধেনুটীকাসমেত), হরগোবিন্দ শাস্ত্রী অনূদিত ও সম্পাদিত, বারাণসী, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৮৯।
- (মম্মটপ্রণীত) *কাব্যপ্রকাশ*, রামানন্দ আচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্ত ক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।
- (ঐ) *কাব্যপ্রকাশ*, বামনাচার্য ঝালকিকার সম্পাদিত, পুণা, ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৬৫ (সপ্তম সংস্করণ)।
- (ঐ) *কাব্যপ্রকাশ (প্রথম উল্লাস)*, সুমিতা বসু ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, কলকাতা, সদেশ, ২০০৪।

- (রাজশেখরপ্রণীত) *কাব্যমীমাংসা*, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, শান্তি নিকেতন, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৯৬০ ।
- (ঐ) *কাব্যমীমাংসা*, সি.ডি. দালাল ও আর.এ. শাস্ত্রী সম্পাদিত, বরোদা ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯৩৪ (তৃতীয় সংস্করণ) ।
- (রামচন্দ্রপ্রণীত) *কুমারবিহারশতক*, ভাবনগর, জৈন আত্মানন্দ সভা, ১৯০৯।
- (ধনঞ্জয়বিরচিত) *দশরূপক*, এফ.ই. হল সম্পাদিত, কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৯ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ)।
- (ঐ) *দশরূপক*, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, কলকাতা, ১৮৭৮।
- (ঐ) *দশরূপক (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশ)*, সীতানাথ আচার্য ও দেবকুমার দাস সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৭।
- (আনন্দবর্ধনপ্রণীত) *ধ্বন্যালোক*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ (পরিমার্জিত সংস্করণ)।
- (ঐ) *ধ্বন্যালোক (প্রথম উদ্দ্যোত)*, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮।
- (ঐ) *ধ্বন্যালোক*, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য অনূদিত, কলকাতা, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।
- (রামচন্দ্রবিরচিত) *নলবিলাস*, জি.কে.গোণ্ডেকর ও লালচন্দ্র বি. গান্ধী সম্পাদিত, বরোদা, সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৯২৬।

- (হর্ষবিরচিত) *নাগানন্দ*, পি.ভি. রামানুজস্বামী সম্পাদিত, মাদ্রাজ, ১৯৫০।
- (রূপ গোস্বামীপ্রণীত) *নাটকচন্দ্রিকা*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, সদেশ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।
- (সাগরনন্দীপ্রণীত) *নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।
- (শিঙ্গভূপালপ্রণীত) *নাটক পরিভাষা*, শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।
- (রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রপ্রণীত) *নাট্যদর্পণ*, গজানন কুশব গোণ্ডেকর ও লালচন্দ্র বি. গান্ধী সম্পাদিত, বরোদা ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯২৯।
- (ঐ) *নাট্যদর্পণ*, থানেশচন্দ্র উপ্রেতি সম্পাদিত, দিল্লী, পরিমল পাবলিকেশনস্, ১৯৮৬।
- (ভরতপ্রণীত) *নাট্যশাস্ত্র (অভিনবভারতীটীকাসমেত)*, আর.এস. নাগর সম্পাদিত, দিল্লী, পরিমল পাবলিকেশনস্, ২০০৪ (পরিমার্জিত সংস্করণ)।
- (ঐ) *নাট্যশাস্ত্র*, কে.পি. উন্নি সম্পাদিত, দিল্লী, নাগ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
- (ঐ) *নাট্যশাস্ত্র*, মনোমোহন ঘোষ অনূদিত, কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৫১।
- (ঐ) *নাট্যশাস্ত্র*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

- (রাজশেখর সূরিপ্রণীত) *প্রবন্ধকোশ (প্রথম ভাগ)*, জিন বিজয়মুনি সম্পাদিত, শান্তিনিকেতন, সিঙ্ঘী জৈন জ্ঞানপীঠ, ১৯৩৫।
- (মেরুতুঙ্গপ্রণীত) *প্রবন্ধচিন্তামণি (প্রথম ভাগ)*, জিন বিজয়মুনি সম্পাদিত, শান্তি নিকেতন, সিঙ্ঘী জৈন জ্ঞানপীঠ, ১৯৩৩।
- *পুরাতনপ্রবন্ধসংগ্রহ*, জিন বিজয়মুনি সম্পাদিত , কলকাতা, সিঙ্ঘী জৈন জ্ঞানপীঠ, ১৯৩৬।
- (প্রভাচন্দ্র সূরিপ্রণীত) *প্রভাবকচরিত*, জিন বিজয়মুনি সম্পাদিত, আমদাবাদ-কলকাতা, সিঙ্ঘী জৈন গ্রন্থমালা, ১৯৪০।
- (হর্ষবিরচিত) *প্রিয়দর্শিকা*, এম.আর. কালে সম্পাদিত, বম্বে, গোপাল নারায়ণ এণ্ড কোং, ১৯২৮।
- (রাজশেখরবিরচিত) *বালভারত*, গঙ্গাসাগর রায় সম্পাদিত, বারাণসী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৮৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- (মধুসূদন সরস্বতীপ্রণীত) *ভক্তিরসায়ন*, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ (পরিমার্জিত সংস্করণ)।
- (শারদাতনয়প্রণীত) *ভাবপ্রকাশন*, মদনমোহন অগ্রবাল সম্পাদিত, মথুরা, ১৯৭৮।
- (ভাসবিরচিত) *ভাসনাটকচক্রম্*, সি.ভি. দেবধর সম্পদিত, পুণা, ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী, ১৯৬২।

- (ভবভূতিবিরচিত) *মহাবীরচরিত,* টি.আর.আর. আইয়ার সম্পাদিত, বম্বে, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৬।
- (ভবভূতিবিরচিত) *মালতীমাধব,* এম.পি. টেইলর সম্পাদিত, বম্বে, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২৬।
- (কালিদাসবিরচিত) *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* আর.ডি. কর্মকার সম্পাদিত, পুণা, ১৯৫০ (চতুর্থ সংস্করণ)।
- (বিশাখদত্তবিরচিত) *মুদ্রারাক্ষস,* এম.আর. কালে সম্পাদিত, দিল্লী, মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৭৬ (ষষ্ঠ সংস্করণ)।
- (হর্ষবিরচিত) *রত্নাবলী,* এম.আর. কালে সম্পাদিত, বম্বে, ১৯২১।
- (জগন্নাথপ্রণীত) *রসগঙ্গাধর,* সন্ধ্যা ভাদুড়ী সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৬১ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- (ভানুদত্তপ্রণীত) *রসতরঙ্গিনী,* গোপালচন্দ্র জোশী অনূদিত, দেবদত্ত কৌশিক ব্যাখ্যাত, দিল্লী, মুন্‌শীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৪।
- (শিঙ্গভূপালপ্রণীত) *রসার্ণবসুধাকর,* টি. গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গভর্ণমেন্ট প্রেস, ১৯১৬।
- (কুন্তকপ্রণীত) *বক্রোক্তিজীবিত,* এ.কে. কৃষ্ণমূর্তি সম্পাদিত, ধারওয়ার, কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭।

- (ঐ) *বক্রোক্তিজীবিত*, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।
- (মহিমভট্টপ্রণীত) *ব্যক্তিবিবেক*, টি. গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেন্ট প্রেস, ১৯০৯।
- (বিল্হণবিরচিত) *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত*, গজানন শাস্ত্রী মুসলগাংবকর সম্পাদিত, বারাণসী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৬৯।
- (কালিদাসবিরচিত) *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, আর.এন. গৈধানি সম্পাদিত, পুণা, রয়্যাল বুক স্টল, প্রথম সংস্করণ।
- (ভট্টনারায়ণবিরচিত) *বেণীসংহার*, এ.বি. গজেন্দ্রগাদকর সম্পাদিত, বম্বে, ১৯৪১ (তৃতীয় সংস্করণ)।
- (শার্ঙ্গধরপ্রণীত) *শার্ঙ্গধরপদ্ধতি*, পিটার পিটারসন সম্পাদিত, বম্বে, গভর্ণমেন্ট সেন্ট্রাল বুক ডিপো, ১৮৮৮।
- (ভোজদেবপ্রণীত) *শৃঙ্গারপ্রকাশ*, জি.এস. জসিয়ার সম্পাদিত ও প্রকাশিত, মাইসোর, ১৯৫৫।
- (শুভঙ্করপ্রণীত) *সঙ্গীতদামোদর*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬০।
- (শার্ঙ্গদেবপ্রণীত) *সঙ্গীতরত্নাকর*, আর.কে. শ্রিঙ্গি ও প্রেমলতা শর্মা সম্পাদিত, দিল্লী, মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৮৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

- (বিশ্বনাথপ্রণীত) *সাহিত্যদর্পণ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, মিতভাষিণীটীকাসমেত)*, কুমুদরঞ্জন রায় সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ।
- (ঐ) *সাহিত্যদর্পণ (লক্ষ্মীটীকাসমেত)*, দুর্গাদাস দ্বিবেদ সঙ্কলিত, দিল্লি, মেহরচন্দ লছমনদাস, ১৯৮২।
- (ঐ) *সাহিত্যদর্পণ (প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)*, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮।
- (ঐ) *সাহিত্যদর্পণ (কুসুমপ্রতিমাটীকাসমেত)*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৮১ (পুনর্মুদ্রিত পঞ্চম সংস্করণ)।
- (শঙ্করবিরচিত) *সৌন্দর্যলহরী*, এ. কুপ্পুস্বামী সম্পাদিত ও প্রকাশিত, টি.আর. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও বৈদ্য এস. ভি. রাধাকৃষ্ণ শাস্ত্রী সহ-সম্পাদিত, ১৯৭৬।
- (বাণভট্টবিরচিত) *হর্ষচরিত*, পি.ভি. কাণে সম্পাদিত, দিল্লী, মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৮৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

বাংলা ঃ

- গুপ্ত অতুলচন্দ্র, *কাব্যজিজ্ঞাসা*, কলকাতা, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৯৬ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায় পরিমল, *সংস্কৃত নাট্যপ্রয়োগ*, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

- দাশগুপ্ত সুধীরকুমার, *কাব্যালোক*, কলকাতা, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (তৃতীয় সংস্করণ)।
- দাশগুপ্ত সুরেন্দ্রনাথ, *কাব্যবিচার*, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬।
- দাস করুণাসিন্ধু, *সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের রূপরেখা*, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।
- ভট্টাচার্য বিষ্ণুপদ, *প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ভূমিকা*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্ত ক ভাণ্ডার,১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
- ভট্টাচার্য বিষ্ণুপদ, *সাহিত্যমীমাংসা*, কলকাতা, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)।
- ভট্টাচার্য সাধনকুমার, *নাট্যতত্ত্বমীমাংসা*, কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩।
- ভট্টাচার্য সুকুমারী, *ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা, ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৯১।
- ভৌমিক দুলাল, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
- মজুমদার মোহিতলাল, *সাহিত্যবিচার*, কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ)।

- মিত্র হরপ্রসাদ, *সাহিত্যের নানা কথা*, কলকাতা, ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
- মুখোপাধ্যায় রমারঞ্জন, *রসসমীক্ষা*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
- মুখোপাধ্যায় সচ্চিদানন্দ, *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার , ১৯৭৪।
- শাস্ত্রী অশোকনাথ, *রস ও ভাব*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।
- সান্যাল অবন্তীকুমার, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০০৩, পুনর্মুদ্রণ)।

English ঃ

- Apte V.S., *Practical Sanskrit English Dictionary*, Poona, K.P. Gode & Co. Karve, 1957-58.
- Bhat G.K., *Sanskrit Drama*, Delhi, Ajanta Publications, 1985.
- Bhattacharya Biswanath, *Sanskrit Drama and Drumaturgy*, Delhi, Sharada Publishing House, 1994 (second edition).
- Butcher S.H., *Aristottle's Theory of Poetry and Fine Arts*, New Delhi, Kalyani Publishers, 2002(rptd).
- Chattopadhyay Rita, *Modern Sanskrit Dramas of Bengal (20th century),* Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 1992.
- Dasgupta S.N. and De S.K., *A History of Sanskrit Literature (classical period)*, University of Calcutta, 1977.

- Jagirdar R.V., *Drama in Sanskrit Literature,* Bombay, Popular Book Depot,1947.
- Kane P.V., *History of Sanskrit Poetics*, Delhi-Varanasi-Patna-Madras, Motilal Banarasidas, 1987 (fourth edition).
- Keith A.B., *The Sanskrit Drama in its origin, development, Theory and Practice*, Oxford University Press, 1924.
- Krishnamachariar M., *History of Classical Sanskrit Literature*, Delhi, Motilal Banarasidas, 1989 (third edition).
- Levi Sylvain, *The Theatre of India (vol. I&II),* Translated from the French by Narayan Mukherjee, Calcutta, A Writer's Workshop Publication, 1978.
- Macdonell Arthur A., *A History of Sanskrit Literature*, London, William Heinemann, 1905.
- Mainkar T.G., *Sanskrit Theory of Drama and Dramaturgy*, Poona, 1985 (third edition).
- Mainkar T.G., *The Theory of the Sandhis and the Sandhyangas*, Poona,1960.
- Majumder R.C. and Pusalkar A.D., *The Struggle for Empire,* Bharatiya Vidyabhavan's History and Culture of Indian People , Vol-5, 1951.
- Mankad D.R., *The Types of Sanskrit Drama*, Karachi, Urmi Prakashana Mandir, 1936.
- Mishra Gopal Chandra, *Sanskrit Farcical Plays and those of Srijibanyayatirtha of Bengal*, Calcutta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1999.
- Polgrave F.Turner, *The Golden Treasury of the best songs and lyrical poems in the English language*, New Delhi-Bombay-Calcutta, Oxford and IBH Publishing Co. Private Limited, 1861.

- Raghavan V., Bhoja's *Srngaraprakasa*, Madras, Punarvasu, 1963.
- Raghavan V., *The Number of Rasa's*, Adyar, Adyar Library, 1940.
- Roy Choudhuri Hemchandra, *Political History of Ancient India*, Oxford University Press, 1996 (revised third edition).
- Shastri Gourinath, *History of Classical Sanskrit Literature,* Delhi, Motilal Banarasidas, 1987 (rptd.).
- Shekar Indu, *Sanskrit Drama: It's Origin and Decline*, Leiden, 1960.
- Trivedi K.H., *The Natyadarpana of Ramacandra-Gunacandra -- A Critical Study*, Ahmedabad, L.D. Institute of Indology , 1966.

['নাট্যদর্পণ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থের দ্বিতীয় (তথা অন্তিম) খণ্ড সমাপ্ত]